স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের জন্য

ইহাতে গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের
স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ৩২৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী উপদেশ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী অফিস।

[illegible] রোড, ভবানীপুর

সূচীপত্র

বিষয়সূচী — পৃষ্ঠা।

বিষয়সূচী

বিষয়সূচী — পৃষ্ঠা

চিত্রসূচী

"বঙ্গবাণী"র নিবেদন

গ্রাহক সংক্রান্ত—

১। ফাল্গুন হইতে "বঙ্গবাণী"র বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়।

২। বঙ্গবাণীর বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতিমাসে		...	১৮৲
" ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	...	১০৲
" ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	"	...	৬৲
রঙিন ছবির আগের পৃষ্ঠা	"	...	২২৲
শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২২৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১২৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	"	...	৩০৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৬৲
কভারের ৩য় পৃষ্ঠা	"	...	২৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৩৲
কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা	"	...	৩৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৮৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৩
সূচীপত্রের সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২০
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১১
সূচীপত্রের নীচে অৰ্দ্ধপৃষ্ঠা	"	...	১৩

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
Managing Proprietor.

সমস্ত রকম
বিবাহের
গহনা
বিক্রয়ার্থ
আছে।
আবশ্যক হইলে
২৪ ঘণ্টায় যে
কোন গহনা
প্রস্তুত করিয়া
দেওয়া হয়।
গিনি সোনার
ও পানমরতার

গ্যারা
দেওয়া
আমা
প্রস্তুত পু
গহনা
পানম
বাদে গি
সোনার
সর্ব্বদাই
করিয়া প
ক্যাটাল
জন্য প
লিখুন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের

পর্ণপুট

(১ম ভাগ)

চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল।

গরদ—মটকা ও তসরের—

যা কিছু সব মুর্শিদাবাদের দরেই বিক্রয় করিয়া থাকি। জিনিষের বিবরণ ও আন্দাজ দাম জানাইলে আমরা পত্রপাঠ মাল পাঠাই।

এইচ্, কে, ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

কাগজ বিক্রেতা

সকলরকম কাগজ, কালি, পিতলের রুল, কার্ড-বোর্ড আর্ট-কাগজ, ব্যাঙ্ক কাগজ, ইত্যাদি পাওয়া যায় ও সুবিধাদরে কণ্ট্রাক্ট করিয়া দৈনিক ও মাসিক পত্রিকার কাগজ সরবরাহ করা হয়

Tel. 'ENVANOTE' Cal.

৪১নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Phone 4676.

"আবার তোরা মানুষ হ'

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৩-'৩৪ | ভাদ্র | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ১ম সংখ্যা

মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ

জীবন-সমস্যা ও মতবাদ

একই মাটির রসে যেমন অগণিত তরুরাশি ধরণীবক্ষে শাখাপ্রশাখা মেলিতেছে তেমনি একই জীবনসমস্যা মানবমণ্ডলীকে জীবনের নানা বিচিত্র পথে প্রেরণ করিতেছে। সব গাছ এক রকম হয় না, সব মানুষও একরূপ নয়। এক জাতীয় বীজ হইয়াও রসগ্রহণের পার্থক্যবশতঃ বৃক্ষের গঠনে ও আয়তনে কত বিভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মানুষও শক্তির তারতম্য বশতঃ এই জীবন-সমস্যাকে একই ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং সেই জন্যই স্থূলজগতের বাহ্যিক পারিপার্শ্বিক ভেদে যেমন স্থূলদেহের ভেদ, তেমনি আন্তরিক বিভিন্নতা বিশিষ্টতাও গঠিত হইয়া উঠে। একই অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ব্যক্তিগত, বীজগত বিভিন্নতার জন্য চিন্তাপ্রণালী ও অনুভবরীতি প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। বাহ্যিক গঠন-বৈচিত্র্য যেমন প্রত্যেক মানবকে একটি রূপের বৈশিষ্ট্য দান করিতেছে, অন্তরের চিন্তা ও অনুভবগুলিও তেমনি নানা বিচিত্রভাবে প্রত্যেকের অন্তরকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। এই অন্তররূপটিকে আমরা দার্শনিক ভাষায় মতবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। কারণ যে কোনও লোকের সত্যকার মতবাদ জানিতে পারিলে, আমরা সেই লোকটির অন্তর সম্বন্ধে তাহার সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে

একটা ধারণা করিয়া লইতে পারি। এই অধ্যায়ে আমরা মেটারলিঙ্কের মতবাদটি কি—সমগ্রভাবে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। যদিও দার্শনিক ভাষায় 'মতবাদ' কথাটি ব্যবহার করিতে হইতেছে তথাপি কবির মতবাদ যে দার্শনিক মতবাদ হইতে কতকটা ভিন্ন তাহা মনে রাখিতে হইবে।

দার্শনিক ও কবি

দার্শনিক মতবাদ কতকগুলি প্রত্যক্ষ সত্যকে আশ্রয় করিয়াই গঠিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু দার্শনিক প্রত্যক্ষের মধ্যেই আপনাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়া তুষ্ট নহেন। তাঁহার মতবাদ তর্ক-প্রতিষ্ঠিত; কতকগুলিকে সত্যকে যুক্তির কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া, তাহাদের মুখ হইতে তিনি কোন একটি সিদ্ধান্তকে বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করেন; বহুস্থলে এই সিদ্ধান্ত কেবল দার্শনিকের অপূর্ব্ব যুক্তি-প্রয়োগ-শক্তিরই নিদর্শন হইয়া দাঁড়ায়। উকীল যেমন সাক্ষীর মুখ হইতে কথা বাহির করিয়া তাহা হইতে আপনার সিদ্ধান্ত সৃষ্টি করেন, ইহাও তেমনি। এই জন্যই দার্শনিকের সিদ্ধান্ত জীবনে পরীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চয়তার দাবী করিতে পারে না। কিন্তু কবির মতবাদে জীবনের প্রাধান্যই বেশী, সেখানে যুক্তির প্রাধান্য নাই। তাঁহার মতবাদ তাঁহার অনুভব জীবনেরই একটা সৃষ্টি বলিয়া তাহার মধ্যে নিশ্চয়তা আছে। যে পরিমাণে কোনও মতবাদ জীবনের অনুভব হইতে আপনি গড়িয়া উঠে, সেই পরিমাণেই সেই মতবাদ সেই ব্যক্তিবিশেষের অন্তররূপটিকে প্রকাশ করিয়া থাকে। শুদ্ধমাত্র দার্শনিক মতবাদের মধ্যে অন্তরজীবন তেমন করিয়া প্রকাশ নাও পাইতে পারে।

মেটারলিঙ্কের অনুভব-জীবন হইতে উৎসারিত মতবাদটি অনেকের নিকটই দুর্ব্বোধ্য ও বিচিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত ইনিও বেশীর ভাগ লোকের নিকট 'মিষ্টিক' (গোপনচারী) আখ্যা পাইয়া বসিয়াছেন। যাহাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ও মেটারলিঙ্ক উভয়েরই অনুভূতি একান্তভাবে মানবীয়; তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সাধারণ না হইলেও অস্বাভাবিক ইন্দ্রজাল নয়, কোনও বিশিষ্ট গুপ্ত প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা উপলভ্য বস্তু নয়। 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্ট' গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বলিয়াছেন 'আমার এই মতবাদ কোথা হইতে আসিল তাহা আমি নিজেই জানি না। আমার নিকট উহা জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ও সহায়ক বলিয়া মনে হয়; আর কেবল হৃদয়ের অনুভব হইতে ইহার জন্ম বলিয়াই আমি ইহাকে মানি—ইহা ছাড়া অন্য কোন যুক্তি আমি দিতে পারি না।'* এই জন্যই বলিতেছিলাম যে মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ দার্শনিক মতবাদ হইতে ভিন্ন। দার্শনিক মতবাদ কতকগুলি প্রত্যক্ষ হইতে যুক্তিতর্কের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ সত্য সম্ভাব্যতার

* Wisdom and Destiny p. 4.

অনুমান করিতে পারে মাত্র, নিশ্চয় করিতে পারে না। কিন্তু মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ তাঁহার অনুভব-সিদ্ধ বস্তু বলিয়াই, তাঁহার জীবনের দিক দিয়া ইহাকে কখনই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে।

জীবন সমস্যা কি ?

বলিয়াছি যে জীবন-সমস্যা হইতেই বিভিন্ন মতবাদ উৎপন্ন কিন্তু জীবন-সমস্যা কি তাহা ভাল করিয়া বলা হয় নাই। বাঁচিয়া আছি, উহার মধ্যে আমাদের সমস্যাটি কিসের ? এই বলিয়া কেহ কেহ একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। কিন্তু যদি দৈবগতিকে কোন দিন পাতে অন্ন পড়িতে বিধাতার ভুলে একটু গণ্ডগোল হইয়া যায় সেদিনও এমনই ভাবে জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। আজকাল এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে বহুলোকই বাঁচিয়া থাকার ভারটা যে কতখানি দুর্ব্বিহ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। ইহা হইল অতি সহজ স্থূল জীবনের অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা সমস্যারূপ। ইহার মীমাংসাও তেমনি স্থূল ; দা-কোদাল-লাঠি-লাঙ্গলে এই সমস্যার একটা মীমাংসা মানুষ প্রতিনিয়তই করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই বিচিত্র রহস্যময় জীবন-সমস্যা কেবল মাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির রূপ ধরিয়াই আসে নাই। নানা বিচিত্র রূপে সে বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, বিবাহ দিবার কিম্বা বরক্রয়ের অর্থসামর্থ্য নাই ; পিতামাতার বুকের রক্ত নিমেষে নিমেষে শুকাইয়া উঠিতেছে : অন্নে রুচি নাই, রজনীতে নিদ্রা নাই ; এও জীবনসমস্যার একটি রূপ। এখানে অন্ন চিন্তা নাই, তবু জীবন কি দুঃসহ যাতনা ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ ! আবার দৃষ্টি পড়ে কলিকাতার সেই নরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর ; কি তাঁহার অভাব ছিল ! বন্ধুবান্ধব, স্বাস্থ্য, যৌবন সবই ত ছিল, তবু তাহারই মাঝে তাঁহার হৃদয়ের কোন্ জ্বালা আগ্নেয়গিরির মত জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহার চিত্তাকাশকে বাথাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ! কোন্ মহা অস্বস্তি তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল ? তাঁহারও জীবন কোন্ অদৃশ্য ভারের তীব্র চাপে নিষ্পেষিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল ! এখানেও দেখি জীবন সমস্যারই এক বিচিত্র রূপ !

এমনই করিয়া জীবন দেশকে, সমাজকে, ব্যক্তিকে অহরহ ব্যাকুল করিয়া ফিরিতেছে। ইজিপ্টের স্ফিঙ্ক্স্ (sphinx) এর মত, বাপীতটে যুধিষ্ঠির-সম্মুখে যক্ষরূপী ধর্ম্মের মত, সে একটি প্রশ্ন লইয়া দাঁড়াইয়াছে ; উত্তর দাও, বাঁচিবে নতুবা ত্রাণ নাই। যাহার নিকটে যে রূপেই এই সমস্যা আসিয়া হাত পাতুক, তাহাকে তৃপ্ত করিয়া ফিরাইতে হইবে, নতুবা বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। জীবন-যুদ্ধ বাস্তবিক জীবে জীবে নয়, জীব ও জীবনে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত রোগক্লিষ্ট মানবকে একভাবে তাহার উত্তর দিতে হইয়াছে আর বুদ্ধ-বিবেকানন্দ-

বিজয়কৃষ্ণকে আর একভাবে তাহাকে তৃপ্ত করিতে হইয়াছে; উত্তর না দেওয়া পর্য্যন্ত কাহারও বেদনা ও অস্বস্তির আর সীমা-পরিসীমা থাকে না।

আদর্শবাদ ও জীবনসমস্যা

বর্ত্তমান যুগে ইউরোপের ভাবুকগণ আদর্শবাদ প্রচার করিয়া জীবন-সমস্যার একটা মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু করালী কালীর ক্ষুধা মিটে নাই, আদর্শবাদ সফলতা প্রাপ্ত হয় নাই। একটা বিকট বিরোধ তাহার সম্মুখে আজ বিভীষিকা লইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু কোথায় এই বিরোধের নিবৃত্তি তাহা সে আজও আপনার হৃদয়ের মাঝে খুঁজিয়া পাইতেছে না। এক দিকে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, অপরদিকে বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র লীলাখেলা, বিশ্ববিধানের বিচিত্র দুর্ব্বোধ্য গতি এ দুয়ের মিল কোথায়? পদে পদে এই যে সজ্ঘাত উৎকট হইয়া উঠিতেছে ইহাকে শান্ত করিবার মন্ত্রটিকে ত আজও সে পাইল না! আর পাইতেছে না বলিয়াই না-পাওয়ার বেদনাটি আজ প্রবল হইয়া তাহার চিত্তকে নিরাশ করিয়া তুলিতেছে! জোর করিয়া নানা যুক্তিতর্ক দিয়া এই বিরোধের, এই বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজের সহিত ব্যক্তির, ধর্ম্মের সহিত প্রবৃত্তির, একটা সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু পরিণামে সত্যই কোনও ভিত্তি আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, অনেকেই মানব-জীবনের মূলে শুধু একটা করুণ সহায়হীনতা ও অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন; বলিয়াছেন, জীবন একটা উন্মাদের প্রলাপের মতই অর্থহীন। এই নিরাশার ফলে কেহ কেহ জীবনের নৈতিক মূল্যটিকেও অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'এই জীবনের নৈতিক সাধনার কোন মূল্য নাই, বৃথাই ওই সব নিয়ম মানিয়া আত্মবঞ্চনা করিয়া মরিতেছে, দু'দণ্ডের জীবন, পান পাত্র পূর্ণ করিয়া লও, সব দ্বিধা-সঙ্কোচ দুহাতে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেল! অন্ধকার হইতে আসিয়াছ আবার অন্ধকারেই কে কোথায় চলিয়াছ তাহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে! যতটুকু পার এই বর্ত্তমানের আলোকে আনন্দ লুটিয়া লও।'

মেটারলিঙ্কের বাণী

এই নৈরাশ্য, এই Nihilism-কে অস্বীকার করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকটাও বিংশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে কয়জন ভাবুক আত্ম-অনুভূতির প্রেরণায় আনন্দবাণী উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মেটারলিঙ্ক অন্যতম। মানব-জীবনের উপর তিনি যে আলোক-পাত করিয়াছেন তাহা কোনো চোখ-বোজা ভাবুকের স্বপ্নালোক নয়; তিনি পরম গম্ভীর ভাবে দাড়িতে হাত দিয়া বলেন নাই যে দুঃখটা মিথ্যা, মায়া, স্বপ্ন, অবিদ্যা। তিনি মানব-জীবনের সমস্ত দুঃখকে চোখ মেলিয়া স্বীকার করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই, তবে দুঃখকেই তিনি চরম

করিয়া দেখিতে পারেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন,—এই সুখদুঃখকেই অতিক্রম করিয়া জীবন আনন্দলোকে পৌঁছাইয়া সার্থক হইতেছে। এই জীবন আমাদের প্রতিনিয়তই সেই অদৃশ্য সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ছোটখাটো ঘটনায় সুখদুঃখের অন্তরালে থাকিয়া আমাদের কতকগুলি বিশেষ ভাবনা ও অনুভব জীবনকে সততই সেই লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে! সেই সব ভাবনা ও অনুভবের সন্ধান পাইলে চিত্ত আর ঘটনাপরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে না। কিন্তু সেই সব অদৃশ্য-শক্তির ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইলে চিত্তকে একটু উচ্চতর ভূমিতে লইয়া যাইতে হইবে।

সেই ভূমিতে উঠিতে গিয়া অনেকগুলি ধারণাকেই পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হইয়াছে। ইউরোপের কানে তাই মেটারলিঙ্কের বাণী নূতন ও 'মিষ্টিক' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইউরোপ বলিতেছিল 'মানুষ একটা প্রবৃত্তি-চালিত পশু মাত্র, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের ফলে সে অপরাপর পশুদের পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে; তাহা না হইলে এমন কিছুই পাইবে না যাহা মানুষেই আছে, পশুতে নাই। ওই যে মানুষের মধ্যে দেবভাব ইত্যাদির কথা শোনা যায় উহা কবিকল্পনা মাত্র, সত্য নয়।' এই জাতীয় চিন্তাপ্রণালীর ফলে ইউরোপীয় দৃষ্টি এই বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে কোনই রহস্য, কোনই অর্থ পাইতেছিল না: সে দেখিতেছিল সমগ্র বিশ্বজগৎ একটা অণুপরমাণুর দ্বন্দ্বমাত্র, ইহার মূলে যেন কোনই সামঞ্জস্য নাই, উদ্দেশ্য নাই। পশু-ধর্ম্ম ছাড়া মানব-প্রকৃতির মধ্যে ইউরোপ যখন আর কিছুই না পাইয়া ব্যর্থ ফিরিতেছিল তখন মেটারলিঙ্ক বলিয়া উঠিলেন 'না, না, মানুষ পশু নয়, তাহার মাঝে দেবত্বের পরমপূত জ্যোতিঃ রহিয়াছে; অন্তর তাহার স্বর্গের আলোক হইতে বঞ্চিত হয় নাই।'* মানব চেতনার মূলে এই 'অমর জীবন' ও 'পরম মঙ্গলে'র আবিষ্কার বাণী ইউরোপের কানে অপূর্ব্ব ঠেকিল। এই বাণীকে মানিয়া লইতে গিয়া সংশয় ও দ্বিধা চিত্তকে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল।

সংশয় হইবারই কথা বটে; জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে কোথাও মঙ্গল ও সৌন্দর্য্য কি চোখে পড়ে? চারিদিকে কত পাপ, কত অমঙ্গল ও দ্বিধা-দৌর্ব্বল্য! ইহার দিকে চাহিয়া কে বলিবে যে এই জীবন মঙ্গল ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ মাত্র! সত্যই বাহ্যদৃষ্টিতে এই ভাবের কথা বলা চলে না এবং এই দৃষ্টি ছাড়া যদি মানুষের সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার আর কোনও অন্তরিন্দ্রিয় না থাকিত তবে ইহাই নিঃসংশয়ে বলা চলিত যে, এই জীবনটা বাস্তবিক একটা বিশ্রী ব্যাপার; কোনও রকমে ইহাকে শেষ করিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু মেটারলিঙ্ক আসিয়া বলিলেন, শেষ করিয়া ফেলার মত বিশ্রী এই জীবন নয়; তবে যে এইরূপ মনে হয় তাহা সত্য; কিন্তু মনে হওয়াটাই সত্য নয়! জীবনের প্রকৃত সত্যটিকে জানিতে হইলে একটু অন্তরে প্রবেশ

* Treasure of the Humble (Invisible Goodness).

করিতে হইবে। অন্তর্দৃষ্টি (Wisdom) লাভ করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে মানব-হৃদয়ের গুপ্ত-কক্ষে সেই মণিদীপ নিবাত নিষ্কম্প জ্বলিতেছে ; একটু অন্তরে প্রবেশ লাভ কর, দেখিবে শত পাপ মলিনতা ঘেরা জীবনও সত্য এবং মঙ্গলকে হারায় নাই* এই বিশ্বাস, মানব-হৃদয়ের প্রতি এই শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি ইহাই মেটারলিঙ্কীয় আনন্দবাণীর একটি বিশেষত্ব।

জীবনের তিনটি স্তর

অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিলে জীবনের সত্যকার অর্থটি পাওয়ার আশা আছে বুঝিলাম কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি পাই কি করিয়া ? সকলেরই ত সেই দুর্লভ বস্তুটির উপর কোনও জন্মসিদ্ধ অধিকার নাই। মেটারলিঙ্ক বলিয়াছেন যে আমাদের সাধারণ অবস্থায় অন্তর্দৃষ্টির অধিকার পাওয়া যায় না ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু জীবনের একটা বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইলে মানুষ সত্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। এই অবস্থাটি নির্দ্দেশ করিবার জন্য মেটারলিঙ্ক জীবনকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভাগ করিয়াছেন।

প্রথম, পাশব স্বভাববৃত্তির জীবন। আমাদের কথায় ইহাকে তামস-জীবন বলিতে পারি। জীবনের এই অবস্থায় মানুষের কর্ত্তৃত্ববোধটা যেন ঘুমাইয়া থাকে। স্রোতবাহিত তৃণের মত ঘটনাস্রোতে পড়িয়া এই অবস্থার মানুষগুলি ও এক দুই করিয়া জীবনের এক একটা বাঁক পার হইয়া যায়। ভিড়ের ঠেলায় যেমন, করিয়া মানুষ স্বকর্ত্তৃত্ববিহীন হইয়া গা ছাড়িয়া দিয়া এক রকম চক্ষু না চাহিয়াই চলিতে থাকে এই অবস্থায় জীবন-চলনও সেই রকমের।

কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ পৌঁছাইয়া আর এমনটি থাকিতে পারে না। তখন তাহার অন্তরে কর্ত্তৃত্ববোধ ও বিচারশক্তি জাগিয়া উঠে। ইহাকে প্রজ্ঞার জীবন বলা যাইতে পারে। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে এখন সে আর কেবল এদিক হইতে ওদিকে ঠেলা খাইয়া বেড়ায় না ; পিঠে কিল পড়িলে সেও তাহার দৃঢ়মুষ্টি উদ্যত করিতে ছাড়ে না। এই স্তরের মানব যোদ্ধা, জীবন তাহার একটা সংগ্রাম; জীবনের এই স্তরেই সত্যলাভের ব্যাকুলতা দেখা দেয় এবং তাহারই ফলে মানব-অন্তরে একটা ঘোর অন্তর্বিরোধ ও সংগ্রামের সৃষ্টি হয়।

এই সংগ্রাম শেষ হইলেই তৃতীয় স্তরের প্রেমজীবন আরম্ভ হয়। মেটারলিঙ্ক ইহাকে দৈবস্বভাববৃত্তির জীবন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই মানব-জীবনের চরম সার্থকতার অবস্থা। প্রেমের দ্বারাই মানব এই গভীরতর সত্যজীবনের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সক্ষম হয়। প্রেম লাভ হইলেই মানব যুক্তি ও বিচারের দ্বন্দ্ব ছাড়াইয়া প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারে ও দৈবজীবন যাপন করিতে পারে।

* Treasure of the Humble (Invisible Goodness).

প্রেম-জীবনে যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি

যাঁহারা মানব-জীবনের এই তৃতীয় স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাঁহারাই মহাপুরুষ। ইঁহারা বিচার-বিতর্ক ছাড়াইয়া একমাত্র প্রেমের সহজ প্রেরণায় কর্ম্ম করেন ও প্রকৃত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বিচার-বিতর্ক করিয়া প্রজ্ঞার পরামর্শ লইয়া যতই আমরা কাজ করি না কেন, তাহাতে প্রকৃত কল্যাণ কি তাহা জানা যায় না। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, এ বিচার কে করিবে? বিচার করিয়া নৈতিক বোধ জাগ্রত করা যায় না। তবে কি বিচার-শক্তির কোনই স্থান নাই? মেটারলিঙ্ক বলেন আছে, "যুক্তি আত্মরক্ষা করে, সময় সময় সরিয়া দাঁড়ায়, কখনও বারণ করে, কখনও ত্যাগ করে, আবার কখনও নষ্ট করে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অগ্রসর হইয়া যায় এবং আক্রমণ করিয়া আপনার অধিকারসীমা বর্দ্ধিত করে---সে সৃষ্টি করে, প্রভুত্ব করে"* যুক্তি যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করে, কিন্তু নূতন কিছু বাহির করিবার শক্তি তাহার কোথায়? দশটা জিনিস হাতে পাইলে তুলাদণ্ড ধরিয়া কোন্‌টা ছোট কোন্‌টা বড় তাহার বিচার সে করিতে পারে কিন্তু এই দশটাকে ছাড়িয়া আরও ভাল বা আরও মন্দ, আরও ছোট বা আরও বড় কিছু আবিষ্কার করিতে পারে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি। প্রেমের গভীরতার অনুপাতে অন্তর্দৃষ্টি (intuition) ও তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়; তখন অন্তর্দৃষ্টি যাহা আবিষ্কার করে তাহা প্রজ্ঞার বা যুক্তির মনোমত না-ও হইতে পারে। অর্থাৎ যুক্তি দিয়া সব জিনিসেরই একটা মূল্য নিরূপণ সম্ভব নয়, যতক্ষণ আমরা যুক্তির ভিত্তি অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান না করিব। দুইটি নীতি উপদেশ লইয়া প্রেম ও প্রজ্ঞার দৃষ্টির পার্থক্যটুকু স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। একজন বলিতেছেন আত্মসুখই লক্ষ্য, আর একজন বলিতেছেন পরসুখই লক্ষ্য, শত্রুকেও ভালবাসা চাই। যুক্তি বিচার দিয়া বুঝাইতে গেলে আত্মনেপদী উপদেশটাই বোধ করি খুব জোরে এবং ঘোরালো করিয়া বলা যায়। কিন্তু ওই দ্বিতীয় উপদেশটির স্বপক্ষে যুক্তি খুব জোর করিয়া বলিতে পারে এমন কি কথা আছে! নিজের সুখের চেষ্টা, নিজের অস্তিত্বটিকে সর্ব্বাগ্রে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিব এ কথাটা কে না বুঝিবে? কিন্তু আপনার

---

* Wisdom and Destiny.

পার্ব্বত্যপথে Two Lobes প্রবন্ধে মেটারলিঙ্ক যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির শক্তি ও সীমা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

"It seems that there are in fact in the human brain an eastern lobe and a western lobe, which have never acted at the same time. The one produces, here, reason, science and consciousness. One reflects only the infinite and the unknowable; the other is interested only in what it is able to delimit, in what it may hope to understand. They represent employing a perhaps imaginary image, the conflict between the material and the moral ideal of humanity." pp, 167-68.

অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত ধূলিলীন করিয়া দিয়া শত্রুকেও ভাল বাসিতে যাওয়াটা যে একটা পাগলামী একথাটা মানব সমাজের প্রায় ব্যক্তিই মুখে ততটা জোরে না বলিলেও জীবনের সকল কর্ম্মে নিয়তই প্রচার করিতেছেন। শত্রুর শেষটুকু পর্য্যন্ত রাখিতে মানুষ নারাজ—বাঁচিয়া থাকার পক্ষে শত্রুকে নির্ম্মূল করাই একমাত্র বিচারসহ কথা। এমত অবস্থায় ইউরোপ যে খৃষ্টের উপদেশ বছরে বায়ান্ন দিন শুনিয়াও একগালে চড় খাইয়া অতি বিনীত ভাবে আর একখানি গালও ফিরাইয়া দিবার মত মনের গতি করিয়া তুলিতে পারে নাই ইহা বিচিত্র নয়। কিন্তু তবু একথা সত্য যে ওই খৃষ্টের উপদেশের নিকট বিশ্বজগতের সকল প্রেমিকই যে শুধু মাথা নত করিয়াছেন তাহা নয়. ওই আত্ম-সুখান্বেষীরদলও এই প্রেমের নিকট আপনাদের উদ্ধত পতাকাটা নত করিয়া রাখিয়াছে; অন্ততঃ কার্য্যে যাহাই করুক, অন্তরের লজ্জা তাহাকে ওই প্রেমের নীতিকেই সত্য বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য করিয়াছে। অথচ এই প্রেমের স্বপক্ষে, এই উচ্চতর নীতির সমর্থন করিবার মত আমাদের বিচার বিশেষ জোরাল যুক্তি খুঁজিয়া পায় নাই।

কিন্তু বিচার দিয়া না বুঝিতে পারিলেই যে কোন রীতি বা নীতি অবহেলন-যোগ্য একথা মেটারলিঙ্ক স্বীকার করেন নাই। বরং তাঁহার মতে যুক্তির স্তরটাই হইতেছে বিরোধ এবং অসামঞ্জস্যের লীলাভূমি। ইহাকে ছাড়াইয়া গেলেই আত্মানুভূতি সম্ভব হইতে পারে। এই জন্যই মেটারলিঙ্ক তৃতীয় স্তরের জীবনকে উচ্চতর যুক্তির জীবন না বলিয়া সহজ স্বর্গীয় জীবন বলিয়াছেন। বিচার শুধু সেইখানেই যেখানে দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। জীবনের সত্য পরিণাম দ্বিধাকে পার হইয়া, সুতরাং বিচারের রাজ্যকে পার হইয়া পাইতে হইবে।

তা' বলিয়া এ কথার এই অর্থ নয় যে, বিচার-বিরোধী কর্ম্মই প্রেমজীবনের ধর্ম্ম। অধিকাংশ মানবের পক্ষেই বিচারাধীন হইয়া কাজ করা যে প্রয়োজন, এ কথা মেটারলিঙ্ক অস্বীকার করেন না। কিন্তু সারা জীবনই বিচার-বিবেচনার ওজন করা কথা শুনিয়া সতর্ক পদক্ষেপে পথ চলাটাকে জীবনের চরম আদর্শ বলিয়া মানেন না। জীবনে এমন সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাহাকে সমস্ত অন্তর নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া লয়, অথচ তাহাকে যুক্তিতর্ক করিয়া আসন দেওয়া হয়ত একেবারেই অসম্ভব। এই জাতীয় সত্যগুলি যেন বিচারের নাগালের বাহির, ধরিতে পারে না বলিয়াই মানবীয় বিচার-বুদ্ধি এই সব সত্যের উপর কোনই অধিকার প্রচার করিতে পারেনা। প্রেমজীবনের কর্ম্ম সেইজন্যই দুর্ব্বোধ্য হইলেও বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করিয়া বিদ্রোহী করিয়া তোলে না। বুঝিতে না পারিলেও এইসব কর্ম্ম অন্তরের গভীরতর ন্যায়বোধকে তৃপ্ত করে; এইজন্যই শত্রুকেও যিনি ভালবাসিয়া গিয়াছেন তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী যুক্তির মনোমত না হইলেও অন্তর কি জানি কেন তাঁহাকে শ্রদ্ধার সর্ব্বোচ্চ আসনটি ছাড়িয়া না দিয়া থাকিতে পারে নাই।

জীবন ও অদৃষ্ট

আসল কথা এই যে যুক্তির এই বিরোধ-প্রধান দ্বিধাময় জীবনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এমনই একটি সহজ আসন অধিকার করিতে হইবে, যেখানে কর্ম্মে সুষমা ও কল্যাণ অব্যাহতভাবে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে। বিরোধের মধ্যে ব্যক্তিত্ব-বোধ স্বভাবতই প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে, যতই ঘা খাওয়া যায় ততই নিজের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং এই স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে গিয়া উৎকট বেদনাময় সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিজ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার অনুপাতেই সঙ্ঘাতটি তীব্রতর হইতে থাকে।

প্রথম অবস্থাটা ছিল একটা মূঢ় চেতনার খেলা ; কেমন করিয়া জীবন চলিতেছিল তাহাই যেন জানিতাম না। আমার চেয়ে আমার ক্ষুৎপিপাসাগুলিই যেন ছিল আসল কর্ত্তা ও নিয়ামক। তাহাদের জন্যই ছিল জীবন, আমি যেন কেহই-না। কিন্তু যখন অভাব-অভিযোগের ঠেলা আসিল তাহা আসিয়া লাগিল একেবারে খাঁটি আমিটির উপর। যতই 'আমি' আমার সচেতন ও জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই এইটুকু বুঝিলাম যে আমি হেন একটা ক্ষুদ্র প্রাণীর বিরুদ্ধে এই বিশ্বজগতের একটা কত বড় সংগ্রাম চলিতেছে। তখন অদৃস্টকে, না-দেখা সেই বিপুল বিশ্বশক্তিকে সসম্ভ্রমে স্বীকার না করিয়া পারিলাম না। একদিকে আমার ইচ্ছা আর অন্যদিকে অদৃস্টশক্তির অজ্ঞাত বিপুল গতি—দু'য়ের মাঝে একটা কত বড় সংগ্রামই না চলিয়াছে! কিন্তু মানুষের সঙ্গে অদৃষ্টের এই সংগ্রাম কেন? বিস্মিত-নেত্রে দেখিতেছি একা মানুষকে ঘিরিয়া অনন্ত বিশ্বব্যাপ্ত অজ্ঞেয় অদৃষ্টের শক্তির এক চিরবিচিত্র লীলা চলিয়াছে। প্রশ্ন ওঠে, মানুষ কি এই অদৃষ্টশক্তির (Destiny) দান মাত্র? শক্তিতরঙ্গে তাড়িত হইয়া চলাই কি জীবনের একমাত্র পরিণাম? না, তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায়ই জীবনের সফলতা? 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্ট' গ্রন্থে মেটারলিঙ্ক এই সমস্যারই একটি উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এবং সেই উত্তর দিতে গিয়া মানবজীবন যে একটা অকিঞ্চিৎকর বস্তু নয়, ইহার মাঝেও যে পরম গৌরব, মহত্ত্ব ও অপরূপ আনন্দশ্রী রহিয়াছে সেইদিকে মেটারলিঙ্ক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কোথায় মানবজীবনের মহত্ত্ব ও অপরূপত্ব তাহা বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম আমাদিগকে তাঁহার অভিনব অদৃষ্টবাদ ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন।

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

গুপ্ত-ধন

(১)

গারো পর্ব্বতমালার সানুদেশে মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সুসঙ্গ্ ও সেরপুর পরগণার অন্তঃপাতী যে বিস্তীর্ণ জনপদ উহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কাছাড় প্রদেশভুক্ত ছিল। ডুডুং কুঙারা নামক হদিবংশোদ্ভব জনৈক নোক্‌মা এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কাছাড়ের বহু অংশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল বলিয়া সাধারণ্যে তিনি কাছাড়-রায় নামেই অভিহিত হইতেন। হালুয়াঘাট পুলিশ-ষ্টেশনের অনতিদূরে অগভীর পরিখা-পরিবেষ্টিত যে-স্থান অধুনা বেকীপাড়া নামে পরিচিত, উহা তখন ছিল এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনগর এবং কাছাড়-রায়ের রাজধানী। বর্ত্তমান সময়ে হিংস্র শ্বাপদ-জঙ্গমের লীলা-নিকেতন হইলেও সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও স্থানে স্থানে এমারতের ভগ্নাংশ বক্ষে ধারণ করিয়া এই লুপ্ত-শ্রী বন্যভূমি অদ্যাপি অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই স্থানে অচল পাষাণাবৃত দুইটী কূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের গর্ভে কি গুপ্তধন নিহিত আছে নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে অনেকে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনেক প্রকার চেষ্টা-কৌশল করিয়াছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

অষ্টাবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাগা ও গারো শ্রেণীভুক্ত পার্ব্বত্যজাতি কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি নির্য্যাতিত হইয়া হদিসম্প্রদায়ভুক্ত কাছাড়ের অধিবাসীরা গারো গিরিমালার দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে এবং পতিতভূমি আবাদ করিয়া নানাপ্রকার শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক অবস্থার উন্নতিবিধান করে। ক্রমশঃ, হাজং, ডালু, বানাই, মান্দাই, কোচ্, রাজবংশীরাও আসিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিতে থাকে; কিন্তু দেশভ্রষ্ট হইয়াও ইহাদের নিস্তার ছিল না—অরাতিকুল দাল্‌খিলার গিরিসঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক অতর্কিতে আসিয়া প্রায়ই ইহাদিগকে জ্বালাতন করিত এবং সুযোগ পাইলেই ইহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পার্ব্বত্য জাতিদের ভিতর অন্তর্ব্বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে। অসংখ্য নাগা ও গারো হদিদের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে। উপনিবেশের অন্যান্য অধিবাসীর সহিত মিলিত হইয়া হদিরাও শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ ব্যর্থ করিবার মানসে যুদ্ধ করিতেছে —কেহ বা মরিতেছে, কেহ বা "রূগা" পর্ব্বতমালা অতিক্রমপূর্ব্বক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছে, আর কেহ বা গড়ের ভিতর হইতে ঘূর্ণীবায়ুর মত উঠিয়া আচম্বিতে গারো বাহিনীর উপর পড়িতেছে এবং তাড়া খাইয়া পুনরায় গড়ের মধ্যে লুকাইতেছে।

হদি-উপনিবেশের যখন এই অবস্থা, তখন কাছাড়-রায় আসামের অন্তর্দেশে আলাম্ ফ্রু নামক জনৈক ব্রহ্মদেশীয় দস্যুর সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। কাজেই, হদিরা নেতৃবিহীন অবস্থায় শত্রুর প্রবল আক্রমণ বহুদিন আর প্রতিরোধ করিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া

পড়িতে লাগিল এবং সেই সুযোগে শত্রুরা অল্প আয়াসেই কাছাড়-রায়ের রাজধানী হস্তগত করিয়া ফেলিল। কিন্তু এখানেই অত্যাচারের শেষ হইল না—অরাতিকুল রাজান্তঃপুর আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ আরম্ভ করিয়া দিল। রাজমহিষী বাচ্‌মণি আত্মরক্ষার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন, শত্রুরা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত কেবল তাঁহারই সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া নিজের একমাত্র শিশুকন্যাটিকে একটা নিভৃত গুহায় লুকাইয়া রাখেন এবং স্বয়ং অতলগর্ভ কূপ-সলিলে ঝম্পপ্রদান-পূর্ব্বক আততায়ীর কবল হইতে চিরকালের জন্য নিষ্কৃতিলাভ করেন। এদিকে, বহু প্রয়াসেও রাজমহিষীর সন্ধান করিতে না পারিয়া পাষণ্ডেরা রাজপুরীর চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধকরতঃ অগ্নি-সংযোগ করে। এইরূপে তাহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি তখনকার মত চরিতার্থ হয়।

যখন ভূয়াঘাট গাঙের উভয়কূল প্লাবিত করিয়া বরষার খরস্রোত নররক্তের গৈরিকস্রাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গাঙ্গিনী নদীর অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিল, যখন মৃত্যুভয়াকুল জীবের কাতর আর্ত্তনাদে পর্ব্বতের ঘুমন্ত শান্তি শিহরিয়া উঠিতেছিল, তখন কাছাড়-রায় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। . . . . . .

স্ত্রী নাই, কন্যা নাই, গৃহ নাই—আপনার বলিতে আর কিছুই নাই! কাছাড়-রায় পারি-পার্শ্বিক অবস্থায় জীবন্মৃত হইয়া পড়িলেন; তারপর নিদ্রালস স্থবিরের ন্যায় টলিতে টলিতে কোথায় যে অন্তর্দ্ধান করিলেন, কেহ জানিল না। তখন বাত্যাবিতাড়িত বিটপীশ্রেণী মৃত্যুর করাল-ভীষণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া স্বন্ স্বন্ রবে দুলিতেছিল, অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্বচিৎ কোথায়ও শিবাকুল চীৎকার করিয়া চারিদিক সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

এই ঘটনার পর বহুদিন ধরিয়া গভীর রজনীযোগে এক ভ্রাম্যমাণ ব্যাকুলকণ্ঠ সময় সময় অরণ্যের অন্তর্দ্দেশ কম্পিত করিয়া তুলিত—"বাচ্‌মণি" "বাচ্‌মণি" রবে দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত হইত এবং সেই মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ অদূরের গিরিগাত্রে আছাড়িয়া পড়িয়া হাহাকার করিতে করিতে অখ্যাত প্রদেশের দিকে ছুটিয়া চলিত!

কিংবদন্তী এই যে, বিপ্লব ও অরাজকতা যখন উলঙ্গ হইয়া সালঙ্কারা বিভীষিকার কটিদেশ ধারণপূর্ব্বক কাছাড়-রায়ের রাজ্য জুড়িয়া তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছিল, আর আততায়ীকুল নৃত্যগীত পানাহার ও কোলাহলে মত্ত ছিল, তখন মানসিংহ সাঙ্‌মা নামক জনৈক গারো নোক্‌মা (সামন্ত) দৈবক্রমে গুহার অভ্যন্তরে হদি-রাজার শিশু কন্যাটীর সন্ধান পান এবং উহাকে একটি "থয়ড়া"তে (বংশনির্ম্মিত সম্পুটকবিশেষ) ভরিয়া সঙ্গোপনে রাজপুরী ত্যাগ করেন। পরে তিনি সর্ব্বদর্শী ভগবানকে একমাত্র সাক্ষী রাখিয়া কাছাড়-রায়ের এই ত্রয়োদশ মাসের কন্যাটীকে অকৃত্রিম স্নেহ ও বাৎসল্যের সহিত লালনপালন করিতে থাকেন এবং এই শিশুটীও গারোর হাবভাব ও

রীতিনীতি লইয়া শত্রুগৃহে দিনের দিন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত বাড়িতে থাকে। নিঃসন্তান গারো দম্পতি বড় আদর করিয়া ইহার নাম রাখেন—মিনা!

এদিকে, রাজ্য-ভ্রষ্ট কাছাড়-রায় স্বজনগণের বিয়োগ-নিবন্ধন চিতার রুদ্ধবাক্ নরক-যন্ত্রণা হৃদয়ে ধারণ করতঃ কতিপয় বৎসর হাজংএর ছদ্মবেশে নানা দেশবিদেশ পর্য্যটন করিয়া কালাতিপাত করেন। কথিত আছে যে জনৈক ইংরেজ রাজপুরুষের অনুকম্পায় তিনি অমিত-প্রতাপশালী বৃটিশরাজের সাহচর্য্যলাভে সমর্থ হন ও উত্তরকালে হৃতরাজ্য এবং প্রনষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া রাজ্যসীমা তুড়ার অপরপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত করেন।

(২)

প্রায় পঞ্চদশ বৎসরকাল মর্ম্মুর সদৃশ জ্বলিয়া জ্বলিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আসামের পার্ব্বত্য-জাতিদের ভিতর অন্তর্বিপ্লব প্রচণ্ড দাবানলে আত্মপ্রকাশ করে। সেই বৎসর গ্রীষ্মকালে গারোদের সহিত এক প্রবল সংঘর্ষে কাছাড়-রায়ের দেওয়ান কারকস্ দত্ত বিজয়লাভ করেন। দেওয়ান একাধারে রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষ, সম্পর্কে রাজার ভাগিনেয়; কাজে কাজেই তদীয় লব্ধ-বিজয়ে কাছাড়-রায়ের রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দের তুফান ছুটে এবং তাঁহার আদেশে সর্ব্বত্র এক অভিনব উৎসবেরও ব্যবস্থা হয়। সেই উৎসবে দর্শা নদীর পূর্ব্বসীমা হইতে নিতাই নদীর সীমা অবধি সমুদয় পার্ব্বত্যপ্রদেশ নৃত্যগীতকোলাহলে মাতিয়া উঠে। সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রতি সন্ধ্যায় সেই জনবিরল প্রদেশের অধিবাসিবর্গের গৃহপ্রাঙ্গণ বিচিত্র আলোকসজ্জায় উদ্ভাসিত হইতে থাকে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হদি, ডালু, হাজং, মান্দাই এবং বানাইরা, এমন কি কোনো কোনো স্থলে গারোরা পর্য্যন্ত এই অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসবে যোগদান করিয়া রজনী-যোগে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রজ্বলিত মশাল হস্তে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিক্রম পূর্ব্বক ধূমধাম্ করিতে থাকে।...... শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই—পানাহার, নৃত্যগীত অবাধে চলিয়াছে...... আনন্দের উৎসমুখ উৎসৃত্র হইয়া চতুর্দ্দিক পরিপ্লুত করিতেছে!......

সেদিন সন্ধ্যায়ও একদল নৃত্যগীত করিতে করিতে পার্ব্বত্য পথ দিয়া কুমারগাতি গ্রামের দিকে আসিতেছিল। গ্রামবাসীরা—সংখ্যায় খুব কম হইলেও—যে যেমনে পারিল ইহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতে ক্রুটী করিল না। আসিতে আসিতে পর্ব্বতের অধিত্যকার এক নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইয়া ইহারা অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন একটী গৃহের সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। এ-ও কি সম্ভব!...... আজ কাহার এত বিক্রম যে, রাজাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া এ-গৃহে রুদ্ধ-দ্বারে অবস্থান করিতেছে? গৃহ-প্রাঙ্গণে নাই কোনো আলোকসজ্জা, নাই উৎসবের কোনো ব্যবস্থা—সমস্তই ত অন্ধকার! নাঃ—ওই ত গবাক্ষপথে ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইতেছে!...... উত্তেজিত নরনারীর মিলিত কণ্ঠস্বর বজ্র-নির্ঘোষে গর্জ্জিয়া উঠিল—কৈ গৃহস্বামী!......

এই আখ্যায়িকার পূর্ব্ব-বর্ণিত গারো-অভিযানের কিছুকাল পর মানসিংহ সাঙ্‌মা গারো রাজার বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হন এবং তন্নিবন্ধন পর্ব্বতের এই নির্জ্জন অধিত্যকার ক্ষুদ্র এক ভূ-সম্পত্তি লইয়া লোকচক্ষুঅন্তরালে কালাতিপাত করিতে থাকেন। তাঁহার আবাসস্থলের নিম্নে পূর্ব্বোক্ত কুমারগাতি নামে খণ্ডগ্রাম তখন কাছাড়-রায়ের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে না আসিলেও গারোদের অধিকৃত রাজ্য-সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, অপিচ হদি-উপনিবেশের উপকণ্ঠে অবস্থিত বলিয়া তদধিবাসীরা প্রকৃতপক্ষে কাছাড়-রায়েরই আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিত।

একদিন যে-গারো-সামন্তের অতুলনীয় শৌর্য্য হদিদের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দিত, সেই মানসিংহ নোক্‌মা আজ স্থবিরত্বপ্রাপ্ত হইয়াও হদি-রাজ কাছাড়-রায়ের বিজয়গৌরবে নিজেকে গৌরবিত মনে করিতে পারিলেন না। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে, হদির গণ্ডীসীমা মধ্যে বসতি করিয়াও তিনি হদিদের বিজয়জনিত উৎসবাদি ব্যাপারে সর্ব্বতোভাবে নির্লিপ্ত রহিলেন। এই নির্লিপ্ততাই তাঁহার কাল হইল! ......

ক্রুদ্ধ জনশক্তি তাঁহার এবংবিধ অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত প্রতিফল বিধানের নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিল। এই উত্তালতরঙ্গায়িত জন-সমুদ্রের মধ্যেও অবিচল থাকিয়া মানসিংহ ঈষৎ শিরসঞ্চালন পূর্ব্বক ডাকিলেন, "মিনা, মা!"

"বাবা"—"বাবা" বলিয়া এক ষোড়শী উত্তেজিতভাবে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে মানসিংহ তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক স্থিরকণ্ঠে কহিলেন, "মা! তোর বাবার লোল-চর্ম্ম আর পলিত-কেশ দেখে পাষণ্ডেরা ভেবেচে তা'র অপমান কর্‌বে! অথর্ব্ব হয়েচি আজ, তাই না? মিনা—মা-- দে—দেখি একবার তলওয়ারখানা!" ......

অরাতিকুল হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল; মানসিংহও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া নক্ষত্র-বেগে অসি-চালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্ষিপ্ত জন-সংহতির প্রচণ্ড আক্রমণ অধিকক্ষণ তিনি আর রোধ করিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। অচিরকালমধ্যেই আহত হইয়া বাত্যাবিতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি ধরাশায়ী হইলেন। শত্রুরা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কেহ কেহ গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইল, আর কেহ কেহ মানসিংহকে ঘেরিয়া কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরেই উন্মুক্ত কৃপাণরাশি মশালালোকে ঝলসিয়া উঠিল .... যায় বুঝি!

"খবরদার! কাপুরুষের দল ......"

উদ্যত তরবারি অকস্মাৎ যেন এক সম্মোহিনী শক্তি-প্রভাবে অর্দ্ধপথে স্তব্ধ হইয়া রহিল—এক বলিষ্ঠকায় সুন্দর যুবক আচম্বিতে জনতার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেম!

মানসিংহ বারেক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পরম মিত্র কেশর গারো! তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইল। ......

* * * *

আরোগ্যলাভের পর একদা কথাপ্রসঙ্গে কেশর গারোর অদ্ভুত বীরত্বের প্রশংসা করিতে করিতে মানসিংহ কহিলেন, "আশ্চর্য্য-ক্ষমতা !"

মানসিংহ-পত্নী সায় দিয়া কহিলেন, "চমৎকার ! . . . . . . কেশর ওদের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়তেই ফেরুপালের মত সব পালিয়ে গেল . . . . . . কাপুরুষের হদ্দ !" . . . . . .

গর্ব্বে ও আনন্দে মিনার রোমাঞ্চ হইল ; সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কেশর নিশ্চয়ই যাদু জানে !

আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে এইরূপে মানসিংহ পরিবারের উদ্ধারসাধন করিয়া কেশর প্রথম প্রথম মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এক অনির্ব্বচনীয় দুশ্চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তদবধি মানসিংহের পরিবারে তাঁহার সম্মুখে কদাচিৎ এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তিনি কোনো-না-কোনো প্রয়োজনের অছিলায় সরিয়া পড়িতেন।

(৩)

একদিন সন্ধ্যার মলিন জ্যোৎস্নালোকে নিভৃতে বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসিয়া মিনা আকাশের গায় ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘগুলির অন্তরালে চাঁদের লুকোচুরি দেখিতেছিল, শরতের স্নিগ্ধ সমীরণ তাহার ললাটের কোমল চূর্ণ কুন্তলগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময়ে কে আসিয়া সন্তর্পণে তাহার যুগল নয়ন দুই হাত দিয়া পশ্চাদ্দেশ হইতে চকিতে চাপিয়া ধরিল।

"ছাড়ো . . . . . . ছাড়ো" এই বলিয়া মিনা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

আগন্তুক স্বর বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছাড়ি, যদি বল্‌তে পার---কে আমি !"

কে এই আগন্তুক মিনার আর বুঝিতে বাকী রহিল না ; তবু রঙ্গচ্ছলে অজ্ঞতার ভাণ করিয়া কহিল, "যদি না বলি ?"

"ছাড়্‌ব না !"

"চীৎকার করে অপদস্থ কর্‌ব !"

"দরকার নেই, হার মান্‌লুম্‌ !"

"এর শাস্তি ?"

আগন্তুক তন্মুহূর্ত্তে মিনার সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া করজোড়ে কহিল, "রাজী আছি, দাও শাস্তি।"

মিনার মস্তক আপনা হইতে নুইয়া আসিল। সে পরিহিত বসনের অঞ্চলভাগ দিয়া অঙ্গুলী জড়াইতে জড়াইতে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "শাস্তি !" . . . . . .

আগন্তুক মিনার পার্শ্বে আসিয়া বসিল এবং তাহার বাম হাতখানি করতলে ধারণ করতঃ গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে ডাকিল, "মিনা!"

"কি?" ......তারপর কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরব হইয়া রহিল।

আগন্তুক বলিল, "কেমন জ্যোৎস্না!"

"সুন্দর!"

"এই জ্যোৎস্না যদি চিরকাল এমনি করে ফুটে থাক্‌ত?"

"তা'হ'লে জ্যোৎস্নার চেয়ে মানুষ চাইতো বেশি অন্ধকার।"

আগন্তুক সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, "অন্ধকারও মানুষে চায়?"

"চাইতো না যদি জ্যোৎস্না তা'র যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে অন্ধকারকে বরণ করে না নিতো!"

আগন্তুক ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকিল, "মিনা—"

"কেশর—প্রিয়তম—"

কেশর গারো প্রণয়িণীর মুখখানি বক্ষে তুলিয়া লইয়া মস্তক অবনত করিতেই মানসিংহ-পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়ে সোজা হইয়া বসিল।

মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে হইতে মানসিংহ-পত্নী বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলেন, "ওমা! মিনা, এখানে? কি দুষ্টু মেয়ে, যা' হোক! খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেলুম!"

অভিমানিনী মিনা লজ্জাবনত মুখে কহিতে লাগিল, "হদিতে আমায় ধরে' নে' গেছে ভেবেছিলে বুঝি ...... না, মা?"

কেশর গারো চমকিয়া উঠিল!

মানসিংহ-পত্নী ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন, "হদির বুকের পাটা ত বড়! ......আয়, যাবি না?"

* * * * *

রজনী-প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহের বহির্দ্দেশে এক অশ্রুতপূর্ব্ব কোলাহল শুনিয়া শ্রমক্লান্ত দেহখানি শয্যা হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধানে দুয়ারের দিকে যাইতেই মানসিংহ বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দরী তন্বীসমভিব্যাহারে জনকয়েক হদি-সৈন্য তাঁহার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। মানসিংহ-পত্নীও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মিনার আগে আগে সেই দিকেই আসিতেছিলে, হঠাৎ অপরিচিতার সঙ্গে মুখোমুখী হইতেই তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া অপরিচিতা মিনার কণ্ঠদেশ ধারণ পূর্ব্বক নম্রস্বরে কহিতে লাগিলেন, 'বহিন্! পথশ্রান্তা আমি ... ..অতিথি! লজ্জা কি?"

অনতিবিলম্বেই সকলে জানিতে পারিলেন, নবাগতা আর কেহই নহেন—কাছাড়-রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, রাজকুমারী খোমেঙ্! পুরস্ত্রীরা ইতঃপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, এই মহিলার সহিত হদি-

রাজের ভাগিনেয় কারকস্ দত্তের পরিণয় স্থির হইয়াছে। মানসিংহ, তাঁহার পত্নী এবং কন্যা, রাজকুমারীর আকস্মিক আবির্ভাবে ও পরম সুজনতায় প্রথম প্রথম কিংকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু বুদ্ধিমতী খোমেঙ্ অচিরেই তাঁহাদিগের হৃদয় জয় করিয়া মিনা ও তাহার জননীকে সম্পূর্ণ আপন করিয়া লইলেন। ক্রমে সকলের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্যও জন্মিল। তখন কথায় কথায় প্রকাশ হইয়া পড়িল যে রাজকুমারী বিগত রজনীতে মাতৃষ্বসালয় হইতে অনুচরবর্গের সঙ্গে রাজধানীতে গমন করিতেছিলেন, অকস্মাৎ পথিমধ্যে গারো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন। তাঁহার সঙ্গী ও পাল্কীবাহকদের কয়েকজন সেই সংঘর্ষে নিহত হয়। তিনি ও তাঁহার সঙ্গের কয়েকজন অনুচর অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া দেবানুগ্রহে প্রাণরক্ষা করেন এবং গারোরা প্রস্থান করিলে দাল্‌খিলার পথে পলায়ন করিয়া পদব্রজে এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হন।

মিত্র না হইলেও—মানসিংহের ক্ষুদ্র-কুটীরে রাজকুমারীর আতিথেয়তার ত্রুটী হইল না। এমন কি, তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত এই নবাগতা মহিলার এতটা ঘনিস্টতা জন্মিল যে, গারো-হদির পার্থক্য রহিল না;—মিনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজকুমারীর উদ্বাহক্রিয়ার মঙ্গলানুষ্ঠানে যোগদান করিতে পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিল!

ডুলী ও বাহক সংগ্রহ করিয়া রাজকুমারী বিদায় গ্রহণ করিলে কেশর গারো আসিয়া দেখা দিলেন! মানসিংহের গৃহেই তিনি পূর্ব্ব-রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকুমারীর আবির্ভাবের ক্ষণকাল পূর্ব্ব হইতেই তিনি যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত কোনো খোঁজ-খবর ছিল না। . . . . . .

মানসিংহ তাঁহার অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "বড় মুখচোরা ত তুমি কেশর?"

মানসিংহ-পত্নীও সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন, "তাই ত বাপু! কি ভয়ে সর্ব্বদাই যেন তটস্থ হ'য়ে আছ! রাজার ভাইঝিকে তোমার সেদিনকার বীরত্বের কথা শুনালুম; তিনি কত না প্রশংসা কর্‌লেন; তারপর তোমাকে দেখ্‌তে চাইলেন—মিনাও কত খুঁজ্‌ল . . . . তুমি ত উধাও!"

মিনাও বলিতে ছাড়িল না; সে কেশরের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া জনান্তিকে কহিল, "সাবাস, বীর! রাজকুমারীর আর এখানে স্বয়ংবরা হ'বার মতলব ছিল না . . . পালালে কেন?"

কেশর গারো কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিলেন না—তাঁহার মুখখানি ছাইএর মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ; এ লুকোচুরী আর কতকাল চলিবে?

(৪)

সম্প্রতি সপ্তাহকাল হইতে কেশর গারোর অদর্শন। মানসিংহের পরিবারে তাঁহার যাতায়াতও পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া আসিয়াছে। ইদানীং তিনি কালে-ভদ্রে আসেন, কিছুক্ষণ মানসিংহের পরিবারে কাটাইয়া পুনরায় চলিয়া যান। মিনার সে'টা মোটেই পছন্দ হয় না; কেশরকে সে কথা বলিলে, তিনি বলেন নিরুপায়!

রাজকুমারীর বিবাহের মঙ্গলাচরণের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে; মিনার কানেও আসিয়াছে। সে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি ভুলিয়াই গিয়াছিল; যা'বে কি যাবে না কত রকম কত কি ভাবিয়া পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট দিবসে যাওয়াই স্থির করিল।......

রাজপুরীতে আনন্দ-উৎসবের স্রোত বহিতেছে, অগণিত দীপমালায় দশদিশি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, নৃত্য-গীত কোলাহলে ভুবন-ভবন মুখরিত হইতেছে!

সহচরী অণিমা মিনাকে ঠাট্টা করিয়া বলিল, "এর পর তোর পালা, দিদি!....আহা, সবুরই কর্ না—"

কিন্তু এই শুভেচ্ছাজ্ঞাপনের "অপরাধে" মিনা অণিমার বাম-গণ্ডে ক্ষুদ্র এক চপটোঘাত করিয়া কৃত্রিম কোপ সহকারে কহিল "দূর হতচ্ছাড়ি! কি যে বলিস্?"

উজ্জ্বল সজ্জিত কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে যাইতে মিনা ভাবিতে লাগিল, কেশর সঙ্গে আসিলে কতনা সুখের হইত! আবার ভাবিল, কেশরেরই বা দোষ কি! সে ত রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণের কথা কখনো তাঁহাকে জানায় নাই?...... মিনার অনুতাপ হইতে লাগিল।

এমন সময় নেপথ্যে কলরব উত্থিত হইয়া ভাবী-দম্পতির শুভাগমন সূচনা করিয়া দিল। ক্ষণবিলম্বেই পুরস্ত্রী পরিবেষ্টিতা নববস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা খোমেঙ্ বধূবেশে উৎসবক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিনার সহিত চোখাচোখি হইতেই পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় হইয়া গেল: উভয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

আবার কোলাহল উঠিল। মহিলাগণ সতৃষ্ণনয়নে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন।.... কতিপয় পদস্থ ব্যক্তি ও পুরাঙ্গনা সমভিব্যাহারে এবার ভাবী-বর আসিয়া রাজকুমারীর পার্শ্বের শূন্য আসন খানিতে উপবেশন করিলেন। স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত হর্ষ-কোলাহলে গৃহখানি মুখরিত হইয়া উঠিল। পানাহার চলিতে লাগিল।

একি! হঠাৎ এ কি হইল? সর্পদষ্টবৎ মিনা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে তাহার উজ্জ্বল বদনমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল!......

রাজকুমারীর দক্ষিণপার্শ্বে বরবেশে বসিয়া অধোবদনে, কে ওই? মিনার মস্তিষ্কে কে যেন গলিত সীসক ঢালিয়া দিল!..... কেশর! কেশর!...তুমি? ..... আর ত অবিশ্বাসের যো

নাই......এই ত মিনার প্রণয়ী কেশর—যা'কে সে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছে! মিনার আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিল।.........

মিনার সহিত কেশরের দৃষ্টিবিনিময় হইতেই কেশর জীবন্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মিনা! মিনা!......মিনা এখানে কেন? এ ত অসম্ভব...স্বপ্নাতীত! তাঁহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল!

মিনা আর ভাবিতে পারিলনা; সে দিগ্বিদিক্ হারাইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইল; তারপর আগ্নেয়গিরির মত ক্ষিপ্র হলাহল বর্ষণ করিতে করিতে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কেশরের ব্যাভিচারের আনুপূর্ব্বিক কাহিনী এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করিয়া ফেলিল। সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল—উপস্থাপিত অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও বড় আর একটা সংশয় রহিল না!......

রাজকুমারী লজ্জায় মরিয়া গেলেন—ক্রোধে ঘৃণায় তাঁহার বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না।......যদিও তখন পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে নৈতিক বন্ধন শিথিল ছিল, তথাপি অসবর্ণমিলনজনিত ব্যভিচারকে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করিত। রাজকীয় বিচারে এ অপরাধের আর মার্জ্জনা ছিল না!

মিনার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। রাজকুমারী ত্রস্তপদে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু এই মর্ম্মস্পর্শী নাটিকার এইখানেই যবনিকা পড়িল না—অনতি-বিলম্বেই হদিরাজ কাছাড়-রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন! জনমণ্ডলী আতঙ্কে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

ভাগিনেয় কারকস্ দত্তের দেশাচার-বিরুদ্ধ পাপ-কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া আভিজাত্য মদ-গর্ব্বিত কাছাড়-রায় নিজেকে বড়ই অবমানিত মনে করিতে লাগিলেন। দুঃখে ক্রোধে তাঁহার দুই নয়ন দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, কারকস্ দত্তের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি কঠোর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব কথা কি শুন্‌ছি, কারকস্? বল এ অভিযোগ মিথ্যা......"

কারকস্ দত্ত বিনয়-নম্র স্বরে উত্তর করিলেন, "না মহারাজ! আপনি যা শুনেছেন তার এক বর্ণও মিথ্যা নহে। আমিই প্রকৃত দোষী...এর জবাবদিহি সম্পূর্ণ আমার........."

অতঃপর মিনার দিকে আঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কারকস্ দত্ত অবিচলিতকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "এই বালিকার লোক-বিশ্রুত রূপ সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে আমিই কৌশল করে গারোর ছদ্মবেশে মানসিংহের পরিবারের সহিত পরিচিত হই এবং নানা উপায়ে তাঁর ও তাঁর স্ত্রী-কন্যার বিশ্বাস উৎপাদন কর্‌তে থাকি। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বালিকার সহিত আমার প্রণয় জন্মে। বালিকা সরলবিশ্বাসে আমাকে প্রকৃতই কেশর গারো ভ্রমে আত্ম-সমর্পণ করে। হদি ও গারোতে যৌন-সম্বন্ধ দেশাচার বিরুদ্ধ বলে আমি এ বৃত্তান্ত গোপনে রাখি।

যে কারণে আমি আত্মপরিচয় গোপনে রেখেছিলুম, সে কারণেই আমাদের প্রণয়-ব্যাপারও অপ্রকাশ ছিল। এ বালিকার কোন দোষ নেই........"

"চুপ্‌ রহ! সে বিচারে তোমার অধিকার নেই......" এই বলিয়া কাছাড়-রায় দুঃখে ও অপমানে মস্তকের কেশাকর্ষণ করিতে করিতে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমি এর বিচার করব! কারকস্‌, এ অপরাধের দণ্ড কি জান?"

কারকস্‌ দত্ত পূর্ব্ববৎ অবিচলিতকণ্ঠে কহিলেন, "প্রাণদণ্ড!"

হাঁ প্রাণদণ্ড......তোমার প্রাণদণ্ডই বিধান করলুম...কারকস্‌! তুমি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় যদিও, এখানে বসে আমি আর রাজ-তক্তের অপমান করতে পারিনে। ...কারকস্‌ দত্ত শির ঈষৎ অবনমিত করিয়া নিঃশঙ্কে কহিলেন, "মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য!"

অতঃপর কাছাড়-রায় মিনার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "আর তুমি! এ পাপ-কার্য্যে তুমিও তুল্য অপরাধিনী......বালিকা বলে' কি দুর্ব্বলতাকে এনে বিচারতক্তে বসা'ব? না—না—তা' হতে পারে না, তা' হতে পারে না।"

কারকস্‌ দত্ত করযোড়ে কহিলেন, "মহারাজ! আমিই একে প্রতারিত করেচি...... এর কোনো দোষ নেই।"

কাছাড় রায় ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন,"বটে! তা' হ'বে না...আমি জীবিত থাকতে হৈহয় বংশের অপমান হ'তে দেবনা! না—না...এ বালিকা হলেও গারো...মার্জ্জনা নেই। অমি এরও প্রাণদণ্ড করলুম......"

কারকস্‌ দত্ত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এক রক্ত—এক মাংস—এক ভগবান্‌! আমি হদি, এ গারো......এ প্রভেদ ঈশ্বরের নহে...বিচারের নামে অবিচার করবেন না, দোহাই—মহারাজ!"

কাছাড়-রায় চলিয়া যাইতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইলেন! "স্পর্দ্ধা বটে! আমার আদেশ 'ওয়াল্‌চাক্ষ্যা'*...এই পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত...যাও!"

সঙ্গীত ও কলধ্বনিমুখরিত উৎসব গৃহ মৃত্যুর করাল ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নীরব হইয়া গেল!

(৫)

কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী, রজনী দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ প্রায়। প্রশস্ত প্রান্তরে মশালরাশির সধূম আলোকের নিম্নে কাছাড়-রায়ের দরবার বসিয়াছে।

* তদানীন্তন পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে জীবিতকে দগ্ধ করিয়া বধ করিবার নিষ্ঠুর প্রথা বিশেষ।

রাজকুমারী খোমেঙের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তথায় মিনা আনীত হইল। "আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেচ গারোর মেয়ে?" কাছাড়-রায় শ্লেষতীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মতলবে?" কাছাড়-রায়ের শ্লেষোক্তি শুনিয়া মিনাও চিন্তা করিতে লাগিল, তাই ত,—কি মতলবে!

একবার ভাবিল কিছু বলিবে না; পরক্ষণেই ভাবিল, না—।

মনে মনে এ প্রকার আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ নজরে পড়িল—রাজকুমারী খোমেঙ অ-দূরে কাতর নেত্রে মৌনভাষায় তাহার করুণা ভিক্ষা করিতেছে। তাহার দুঃখ-ক্রোধ-অভিমান সমস্ত দূরে সরিয়া গেল: সে মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল "মহারাজ! আমি দোষ করেচি—"

কাছাড়-রায় বাধা দিয়া কহিলেন, "জানি; আর...?"

"মিথ্যা বলেছি..."

"কি!"

"ভাগিনা আপনার নির্দ্দোষ ....."

কাছাড়-রায় সন্দিগ্ধমনে বারংবার মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ভেবেচিস্ প্রলাপ বকে মুক্তি পাবি......দুরাশা!"

মিনার চক্ষের সম্মুখে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে লাগিল!.....সে গ্রীবাদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি মুক্তির কামনায় আসিনি......"

কাছাড়-রায় গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, কি চাস্ তুই?"

"মহারাজাকে অপদস্থ কর্‌তে......"

"অপদস্থ কর্‌তে! কি বল্লি অপদস্থ কর্‌তে? দুঃসাহসী বালিকা—অপদস্থ!!"

মিনা নির্ভয়ে কহিল, "হাঁ মহারাজ! অপদস্থ—আপনাকে!"

কাছাড়-রায় কঠোরকণ্ঠে কহিলেন, "অসম সাহস......এর অর্থ?"

মিনা কম্পিত স্বরে উত্তর করিল, "ষড়যন্ত্র!"

কাছাড়-রায় বাম করতলে চিবুক স্থাপন পূর্ব্বক অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "হুঁ......সম্ভব বটে!"

মিনা কহিতে লাগিল, "মহারাজার ভাগিনা দোষ কর্‌বে? না—না—তা, হ'তে পারে না! মহারাজ, সুবিচার করুন......তাঁকে অব্যাহতি দিন্......দোষী আমি......দণ্ড দিন্!"

"তাই হ'বে—তাই হ'বে! কিন্তু আমি বিচার করে' দণ্ড দেব!"

"বিচার চাই মহারাজ......বিচার চাই" রবে সভাস্থল ধ্বনিত হইয়া উঠিল!......

মহারাজার বিচারে কারকস্ দত্ত অব্যাহতি লাভ করিলেন; চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। রাজকুমারীর চেষ্টা ফলবতী হইল, তিনি সজল-নয়নে মিনার দিকে তাকাইয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।......

"তারপর, গারোর মেয়ে!" কাছাড়-রায় মিনাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বজ্রকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "এবার তোর বিচার কর্‌বো! বল্‌, আর তোর কি বল্‌বার আছে?"

সভাস্থল পুনরায় নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল—স্ত্রী পুরুষ উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

মিনা কহিল, "বলে' আর মহারাজার কর্ণশূল বাড়া'ব না......"

কাছাড়-রায় ব্যঙ্গোক্তিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন; তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ডাইনি! এত সাহস তোর? হদির নামে মিথ্যাপবাদের অপরাধে আজ হ'তে এক সপ্তাহ পর তোর শাস্তি—ওয়াল্‌চাক্ষ্যা!"......

খোমেঙ্‌ বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া শুধু ভাবিতে লাগিলেন, এ মৃত্যু-দণ্ড মিনার, না তাঁর?......

সভা ভঙ্গ হইল।

কাছাড়-রায় মিনার মৃত্যু-দণ্ডের বিধান করিয়া দুর্বিষহ অন্তর্দ্দাহে জ্বলিতে লাগিলেন। মনে পড়িল, সেই প্রিয় সৌম্য অনাবিল মুখচ্ছবি—রাণী বাচ্‌মণির; মনে পড়িল, আর সেই সদাহাস্য জড়িত ক্ষুদ্র মুখখানি—দেব শিশু কন্যাটীর!

* * * * *

দেখিতে দেখিতে সপ্তাহকাল শেষ হইয়া আসিল। মিনার বধ-কার্য্যের নিমিত্ত ঘোষবেড়ের সান্নিধ্যে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে এক প্রকাণ্ড মঞ্চ নির্ম্মিত হইল। মঞ্চের চতুষ্পার্শ্বে বিংশহস্ত পরিমিত বাসভূমি গজারী বৃক্ষের খুটা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। এত আয়োজনের পর মিনার শেষ-রজনী প্রভাত হইল!......

মঞ্চ-নিম্নে এক অতিকায় লৌহ-কটাহে দশ মণ তৈল অগ্নির প্রবল উত্তাপে ফুটিতেছিল। ইহার মধ্যে বালিকাকে বিবস্ত্র করিয়া নিক্ষেপ করা হইবে এবং সেই ভীষণ পৈশাচিক দৃশ্যের অভিনয় সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দেশ-দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র নর-নারী আসিয়া দলে দলে মঞ্চের চতুর্দ্দিকে কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! শত শত পানোন্মত্ত নর-নারী পক্ষীপালক এবং কঙ্কালরাশিতে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে!......

সহসা বহু সংখ্যক মাদল একে একে বাজিয়া উঠিল—শৃঙ্গনাদে দশদিক মুখরিত হইল। রাজা কাছাড়-রায় সপারিষদ নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া উপবেশন করিলেন।......

সশস্ত্র হদি-সৈন্য চতুষ্টয় বিপুল জনতার চক্রব্যূহ ভেদ করিয়া বৃদ্ধ জরাজীর্ণ মানসিংহকে রাজার সমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল।

"মানসিংহ!"

"কি, রাজা?"

"শুন্‌লুম, আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেচ? এ সত্য কথা?"

মানসিংহ শির উন্নত করিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, রাজা! একটা ক্ষুদ্র বালিকার জীবনের পরিবর্ত্তে বিশাল একটা জাতের মহিমা খর্ব্ব হ'তে দিতে পারিনে,..... না, রাজা......তা' হয় না!"

"এত নিষ্ঠুর তুমি?"

মানসিংহ ভ্রূকুটি করিয়া অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! হ'বেও বা......"

"পিতা তুমি, ভেবে দেখ' . . . . . ."

মানসিংহ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কাছাড়-রায়ের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই একটা জাতের একটা গর্ব্ব করবার মত মহিমা ক্ষুণ্ন হয় বটে, কিন্তু তদ্বিনিময়ে মিনার প্রাণ রক্ষা হয়! তারপর . , ... তারপর? মিনাকে গৃহে নিবেন? অহো, আর ত তা' হয় না! হদি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! সে যে এখন অস্পৃশ্যা—পতিতা! তাঁহার গৃহে ত হদি-ধর্ষিতা নারীর স্থান হ'তে পারে না; হলেই বা সে প্রাণ-প্রিয়!

তবে?. . . . . . দীর্ঘ পঞ্চদশবর্ষকাল কন্যার অধিক স্নেহে, পুত্রের অধিক বাৎসল্যে লালন পালন করিয়া মিনাকে আজ কাছাড়-রায়ের হস্তে তুলিয়া দিবেন? এতদিনের গুপ্ত কাহিনী আজ ব্যক্ত করিবেন? মিনা যে তাঁহার নয়নের তারা—অন্ধের যষ্টি!. . . . . . তাহাও কি হয়? অসম্ভব!

মানসিংহের তুষ্ণীম্ভাব সম্মতির নির্দ্দেশক অনুমান করিয়া কাছাড়-রায় পুনরায় কহিলেন, "পিতা তুমি . . . . . . কন্যা তোমার . . . . . . এখনও সময় আছে . . , . . ."

ইহা শুনিয়া মানসিংহ বিকৃত মুখভঙ্গী সহকারে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ওই দোহাই দিও না রাজা!. . . . . . চন্দ্রসূর্য্য খসে' পড়্‌বে . . . . . . সৃষ্টি রসাতলে যা'বে!". . . . . .

কাছাড়-রায়ের হৃদয়ের স্পন্দন যেন নিমিষে থামিয়া গেল......বক্ষের মাঝখানে কে যেন উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল।......মনে পড়িল, পনর বৎসর পূর্ব্বের কথা—রাজ্য-চ্যুতি, অগ্ন্যুৎপাত.........আর—আর......

কাছাড়-রায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!......... গারো-নোক্‌মার উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের এই দুর্লভ সুযোগ আজ আর তাঁহার পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইল না!

(৬)

যথাসময়ে মিনাকে বধ্য-ভূমিতে আনয়ন করা হইল। তদ্দর্শনে সমবেত জনসঙ্ঘ আনন্দে মাতিয়া উঠিল। মানসিংহ আর থাকিতে পারিলেন না—দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে মিনাকে বক্ষে ধারণ করতঃ ব্যথা-বিকম্পিত স্বরে ডাকিলেন, "মিনা" "মিনা"—"মা আমার!"

"বাবা" "বাবা" বলিয়া মিনা মানসিংহের সুবিশাল বক্ষের মধ্যে মস্তক লুকাইল!

এতক্ষণ এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেগে কাছাড়-রায়ের হৃদয় তোলপাড় করিতেছিল।......মিনা তাঁহার ত কেহই নহে......শত্রু—গারোর কন্যা! তবুও এক একবার তাঁহার সাধ হইতে লাগিল,

বালিকার ক্ষুদ্র মস্তকখানি বক্ষে ধারণ করিয়া তিনিও তাঁহার তাপদগ্ধ হৃদয়খানি শীতল করেন। পর মুহূর্ত্তেই শয়তান তাঁহার অন্তরের ভিতর হইতে ভূকম্পের মত জাগিয়া উঠিল .....তিনি হৃদয়ের যাবতীয় কোমলবৃত্তিনিচয় উপড়াইয়া আভিজাত্যের যূপ-কাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন।.........

মানসিংহ নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না; কাতর-কণ্ঠে কহিলেন, "রাজা! এই বালিকাকে মের' না......আমার প্রাণ লও!"

কাছাড়-রায় শুষ্কহাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা'তে রাজ্যের লাভ?"

"লাভালাভ খুঁজে দেখিনি, রাজা! তবে এ বালিকার জীবন অপেক্ষা মানসিংহের জীবনে তোমার লাভ অনেক বেশি হওয়ারই কথা!"

কাছাড়-রায় অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন।

তাহা দেখিয়া মানসিংহ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "একদিকে রাজ্য—আর একদিকে? —না, না......ভেবে দেখ', রাজা......বালিকার প্রাণ আমায় ভিক্ষা দাও; বিনিময়ে আর যা' চাও......"

"আমার প্রস্তাব—স্বীকার তবে?"

"না, না, আর কিছু—আর কিছু চাও, রাজা!"

"আর কি চা'ব, মানসিংহ!"

মানসিংহ সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "কন্যা—কন্যা তোমার—"

কাছাড়-রায়ের টনক পড়িল; তিনি উন্মত্তবৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কন্যা! আমার কন্যা? সে কি!......কোথায়......কি বল্‌চ তুমি?......আমার কন্যা!"

"হাঁ, রাজা!"

"তা'কে ত' তোমরা হত্যা করেচ?"

"মিথ্যা কথা—"

"মিথ্যা কথা!......তাই হোক্‌, তাই হোক্‌—মিথ্যা কথা! মানসিংহ—মানসিংহ—"

"কন্যা তোমার জীবিতা আছে!"

"কন্যা আমার জীবিতা! কি বল্‌চ তুমি? এ যে বিশ্বাস কর্‌তে সাহস হচ্চে না......... কি বল্‌চ তুমি?"

মানসিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "উন্মত্তের প্র-লা-প—।" ভাবিয়া স্থির করিলেন, মিনার মরণই মঙ্গল!

কাছাড়-রায় অধৈর্য্যপ্রাণে কহিলেন, "না—না—প্রলাপ নহে—প্রলাপ নহে—বল, কন্যা আমার বেঁচে আছে?........."

মানসিংহ উদাসভাবে কহিলেন, "পাগল আমি, মতিচ্ছন্ন!"

কাছাড়-রায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মিথ্যা কথা !"

মানসিংহ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কাছাড়-রায় উন্মত্তবৎ তাঁহার দক্ষিণ মণিবন্ধ বজ্র মুষ্টিতে ধারণপূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "বল্ শয়তান্! কন্যা আমার কোথায় ?"

বামহস্ত আকাশের দিকে তুলিয়া মানসিংহ জড়িতকণ্ঠে উত্তর করিলেন "ওই......ওই...... ওইখানে !"

"তবে যা শয়তান্, তুইও সেখানে......"

এই বলিয়া কাছাড়-রায় মানসিংহকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। আবার বজ্রনির্ঘোষে অসংখ্য দামামা ডঙ্কা একে একে বাজিয়া উঠিল ; সঙ্গে সঙ্গে অগ্নির প্রবল উত্তাপে কটাহের তৈল রাশি পুড়িতে লাগিল।

"বাবা ! বাবা !"—মিনা বাষ্পাকুল নয়নে মানসিংহের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভগ্ন-কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা ! বাবা !"

"মা—মা আমার !" এই বলিয়া বৃদ্ধ মানসিংহ আকুলভাবে মিনাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।.........

পান-মত্ত জনসংহতি ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিল। এবার মৃত্যু-সদনে মিনার ডাক পড়িল... ডঙ্কা, মাদল, শিঙ্গা একে একে চতুর্দ্দিকে বাজিয়া উঠিল।

ঘাতকের দল চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মিনার অঙ্গাবরণ একে একে উন্মোচন করিতে লাগিল।......মানসিংহ দুইহস্তে দুই চক্ষু আবৃত করিলেন।.........

মিনা জল্লাদের সঙ্গে অধিরোহিণী বাহিয়া বধ-মঞ্চে উঠিতে লাগিল......সকলে নির্নিমেষ-নয়নে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

কাছাড়-রায়ও অনিমেষনেত্রে দেখিতে লাগিলেন।......হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন...... ওই না ? তিনি নিজের চক্ষুকে পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিলেন না ! পলকে নিজের বক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিনার অনাবৃত হৃদয়ের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইলেন।......ওই না ?— বালিকার বক্ষের মধ্যভাগে তাঁহারই বক্ষের অনুরূপ গাঢ় সবুজবর্ণের বিচিত্র উল্কী ?

কাছাড়-রায়ের প্রত্যেক ধমনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতে লাগিল......তিনি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।......

"মানসিংহ—মানসিংহ—বল—ঈশ্বরের দোহাই—সত্য বল—এ কা'র কন্যা, কোথায় পেলে তুমি ?"

মানসিংহ তীব্রস্বরে কহিলেন, "এ সময়ে রাজার উন্মত্ততা শোভা পায় না—"

কাছাড়-রায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া নক্ষত্রবেগে বধ-মঞ্চের দিকে ধাবিত হইতেই মানসিংহ আচম্বিতে তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

"দাঁড়াও, রাজা !"

"দূর হ' পাপিষ্ঠ"—এই বলিয়া কাছাড়-রায় নিমেষ মধ্যে হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা মানসিংহের মস্তকে সজোরে আঘাত করিলেন।......মানসিংহ বাম হস্তে ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণহস্ত মিনার দিকে তুলিয়া ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপতিত হইলেন।

কাছাড়-রায় সে দিকে দৃকপাত না করিয়া মিনাকে ধরিতে ছুটিলেন। বালিকা আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং চক্ষের পলক পড়িতে-না-পড়িতে মঞ্চ হইতে কুণ্ডের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।......তপ্ত-কটাহে ফুটন্ত তৈলরাশি সবেগে আন্দোলিত হইয়া সধূম-তীব্র-দুর্গন্ধ উদ্গিরণ করিতে লাগিল।.........

"ধর্'—ধর্' রাক্ষস......ওই—ওই তোর কন্যা!" এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মানসিংহ রক্তাপ্লুত দেহে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

ব্যাপার কি দেখিবার নিমিত্ত উন্মত্ত জনতা বেষ্টনীর চতুষ্পার্শ্বে ঝুকিয়া পড়িল।......

যে কূপে মহিষী বাচ্‌মণি আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারি সান্নিধ্যে কাছাড়-রায় এক নূতন কূপ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে মিনার দগ্ধাবশিষ্ট দেহখানি বিবিধ রত্নালঙ্কারের সহিত সমাহিত করিলেন। কূপ দুইটীর মুখ প্রকাণ্ড প্রস্তরের দ্বারা অদ্ভুত কৌশলে বন্ধ করিয়া দিয়া কাছাড়-রায় জীবনের অবশিষ্টকাল এই সমাধি-বক্ষে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে অনন্ত অব্যক্ত শোক-দুঃখ বক্ষে ধারণ করিয়া কূপ দুইটী একদিন অশেষ যন্ত্রণায় বদন আবৃত করিয়াছিল, পরে মানুষের অশেষ চেষ্টাতেও তাহা উন্মুক্ত করে নাই। যুগ-যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে, কাছাড়-রায়ের রাজধানীতে এখনও সেই কূপ দুইটী সেই ভাবেই রহিয়াছে; কিন্তু কেহ কখনো তাহাদের "গুপ্ত-ধনের" সন্ধান লাভ করিতে পারিবে কি না ভবিতব্যতাই জানেন!

* * * * *

তারপর—তারপর?—তারপর, বিভীষণের আমল হইতে যুগ-যুগান্তর কাল ধরিয়া এই হতভাগ্য দেশে যাহা হইয়া আসিতেছে তাহারই পুনরভিনয় হইল! অপাপবিদ্ধা মিনার শুভ্র-পেলব দেহখানি দগ্ধ করিবার নিমিত্ত যে ক্ষুদ্র বহ্নি-কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল, ক্রমে উহা ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ ছারখার করিয়া দিল।

তদনন্তর কাছাড়-রায়ের ছিন্ন-শির-নিঃসৃত রুধির-সিঞ্চনে অন্তর্ব্বিপ্লবের প্রচণ্ড অনল প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে ধ্বংসোন্মুখ দেশবাসী, অনন্যোপায় হইয়া তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শরণাপন্ন হইল। ফলে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় ঘোষণাবলে কাছাড় বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূর্ত হইয়া গেল। তদবধি ইংরেজের রক্ত-চক্ষুর নিম্নে নিয়মানুগত শাসন-নিয়ন্ত্রিত পরস্পর-বিরোধী গারো-হদি-মান্দাই-বানাই প্রভৃতি আসামের পার্ব্বত্যজাতি-নিচয় পূর্ব্ব বৈরভাব বিস্মৃত হইয়া অবিচলিত শান্তিতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। শ্রীশশিভূষণ পাল

সুন্দর

হে সুন্দর, তরুণের লহ নমস্কার !
মুক্ত করি' হৃদয়ের দ্বার,
ত্যজিয়া মুকুট দণ্ড, বিভব-গৌরব, যত কিছু অনর্থ সন্ধান,
যত কিছু তুচ্ছ বাধা, দ্বিধা-ভয়-লজ্জা-অভিমান,
বরিব বিপুল গর্ব্বে বন্ধহারা দুরন্ত উচ্ছ্বাসে,
মুক্তির উল্লাসে,
তোমার অমৃত-সিক্ত এ বিশ্বের প্রতি রেণুকণা ;
তাহা ছাড়া আজি আর কিছু চাহিব না।

জানিয়াছি, হে জাগ্রত, হে চঞ্চল আনন্দ-দুলাল,
সৃষ্টির আদিম প্রাতে ছিন্ন করি' পুঞ্জীভূত আঁধার-আড়াল
নবোদ্ভিন্ন উন্মাদনে আপনি উচ্ছ্বসি',
বিশ্ব-হৃদি-মণিপদ্মে ছন্দে-গীতে উঠিল বিকশি',
তোমার অপূর্ব্ব-জ্যোতিঃ অখণ্ড-আনন্দময় বিরাট প্রকাশ!
তাহারি সে চিরন্তন মঙ্গল-আভাস
শিহরি' শিহরি' উঠে এ বিশ্বের অনন্ত কুলায়ে।
মুহুর্মুহু দু'লায়ে দু'লায়ে
প্রতি অণু-পরমাণু সৌন্দর্য্যের মহীয়সী পরিণতি পানে,
শব্দে-রসে-স্পর্শে-গন্ধে-গানে।
তায় আজি হয়েছি নির্ভীক।
বিশ্বের সকল পাত্র হ'তে, শুধু চায় ভিখ্
আনন্দ-মদিরা-ধারা, রাখিতে হৃদয়
জাগ্রত-স্বাধীন-মুক্ত-অম্লান-অক্ষয়,
নিত্য তব রহস্যের অজস্র সন্ধানে,
প্রতিদিন প্রতি রাত্রি দিক্ হ'তে দিগন্তের পানে।

প্রীতি যদি জাগিয়াছে প্রাণে, অসম্বৃত উদ্দাম চঞ্চল,
চিত্ত যদি আত্মহারা, সিন্ধু সম, প্রমত্ত বিহ্বল,
সন্ধান করিতে তব অন্তরের অনন্ত মহিমা,
হে পবিত্র, সৌন্দর্য্যের হে পূত-পূর্ণিমা !
কে আর ফিরাবে মো'রে ?
কোন্ শক্তি সম্মুখে হানিবে হেন বাধা,
পশ্চাতে টানিবে হেন জোরে,
যাহে মোর আনন্দের অভিসার-পথে
পাথেয় ফুরায়ে' যাবে এ প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন বেলায় ?
নাই নাই হেন বাধা হেন শক্তি নাই।

সান্ত্বনা নাহিক মোর, বিতর্ক বিচার ;
নিত্য তব রহস্যের অন্তহীন গোপন-সঞ্চার,
নিত্য তব আনন্দের নব নব মুক্ত ধারা, গুপ্ত-অভিসার,
নিত্য তব সৌন্দর্য্যের নব নব অভিযান
জয় করি বিশ্ব পারাপার
সন্ধান করিতে হ'বে, এ বিশ্বের সাথে
যেথা তব নিত্য যোগ নিত্য আনাগোনা,
সুখে দুঃখে সমভাবে, দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয় করি'
জীবনের অক্ষয় সাধনা।

ছুটিব অশান্ত-প্রাণ, উল্কাসম, নব নব স্রোতে ;
জলে-স্থলে আকাশে বাতাসে বনানী-পর্ব্বতে,
লতায়-পাতায়-পুষ্পে, বিহঙ্গের প্রতি নীড়ে নীড়ে,
অনন্ত এ মানবের ভিড়ে,
আলোকে আঁধারে,
বন্ধহারা অনির্দ্দেশ ছুটি' চলি' যাব
এপার হইতে পরপারে।

শুধু চাই অমৃতের সহস্র সন্ধান ;
আনন্দের পূর্ণকুম্ভ আকণ্ঠ করিয়া শুধু পান,
মৃত্যুঞ্জয় হ'ব আজি, শুধু চাই এই পুরস্কার।
হে সুন্দর ! তরুণের লহ নমস্কার।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু

ভারতবর্ষে সমানাধিকারবাদ (Communism)

মানব সমাজের আদিম অবস্থায় সর্ব্বত্রই সাম্য ছিল; মানুষে মানুষে সমান, সে জ্ঞান ছিল এবং সে জ্ঞান সামাজিক কাযে প্রকাশিত হত। কিন্তু অভিব্যক্তির নিয়মে যখন কতকগুলি মানুষ অপর কতকগুলি থেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, শারীরিক বলে এবং মানসিক গুণে প্রভিন্ন হল, তখন থেকে বৈষম্যের আরম্ভ হল। ক্রমে এই বৈষম্য যখন গুরুতর হয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও গুণহীনের প্রতি অত্যাচার করতে লাগল, তখন আবার এক শ্রেণীর মহানুভব মানবের আবির্ভাব হল, যাঁরা আবার সেই আদিম সাম্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

ভারতবর্ষেও এ নিয়মের ব্যভিচার হয় নি। বৈদিক যুগের জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষত্ব থেকে পরবর্ত্তী যুগের অসংখ্য জাতিবিশেষত্ব এবং তার উপর ধন-বৈষম্য, বিদ্যা-বৈষম্য এবং সর্ব্বপ্রকার অধিকার-বৈষম্য আবির্ভূত হল। সে সকল পুরাণেতিহাসের কথা এ প্রবন্ধে আমার বক্তব্য নয়। প্রবন্ধে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, বহুযুগের সঞ্চিত পুঞ্জীভূত এই বৈষম্যভাব বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়েছে। অন্যান্য দেশের মত এদেশেও দেশজাত বৈষম্য ত' আছেই, তার উপর বিদেশাগত বৈষম্যও বহু পরিমাণে আরোপিত হয়েছে, এবং এই সকলের সম্মিলিত ভার তার সহিষ্ণুতার সীমাকে অতিক্রম করবার উপক্রম করছে। এর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে ধন-বৈষম্য—এক প্রান্তে দেশীয় এবং বিদেশীয় ধনাধিকারীর অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপর প্রান্তে জন-সাধারণের আত্যন্তিক দারিদ্র্য। এই গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যের সহস্র দোষের মধ্যে ভারতবর্ষে যে গুলি উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে সেগুলি হচ্ছে অন্নবস্ত্রের অভাব, শিক্ষার অভাব—এক কথায় যাতে মানুষ মানুষ হয়, সে সকলেরই অভাব।

জনসাধারণের দারিদ্র্য সম্বন্ধে কৃষকদের কথা বললেই প্রায় সকলের কথাই বলা হবে। কারণ, কৃষকেরা দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৭২ জন। ১৯১৯—২০ সালে কৃষি-সম্বন্ধীয় যে সকল সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তা' থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে ব্রিটিশ বাঙলায় চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২,৪৪,৯৬,৮০০ (দু'কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ ছেয়ানব্বই হাজার আট শ') একর; আর কৃষক, কৃষকের ভৃত্য, কৃষি-মজুর, এবং বিশেষ বিশেষ উদ্ভিজ্জ-উৎপাদনকারী এই সকলের সমষ্টি সংখ্যা ছিল ১,১০,৬০,৬২৯ (এক কোটি দশ লক্ষ ষাট হাজার ছ' শ' উনত্রিশ) জন; অর্থাৎ প্রত্যেক কৃষিজীবীর চাষের জমির পরিমাণ গড়ে সওয়া-দু একর বা সাড়ে ছ' বিঘা মাত্র। এর মধ্যে আবার জলসেচনের ব্যবস্থার অভাবে এবং ম্যালেরিয়ার প্রভাবে অনেক চাষযোগ্য জমি পতিত আছে এবং তার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। ১৯১৭ সালে এইরূপ পতিত জমির পরিমাণ ছিল ৪৯,৫০,০০০ (উন পঞ্চাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) একর; ১৯২৬ সালে তার পরিমাণ হয় ৬২,০০,০০০ (বাষট্টি লক্ষ) একর। এ ছাড়াও বাঙ্‌লায় আরও ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ)

একর পরিমিত জমি অনাবাদী আছে। বাঙলার কৃষকের দারিদ্র্যের হেতু এই সকল অঙ্কেই প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস্ কর্ম্মাধ্যক্ষ বলেন বাঙালী কৃষক পরিশ্রমী, কিন্তু তার জমির পরিমাণ এত অল্প যে তাতে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল কাটা—এই সমস্ত নিয়ে তাকে বছরের মধ্যে কয়েক দিন মাত্র পরিশ্রম করতে হয়। অবশিষ্ট সময় তার প্রায় কোন কায থাকে না।

অপরের সঙ্গে তুলনা না করলে নিজের অবস্থার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতা বোঝা যায় না। তাই বাঙলার এই অবস্থা অন্যান্য দেশের অবস্থার সঙ্গে একবার তুলনা করে দেখা আবশ্যক। ১৯১১ সালের সেন্সাস অনুসারে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের চাষের জমির পরিমাণ ছিল ২,৬০,০০,০০০ (দু'কোটি ষাট লক্ষ) একরের কিছু বেশী; আর কৃষিজীবীর সংখ্যা ছিল ১২.৫৩,৮৫৯(বার লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশ' ঊনষাট) জন, অর্থাৎ প্রত্যেক কৃষিজীবীর চাষের জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ২১ একর বা বাঙালী কৃষকের জমির দশগুণ! দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের সংখ্যা সাধারণ অধিবাসীদের সংখ্যায় শতকরা প্রায় ১১ জন; আর তাদের জমির পরিমাণ প্রত্যেকের গড়ে ৪৬০.২ একর। এর মধ্যে গোচর জমিও আছে; তা বাদ দিলেও চাষের জমি থাকে প্রায় ৮৩ একর বা বাঙলার কৃষকের ৩৮ গুণ! বাঙলার ধানই প্রধান ফসল এবং তার ফলন একর প্রতি ১৫ মণের বেশী নয়। গড়ে ২॥০ আড়াই টাকা মণ হিসাবে তার দাম ৩৭॥০ টাকা। রবি শস্য বা শাক-সবজী কোন কোন কৃষক কিছু কিছু উৎপাদন করে। গড় পড়তার ভিতর আনলে তার দাম নগণ্য। লর্ড কারজনের গবর্ণমেণ্টও এইরূপ অনুমান করেছিলেন। অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়মস্ (Rushbrook Williams) বলেন ভারতবর্ষের লোকের আয়, গড়ে অত্যন্ত দরিদ্র প্রদেশে ৪৫৲ টাকা আর সমৃদ্ধ প্রদেশে ১৫০৲ থেকে ২০০৲ টাকা। বলা বাহুল্য এর মধ্যে শিল্পবাণিজ্যজীবীও আছে, কেবল কৃষক নয়। যা' হোক্, তিনি বলেন পাশ্চাত্য দেশে যা'কে জীবনযাত্রার নিম্নতম মান—lowest standard of living—বলে, ভারতীয় মান তার চেয়েও নিম্নতর। এতে অধ্যাপক বার্ণেট হার্ষ্ট (Burnett Hurst) জিজ্ঞাসা করেন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে এই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না? অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়মস্ বলেন, বোঝাবার বিশেষ আবশ্যক নাই, ব্যবস্থাপকেরা তা' বেশ বোঝেন; এ বিষয়ে তাঁদের দিব্যজ্ঞান আছে। (১) এই অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়মস্ পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের Director of Public Information ছিলেন এবং বার্ষিক "ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকের সম্পাদনকার্য্যও করতেন। পুস্তকখানি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের অবগতির জন্য রচিত হয়।

(১) Professor Rushbrook Williams' evidence before the Economic Enquiry Committee, 1925.

দেশের শতকরা ৭২ জনের অবস্থা যে এইরূপ তা' গবর্ণমেণ্ট জানেন। গবর্ণমেণ্ট আরও জানেন যে এর উপর কৃষকের ঋণ আছে দু' শ' কোটি টাকা। (১)

১৯২১ সালে জেনেভা-নগরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতির (International Labor Conference) এক অধিবেশন হয়। তাতে ভারতীয় কৃষকের অবস্থা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল, কিন্তু সমিতির সদস্যেরা বিচার করলেন যে, যে-হেতু ভারতীয় কৃষক তার জমির স্বত্বাধিকারী, সেই হেতু সে "শ্রমিক" হতে পারে না এবং "শ্রমিক" হতে পারে না বলে' শ্রমিক প্রতিনিধি সমিতিতে তার অবস্থার কথাও আলোচিত হতে পারে না। অর্থাৎ তাঁরা বলতে চান যে ভারতীয় কৃষক জমির মালিক বা land-owner বা proprietor, জমির মজুর নয়! যেখানে এই কথাটার আলোচনা হয়েছিল সেটা আন্তর্জাতিক সভা, সেখানে বহু সভ্যদেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন; তাঁদের কাছে ভারতীয় কৃষকের এই সম্মান; আর তার নিজের দেশে তার যে শোচনীয় অবস্থা তা আমরা দেশবাসীরা ভাল করেই জানি এবং আমাদের গবর্ণমেণ্টও জানেন। যে দেশের লোকসংখ্যার শতকরা ৭২ জন ভূ-সম্পত্তির অধিকারী বলে' পৃথিবীর সভ্য জাতি সংঘ কর্ত্তৃক স্বীকৃত, সে দেশের গভর্ণমেণ্ট যে দেশে কর্ম্মহীনতা নাই বলে' গর্ব্ব অনুভব করবেন এবং সে কথা ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তথা সভ্য জগৎকে জানাবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই আমরা দেখি যে ভারত গবর্ণমেণ্টের সংবাদ-বিধাতা (Director of Public Information) বলেছেন ভারতবর্ষে কর্ম্মহীনতা নাই, ভারত সচিবের ভূতপূর্ব্ব সহকারী বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে (The Twentieth century in the Making) বলছেন ভারতবর্ষে কর্ম্মহীনতা নাই, ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাই কমিশনার জাতি-সংঘে প্রচার করছেন ভারতবর্ষে কর্ম্মহীনতা নাই!

এই ত গেল অধিবাসীদের শতকরা ৭২ জনের কথা। অবশিষ্ট ২৮ জনের মধ্যে দশ জন শ্রমজীবী অর্থাৎ রেল, কলকারখানা প্রভৃতি শ্রমশিল্পে নিযুক্ত। এদের দুঃখের কাহিনীর অন্ত নাই। তার সবিস্তর বর্ণনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। সংক্ষেপে এই বললেই যথেষ্ট হবে যে, এদের বাসস্থান বলে' এদের প্রভুরা যে স্থান নির্দ্দেশ করে' দেন তা' মানুষের বাসের অযোগ্য, তারা যা' মজুরি পায় তাতে তাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয় না. শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই, আর এই মতের উপর তাদের কর্ম্মটুকু কখন থাকে কখন যায় তার স্থিরতা নাই—সেটা সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অন্য দেশে এর জন্য কর্ম্মহীনতার বীমা (Un-employment insurance) আছে। এদেশের শ্রমজীবীরা তার নামও শোনে নি। রোগ বা বার্দ্ধক্যের জন্য কাজ করতে অসমর্থ হলে, অন্য দেশে তার জন্যও যে বীমা এবং অবসর-বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, বলা বাহুল্য, সে কথাও এদেশের শ্রমজীবীরা এখনও জানে না। ১৯২৫-২৬ সালের শীতকালে মিঃ

---

(১) রয়াল এগ্রিকালচারাল কমিশনের কাছে রায় বাহাদুর যামিনীমোহন মিত্রের সাক্ষ্য। শ্রীযুক্ত মিত্র মহাশয় কো-অপারেটিভ সোসাইটি সমূহের রেজিষ্টার।

জনষ্টোন নামে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একজন মেম্বর এদেশের শ্রমজীবীদের অবস্থা দেখতে এসেছিলেন। ডাণ্ডি-জুট-ওয়ার্কার্‌স্ ইউনিয়নের (Dundee Jute Workers' Union) সেক্রেটারী মিঃ জে, এফ, সাইমও তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। এঁরা কলকাতার নিকটবর্ত্তী পাটের কলের শ্রমজীবীদের অবস্থা দেখে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট উপলক্ষ্যে Weekly Forward নামক বিলিতী সংবাদপত্র একটা প্রবন্ধ লেখেন। তার তাৎপর্য্য এই যে, ১৯১৫ থেকে ১৯২৪ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে এই পাটের কলওয়ালারা লাভ করেছে ৩০,০০,০০,০০০ ত্রিশ কোটি পাউণ্ড বা চারশ' পঞ্চাশ কোটি টাকা! অর্থাৎ তাদের মূলধনের শতকরা নব্বই টাকা। এই সকল কলে কায করে ৩,০০,০০০ তিন লক্ষ লোক। এদের মজুরি গড়ে লোকপ্রতি বৎসরে ১২ পাউণ্ড, অর্থাৎ মাসে এক পাউণ্ড বা ১৫৲ টাকা! এদের বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ৫০৲; প্রাথমিক শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা নাই।

আর একজন পার্লামেণ্টের মেম্বর ম্যাঙ্গানীজ খনিতে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন—যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী খনি থেকে ম্যাঙ্গানিজ খুঁড়ে তোলে তাদের মজুরি দৈনিক পাঁচ আনা। তখন ম্যাঙ্গানীজের দর টন প্রতি ৪০ শিলিং। রুশো-জাপানী যুদ্ধে রুশিয়া থেকে ম্যাঙ্গানীজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। ভারতীয় ম্যাঙ্গানীজের দর চড়ে' গিয়ে টন প্রতি ১২০ শিলিং হল। জাহাজ ভাড়াও টন প্রতি ১২ শিলিং থেকে ৫২ শিলিং হল। কিন্তু যারা খনি থেকে ম্যাঙ্গানীজ খুঁড়ে তোলে তাদের মজুরি সেই পাঁচ আনাই থাকল। আর বেশী দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

জন-সংখ্যার অবশিষ্ট ১৮ জনের মধ্যে আছেন দিন মজুর, অতিসামান্য বেতন-ভোগী জমিদার ও ব্যবসাদারের নিম্নতম কর্ম্মচারী, সামান্য দোকানদার, সাধু-সন্ন্যাসী এবং ভিক্ষুক। সকলেই জানেন সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বড় বড় বেতনের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রায় সকলেই ইংরেজ। বলা বাহুল্য দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বও তাঁদেরই। এই সকল কারণের সমবায়ে দেশটা দরিদ্র, অতি দরিদ্র হয়ে পড়েছে।

এই দারিদ্র্য সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করবার জন্য দেশের লোক বহুবার গবর্ণমেণ্টেকে অনুরোধ করেছে, প্রার্থনা করেছে, আবেদন করেছে, নিবেদন করেছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য বিচলিত করতে পারে নি। অপর পক্ষে ১৯২৩ সালের শেষে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কয়েক জন প্রতিনিধি মিলে একটা মন্তব্য প্রকাশ করেন যে কর নির্দ্ধারণের একটা বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করবার জন্য একটা বিশেষজ্ঞদের কমিটি নিযুক্ত করা হ'ক। এই মন্তব্য অনুসারে একটা কমিটিও নিযুক্ত হল। এই সময় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কয়েক জন সদস্য সুযোগ বুঝে দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত করবার জন্য নিতান্ত নাছোড়বান্দা হয়ে অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট এবার আর অনুরোধটা একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। একটা কমিটি নিযুক্ত হল, কিন্তু দেশের আর্থিক অবস্থার অনুসন্ধানের

জন্য নয় ; সেইরূপ একটা অনুসন্ধান করতে হলে যে সকল উপকরণের আবশ্যক তা' আছে কিনা এবং না থাকলে কি উপায়ে তা সহজে পাওয়া যেতে পারে তাই দেখবার জন্য—"to examine the material at present available for framing an estimate of the economic condition of the various classes of the people of British India etc." কমিটি যথানিযুক্ত অনুসন্ধান করলেন এবং যথারীতি একটা রিপোর্ট'ও দিলেন। সেই রিপোর্ট থেকে গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সে রকম উপকরণের নিতান্তই অভাব যা' থেকে দেশের লোকের একটা গড়-পড়তা আয়, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, জীবন-ধারণের ব্যয়, মজুরি এবং এই জাতীয় অন্য অন্য বিষয়ের একটা আনুমানিক হিসাব করতে পারা যায়—"The committee submitted its report in August 1925. The report shows clearly the paucity of the materials at present available in India for estimating average income, crop-production, cost of living, wages and other cognate subjects * * * *No attempt*, therefore, at a detailed and satisfactory description of the economic state of the Indian masses can be made."—(India in 1925-26 by J. Coatman, Director of Public Information. Government of India, pp. 249-50.) অনুসন্ধান ত হবেই না, গবর্ণমেণ্টের সংবাদবিধাতা বলেন তার কোন চেষ্টাও হতে পারে না!

এই কথাগুলি বলবার পূর্ব্বে ভারতগবর্ণমেণ্টের এই সংবাদনিয়ন্তা বলেছেন যে, এই বিষয়টার সম্বন্ধে এত তর্কবিতর্ক হয়ে গিয়েছে যে এখন ও-কথা শুনলে গা-বমি-বমি করে—"The question......has been debated *ad nauseam*" সুতরাং সে সকল তর্ক-বিতর্কের পুনরালোচনা করে' গবর্ণমেণ্টের বিবমিষা বৃদ্ধি করা আর উচিত হবে না। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট যখন বলেছেন এখানকার ভারতীয় কৃষক ও শ্রমজীবী জীবন যাত্রার এমন সব সুবিধা ও বিলাস ভোগ করছে যা' তাদের "বাপ দাদারা" কখনও কল্পনাও করতে পারে নি—"the Indian peasants and the Indian industrial workers of to-day enjoy many conveniences and luxuries which were beyond the reach of their fore-fathers." কৃষক ও শ্রমজীবীরা বলে সুখসুবিধা সবই আছে, দুঃখ যা' অন্ন-বস্ত্রের।

কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণীর পরেই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক-শ্রেণীর কথা। গবর্ণমেণ্ট বলেন এদের মধ্যে আর ফিরিঙ্গীদের মধ্যেই যা' কিছু কর্ম্মহীনতা আছে, অন্যত্র ভারতবর্ষে কোথাও কর্ম্মহীনতা নাই—"It should be noted at the outset that, with the exception of the Anglo-Indian community and the educated Indian middle classes......there is, broadly speaking, no un-employment problem in India." তথাপি ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যেরা অধিকাংশের সম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব

অনুমোদিত করিয়ে নেন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের কর্ম্মহীনতা-নিবারণ-কল্পে একটা অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত করা হ'ক। প্রস্তাবটা যাতে ব্যবস্থাপকসভার অনুমোদিত না হয় তার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয় নি, প্রস্তাবটি অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়েছে। গবর্ণমেণ্টের সংবাদ-নিয়ন্তা "ইণ্ডিয়ার" লেখক মিঃ কোটম্যান 'প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে' এই মাত্র বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন; পাঠককে অনুমান করতে অবসর দিয়েছেন যে প্রস্তাব অনুসারে কাযও হবে। কিন্তু শ্রমশিল্প-সচিব বলেছেন যে, তা' হবে না, বিষয়টার প্রতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিমাত্র আকর্ষণ করা হবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বাঙলার গবর্ণমেণ্ট এর আগেই একটা কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। কমিটিও রিপোর্ট দিয়েছেন, গবর্ণমেণ্টও যথারীতি তার উপর একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। মন্তব্যটির সারমর্ম্ম এই যে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সে বিষয়ে এখন কিছু করতে গবর্ণমেণ্ট অক্ষম!

আর্থিক অবস্থার পরে দেশের লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থাটা দেখা যা'ক। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং যা' বলেন, তার উপর বড় বেশী বলবার কিছু নাই। ১৯২৫-২৬ সালের "ইণ্ডিয়াতে" প্রকাশ, "ভারতবর্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা প্রায় অসম্ভব। এই বিশাল দেশের কুত্রাপি এমন স্থান নাই যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করতে পারা যায়। বড় বড় সহরগুলির বাইরে সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার ছাড়া ডাক্তার নাই। ম্যালেরিয়া ও হুকওয়ারম্ (hookworm) লোকের নিত্যসহচর, তার উপর স্থানে স্থানে কলেরা, প্লেগ ও কালাজ্বর সংক্রামক ভাবে বিরাজ করছে। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলিও লোকের অজানিত।" এ অবস্থায় লোকের বড় একটা আশা ভরসা থাকে না। গবর্ণমেণ্টও হতাশ। "ইণ্ডিয়ার" লেখক বলেন "এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট আর কি কর্‌তে পারেন? তবুও পাঠশালার ছেলেদেরকে এবং কো-অপারেটিভ সোসাইটি দ্বারা ছেলেদের পিতামাতাকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি শেখান হচ্ছে এবং কোথাও বা স্থানীয় স্বাস্থ্যের কিছু কিছু উন্নতিও করা হচ্ছে।" ফল যে বিশেষ কিছু হচ্ছে না, তাও লেখক বোঝেন এবং সেই আশঙ্কা করে বলছেন "প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি অবশ্য বলতে পারেন না যে, বৎসরের আরম্ভে স্বাস্থ্যের যে অবস্থা ছিল বৎসরের শেষে তার কি বিশেষ উন্নতি হয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিভাগের বার্ষিক রিপোর্টগুলি মনোযোগ করে' পড়লে দেখতে পাওয়া যায় যে সাধারণ মৃত্যুর হার এবং শিশু মৃত্যুর হার বছর বছর দাশমিক বিন্দু পরিমাণ কমছে—"The general death rate and the mortality among babies shrinks decimal point by decimal point." বলা-বাহুল্য জনসাধারণ এই আণুবীক্ষণিক হ্রাস লক্ষ্য করতে পারে না। জনসাধারণ দেখে এক বাঙলা-দেশেই প্রতিবৎসর লোক মরে, ম্যালেরিয়ায় দশ লক্ষ, কালাজ্বরে এক লক্ষ এবং কলেরায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার; এ ছাড়া বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতিতেও মৃত্যুর সংখ্যা নগণ্য নয়। ১৯২৫ সালে বাঙালায়

জন্মের হার ছিল হাজারকরা ২৯·৫ আর মৃত্যুর হার হাজার করা ৩২·৬। আর ঐবৎসর শিশু মরেছে এক হাজারের মধ্যে ২৩৪·৯। এর উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলতে চান স্বাস্থ্যবিভাগটি এখন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তান্তরিত বিষয়ের মধ্যে এবং এর শীর্ষস্থানে আছেন একজন নির্ব্বাচিত দেশীয় মন্ত্রী। এই সময় গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ভুলে যান যে, এই বিভাগীয় ব্যয়টি অন্যান্য বিভাগীয় ব্যয়ের মত গবর্ণমেণ্টের নিজের হাতেই আছে, মন্ত্রীদের প্রতি কৃপা করে' যে টাকা দেন, তাতে তাঁরা আশানুরূপ কাজ করতে পারেন না।

তারপর শিক্ষার কথা। গবর্ণমেণ্টের লোকশিক্ষা-বিষয়িণী কার্য্যতৎপরতা স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা-বিষয়িণী কার্য্যতৎপরতার অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নয়। ১৯২১ সালের সেন্সাসরিপোর্টে প্রকাশ ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে পুরুষের সংখ্যা ১২,৬৮,৫০,১৬৩ (বারোকোটি আটষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক শ' তেষট্টি); তার মধ্যে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যা ১,৬৫,০৮,৭০০ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ আট হাজার সাত শ'); আর, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১২,০১,০৯,০৮৫ (বার কোটি এক লক্ষ ন' হাজার পঁচাশী) তার মধ্যে লেখাপড়া-জানার সংখ্যা ২১,৪৫,৯০৪। যদি এই সংখ্যা থেকে পাঁচ বছর এবং তার কম বয়সের বালক-বালিকা বাদ দেওয়া যায়, তা' হলে যা' থাকে তাদের, অর্থাৎ যাদের পাঠশালা যাবার বয়স হয়েছে, তাদের মধ্যে লেখাপড়া-জানার সংখ্যা, পুরুষ শতকরা ১৩·৯ (প্রায় ১৪) আর স্ত্রীলোক শতকরা ২·১ (দু'জনের কিছু উপর)। এখানে লেখাপড়া-জানার মানে এই যে, যে একখানা চিঠি লিখতে পারে এবং পড়তে পারে, সেই লেখাপড়া-জানা। যারা ইংরেজী জানে তাদের সংখ্যা, পুরুষের মধ্যে ১৯, ৯৮, ১৯৩ এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে ২, ০২, ৯৫১ অর্থাৎ এক হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ২জন মাত্র ইংরেজী জানে! এক শ' সত্তর বৎসরের ইংরেজ-রাজত্বের ফলে শিক্ষার এই বিবর্ত্তন (evolution) হয়েছে। দেশে এখন যাঁরা চিন্তা করতে পারেন এবং চিন্তা করে' থাকেন, তাঁরা বলছেন এই অতি-মন্থর গতিকে একটু দ্রুত করতে হবে। কর্ত্তৃপক্ষ ইঙ্গিত করছেন দ্রুতগতিরই নামান্তর আবর্ত্তন (revolution). তত্ত্বদর্শীরা বলেন evolution আর revolution বস্তুতঃ একই ; ফল ও দুয়েরই একই ; প্রভেদ এই যে evolution-এর ফলটা revolution-এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত শীঘ্র পাওয়া যায়। আর, revolution মানেই যে গুপ্ত সমিতি, ষড়যন্ত্র, বোমা, রক্তপাত ইত্যাদি ইত্যাদি, তাও নয়। Revolution মানে আবর্ত্তন। পৃথিবীর নিত্যই আবর্ত্তন হচ্ছে; শিক্ষারও একটা আবর্ত্তন আবশ্যক হয়েছে। বিবর্ত্তনের গতির মন্থরতায় দেশের লোকের সহিষ্ণুতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দেশ চাচ্ছে শিক্ষা হ'ক সার্ব্বজনীন এবং বাধ্যতামূল এবং সত্বর। গবর্ণমেণ্ট বলছেন তাঁরা সর্ব্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপকারিতা এবং আবশ্যকতা বেশ বোঝেন, কিন্তু নানা কারণে (তার মধ্যে রাজনৈতিক কারণও আছে) কিছু করে' উঠতে পারছেন না; বড় বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য (১৯২৬ সালে) এই যে যদিও সমগ্র ভারতবর্ষের বত্রিশ কোটি অজ্ঞানতিমিরান্ধ লোকের মধ্যে কেবল দু'কোটি

লোকের চোখে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা প্রয়োগ করতে পেরেছেন এবং এখনও ত্রিশকোটি অজ্ঞানতিমিরান্ধই আছে, তথাপি ১৯২৫-২৬ সালে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে বহুপরিমাণ উন্নতি করেছেন—"There is a good deal of progress to report in Education of all kinds during the year." তথাপি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যর সমালোচকেরা বলেন শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ বড় পেছিয়ে পড়ে' আছে। গবর্ণমেণ্ট বলেন এই সমালোচকেরা বোঝেন না যে ভারতবর্ষের মত একটা মহাদেশকে শিক্ষায় অগ্রসর করবার কত বিঘ্ন? দেশটা অন্যান্য প্রাচ্য দেশের মত অত্যন্ত দরিদ্র; এর অভাব-অভিযোগের অন্ত নাই; কিন্তু তার দাবী-দাওয়াগুলি আধুনিক উন্নতিশীল সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলির মত। তবুও গবর্ণমেণ্ট বিগত দু'পুরুষের জীবিতকালের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির জন্য কত চেষ্টাই না করেছেন! কিন্তু চেষ্টা সফল হবে কেমন করে'? বিঘ্নগুলি যে অনতিক্রমণীয়! গবর্ণমেণ্ট বলেন একটা প্রধান বিঘ্ন এই যে, এদেশের নারীরা শিক্ষয়িত্রীর কায থেকে দূরে সরে' থাকেন। পাঠ্যপুস্তক করতে হয় অসংখ্য ভাষায়। বালক-বালিকারা বাস করে দুর্গম পাহাড় পর্ব্বতে অথবা সুদূর পল্লীগ্রামে। (১)

সমালোচকেরা বলেন ভারতবর্ষীয় নারী যদি শিক্ষয়িত্রীর কায করতে অনিচ্ছুক বা অপারক হয়, ত সেটা তার শিক্ষার অভাবের ফল, তার হেতু নয়। আর, পাহাড়-পর্ব্বতে বা সুদূর পল্লীতে যদি চৌকীদার রাখা সম্ভব হয়, ত পাঠশালার গুরুমহাশয় রাখা যে কেন অসম্ভব তা বোঝা কঠিন। গবর্ণমেণ্ট বলেন তাঁরা যা' করছেন তা' যথেষ্টের চেয়ে বেশী! সমালোচকেরা অন্য দেশের নজীর দেখান। তাঁরা দেখান গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিক্ষার কত উন্নতি হয়েছে—

পাঁচ বৎসরের অধিক বয়স্ক অধিবাসী সংখ্যার শতকরা

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হলাণ্ড	৮১	৮৬	৯৪·৫	১০০
নরওয়ে	৮২	৮৭	৯৫	১০০
জারমানি	৮৩	৮৮	৯৬	১০০
ফ্রান্স	৮৪	৮৮	৯২	৯৪
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৮৫	৮৬	৯৯	৯৭·৪
ইংল্যাণ্ড	৮১	৮৬	৯৭	৯৩·৫
জাপান	৬৫	৮০	৯৫	৯৭·৫
ব্রিটিশ ভারত	৩	৩·৮	৪·৫	৫·২
ভারতের দেশীয় রাজ্য—				
ত্রিবাঙ্কুর	...	১১	১৯	২৮·২
বরোদা	৪·২	৬·৬	১৩	২১·৫
নিজাম রাজ্য	...	৫·৫	৯·৭	১৫·৭

(১) India in 1925-26, p. 163.

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়

	টাকা		টাকা
হলাণ্ড	১৯।০	জাপান	৯৲
ডেনমার্ক	১৭৲	নিউজীলাণ্ড	৮।।০
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	১৬।০	ফিলিপাইন	৮৲
জারমানি	১৩৲	ব্রিটিশ ভারত	৵০ দু' আনা
ইংল্যাণ্ড	৯।।০	মাত্র (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ব্যয় নিয়ে)	

এই তুলনায় স্বতঃই ভারতবাসীর মনে একটু বিকার জন্মায়। উচ্চের সঙ্গে তুলনায় নীচের মনোবিকার জন্মান স্বাভাবিক। মনোবিকার অসন্তোষে পরিণত হয়। তার হেতুও যথেষ্ট আছে। শিক্ষার অভাব মানে জ্ঞানের অভাব, আর জ্ঞানের অভাব মানে সেই জিনিষটির অভাব যা' মানুষকে ইতর জীব থেকে পৃথক করে। মনুষ্যত্ব-লাভের উপায়বিধায়ক এই যে শিক্ষা, এ এখন ধনীদের অধিকৃত হয়ে আছে। এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণার লোককেও ধনী-শ্রেণীর মধ্যে ধরা গেল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিবরণ থেকে দেখতে পাওয়া যায় সেখানে যাঁরা শিক্ষা পান তারা সকলেই ধনা। কৃষক এবং শ্রমী তার মধ্যে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নীচে যে উচ্চ শিক্ষা—secondary education—কৃষক ও শ্রমী ততদূর পর্য্যন্তও যেতে পারে না। তারও নীচে যে প্রাথমিক শিক্ষা তাও এত দুর্লভ যে কৃষক ও শ্রমীর ছেলেদের মধ্যে যারা পাঠশালায় যায় তাদের সংখ্যা শতকরা পাঁচ জনও নয়! শিক্ষা এখন প্রাদেশিক হস্তান্তরিত বিষয়ের মধ্যে এবং দেশীয় মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীন। এই একশ'টির মধ্যে পাঁচটি ছেলের নিরক্ষরতা দূর করতে বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষামন্ত্রী ব্যয় করেছেন ১৯২৫-২৬ সালে ৫১, ৭৭, ১৬২ টাকা। এর মধ্যে সরকারী রাজস্ব থেকে ব্যয় হয়েছে ১৫, ৯৬, ৯০৫ টাকা বা শতকরা ত্রিশ টাকা মাত্র! প্রত্যেক বিদ্যার্থীর প্রতি ব্যয়ের হিসাব---

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র প্রতি	১২১৸৶০ টাকা
উচ্চশ্রেণী স্কুলের ছাত্র প্রতি	৬৸৵০ ,,
প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্র প্রতি	১৸৶০ ,,

অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমজীবীকে তার একশ' ছেলে মেয়ের মধ্যে পঁচানব্বইটিকে নিরক্ষর করে' রেখে বাকী পাঁচটির নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য দিতে হয়েছে প্রত্যেকটির জন্য বছরে ১৸৶০, উচ্চ শ্রেণীর স্কুলের প্রত্যেক ছেলের জন্য ৬৸৵০ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছেলের জন্য ১২১৸৶০! এত বড় বৈষম্য বোধ হয় আর কোন বিষয়ে নাই। এর ফলটা আরও একটু বিশ্লেষণ করে' দেখতে হবে। যে ধনীর ছেলেটিকে বিদ্বান করবার জন্য দরিদ্র কৃষক এবং শ্রমজীবী নিজের ছেলেটিকে মূর্খ করে' রাখে সেই ধনীর ছেলেটিই সরকারী উচ্চ নীচ সব কর্ম্মগুলি অধিকার করে'

নিয়ে তার উপর এবং তার ছেলের উপর প্রভুত্ব করে, এবং সরকারের সহযোগী হয়ে তার নিজের এই প্রভুত্ব এবং কৃষক শ্রমজীবীর দাসত্ব চিরস্থায়ী করে। যে সরকারী কর্ম্মগ্রহণ করে না, সেও শিক্ষিতের ব্যবসায় অবলম্বন করে' যথেষ্ট অর্থ এবং সামাজিক প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে' বুর্জোয়া বংশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে। এই ব্যবস্থারই ফলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্ব-প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ ভোগ করছে ধনী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক—কেবল শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য নয়, ইন্দ্রিয়ের সুখ নয়, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক আনন্দও তাহাদেরই। সংসার-বিষ-বৃক্ষের কাব্যামৃত-রসাস্বাদ এবং সজ্জন সঙ্গমরূপ অমৃতোপম ফল দু'টিই দরিদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ! জ্ঞানবৃক্ষ এখনও ধনীর সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত! এই যে কাব্য, উপন্যাস, কবিতা, গীতি সমাজের জ্ঞান-ও-আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নিত্য প্রকাশিত হচ্ছে, তার কখানি দরিদ্রের কুটিরে প্রবেশ লাভ করে? রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি সম্বন্ধে লোকে বলে যে, যখন ঐ বইখানির লক্ষ লক্ষ খণ্ড ইউরোপ আমেরিকায় বিক্রী হচ্ছিল, বাঙলা দেশে তখন তার কয়েক হাজার খণ্ডও বিক্রী হয় নি। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন নিরেট নিরক্ষর, উচ্চশিক্ষিত শতকরা একজনেরও কম, সে দেশে গীতাঞ্জলির পাঠক যে নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? অন্যান্য কাব্য-উপন্যাস সম্বন্ধেও ঐ কথা। উচ্চ অঙ্গের ইতিহাস, বিজ্ঞান, কলা বিদ্যা বিষয়ে কোন বই নাই বললে বড় অত্যুক্তি হয় না। পাঠক নাই, সুতরাং লেখকও নাই। যে জনকয়েক ধনী এবং মধ্যবিত্ত লোক উচ্চ-অঙ্গের সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সুকুমার কলা শিখেছেন, দরিদ্রের কষ্টার্জ্জিত অর্থে, তাঁরা আর দরিদ্রকে তা' প্রত্যর্পণ করেন না। তাঁদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের অর্জ্জিত জ্ঞান বিতরণ করবার জন্য ঐ সকল বিষয়ে পুস্তকাদি লেখেন, তাঁরা তা' ইংরেজী ভাষায় লিখেন, যা' দেশের শতকরা ৯৭ জন জানে না এবং বোঝে না। সুতরাং এক শ' জনের মধ্যে ৯৭ জনের জ্ঞানানন্দের দৈন্য চিরস্থায়ী হয়ে আছে এবং লক্ষণ দেখে আশঙ্কা হয়, চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট তা এখন সকলেই বোঝে। তথাপি এটাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করবার জন্য একটা পরীক্ষা হয়েছিল। ১৯০৩-০৪ সালের শীতকালে গ্লাসগো (Glasgow) নগরে এই পরীক্ষাটা হয়। সেখানকার স্কুলের ছেলে দেখে অবস্থা-অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; প্রথম,—যারা এমন বাড়ীতে বাস করে যাতে একটি মাত্র ঘর; দ্বিতীয়,—যাদের বাড়ীতে দুটি ঘর; তৃতীয়,—যাদের বাড়ীতে তিনটি ঘর আছে। তাতে দেখা গেল, মৃত্যুর হার একঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে হাজার করা ৩৩; দু'ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ২১; তিন ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ১১। ছেলেদের দেহের উচ্চতা গড়ে—একঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ৪৭·৭ ইঞ্চি; দু'ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ৪৯·৩; তিনঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ৫০·৮। শরীরের ওজন—একঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ২৬ সের ৩ ছটাক; দু'ঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে ২৮ সের ৩ ছটাক; তিনঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে ২৯ সের ৪ ছটাক। পুষ্টির অবস্থা—একঘর বিশিষ্ট বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে

মোটাশোটা ছেলে নাই; দোহারা আছে শতকরা ৮০টি; পাতলা—শতকরা ২০; দু'ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে মোটাশোটা ছেলে শতকরা ৪.৯; দোহারা ৭৭.২; পাতলা ১৪.৯; তিনঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে মোটা-শোটা ১০.৫; দোহারা—৭৪.৫; পাতলা—১৪.৯। মানসিক বৃত্তি চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—প্রথম উৎকৃষ্ট; দ্বিতীয়, উত্তম; তৃতীয়, মধ্যম; চতুর্থ, নিকৃষ্ট। এই শ্রেণীবিভাগ-অনুসারে পাওয়া গিয়েছিল—একঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে উৎকৃষ্ট শতকরা ৬.৬; উত্তম, ২৬.৬; মধ্যম ২৬.৬; নিকৃষ্ট ৪০.২। দু'ঘর বিশিষ্ট বাড়ীতে—উৎকৃষ্ট ১৬.৬; উত্তম, ৪৫.৪; মধ্যম ৩১.২; নিকৃষ্ট ৬.৬; তিনঘরবিশিষ্ট বাড়ীতে উৎকৃষ্ট ১৭.৫; উত্তম ৪৯.১; মধ্যম ২৮.০; নিকৃষ্ট ৫.২। (১)

১৯২৫ সালে লণ্ডনের স্কুলের ছেলেদের বুদ্ধিবৃত্তির একটা সাধারণ পরীক্ষা হয়। দু'শ্রেণীর স্কুলের ছেলে নেওয়া হয়েছিল—(১) ভাল স্কুল, অর্থাৎ যেখানে পড়ান এবং তার আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাই ভাল; (২) সাধারণ। ছেলেদের বয়স ১১ থেকে ১৪; প্রশ্ন ছিল ১০০টি; নম্বর ১০০। ফল এইরূপ —

বয়স —	১১	১২	১৩	১৪
ভাল স্কুলের ছেলেদের নম্বর	৪৩	৪১	৪৯	৬৬
সাধারণ স্কুলের ছেলেদের নম্বর	৭	১৪	১৭	২১

ধরে নেওয়া যেতে পারে, যে-বাড়ীতে মোটে একটি ঘর, সে বাড়ীর লোকেদের অবস্থা ভাল নয়; যে বাড়ীতে দু'টি ঘর তাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল; আর যাদের বাড়ীতে তিনটি ঘর তাদের অবস্থা বেশ ভাল, তাদের ছেলেরা সুপুষ্ট; তাদের দেহের উচ্চতা বেশী; ওজনও বেশী; মৃত্যুসংখ্যা খুব কম, বুদ্ধিবৃত্তি উৎকৃষ্ট। আমাদের দেশে এইরূপ তথ্য সংগ্রহ করলে যা পাওয়া যাবে তা' বলাই বাহুল্য। একবার কলকাতার ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছিল, ফলে পাওয়া গিয়েছিল শতকরা ৬৫টি ছেলে রুগ্ন।

আমাদের জনসাধারণের এইরূপ আর্থিক অবস্থা, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং শিক্ষার অবস্থা আলোচনা করে' আমাদের গবর্ণমেণ্ট বলেন "ভারতীয় কৃষক, যার সংখ্যা, সমস্ত দেশবাসীর শতকরা ৭৫ জন, তার নীরস জমিটুকু থেকে জীবন ধারণের উপায় আহরণ করতেই ব্যস্ত থাকে, তার সংসারের বাইরে যা কিছু আছে তার সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই, সে সকল বিষয়ের সংবাদ রাখার তার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই; তার উপর আছে তার গুরুঋণ ভার, যা' তাকে পিষে ফেলছে, আর রোগের অত্যাচার, যা' তাকে দিন দিন দুর্ব্বল করে' তার শক্তির অপচয়ের সঙ্গে অর্থেরও অপচয় ঘটাচ্ছে। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কৃষক তার সন্তানকে পাঠশালায় পাঠাতে পারে না; পারলেও তাকে পাঠশালায় বেশী দিন রাখতে পারে না;

(১) Journal of the Royal Sanitary Institute, Glasgow Congress 1904, quoted in Socialism for Today by H. N. Brailsford. P. 43

আর, বেশী দিন পাঠশালায় না রাখলে তার এমন শিক্ষা লাভ হতে পারেনা, যা' দ্বারা সে জীবনের প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে' জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করতে পারে। শিক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে তার স্বায়ত্ব শাসনের জ্ঞান লাভ হবে ; স্বায়ত্ব শাসনের জ্ঞান লাভ হলে সে বুঝতে পারবে সাক্ষাৎ ভাবে, কেবল তার অব্যবহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার নয়, সমস্ত জাতির সমস্ত অবস্থার, কি উন্নতি হতে পারে। সমাজ-শরীরের এই সকল কোষেই জাতীয় ভাব বিদ্যমান থাকে, এবং সেইখানেই তার পরিপুষ্টি সম্ভবপর। লোকে যখন শিক্ষার লাভ প্রত্যক্ষ দেখে, তখনই তার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। ১৯২৫-২৬ সালের "ইণ্ডিয়া"র লেখক এই সকল নীতিকথার উপদেশ করেছেন। (১) কিন্তু কি উপায়ে দেশটা সেই বাঞ্ছনীয় অবস্থায় উপস্থিত হতে পারে সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নি।

ভারতবর্ষের অসমানাধিকারজনিত অভাব-অভিযোগের কথা বলতে গেলেই আমরা গবর্ণমেণ্টের কথা বলি। কারণ, আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট-ব্যতিরিক্ত আমাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; সময়ে অসময়ে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই বলে' থাকেন আমরা অপোগণ্ড, তাঁরা আমাদের অভিভাবক, আমাদের ন্যাসরক্ষক। তাই আমাদেরকে তাঁরা স্বায়ত্ব শাসনের প্রথম পাঠ শেখাচ্ছেন এবং বলছেন এই প্রথম পাঠ অভ্যাস করতে দশ বৎসর লাগবে। তার পর দ্বিতীয় পাঠ, আর দশ বৎসর ইত্যাদি। এইরূপ কত পাঠ অভ্যাস করতে পারলে সমস্ত স্বায়ত্ত-শাসন-তন্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ হবে তা' তাঁরাও ঠিক করে' বলতে পারছেন না। আমরাও ঠিক করে' বুঝতে পারছি না। তবে তাঁরা আশা দিচ্ছেন যে কাল পূর্ণ হলেই—"in the fulness of time"—তাঁরা আমাদেরকে ব্রিটিশ সাধারণ তন্ত্রে তাঁদের সঙ্গে সমান অংশ দেবেন। এখনকার প্রশ্নটা এই যে সেই কালটা পূর্ণ হবে কবে? তার উত্তর কে দেবে? কাল ত অনন্ত।

তার পর, যে ধন ও শ্রমের বিবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রকাশমান হয়েছে, এ দেশেও তা' অপ্রকাশ নাই। এ দেশে তার একটা গুরুতর বৈশিষ্ট্যও আছে। এ দেশে গবর্ণমেণ্ট সব চেয়ে ধনী ; দেশের সমস্ত জমির উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠতম স্বত্বাধিকারী, এবং প্রধানতম শ্রম-নিয়োক্তা (employer of labour)। তাঁদের বিভিন্ন কর্ম্ম-বিভাগের কর্ম্মচারী ত আছেনই ; তার উপর বড় বড় রেলওয়ে আছে, খাল আছে এবং আরও কত বড় বড় পূর্ত্তকার্য্য আছে যাতে অনেক শ্রমজীবী নিযুক্ত আছে। এই সকল বিভাগীয় কর্ম্মচারী এবং শ্রমজীবীদের মধ্যে বেতন বা পারিশ্রমিক অনুসারে উচ্চ-নীচ পদভেদ ত আছেই, তার উপর আছে বর্ণভেদ—সেকালের গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ যে চাতুর্ব্বণ্য ছিল তা' নয়, প্রাকৃতিক বর্ণের অর্থাৎ রঙের ভেদ, শ্বেত-কৃষ্ণের ভেদ, আরও আছে জেতা-জিত জাতিভেদ। এই সকলের সমবায়ে সমাজের বর্গে বর্গে, শ্রমজীবীদের শ্রেণীতে শ্রেণীতে,-দ্বন্দ্বও আছে যথেষ্টের চেয়ে অনেক বেশী। এ অবস্থায় দেশবাসীর মনে যে অসন্তোষ জন্মাবে এবং ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে নানা আকারে, নানা

(১) India in 1925-26 ; p. 188.

প্রকারে আত্ম-প্রকাশ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তার উপর এই তার-বেতার-ছাপাখানা-সংবাদপত্র-সাময়িক-সাহিত্যের দিনে সভ্য জগতের সর্ব্ব প্রকার ভাব ও ভাষা, বাদ ও প্রতিবাদ এ দেশেও পৌঁছুতে বিলম্ব হচ্ছে না। সমানাধিকারবাদও (Communism) যথা সময়ে এ দেশে আবির্ভূত হয়েছে। বোম্বাই-এর কাপড়ের কলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া, নর্থওয়েষ্টারণ এবং বি, এন রেলে এবং অন্যান্য কল-কারখানার ধর্ম্মঘটে সেই সমানাধিকারবাদেরই আত্মপ্রকাশের লক্ষণ দেখা যায়। সমানাধিকারবাদীদের (Communist) একটা দলও সংগঠিত হয়ে উঠছে। এই দলের প্রথম আবির্ভাব জানা গেল কাণপুর-ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায়। ১৯২৫-২৬ সালের "ইণ্ডিয়া"তেও তার উল্লেখ আছে। তার মর্ম্ম এই—এম, এন, রায় নামে এক ব্যক্তি এ দেশে সমানাধিকার-বাদীদের একটা দল সংগঠন করবার চেষ্টা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে তাদের কাজের দুটো ভাগ করে—এক ভাগের কাজ হলো রাষ্ট্রবিপর্য্যয় ঘটান (Subversion of the State), আর এক ভাগের কাজ হল জনসাধারণের মধ্যে সমানাধিকারবাদের প্রচার। প্রথম কাজের আরম্ভেই রায়ের সহকারীরা ধরা পড়ে' গেল এবং বিচারে তাদের দণ্ড হল। দ্বিতীয় কাজের জন্য এই বিষয়ক সাহিত্য প্রকাশ করে' জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ চলতে লাগল। এই সাহিত্যের মধ্যে ছিল রায়ের এক খানি পুস্তিকা। তাতে তিনি বলেন যে আবর্ত্তন (revolution) মানেই যে বোমা, রিভলভার এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্র, তা' নয়; এই সকল ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা বৃথা; এর নিবারণের জন্য পার্লামেন্টের আইনও বৃথা। বর্ত্তমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার উৎসাদন ঘটাতে পারে একমাত্র বিদ্রোহী জনসাধারণ। সেই জন্য রায়ের ইচ্ছা এবং রায়কে যাঁরা নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের ইচ্ছা এবং চেষ্টা ছিল জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ শ্রমজীবীদের মধ্যে এই মতবাদের বহুল প্রচার করা। চীন এবং ইউরোপের কোন কোন স্থানকে সময়ে সময়ে এই কাজের কেন্দ্রস্থান করা হয়েছিল; কোন কোন শ্রমজীবী সংঘের সহিত, সভাসমিতির সহিত, কখনও বা ব্যক্তিবিশেষের সহিত এবিষয়ে পত্রব্যবহারও হয়েছিল। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে মান্দ্রাজে শ্রমজীবী-সংঘ সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে মস্কো থেকে দু'টি টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়েছিল তাতে অনুরোধ ছিল যে ভারতীয় শ্রমজীবী সংঘগুলিকে যেন তাদের শ্রমজীবী সংঘের সহিত সংযুক্ত করে' দেওয়া হয়। এই সময়ে এদেশে যে সকল ধর্ম্মঘট হয়, তাতেও তারা সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং অর্থ সাহায্যও করে। এদেশে সমানাধিকারবাদীদের একখানা নিজস্ব সংবাদ পত্রের অভাব ছিল। এই সময়ে বাঙালায় "লাঙল" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে সে অভাব পূরণ করে' দেয়। "ইণ্ডিয়ার" লেখক এই কাগজ খানির আর্থিক অবস্থা দেখে অনুমান করেছিলেন যে কাগজ খানি স্থায়ী হবে না। তাঁর অনুমান কতক পরিমাণে সত্য হয়েছে। কিন্তু তার পরেই "গণবাণী" নামে কৃষক ও শ্রমজীবীদের মুখপত্র স্বরূপ এক খানি বাঙালা সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়েছে এবং "লাঙল" কে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে' দেওয়া

হয়েছে। ১৯২৪ সালে কানপুরে 'ইণ্ডিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টি' নামে সমানাধিকারবাদীদের একটা দলও সংগঠিত হয়েছে। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সত্যভক্ত বলেন যে, কানপুরের ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় বিচারক মত দিয়েছেন যে সমানাধিকারবাদ বা কম্যুনিজম স্বতঃই কোন অপরাধের বিষয় নয়। তবে যে, সে মোকদ্দমায় অভিযুক্তদের দণ্ড হয়েছিল, তার কারণ তাঁরা রাষ্ট্র-বিপর্য্যয়-জনক কাজ কিছু করেছিলেন এবং বিচারক সেই কাজগুলিকে অপরাধের কাজ বলে' অবধারণ করেছিলেন। এই দলের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য দরিদ্র শ্রমজীবীদের দারিদ্র্য মোচন করা এবং অন্যবিধ অভাবের পূরণের জন্য চেষ্টা করা। এই "শ্রমজীবীদের" মধ্যে তাঁরা ধরেছেন কৃষক, কেরাণী, রেল এবং ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী, পুলিসের কনষ্টেবল এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র। চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই দল ঘোষণা করেছেন যে, "বর্ত্তমান সমাজ-সংগঠন এবং দেশের গবর্ণমেণ্ট-সংগঠন পরিবর্ত্তিত করতে হবে; জমি, কারখানা, খনি, টেলিগ্রাফ, বাণিজ্য জাহাজ প্রভৃতি ধনের উৎপত্তি এবং বিতরণের মূল উপায়গুলিকে সাধারণ সম্পত্তি করতে হবে, এবং এই সকল কাজ এমন ভাবে করতে হবে যেন জনসাধারণও তার সম্পাদনে অংশ নিতে পারে এবং কাজ সম্পন্ন হলে তার ফলভাগীও হতে পারে।" ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এই দলের শাখাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু "ইণ্ডিয়ার" লেখক বলেন, তথাপি এ দলটি তেমন পুষ্টি ও শক্তি লাভ করতে পারে নি। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এই দলের উদ্যোগে কানপুরে সর্ব্বভারতীয় সামানাধিকারবাদী-সমিতির (All India Communist Conference) এক অধিবেশন হয়। তার সভাপতি ছিলেন শিঙ্গার বেলু। ইনিও কানপুরের ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য এঁকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হয় নি। সমিতির অধিবেশনে পাঁচ শ' প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তারমধ্যে শতকরা নব্বই জন ছিলেন কৃষক ও শ্রমজীবী। "ইণ্ডিয়ার" লেখক বলেন, সভাপতির অভিভাষণে বিশেষ কিছু গুরুতর ছিল না। যে সকল মন্তব্য গৃহীত হয়েছিল তাতেও বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু তারপরে সত্যভক্তের সহিত অন্য সদস্যদের মতানৈক্য হয়। সত্যভক্ত মস্কৌ-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চান না, অন্য সদস্যেরা তা' চান। এই সময় এম, এন, রায় "মাসেস্ অভ্ ইণ্ডিয়া (Masses of India)" পত্রিকায় সত্যভক্তের বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখেন; সত্যভক্তও তার উত্তরে একটি বিজ্ঞপ্তি লিখে রায়কে আক্রমণ করেন। এই দলের প্রধান কর্ম্মস্থান ছিল প্রথমে কানপুরে; সেখান থেকে তাকে বোম্বাই-এ স্থানান্তরিত করা হয়। তার পরে আবার সেখান থেকেও স্থানান্তরিত হয়ে সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছেন। "ইণ্ডিয়ার" লেখক বলেন এর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, সাধারণ লোক একে বিশেষ কোন সাহায্য করছে না। (১)

(১) India in 1925-26 by J. Coatman, pp. 194-96.

কিন্তু "ইণ্ডিয়া"-লেখকের এই মন্তব্য-প্রকাশের পরও এদেশের সমানাধিকারবাদীদের দল সজীব আছে। নানা স্থানে শ্রমজীবীসংঘও—Trades Unions—স্থাপিত হয়েছে। এবং বিভিন্ন স্থানের শ্রমজীবীসংঘ সমূহের মহাসম্মেলনও (Congress) হয়েছে। ওদিকে জাতিসংঘের শ্রমিক-সমিতিতে (Lnternational Labor Conference of the league of Nations) ভারতীয় শ্রমজীবী-প্রতিনিধিকে স্থান দেওয়া হয়েছে, আর্থিক সমিতিতেও (Economic Conference) ভারতীয় কৃষকের কথার আলোচনা হচ্ছে। ১৯১৯ সালে ওয়াসিংটনে শ্রমজীবী প্রতিনিধি-সমিতির যে অধিবেশন হয় তাতেও ভারতীয় শ্রমজীবীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং তারপর জেনেভা নগরে যে অধিবেশন হয় তাতেও ভারতের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সকল সভাসমিতিতে শ্রমজীবীদের হিতার্থে যে সকল মন্তব্য গৃহীত হয়, ভারতগবর্ণমেণ্ট তার কতকগুলিকে কাজে পরিণত করবার জন্য যথাবশ্যক বিধি-ব্যবস্থাও কিছু কিছু করেছেন। এসম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্ট, "ইণ্ডিয়া"-লেখক-প্রমুখাৎ, সগর্ব্বে বলেছেন—"Few, if any, countries have done so much to comply with the provisions of the conventions and recommendations adopted at International Labor Conferences. Indeed in some quarters in India the opinion is held that the Indian Goverment has proceeded in this matter at too great a pace." অর্থাৎ অন্য কোন দেশই এত করেনি, এমন কি কেউ কেউ বলেন এ বিষয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট যতটা দ্রুত গতিতে চলেছেন ততটা দ্রুত গতি ভাল নয়। (১)

এ সম্বন্ধে ভারতগবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প-সচিব বলেন যে, ১৯২৬ সালে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী-প্রতিনিধি-সমিতির জেনেভা-অধিবেশনে যে চারিটি মন্তব্য অবধারিত হয় ভারতগবর্ণমেণ্ট তার একটি মাত্র গ্রহণ করেছেন। বাকী তিনটির মধ্যে দুটি শ্রমজীবীদের দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণবিষয়ক। এ বিষয়ে ভারতগবর্ণমেণ্ট স্থির করেছেন যে, আপাততঃ তাঁরা কিছু করবেন না। ১৯১৯ সালে ওয়াশিংটনে স্ত্রী-শ্রমজীবিনীদের সন্তানপ্রসবের কিছু পূর্ব্বে এবং পরে শারীরিক পরিশ্রম করতে যখন তারা অসমর্থ তখন তাদের সাহায্য করবার জন্য যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে ভারতবর্ষকেও অনুরোধ করা হয়েছিল তাঁরাও যেন এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখেন। গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে' এবং সবিশেষ বিবেচনা করে ১৯২১ সালের জেনেভা-অধিবেশনে বলেন যে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট-গুলি অনুসন্ধান করে' রিপোর্ট করেছেন যে, সেরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা বড় একটা কোথাও নাই— "that such schemes were comparatively rare." কিন্তু তারপরে ১৯২৫ সালে যখন শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এন. এম. যোশী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এর জন্য একটা আইনের প্রস্তাব করেন তখন গবর্ণমেণ্টের শ্রমশিল্প-সচিব সার ভূপেন্দ্র নাথ তাতেও আপত্তি করেন।

(১) India in 1925-26. p7.

তার ফলে যোশীর প্রস্তাবিত আইনটি সিলেক্‌ট্‌ কমিটি পর্য্যন্তও গেল না। তথাপি ভারতগবর্ণমেণ্ট বলতে কুন্ঠিত হন নি যে, অন্য কোন দেশ ভারতবর্ষের মত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবী-সমিতির মন্তব্যগুলি কাজে পরিণত ক'রতে পারেনি! এসম্বন্ধে ভারতীয় শ্রমজীবীদের প্রধান কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট যাঁদেকে শ্রমজীবীদের প্রতিনিধি বলেন, তাঁরা ভারতীয় শ্রমজীবীদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নন, তাঁরা গবর্ণমেণ্টের মনোনীত। বর্ত্তমান সময়ে শ্রমজীবীসংঘ দেশে অনেকগুলি আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে' অন্য অন্য শ্রম-নিযোক্তারাও তাদেকে আমল দেন না। সুতরাং ধর্ম্মঘট উপস্থিত হলে শ্রমজীবীদের অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শোনেন না। কারণ, তাঁরা তা' শুনতে বাধ্য নন। নিযোক্তা এবং নিযুক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলে মধ্যস্থতা করবারও কোন ব্যবস্থা নাই।

এইরূপ অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের জন্য ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের অন্য অন্য দেশে যথোচিত বিধিব্যবস্থা আছে এবং যখনই সেই বিধিব্যবস্থা অসম্পূর্ণ বলে' বোধ হচ্ছে, তখনই তার সংশোধন এবং পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এদেশেও ঐরূপ বিধিব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করবার জন্য ১৯২৫ সালে একটা আইনের খসড়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হয়েছিল। শ্রমজীবী-প্রতিনিধিরা চেয়েছিলেন ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীসংঘ-আইনগুলি ইংরেজ শ্রমজীবীদের যে সকল অধিকার এবং সংঘবদ্ধ হয়ে স্বার্থ রক্ষা করবার যে সকল সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছে, প্রস্তাবিত আইনের দ্বারা ভারতীয় শ্রমজীবীদের সেই সকল অধিকার এবং সুবিধা দেওয়া হ'ক। ইউরোপীয় সরকারী এবং বেসরকারী সদস্যেরা বলেন ইংলণ্ডের ১৮৭১ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এই কিছু-কম অর্দ্ধশতাব্দীকালে ইংরেজ শ্রমজীবী যে সকল অধিকার এবং সুবিধা পেয়েছে, ভারতীয় শ্রমজীবী এক দিনেই তা' পেতে পারে না। ইউরোপীয় সদস্যেরা বোধ হয় বলতে চান না যে, ইংরেজ শ্রমজীবীরা এই সকল অধিকার পাবার জন্য ধনীদের সঙ্গে যে সকল খণ্ড যুদ্ধ করেছে, ভারতীয় শ্রমজীবীরাও তার পুনরভিনয় করুক? যা' হ'ক, ইউরোপীয় সদস্যেরা প্রস্তাবিত আইনটিকে সুনজরে দেখলেন না। তার হেতু এই যে এদেশে গবর্ণমেণ্ট অনেক রেল এবং কলকারখানার মালিক, ইউরোপীয় বে-সরকারী সদস্যদেরও অনেকে অনেক কলকারখানা এবং চা-বাগান প্রভৃতিতে অনেক শ্রমজীবী নিযুক্ত করে' থাকেন; দেশীয় বে-সরকারী সদস্যদের মধ্যেও অনেক এই শ্রেণীর লোক আছেন। কাযেই এঁরা একযোগে এই প্রস্তাবিত আইনের বিপক্ষে দাঁড়ালেন। এঁদের সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমজীবী প্রতিনিধিরা বিশেষ কিছু করে' উঠতে পারলেন না। পর বৎসর বিলটা ১৯২৬ সালের ১৬ আইনরূপে বিধিবদ্ধ হ'ল, কিন্তু তাতে শ্রমজীবীদের বিশেষ কিছু উপকার হবে বলে শ্রমজীবী প্রতিনিধিরা বিশ্বাস করছেন না। তাও, আবার, এখনও প্রচলিত হয় নি। এই বৎসর জুনমাস থেকে হবে।

জাতিসংঘের অন্তর্গত এবং বহিঃস্থিত সভা-সমিতির সঙ্গে ভারতবাসীর সম্পর্কের কথা

বলেছি। আর একটি এইরূপ মহাসংঘের কথা বলেই এবিষয়ের শেষ করব। বর্ত্তমান বৎসরে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রুসে'জ (Brussels) নগরে পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের (Anti-Imperialist) এক মহাসভা হয়ে গিয়েছে. তাতেও ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে যে সকল তর্কবিতর্ক-আন্দোলন-আলোচনা হয়েছিল, তৎসম্বন্ধীয় সাহিত্য ভারতবর্ষে আসা নিষিদ্ধ, সুতরাং সে বিষয়ের সবিশেষ তথ্য জানবার উপায় নাই।

এই সকল অবস্থা থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে সঙ্গহীন একাকী নয়, অবহেলিত নয়। তার বহুকাল-বিস্মৃত প্রাচীন দীক্ষা "সংঘং শরণং গচ্ছামি" স্মরণ করে' ভারতবর্ষ এখন সর্ব্বজাতি সংঘে সম্মিলিত হতে চায়; জাতি-সংঘ সকলও 'জগদ্ধিতায়' ভারতবর্ষকে সকল কার্য্যে সহযোগিতা করতে আহ্বান করছে। ভারতের বর্ত্তমান শাসকবর্গ তাতে সমানাধিকারবাদের রুশীয় মূর্ত্তি দেখে আতঙ্কিত হচ্ছেন এবং বলছেন এই সকল প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্র-বিপর্য্যয় ঘটান—to *subvert* the State, কিন্তু স্বরাজ্যকাম ভারত সন্তান বলছেন, তা' নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে সমানাধিকারবাদ মন্ত্রে দীক্ষিত করা—to *convert* it to the faith of communism. যে দেশের পরম ধর্ম্ম অহিংসা, সেই পুণ্যদেশ ভারতবর্ষে এসে প্রতীচ্য সমানাধিকারবাদ রক্ত-কলঙ্ক-বিধৌত করে' শুভ্র-সৌম্য মূর্ত্তিতে মহামানবের সেবায় নিযুক্ত হবে। 　　　শ্রীহৃষীকেশ সেন

বরষার স্মৃতি

আজ সারাদিন, বিরামবিহীন ঝরিয়াছে বারিধারা,
সাঁঝের গগন, বিষাদমগন একটি ফোটেনি তারা।
পূবের বাতাসে, আজ মনে আসে সেই কথা কবেকার—
দূরে বহু দূরে—উজয়িনী পুরে রেবা নদীটির ধার।
আজিকার মত, সেদিনো হয়তো ঘন ঘোর ঘটা করি,
ছল ছল জল, শুধু অবিরল পড়েছিল বুঝি ঝরি!
পথপানে চেয়ে, বিরহিণী মেয়ে বুঝি ছিল বসে একা,
বুঝি ক্ষণে ক্ষণে, খোলা বাতায়নে দুটি আঁখি গেল দেখা।
দেখি মেঘভার, বুঝি প্রিয়া, তার হারানো প্রিয়ের লাগি'
বসি' গৃহ-কোণে, সজল নয়নে সারানিশি ছিল জাগি'?
নিবু নিবু করে, দীপ-শিখা ঘরে, প্রবল বাতাস-বেগে—
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলি, উঠিছে বিজলী গুরু গুরু ধ্বনি মেঘে!
অমর সে বাণী—মেঘদূত খানি রচেছিল যেই কবি,
এতদিন পরে, বসি' নিজ ঘরে—দেখিতেছি সেই ছবি।
টুপুর টুপুর একটানা সুর শুধু জেগে আছে কানে,
সেই কবেকার ঘন বরষার স্মৃতি খানি বয়ে আনে!

শ্রীউমা দেবী

গিরীশ-স্মৃতি

(৭)

১৯১১ খৃষ্টাব্দ—জুলাই মাস—কলিকাতায় মহা আনন্দ উৎসব। গড়ের মাঠ লোকে লোকারণ্য—রাস্তায় রাস্তায় হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে—বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হাস্য-কলরবে আনন্দ-কোলাহলে পথঘাট মুখরিত করেছিল।

আনন্দোৎসবের হেতু এই আজ মোহনবাগান ফুটবল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিটারী team-কে হারিয়ে শিল্ড লাভ ক'রেছে।

রাত্রি প্রায় ৮টার পর গিরীশ বাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখি তিনি এক রকম আদুড় গায়ে তাঁর বাড়ীর ফটক-লগ্ন গলির দিকে তাকিয়ে আছেন—সতৃষ্ণ-নয়নে তাকিয়ে আছেন। নিকটে আর কেহ নাই।—আমাকেদেখেই বলে উঠ্‌লেন "আজ্‌কের ফুটবল ম্যাচের খবর কিছু জান?"

আমি বল্‌লাম "কেন মোহনবাগান জিতেছে। আমি দেখে এসেছি।"

গিরীশ বাবু আনন্দে সহাস্য-বদনে বল্‌লেন, "বাঃ! আমাদের আজ বড় আনন্দের দিন! বাংলা দেশের ছেলেদের উপর কিছু ভরসা হচ্ছে। এও যে দেখ্‌বো তা ভাবিনি।" এই ব'লে তিনি নিজেই তাঁর চাকর সুদর্শনকে ডেকে তামাক আন্‌তে বল্‌লেন।

আমি বল্‌লাম "আজ এত আনন্দের দিন কিসে? এবারে মোহনবাগান তো বরাবর এই শিল্ড ম্যাচে মিলিটারী টীমকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে শিল্ড লাভ ক'রেছে! গড়ের মাঠে বাঙালীর সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়-ধ্বনিতে সমস্ত সহর কেঁপে উঠেছে!"

গিরীশ বাবু হাস্যমুখে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্‌লেন, "কাঁপ্‌বে না!—মনে ক'রে দেখ দেখি যে, যে লালমুখ দেখ্‌লে আমরা ভয়ে আঁৎকে উঠি—বরাবর মনে ক'রে থাকি আমরা চেষ্টা কর্‌লে তাদের চেয়ে intellectually বড় হ'লেও হতে পারি কিন্তু বাহুবলে তাদের কাছে কস্মিন্ কালে এগুতে পার্‌বো না,—শিখ গোরখা কেবল তাদের কাছে যেতে পারে—সেই জাতের মিলিটারী দলকে খেলায় পরাজিত করা কম কাজ হয় নি। একটা ভয়—একটা সঙ্কোচ—যেটা শুধু মনের মনগড়া ছায়া—সেটা দূর হয়েছে। এখন আমরা মনে করতে পারি যে বাহুবলে আমরা তাদের সাম্‌নে এগিয়ে যেতে পারি—প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষেত্রে চেষ্টা কর্‌লে তাদের পরাজয় করতে পারি। বাঃ! খুব বাহাদুর! বাংলা দেশকে এই খেলায় জিতে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছে।" এই ব'লে গিরীশ বাবু আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। আমি সেই সপ্ততিবর্ষ রুগ্‌ণ বৃদ্ধের যুবার ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দ দেখে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। তখন গিরীশবাবুর আনন্দোৎসাহ দেখ্‌লে কে মনে করবে যে ইনি একজন হাঁপানী রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ—ভাবুক নাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা!

এমন সময়ে সুদর্শন তামাক আন্‌লে তিনি আমাকে তা পান কর্‌তে বল্‌লেন। তিনি বয়োবৃদ্ধ মাননীয় ব্যক্তি—তাঁর সম্মুখে তামাক খেতে ইতস্ততঃ কর্‌তে দেখে আমাকে বল্‌লেন "তুমি তামাক খাও না ?"—আমি নিরুত্তরে মাথা নীচু কর্‌তেই বল্‌লেন "এতে লজ্জা কি ? আমি ঠাকুরের কাছে তামাক খেয়েছি।" আমি বল্‌লেম "আচ্ছা আপনাকে তো তামাক খেতে দেখি নি কিন্তু হুঁকো বৈঠক তামাকের সব সরঞ্জাম ঠিক রেখেছেন।"

গিরীশবাবু। তামাক ঢের খেয়েছি। ওর ঝাড়ে বংশে খেয়েছি।—শুধু কি তামাক—মদ, গাজা, আফিং, চরস, ভাং—কোন্‌টা বাকি আছে। এখন মাঝে মাঝে cigar খাই।—সব নেশা করে দেখেছি।

আমি। আচ্ছা এই সব নেশা তো এখন সব ছেড়ে দিয়েছেন—কেননা আপনাকে তো কখনও কোনও নেশা কর্‌তে দেখিনি।

গিরীশবাবু। সাধে ছেড়েছি—প্যায়দায় ছাড়িয়েছে। দেখ আমি নিজে চেষ্টা ক'রে কিছুই ছাড়িনি। বোতল বোতল মদ খেয়েছি—একদিন বাইশ বোতল বিয়ার খেয়েছি।—কিন্তু মদ খেয়ে দেখেছি কি জান—জোর ক'রে—মনকে ধ'রে রাখা—সে চেষ্টায় আবার অবসাদ আসে—আবার সেই অবসাদ দূর কর্‌বার জন্য আবার মদ খাও।—নেশার দোষ গুণ আছে—মদ যেমন সর্ব্বনেশে নেশা, মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুর মত ক'রে তোলে—পাগল ক'রে তোলে—তেমনি সব নেশার রাজা—কোন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'লে—তোমার সে চিন্তার সাহচর্য্য কর্‌বে, শরীরে ও মস্তিষ্কে প্রবল উত্তেজনা উৎপন্ন কর্‌বে—কর্ম্মে সতেজ কর্‌বে। কিন্তু এই সকলের প্রতিক্রিয়া—বড় ভয়ঙ্কর। ঔষধে—ডাক্তারের হাতে ঔষধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ঔষধ কিন্তু নিজে খেতে গেলে বিষ!

আমি। যদি কেউ ঠিক ডোজ-মত নিয়মিত সুরা পান করে—তবে নাকি তা health-এর পক্ষে ভাল।

গিরীশবাবু। হ্যাঁ—মাতালে একথা বলে বটে! কেহ কখনও দাগ ঠিক রেখে নিয়মিত ডোজে খেতে পারছে ? যেটা নেশা—তা দুদিন খেলে—সে তার বশ হবে।—ওসব সর্ব্বনেশে advice.

আমি। আচ্ছা মশায় গাঁজা তো অনেক সাধুরা খায়! কিছু উপকার পায় ব'লে তো খায় ?

গিরীশবাবু। দেখ সাধুর বেশে থাকুক আর যাই থাকুক—যে মানুষ ভেতরে ভেতরে নেশাখোর—সে একটা দোহাই দিয়ে নেশা করে।—শাক্তেরা মদ খান না কারণ করেন, সাধুরা স্বাস্থ্যের জন্য গাঁজা খান বা ভাং খান—কোনও নেশাখোর বলে না যে নেশায় তার শরীর ভাল রাখে না। বরং উল্টো বল্‌বে, যে নেশায় তার স্বাস্থ্য ভাল থাকে, মন একাগ্র হয়—এই সব

বাজে কথা। অবশ্য নেশা মাত্রেই দ্রব্যগুণ আছে। বিষও ঔষধের কাজ করে কিন্তু তা ব'লে কি বিষ কেউ খায় ? জেন—নেশা বিষের মত অপকারী মানুষের পরম শত্রু।

তারপর হেসে বল্‌লেন, কিন্তু তা বলে' তামাক নয়।

আমি। আচ্ছা আপনি তো সব রকম নেশা ক'রেছেন—কোন্‌টাতে কোন কিছু গুণ দেখেছেন ?

গিরীশবাবু। মদের কথা তো তোমাকে বল্লাম। গাঁজাতে দেখেছি ভয়ানক will power বাড়ে। আমি যখন গাঁজা খেয়ে বুঁদ হ'য়েছি তখন বাস্তবিকই will power-এ লোকের রোগ ভাল ক'রেছি। কিন্তু আফিংএর মত ছোটলোক নেশা নেই।

আমি। কিসে ?

গিরীশবাবু। দেখ—আমার শেষ নেশা দাঁড়িয়েছিল—আফিং। এইতো অবিনাশকে দেখ্‌চো—সে ছেলের মত আমাকে করচে দেখ্‌চে।—একদিন কতকগুলো আঙ্গুর কিনে আনা হয়। অবিনাশ—বামুনের ছেলে—আমার কাছে সর্ব্বদা আছে—ওকে চার্‌টে আঙ্গুর দিলাম। কিন্তু দেবার পরক্ষণেই মনে হ'ল—চার্‌টে না দিয়ে দুটো দিলেই হ'ত। তখন মনে মনে বিচার করলাম—মন শালা এত ছোট লোক কেন হ'ল ? ভেবে চিন্তে দেখ্‌লেম আফিংএর এই কায। তখনিই দৃঢ়সংকল্প হ'য়ে আফিং ত্যাগ কর্‌লেম।

আমি। আচ্ছা মশায়—আফিং ত্যাগ কর্‌লেন তাতে আপনার শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত ক'রেনি।

গিরীশবাবু। রাম! ও সব নেশাখোরের কথা। কি জান মন দিয়েই সব। মানুষ এই মনে বদ্ধ এই মনে মুক্ত হচ্ছে। নেশাও তাই।—লোকে বলে মাতালে মদ ছাড়্‌লে, গেঁজেলে গাঁজা ছাড়লে, ভাংখোর ভাং ছাড়্‌লে, আফিংখোর আফিং ছাড়্‌লে হঠাৎ অসুখ করে। ওসব বাজে কথা—মিছে কথা। ঐসব কথা ব'লে ব'লেই মনকে এমন খারাপ ক'রে ফেলে যে নেশাখোর তার নেশা ত্যাগ কর্‌তে ভয় পায়, ত্যাগ করা চুলোয় যাক—কম হ'লে ভয় পায়।—কিন্তু দেখ এই বিষগুলি আমাদের দেশের আপামর সাধারণকে জর্জ্জরিত ক'রেছে।—সরকারের কোটী কোটী টাকা রাজস্ব মুখ বুজে আমরা তুলে দিচ্চি।—আর কি গরীব কি গেরস্ত কি বড় লোক সব সংসারে অশান্তির আগুন জ্বাল্‌চে। পরাধীন জাত—একে দুবেলা দুমুটো ভাত খেতে পায় না—তাতে আবার এই সব বিষ খেয়ে জড়ের মত, পাগলের মত হ'য়ে যাচ্চে—কত সংসার অনাথ হচ্চে—কত দুখিনী অনাহারে মর্‌চে। বীভৎস কাজ—অতি দুঃসাহসিক criminal কাজ—সব এই নেশায় হচ্চে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌চি, আমাদের দেশের অন্ততঃ আট আনা সুখ-সৌভাগ্য নষ্ট করেছে এই পাপ নেশা।

আমি। আচ্ছা আপনার এখন কখনও কখনও কোনও নেশা কর্‌তে ইচ্ছে হয় না।

গিরীশবাবু। ঠাকুরের ইচ্ছেয় হয় না। দেখ, জীবনে অনেক অকাজ কুকাজ ক'রেছি—জেন কোনও পাপ করতে আমার বাকী নেই—সর্ব্বরকম হ'য়েছে। কিন্তু তাই আমার গৌরবের বিষয় হয়েছে। এই ধুলোকাদা মেখেই আমি ঠাকুরের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছি—তাঁর নিষ্পাপ পুণ্যবান সন্তানেরা আছে—তাঁদের তিনি পথ দেখিয়ে চলুন। কিন্তু আমার এই ধুলোকাদা মহাপাপ ব্যভিচার জাল জুয়াচুরী—সব নিয়ে—কলঙ্ক মেখে তাঁর সাম্‌নে এই গৌরব ক'রে দাঁড়িয়েছি "প্রভু, আমার নিজের কোনও গৌরব নেই—গর্ব্ব নেই—গৌরব ও গর্ব্ব আছে যে পাপ করতে আমি কিছু বাকি রাখিনি—এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা পুঁছে নেও তো নেও—নইলে আমার আর কিছু উপায় নেই।" প্রভু সে কথা শুনেছেন—তাই অহেতুকী দয়াময় বকলম্ নিয়েছেন।—পূর্ব্বকার পাপ কাহিনীর কথা আমার মুখে বারবার শুনে খেলার মত স্তান করিয়ে দিয়ে আনন্দ দান ক'রেছেন।—এখন কি দেখ্‌চি জান—যত নেশাই করনা কেন—ভগবৎপ্রসঙ্গের নেশা—তাঁর স্মরণ মননের নেশার এক বিন্দুর সঙ্গে পরিমাণ হ'তে পারে না! এমন নেশা থাক্‌তে লোকে ঐ ছাইভস্ম খেয়ে নস্ট হচ্চে। ভারতবাসী—সমস্ত জগতের লোক এই আনন্দের নেশায় মেতে উঠুক—তবে ঐসব ছাইভস্ম দূর হয়ে যাবে।—এই মদ ভাং গাজা আফিং প্রভৃতির নেশার বিষ যতদিন থাক্‌বে—ততদিন জাতীয় জীবনে চেতনা সঞ্চার করা অসম্ভব। স্বাধীন জাত চীন এই পাপ বিষে জর্জ্জরিত। ভারতবর্ষের চেয়েও তাদের অবস্থা আশাপ্রদ নয়।—"মায়াবসানে" তাই আমি বারম্বার এই সব তুলে দিতে বলেছি। কংগ্রেস যদি এই কাজটাও নিদেন উঠে পড়ে করতো!

এমন সময়ে ডাক্তার কাঞ্জিলাল এলেন। আবার মোহনবাগানের ফুটবল খেলার কথা উঠ্‌লো। খেলায় ভাদুড়ী ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য খেলোয়াড়েরা কেমন আশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে ডাক্তার তাহা সবিস্তারে বর্ণনা কর্‌লেন।

এই খেলার প্রসঙ্গে গিরীশবাবুর অসীম উৎসাহ এবং আনন্দ দেখে অনেকেই অবাক হলেন।

পরে ডাক্তারের সঙ্গে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা সম্বন্ধে বিচার চল্‌তে লাগ্‌ল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল তখন পূরাদস্তুর এলোপ্যাথ—তিনি তখন হোমিওপ্যাথাকে un-scientific ব'লে উড়িয়ে দিতেন।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল বল্লেন "মশায়, যার ত্রিশ ডাইলুশনে কোনও অস্তিত্ব থাকে না, তার আবার ১০০, হাজার ডাইলুশন।

গিরীশবাবু। কি ক'রে জান্‌লে ত্রিশ ডাইলুশনে তার কোনও অস্তিত্ব থাকে না।

কাঞ্জিলাল। Examine কর্‌লে বোঝা যায়।

গিরীশবাবু। আমি যদি বলি এই সব ডাইলুশন পরীক্ষা কর্‌বার সূক্ষ্ম যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি! বিজ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ।

কাঞ্জিলাল। যখন সে রকম সূক্ষ্ম যন্ত্র বেরুবে তখন হোমিওপ্যাথী ঔষধ পরীক্ষা ক'রে দেখা যাবে। এখন যা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর—তার উপর চিকিৎসা নির্ভর করা কি আহাম্মুকী নয়?

গিরীশবাবু। (বিরক্ত ভাবে) তোমার মাথায় কেবল গোবর পোরা, তোমাকে বোঝাব কি? একদিন এমন দিন আস্‌বে যখন এই হোমিওপ্যাথীকে তুমি মহা scientific বলে মনে কর্‌বে।

কাঞ্জিলাল। ঔষধের কেমন efficacy! একশিশি খেলেও কিছু হবে না। যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ বাক্স শুদ্ধ খেলে কোনও অনিষ্ট হবে না সেই ঔষধ এক ফোঁটা খেলে সব রোগ আরাম হবে। তার চেয়ে জলপড়া খাওয়ালে হয়। সেই হ্যানিমানের বিলাতী ছাপ থাক্‌বে না, একেবারে খাঁটী স্বদেশী। লোকের কোনও খরচা লাগ্‌বে না।

গিরীশবাবু। কে বল্‌লে তোমাকে হোমিওপ্যাথা ঔষধে খারাপ করে না। এক ফোঁটা by mistake যদি কোনও ঔষধ দেওয়া হয় তাতে যা অনিষ্ট হয়, তোমার এক বাক্স এলোপ্যাথী ঔষধে তেমন অপকার হয় না।—তোমাদের এলোপ্যাথী ঔষধে কেবল বাহ্যিক ক্রিয়া দেখাবে—তাও temporary—কিন্তু হোমিওপ্যাথীর এক ফোঁটা ঔষধের অপপ্রয়োগে whole constitution undermine কর্‌বে। যে ঔষধে ভাল কর্‌তে পারে—তার অপপ্রয়োগ হ'লে আবার অনিষ্ট কর্‌তে পারে।...এই ভাল মন্দ দুইটী শক্তি যদি কোনও ঔষধে না থাকে তবে তা ঔষধ নয়।

আমি। (ডাক্তারের প্রতি) অনর্থক এসব বাজে তর্কে কি হবে। তার চেয়ে ওঁর কথা শোনা যাক্।

কাঞ্জিলাল। কিন্তু মশায় হোমিওপ্যাথীর এখনও কোন sceintific basis নেই।

গিরীশবাবু। প্রত্যক্ষ ফল দেখেও যদি তা না মান তবে আমি কি কর্‌বো!

আমি। মশায় আমি কিন্তু ডাক্তার ইউনানের এক আশ্চর্য্য চিকিৎসা কৌশল দেখে ছিলাম। আমার একটী মামাতো বোনের malignant type-এর dysentery হয়। ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী এবং আমাদের ডাক্তার সতীশ বরাট দেখে কিছুই কর্‌তে পারেন নি—এমন কি সুপ্রসিদ্ধ মহানন্দ গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে আনা হ'ল—তিনি মুমূর্ষু দেখে চিকিৎসার ভার নিলেন না—এই রকম জীবনমরণের সন্ধিস্থলে ডাক্তার ইউনানকে call দিতে ডাক্তার বরাট পরামর্শ দিলেন। ইউনান সাহেব এসে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা কর্‌লেন—পরে নিজের বাক্স থেকে একটী ঔষধ বার কর্‌লেন। ডাক্তার বরাট নানান ঔষধের নাম suggest

কর্‌তে লাগ্‌লেন কিন্তু ডাক্তার ইউনান সাহেব মাথা নেড়ে বল্‌লেন "না—না সতীশ —আমি নূতন ঔষধ দিচ্ছি।" ডাক্তার সাহেব নিজের হাতে এক চামচ ঔষধ খাইয়ে দিলেন —আশ্চর্য্যের বিষয় প্রায় দুই ঘণ্টা পর রোগীর এমন অবস্থা হল যে কে বল্‌বে যে তার জীবন নিয়ে টানাটানি হচ্চিল—তার stool-এর character প্রায় natural হল, ব্যথা কোথায় চ'লে গেল—যেন একটা ম্যাজিকের মত কাজ কর্‌লে। আমার মামা যখন ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে গেলেন তখন Dr. Younan বল্‌লেন "Dr. Hahneman-কে ধন্যবাদ দাও—যিনি হোমিওপ্যাথীর আবিষ্কর্ত্তা।"

গিরীশবাবু। কি নূতন ঔষধ দিয়েছিলেন তুমি বল্‌তে পার কি?

আমি। হ্যাঁ—ডাক্তার ইউনান ধন্যবাদ দিবার সময় আমার মামাকে ব'লেছিলেন— Cuinabar 200.

গিরীশবাবু। (ব্যস্ত ভাবে) ঐ দক্ষিণ ধারের আলমারীর second shelf-এ তোমার বাঁ দিকের পাঁচখানা বইয়ের পর যে বই খানি আছে তা আন দিকি।

আমি উঠে সেই বইখানি এনে গিরীশবাবুর সম্মুখে রাখ্‌লাম। কাঞ্জিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কি বই? আমি বল্‌লেম—একখানি হোমিওপ্যাথী বই।

গিরীশবাবু। (হাসিয়া) ডাক্তার—তোমার ঐ unscientific বইতে দরকার কি?— আচ্ছা তুমি ঐ বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠা বের কর দেখি।

আমি ঐ বইটীর ৮১ পৃষ্ঠা বের কর্‌লাম।

গিরীশবাবু আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে "ঐ ৮১ পৃষ্ঠার ৭ ছত্রের পর কি লেখা আছে পড় দেখি।"

আমি পড়্‌লাম বড় অক্ষরে হেডিংয়ে একটী লাটিন শব্দ ব্র্যাকেটে লেখা আছে Cuinabar—ঔষধের গুণের মধ্যে লেখা আছে যে ইহা Dysentery-র একটী মহৌষধ।

আমার পড়ার পর গিরীশবাবু বল্‌লেন "দেখ—নূতন ঔষধ নয়।"

কিন্তু উপস্থিত আমরা সকলেই গিরীশবাবুর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। আমি সবিস্ময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "মশায়, বইখানি দেখ্‌লে মনে হয় না যে কেউ পড়েছে! কিন্তু আপনি কেমন ক'রে বল্‌লেন যে এই বইয়ের এত পৃষ্ঠায় এত ছত্রের পরে cuinabar-এর কথা আছে। এমন কি আলমারীতে কোন্ জায়গায় বইখানি আছে তাও পর্য্যন্ত বল্‌লেন কি ক'রে।

গিরীশ বাবু। কেন—এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আলমারীতে বই রয়েছে তা তো দেখ্‌চি। আর এত detail মনে আছে কেমন ক'রে তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছো—তার কারণ আমি কখনও দাগ দিয়ে পড়িনি।

আমি। এর মানে ?

গিরীশবাবু। দেখেছো তো—বাড়ীর চাকর বা দাসী বাজারে যায়—তাকে টাকা দিয়ে বাড়ীর গিন্নি বলে সিকি পয়সার অমুক জিনিষ—আধ্‌লার অমুক জিনিষ—আড়াই পয়সার অমুক জিনিষ—এমনি করে একটী টাকা বা দুটী টাকার বাজার কর্‌তে দেওয়া হয়,—চাকর বা দাসী ঠিক বাজার ক'রে এনে ক্ষুদেকুনে তোমাকে হিসেব বুঝিয়ে দেয়।—আর তুমি যখন বাজারে যাও—কাগজে ফর্দ্দ ক'রে যথারীতি লিখে নাও। কিন্তু বাজারে কি কর ? প্রত্যেক জিনিষ কেন্‌বার সময় সেই ফর্দ্দ বের ক'র্‌চো আর পড়্‌চো আর তাই মনে ক'রে বাজার ক'র্‌চো, হয় তো বা একটু অন্যমনস্কে ২।১টা জিনিষ আন্‌তেই ভুল হ'ল।—দাগ দিয়ে পড়ায় তেমনি তুমি তোমার memory-কে দেগে একটা limit ক'রে দিলে—আসল জিনিষ আর মনে থাক্‌বার চেষ্টা থাকে না।—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। এ তুমিও পার আমিও পারি।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও আমি উভয়ে একযোগে বল্‌লাম "অসম্ভব! আমাদের শক্তিতে কুলাবে না।"

গিরীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "সম্ভব অসম্ভব—সব একেবারে জেনে ফেলেছ। মানুষের ভেতর কি যে সম্ভব হয় আর কি যে অসম্ভব হয়—তা আজও পর্য্যন্ত আমি ঠাউরে ঠিক করতে পারি নি। তিনি কখন কার ভিতর কি খেলা খেলেন তা বলা বড় শক্ত। আমি দেখি কি জান—কি এক খেলার শক্তি বলে ঠিক জোট-পাট হয় না! যে উকীল হ'লে ভাল হত-সে হয় তো হ'ল কেরাণী, যে ধর্ম্মপ্রচারক হ'লে কৃতকার্য্য হ'ত সে হয় তো হ'ল ইঞ্জিনিয়ার। যে চাষ আবাদ কর্‌লে ভাল হ'ত সে হয় তো হ'ল ডাক্তার, আর যে মুদীর দোকান দিলে ভাল হ'ত সে হয় তো হ'ল গ্রন্থকার, যে ব্যবসা কর্‌লে উন্নতি লাভ কর্‌তো সে হয় তো হ'ল রাজনৈতিক বক্তা। এই রকম জোটপাট! স্ত্রী-ভাগ্যও মানুষের সেই রকম জোটে।—এই একটা আঁদুলি দিয়ে এক বিরাট খেলা চল্‌চে।—তোমার যে রকম স্ত্রী হ'লে যেমন মিল হ'ত—তা গেল শ্যামের ভাগ্যে—আবার শ্যামের যেমন স্ত্রী হ'লে মিল হ'ত সে হয় তো হ'ল রামের স্ত্রী। এই নিয়ে প্রায় দাম্পত্য প্রণয়ের অশান্তি। তবে কি জান—মহামায়ার মায়া এটাই সংসারকে complex করেছে নানাভাব জাগিয়ে তুল্‌ছে—এই নিয়ে সংসারের অবিরাম গতি চলেছে। কোটী কোটীর ভিতর হয় তো একটী ঠিক জোটপাট হয়—সেখানে কৃতকার্য্যতা অনাবিল দাম্পত্যপ্রেম—সংসারের শান্তি দেখ্‌বে।

কাঞ্জিলাল। তবে ঈশ্বর কি এই অসম্পূর্ণভাবে জগত সৃষ্টি ক'রেছেন!

গিরীশবাবু। অসম্পূর্ণ কেন—এই তো খেলা! এই তো প্রকৃতির লীলা! এটাই তো প্রকৃতির রীতি! যদি সব ঠিক ঠিক জোটপাট হ'ত—তবে সংসারের খেলা কি চল্‌তো—এত বৈচিত্র্য কি ঘট্‌তো? এই বিচিত্রতাই তো সৃষ্টি!—রূপ দিয়ে অরূপের খেলা! বৈচিত্র্যের

ভিতর ঐক্যের সূত্র! অসম্পূর্ণতার মাঝে পূর্ণের পরিপূর্ণতা! অজ্ঞানতার আবরণে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ!

আমি। সেদিন রবিবাবুর "রূপ ও অরূপ" ব'লে প্রবাসীতে গবেষণাপূর্ণ একটী প্রবন্ধ পড়্‌লাম। কিন্তু তিনি পরমহংসদেবের নাম স্পষ্টতঃ না কর্‌লেও এক রকম উল্লেখ ক'রেছেন আর ভাব হিসেবে তাঁকে কিছু আক্রমণ ও কটাক্ষ করেছেন।

গিরীশবাবু। রবিবাবু ঠাকুরকে আক্রমণ ক'রেছেন? কেন?

আমি। তিনি ব'লেছেন বিদেশী ভাবুকেরা প্রতিমা পূজার সম্বন্ধে যে ভাবের কথা ব'লে থাকেন—তাঁরা ভাবুক, তাঁরা পূজক নন। তাঁরা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্ত্তিকে দেখ্‌ছেন ততক্ষণ তাঁরা চরম ক'রে দেখেন না। কিন্তু যাঁরা পূজক তাঁরা বিশেষ মূর্ত্তিকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন ক'রেছেন। জ্ঞান স্বরূপ অনন্তের এই একটীমাত্র রূপকেই চরম ক'রে দেখ্‌ছেন। তাঁদের ধারণাকে তাঁদের ভক্তিকে বিশেষ রূপের বন্ধন থেকে মুক্ত কর্‌তে পারেন না।

কাঞ্জিলাল। কিন্তু ঠাকুরের কথা রবিবাবু কি বলেছেন?

আমি। তিনি ব'লেছেন যে এই রূপের বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্য্যন্ত বন্দী করে—তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি লিখেছেন যে তিনি শুনেছেন যে শক্তি উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালার সিংহকে বিশেষ ক'রে দেখ্‌বার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ ক'রেছিলেন—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন।" রবিবাবু বলেন যে শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা কর্‌তে দোষ নেই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে দেখ্‌লে কল্পনার মহত্ত্বই চ'লে যায়। কেননা যে কল্পনা—সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ দেখায় সেই কল্পনা সিংহে শেষ হয় না ব'লে তার রূপ উদ্ভাবনকে সত্যি ব'লে গ্রহণ করা যায়—যদি তা কোন এক জায়গায় এসে বদ্ধ হয় তবে তা মিথ্যে—মানুষের শত্রু।

গিরীশবাবু। যাক্। এখানে সিঙ্গিকে শক্তিরূপে দেখা হ'ল কোথায়?

আমি। ঐযে পরমহংসদেব ব'লেছিলেন সিংহ মায়ের বাহন!

গিরীশবাবু। এর মানে কি সিঙ্গিই সেই মহাশক্তির রূপ? তুমি যে ব'ল্লে রবিবাবু ব'লেছেন যে শক্তিকে সিঙ্গি রূপে কল্পনা ক'র্‌তে দোষ নেই কিন্তু সিঙ্গিকেই শক্তিরূপে দেখ্‌লে কল্পনার মহত্ত্ব চ'লেই যায়।—এটা যে কি তা তিনি বোধ হয় নিজেই ভাল ক'রে বুঝে প্রকাশ কর্‌তে পারেন নি। তাঁর বল্‌বার উদ্দেশ্য কি সিঙ্গিকে শক্তির প্রতীক ব'লে কল্পনা ক'র্‌তে পার কিন্তু সিঙ্গিই শক্তির রূপ এ কল্পনা কর্‌লেই দোষ? এর মানে কি? সিংহ মায়ের বাহন—এর ভিতর তার কি সম্বন্ধ?—কোনও হিন্দু কি কখনও সিংহই স্বয়ং মহাশক্তি ব'লে কল্পনা ক'রে থাকে?—পূজা করা তো দূরে থাক্।

আমি।—রবিবাবু প্রতিমার পূজাকেই দোষ দিচ্ছেন—মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরম শত্রু মনে করছেন এবং পূজাকে ভাবের কল্পনা ব'লে স্বীকার করতে চান না।

কাঞ্জিলাল। কেন? সাধকদের হিতের জন্য তো ব্রহ্মের রূপ কল্পনা হয়েছে!

আমি। রবিবাবু বলেন যে সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করতে থাকে—তা বদ্ধ রূপ নয়—তা একরূপ নয়—তা প্রবহমান—তা বহু।—কিন্তু সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখন কোনো বিশেষ দেশকালপাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে তা বদ্ধ করতে যায়, তখনি তা সত্য সুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত ক'রে মানুষ অবনতির পথে যায়!

গিরীশবাবু। হিন্দুও তাই ভগবদ্ বিগ্রহের রূপকে নিত্য রূপ ব'লে মনে করে—কেননা তা সত্য সুন্দর মঙ্গলকে ব্যক্ত করতে থাকে—তা বদ্ধরূপ নয়—তা একরূপ নয়—অনন্তের অনন্তরূপ।—শুধু রূপকে তো একটা জড় রূপ ব'লে পূজা করা হয় না—সেই রূপের ভেতর অরূপের পূজা হয়। মৃন্ময় প্রস্তর কিম্বা ধাতুনির্ম্মিত বিগ্রহকে সেবক চিন্ময় ভাবে গ্রহণ করে। পূজা তো কল্পনা ছাড়া নয়।—তা তো প্রবহমান—তার শক্তি নানামুখী।—ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, এটা তো সবাই জানে। ভাব ছাড়া পূজা কোথায়? ভাব দিয়ে—কল্পনা দিয়ে—পূজো হয়। শুধু জড়রূপ জড়বস্তু আর জড়চক্ষুর সম্বন্ধ নয়।

আমি। রবিবাবু তা স্বীকার করতে চান না। তিনি বলেন যে শিক্ষিত লোক যখন প্রতিমা পূজাকে সমর্থন করেন তখন তিনি ব'লে থাকেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছু নয় ভাবকে রূপ দেওয়া। মানুষের ভিতর যে বৃত্তি—শিল্প সাহিত্যের সৃষ্টি করে—প্রতিমা পূজাও তেম্নি যেন একটা বৃত্তির কাজ! সেটা একেবারে মিছে কথা! কে বল্লে? সাহিত্যশিল্পকলা সত্যশিব সুন্দরকে কি নির্দ্দেশ করে না? তবে রস ও আনন্দ কোথা থেকে আসে?

গিরীশবাবু। কি বল্ছো?—রবিবাবু কি লিখেছেন?

আমি। তিনি তাঁর "রূপ ও অরূপে" বলেছিলেন যে দেবমূর্ত্তিকে উপাসক কখনও সাহিত্য হিসেবে দেখেন না।

গিরীশবাবু।—এটা সবাই জানে—এ কাউকে ব'লে দিতে হয় না। কিন্তু বৃত্তি—ভাবকে রূপ দেওয়া কিনা বল্‌ছিলে?

আমি।—রবিবাবু তাঁর প্রবন্ধে ব'লেছন যে প্রতিমা—ভাবকে রূপ দেওয়া নয়। তিনি দেবমূর্ত্তির কল্পনা আর সাহিত্যের কল্পনা এক নয় ব'লেছেন। কেননা কল্পনাকে মুক্তি দেবার জন্য—সাহিত্যে রূপের সৃষ্টি আর দেবমূর্ত্তি কল্পনাকে বদ্ধ করবার জন্য।

গিরীশবাবু। সেটা কি বুঝিয়েছেন?

আমি। তিনি বলেন কল্পনাকে তখনই কল্পনা ব'লে জানা যায় যখন তার প্রবাহ থাকে—যখন তার গতি থাকে—যখন তার সীমা কঠিন থাকে না—তখনি কল্পনা সত্যি কাজ ক'রে।

গিরীশবাবু। সে সত্যি কাজটা কি ?

আমি। সেই কাজ—রবিবাবু বলেন সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দ্দেশ করা।

গিরীশবাবু। এটা ঠিক কথা। কিন্তু কল্পনা—কল্পনা। সাহিত্যে, শিল্পে যে কল্পনা সত্যশিব সুন্দরকে নির্দ্দেশ করে—দেবপূজকও সেই কল্পনার অনুগামী হ'য়ে তার ইষ্টচিন্তা করে।—সেই সত্য শিব মঙ্গলের ধ্যান করে। পূজোর মন্ত্র অনুষ্ঠান পদ্ধতি কি শুধু জড় বস্তুকে নির্দ্দেশ করে ?—সেই সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তির উদ্বোধন করে না ? –আবাহন—প্রাণ প্রতিষ্ঠা তবে কি ?

আমি। কিন্তু কল্পনা যখন থেমে গিয়ে কেবল মাত্র একটা রূপেই একান্তভাবে আবদ্ধ থাকে —তখন আর রূপের অনন্ত সত্যকে দেখায় না—রবিবাবু তাই বলেছেন।

গিরীশ বাবু। কল্পনা থামে কোথায় ? হিন্দুর প্রতিমা পূজায় যে রূপকে ভাব দেওয়া হয়নি আর কল্পনায় সে সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দ্দেশ করেনা—তা তিনি জানলেন কি করে ? হিন্দুর দেবমূর্ত্তির রূপ যে সত্য সুন্দর শিবকে ব্যক্ত করবার উদ্দেশ্যে নয়—তা তিনি জান্‌লেন কি করে ? সে সাধনা কি তিনি ক'রে দেখেছেন ? আর—তিনি একজন এত বড় কবি—তিনি কি জানেন না যে ভাবে রূপ ফুটে উঠে ?—ভাব যে সর্ব্বদা প্রবহমান। রূপে যে ভাব ফুটে উঠে তাতো একান্তভাবে কোথাও বদ্ধ হ'তে পারেনা।

আমি। রবিবাবু তাঁর "রূপ ও অরূপ" প্রবন্ধেই স্বীকার ক'রেছেন সাহিত্য শিল্প কলার ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না ;—তাতে নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকে। তাই প্রতিভাকে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি" বলা হয়। প্রতিভা রূপের ভিতর বন্দী থাকে না—তার কাজ শুধু রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করা।—এই জন্য প্রতিভার নব নব উন্মেষের শক্তি থাকা চাই।

গিরীশবাবু। যে কোন সাধক—প্রতিমাপূজক সাধকের সাধন কাহিনী—আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় সাধকের পূজা—রূপ দিয়ে সাধকের চিত্তকে বিকাশ করে—নিত্যি নূতন ভাবে—নূতন কল্পনার প্রবাহে। সাধক পূজক তাই দেবমূর্ত্তিতে নিতুই নব ভাবে উন্মত্ত হয়। কল্পনা ছাড়া কি পূজা কখনও করা যায় ? মানস-পূজাটা কি ? মানস ধ্যান কি ? ভাব ছাড়া কি ভাবময়কে ভাবা যায় ! রবিবাবুর মত ভাবুক কবি যে রূপে অরূপের সন্ধান পান না, ব্যক্তের ভিতর অব্যক্তের আভাষ দেখ্‌তে পান না—এটাই বেশী আশ্চর্য্য।—আর ঠাকুরের সাধনার উপর ভাবের উপর রবিবাবুর এই নিরর্থক কটাক্ষ—একেবারে হাওয়ার উপর তাঁর কবি-কল্পনা ! যিনি জগতের প্রত্যেক পদার্থকে সেই ব্রহ্মবস্তু—মহাশক্তির বিকাশ দেখ্‌তেন, মহাভাবে সর্ব্বদা সমাধিস্থ থাক্‌তেন, শ্যামল তৃণরাশি পদদলিত দেখ্‌লে যিনি নিজের দেহে বেদনা বোধ কর্‌তেন, কোনও মূর্ত্তি, কোনও মন্দির—সৃষ্টির যে কোন স্থানে শক্তির—ভাবের বিশেষ দেখ্‌লে, যিনি তৎক্ষণাৎ অরূপের ভাব সাগরে ডুবে যেতেন—ব্রাহ্ম ভক্তেরাও যাঁকে

একাধারে শাক্ত বৈষ্ণব বৈদান্তিক যোগী বলে নির্দ্দেশ করেন—তাঁকে শুধু শক্তি উপাসক ভক্ত ব'লে উল্লেখ করা উদারতার পরিচায়ক হয় নি। কেশববাবুর মত মহাপুরুষ নিরাকার সাধকও যাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাব দেখে—যাঁর অনুসরণ ক'রে নিজের ভাবে মিশিয়ে নব বিধান প্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন—তাঁকে একজন শাক্ত ভক্ত বলা সমীচীন হয় নি। কবিত্বের অনুভূতি আর ব্রহ্মানুভূতি এক নয়।—কিন্তু তিনি যে পরমহংসদেবের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—তাও সম্পূর্ণ ভুল। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়কে বলেছিলেন মায়ের বাহন দেখ্‌লাম—আর কি দেখ্‌বো।—তার অর্থ কি রবিবাবু এমন নিজের মনগড়াভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারেন ? তাঁকে পশুশালায় নিয়ে গিয়েছিলেন—তাতে সিঙ্গিকে দেখে ব'লেছিলেন "মায়ের বাহন পশুরাজ দেখ্‌লাম—আর কি ?" যেমন সূর্য্যের আলো দেখ্‌লে জোনাকীর আলো কে দেখ্‌তে চায়—ঠাকুর সেইভাবে অন্য পশু দেখ্‌তে যান নি। যিনি নিখিল পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্ব বস্তুতে বিশেষ বিশেষ শক্তি প্রকাশকে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখ্‌তেন, সেইভাবে যিনি সর্ব্ব খল্বিদং ব্রহ্ম দর্শন কর্‌তেন—তাঁর সেই অনুভূতির দোষ দেখানো যিনি যত বড় সাহিত্যিক হন না কেন তা তাঁর অনধিকারচর্চ্চা।

আমি। কিন্তু বিচার কর্‌তে দোষ কি !

গিরীশবাবু।—বিচার কর্‌তে হ'লে আগে তাঁর জীবন আগাগোড়া আলোচনা কর্‌তে হয়।—তাঁর কিছু জান্‌লাম না—আর মাঝ খান থেকে একটা কথা টেনে নিয়ে বিকৃত ব্যাখ্যা করা সত্যানুসন্ধিৎসা বলে না। আর তিনি যখন কবি তিনি তো নিজে প্রত্যহ এই প্রকৃতির ভিতর রূপের পূজা করে থাকেন। শিবের রূপে প্রকৃতির রূপ গড়ে কবিতা রচনা তা কি রূপের পূজা নয় ? অধিকারীভেদে কেহ ক্ষুদ্র রূপে তন্ময়—কেহ বিরাট রূপে তন্ময় !—কিন্তু অরূপ সাগরে যেতে গেলে সেই রূপের ভিতর দিয়ে সেই রূপের পূজা ক'রে অরূপকে খুঁজ্‌তে হবে—সেই রূপ দিয়ে অরূপকে পেতে হবে। সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে রূপ জেগে ওঠে—সেই রূপ অসীম বিরাট হ'য়ে অরূপে মিলিয়ে যায় !—যেরূপ সেই অরূপে নিয়ে যায়—তা নিত্য—কেননা তার ভাবে কল্পনায় সেই সত্য শিব সুন্দরকে ব্যক্ত কর্‌তে থাকে।

সবাই জ্ঞান জ্ঞান করে। কিন্তু একদিন আমি ঠাকুরের শ্রীমুখে এই জ্ঞানের আভাষ পেয়েছিলাম। তিনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—অনন্ত চিদানন্দ সাগর তার হিল্লোল কল্লোল শুনে নারদাদি বিভোর, শুক সনক তটে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত—মহাদেব তিনগণ্ডূষ জলপানে শবের মত পড়ে আছেন—এই যখন বল্‌লেন তখন আমার মাথার ভিতর সেই অসীম অনন্তের একটা ধারণা হ'তে লাগ্‌লো—আমার মাথা **reel** কর্‌তে লাগলো—আমার পরম শত্রুও বোধ হয় আমার **intellectual power**-এ সন্দিহান হবে না ; কিন্তু আমি সেই—অসীম অনন্ত বিরাট ভাব ধারণা কর্‌তে পারলাম না। আমি যখন ঠাকুরকে বলতে যাচ্চি আর ধারণা করতে পার্‌চিনি তখন চেয়ে দেখি নিজে তিনি

দাঁড়িয়ে দিগম্বর সমাধিস্থ—কে চিনেছে তাঁকে—কে বুঝ্‌তে পারে তাঁকে ? এইসব সত্যকার অনুভূতি **artificial intellectual jugglery** নয়। বলিতে বলিতে গিরীশবাবুর মুখ আরক্ত বর্ণ হল। তিনি বল্‌লেন "দেখ সকলের চেয়ে আমি ঘৃণা করি প্রতিষ্ঠা আর হাততালি। এতে মানুষকে এত দাম্ভিক ও হীন করে তা বলা যায় না। যখন চৈতন্যলীলা অভিনীত হয় তখন অনেক বৈষ্ণব বাবাজী এই হলঘরে আমাকে বেষ্টন করে থাক্‌তেন।—কেহ বল্‌ছেন আমার ভিতর নিত্যানন্দের শক্তি আবির্ভূত হয়েছে, কেহ বল্‌ছেন যে আমি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র—এইরকম সম্মান দেখিয়ে আমাকে জ্বালাতন ক'রে তুল্‌লে। —আমি দেখি আমার কাজের বিশেষ বিঘ্ন। আর এই সব প্রশংসা সম্মান আমার শরীরে জ্বালা উৎপাদন কর্‌তো—শেষ ঠাউরালাম এই সব দলকে এখান থেকে তাড়াতে হ'বে। একদিন এইরকম বৈষ্ণব বাবাজীতে এই হলঘর ভর্ত্তি। আমি মদের বোতল খুলে গেলাসে ঢাল্‌লাম—একজন বাবাজী জিজ্ঞেস কর্‌লেন "কি খাচ্চেন, ও কি মহাপ্রভুর চরণামৃত !" আমি বল্লাম—"না—মদ, আপনি খাবেন ?" —তখন সকলে ভয়ে "রাম রাম" ব'লে স'রে পড়্‌লো। সেইদিন থেকে সে দল আর এমুখো হয় নি—আমিও বাঁচ্‌লাম। এইতো একটু মান প্রতিষ্ঠা। তাতেই আমরা মনে করি যে আমরা জগতের মহাপুরুষদের অনুভূতির পরিমাণ কর্‌তে পারি !"

কাঞ্জিলাল। কিন্তু মশায় এটাই সকলের ভিতর সাধারণতঃ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।—তারা মনে করে যেন সমস্ত প্রতিভা সমস্ত অনুভূতি তাদের করায়ত্ত।

গিরীশবাবু। অজ্ঞানতার দাম্ভিকতার পরিচয়ই এই ! এই দেখ না—এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড —অনন্ত আকাশের দিকে তাকালে নিজেকে একটা ক্ষুদ্র কীটাণুকীট মনে হয়, আর আমরা ঠিক কর্‌তে যাই এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কেউ আছে কি না !—যিনি সর্ব্বশক্তিমান তাঁর শক্তির আমরা সীমা কর্‌তে যাই ! যিনি অণুর অণু—আবার বিরাট মহান্‌,—যিনি অনন্ত, যিনি সমস্ত ভাবের, রূপের রসের আধার—তাঁকে আমরা বোঝাতে যাই—এই হ'লে পাওয়া যাবে আর এই হ'লে পাওয়া যাবে না ! যিনি শাশ্বত কবি মহামনিষী, স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ—কত আদি কবি—মহাকবি—ছন্দে স্বরে—ভাবে সেই কবিকে ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌চে না, মনীষায় প্রতিভায় যে মহামনীষী তত্ত্ব পায় না—যে পরম রসিকের এক ছিটে রসে সাহিত্য ভরপুর হ'য়ে যায়—কে তার সীমা কর্‌বে ? তাই রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

"মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধর্ত্তে পারে।"

কে তাঁকে বোঝাবে আর কে বুঝ্‌বে ? আরাম কেদারায় ব'সে ঠাকুরের ভাব বোঝা যায়

না। তিনি ভাবঘনমূর্ত্তি ছিলেন—সেই ভাবের ভাবুক না হ'লে কে তাঁর ভাব ধর্‌তে পারে ?

আমি। রামানুজ শ্রীচৈতন্য, মাধবেন্দ্রপুরী, রূপ সনাতন রামপ্রসাদ যত মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন—তাঁরা সকলেই দেবমূর্ত্তি স্বীকার কর্‌তেন, কেহ কেহ সেবা পূজা কর্‌তেন—রবিবাবু বল্‌তে চান—তাঁরা সকলেই রূপে বদ্ধ ছিলেন—তাঁরা কেহই শিবসুন্দর সত্যকে ধর্‌তে পারেন নি ! কেননা ঠাকুরের এই ভাবকে কটাক্ষ করা মানেই তাই !

গিরীশবাবু। ঠাকুর সব ভাবের আধার ছিলেন। তাই তিনি সব ভাবের সাধনা ক'রেছিলেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—শাক্ত বৈষ্ণব সাকারবাদী নিরাকারবাদী—সকলেই তাঁর অদ্ভুতভাবে বিস্মিত হ'য়েছেন।—সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়—অর্থাৎ সব ধর্ম্মই সেই এক মহাশক্তির উপাসনা —সব ধর্ম্মই সত্য—সব ধর্ম্মেই তাঁকে পাওয়া যায়।—এই মহাবাণীই এই যুগের যুগবাণী। India's message to the world—এই প্রেম ও শান্তির বাণী! জগতের ভাবী সভ্যতা এই মহাবাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত হ'বে। বিদ্রোহিতা, অবজ্ঞা, পরধর্ম্ম দ্বেষ—এ যুগে টিঁক্‌বে না। যিনিই হোন্—হিন্দু, ব্রাহ্ম খৃষ্টান মুসলমান—সংকীর্ণতার গণ্ডী ছেড়ে তাঁকে যেতে হবে—পর-মত-অসহিষ্ণুতা ত্যাগ কর্‌তে হবে। প্রেমে উদারতায় সবাইকে আলিঙ্গন কর্‌তে হবে।—যিনি এই পরম প্রেমের জীবন্ত মূর্ত্তিকে চিন্‌তে পারেন নি—তিনি যিনিই হোন্—সাধু হোন্, কবি হোন্ দার্শনিক হোন্, রাজনীতিজ্ঞ হোন্—যিনিই হোন—তিনি এই যুগের যথার্থ বাণী দিতে পার্‌বেন না—জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে—স্থায়ী দান কর্‌তে পার্‌বেন না !

গিরীশবাবু নিস্তব্ধ হ'য়ে গম্ভীরভাবে ব'সে রইলেন। আমরা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ কর্‌লেম।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

চিত্র

বিচিত্রে চিত্রিতে চাই পটে পটে ফলকে ফলকে।
কম্পিত চঞ্চল তূলি দিশাহারা পলকে পলকে।
বর্ণসার পর্ণগুলি ; কোথা বল তরু, গুল্ম, লতা !
স্বপ্নে রাঙ্গা যেন নানা ভাঙ্গাচোরা কথা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ *

এই জায়গার সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি জড়িত। উত্তরে একটু তফাতে তিন কুড়ি বৎসর আগে আমাদের মাইনর স্কুল ছিল। মাঠের ভিতর বলে তাকে "মাঠের স্কুল" বলিত। আমার কত সহাধ্যায়ী ছিলেন; কাটীপাড়ার যোগেন্দ্রনাথ বসু (তোমাদের স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) অতুলবাবু সবাই এক সঙ্গে পড়েছি। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে মনে কত ভাব হয়, হিংসা হয়, পড়তে ইচ্ছা করে। "আলো ও ছায়া'র একটী কবিতার কথা মনে পড়ে—

"স্মৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে,
লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায়।"

"আলো ও ছায়া"র প্রায় সব কবিতাই আমার মুখস্থ আছে। এখনও এই বুড়া বয়সে আমি মুখস্থ করি। ভাল ভাল কবিতা মুখস্থ করা ভাল। এই স্কুল আমার বড় সাধের স্কুল।— বাংলাদেশের কেন, আমি ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানেই ঘুরে বেড়াই। বোম্বাই মান্দ্রাজ গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে অহরহ যাতায়াত করি। এই সেদিন বোম্বাইএর দক্ষিণ পুনা সহর থেকে আস্‌ছি। বোম্বাই অঞ্চলে মেয়েদের পর্দ্দা নাই—সেখানে স্কুল কলেজে ছেলে মেয়ে সব এক-সঙ্গে পড়ে। মেয়ে-ছেলেরা পুরুষের সাম্‌নে একহাত ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে না। আমি উইলসন কলেজে একবার ছদ্মবেশে গিয়াছিলাম। কিন্তু অধ্যক্ষমহোদয় ধরিয়া ফেলিলেন এবং ছেলেদের লেক্‌চার দিতে বলিলেন। বক্তৃতা দিতে গেলাম—গিয়া দেখি প্রথম দুই বেঞ্চে শুধু বর্ষীয়সী মহিলারা সব বসিয়াছেন। পুনায় ফার্গুসন কলেজও ঐরূপ দেখিয়াছি। মেয়েদের বলিলাম তোমাদের বাংলার ভগিনীরা তোমাদিগকে এরূপ দেখিলে লজ্জায় ও হিংসায় মরিয়া যাইবে। মোটের উপর আর্য্যাবর্ত্ত ছাড়া পর্দ্দা-প্রথা প্রায় কোন প্রদেশেই নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় সাড়ে নয়শ' স্কুল। এই এতগুলি স্কুলের ছেলে কেবল পুস্তকে-লেখা গদ তোতাপাখীর মত মুখস্থ করে; কি সর্ব্বনাশের কথা—যেটুকু শুধু পরীক্ষায় লাগিবে কেবল সেইটুকু গলাধঃকরণ করিয়াই খালাস—নিশ্চিন্ত। বাস্তবিক পক্ষে লেখাপড়াকে অত ছোট করিয়া ভাবা উচিত নয়। শুধু বই পড়িলেই জ্ঞানলাভ হয় না। বিদ্যাশিক্ষা একটা সামান্য জিনিষের মধ্যে আবদ্ধ করিতে যাওয়া আহাম্মকি নয় কি? শরীর, মন, এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের যাহাতে সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।

শারীরিক পরিশ্রমকে ঘৃণা করিও না। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" পরিশ্রম করিলে মানুষ ছোট হয় না। নীচকুলে জন্মিলেও মানুষ নীচ হয় না। পঞ্চম বেদ মহাভারতে

* আচার্য্য রায়ের গ্রামস্থ স্কুলের ছাত্রগণের প্রতি উপদেশ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বসু বি-এ হেডমাষ্টার কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

দেখিতে পাই, মহাবীর কর্ণকে যখন সূতপুত্র বলে ঠাট্টা করা হয়েছিল, তখন কর্ণ গর্ব্বভরে উত্তর করেছিলেন, "সূতো বা সূতপুত্রোবা যো বা কো বা ভবাম্যহম, দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।" বৈশম্পায়নও মহাভারতে বলেছেন—

"ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভি র্ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
চণ্ডালোঽপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠিরঃ।

আমি নয় বৎসর বয়সের সময় কলিকাতা যাই—শীতের সময় —গ্রীষ্মের সময় এক মাস করে' ছুটী ছিল। বাড়ী এসেই কোদালী ধরতাম। যত নারিকেল গাছ আমার বাড়ীর চারি পাশে দেখ, এই হাতে তাদের পুঁতেছি, চারা বাঁচাইয়া বড় গাছ করেছি। বাগানের জন্য আমার নেশা ছিল—মদের বোতলের উপর মাতালের নেশার মত। নিজের হাতে বেড়া ঘিরেছি। বাবার অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না, লোকজনও যথেষ্ট ছিল। সঙ্গতিপন্ন লোকের ছেলে বলে মনে কখনও এমন হয়নি যে পরিশ্রম করতে নেই। তোমাদের কেন এমন হয়?

বিলাত যাইতেছিলাম। তোমরা বোধহয় ম্যাপে মাল্টা দ্বীপ দেখেছ। মাল্টা হইতে একজন ইংরেজ জাহাজে উঠেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে ফুটবল খেলার কথা হইল। স্বাস্থ্যের জন্য খেলার কথা বল্লেই তোমরা ধরে বস ফুটবল, তিনি বলিলেন, "ফুটবল স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ উপযোগী নহে। একে ত অতিরিক্ত পরিশ্রম—তাহাও আবার কয়জনের হয়—এগার দুগুণে বাইশ জনের মাত্র। কিন্তু ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোক জড় হইয়া কেবল মজা দেখে। পাড়াগাঁয়ে এমন কেউ নেই যার বাড়ী দু'কাঠা পাঁচ কাঠা জমি নেই। অনেকের দু'দশ বিঘাও আছে। যদি কোদাল নিয়ে সকালে আধ ঘণ্টা ও বিকালে আধ ঘণ্টা কাজ কর, বৎসরের শেষে কতটা জমি নিজ হাতে চাষ করতে পার ভাব দেখি। কচু বেগুণ কত করতে পার—একটা লাউ গাছ কর —কত কুড়ি লাউ ফলে। ছোট ঘেরা দিয়ে একটা সিম গাছ করে', উপরে একটা মাচা দেও ও গাছের গোড়ায় সার দেও ত দেখ্‌বে গাছের "ভাল ধাত" হবে—কত হাজার সিম ফলে ভাব দেখি?

আমাদের ছেলেবেলায় শুনেছি—মা' প্রায়ই বলতেন—"ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের সোণা।" খুব কঠোর পরিশ্রম করে মানুষ হতে হয়। আর নিজের পরিশ্রমের অর্জ্জিত দ্রব্য দেখিতে কত সুন্দর, খাইতে কত মিষ্ট, রূপে সেগুলি অনুপম, গুণে অতুলনীয়।

অনেকে বলে খাই কি, কিন্তু আমি বলি পরিপাক করি কি প্রকারে ইহাই প্রশ্ন হওয়া উচিত। আমাদের খাবার জিনিষের অভাব; অবস্থা ভাল নয়; তা বেশ। ফ্যানে ফ্যানে ভা'ত খাও। সিকি পয়সা খরচে বেশ সারবান জলখাবার হয়। দুই আনায় এক সের ছোলা; এক মুঠা ভিজালেই যথেষ্ট; একটু আদার সঙ্গে খাইলে এক পোয়ায় সাতদিন চলে। এরূপ খাদ্য কি লুচি, না সন্দেশ? ইংরেজীতে ইহাকে "পারফেক্ট ফুড" বলে। লক্ষ্মীপূজার সময়

তোমরা মুগের অঙ্কুর খাও। ঐরূপ অঙ্কুর খাইতে পাইলে শরীর দ্বিগুণ সবল হয়। উহাতে 'ভাইটামিন' বলে এক প্রকার জিনিষ আছে, তাহা শরীর গঠন পক্ষে বিশেষ কাজ করে। সিকি বা আধ পয়সা ব্যয় সকলেই করিতে পারে। কিন্তু সে সব খাবার এখন উঠিয়া গিয়াছে। ভাল ভাল গৃহস্থ বাড়ী খই ভাজার ধান রাখা হয়; কেহবা মুড়ির চাউল তৈয়ার করিতে জানেন। আজকালের বউরা লুচি ও হালুয়া তৈয়ার করিতেই জানেন। সে কালের সস্তা অথচ সারবান খাবার তাঁহাদের নিকট অতি নিকৃষ্ট। খই গুড়, মুড়ির সহিত মৌঝোলা গুড়ের চাক্তি, যা আমি এখন খাই, অতি উত্তম খাবার। নিজের হাতের কলা আরও মিষ্ট, কথায় বলে "আপন হাত জগন্নাথ।"

এখন কি কপাল পুড়েছে! আমাদের ছেলেবেলায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ী গরু ছিল; গ্রামে গো-চারণের মাঠ ছিল। গৃহস্থের প্রধান কাজ ছিল গো সেবা করা—ভগবতীর এক রকম মূর্ত্ত উপাসনা। বাড়ীর কর্ত্তা-কর্ত্রী ঐ সেবার ভার লইতেন। দুগ্ধত পাওয়াই যাইত গোবরও জ্বালানী কাষ্ঠের ও সারের কাজ করিত। গোমূত্র গোবর ফেলা পলকুটা পচিয়া সার হইত। সকল দেশেই ইহা ব্যবহৃত হয়। বিলাতে এডিনবরা সহরের অতি সন্নিকটে দেখেছি গরুর গোবর মলমূত্র সারের জন্য ব্যবহার হয়। মানুষের "নরবর" (বিষ্ঠা) আরও ভাল। জাপানে প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ীতে একটা হাত গাড়া আছে; তাতে করে বিষ্ঠা রাখে এবং তাহা কৃষকেরা খোসামোদ করিয়া লইয়া যায় ও জমিতে দেয়। কলিকাতায় ধাপার মাঠ আছে। ঐ মাঠ মল মূত্র আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হয়। কলিকাতা মিউনিসিপালিটি বিঘা প্রতি যথেষ্ট খাজনা ও সেলামি আদায় করিয়া ঐ সার বিলি করে। সেখানে ভাল ভাল কফি বেগুন ইত্যাদি হয়। এসব হেয় জ্ঞান করার নয়। গোসেবা করিতে বার মাস নিজেরা কেন পারিবে না? গো সেবা করিলে লক্ষ্মীর প্রকৃত পূজা ঘরে ঘরে করা হয়। দুগ্ধ ঘৃত মাখন দধি আপশোষ মিটাইয়া খাইতে পার অথচ ব্যয় সামান্য। পাড়াগাঁয়ে এসব এখনও আছে বটে কিন্তু নামমাত্র, এখন বর্ষাকালে ।৶০ ছয় আনা মূল্যে দুধ বিকায়—কয়জন তাহা খাইতে পায়? পাড়াগাঁয়ে গরুর চেহারা দেখিলে প্রাণ কাঁদে।

তোমরা যখন কলেজে যাবে একটী একটী ক্ষুদ্র নবাব হবে। খাসা টেড়ী, তাম্বুল রাগে রক্ত অধর, কি নধর দেহখানি। মা-বাপ কত কষ্ট করে খরচ পাঠান, আর তোমরা সহরে সিনেমা ও থিয়েটারে গিয়া—আর এখন পাড়ায় পাড়ায় রেঁস্তোরা হইতেছে, সেখানে যাইয়া চপ্, কটলেট্ অনেক সময় অর্দ্ধপচা মাংস প্রভৃতি খাইয়া, সেই অর্থের কি সদ্ব্যবহার কর? গ্রীষ্মকালে আড্ডা, তাস, দিনের বেলায় ঘুম। দৈহিক পরিশ্রমে পাপ, হীনতা বোধকর। যারা দু' পাতা পড়েছে তাদের রোজগারের ক্ষমতা নাই ·কিন্তু কাজও করে না। তোমরা লেখাপড়া শিখ্‌ছ, ডিগ্রি পেলেই তোমাদের শিক্ষা ফুরাল। কিন্তু তা নয়। লেখাপড়া শেখে কেন? দুনিয়াটা

চক্ষু মেলে প্রকৃত ভাবে দেখার জন্য। প্রকৃতির সহিত চাক্ষুষ পরিচয় হওয়ার জন্য। কিন্তু তা কৈ? পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে প্রভেদ কি? আমার ছেলেবেলায় গ্রামের প্রজাদের বল্‌তে শুনেছি "আমরা চোখ থাক্‌তে কাণা!" সত্যই অশিক্ষিত লোকগুলি পশুর মত। "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।"

চোখ ফুট্‌লে তবে দেখতে পাবে, তোমারা যা করছ সব ভূয়া। ঐ যে ইংরেজ দর্পভরে পা' ফেলে চলে যাচ্ছে ওর কর্ম্মশক্তি যে কতবেশী প্রকৃত লেখাপড়া শিখলে তা চোখে পড়বে। উহাদের নিকট শেখার অনেক আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায়না—সাধে কি এত বড় রাজ্য হয়েছে? আমাদের মত কর্ম্মকুণ্ঠ জাতি কখনও এরূপ বৃহৎ সাম্রাজ্য করতে বা চালাতে পারেনা। ইংরেজের জাহাজ পৃথিবীময় সমুদ্রবক্ষে সদর্পে ভ্রমণ করছে। চীন জাপান অষ্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছে—দুস্তর আটলান্টিক পার হয়ে মার্কিণে যাচ্ছে। পৃথিবীর যা কিছু ভাল জিনিষ সবই তারা নিজেদের দেশে আন্‌ছে। বিদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই করে কাঁচামাল দেশে নিয়ে সেগুলি তৈরী করে আবার বিদেশে চালান দিচ্ছে। বোম্বাই থেকে তুলা ল্যাঙ্কাসায়ার কেনে, আবার কাপড় করে' বোম্বাইতে ফেরৎ পাঠায়। কত লাখ লাখ টাকা নিয়ে যায় —শুধু আমাদের এই বাংলা দেশে বছরে পয়ত্রিশ কোটী টাকার কাপড় আমদানী হয়। একবার ভাব দেখি বিদেশীয়েরা কি টাকাই উপার্জ্জন করে। আর আমরা কেবলই দেশের টাকা বিদেশে পাঠাই, আর দেশের লোকের অন্ন মারছি। আমার ছোট বেলা রাড়ুলী ঘাটে ২৫।৩০ খানা পান্‌সি থাকৃত। বেলেঘাটায় ১৫০।১৫৫ খানা নৌকা থাক্‌ত। সে সব আর এখন নাই, সেদিন গিয়াছে, মাঝিরা জমি বিভাগ করিয়া লইয়া লাঙ্গল ধরেছে অথবা বাবুর্চ্চি হয়েছে। ষ্টিমারে আমরা যাতায়াত করি, পায়ে হাঁটা ত ভুলে গেছি। যখন কলিকাতা যাও বা বিদেশে যাও তখনই টাকার ৸৹ বার আনা বিলাতে মণিঅর্ডার কর। বাকীটা খালাসী মিস্ত্রী আর ঐ "নিরক্তে" কেরাণীবাবু পান। রেলওয়েতেও ঐ প্রকার। রেল-ষ্টিমারের লোহা-লক্কড় কল-কব্জা সবই বিদেশের। এসব যদি আমরা করতে পারতাম তবে আমাদের কিসের অভাব হইত? আর এখন ত মোটর গাড়ী সর্ব্বত্র।

একটু কষ্ট করতে হবে। ইংলণ্ডে ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ভোঁ ভোঁ চরকা চল্‌ত। কামার হাতুড়ি পিট্‌ত। কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া, গতর খাটাইয়া, লোকের অন্ন সংস্থান করিতে হইত। গরুর রাখাল পরে কয়লার খনির কুলি ষ্টিফেনসন্ লোকোমোটিভ ষ্টিমইঞ্জিন অর্থাৎ গতিশীল রেলগাড়ি আবিষ্কার করেন। তিনি লেখাপড়া জান্‌তেন না। তাঁর ছিল মাথা আর শক্ত খাটা খাটনীর দেহ। জেম্‌স্ ওয়াট তাহার পূর্ব্বে—ষ্টীমের শক্তির আবিষ্কার করেন। এই দুজনের উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা রেলওয়ে ষ্টীমার হল। তোমরা বই মুখস্থ করে আর কেরাণীগিরির দরবার করে এই উৎসাহী পরিশ্রমী জাতির সহিত টক্কর দিয়ে কি করে পার্‌বে? রেলওয়ে ষ্টীমারের সহিত কলার ভেলা কি প্রতিযোগিতা কর্‌তে পারে?

"সূতা জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার, জোলা কর্ম্মকার করে হাহাকার।" আজকাল লাখ লাখ কর্ম্মকারের অন্নকষ্ট। 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।' আজ যদি আমাদের ঘরে ঘরে চরকার প্রচলন থাকত এবং সেই সূতায় যদি জোলা তাঁতি কাপড় বুনিত তবে কত কোটী টাকা থাকত। এই বুদ্ধি আপনা হইতে খেলে না। হাতে কলমে কাজ করতে করতে খেলে। "কর্ম্মণা বর্দ্ধতে বুদ্ধিঃ?" কিন্তু কাজ তোমরা করবেনা। তোমাদের সম্মানের আদর্শ বড় আশ্চর্য্যজনক। যদি কুড়ালি মার, কাট ফাড়, "খারৈ" হাতে করে মাছ আন, ভাব্‌বে আমার বুঝি লজ্জা পেতে হ'বে।

বাংলাদেশে হাজার ত্রিশেক ছেলে কলেজে পড়ে, আমার মনে হয় যদি পাঁচ হাজার বাছা বাছা ছেলে কলেজে পড়িত, তা হ'লে ভাল হ'ত। পাশ করে চাকুরী কয়জনের জুটে? নূতন ডিপার্টমেণ্ট হইতেছে না বরং সর্ব্বত্রই ব্যয় সংকোচের ডাক হাঁক চলিতেছে। যে কোনো আফিস বল, একবার একজন ঢুকিলে আর জায়গা কই? একজন না মরিলে ত আর জায়গা হয় না! আর এদিকে দেখ কত শত শত গ্রাজুয়েট বসে আছে—সর্ব্বত্রই চাহিদার চেয়ে আমদানী বেশী। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যের মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিল, এখন সর্ব্বজাতির ভিতর লেখাপড়া শিক্ষার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। পনের বিশ হাজার ছেলে ম্যাট্রিক দেয়—এত ছেলে কেবল চাকুরীর জন্য লেখাপড়া শিখিতেছে, কি ভয়ানক কথা!!!

লেখাপড়া শিখ্‌লেই যে চাকুরী করতে হয় তা নয়। বুদ্ধি-বৃত্তিকে একটু মার্জ্জিত করা, দেশের ও দুনিয়ার সমস্ত খবর রাখা—এই সব লেখাপড়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এদেশে শতকরা সর্ব্বশুদ্ধ ৫ পাঁচজন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট, কিন্তু জাপানে শতকরা ৯৮, আমেরিকায় শতকরা ১০০ জন বল্লেও হয়, তারা কি কেবল চাকুরি করে? বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কথা শুনেছ—তিনি নিজের জীবনস্মৃতি লিখে গেছেন। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে রত ছিল, তখন জর্জ্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন আর ফ্রাঙ্কলিন দৌত্যকার্য্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বলে স্বাধীনতাসমরে বিজয়লক্ষ্মী আমেরিকার অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত মহাপুরুষ নিজের চেষ্টায় ও অসাধারণ বুদ্ধিবলে লেখাপড়া শিখে ছিলেন। অতি সাধারণ অবস্থাপন্ন ঘরে ইঁহার জন্ম। স্কুল কলেজে কতটুকু শিক্ষা হয়? আমার নিজের লেখাপড়া বিদ্যাবুদ্ধি যদি স্কুল কলেজে একগুণ হয়ে থাকে তবে নিজের চেষ্টায় সহস্রগুণ হয়েছে। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী পড়েছ? কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী পড়েছ? কি কষ্ট করেই এঁরা লেখাপড়া শিখেছিলেন। পরিশ্রমের কাজ করলেই যে লেখাপড়া হয় না, ছোট হয়ে যেতে হয় তাহা তোমরা বল্‌তে পার না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে লিখেছেন, বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ছিল তা শুন্‌লে অবাক্ হতে হয়। কোন দিন অন্ন জুটিত কোন দিন জুটিত না, সেজন্য

তাঁহাকে কেহ কখনও বিমর্ষ দেখিত না। একবেলা তিনি নিজে রাঁধিয়া মাকে অবসর দিতেন। মা সেই সময় কাঁথা সেলাই করিয়া পয়সা রোজগার করিতেন।

তোমরা বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়েছ? কত শারীরিক পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'ত। ভাত রেঁধে খেয়ে সকলকে খাওয়াইয়ে তবে স্কুলে যেতে হ'ত। তোমরা ভাব বাড়ীর কাজ কর্‌তে হলে আর পড়া হয় না। শিক্ষা নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। স্কুল কলেজে শুধু কোন্ পথে যাবে তাই দেখে নেওয়া, হাঁট্‌তে হবে তোমাদের।

যদি এক বিষয়ে বুদ্ধি একটু কম খেলে হতাশ হইও না। যে যে-বিষয়ে পার এগিয়ে যাও। আমাদের বংশের সকলেই অঙ্কে খাট কিন্তু ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতি আমাদের বড়ই প্রিয়। আমার কনিষ্ঠ পূর্ণ সন তারিখ সব মনে রাখ্‌তে পারে; কাহার সহিত কোন সনের কোন তারিখে দেখা হ'য়েছিল, বাংলায় কোন সাহেবের আমলে কোথা হইতে কোন্ পর্য্যন্ত প্রথম রেললাইন খ্‌লে ছিল, কোন্ সন কোন্ তারিখে কাহার ছেলের জন্ম, মেয়ের বিবাহ, বাপের শ্রাদ্ধ হয়েছিল সমস্ত পূর্ণর কাছে জিজ্ঞাসা করলেই বল্‌তে পার্‌বে। আমার দাদা যখন 'মাঠের স্কুলে' পড়তেন, তখন তিনি রহস্য করে বল্‌তেন ইতিহাস হ'ল ইতি—হাস, আর ম্যাথেম্যাটিকস্ না—মাথায় মাটি। লর্ড বাইরণ একজন বড় ইংরেজ কবি, জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার মাথায় ঢুকিল না। স্যর ওয়াল্টার স্কট একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক—ঐরূপ লেখক এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি কবি ও ঐতিহাসিকও বটেন। একখানা জীবন-চরিতে পড়িয়াছি তাঁহার শিক্ষক অঙ্ক কষাইতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, "Dunce he was and dunce he would remain."

খাদ্যের অভাবে আমাদের প্রকৃত লেখাপড়া হয় না তা নয় চেষ্টার অভাবই মূল কারণ। পাঁড়াগায়ে কত ভাল খাদ্য, মুড়ির চাক্‌তি, নলেন গুড়। "সরষে ফুলে" ফুট হইতে যখন "চাল্‌তে ফুটে" আসে সেই তাত রস কি মধুর কি উপাদেয়। একটা বড় পূবে "ডয়া"* কি সুন্দর খাদ্য।

কলা এত সারবান খাদ্য যে ইংলণ্ডের সমস্ত জায়গায় ঠেলা গাড়ী করে ফেরি করে নিয়ে বেড়ায়; জাহাজে করে বোঝাই হয়ে আসে, ইংলণ্ড কলায় কলায় ছেয়ে যায়। আনারস আগে ১০।১৫ টাকা করে বিক্রী হত। 'হট-হাউসে' তৈরী কর্‌তে হ'ত। এখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে জাহাজে করে আসে—এসব এমন উপাদেয় খাদ্য যে বিদেশ থেকে জাহাজ ভরে এনে ধনী ইংরাজ খায়। আর আমাদের ঘরের কানাচে দুই ঝাড় কলাগাছ করে তাহা আমরা খাইতে পারি না। ইহাকে কি খাদ্যের অভাব বলে না চেষ্টার অভাব বলে?

তোমরা নিজের চেষ্টায় শিক্ষা করার উদাহরণ চারিদিক হইতে গ্রহণ কর এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া মানুষ হও। আমাদের দেশে না জন্মে এমন জিনিষ নাই।

* এক প্রকার বিরাট বীচিপূর্ণ কলা।

যাদের চাষা বল' তারা যে টুকু তৈয়ার করে দেয় তার উপর আর এক পয়সা যোগ কেউ করেনা। তোমরা কেবল 'খাওয়ার খাসি।' কাঁচামাল যাহা আছে তাহা বিদেশীয়েরা লয়ে যায়, আর তাহারা উহার উপর নিজের পরিশ্রম ব্যয় করে উহার মূল্য বিশগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা তাই খরিদ কর, গরীব হয়ে যাও। এই ধর চামড়া। এই চামড়া এখান থেকে মুচিরা চালান দেয়, ইংলণ্ডে যায়। ঐ চামড়া সেখান থেকে লেদারে পরিণত হয়ে আসে। এক টাকার মালে আমাদের কাণ মলে ১৫ টাকা আদায় করে। আমরাও ত এসব পারি। আমার পায়ের এই জুতা ডাক্তার নীলরতন সরকারের ট্যানারিতে প্রস্তুত। স্যার নীলরতন, যিনি তোমাদের ইউনিভার্সিটির একজন কর্ত্তা, তিনি কেবল সুনিপুণ চিকিৎসক নন্—He is the Prince of Muchis.

মূলধন নাই—কি করে কি করি, আজকাল এরূপ একটা বুলি শুনা যায়। আমি কিন্তু ও কথা মানিনা। এণ্ড্রু কার্ণেগী স্কটল্যাণ্ডের লোক—অতি দরিদ্রের সন্তান। কোনরূপে দেশে অন্নসংস্থান করতে না পেরে ভিক্ষাদ্বারা "প্যাছেজ" সংগ্রহ করে আমেরিকায় গেলেন 'নিউস বয়' টেলিগ্রাফিক পিয়ন প্রভৃতি হয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগলেন। ক্রমে স্বীয় প্রতিভাবলে লোহার খনির মালিক হন। তিনি কত টাকাই না রোজগার করেছেন আর দেশের কাজে কত টাকাই না ব্যয় করেছেন। নিজে শ্রমজীবী ছিলেন—জানতেন শ্রমজীবীরা সন্ধ্যাবেলায় মদ খায় মন্দসংশ্রব ও কুৎসিৎ আমোদে প্রমোদে মত্ত হয়। তাই অনেক টাকা ব্যয় করে "ওয়ার্কিং মান্‌স্ ইনিষ্টিটিউট" স্থাপন করেন; সঙ্গে সঙ্গে কোকো কাফি, চা, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, লাইব্রেরীতে বই পাবার সুবিধা সমস্তই তাহারা পাইতে থাকিল। ভাব দেখি কত অজস্র টাকা ব্যয় করেছেন তিনি। সমস্ত জীবন ভরে তিনি কোটী কোটী টাকা দান করে গেছেন। তিনি বল্‌তেন, "Those who die rich die condemned" স্কটলণ্ডে ৪টি ইউনিভার্সিটি আছে, উহার প্রত্যেকটীতে কার্ণেগী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বল্‌তেন স্কটলণ্ডের কোন প্রতিভাবান মেধাবী ছেলে অর্থাভাবে পড়তে পাবে না—ইহা আমার সহ্য হ'বেনা।

আমেরিকায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। অনেক গরীব ছেলে পড়ে। তারা কিন্তু পরের নিতান্ত গলগ্রহ হয়ে পড়ে না। যারা গরীব তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে রেলওয়ে ষ্টেশনে মুটের কাজ, হোটেলে খানসামার কাজ, বাবুর্চ্চির কাজ করে' পয়সা রোজগার করে, আবার শীতকালে কলেজে পড়ে। সেখানে দৈহিক পরিশ্রমে জাত যায় না। শ্রমের মর্য্যাদা সেখানে পূরাপূরি। কেহ দৈহিক পরিশ্রমের জন্য টিট্‌কারী দিলে সে অসভ্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। Ill-mannered, ill-bred বলে তাকে নির্য্যাতিত হ'তে হয়। যে আজ রাস্তার মুটে সে প্রতিভাবলে কালে আমেরিকার সর্ব্বোচ্চপদ প্রেসিডেণ্টের আসন দখল করতে পারে। তারা বলে পরিশ্রমই উন্নতির মূল—'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতিলক্ষ্মী, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।' এই

পুরুষকারের আদর এক সময়ে ভারতেও ছিল। কর্ণের উত্তর তাহারই প্রতিপাদন করে। পুরুষকার দেখিয়াই পুরুষের বিচার করা কর্ত্তব্য।

বড় মানুষের ঘরে জন্মিলেই প্রকৃত মানুষ হয় না, অধিকাংশই গাছগরু হয়। কলিকাতার একজন সর্ব্বপ্রধান ধনী জমিদার, অনেক উপাধিধারী, তাঁর নাম আমি কর্ব্বো না—তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল এক শ্রাদ্ধ-বাসরে। তাঁকে অভিবাদন করে বল্‌লাম—"আজ শ্রাদ্ধ-বাসরে দেখা কিন্তু আপনার শ্রাদ্ধ প্রত্যহ না করিয়া আমি জল খাই না।" তাঁর নিকট থেকে দেশের কাজে কোন সাড়াই পাই নাই কিন্তু রাজপুরুষেরা ডাক দিলেই ৩০।৪০ হাজার টাকা দান করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না। এই ত বড় মানুষের ছেলে। আর ঐ যে এই নদীর ওপারে আগড়ঘাটার ডাক বাঙ্গালায় বেহারা ছিল—মেহের বেহারা—তার আজন্ম সঞ্চিত অর্থ ৪ হাজার টাকা দান করে তার আয় থেকে তোমাদের পড়াচ্ছে—সমাজের হিসাবে সে ত অতি ছোট লোক! তোমরাই বল কে প্রকৃত বড়?

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁরা ওয়াশিংটন ও বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে দেবতার মত পূজা করেন। ফ্রাঙ্কলিন অতি দরিদ্রের সন্তান। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ছাপাখানার কম্পোজিটার হ'য়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন। এই অবস্থায় সন্ধ্যার পর ধার করে বই নিয়ে লেখাপড়া শিখতেন। পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে সন্ধ্যার পর বই লইতেন, সমস্ত রাত্রি পড়তেন, সকালে ফিরাইয়া দিতেন। "Spectator" পড়তেন আবার Reproduce করতেন, শেষে মূলের সঙ্গে মিলাইতেন। এই প্রকারে লেখার শক্তি বাড়াইতেন। শেষে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে' নিজে ছাপাখানা করেন। শুধু এই নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও তিনি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি ঘুড়ি উড়াইতে ছিলেন—বিদ্যুৎপ্রবাহ ভিজা সূতা বহিয়া মাটিতে এল। সেই অবধি তাঁহার নির্দ্দেশমত Lightning conductor-এর সৃষ্টি হ'ল। শেষে আমেরিকার যুদ্ধের সময় তিনি বৈদেশিক দূত নিযুক্ত হলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম কবি মাইকেল মধুসূদন যেমন কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকিকে উদ্দেশ করে বলেছেন—"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে" তেমনি যে ছাত্র পদার্থবিদ্যা পড়িতে যায় সে অগ্রে Self-taught Benjamin Franklin-এর পদাম্বুজ বন্দনা করে।

তোমরা ছেলেমানুষ। সমস্ত দিনটা ২৪ ঘণ্টা না হয় ৮ ঘণ্টা ঘুমাইলে। তবু ত ষোল ঘণ্টা হাতে রইল। সকালে রাত্রে পড়াশুনায় ৩ ঘণ্টা গেল। তার পর কি করবে? শুপারি নারিকেল গাছে ওঠ, "ঝাঁপাই" জোড়, স্বাস্থ্যলাভ কর। বৎসরে ৬ মাস ছুটী; গ্রীষ্মের বন্ধ, হিন্দুর পর্ব্ব, মুসলমানের পর্ব্ব, খৃষ্টানের পর্ব্ব। ভাব দেখি ছুটীর সময় কত 'আলসেমি' করে সময় নষ্ট কর—আমার এই বয়স—পাঁচ মিনিট কারো সঙ্গে দেখা কর্ত্তে পারি না।

আমি ৪ বৎসরে ৪০ হাজার মাইল বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঘুরেছি;

গত তিন মাসে ৮৫০০ মাইল ভ্রমণ করেছি—বম্বে থেকে পুনা, সেখান থেকে ঢাকা—কত কাজ তবুও সময় পাই। একটু পরেত নৌকায় বাহির হইব; নিজ হাতে দাঁড় বাইব, তোমরা যদি বল সময় পাওনা তা হ'লে মিথ্যা কথা বলা হবে। মিষ্টার গ্লাডষ্টোনকে এক সময় জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কি করে এত কাজের সময় পান, তাঁর উত্তর :—The busiest man has the largest available time at his disposal—it is only method, punctuality, precision. সময়ের মূল্য তোমরা বোঝ না, তাই এত সময়ের অভাব। ইংরাজের সঙ্গে দেখা করার যদি কথা থাকে তবে ঠিক সময় না গেলে আর দেখা হবে না। আমাদের নিমন্ত্রণ যদি মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য হয় তবে সে সন্ধ্যায়। একজন ইংরাজ Punctual to the minute আর আমরা পাত্রমিত্র কোটাল নলনীল গয়গবাক্ষ দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত। অথচ সময় হয় না।

ইহার সহিত অক্লান্ত অধ্যবসায়ও চাই। ঐ দেখ রাজপুতানার ঊষর মরুভূমি পার হ'য়ে, লোটা কম্বল মাত্র সম্বল করে লোক এসে তোমার সাধের বাংলা দেশ জুড়ে বসেছে, It is the Marwari conquest apart from the British conquest that has impoverished Bengal. শুধু কলিকাতার বড়বাজার কেন আমাদের দেশের সব চেয়ে বড় হাট 'বড়দল', সেখানে এক একটা রবিবারে যত টাকার কারবার হয় তাহা সমস্ত একজন মাত্র মাড়ওয়ারির মুঠোর ভিতর। তাঁর নাম মাদ্দিলাল মাড়োয়ারি। আমাদের ভাগ্য-বিধাতা লর্ড বার্কেন হেড লিখিতেছেন :—About 55 years ago there stood behind the counters of a Lancashire grocer a young lad about whom nothing was particularly noticeable except his bright intelligent eyes—সেই বালক স্কুলে পড়েনি, কলেজে পড়েনি, রসায়ন শাস্ত্র পড়েনি, নিজের চেষ্টায় আজ কোটীপতি। ইহাঁর নাম William Hesketh Lever পরে Lord Leverhulme. ইহাঁর সাবানের কারখানা লিভারপুলের নিকট—ইনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাবান নির্ম্মাতা—যার সাবান এমন কি আমাদের দেশেও ঘরে ঘরে রোজ ব্যবহৃত হয়। "সান লাইট সোপ" দেখেছ ত। ইহা তাঁহারই কীর্ত্তি। ইহার বর্ত্তমান মূলধন ৪২ মিলিয়ান ষ্টার্লিং অর্থাৎ ৬৩ কোটী টাকা। ভাব দেখি কি বৃহৎ ব্যাপার!

চাকরী চাকরী করেই এদেশটা গোল্লায় গেল। বাংলার মুসলমানেরা আজ কায়েত বামুনের দাসত্বের গর্ব্ব ভাগাভাগি করার জন্য মহাব্যস্ত, অবশ্য সংখ্যা অনুসারে তাদের দাবী অন্যায় নহে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান চাষ-ব্যবসায়ী। অনেক চাষী মুসলমান লেখাপড়া শিখে চাকরীর দরবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের "এ্যাও" গেল "অও" গেল—তাঁতিকুল বৈষ্টমকুল দুইই গেল। চাষ ব্যবসায় আর শরীরে সয় না। চাকুরীও জোটে না। আমি বলি মুসলমান তুমি বাংলার মুসলমান হইও না; দিল্লীওয়ালা হও, বোম্বাই-এর নাখোদা হও। কলিকাতায়

দিল্লীওয়ালা মুসলমানের হাতে বড় বড় কারবার। লাখ লাখ টাকা তাদের উপায়। ফৌজদারী বালাখানায় যাঁরা গিয়াছেন তাঁরা জানেন নাখোদারা কি পরিমাণ টাকার মালিক। বোম্বাই-এর একজন মুসলমান স্যর ইব্রাহিম করিমভাই—ইনি মারা গেছেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলে। তাঁর জাপানে টোকিও, কিয়াতো এবং হংকং প্রভৃতি স্থানে ব্যবসায়—রাশি রাশি তুলা রপ্তানি করেন। রেশম আমদানী করেন—কত কোটী টাকা তাঁর উপায়। তাঁর এক একজন ম্যানেজারের মাহিনা ৫,০০০৲ টাকা। আবার কচ্ছের মুসলমানেরা চাল রপ্তানি করেন—ব্যবসা' ছাড়া উন্নতি হয় না। যত গ্রাজুয়েট হয় তার শত করা কয় জন চাকুরী পায়? চাকুরী চাকুরী করে ঘুরে বেড়ালে কোনো জাত উঠ্‌তে পারে না।

স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি—কুলীন বামুনের ছেলে। বারাসতের কাছে ভেবলায় তাঁর বাড়ী। অতি দরিদ্রের সন্তান। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকেন, কিন্তু পয়সা অভাবে বেশী দিন পড়তে পারেন না। প্রাইভেট টুইশানি করতেন—শেষে ছোট ছোট কনট্রাক্ট লইতেন—আর এখন তিনি বাংলার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসাদার। কত রেল লাইন তাঁর অধীনে। ফেলে ঝেলে ১২ মাসে ১২ লক্ষ টাকা তাঁর আয়। তাঁর তাঁবেদারে ১০।২০ জন হাজার দেড়হাজার টাকা বেতনের সাহেব ভৃত্য আছে। It would have been a real misfortune for Bengal if Sir R. N. Mukerjee had come out of the Engineering College successful—এই কথা আমি নানাস্থানে বলিয়া থাকি—আজ তিনি কত বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারকে চাকর রেখেছেন।

শুধু কতকগুলি কেতাব মুখস্থ করলেই বিদ্যা হয় না। আকবর লেখাপড়া জানতেন না; শিবাজী মহারাজ লেখাপড়া জানতেন না, রণজিৎ সিংহও নয়। মানুষ হওয়া চাই। জ্ঞানের জন্য বাজে বই অর্থাৎ পাঠ্য তালিকাভুক্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য বই পড়। যারা আপন চেষ্টার বলে মানুষ হয় তারাই মানুষ। পুরুষকার আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমার মনের দৃঢ়তা আমার একনিষ্ঠতা, আমার অধ্যবসায়, উদ্যোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে। আমার সফলতা বা নিষ্ফলতার জন্য অপর কেহই দায়ী নহে—আমি নিজেই দায়ী। নিজের জীবন-যাত্রাকে সফল করিতে হইলে নিজেই পথ দেখিয়া লইতে হইবে।

আমার শেষ সময় উপস্থিত—হে আমার সাধের ছাত্রগণ, তোমাদের দিকে আগ্রহাকুল-নয়নে আমি তাকিয়ে আছি। যদি দেখি তোমরা মানুষ হচ্ছ তবে ভাব্‌বো আমার জীবন-ব্রত সফল হ'ল। The future destiny of my country is in the hands of my young children—তোমরা মানুষ হও—নিজেরা আপন পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও—দেশ আবার নিশ্চয়ই উঠ্‌বে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

মরুভূমি

হে বিস্তীর্ণা মরুভূমি, ধূসর সুন্দর
বক্ষতলে দোলে তব নগ্ন দীপ্ত বালুকার স্তর ;
জলজটা খর দ্বি-প্রহরে
বেগের আবেগ ভরে
উড়ে যায় বহ্নির কণিকা, ছড়াইয়া ধ্বংস-বিভীষিকা,
কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় প্রজাপতি সম
চঞ্চল পাখায়
রৌদ্রদগ্ধ বায়ুস্তরে, নীল সীমানায়
রক্তপীত আলোক বিথারি ;
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি'
বাড়াইয়া দেয় প্রতি বালুকণা শীর্ণকরতল
বলে বুঝি "ঢাল ওরে ঢাল বুকে জল।"

এসেছিল কত শত তীর্থযাত্রী হারেম সুন্দরী
উটের তাঞ্জামে চড়ি'
তব পথে, কোলে ল'য়ে বালক বালিকা ;—
প্রভাতের প্রস্ফুটিত পেলব উজ্জ্বল মাধবিকা
ম্লান হ'তো তাহাদের রূপের জৌলুসে,—সুরভি নিশ্বাসে,
ঈষৎ বঙ্কিম হাসে
ভোরের তারার মত ;......
এসেছিল কত শত
বিদেশী বেদিয়া
বুকে নিয়া
আকাঙ্ক্ষার ঘননীল ধারা
শফেদ বালির দেশে খুঁজিতে কিনারা ;—
......তারা সবে পথভ্রান্ত ; হ'য়ে এক সাথে
বরাতের ঘূর্ণী ঝঞ্ঝাবাতে,

দগ্ধ মরুভূর, জল মন্বন্তরে পড়ি'
"পানি পানি করি' "
গেল চলি চির অস্তাচলে
মিটাইতে তৃষ্ণা বুঝি বৈতরণী-জলে ;—
পিপাসার্ত্ত যত শিশু শুষ্ক স্তনে মাতৃবক্ষ তলে
ক্ষণকাল করে হা-হুতাশ
তারপরে'—দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ;
হে মরুভূ,—তুমি যে গো জ্বলন্ত-শ্মশান
তাই তব বক্ষে জ্বলে জ্বালা অনির্ব্বাণ !

ওগো উদাসিনী !
বহ্নি-বেদ পাঠ করি' যার ধ্যান করো তপস্বিনী
বাজাইয়া ঝটিকা কিঙ্কিনী
সেকি তব আসিল না ? কহিল না কথা ?
বুঝিল না প্রেয়সীর তীব্র মর্ম্ম ব্যথা ?
ব্যর্থ হলো উচ্ছ্বসিত যৌবনের প্রদীপ্ত আহ্বান,
নারীর সম্মান ?

আজি আমি সহসা জেনেছি হে ভীষণা কালের কিঙ্করী !
একদিন সে বিরহী অমৃত ভৃঙ্গার পূর্ণ করি'
ঢেলে দেবে পিপাসার জল
তুহিন শীতল ;
শিশু করোটির, বাটি ভরি' ভরি'
সর্ব্বজ্বালা পরিহরি'
খেও,—খেও তুমি
ওগো সখি ! তাপদগ্ধা ক্লিষ্টা মরুভূমি,
খেও তাহা ;—
অস্থির রেণুকা মাঝে, তৃষ্ণা কাঁদে,—আহা !

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

প্রজাপতির দৌত্য

(৮)

সনাতন আর বিছানা হইতে উঠিলেন না। দিনের পর দিন জ্বর বাড়িতে লাগিল। সকালের কতকটা সময় জ্ঞান থাকিত, বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন এবং সন্ধ্যার পর উল্টা-পাল্টা কথা আরম্ভ হইয়া যাইত।

সব ভুলের মধ্যে একটা জিনিষের কিছুতেই ভুল হইত না, রামকে ঘরে দেখিলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিতেন, আমি এখন ভাল আছি, ওকে পড়্‌তে যেতে বল, পরীক্ষার যে আর বড় বেশী দেরি নেই।

সে কথা অগ্রাহ্য করিলে, সনাতন একেবারে অধীর হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, কথা শোনে না, আজকালকার ছেলেরা······আর ক'দিন? শীগ্‌গির বাড়ি যাবো······

মানদা জানিতেন, বিকারে রোগী বাড়ি যাওয়ার কথা বলিলে তাহাকে ফিরান কঠিন হয়; তাই তিনি রামকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে যাইতে বলিতেন। রাম বিষণ্ণ মনে বাহিরে গিয়া বসিয়া থাকিত। এই বিপদে কি কেহ মন শান্ত করিয়া পরীক্ষার পড়া পড়িতে পারে?

কিন্তু নন্দকে সে কথা বলিতে তাঁহার মনে থাকিত না। সে কিছু করিতে গেলে, লাল চক্ষু খুলিয়া বলিতেন, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না বাবা, শুভিকে বল সে আসুক না, শুভি গেল কোথায়?

শুভি কাছে আসিয়া ডাকিত, বাবা, কি বলচো? আবার চোখ খুলিয়া তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিতেন, কিছু বলিনি..... কোথায় যাস্? বলিতে বলিতে ভারি পল্লব দুটি চখের অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়া দিত।

মানদা ভয় পাইতেন, এযে শিব-চক্ষু!

সেদিন অঝোরে বর্ষা নামিয়াছে, সনাতন সকালেও চোখ চাহিলেন না। মানদা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, অসময়ের বৃষ্টি; কি না বিপদ ঘটে! শীতের বাদলায় কবিরাজ ঘর হইতে বাহির হইতে সাহস করেন নাই; বলিয়াছেন, একটু নরম পড়িলেই আসিবেন।

দুপুরে বর্ষা আরো চাপিয়া আসিল; মেঘ গর্জ্জন আর বৃষ্টির অবধি নাই। মানদা রামকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই যেমন ক'রে পারিস, কবরেজ মশাইকে নিয়ে আয়। আমার ভাল বোধ হয় না, এত ঘুম কিসের?

হরি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, কিন্তু মা, বেশ সুস্থ মানুষের মতই ত ঘুমুচ্চেন।

মানদা রাগ করিলেন, তুই সব জানিস্, দেখ্‌চিস্‌নে, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্চে?

রাম কবিরাজ মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, বাপু বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে, আমি অসুস্থ হব, তখন কে চিকিৎসা করবে ?

খুবই যুক্তির কথা। রাম ভাবিতে ভাবিতে নন্দর কাছে পরামর্শের জন্য গেল।

সাম্‌নে ব্রজকিশোর বসিয়াছিলেন, রামকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে, দাদা কেমন ? আজ বাদলার জন্যে আমি যেতে পারিনি।

রাম বলিল, ভাল বোধ হয় না ; আজ সকালে উঠেন্ নি ; কেবল ঘুমোচ্চেন্। এদিকে জ্বরটা খুব বেশী মনে হয়।

তাইতো, বলিয়া ব্রজকিশোর চিন্তিত হইয়া পড়িলেন. ক'ব্‌রেজ মশাই কি বলেন ?

রাম কহিল, তিনি আজ যেতেই পারেন নি—এই বর্ষায় তাঁর পক্ষে ঘরের বার হওয়াই শক্ত।

ব্রজকিশোর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া ডাকিলেন নন্দ, ও নন্দ. কাহারদের ডেকে পাঠাতো। সেকি কথা, পাল্‌কি নিয়ে কব্‌রেজ মশাইকে নিয়ে যাক্ ; তারপর তাঁকে রেখে আমাকেও নিয়ে যেতে ব'লে দিস্।

ঘণ্টা দুই পরে কবিরাজ মহাশয় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া নাড়ি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তাইতো শ্লেস্মায় যে দেহ পূর্ণ হ'য়ে গেছে ! এতো কাল বিকেলে ছিল না, এই বিশ-বাইশ ঘণ্টার মধ্যে দেখি, শ্লেস্মা মারাত্মক কুপিত হ'য়ে গেছে !

ব্রজকিশোর কবিরাজ মহাশয়কে নিভৃতে ডাকিয়া বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন যে একবার ডাক্তারকে দিয়া বুকটা পরীক্ষা করান একান্ত প্রয়োজন।

কবিরাজ মহাশয় মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, কিন্তু একটা ভয় করে……

কি ?

শেষ পর্য্যন্ত আবার বৈদ্য-সঙ্কট না হ'য়ে দাঁড়ায় !

ব্রজকিশোর হাসিলেন, কিন্তু এদিকে যে জীবন-সঙ্কট !

কবিরাজ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন, খানিকপরে বলিলেন, ওরা একবার বাগ্ পেলে যেন চেপে ধরতে চায়।

রাম সেখানে আসিয়া বলিল, মা বোলচেন্, বাবা ডাক্তারি ওষুধ খান না !

ব্রজকিশোর যেন একটু তাতিয়া উঠিলেন, আরে ! প্রাণ আগে না, জাত আগে ?

কবিরাজ মহাশয়ের স্তব্ধ হাসিতে একটি কথা যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ; রায় মশাই, বলেন কি ? ধর্ম্মের কাছে প্রাণ কোন্ ছার ?

রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া ব্রজকিশোর বলিলেন, ডাক্তারে বুকটাতো পরীক্ষা ক'রে দেখুক, যদি দরকার হয় ওদের মালিশ, পুল্‌টিস্ গুলোও ত' চ'লতে পারে; ওষুধ না হয়, কব্‌রেজ মশাই-এরই চল্‌বে।

ডাক্তার আসিলেন, বুক পরীক্ষা করিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, ডবোল নিমোনিয়া!

এই কথা দুইটা মানদার বুকে যেন একটা ষাঁড়ের দুইটা সিংএর মত গোঁতা মারিয়া গেল।

কিন্তু অবসন্ন হইয়া পড়িবার অবসর নাই। একদিকে মালিশ পুল্‌টিসের রথ দোল; আর একদিকে পাঁচন সিদ্ধের দুর্গোৎসব বাধিয়া গেল!

সেদিন কবিরাজ মহাশয় মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া বলিলেন, আজ তেরো দিন, যদি আজ রক্ষা হয় ত' বুঝবো মহাকালী মুখ তুলে চাইলেন।

কিন্তু ভাল লক্ষণ দিনের মধ্যে একটিও দেখা গেল না; ক্রমেই শ্বাসকষ্ট বাড়িয়া উঠিতেছে; মধ্যে মধ্যে একটা গোঁয়ানির শব্দ মনে হয়, একটা মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় রোগীকে অস্থির করিয়া দিতেছে!

মানদা আর ঘরে থাকিতে পারেন না; কষ্ট দেখিয়া দুই-চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। মনে হয়, মা কালি, আর যে কষ্ট চোখে দেখ্‌তে পারিনে। তোমার মনে কি আছে?

নিবিড় অন্ধকার লইয়া বিপদের নিশা সমাগত হইল। তখন যমে-মানুষের যুদ্ধ চলিয়াছে। রাম আর নন্দ গালে হাত দিয়া রোগীর দুই পাশে; পায়ে হাত দিয়া শুভদা বসিয়া। মানদা অদূরে একটা মাদুরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া আছেন।

রাত আর কাটিতে চাহে না। নন্দ বলিল, রাম তুই আর শুভি একটু শুয়ে নে; আমি তোদের তিনটের সময় ডেকে দিয়ে শুতে যাবো।

রাম বলিল, তুমি শোও গিয়ে, তিনটের সময় উঠো।

নন্দ রাজি হইল না; না না তোরা ক'দিন শুস্‌নি, শুগে যা।

রাম গেল, শুভদা যাইতে চাহে না। সে আজ দুইরাত্রি খাড়া বসিয়া আছে। শুইলে চক্ষে ঘুম আসে না!

সনাতন প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিলেন। কাহার সহিত কলহ হইতেছে—শুন্‌বিনে আমার কথা? তবে যা ইচ্ছে তাই কর, আমি যে আর পারিনে, পাষাণি!......কাল যাবো, কালই, দেরী হবে না!......

শুভি বলিল, নন্দদা, ভয় করে।

ভয় কি শুভি, বিকারে এমন হয়।

আবার প্রলাপ আরম্ভ হইল ঃ—ভাই আমাকে ক্ষমা ক'রো, ভাই না বুঝে তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি।......রাম, রাম... . হরি, হরি, তাড়িয়ে দে...বেটাকে, লোভী, বেটার আক্কেল নেই!

শুভি আবার বলিল, নন্দদা, ভয় করে, এমন কোরছেন কেন?

ভয় কি বোন, রোগে মানুষ ভুল কথা কয়, সেরে যাবে।

শুভদা কাঁদিতে লাগিল।

ছিঃ শুভি, কাঁদতে নেই, উনি জানতে পারলে, দুঃখ পাবেন, ভয় পাবেন।

শুভদা কান্না সম্বরণ করিল।

সনাতন শান্ত হইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন।

সনাতন হঠাৎ চোখ চাহিলেন, ঠিক সুস্থ মানুষের মত।

কিছুক্ষণ নন্দর মুখের দিকে অবলোকন করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, জল দাও।

শুভি জল ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তাঁহার মুখের মধ্যে দিল।

জল পান করিয়া বলিলেন আমি ভাল আছি, আমায় বসিয়ে দাও না......

নন্দ বলিল আপনি, যে বড় দুর্ব্বল হয়েছেন, জেঠামহাশয়; আপনি আজ বসতে পারবেন না যে।

পারবো না? বলিয়া আবার একটু হাসিলেন, তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা ছিল, নন্দ; ভারি দরকারি কথা......

বলুন, জেঠামহাশয়।

সনাতন বলিতে লাগিলেন,

আমি আপত্তি করেছিলুম তিরস্কার ক'রেছিলুম; একটি কথা না কয়ে চলে গেল...

নন্দ বুঝিল এই সকল প্রলাপের অংশ। সে কোন প্রশ্ন করিল না; প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হয় না।

সনাতন আবার বলিতে লাগিলেন,

বুঝেছ নন্দ, একটি কথা না কয়ে চলে গেল। তখন মহাকালী ডেকে বল্লেন, একি করছিস্ তুই মূর্খ?... ... কাঁদলুম; মায়ের পা ধরে অনেক কাঁদলুম; কিন্তু মার কঠিন আদেশ, নন্দ, মা আমার কোন কথা শুনবে না, পাষাণী, পাষাণী মা!......একটু জল দাও......

জলপান করিয়া সনাতন কহিলেন, ব্রজকে ব'লো তার আবেদন মা গ্রাহ্য করেছেন, সে ডিক্রী পেয়েছে—আমার মামলা ডিস্‌মিস্‌......

শুভিকে, বুঝেছ নন্দ ? শুভিকে ঘরে নিয়ে যেতে চায়...... কি করবো, মার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক ? মা হাস্‌চে—ঐ আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাই··· পাষাণী মা !

বলিতে বলিতে সনাতন শ্রান্ত হইয়া আবেশাচ্ছন্ন হইল। শুভদা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল ; নন্দ একদৃষ্টে সনাতনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সনাতন আবার জল জল বলিয়া জাগিয়া উঠিলেন। জল পান করিয়া বিপুল বৈরাগ্যভরে হাসিয়া বলিলেন, মা ডাক্‌চে, বল্‌চে আর কেন ? কাজ শেষ করে চলে আয় ! কাজ শেষ কর্‌তে হবে !

তিনি ধীরে ধীরে নন্দর একখানি হাত ধরিলেন, তাহার পর শুভদাকে ডাকিলেন, আয়মা, এদিকে। শুভদা আসিলে তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, নন্দ, শুন্‌চো বাপ্‌, মার আজ্ঞায় আমি শুভিকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম। আমার কাজ শেষ হ'লো...বলিতে বলিতে তিনি গভীর নিদ্রা-মগ্ন হইলেন।

মেঘ-মুক্ত আকাশে রবির কিরণ ঝলকিয়া উঠিল। সেই অবসরে সনাতনের প্রাণ সকল রোগ-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া—মহাব্যোমে লীন হইয়া গেল।

পার্শ্বে বসিয়া স্বজন-পরিবার ক্রন্দনের রোল তুলিল। প্রতিবেশীরা ছুটিয়া দেখিতে আসিলেন। তখন পথিক জীর্ণ পান্থশালা ত্যাগ করিয়া—নূতনতর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন !

রাম মাথা তুলিয়া পিতার মুখাবলোকন করিয়া বুঝিল—যে-পর্ব্বতের পিছনে এতদিন নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইয়াছে তাহা বিধাতার অমোঘ বিধানে নিমেষে অপসৃত হইয়াছে। সে কাঁদিয়া মানদার পায়ের কাছে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, মা আমাদের আজ কি হ'লো গো !

মানদা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, রাম অধীর হ'য়ো না বাপ্‌ ; বাপ্‌-মা কারুর চিরদিনের জন্য নয়। মনকে শক্ত কর, তুমিইত এখন আমাদের ভরসা !

রাম জননীর অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(৯)

মৃত্যুর পরেও মুক্তি নাই ! দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় ; কিন্তু আত্মা ? আত্মার সদ্গতি চাই।

শোকের অবসর কোথায় ? সনাতনের আত্মার সদ্গতির জন্য রামকে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইল। লোকচক্ষু বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া আছে, আজ দেখিবে পিতৃ-ভক্তি কতখান'

পরামর্শদাতার অভাব হয় না। দেখো বাবা, মুখুয্যে মশায় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁর শেষ কাজে যেন কোন ক্রুটি না হয়।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল।

চতুর্থ দিনে লোকে ক্ষোভ করিয়া গেল; শুভির বে' যদি দিয়ে যেতে পারতেন, তা'হলে তার হাতের জল পেতেন; একেই বলে ভাগ্য! তাইতো তিনি অত ব্যস্ত হয়েছিলেন! শুভদার শত অপরাধের উপর আর একটা অপরাধ বাড়িল!

সেদিন সন্ধ্যার পর ব্রজকিশোর আসিলেন। প্রত্যহই আসিতেছিলেন, তবে সেদিন ইচ্ছা ছিল ক্রিয়া-কর্ম্মের বিষয় পরামর্শ আলোচনা করেন।

রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছু ঠিক-ঠিকানা ক'রেছ?

রাম আর্দ্রচক্ষে মাথা নিচু করিয়া বলিল, আমি ত কিছু জানিনে কাকাবাবু; আপনি যেমন বল্‌বেন তাই করবো।

ব্রজকিশোর খানিক চিন্তা করিয়া বলিলেন, সবই নির্ভর করে অবস্থার ওপরে; দাদা কি রেখে যেতে পেরেচেন?

রাম বলিল, তাতো কিছুই জানিনে।

তুমি ছেলেমানুষ, তোমার মা বল্‌তে পারবেন।

হরি বলিল, বোধকরি মাও কিছুই জানেন না; বাবা টাকা কড়ির কথা কাউকে কিছুই ব'লতেন না; শুধু ব'লতেন, কিছুই নেই।

ব্রজকিশোর একটু হাসিলেন, তা' বল্লে চলে কৈ বাবা, এ পিতৃ-ঋণ, এ তোমাদের শোধ করতেই হবে।...

আরো খানিক বসিয়া অবশেষে বলিলেন, তবে আজ উঠি। তোমরা আজ রাতে তাঁর কি আছে নেই ঠিক কর। তারপর কাল বসা যাবে। আর দিন ত' বড় বেশী রইল না!

রাত্রে সকলে একত্রে শুইত।

শুইবার আগে রাম মানদার কাছে গিয়া বসিল। মানদা ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। রামের মনটা অনেকটা শান্ত হইল; নিদারুণ শোকের সময় কথায় সান্ত্বনা হয় না।

রাম বলিল, নন্দর বাবা এসেছিলেন, মা।

মানদা তাহা জানিতেন, তাই উত্তরে বলিলেন, হুঁ; কি বলেন তিনি?

কাজ-কর্ম্মের কি রকম কি ব্যবস্থা হচ্চে—তাই জান্‌তে চাচ্ছিলেন।

মানদা বলিলেন, তোরা কি বল্লি ?

কি বল্‌বো ? আমরা কি কিছু জানি !

তারপর ?

তারপর, তিনি বল্লেন, সবই নির্ভর করে অবস্থার ওপর ; কি আছে না আছে—সেই কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

মানদা বলিলেন, কি আবার থাক্‌বে ? আমরা কি জমিদার ?……দুঃখের সংসারে, দুঃখ কষ্ট ক'রেই—যা পারা যাবে করতে হবে।

রাম চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরের কথা তাহার যেন আর মুখে আসে না।

অনেকক্ষণ পরে রাম বলিল, দিন তো এগিয়ে আস্‌চে, মা, একটা কিছু করতে তো হবে ?

মানদা বলিলেন, পুরুৎঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলি ? তিনি কি বলেন ?

তিনি বলেন, বৃষ না করলে ভারি নিন্দে হবে।

মানদা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, বৃষ করলেই কি নিন্দের হাত থেকে রক্ষে পাবি, রাম ? গরীবের কপালে নিন্দে ছাড়া আর কিছুই লেখা থাকে না।

তবে কি ক'রবো, মা ?

বৃষই কর। দেনা ক'রতে হবে।

কে ধার দেবে ?

ওই, জমিদারই দেবে—আবার কে দেবে ? বাড়ি বন্ধক রাখ্‌তে হবে বোধ হয়।

রাম বলিল, বাড়ি বন্ধক ? সে কথ্‌খনোই হবে না, মা। উঃ ও কথা মনে করলেও আমার বুক ফেটে যায়।

সকালে সনাতনের বাক্স খোলা হইল। মৃতের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা-সম্মানের সহিত এক টুকরা কাগজ পর্য্যন্ত সতর্কতার সহিত তুলিয়া রাখা হইতেছিল। তিনি কি করিতেন না করিতেন, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির নিদর্শন ছিল ; কিন্তু সব চেয়ে বিস্ময়ের--তাঁহার দূর-দৃষ্টি !

তাঁহার শব লইয়া বিধবা কিম্বা নাবালক পুত্র-কন্যা বিপন্ন না হয়—তাই অন্ত্যেষ্টির জন্য একটি কাগজে মোড়া কয়েকটি টাকা ! তাহার পিঠে উদ্দেশ্যটি ছোট করিয়া লেখা।

শ্রাদ্ধের জন্য মাত্র পঞ্চাশ টাকা রহিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে আর একখানি কাগজে লিখিয়াছেন ; এই টাকায় কোন সমারোহ হইবে না ; পরন্তু সমারোহের প্রয়োজন কি ? কন্যাগুলির বিবাহ দিতে হইবে। রাম এবং হরি বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই কার্য্য করিবে ; তবে ইহাতে গৃহিণীর মতামত সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইবে।

এই কথা গুলি শুনিয়া মানদা চিন্তাকুল হইলেন। তিনি কর্ত্তাকে চিনিতেন, বুঝিলেন যে সমারোহে তাঁহার একান্ত অমত ছিল না, তবে অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি সমারোহ না হয়, তাহাতেও তাঁহার ক্ষোভের বিশেষ কোন কারণ হইবে না।

অনেক চিন্তা করিয়া মানদা বলিলেন, কিন্তু এ কথা আমাদের ভাব্‌তে হবে যে শুভির বে আমরা অল্প দিনের মধ্যেই দেব।

রাম বিস্মিত হইয়া মার মুখের দিকে চাহিল, কেন মা?

কেন? এই ভাবনা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই ত' তাঁর দেহ-পাত হলো! এ কাজে আর দেরি করলে চ'ল্‌বে না।

হরি বলিল, বাবা এত চেষ্টা করে পেরে উঠ্‌লেন না······

মানদা বাধা দিয়া বলিলেন, তাঁকে আমি বাধা দিয়েছিলুম; কিন্তু আজ আমি বুঝেছি যে সে কাজ আমি ভাল করিনি। আমি মনে করেছি চণ্ডীতলার জমিদার, ঐ ভবশঙ্কর গাঙ্গুলীর সঙ্গেই শুভির বে দিতে হবে। পূর্ব্ব-পুরুষ আর ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে, কি হ'তে কি হলো······ বলিয়া মানদা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রাম কহিল, মা তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব না; তবে যে দায়ে এখন এসে ঠেকেছি, তা থেকে কি করে মুক্তি পাই বল।

মানদা বলিলেন, পুরুৎমশাইকে আর একবার ডাক, ডেকে জান যে কত কমে বৃষ হ'তে পারে, তাঁর আত্মার তৃপ্তি, এটাও ত মস্ত কাজ!

রাম বলিল, আমি তা জিজ্ঞেস করেছি মা সে অনেক বেশী; আরো অন্ততঃ দু'শো চাই।

মানদা বলিলেন, এ টাকাই বা আসে কোত্থেকে?

হরি বলিল, কেন কাকা বাবুকে বল্‌লে, তিনি দিতে পারেন......

মানদা বলিলেন, তা পারেন; কিন্তু তাঁহার কাছ থেকে টাকা নিলে, আমরা নিশ্চয় বাড়ি বন্ধক দিয়ে নেবো ...

কেন মা? রাম জিজ্ঞাসা করিল।

আমি কারণ বলবো না; কিন্তু এ নইলেও টাকা নেওয়া হবে না।·········

রাম এবং হরি অবনত মুখে মাতার এই কঠিন আজ্ঞা শুনিয়া বুঝিল, যে এমন কোন কারণ ঘটিয়াছিল যাহা পিতা তাঁহাকে বলিয়াছেন, কিন্তু মাতা তাহা প্রকাশ করবেন না।

ব্যাপারটা দুই ভায়ের বুকের উপর শেলের মত চাপ দিয়া রহিল।

•

ব্রজকিশোর শান্ত হইয়া সকল কথা শুনিলেন। মানদার জিদের অর্থ বুঝিতে তাঁহার

দেরি হইল না। তাঁহার অনুরোধটি—সনাতনের বুকে বজ্রের মত ব্যথা দিয়াছিল; মনে করিয়া দুঃখ পাইলেন; মনে করিলেন, সেদিন ও-কথাটা না বল্লেই হ'তো।

অবশেষে ব্রজকিশোর বলিলেন, আমি দাদার শ্রাদ্ধে একশো টাকা দেব মনে করেছি, আশা করি, তোমরা এর জন্য কিছু মনে করবে না। আর বাকি একশোর জন্য বাড়ি বন্ধক দিতে হবে বলে ত' মনে হয় না। হ্যাণ্ড নোট দিয়ে টাকা আনায়াসেই ত পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু কে দেবে? রাম প্রশ্ন করিল।

সে ব্যবস্থা পরে হবে। তোমারা পুরুৎঠাকুরকে ডেকে কাজে অগ্রসর হও। আর দেরি করলে বিব্রত হয়ে পড়বে। বলিয়া উঠিয়া যাইবার সময় ব্রজকিশোর রামের হাতে একখানি একশত টাকার নোট দিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রাদ্ধ শেষ হইল। অনুমানের অপেক্ষা খরচ বেশী পড়িল। কবিরাজ মহাশয় রামের নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইয়া দেড়শত টাকা ধার দিলেন; কিন্তু সকলেই জানিল, কাহার টাকা তিনি দিলেন।

কাজকর্ম্মের পর মানদা একদিন রামকে ডাকিয়া বলিলেন, একটা চিঠি চণ্ডীতলায় লিখে দিয়ে পুরুৎঠাকুরকে পাঠিয়ে দি, কি বলিস্?

তা দাও।

কাগজ কলম নিয়ে আয়, তুই তো লিখবি।

রাম চিঠিতে লিখিল যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে; তাহার ভগ্নী কিন্তু অরক্ষণীয়া,—অতএব এক বৎসরের মধ্যে বিবাহ হওয়া শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইবে না। এখন তিনি আসিয়া তাহার ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া—বিবাহের দিন স্থির করেন।

ভবশঙ্কর পত্রের উত্তর দিলেন না; তবে পুরোহিত ঠাকুরের মুখে বলিয়া পাঠাইলেন যে এক বৎসরের মধ্যে ঐ কন্যাকে তিনি বিবাহ করিবেন না; কারণ তাহার কালাশৌচ। এবং এক বৎসর তাঁহার পক্ষে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তবে ভাগ্যের কথা কিছুই বলা যায় না; যদি কোন দিন প্রয়োজন বোধ করেন ত' সংবাদ দিবেন।

পুরোহিত ঠাকুর আভাসে বলিলেন, সেদিন ব্যাভারটা তো ভাল হয়নি; ঐ গাঁয়ের ছোঁড়ারা—তাঁকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে।

মানদা সকল কথা শুনিয়া স্তব্ধ-নীরবে রহিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। মানদার শরীর ভাল নয় বলিয়া শুইয়া ছিলেন। নন্দ আসিয়া কাছে বসিল।

জেঠিমা, শরীর বুঝি ভাল নেই ?

মানদা বলিলেন, ক'দিন ধরেই সন্ধ্যের পর গা ম্যাটি-ম্যাটি করে ; আজ যেন একটু জ্বরই হ'য়েছে ব'লে মনে হয়। নইলে রগ্‌ টিপ-টিপ্‌ কর্‌বে কেন ?

নন্দ গায়ে হাত দিয়া দেখিল, হাঁ, বেশ স্পষ্ট জ্বরই হ'য়েছে। কাল একবার কব্‌রেজ মশাইকে ডেকে আনবো।

মানদা বলিলেন, না বাবা, সে সব হাঙ্গাম আর তোমায় কর্‌তে হবে না ; মেয়ে মান্‌ষের জ্বর গায়ে গায়ে সেরে যায়।

নন্দ বলিল, কিন্তু গোড়ায় একটু সাবধান হ'লে আর ভোগায় না।

মানদা বোধ হয় বিষয় পরিবর্ত্তনের জন্য বলিলেন, তোমাদের কবে গিয়ে আস্‌তে হবে, কোল্‌কেতায় ?

নন্দ বলিল, আর দিন কুড়ি বাইশ রইল জেঠাইমা, দিন আষ্টেক থাক্‌তে গেলেই চল্‌বে !

মানদা কতকটা নিজের মনে মনেই বলিলেন, সে আবার কতকগুলো খরচপত্র আছে ; কোত্থেকে যে কি হয়, তা ভেবেই উঠ্‌তে পারিনে ! সাধে কি বলে যে মেয়ে-মানুষ, মানুষ নয় ; দশহাত কাপড়ে কাছা নেই !

নন্দ একটু হাসিল। বলিল, তার জন্য ভাবনা কি, বাবা তো আমাকে সেকেণ্ড ক্লাশের ভাড়া দেবেন, ওতেই আমরা দু'জন চ'লে যাব।

মানদা বলিলেন, কতদিন এমনি ক'রে চলে ! এদিকে ঘরে মেয়ে ধুবড়ি হ'য়ে রইল,······ মনে ক'রেছিলুম, জমিদারেরা নিয়ে যাবে, তাও ত হয় না দেখি ...

এই কথায় নন্দ যেন মনে একটু আঘাত পাইল। সে বলিল, আর যাই করেন জেঠিমা, ও-লোকটার হাতে দেবেন না।

কুলীন, উপযুক্ত পাত্তর ত চোখে পড়ে না ; আর তাদের খাঁই বেশি ! কিন্তু মেয়েতো আর ঘরে রাখা যায় না ! আর রেখেই বা কি শুভ হলো।

নন্দ বলিল, কিন্তু যাই বলুন জেঠিমা, একথা কিন্তু আপনার উপযুক্ত নয়, একদিন আপনি এর ঠিক উল্টোই বলে এসেছেন।

মানদা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাতে লাভটা কি হলো ? যাঁর বাড়ী, যাঁর ঘর, এই ছেলে, মেয়ে,—তিনিই চলে গেলেন······

মানদা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন। নন্দ বুঝিল একথা আর না বলাই উচিত।

অতর্কিতে যেন মানদা বলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু বাপু, বংশজের ঘরে আমি কিছুতেই মেয়ে দেব না······

নন্দর গালে কে যেন অকস্মাৎ চড় মারিয়া গেল।

নন্দ কথার কোন উত্তর দিল না ; কিন্তু তাহার মনে হইল যে, হয়ত শুভদার অসাবধানতায় সে-রাত্রের কথা মানদা জানিতে পারিয়াছেন। হয় শুভদাকে তিনি বিশ্বাস করেন নাই; নয়ত, সনাতনের বিকারের কথা অগ্রাহ্য করিয়া তিনি তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেই চান যে শুভদার সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না।

ধীরে ধীরে নন্দ সেখান হইতে উঠিয়া গেল। যতই সে এই কথা লইয়া মনে মনে আলোচনা করিল, নিজেকে ততই তাহার ক্ষুদ্র এবং নীচাশয় বলিয়া প্রতিভাত হইল। তাহার মনে হইল, একথা জানিলে, লোকে স্পষ্টই বুঝিবে কেন সে রামের সহিত বন্ধুত্ব করে, কেনই বা এই পরিবারের উপকার করিতে সকল সময়ে সে এত উন্মুখ এবং অগ্রসর।

লজ্জায়, ঘৃণায়, আত্ম-ধিক্কারে নন্দর মন একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু এ কথা আর কাহাকেও বলা চলে না ; অধিকন্তু শুভদাকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া আবশ্যক, যেন এই কথা সে আর কোনদিন দ্বিতীয়-বার মুখে উচ্চারণ না করে!

শুভদার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে নন্দর লজ্জা হইল। মনে হইল, মানদা যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন তাহা হইলে আরো কি মনে করিতে পারেন। তাই বাড়ি গিয়া শুভদাকে একখানি পত্র দিল।

পত্রখানি ক্ষুদ্র কিন্তু খুব স্পষ্ট কথায়। সে বার বার শুভদাকে অনুরোধ করিল যে জীবনে যেন সে সে-রাত্রের কথা—কাহাকেও না বলে : বলিলে তাহার দুঃখ এবং লজ্জার অবধি থাকিবে না।

নন্দর ব্যবহারের ভাবান্তর দেখিয়া রাম অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া গেল। নন্দ আর বড় বেশী আসে না। পড়া-শুনায় অপরিসীম ঔদাসীন্য!

রাম তাহাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, নন্দ, তুমি কি এক্‌জামিন দেবে না মনে ক'রেছ?

সে গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই ভাবচি।

রাম কতকটা বিরক্ত হইয়া বলিল, পরীক্ষার কাছা-কাছি, ফি-বার, কি যে তোমার হয়! অমন করলে চ'ল্‌বে না বলে দিচ্চি। কাল থেকে ঠিক সময়ে এসে আবার নিয়মমত পড়া-শুনো কর্‌তে হবে।

নন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে, চেষ্টা ক'রবো রাম, কিন্তু ভাই, তোকে সত্যি বলি, আমার আর কিছুতেই মন বসে না।

শুভদার বই-কাগজ নাড়িতে চাড়িতে নন্দর পত্রখানি জ্ঞেনীর হাতে পড়িল, সে সেখানি লইয়া শুভদাকে জিজ্ঞাসা করিতে গেল, দিদি, এ কার চিঠিরে ? নন্দদা তোকে লিখেছে ?

শুভদা ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চিঠিখানি জ্ঞানদার হাত হইতে কাড়িয়া লইল।

কিন্তু ব্যাপার এখানে শেষ হইল না। জ্ঞানদা মনে ঈর্ষা বশতঃই বোধ হয়, মানদাকে গিয়া এই সংবাদ দিল।

মানদা প্রথমে বিস্মিত হইলেন, কি এমন কথা নন্দর থাকিতে পারে যে সে শুভদাকে পত্র দেয় ?

শুভদার ডাক পড়িল।

তোকে নন্দ চিঠি দিয়েছে ?

শুভদা লজ্জায় উত্তর করিতে পারিল না। মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

জ্ঞানদা বলিল, আমি দেখেছি সে চিঠি, দিদি আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে, মা।

মানদা রাগ করিয়া বলিলেন, নিয়ে আয় সে চিঠি, আমি দেখ্‌তে চাই, কি কথা নন্দ তোকে লেখে।

শুভদা সে পত্র কিছুতেই কাহাকেও দেখাইল না।

মানদা বলিলেন, দেখ্ রাম, নন্দর একটা ব্যবহার আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারিনে! আচ্ছা বল্‌তো, ওর কি দরকার হ'লো শুভিকে চিঠি দেবার ?

রামও বিস্মিত হইল, চিঠি! চিঠি! চিঠি কেন ?

কেন তা' কি ক'রে ব'লবো রে।

তুমি দেখেছো সে চিঠি ? রাম জিজ্ঞাসা করিল।

দেখ্‌বো ? ওই থুবড়ি বুড়ী, কাউকে কি দেখ্‌তে দেবে ? পেটে-পেটে কত শয়তানি জানে।

রাম বলিল, ছেড়ে দাও মা, কি সব ছেলে-মান্‌ষি করে ওরা।

মানদা বলিলেন, এ ছেড়ে দেবার কথা নয় রাম। নন্দকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে বংশজের ঘরে আমি মেয়ে দেব না।

রাম বলিল, তাই কি ও বল্‌চে যে শুভিকে বে করবে ?

মানদা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, ও বলে কি না বলে, জানিনে, ওর বাপ বলে। সেদিন মহাকালীর মন্দিরে কি অপমানটা না গেছে! তারপরই ত' এত বড় অসুখ ওঁর হ'লো।

রাম স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল।

জননীর মতের কঠিন পরিবর্ত্তনের সে যেন কতকটা কারণ উপলব্ধি করিল। কেন যে তিনি

ব্রজকিশোরের নিকট টাকা ধার লইতে চাহেন নাই, তাহা আজ তাহার মনে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

পিতার অসামান্য কৌলিন্য-গর্ব্বের কথা মনে করিয়া তাহার চিত্ত বিচলিত হইল। রাম সাশ্রু-নয়নে জননীর চরণ ধরিয়া বলিল, মা আমার কথা বিশ্বাস কর, তোমার ইচ্ছা আর আদেশের বাইরে আমি আর কোন দিন যাবো না।

অঞ্চল দিয়া মানদা চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রাম, পিতার উপযুক্ত হও।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল

১

অনেক সময় ভালই লাগে ভুল গো
মহাকালের নয়ন ঢুলু ঢুলু গো।
ভুলে বায়স কোকিল পালে—
সুধা ঢালে তমাল ডালে
বসুন্ধরা আনন্দে আকুল গো।

২

ভঙ্গ যতি মহা কবির পদ্যে,
মুক্তা তোলা তরী সাগর মধ্যে।
নীল আকাশে ফানুষ উঠা,
মেরুর দেশে মানুষ জোটা,
ফাটাল মাঝে হঠাৎ ফোটা ফুল গো!

৩

ভুলটা আহা অর্জ্জুনেরি লক্ষ্যে
চমক লাগায় বিশ্ববাসীর চক্ষে।
পাগ্‌লা ভোলার মধুর ভুলে
নিঠুর নিষাদ মুক্তি পেলে
এ ভুল করে হৃদয় বেয়াকুল গো।

৪

সাবিত্রীকে যমের দেওয়া বর গো
ভুল ত বটে ভুল যে মনোহর গো।
যম রাজারে দেয় মহিমা
অসীমে দেয় শোভার সীমা,
অকূল মাঝে মোহন উপকূল গো।

৫

ভুল করিয়া তমাল আলিঙ্গন গো
নবঘনে দেখা ক্ষণে ক্ষণ গো
মহা ভাবের আবেশ বলে
হর্ষে ভাসা নয়ন জলে
ভুল নহে সে সকল জ্ঞানের মূল গো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ইউরোপের শিল্পতন্ত্রের বিষয়ে

Bertrand Russellএর অভিমত

শিল্পতন্ত্রের ও জাতীয়তার দুই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের তীব্রতা তাহাকে আমাদের দৃষ্টি থেকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে; তাহা নির্ণয় করা দরকার। তাহা না করিলে বর্ত্তমান অবস্থাকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হইবে না।

শিল্পতন্ত্র বলিতে আমরা কি বুঝি প্রথমে তাহাই স্থির করা যাউক।

শিল্পতন্ত্রের সূচনাতেই বিপুল মূলধনের আবশ্যক হয়। যন্ত্রের বৈচিত্র্যের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। যে বস্তু আমাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছা পূর্ণ করিবে তাহার উৎপাদনের কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার জন্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার তরে আগে থেকেই প্রচুর শ্রম ও অর্থ লাগে। যে মানুষ বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে লাঙ্গল তৈয়ারী করিবার প্রথম সংকল্প করিয়াছিল বস্তুতঃ সেই মানুষই এই শিল্পতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। এই লাঙ্গলে আমাদের ক্ষুধা মিটে না। ইহার দ্বারা শ্রমের লাঘব হয় মাত্র। আজ যে শিল্পতন্ত্র সমস্ত বিশ্বে নানারূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহা এই নীতিরই সম্প্রসারণ মাত্র। যতই দিন যাইতেছে ততই নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে এবং ততই যন্ত্রসৃষ্টির জন্য মূলধনের আবশ্যকতাও বাড়িয়া চলিয়াছে। শুধু তাহাই নয়; অধুনা এই যন্ত্রসৃষ্টির কাজ অধিকাংশ শ্রমিকের বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। রেলওয়ে এই শিল্পতন্ত্রের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিবার সময় প্রচুর মজুরের দরকার হয়; তারপর রেলওয়ে স্থাপিত হইয়া যাইবার পরও উহা হইতে আমাদের কোনও বস্তুগত অভাব পূরণ হয় না। অন্ন বস্ত্রের ন্যায় ইহাকে ভোগ করা যায় না; কিন্তু অন্ন বস্ত্রের সংগ্রহের জন্য ইহাকে আমরা উপায়-স্বরূপে ব্যবহার করি। রেলওয়েকে অবলম্বন করিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিশ্রমে দেশদেশান্তরে যাতায়াত করি এবং দেশদেশান্তর হইতে পণ্য আহরণ করি। যখন এই রেলওয়ে নির্ম্মিত হইতে থাকে তখন ইহা কোনও কাজেই আসে না,—ইহা হইতে তখন আমরা কোনও উপকারই পাই না। যতক্ষণ না ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় ততক্ষণ ইহাতে যে সকল শ্রমিক লিপ্ত থাকে তাহারা তাহাদের সেই শ্রমের ফলের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না,—ততক্ষণ অন্য ধনশালী ব্যক্তির পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত অর্থ হইতেই তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হয়; সুতরাং তাহাদের বর্ত্তমান যেরূপ অতীতের সঞ্চয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হয়—তেমনি তাহাদের বর্ত্তমানকেও তাহার কর্ম্মফল থেকে বঞ্চিত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের সঞ্চয় করিতে হয়। কোনও সমাজে এই শিল্পতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে একটি সাধারণ কাজে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লিপ্ত হইতে পারে এমন মজুর সেই সমাজে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি না। তারপর দেখিতে হইবে সেই সমাজের যে সকল

সম্পদশালী ব্যক্তি ঐ মজুর সমূহের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবেন তাঁরা ভবিষ্যতে অধিকতর লাভ পাওয়ার আশায় তাঁহাদের বর্ত্তমান ভোগকে সঙ্কুচিত অথবা পরিহার করিতে প্রস্তুত আছেন কি না। তৃতীয়তঃ সেই সমাজে দণ্ডনীতির প্রাচুর্ভাব আছে কি না; কেননা তাহা না হইলে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় বর্ত্তমান ভোগকে ত্যাগ করিতে মানুষের প্রবৃত্তিই হইবে না। যদি জানি যে আমরা আজ আমাদের ভোগকে খর্ব্ব করিয়া যাহা সঞ্চয় করিব আমরা ভবিষ্যতে তাহা অবাধে ভোগ করিতে পারিব তাহা হইলেই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হইবে; তাহা না হইলে "Let us eat and drink, for tomorrow we die." এই নীতির অনুসরণ করিয়া মানুষ বর্ত্তমানের মধ্যেই তার কর্ম্মফলকে নিঃশেষ করিয়া দেয়। চতুর্থতঃ সেই সমাজে সুনিপুণ শিল্পী থাকা চাই; কেননা যন্ত্র পরিচালনা করা কৌশল-সাপেক্ষ; ইহা অনিপুণ শ্রমিকের দ্বারা কদাচ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তারপর যন্ত্র সমূহের উদ্ভাবন এবং তাহাদের কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য যন্ত্রকোবিদ্ বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন আছে। ইহাদেরই অভাবে শিল্পতন্ত্রের আবির্ভাব ও প্রসার এতদিন সম্ভব হয় নাই।

শিল্পতন্ত্রের প্রথম বিকাশে দেশের সম্পদ কতিপয় মাত্র ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হয়, তবে যদি কোনও সম্পদশালী দেশ হইতে ধার পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার প্রতীকার হইতে পারে বটে; কিন্তু সেরূপ ঘটনা খুবই বিরল।

প্রথমে এই দারিদ্র্যের কথা ধরা যাউক্। যে দেশে শিল্পতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই সে দেশের উৎপাদিকা-শক্তি অল্পফলপ্রদ হয়; সেখানে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে দিনগত অভাব মোচন হইয়া আর বড় একটা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না। শিল্পতন্ত্রের প্রাতষ্ঠা করিতে গেলেই আশু ফলপ্রসূ কাজ হইতে ছাড়াইয়া কতিপয় শ্রমজীবিকে যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। তার ফলে সদ্য-ব্যবহার্য্য বস্তুর হ্রাস হয় এবং পূর্ব্বের কোনও সঞ্চয় না থাকায়—শ্রমজীবিরা অভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে যদি শিল্পতন্ত্রের প্রসার করা হয়—কিম্বা যদি অন্য কোনও দেশ থেকে ধার পাওয়া যায় তাহা হইলে আর এরূপ হয় না। অভ্যুদয়শালী দেশের সঙ্গে যখন মিত্রতা থাকে তখন ধার করিয়াই কাজ চলিয়া যায়; কিন্তু যখন তাহা না থাকে তখন ধার পাওয়া অসম্ভব হয়; তখন হয় এই দারিদ্র্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হয় আর না হয় শিল্পতন্ত্রকে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে স্থাপিত করিতে হয়।

যে দেশের শিল্প তরুণ অবস্থায় অবস্থিত সে দেশের সম্পদ যে কতিপয় মাত্র ব্যক্তির হস্তে আবদ্ধ থাকিবে ইহা অনিবার্য্য। Great Britain-এ সবার আগে এই শিল্পতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেথায় যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান আছে তাহার মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শিল্পীরা তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। এই আন্দোলন যে শুভাবহ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এবং ইহাকে প্রতিপালন করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহা সমাজনীতির অন্যতর

প্রকাশ। বিলাতের ঐক্য-বাদী বণিকদিগের মধ্যে Russia-তে ১৯১৭।১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই মতের খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল; কিন্তু সেথায় ইহা সম্পূণ-রূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। এখন সেথাকার পাণ্ডারা শিল্পশালাগুলিকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক একজন ব্যক্তির শাসনাধীনে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং উপর থেকে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মতই সেগুলির পরিচালনা করিতেছেন। সেথায় শ্রমজীবিদের আদৌ স্বাতন্ত্র্য নাই। বিলাতের সঙ্গে রাশিয়ার এই বিষয়ে এই যে প্রভেদ দেখা যাইতেছে উহাদের পরস্পরের অবস্থাগত বৈষম্য থেকেই উহা উৎপন্ন হইয়াছে। রাশিয়ার ন্যায়—অনুন্নত ও অনভিজ্ঞ দেশে শিল্পে শ্রমিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, আমার ধারণায় স্বভাবতঃ অসম্ভব। কিন্তু বিলাতের ন্যায় অভ্যুদয়শালী দেশে উহা খুবই সহজ-সাধ্য। এই বৈষম্যের কারণ সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাউক।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি কোনও দেশে শিল্পতন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তন করিতে হইলে যদি কোনও সম্পদশালী দেশান্তর থেকে ঋণ পাওয়া না যায় তাহা হইলে দেশের ইতর সাধারণকে প্রথম প্রথম যাহার পর নাই অভাবের ভাগী হইতে হয়। যদি দেশের শিল্পতন্ত্র এই ইতর সাধারণের কর্ত্তৃত্বাধীন হয় তাহা হইলে তাহারা এই অভাবের কারণ হইতে বিমুখ হইবেই হইবে এবং ভবিষ্যতের আশা কিছুতেই তাহাদের এ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না। বিলাতে শিল্পতন্ত্রের প্রথমাবস্থায়—শ্রমিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কলের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প লোকের দ্বারা বহুলতর পণ্য উৎপন্ন হওয়ায় অনেক লোককে কর্ম্মচ্যুত হইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহারা অনেক কল-কারখানা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। যদি দেশের পণ্য উৎপাদনের উপায় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রমিকেরা স্বাধীন হইত তাহা হইলে বিলাতে কলকারখানার প্রবর্ত্তন-জনিত এই শিল্প-বিপ্লব কিছুতেই সম্ভব হইত না।

শুধু যে এই সাময়িক দারিদ্র্য-বৃদ্ধি থেকে অভিনব শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন অসম্ভব হয় তাহা নয়। ইহা ছাড়া তাহার আর একটি কারণ এই যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কোনও বৃহৎ কাজ করার আস্বাদ না পাওয়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতে তাহাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। স্বেচ্ছাবৃত হইয়া আত্মলোপ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করা মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এরূপ ঘটনার কোনও উদাহরণ বিশ্ব-মানবের ইতিহাসে আছে বলিয়া মনে হয় না। বাহিরের অপ্রতিবিধেয় শক্তির প্রভাবেই বিচিত্র প্রকৃতির মানুষে কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের সাধনায় একযোগে লিপ্ত হয়। তাহার পর যখন এই কাজে তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায় এবং যখন তাহারা ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারে তখন আর বাহিরের চাপের দরকার হয় না। রাষ্ট্র ব্যাপারেও ঠিক ইহাই দৃষ্ট হয়। যে দেশে রাজশক্তি প্রবল থাকে সেই দেশে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্রেই তাহা সুবিহিত হইয়া সার্থক হয়। United statesতেও এই নীতির প্রভাব দেখিতে পাই। সেখানে যাঁহারা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদের চরিত্র বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর

কঠোর শাসনের মধ্যেই গঠিত হইয়াছিল,। কোনও একটি বিশেষ রাজশক্তির আধিপত্য ব্যতীত এই পৃথিবীতে সার্ব্বভৌমিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। একবার উহার প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে এবং উহার মধ্যে কাজ করা অভ্যস্ত হইলে পর স্বায়ত্ত-শাসন সম্ভব হইবে। শিল্প ব্যাপারেও ঠিক এইরূপ হয়। নামে যাহাই হউক কাজে অনুন্নত দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠান মাত্রেই প্রথম প্রথম ধনীদের আধিপত্য থাকিবে। রাশিয়ার Bolshevism ইহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অতএব দেখা যাইতেছে Capitalism (ধনতন্ত্র) ও Socialism অর্থাৎ শ্রমতন্ত্রের মধ্যে যতটা ব্যবধান আছে বলিয়া আমরা কল্পনা করি বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের মধ্যে ততটা ব্যবধান নাই। উহাদের উভয়ের মধ্যে প্রথম অবস্থায় কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায় এবং শেষের অবস্থাতেও আরও কয়েকটি লক্ষণ প্রকাশ পায়। Bolshevik-তন্ত্রের অধীনে রাশিয়ার শিল্পের আজ যে অবস্থা বিলাতের শিল্পও একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই অবস্থাপন্ন ছিল। দীর্ঘ দিন-ব্যাপী পরিশ্রমের পর অপর্য্যাপ্ত আহার, ধর্ম্মঘটের নিষেধ, শিল্পশালার কর্ত্তাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিক্রয় এই সব লক্ষণ বিলাতে একশত বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত এবং এখনও Bolshevik তন্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে। ইহার কারণ অর্থাভাব।

সমাজ-তন্ত্র আজ যে লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছে তাহা কল্যাণকর; কিন্তু যতদিন না শিল্পনীতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষ-লাভ করিবে ততদিন সে সেই লক্ষ্যস্থলে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইংলণ্ড কিম্বা আমেরিকায় দীর্ঘব্যাপী সংগ্রাম ব্যতিরেকে যদি শিল্প-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তাহা হইলে তাহা হইতে যে কল্যাণ উদ্ভূত হইবে তাহাতে সমগ্র দেশবাসীই ধন্য হইবে। তারা দিনে মাত্র চার পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের দ্বারায় জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া দীর্ঘব্যাপী লিপ্ততার ফলে এইসব কাজে তাহাদের অভ্যাস ও শিক্ষা পরিণত হইয়া উঠায় তাহারা সহজেই উহা সুসম্পন্ন করিতে পারিবে,—আর বাহিরের কর্ত্তাদের তত্ত্বাবধান ও শাসনের প্রয়োজন হইবে না। ক্রমান্বয়ে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া ইংলণ্ড বা আমেরিকার পক্ষে খুবই সম্ভব; এবং যদি তাহা হয় তাহা হইলে তাহা বিনা বিপ্লবেই হইবে; কিন্তু যে সব দেশে শিল্পতন্ত্র এখনও অপরিণত অবস্থায় আছে এবং পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই সেই সব দেশে এই তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। নামে হইলেও কাজে হইবে না।

শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক

"সাহিত্য-ধর্ম্ম"

(১)

কোন বস্তুর ধর্ম্ম বলিতে আমরা ঐ বস্তুর স্বভাব বা প্রকৃতিকে বুঝি বা বুঝাই। সাহিত্যের ধর্ম্ম অর্থে আমরা তাহাই বুঝি যাহা না হইলে সাহিত্য সাহিত্যই হয় না। যাহাকে সাহিত্য হইতে হইবে, তাহার এমন কতকগুলি লক্ষণ থাকিবে যাহা দ্বারা আমরা বুঝিব যে, ইহা, ভালই হউক মন্দই হউক, অন্ততঃ সাহিত্য। অনেকের মতে সত্যের প্রকাশ সাহিত্য ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত সব সময়ে হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে মানুষের মন ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া বর্ব্বরতার যুগকে বহুদিক্ হইতে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশ মানব-মনকে বহুমুখে বিকশিত, বহুধারায় প্রবাহিত করিতেছে। নরনারীর যৌন সম্পর্ককে, প্রচলিত বিবাহ-বন্ধনকে পরিবর্ত্তনশীল আধুনিক মানব-মন কোন কোন দিক্ হইতে আঘাত করিতেছে। এই আঘাত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর মনে, একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের বিবেচনায়, অতিমাত্রায় সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। বিকাশের ধারায় নরনারী-সম্পর্কে এই ঘাত-প্রতিঘাত মানব-মনে বিচিত্র রূপ ধারণ করিতেছে। মনের এই বিচিত্র রূপ সাহিত্যে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে। কেননা, সাহিত্য আর যাহাই হউক মানব-মনের প্রকাশ—মিথ্যা প্রকাশ নয়, মানব-মনের সত্য প্রকাশ। মানবমনকে প্রকাশের ভার সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া লইয়াছে। যে যুগের মানব-মন যেমন, আমরা তাহার একটা বড় পরিচয় সেই যুগের সাহিত্য হইতে পাই। সাহিত্য যদি মানব-মনের সত্য চিন্তাকে যথাযথ প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে সভ্যতার ইতিহাসে একের পর আর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে বাধা পাইতাম। যে-যুগের বা যে-জাতির সাহিত্য সে-যুগের এবং সে-জাতির মনোভাবকে যথাযথ প্রকাশ করে নাই সে-জাতির সে যুগের সাহিত্য অন্যায় করিয়াছে। মানব-মনের সত্যের প্রকাশ সাহিত্য চায়। যে-সাহিত্য এই প্রকাশের দাবী অগ্রাহ্য করে, সে-সাহিত্য অপূর্ব্ব প্রতিভার সৃষ্টি হইলেও অন্ততঃ ভণ্ড অসঙ্গত—"অসঙ্গতও" বা যদি না হয় নিশ্চয়ই তাহা "অসত্য"—তাহা অলীক—তাহা একটা মায়া বা মোহ মাত্র। মানব-মনে এমন কি মানব-মনের পঙ্কে যে-সাহিত্যের শিকড় নাই, সে-সাহিত্য যে "পদ্ম" ফোটায় সে পদ্ম রঙ্গীণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাগজের—তাহার গন্ধ নাই। গন্ধহীন কাগজের রঙ্গীণ পদ্ম বাঙ্গালার সাহিত্য-সরোবরে একটা মেকী আভিজাত্যের স্তাবক-ভুলান দাবী লইয়া কতগুলি আছে তাহাও যেমন বিবেচ্য, তেমনি তাহা কতদিন থাকিবে তাহাও দুশ্চিন্তার বিষয়।

(২)

সত্যের প্রকাশ "সঙ্গত" রকমে হওয়া চাই—ইহাই নাকি সাহিত্যের দাবী। সত্যের অসংযত বা "অসঙ্গত" প্রকাশ "সাহিত্য-ধর্ম্ম" নয়—ইহাই নাকি সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত একেবারে অসমীচীন এমন নহে। যাহা কিছু সত্য তাহার যে-কোন রকমের প্রকাশই সঙ্গত নহে এবং অসঙ্গত প্রকাশ নিশ্চয়ই সৎ সাহিত্য নহে। কিন্তু সত্যের সহিত লেশমাত্র সম্বন্ধবিহীন অতিবড় আধ্যাত্মিক ও সুসঙ্গত এবং সমীচীন প্রকাশ-ভঙ্গিমাই সাহিত্য-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা নহে। কেননা, সাহিত্য তাহা হইলে শুধু প্রকাশ ও তাহার ভঙ্গিমাতেই পর্য্যবসিত হয়। আমাদের ধারণা, সাহিত্য শুধু তাহার রচনা-কৌশল বা প্রকাশ-ভঙ্গিমা নয়,—সাহিত্য

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ মানব-মনের সত্যের প্রকাশ। তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, যিনি মানব-মনের এই সত্যকে—অসঙ্গত নয়, সুসঙ্গতরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।

(৩)

বর্ব্বরতার যুগে মানবের শুধু দেহ নয়, মনও বহু পরিমাণে উলঙ্গ ছিল। বর্ব্বরতার যুগ অতিক্রম করিয়া আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সভ্য মানব শুধু যে তাহার নগ্ন দেহের জন্য লজ্জা অনুভব করে তাহা নয়, তাহার নগ্ন মনের জন্যও সে খুব বেশী করিয়া লজ্জা বোধ করে। সভ্যতা শুধু আমাদের দেহ ঢাকে নাই আমাদের মনকেও ঢাকিয়াছে, ঢাকিতেছে। দেহের নগ্নতার মতই মনের নগ্নতাও আমাদের নিকট ক্রমে এখন অসঙ্গত ঠেকে,—বিশ্রী বোধ হয়,—সাহিত্যে তাহার প্রকাশের আমরা প্রতিবাদ করি। সভ্য মানব মন খুলিয়া কথা বলে না, বলিতে পারে না,—মন খুলিয়া লিখিতে পারে না,—সে লজ্জা পায়, মনের সত্যকে—সে সত্য সঙ্গতই হউক আর অসঙ্গতই হউক, ভদ্রতার খাতিরে প্রকাশ করে না, "বে-আব্রুতাকে" সে যথাসাধ্য বর্জ্জন করে। সভ্য মানবের মন এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলিতে চলিতে আজ বহু পরিমাণে একে অন্যের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে,—ভাষা সত্ত্বেও মানবের মন আজ বোবা হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্যের যে কৃত্রিম প্রকাশ-ভঙ্গী এতদিন চলিয়া আসিতেছিল এই কৃত্রিম প্রকাশ-ভঙ্গী মানুষের মনকে বোবা করিয়া রাখিয়াছে, মানব মনের সত্যকে পঙ্গু করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও একের মন অন্যের নিকট আজ সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতে পারিতেছে না। সাহিত্যের কৃত্রিম "সঙ্গত" প্রকাশ-ভঙ্গী অনেকাংশে, এই অবস্থা যেখানে যেখানে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহার জন্য দায়ী। এই অবস্থা ভাল নহে—ইহার প্রতীকার, ইহার প্রতিবাদ স্বাধীনতা-প্রয়াসী মানব-মনে স্বভাবতঃই অঙ্কুরোদ্গম করিয়াছে। সাহিত্যের প্রচলিত কৃত্রিম প্রকাশ-ভঙ্গী আজ উলঙ্গ সত্যের প্রকাশে বিভীষিকা দেখিতেছে। সরল সুস্পষ্ট সত্যের প্রকাশ চিরন্তন সাহিত্য-ধর্ম্মকে যত না আঘাত করিতেছে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক চমকিত ও ভীত করিয়াছে,—সাহিত্যের ক্রম-বিলীয়মান কৃত্রিম প্রকাশ-ভঙ্গীকে। মানব-মনের যে অংশ বোবা হইয়া ছিল, আজ যখন তাহা সহসা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন যে তাহার বলার ভঙ্গী ও প্রকাশের ভঙ্গী কেবল অতীত যুগের কৃত্রিম রচনা-ভঙ্গীতে আবদ্ধ থাকিবে না ইহা নিশ্চয়। মানব-মনের যে অংশকে জোর করিয়া বোবা করিয়া রাখা হইয়াছে, এবং সাহিত্যের যে প্রকার "সুসঙ্গত" রচনা-প্রণালী তাহা করিয়াছে, আজ বাঁধ ভাঙ্গিবার সময় প্রতিঘাত তাহার উপরেই বেশী করিয়াই পড়িবে—ইহাই নিয়ম। এবং ইহাও সাহিত্যধর্ম্ম—অধর্ম্ম নহে।

(৪)

সাহিত্যের ধর্ম্ম অর্থাৎ শুধু তাহার প্রকাশ-লক্ষণ যেমন তার প্রাণ নহে, যে সত্যকে সে প্রকাশ করে তাহাই যেমন সাহিত্যের প্রাণ, তেমনি একের পর আর, এক যুগের পর তাহার পরবর্ত্তী যুগে সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গিমাও এক থাকিতে পারে না। সাহিত্য ভার লইয়াছে মানবের মনকে প্রকাশ করিবার। এই মানবের মন কিছু একক বা নিছক স্বতন্ত্র বস্তু নহে। সমাজে প্রত্যেক মানব-মন বহু নরনারীর মনের ঘাত-সংঘাতে বাঁচিয়া রহিতেছে, গড়িয়া উঠিতেছে। মন কখনও একাকী নহে,—কোন অবস্থাতেই নহে। আজিকার বাঙ্গালীর মন শুধু বাঙ্গালায় আবদ্ধ নহে। আজ হইতে শতবর্ষ পূর্ব্বে রাজা রামমোহনের মনকে চেষ্টা করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানব-মনের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছে। কলিকাতার একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে থাকিয়া শতবর্ষ পূর্ব্বে

রামমোহনকে যেমন বিশ্ব-মানবের মনের সহিত একাত্ম-বোধ করিবার জন্য কত প্রকার আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, আজ শতবর্ষ পরে কালচক্রের পরিবর্ত্তনে রামমোহন হইতে শতাংশে নিকৃষ্ট এবং সঙ্কুচিত বাঙ্গালীর মনের সম্মুখেও বিশ্ব-মানবের মন আপনি আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। এক শতাব্দীতে বাঙ্গালার মনোজগতে এই অদ্ভুত-পূর্ব্ব পরিবর্ত্তন এ যুগে সম্ভব হইয়াছে। পৃথিবীর যে যে দেশে আজিকার দিনে মানব-মনের যে যে "হাট" বসিয়াছে, সেই সমস্ত "হাট" শুধু মাত্র সেই সেই দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে না,--পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে "হাট" বসিয়াছে তাহার কলরব বাঙ্গালী কান পাতিয়া শুনিতেছে, আকৃতি ও প্রকৃতি চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছে, সমস্ত মন ভরিয়া ভাবিতেছে। আজ যে কোন দেশের "হাট", অতি নিশ্চয় করিয়া জানি, পৃথিবীর সর্ব্বদেশের "হাট"। ভারত মহাসমুদ্রের ওপারে বিভিন্ন দেশে মানব-মনের আবৃত সত্যকে আজ আবরণ-মুক্ত করিয়া হাটে বেচাকেনার জন্য আমদানী করা হইতেছে। আবরণ-মুক্ত মানব-মন পুরাতন ব্যবসায়ীদিগের নিকট এক অপরিচিত কাঁচা মাল—তাঁহারা এই প্রকার পণ্য হাটে-বাজারে আমদানী করার পক্ষপাতী নন। এই সমস্ত পণ্যকে তাঁহারা "বোর্‌খা" পরাইয়া উচ্চ-গৃহপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে ও দেখিতে অভ্যস্ত। বোর্‌খা-আবৃত মনকে তাঁহারা জানিতেন শুধু একটা পরদা বা আবরণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় বোরখা-আবৃত মানব, আগে মন তারপরে বোর্‌খা। বোর্‌খা ও মানব-মনে আজ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। প্রাচীন বলিতেছেন বোর্‌খা চাই—ইহা আব্রুতা—ইহা সঙ্গত—ইহা আভিজাত্য; কিন্তু নবীন বলিতেছে, ইহা আগে মন, তার পরে বোর্‌খা, চাই মনের প্রকাশ চাই মনের বিকাশ। বোরখার নূতন নূতন রং, নূতন নূতন ঢং, নূতন নূতন ফ্যাসান একটা কৃত্রিম আবরণ-মাত্র। এই প্রকার আবরণ, হইতে পারে অতীতের একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আভিজাত্য, কিন্তু ইহা মানব-মনের প্রকাশে ও বিকাশে এক প্রচণ্ড বাধা। মানব-মনের বিকাশের জন্য বোর্‌খা-আবৃত মানব-মনই আজ আবরণ-মুক্ত হইয়া স্বেচ্ছায় হাটে আসিয়াছে। আবরণ মায়া। মায়াকে সমবেত মুমুক্ষু মানবাত্মা আজ দেশ-বিদেশে হাট বসাইয়া অস্বীকার করিতেছে। এ দৃশ্য বাঙ্গালী আজ দেখিতেছে না এমন নহে—ভয় যে পাইতেছে না তাহাও নহে,--এবং চীৎকার যে করিতেছে তাহাও আমরা শুনিতেছি। কেন না, বাঙ্গালা দেশেও শুধু বোর্‌খা থাকিলেও হইত, কিন্তু এই হতভাগ্য দেশেও আবার —কি দুর্দ্দৈব!—বোর্‌খার নীচে মানব-মন আছে—যে মানব-মন তাহার মন-ধর্ম্ম অনুসারে বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে একাত্ম-বোধ করিতে বাধ্য। ওদেশে যদি বোর্‌খা ছিঁড়িয়া মানব-মন আবরণ-মুক্ত হয়, তবে এদেশের মানব-মনও কি খুব বেশী দিন বোর্‌খার আবরণ সহ্য করিবে?—মনে ত হয় না! আশা বা ভয় এইখানে।

(৫)

সমাজের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে। সাহিত্য সমাজের একটা অঙ্গ। সাহিত্যের ধর্ম্ম বা তাহার প্রকাশ-ভঙ্গী ও যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিবে। সাহিত্য মনের প্রকাশ এবং মন বর্ব্বর অবস্থা হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। আবরণ প্রত্যেক যুগেই মানব-মন গ্রহণ করিয়াছে—স্বেচ্ছায়। এবং উন্নতিমুখে পরবর্ত্তী যুগে আবরণকে ছিন্ন করিতেই হইয়াছে, তখনই যখন আবরণ মনের উন্নতির পথে বাধা হইয়াছে। একটা বিশেষ জাতির, একটা বিশেষ যুগের সাহিত্যের রচনা-ভঙ্গী ত অতি অল্প কথা, স্বাধীনতা-কামী মানব-মন উন্নতির পথে বাধা হইলে এমন যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাকে পর্য্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সাহিত্যের রচনা-ভঙ্গীকে তাহার প্রকাশের সঙ্গতি ও অসঙ্গতিকে সেই যুগের মানব-মনের সঙ্গে মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে। তবে বুঝা যাইবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা-সাহিত্যের রচনা-ভঙ্গিমাকে, এবং তবেই বুঝা যাইবে বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথের

সাহিত্যের রচনা-ভঙ্গীকে। সধবাই হউক আর বিধবাই হউক, বিমলা ও বিনোদিনীর মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণকে আমরা বর্ব্বর মানব-মনের অসঙ্গত সাহিত্যিক প্রকাশ বলিয়া উপেক্ষা করিব না, পরন্তু বর্ত্তমান যুগের একজন জগৎ-মান্য পাকা ওস্তাদ সাহিত্যিকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইব। এবং সেই সঙ্গে ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে, ভারত সমুদ্রের ওপারে উলঙ্গ মানব-মন হাটে আসিয়া যে কলরব করিতেছে তাহা বাঙ্গালার অন্তঃপুরের মানব-মনকে অতি সাংঘাতিক রকমে আক্রমণ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবির লেখনী সে আক্রমণের কথা এমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছে যে রঘুনন্দনের স্মৃতির বৈঠকের ভগ্নাংশ যেখানে যেখানে আছে সেখানে এই সধবা ও বিধবা নারীর মনস্তত্ত্বের অতি নিপুণ বিশ্লেষণ, সাহিত্যিক রচনা ভঙ্গীর ধারাতেও নির্লজ্জ এবং বর্ব্বরোচিত বলিয়া অবজ্ঞাত ও নিন্দিত হইবে।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী

দাবি

বিশ্ব আমার, এদেশ আমার, বিশ্বনাথের হাতের দান।
ন্যায্য দাবির রাজ্যে কভু সইব নারে অপমান।
প্রাণটি আমার, আমার শরীর ;—
নয়রে কেনা পরের কড়ির ;
শাসানি আর চোখ রাঙ্গানি ক'রব ভবে অবসান।
চল্‌রে সবাই সঙ্গে যাবি,
ছাড়ব নারে পথের দাবি ;
ভাঙ্গব দাস্য হাস্যমুখে সহায় স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

সমর্পণ

দিব, দিব, তোমায় দিব দান,—
আমার গেহ, আমার দেহ, আমার সারা প্রাণ।
আমার গন্ধ, আমার কাঁটা, পাপ্‌ড়ি আমার কীটে-কাটা,
জোয়ার-ভাটা, পুলক-ব্যথা, প্রণয়-অভিমান!
পরাগ সম পিষ্ট হ'য়ে, ধূপের মত পুড়ে',
দিব, দিব তোমায় দানের পাত্রখানি পূরে' ;
রাখ্‌ব নাক লেশ অবশেষ—আমার প্রথম, আমার এ শেষ,
মন্দ-ভালো, আঁধার-আলো, আমার দ্বন্দ্ব, গান!

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

আলেয়া

বৃদ্ধ রাজীবলোচন সাহেবের নিকট ছুটীর দরখাস্ত পেশ করিতে সাহেব দরখাস্তটা দেখিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসির অর্থ রাজীবলোচন বুঝিল। সেই কতবৎসর পূর্ব্বে সে আফিসে প্রবেশ করে, তখন বয়স অল্প ছিল,—সেই হইতে দেহ-যন্ত্রটা ঠিকভাবেই চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহার আফিসে যাতায়াতও তেমনই নির্দ্দিষ্টভাবে চলিয়াছে। ঘড়ির কাঁটাও বোধ হয় এত নিয়মিত কাজ করে না। কত বৎসর কাটিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও কখনও ছুটী লয় নাই, বা আফিস কামাই করে নাই। এই প্রথম ছুটীর দরখাস্ত। সাহেবের হাসির প্রত্যুত্তরে রাজীব একটু অপ্রতিভ হইয়া কৈফিয়ৎস্বরূপ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না, সাহেব কলমটা তুলিয়া লইয়া ছুটী মঞ্জুর করিয়া নাম সহি করিয়া দিলেন।

বাবুরা বলিলেন, হঠাৎ যে ছুটী নিলেন, মৎলবখানা কি, রাজীব-বাবু? বিয়ে থা করে সংসারী হবার মৎলব নাকি? বেশ, করুন, কিন্তু নেমতন্নটা যেন ফাঁক না যায়।

একজনের অল্পদিন বিবাহ হইয়াছে। তিনি একটু হাসিয়া বিজ্ঞের মত বলিলেন, এতদিন যখন ও-কাজটা করেন নি, এই বুড়ো বয়েসে আর করবেন না। আমরা ভুক্তভোগী, বিশ্বাস করুন, বিয়ে করলেই আফশোষ করতে হবে।

রাজীব কিছুই বলিল না। স্মিতহাস্যে সকলের নিকট বিদায় লইয়া বড়বাবুর নিকট গেল। বড়বাবু লোক ভাল, বলিলেন, ছুটী পেয়েছেন ত?

রাজীব ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, পাইয়াছে।

বড়বাবু বলিলেন, তা বেশ। ছুটীতে এখানেই থাকবেন, না, আর কোথাও যাবেন?

রাজীব বিনীতকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে না এখানে থাকবো না। শরীরটা খারাপ, কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসবো।

বড়বাবু বলিলেন সেই ভাল। কলকাতায় থেকে থেকে হাড়ের ভেতর ধোঁয়া ঢুকে গেছে, কিছুদিন বাইরে যাওয়া ভাল। তবে কি জানেন, কলকাতায় এই ধুলো-ধোঁয়া, আর আফিসের এই প্রাণান্তকর চাকরী, এর এক মস্ত মায়া আছে। এ-মায়া ছেড়ে বেশী-দিন কোথাও থাকা চলে না। তবে আপনি বিয়ে থা করেন নি,—আচ্ছা আসুন, নমস্কার।

রাজীব যখন রাস্তায় আসিল, সর্ব্বদায়িত্ব হইতে মুক্তির এক তীব্র অনুভূতি তাহার সর্ব্বাঙ্গ কেমন যেন অবশ করিয়া তুলিতে লাগিল। অন্যদিন সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে বাহির হয়, তারপর একান্ত ক্লান্ত মন ও দেহ লইয়া কোনদিকে চাহিবার অবসর পায় না। তাহার পা দুটো চিরাভ্যস্ত পথ বাহিয়া তাহাকে বাড়ী পৌঁছিয়া দেয়। বাড়ী গিয়া আলো জ্বালিতে হয়, এক ছিলিম তামাক ধরাইয়া বিশ্রাম করিতে করিতে আফিসের কাজ কর্ম্মের কথা ভাবিতে হয়,

তারপর আবার রান্নাঘরে ঢুকিতে হয়। আহারান্তে তামাক টানিতে টানিতে পাশের বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় বসিয়া গোঁসাই-মশায়ের সহিত বিচিত্র গল্পকথা হয়, তারপর শ্রান্ত দেহটা শয্যার উপর এলাইয়া দিতে হয়। এতগুলো কাজ যেন ঘড়ির নিয়মে চলে, কোনদিন ফাঁকও পড়ে না, বা ভাবিতেও হয় না।

কিন্তু আজ এই রৌদ্র-সমুজ্জ্বল রাজপথে দাঁড়াইয়া রাজীবের কেমন একটা যেন ভাবনা আসিতে লাগিল। যে পথ ধরিয়া রোজ হাঁটে, সেই পথটা আজ বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। আলো ও রৌদ্র সমস্ত পথখানিতে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু সে যখন রোজ হাঁটে তখন এত আলোও থাকে না, এত রৌদ্রও থাকে না। সন্ধ্যার পাণ্ডুর ম্লানিমা সমস্ত সহরের উপর ঝুলিতে থাকে, এবং চারিদিকের লোক-জন ও যান-বাহনের বিচিত্র কোলাহল কি একরূপ করুণ ভাবে ভাসিয়া আসে, তাহারই মাঝে এক একটা করিয়া গ্যাসের আলো জ্বলিয়া উঠে। পাশ দিয়া কখন একটা মোটর চলিয়া যায়, তাহার ভিতরের বর্ণচ্ছটা ও সুগন্ধ পথিককে সচকিত করিয়া তুলে। কিন্তু তাহাতেও যেন কোথায় একটা সকরুণ অবসাদ লাগিয়া থাকে।

সারি সারি মোটর ও গাড়ী বৈচিত্র্যহীন গতিতে চলিয়াছে। কোনটা অন্যপথে ঘুরিয়া যাইতেছে এবং তাহার দুইপাশ দিয়া ভ্রূক্ষেপহীন দৃষ্টিতে অসংখ্য লোক চলিয়াছে ও মোড়টা পার হইবার আগে সতর্কদৃষ্টিতে চারিদিকে দেখিয়া লইতেছে। রাজীব একটা পোষ্টের পাশে দাঁড়াইয়া নিরলস দৃষ্টিতে প্রত্যেক জিনিষটা দেখিতে লাগিল। আজ সব কিছুই কেমন নূতনভাবে ঠেকিতে লাগিল। এই নূতনত্বের মোহে সে দাঁড়াইয়াই রহিল, কোন পাশ দিয়া সন্ধ্যার পাণ্ডুরতা নামিয়া আসিল, হুঁস রহিল না, রাস্তায় দু'ধারে আফিস-ফেরতা কেরাণীরা হাঁটিতে আরম্ভ করিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রাজীব তাহাদেরই সঙ্গে মিশিয়া পরিচিত প্রথায় বাড়ীর পথে হাঁটা সুরু করিল।

আহারান্তে গোঁসাই-মশায়ের সহিত অনেকক্ষণ পরামর্শ চলিল। ছুটীটা যখন অনেক দিনের জন্যই হইয়াছে, তখন একবার দেশে যাওয়ার কথা গোঁসাই অনেক করিয়া বলিলেন। দেশের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দিন পনেরর জন্য গিয়া একবার সব দেখিয়া শুনিয়া, তারপর ইচ্ছা করিলে আরও কোথাও হইতে বেড়াইয়া আসিতে পারে। পরামর্শটা রাজীবের ভালই লাগিল।

কাল আর আফিস নাই, সুতরাং তাড়াহুড়াও নাই। হয় ত' ভোরে ঘুম না ভাঙ্গিলেও চলিতে পারে। দশটা বা বারটা, যখন হয় খাইলেই চলিবে,—কিছুই ক্ষতি নাই। আফিস্-না-যাবার এমনি এমনি একটা আনুষঙ্গিক অপ্রীতিকর চিন্তায় সে কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। কিছুক্ষণ জোর করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। পরে উঠিয়া পড়িয়া এক ছিলিম তামাক ধরাইয়া দেশে যাওয়ার কথা ভাবিতে লাগিল।

দেশের বাড়ীটা এতদিন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। পাড়ার লোকেদের বাড়ীটা দেখাশুনা করিতে

বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এতদিন ধরিয়া যে তাহারা এই নিঃস্বার্থ উপকার করিবে, তাহা মনে হয় না। আজ পঁচিশ বৎসর হইল সে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। তাহার পর কাহাকেও একখানা পত্রও দেয় নাই,—বোধ হয় দরকার ছিল না ভাবিয়াই। আর পত্র লেখা-লেখির সময় বা কোথায় ছিল! এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরে গ্রামের লোকে যদি তাহার মৃত্যু কল্পনা করিয়াও থাকে,— তাহাও আশ্চর্য্য নয়, বরং সম্ভব। তা' ছাড়া সে সময়ের লোকেরা হয় ত' কেহ মরিয়া গিয়াছে, কেহ হয় ত, তাহারই মত দেশছাড়া হইয়া কোথাকার মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। তথাপি গ্রামে গেলে দু'একদিন থাকিবার ভাবনা হইবে না,—জমীদার আছেন, নয় তার ছেলে আছে! তাহার পিসি বোধ হয় আজও বাঁচিয়া আছেন। তাহারই কুঁড়ে-ঘরে দু'দিন সে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে পারিবে।

তাহার বাড়ীর সম্মুখেই সহরের বাবুটি একটা কাঁচা-পাকা বাড়ী করাইয়াছিলেন, গ্রামের মধ্যে তাহার জোড়া ছিল না। বাড়ীর সম্মুখে অনেকখানি ফুলের বাগান—এবং তাহারই এক কোণে একটা হেনার ঝোপ ছিল। সে যখন সর্ব্ব কর্ম্ম অন্তে তাহাদের গ্রাম্য কুটীরের প্রাঙ্গণে বসিয়া মা'য়ের সহিত গল্প করিত, তখন মধ্যে মধ্যে হেনার ঘনগন্ধ ভাসিয়া আসিত। ঘরের মধ্যে কালি-পড়া আলোটা জ্বলিতে থাকিত, এবং তাহার একটা অস্পষ্ট রশ্মি আসিয়া মা'য়ের মুখে পড়িত। সে গল্প করিতে করিতে কখন অন্যমনস্ক হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কি সব ভাবিত, চেষ্টা করিলেও হয় ত' এখনও মনে করিতে পারে। একদিন সহসা মা'য়ের কলেরা হইল, দুইদিন পরে তিনি মারা গেলেন। তার পরই সে গ্রাম ছাড়া। তখন তাহার বয়স বোধ হয় কুড়ি।

মা'য়ের অসুখের সময় গ্রামের লোক কেহই ঘরে ঢুকিল না। সে একাই যতটুকু পারিল, সেবা করিল, এবং যতটুকু না পারিল, ভাবিল। গ্রামের কেহ না আসিলেও একটি মেয়ে বাড়ীর অভিভাবকদের চক্ষু এড়াইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে একবার আসিয়া দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া কিছুক্ষণ রোগ-গৃহের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া থাকিত, তারপর তেমনই নিঃশব্দে চলিয়া যাইত। ঘরের মধ্যে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিত, তাহারই ক্ষীণ আলোকে সে দেখিতে পাইত, মেয়েটির চোখ দুটো কখন ছল ছল করিয়া আসিয়াছে,—তারপর কেমন দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছে।

তাহাদের বাড়ীর পার্শ্বে মল্লিকদের বাড়ী, তাহারই পিছনে গৌরীরা থাকিত। তাহার বাবার নাকি কিছু টাকাও ছিল। এতদিন বোধ হয় গৌরী স্বামীপুত্র লইয়া ঘর সংসার করিতেছে। হয় ত' গ্রামেই বসবাস করিতেছে।

রাজীব গ্রামে ফিরিল। নিজের বাড়ীতেই স্থান হইল। বাড়ী বদলাইয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গে নাই। পিসি কুঁড়ে ছাড়িয়া ধর্ম্মপুত্র লইয়া এখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন।

রাজীবকে অতি কষ্টে চিনিয়া মুখ কালো করিয়া পিসি বলিলেন, এসো, বাবা এসো। একটা চিঠিও দিতে হয়! আর ত' ফিরলে না, বাবা, বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়ছিল, ভাবলুম, ভায়ের বাড়ী, দেখি যতদিন আছি ইঁটকাটগুলো বজায় রাখি।

রাজীব প্রণাম করিল, কিন্তু একটা কুশল প্রশ্নও করিতে পারিল না। বুকে কোথায় যেন কি একটা অত্যন্ত ভারী ঠেকিতেছিল। সেখানে কর্ম্ম-কোলাহল,—এখানে প্রাণহীন নিরবচ্ছিন্ন অবসাদ; সেখানের জীবন-প্রবাহ যেন এখানে আসিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামে কখন ভাল লাগে কখন খারাপ লাগে। রাত্রে চারিদিকে শৃগাল ডাকে, অশ্রান্ত ঝিল্লি-কোলাহল ভাসিয়া আসে নিবিড় অন্ধকারে চারিদিক ভরিয়া উঠে। রাজীব শয্যার উপর বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গ্রামের পূর্ব্বকথা ভাবিতে গিয়া কখন অন্যমনস্ক হইয়া জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকার পথে চাহিয়া থাকিত। তামাক পুড়িয়া যাইত। কাজকর্ম্ম নাই, কাজকর্ম্মের ভাবনাও নাই। তবুও ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। বোধ হয়, অভ্যাস। সম্মুখের প্রকাণ্ড গাছটায় অসংখ্য বাদুড় আশ্রয়ের জন্য কোলাহল করিত। কোন বাড়ী হইতে ঢেঁকির শব্দ একটানা সুরে ভাসিয়া আসিত।

গৌরীর স্বামীর সহিত রাজীবের পরিচয় হইল। বেশ অমায়িক লোক। সুখে সচ্ছন্দে ঘর-সংসার করিতেছেন। দুইটী মেয়ে ও সম্প্রতি একটি ছেলে হইয়াছে। গৌরীর পিতা নিঃস্ব দেখিয়া জামাই করিয়াছিলেন। সেই বাড়ীতেই গৌরীরা আছে। বাহিরের ঘরটার যেন একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বোধ হয় ভালর দিকেই। এই ঘরটায় বসিয়া গল্প করিতে করিতে চকিতের জন্য এক জোড়া পা ও সাড়ীর একাংশ রাজীবের দৃষ্টির উপর দিয়া চলিয়া গেল। গৌরী বেশ বড় হইয়াছে। এই ছোট্ট মেয়েটিই তাহার মায়ের অসুখের সময় দূর হইতে ভীত-করুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কখন রাজীব অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, গৌরীর স্বামীর প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

গ্রামের দিঘীটা ছোট হইয়া গিয়াছে! জলটাও ঘোলাটে হইয়া গিয়াছে। ও-পাশের বাবলা বনটা অত্যন্তরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহারই অপর প্রান্তে পাঠশালা-পালান ছেলেদের আড্ডাস্থল ছিল। সেও কতদিন এ আড্ডায় আসিয়াছিল।

গ্রামের মেয়েরা কিন্তু এখনও দিঘীতে স্নান করিতে আসে। ঘোমটা টানিয়া কেহ কাঁকে কলসী ও তাহার মুখে লাল গামছা, কেহ বা শুধু গামছা লইয়া—গ্রামের বধূরা স্নান করিতে আসে। বৃদ্ধারা থাকে—তাহাদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে কোনরূপে স্নানটা সারিয়া তাহারা কুণ্ঠিত-চরণে চলিয়া যায়। তারপর বৃদ্ধাদের গল্প চলিতে থাকে। ঠিক আগেকার মতনই।

এই পথ দিয়াই আসিতে গিয়া রাজীব আচম্বিতে যাহার সম্মুখে গিয়া পড়িল, তাহকে কোনমতেই ভুল করিতে পারিল না। একগাল হাসিয়া বলিল, কিরে গৌরী চিন্‌তে-টিন্‌তে পারিস? তোদের বাড়ী সেদিন—

যাহার সহিত সে এতখানি আপ্যায়িত করিয়া কথা কহিতে গেল, সে সহসা ভীত চকিতভাবে একবুক ঘোমটা টানিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার স্থানে যে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া রাজীবের মুখ শুকাইয়া গেল। গৌরীর মা বুড়া হইয়াছে, কিন্তু বেশ চেনা যায়। ছেলেবেলা হইতে রাজীবকে কোনদিনই দেখিতে পারিত না! বুড়ী যে বাঁচিয়া আছে সে ভাবনাটাই এতদিন রাজীবের মাথায় আসে নাই।

ব্যাপারটা অল্পে মিটিল। কিন্তু বুড়ীর তীক্ষ্ণ উপদেশগুলো রাজীবের বক্ষে বিঁধিয়াই রহিল,—অল্পে গেল না।

আহারের পর রাজীব আজ তামাক টানিতে ভুলিয়া গেল। কিন্তু ভাঙ্গা চেয়ারটায় বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে ভুলিল না।

রাত্রে ঘুম আসিল না। নানা কল্পিত বিভীষিকা তাহার সমস্ত ঘুম নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিল। থানার ঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিল, সে শুনিয়াই চলিল।

অদাকার ব্যাপার লইয়া কাল একটা হৈ চৈ পড়িয়া যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। গৌরীর মা' এমন ঘটনাটা নিঃশব্দে হজম করিবে, মনে হয় না। ইতিমধ্যে হয় ত' গৌরীর স্বামী শুনিয়াছে, পাড়ায় আরও দু' একজন হয় ত' শুনিয়াছে। কাল প্রাতে বারোয়ারী-তলার সভাটায় এ ব্যাপার যে কতদূর গড়াইবে, বলা যায় না। তারপর গৌরীর স্বামী যদি ফৌজদারী করে, তবে পুলিশের হাতে ইহার কত শাখা পল্লব বাহির হইবে, তাহা অনুমানেরও অসাধ্য। তারপর কাগজে উঠিবে, আফিসের বাবুরা পড়িবেন, সাহেবেরও কানে উঠিবে। এত কাণ্ডের পর এ-মুখ লুকাইবার স্থান পৃথিবীর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না।

থানার ঘড়িতে দুইটা বাজিল। চকিতে রাজীবের মনে পড়িল, রাত আড়াইটায় কলিকাতা যাইবার একটা গাড়ী আছে। বালিসের তলা হইতে দেশলাই বাহির করিয়া জ্বালিয়া আলনা হইতে জামাটি তুলিয়া লইল। জুতাটা হাতে লইয়াই নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। পুটলীটা পড়িয়াই রহিল।

সেই সাড়ে দশটায় আফিস! বাবুরা হাসিয়া বলিলেন, কি রাজীববাবু, এত শীগ্‌গির ফিরলেন? ছুটী ত' ফুরোয় নি! ফেঁসে গেল বুঝি? না ফাঁকি দিলেন?

রাজীব উত্তর দিতে পারিল না।

বড়বাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে যাইতে বলিলেন, কি ফিরে এলেন? শরীর ত' একটুও সারে নি? বড় খারাপই হ'য়েছে।

রাজীব বলিল, আজ্ঞে কোথাও আর যাওয়া হয় নি। দেশে শুধু দু'দিনের জন্যে—

বড়বাবু হাসিয়া বলিলেন, সে জানি। ঐ যে ব'লেছি,—এ যেন আফিংএর নেশার মত।

পাখীকে খাওয়ালে সেও ফিরে আসে। আচ্ছা, তবে কাজ-কর্ম্ম করুন আর কি!

কি কাজের জন্য সাহেব এ-ঘরে আসিয়া রাজীবকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিয়া আর একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইলেন। তারপর একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজীব ঘাড় হেঁট করিয়াই রহিল।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

দশচক্রে

(৫)

"বিলাত দেশটা মাটীর।" শশীর কিন্তু সেরূপ মনে হইল না। ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতের সন্নিপাতে এই দেশ অভ্রবলয়িত মহেন্দ্রলোকের প্রতিচ্ছবিরূপে তাহার কল্পনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। এখানকার অবিচ্ছিন্ন সৌধশ্রেণী, অবিশ্রাম জনপ্রবাহ অবন্ধুর রাজপথে অবারিত রথ; এখানকার নির্ম্মল গৃহদ্বার, নিখুঁত গৃহস্থালী, পরিচ্ছন্ন আসবাব ও পরিস্ফুট সৌন্দর্য্যবোধ; এখানকার অদম্য উৎসাহ, অদম্য কর্ম্মবেগ, অশান্ত ক্রীড়া, ও অক্লান্ত আমোদ; এখানকার অখণ্ড শৈশব, অক্ষুন্ন যৌবন, অকুণ্ঠিত পৌরুষ ও অগুণ্ঠিত নারীত্ব; এখানকার সুসংযত ভাষা, ভাবুকতা ও পরিচ্ছদ: সহজাত স্বাস্থ্য, ও সত্যনিষ্ঠা; অভীত স্বাতন্ত্র্য ও অদীন শিষ্টাচার; সমস্তই তাহার হৃদয় মনকে মুগ্ধ করিল।

শশী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে যখন তখন সাহেব মেমের ভীড়ের মধ্য দিয়া বুক ফুলাইয়া যাইতে পারে, গুঁতার ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া ড্রেণে নামিতে হয় না; দোকানদারগণ তাহাকে Sir বলিয়া সম্বোধন করে, এবং কথায় কথায় thanks দেয়; বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাহার সহিত এক টেবিলে খাইতে দ্বিধা করেন না; প্রবীণারা তাহাকে স্নেহ করেন এবং নবীনারা তাহার রসিকতায় হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। কেবল তাহাই নহে, Miss Lucy Kerr নাম্নী একজন শ্বেতাঙ্গী সুখে, দুঃখে, উত্থানে, পতনে তাহার সহচরী হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

Miss Lucy Kerr একজন ভারতীয় সিবিলিয়ানের কন্যা। তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা ভারতবর্ষে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি মাতার সহিত কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করিতে-ছিলেন। তিনি নিজেকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বেশ বাংলা বলিতে পারিতেন। ইহাতে শশীর মনে কেন সৌভাগ্যগর্ব্বের উদয় হইত বলা শক্ত। ভারতের সহিত পরিচয়ের প্রয়াগ ক্ষেত্রে তাহারা দুইজনে গঙ্গাযমুনার মত মিলিত হইল। তার পর কত dance, dinner, party, picnic, Hyde Park ও Crystal palace-এর মধ্য দিয়া ছুটিতে ছুটিতে দুই

জনে কোন এক সময়ে একরঙা হইয়া উঠিল,—সাদায় কালোয় আর ভেদ রহিল না। শেষে একদিন Miss Kerr যখন বলিলেন "আপনি জানেন, আমরা চলে যাচ্চি?" তখন শশীর হৃদ্‌স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবেন?"

Miss Kerr. আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্চি।—Won't you miss me?

Miss me! ফুস্‌ফুস্‌টা বাদ দিলে মানুষ কি তাহার অভাব বোধ করে? Miss Kerr-বিহীন জীবন যে শশীর কাছে আজ শূন্যময়। তিনি চলিয়া যাইলে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা যে কোটি হইতে শূন্যের কোটায় নামিয়া পড়িবে!

শশী বলিল "আর আপনি? আপনার বেশ ভাল লাগ্‌বে?"

Miss Kerr. খুব ভাল লাগবে না তবে—

শশী। আপনি ফিরে গিয়ে বিবাহ কর্‌বেন, সুখী হবেন, -

Miss Kerr. I don't know.

শশী। কোন বাঙ্গালী যদি আপনাকে বিবাহ কর্‌তে চায়?

Miss Kerr. আমার ত বেশ ভালই লাগে।

তারপর কতকগুলা বাঁকা কথা, ভাঙ্গা কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইল যে শশী Miss Kerrকে বিবাহ করিতে চায়, এবং Miss Kerr শশীর মুখে এই কথাটি শুনিবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় Miss Kerr-ও এ বিবাহে অমত করিলেন না। স্থির হইল, শশী দেশে ফিরিয়া গিয়া বিবাহ করিবে।

এই সম্ভাবনার উৎকট আনন্দ বিরহের তিক্ততার সহিত মিশ্রিত হইয়া Saccharine-এর মত শশীর মনকে কিছুকাল তন্ময় করিয়া রাখিল। কিছুদিন আর সে লেখাপড়ায় মন দিতে পারিল না। এমন সময়ে ভূপতির পত্র আসিল। শশীর সফল Courtship-এর সংবাদে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন "Court করা যায় যে কোন মেয়েকে, from China to Peru. For, girls are courtable, portable substances. তবে উদ্বাহের পূর্ব্বে একটা কথা মনে রাখা ভাল যে, কোন স্বাধীনজাতের মেয়ের গর্ভে কতকগুলা slave-এর জন্ম দিলে তিনি কখনো তোমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না।" ভূপতির পত্র আকস্মিক বাধার মত পথের মাঝখানে খাড়া হইয়া শশীর ছুটন্ত মনোরথকে একেবারে কাৎ করিয়া দিল। শশী মস্ত একটা ঘা খাইয়া ভাবিতে লাগিল সত্যই সে slave-এর জন্ম দিবে নাকি? Slave বৈ আর কি? "আমি কৃশ্চান, আমি ইউরোপীয় মহিলার গর্ভজাত," এরূপ একটা লেবেল কপালে আঁটিয়া দিলে তাহাদের কিছু কিছু সুবিধা হইবে, সত্য। এই লেবেলের জোরে তাহারা চাকুরী জোগাড় করিতে পারিবে সহজে; একই কাজে native-দের চেয়ে কিছু বেশী বেতন পাইতে পারিবে; এবং পথে ঘাটে গোরার গুঁতা খাইবে কম কিন্তু পদে ও গৌরবে তাহারা কোন সময়েই ইউরোপীয়ের সমকক্ষ হইতে পারিবে না।

শশীর সন্তানগণ যদি ঐরূপ লেবেল আঁটার দীনতা স্বীকার না করিয়া, শুধু শিক্ষা, শক্তি ও পটুতার উপর নির্ভর করিতে চায়,—কেবল বাঙালী হইয়াই থাকিতে চায়, তবে তাহারা কিরূপ জীবন যাপন করিবে? তাহারা সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পাইয়াও ডেপুটীগিরির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না; তাহারা টিকিট কিনিয়াও ফার্ষ্ট বা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারিবে না, যে কোন সাহেব যাত্রীর ইচ্ছামত নামিয়া আসিতে হইবে; গোরার লাথিতে তাহাদের প্লীহা ফাটিলে গোরা কোন দণ্ড পাইবে না,—অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত পায় নাই, কিন্তু তাহারা যদি প্রতিবাদ করে ত একেবারে রাজদ্রোহের আঠার ঘায়ে পড়িয়া যাইবে; তাহাদের হাতের ছড়িটি পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হইবে, এবং যাহারা ছড়ি কাড়িয়া লইল তাহারাই তাহাদের আত্মরক্ষায় অসমর্থ বলিয়া টিট্‌কারী দিবে।

তাহাদের কিসে কল্যাণ তাহা ঠিক করিয়া দিবে বাহিরের লোক, নিজেদের কল্যাণ বাছিয়া লইবার অধিকার তাহাদের থাকিবে না। তাহাদের দেশের টাকা যথেচ্ছ খরচ করিবে বিদেশের লোক আসিয়া, তাহাদের মতামতের দিকে তাকাইবে না। তাহাদের জন্য আইন প্রণয়ন করিবে বিদেশী অভিভাবক, এ আইন প্রণয়নে তাহাদের কোন হাত থাকিবে না। জেলের ভয় দেখাইয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটান হইবে, এবং এই হাসি দেখাইয়া বিশ্বজনকে জানান হইবে যে তাহারা বড় সুখে আছে। এ জীবন দাসের জীবন নয় ত কি?

শশী দেখিল সে বা তাহার সন্তানগণ যেটুক সম্মান ও সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে তাহার অনেকটাই কলারের জোরে। কলারটা খুলিয়া ফেলিলেই দেখা যাইবে তাহারা একেবারে পথের কুকুর!

পথের কুকুর হইয়া সে সিংহীকে কামনা করিয়াছে! কিন্তু সিংহী নিজেও ত বাধা দিলেন না। তিনি হয়ত তাহাকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই। না! Miss Kerr-কে সে এমন করিয়া বিপন্ন করিবে না! শশী ঠিক করিল সে পত্রে নিজের অবস্থা জানাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবে। কিন্তু পারিল না। ভাবিল এ অপ্রিয় কার্য্যটা দেশে গিয়াই করিবে। বিদেশ হইতে মনের ভাব ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু Miss Kerr-কে এতদিন এমনি করিয়া মিছামিছি আবদ্ধ রাখা কি ভাল? শশী তাহারও উপায় করিল,—চিঠির সংখ্যা ও আয়তন কমাইয়া ফেলিল। Miss Kerr-এর চিঠিগুলির সংখ্যা ও আয়তনও সেই অনুপাতে কমিল। কিন্তু মৃগনাভির মাত্রা কমিলেও তাহার সৌগন্ধ ও সঞ্জীবনী শক্তি কমে না।

(৬)

Christianity-কে শশী কখনও মনের সহিত গ্রহণ করে নাই। মানুষের পাঁজরায় এক সময়ে পঁচিশটা হাড় ছিল, ঈশ্বরের আকার অনেকটা ইহুদী, রেড ইণ্ডিয়ান, হটেণ্টট্ আর এস্কিমোর মত, এগুলা সে বিশ্বাস করিত না। সে কৃশ্চান হইবার সময় বলিয়াছিল "যে-ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখিতে শিখায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করবো।" কিন্তু মানুষকে মানুষ বলিয়া

দেখিতে শিখায় এ ধর্ম্ম কোথায় আছে? কোনটী সে? Christianity নয় নিশ্চয়। এই Christianityই না এক সময়ে গির্জ্জার বেদী হইতে প্রচার করিয়াছিল যে কতকগুলা মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে শুধু দাস হইবার জন্য, ইহাদের পশুর মত শিকল বাঁধিয়া রাখিতে হয়, ইহাদের স্ত্রীলোকগুলাকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে হয়, এবং তাহার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিক্রয় করিতে হয়? এই Christianityই না জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর পিঠে চাবুক মারিয়াছে "Wating room for Indian Women"? ভারতবর্ষের সাড়ীপরিহিতা নারী, শিক্ষা ও চরিত্রে যেমনি হউক, তাহাদের কুলমর্য্যাদা যতই থাকুক, তাহারা যেমন ঘরের ঘরণাই হউক না কেন, সকলেই Women! সকলেই she-native! অতএব ইহাদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে, যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহাদের প্রতি অত্যাচার করিলেও দোষ নাই। একবার তেরবছরের একটী native womenএর প্রতি ইউরোপীয়ের অত্যাচার লইয়া শশীর সহিত তাহার একজন পদস্থ ইংরাজ বন্ধুর আলাপ হইয়াছিল বন্ধুটী ব্যাপারটা উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন 'তুমি ভুলে যাচ্চ যে এ ভদ্রলোকটী Christian Countryতে মানুষ হয়েছে, সে এমন কাজ কিছুতেই করতে পারে না।" আজ অনেক দিন পরে শশী এই ইংরাজ বন্ধুর উক্তিটীর তাৎপর্য্য বুঝিবার চেস্টা করিল। হইতে পারে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের দলের একজন নব-পিশাচের prestige বাঁচাইবার চেস্টা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ native বালিকার অত্যাচারকে তিনি তত গুরুপাপ মনে করিতেন না, —nativeরা মানুষ নয় বলিয়াই হয়ত। যদি এমন হয় যে ইংরাজ বন্ধুটী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, অর্থাৎ নারীর প্রতি, বিশেষতঃ বালিকার প্রতি, অত্যাচার Christian Countryর লোকের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তবে তাঁহারা যে native womanএর উপর অত্যাচার করেন তাহার কারণ তাঁহারা এই নারীদের মানুষ মনে করেন না। শশী স্বকর্ণে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজকে বলিতে শুনিয়াছে যে ভারতীয় নারীদের কাছে সতীত্বের মূল্য এত অল্প যে, তাহারা কোন ব্যক্তিবিশেষকে বিপন্ন করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিজেদের সতীত্বহানি হইয়াছে বলিয়া রটাইয়া থাকে। তারপর স্বচ্ছন্দমনে ডাক্তার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়, এবং আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হাজার লোকের সমক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর জেরার জবাব দেয়।

শশী নিজে ইংরাজের নিকট হইতে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পাইয়াছে। আজ কিন্তু এই সদ্ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীর অশ্রদ্ধাকে প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাইল। তাহার চারিদিকের আবেষ্টন চলন্ত ট্রেনের খট্ খট্ খটাখট শব্দের মত এক সময়ে তাহার মনের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছিল "সত্যই সুখে আছ, সত্যই সুখে আছ'; আজ তেমনি তাহার মনের কথার নকল করিয়া বলিতেছে "দুঃখের কোথা শেষ! দুঃখের কোথা শেষ?" তাহার মনে পড়িল সে যখনই

কোন কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তখনি তাহার ইংরাজ বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিয়াছে সে কৃশ্চান কি না? তাহার রক্তে white blood আছে কি না? কি স্পর্দ্ধা! ইঁহারা মনে করেন গুণপনা কেবল তাঁহাদের একচেটে। তাই দম্ভভরে missonary পাঠাইয়াছেন পৃথিবীর সমস্ত লোককে Christianity ও trouserএ দীক্ষিত করিবার জন্য। যাহাদের সভ্যতা শিক্ষা দিবেন তাহাদের মধ্যে কিছু সভ্যতা আছে কি না, ইঁহাদের চেয়ে বেশী আছে কি না জানিতে চান না; এবং কেহ জানাইতে আসিলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। ইঁহারা নিজেদের গলায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি ঝুলাইয়া জগতের পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ করিবেন ও গায়ে lownecked জামা পরাইয়া নারী জাতির লজ্জা নিবারণ করিবেন, এবং কর্ম্মবাদের মত পক্ষপাতরহিত পরলোক-পরিকল্পনাকে হাসিয়া উড়াইয়া তাহার স্থানে বসাইবেন নিজেদের ছেলেভোলান অনন্ত-স্বর্গ-নরকের বিভীষিকা।

শশী এখন হইতে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল এবং হিন্দুর হইয়া তর্ক করিতে লাগিল। সে দেখাইল হিন্দুকে সত্যই পৌত্তলিক বলা যায় না। হিন্দু নানা মূর্ত্তিতে একই ঈশ্বরের পূজা করে, কোন একটী মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে করে না, এবং সত্যই তেত্রিশ কোটী ঈশ্বর স্বীকার করে না। যে মূর্ত্তির পূজা করিবে তাহাকেও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও বিসর্জ্জনের পরে সে মাটীর ঢিপির মতই দেখে। সরস্বতী, কার্ত্তিক প্রভৃতির মূর্ত্তিকে শিশুরা ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিলে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে না। হিন্দু যখন মূর্ত্তিপূজা করিতেছে তখনও সে জানে যাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে তিনি মূর্ত্তিপূজা করেন না। হিন্দুর মধ্যে বংশগত জাতিভেদ আছে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় কি? তাহার শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, তাহার বুদ্ধ, চৈতন্য জতিভেদ মানিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাস্পদ সেই সন্ন্যাসীগণ জাতিভেদ মানেন না! তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যজ্ঞোপবীতও বিসর্জ্জন দিতে হয়, একথা হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিবে! কোন একখানি পুঁথি, বা কোন একটা শ্লোক তাহাকে মানিয়া চলিতেই হইবে এ জুলুম তাহার কোথাও নাই। তাহার ষড়দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্য, তাহার দশাবতারের মধ্যে নিরীশ্বর বুদ্ধ, তাহারা যাঁহাদের শ্রদ্ধা করে তাঁহাদের মধ্যে কেহ মহিষ বলি দেন, কেহ বা জীব মাত্রের প্রতি অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। বাস্তবিক ধর্ম্মে হিন্দু autocracy এড়াইয়াছে অনেক দিন।

তর্ক করিতে করিতে অনেকগুলি জিনিস শশীর নজরে পড়িল যেগুলির দিকে সে ইতিপূর্ব্বে তাকায় নাই। সে দেখিল হিন্দুর কাছে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ ছিল তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আজও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হিন্দুপুরাণের ভীষ্ম কর্ণ গান্ধারী এই ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য নাটকের নায়করূপে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে। হিন্দু অনেক স্থলে বাহুবলের সুখ্যাতি করিলেও, কেবল বাহুবলের পূজা করে নাই। তাহার ঘটোৎকচ অতি নগণ্য।

হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তীকেও বনবাসীর পদে নতশির করিয়াছে, ঐশ্বর্য্যকে খর্ব্ব করিয়াছে জ্ঞানের

নিকট। তাহার "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" ভোগীকে নির্লোভ ও ত্যাগীকে নিরহঙ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খাতক-মহাজনের অপ্রিয় সম্বন্ধকে সে হালখাতার আত্মীয়তায় সুন্দর করিয়াছে। অতিথিকে পূজার্হ করিয়া সে দাতার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিয়াছে এবং দীনকে অপমানিত করে নাই। এক জনকেও অভুক্ত থাকিতে হয় না; অথচ উদরান্নের জন্য orphanage, work-house প্রভৃতির লাঞ্ছনা স্বীকার করিতে হয় না, দীনভাবে ভিক্ষা করিতে হয় না, সিঁধ কাটিবার প্রয়োজন হয় না, এমন সমাজ আর কোথাও আছে? হিন্দুর বেদব্যাস পঞ্চপাণ্ডবকেও নরকভোগ হইতে মুক্তি দেন নাই, হিন্দুর রামচন্দ্র বিজিত রাবণের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, হিন্দুর রাজপুত শরণাগত শত্রুকেও প্রাণ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, হিন্দুর রাজা মুসলমানের জন্য মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কয়জন এমন মহত্ত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন?

অবধীরিত ভারতবর্ষ আজ নবজাগ্রত সিংহের মত শশীর শ্রদ্ধাবিনত মনের উপরে লাফাইয়া পড়িল।

(৭)

দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে শশী নিশিকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার শেষের দিকে ছিল "আজ Mr.—তারিফ কচ্ছিলেন, আমি খুব ভাল ইংরাজী বল্‌তে পারি ব'লে। এ রকম বাহবা আমি আরও দু'একজনের কাছ থেকে পেয়েছি। আশ্চর্য্য! রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন এঁরা ঘুরে যাবার পরেও ইংরাজ আমাদের এতই অবজ্ঞেয় মনে করে, যে আমাদের মুখে ইংরাজী শুনে তাক্ লেগে যায়! অথচ এই এক শ' বছরের কিছু বেশীদিন ইংরাজের সঙ্গে মিশে আমরা যতটা ইংরাজী শিখেছি ততটা আর কেউ পেরেছে? আমরা খাঁটি ইংরাজের মত ইংরাজী বল্‌তে পারি, ফরাসীর মত French বল্‌তে পারি, পারসী পড়তে পারি পশ্চিমা মুসলমানের মত। এমন আর কেউ পেরেছে না কি? আমরা কত বড় বনেদি ঘরের ছেলে! আমরা কতকাল ধ'রে কত সভ্যতার সঙ্গে মিশেছি, তাদের সকলের রক্ত আজও আমাদের শিরা ধমনীতে বইচে, তাদের আকার প্রকার আমাদের মুখে চ'খে ছাপ রেখে গিয়েছে। আমরা যা পারি তা আর কেউ পার্‌বে না। আমরা কৃশ্চানের চোখ দিয়ে Christকে, এবং মুসলমানের চোখ দিয়ে মহম্মদকে ভক্তি কর্‌তে পারি। এমনটী আর কোথাও দেখেচ? আমাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। তার কারণ আমাদের শিক্ষার দিক দেখবার বিশেষ কেউ নাই। State না দেখলে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণিও আজ আমাদেরই মত অশিক্ষিত থাক্‌তো। যাক্, আমাদের এই অশিক্ষিত দেশের নিম্নতম স্তরেও যে উদারতা, যে ন্যায়বুদ্ধি আছে, তা অনেক দেশের শিক্ষিত সমাজেও নেই বলে আমার মনে হয়। ইংরাজ ত নিজেকে আর নিজের জাত ভাইদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলে মনে করে। তার বিশ্বাস, পৃথিবীর বাকী লোকগুলার একমাত্র কল্যাণের পথ

শুধু তাদের পদসেবা করা, আর তাদের কাছে শিক্ষানবীশী করা। আজও অনেক ইংরাজ Geology বা Zoology যাচাই করে নিতে চান বাইবেলের কাছে! দেখে শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। তিন দিনের upstart আজ এক লাফে একেবারে বিশ্বজগতের গুরুর আসনে জেঁকে বসেছেন! আর এঁদের কাছ থেকে আমাদের সভ্যতার পাঠ নিতে হবে! কেন? এরা আমাদের জয় করেছেন বলে? জয় করলেই বড় হয় না। গ্যালিলিওকে যে বন্দী করেছিল তাকেই সকলে পূজা করচে না। বাঘ মানুষকে খেতে পারে বলেই সে মানুষের চেয়ে বড় নয়।

হারতে পারা অনেক সময়ে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। হারবার সাধনাতে মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তরোয়ালের খোঁচায় যে হারাতে পারে, তার জন্মান উচিত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৩৩২ সালে।

সত্যই আমার আর কিছু ভাল লাগ্‌চে না। এ সাহেবী ভাষা, পোষাক আর ধর্ম্ম সমস্তই আমাকে যেন অশুচি করে তুলেচে। এ সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে আমার মন উধাও হয়ে ছুটতে চাইচে সেই সনাতন ভারতবর্ষের দিকে,—সেই ত্যাগের ভারতবর্ষ, কর্ম্মযোগের ভারতবর্ষ, অভুক্ত, অশিক্ষিত বিরাটহৃদয় ভারতবর্ষ, 'নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।'—বলবার মত বীর্য্যবান ভারতবর্ষ, নখদন্তহীন সভ্যতম ভারতবর্ষের দিকে।

নিশি উত্তরে লিখিয়াছে "তোমার ভারতবর্ষকে ভাল চিনতে পারলুম না। এ কোন ভারতবর্ষ? আমি যে ভারতবর্ষকে জানি সেখানকার লোকদের নখদন্তহীন না বলে নখদন্তদীন বললে ভাল হয়। নিজেদের নখদন্ত নিয়েই তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়েছেন। খুব ফ্যাকড়ান শিংওলা হরিণের মত তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শিঙে শিঙে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে আর নড়বার শক্তি নেই। এখন চামচিকি, টিকটিকির লাথি খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছেন। এখন সামনের ব্যক্তিটির শিংভাঙা ছাড়া এঁদের জীবনে আর কোন সাধনা নেই।

"আমার একবার মনে হচ্ছিল ভারতবর্ষ বলতে তুমি গুটিকতক বাঙালীকে বুঝেছ। পৃথিবীর মধ্যে এই একটা জাত আছে যার আকারে প্রকারে কোথাও গোঁড়ামী নেই। ইংরাজের মত ইংরাজী, আর কাবুলীর মত পুস্তু বলতে কেবল এরাই সহজে পারে। এরা রাজেন্দ্র মল্লিকের মত ভোগ করতে পারে, লালাবাবুর মত ত্যাগ করতে পারে। এরা মাইকেলের মত লিখতে পারে, কেশব সেনের মত বলতে পারে, মোহনলালের মত কর্ত্তব্য করে মরতে পারে। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের মত পুরুষ আর রাণীভবাণী, স্বর্ণময়ীর মত স্ত্রীরত্ন এরা দরকার হলেই হাজির করতে পারে। এরা সকল কাজে বড় হতে পারে। এদের মত গোলামী করতেও আর কেউ বড় পারে না। মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য এরা করতে পারেনা এমন কাজ নেই। নীলকরের অত্যাচারে এঁদের সাহায্যে, ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরে খাজনা আদায় এঁদের কীর্ত্তি।

"যাই হোক, ভারতবর্ষের ওপর ভক্তি হয়েছে ব'লে ইংরাজকে গাল দেবার দরকার নেই। upstart সে নয়। গ্রীক, রোমান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সে এত উঁচু হয়ে উঠেছে। গাল দিয়ে তাকে ছোট করা যাবে না।—জাতটা সত্যই বড়, রূপে বড়, গুণে বড়, ধনে বড়, জ্ঞানে বড় ;—আমাদের চেয়ে ঢের বড়। আর একটা আশ্চর্য্য কথা ;—ভারতবর্ষের গৌরবের দিনে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা আচার ব্যবহারে অনেকটা তোমার ঐ "upstart"দের মতই ছিলেন ব'লে সন্দেহ হচ্চে। দেহপাত ক'রে বি, এ, পাশ করা, এবং ভুঁড়ি বাড়্লেই স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্চে ভেবে উৎফুল্ল হওয়া, বোধ হয় তাঁরা পছন্দ কর্তেন না। কারণ এই ইংরাজদের মত তাঁদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছিল, ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষ, আর কৃশাঙ্গী স্ত্রী। আহারটাকে তাঁরা আধ্যাত্মিক না করবারই চেষ্টা কর্তেন। মাংসের মধ্যে ত বিশেষ বাছ বিচার কর্তেন না। মৃত পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবার সময় শূকর, গো, মৃগ, মৎস্যের কোনটাকে বাদ দিতেন না। আতাপি বাতাপির মটনের লোভে ঋষিদের মহলে ত মড়ক পড়ে গেল। 'হৃষ্ট ও প্রসন্ন হ'য়ে আচার্য্য গ্রহণ করবে' এরকম বিধান দিয়েছেন। শুন্‌লে মনে হয় না যে তাঁরা আমাদের মত গোবর-লেপা চপ্‌চাপ মাটার ওপর উপু হয়ে ব'সে গপ্ গপ্ ক'রে থোড় কুমড়োর ঘণ্ট গিলতেন।

"এরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জোর করেই চালাবার চেষ্টা কর্তেন। কিন্তু শূদ্র যদি কৃতিত্ব দেখাত ত দাবিয়ে রাখ্‌তে পার্তেন না, তাদের ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে দিতেন। এদিকে ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মান্বিত হ'লে তার ঘাড় ধ'রে তিন ক্লাস নীচে নামিয়ে দিতেন। এঁরা বিবাহ কর্তেন যার তার ঘরে, বিদ্যালাভ কর্তেন যবন গুরুর কাছ থেকেও। এঁরা সমুদ্রযাত্রা কর্তেন। অথচ জাহাজের ওপর পিপেয় ক'রে গঙ্গাজল নিয়ে যেতেন না, ফিরে এসেও গোবর খেতেন না। এঁদের ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে বাস করবার সময় পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে গিছলেন বলে শুনি নি।

"এঁদের মেয়েরা মেম সাহেবদের মত খট্ খট্ ক'রে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াতেন, ছেলেদের মত এবং অনেক সময়ে ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যালাভ কর্তেন, বেশী বয়সে বিবাহ কর্তেন, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ" দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার অধিকার পেতেন, এবং গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ ক'রে জাতিচ্যুত হ'তেন না। সমাজে এঁদের অহল্যা, কুন্তির নিন্দা ছিল। কিন্তু তা ব'লে তাঁদের আত্মহত্যা করবার দরকার হয় নি।"

নিশির পত্রের ভিতর দিয়া শশী ইংরাজকে ভক্তি করিবার সুযোগ পাইয়া বাঁচিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

হিন্দু বালিকার শিক্ষা*

আজিকার এই আশ্রম-সভা আমার মত অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে যে সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন তাহার জন্য মাতা শ্রীশ্রীগৌরীপুরী দেবী, আশ্রমবাসিনী ভগিনীবৃন্দ এবং এই সভায় সমাগতা যাবতীয় মহিলাবৃন্দকে আমার সসম্মান কৃতজ্ঞতা এবং সবিনয় কুণ্ঠা নিবেদন করিতেছি। আমি যে এ পদের একান্তই অনুপযুক্ত ইহা স্বীকারে আমার এতটুকু অত্যুক্তি নাই; আমার এ কুণ্ঠা প্রথামত বিনয় প্রকাশ মাত্র নহে। আমাদের মত লোকের কাহেরও যাঁহারা একটু আধটু খোঁজ রাখেন এমন কোন কোন ব্যক্তি এ সভায় যদি উপস্থিত থাকেন তো তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি এ পর্য্যন্ত কোন সভা সমিতি বা সংঘবদ্ধ স্থানে কোন সামান্য আলোচনাও কখনো করি নাই, - এমন কি কোন সভায় কখনো উপস্থিত থাকি নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না; বর্ত্তমান সম্মানসূচক পদে অভিষিক্ত হওয়ার তো কথাই নাই। অনভিজ্ঞতার শঙ্কা এবং অনুপযুক্তের কুণ্ঠা লইয়াই আমি আজ এই শ্রদ্ধাস্পদা আশ্রমসভাকে এবং আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবীদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইতেছি। যে স্নেহে তাঁহারা আমার মত ব্যক্তিকেও এই কার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন আশা আছে সেই স্নেহেই আমার সমস্ত ক্রটীকে তাঁহারা মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

এই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের কথা দেশের যে ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীরা বহুদিন হইতে জানেন তাঁহাদেরও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি নিতান্ত লজ্জার সহিতই স্বীকার করিতেছি যে, দুইচারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার নাম দুই একবার কানে শোনার বেশী ইহার সঙ্গে কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের সুযোগ এ পর্য্যন্ত আমার ঘটে নাই। গত বৎসর হইতে ইহাঁরা ইহাঁদের কার্য্য-বিবরণীখানি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রেরণ করিতেছেন, মাত্র এইটুকু পরিচয় হইতে ইহাঁদের অদ্যকার এই আহ্বান আমাকে এখনো পর্য্যন্ত যেন অভিভূত করিয়াই রাখিয়াছে। মাত্র একদিন পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমাতাজীর চরণ-দর্শন এবং আশ্রমের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী প্রভৃতি ভগ্নীগণের সহিত সামান্য পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার লাভ হইয়াছে। মাত্র এইটুকু অধিকারে আজ বেশী কিছু বলিবার আমার নাই এবং সে ক্ষমতাও আছে বলিয়া বিশ্বাস রাখিনা। কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে আমাদের নিজেদের জন্য—আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জন্য যে মুক্তির স্বপ্ন—যে জীবন লাভের দুরাশা আমার মনের নিভৃত কোণের কল্পনাতে মাত্র পর্য্যবসিত ছিল, সেই স্বপ্ন যে আজ ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে জীবন্ত সত্যরূপে আমাদের দেশের বুকে তাহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—একথা যদি সময়ে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইত তাহা হইলে বুঝি আজ নিজের জীবনেরও কোন শ্রেষ্ঠতর সৌভাগ্যলাভ আমার দুর্ল্লভ হইত না। আমাকে এ সম্মান দানের মূলে আমার জীবনের যৎকিঞ্চিৎ সফলতাটুকু যদি কারণ স্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি এটুকুও আজ স্বীকার করিতেছি যে তাহাকে আমি জীবনের সামান্য সাফল্য বলিয়াই মনে করি। আজ শ্রীযুক্তা দুর্গাপুরী দেবী শ্রীমতী সুতপাপুরী দেবী প্রভৃতিকে আমার কল্পনা-জীবনের আদর্শস্থানীয়া দেখিয়া আমি সুখে অভিভূতা হইতেছি এবং নিজের জীবনের প্রকাণ্ড নিষ্ফলতার জন্য তাঁহাদের প্রতি একটু সশ্রদ্ধ হিংসাও জানাইতেছি।

* শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও অবৈতনিক হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ সভায় (৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে) সভানেত্রীর অভিভাষণ।

আমরা হিন্দুনারীরা আজ সমাজের যে কোথায় আছি তাহা বোধ হয় দেশের মনস্বিনীদিগকে বেশী বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। আমাদের বহরমপুরে নারীশিক্ষার প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সম্ভাবনায় এই কথাই আমাদের দেশবাসীকে পত্রযোগে জানাইয়াছিলাম যে "ঘরের কাজে সাহায্যে মাত্র নিজেদের স্বার্থের সংসারে মাত্র—আমাদের আর পুরিয়া রাখিও না, দেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রে—শিক্ষার ক্ষেত্রে—ত্যাগের আদর্শের ক্ষেত্রেও তোমাদের ভগিনী কন্যাদের তোমরা ডাক।" একদিন এ ডাক ভারতে ছিল, নারীদের এ স্থানও এদেশে ছিল। যে ধর্ম্ম জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম এই ভারতেরই এবং তাহার ভিক্ষুণীসংঘ একদিন আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ত্যাগের সেবাধর্ম্মের মুক্তিক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছিল, একদিন সঙ্ঘমিত্রা তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য সিংহলে গিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিন আজ আমাদের কোথায়!

এই জ্ঞান-পিপাসা—মানবের এই চিরন্তনী তৃষা এ আমাদের বহু আদিম যুগের সম্পত্তি। একদিন আমাদেরই একজন নারী ব্রহ্মবাদিনী গার্গীরূপে জনক যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবেত্তা মীমাংসা-সভার নেত্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্ববারা বাচক্লবী একদিন বেদের সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী একদিন জগৎকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম", সেই জ্ঞানস্বরূপের দিকে চাহিয়া উদাত্তস্বরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময়।"

একদিন মণ্ডনমিশ্র-শঙ্করাচার্য্য বিচার সভায় উভয়ভারতী বিচারক আচার্য্যার পদ পাইয়াছিলেন। লীলাবতী খনা একদিন আমাদের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিত। তাই আবার বলি সেদিন আজ আমাদের কোথায়! কিন্তু আজ এই আশ্রমের সাংখ্যতীর্থা ব্যাকরণতীর্থা উপাধিধারিণী এবং বেদান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীদিগকে দেখিয়া সেইদিনের কথাই আমাদের মনে হইতেছে।

আমাদের হিন্দুর ঘরের মেয়েদের জীবনে মাত্র দুটা পথ আমাদের সমাজ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। এক—বিধবা হইয়া সমাজের দয়ার পাত্রী ভাবে দিন যাপন করা, দ্বিতীয়—বিবাহান্তে জীবনযুদ্ধে অসমর্থ স্বাস্থ্য অর্থ-হীন স্বামীর সঙ্গে অপটু রুগ্ন দুর্ব্বল সন্তানদলকে জগতে আনিয়া অবিরত অনশন ও আধিব্যাধি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সংসারধর্ম্ম যতটুকু সম্ভব পালন করা; এই তো আমাদের সমাজের সাধারণ নারীজীবনের চিত্র। ধনীর সুখ সৌভাগ্যের ঘরের কথা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র কিন্তু জ্ঞানালোকের অভাবে সেখানেও অন্য প্রকার দুঃখের অভাব নাই। আমরা আমাদের মেয়েকে বিধবা করিয়া রাখার কল্পনাকে তত ডরাই না তাহাদের চির কৌমার্য্যের কল্পনাকে যতটা ডরাই, আজ দেশকে এই কুপ্রথার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী মাতা আমাদের ডাক দিতেছেন। আজ তিনি আমাদের দেশকে মনে করাইয়া দিতেছেন যে আমাদের আর একটা পথও আছে যাহা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ একেবারেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রেও কুমারী কন্যার তপশ্চর্য্যা ও জ্ঞানচর্চ্চার প্রমাণ অনেক আছে। বৌদ্ধযুগের সঙ্ঘমিত্রা অনাথপিণ্ডদসুতা সুপ্রিয়া প্রভৃতির কথা অনেকেই জানেন। লোকসমাজের দত্ত দুইটি ছাড়া আরও যে একটি স্বতঃ অধিকার—যাহা শিক্ষিত ও জ্ঞানানন্দী জীবের ঈশ্বরদত্ত চরিত্রগত বস্তু সেই ব্রহ্মচর্য্যাচরণেও যে আমাদের মেয়েদের অধিকার আছে সেই কথাও মাতাজী আমাদের সম্মুখে জ্বলন্তরূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। তাঁহার আজীবন তপস্যার ফল তিনি এইরূপে আমাদের জন্য ব্যয়িত করিতেছেন। দেশের অনেকগুলি অনাথা বিধবা এবং

অসহায়া নারীদেরও তিনি আশ্রয় ও শিক্ষাদান করিতেছেন। বহুদিনের চেষ্টায় কতকগুলি সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণী "মাতৃসঙ্ঘ" গঠন করিয়া সম্প্রতি তিনি দেশবাসীকে দেশের নিজস্ব আদর্শে মজ্জাগত সংস্কারের সঙ্গে মিলাইয়া তাঁহাদের কন্যাগণকে শিক্ষাদিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আজ তাঁহার অবৈতনিক হিন্দুবালিকা বিদ্যালয়ে ১৩৫ জন ছাত্রী! আশ্রমেও অনেকগুলি বালিকা পূর্ব্বতম যুগের গুরুকুলে বাস করার আদর্শে বাস করিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ইঁহাদের প্রদর্শিত জাতীয় নারী-আদর্শে চরিত্র গঠিত করিলে কালে এই বালিকারা যে সমাজের কতখানি মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে তাহা দেশের ও সমাজের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন। সকল মেয়েরই কিছু উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকে না, অভিভাবকেরাও মেয়েদের সন্ন্যাসিনী বা ব্রহ্মচারিণী করিবার উদ্দেশ্যেই এ বিদ্যালয়ে পাঠান না। যে মেয়ের অন্তরের যে দিকে প্রবণতা সে মেয়ে এই আশ্রমে সেইদিকের উপযুক্ত আদর্শদৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের জীবন সেইভাবে গঠন করিয়া লইতে পারিবে, যেটুকু জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এই ধারণাই আমার মনে উদিত হইতেছে। এখানের বিদ্যালয়ে পড়ার পর আর একবৎসর পড়িলেই মেয়েরা ম্যাট্রিক দিতে পারে তাহাদের এমনি ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সংস্কৃত এখানে প্রথম হইতেই ভালরূপে পড়ানো হইয়া থাকে।

এখানে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় এই সংস্কৃত ভাষাকে ইচ্ছামূলক শিক্ষায় পরিণত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি, কেননা এ বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আমার খুবই কম। তবে দুই একজন অভিজ্ঞের মুখে একথাও শুনিয়াছি যে সংস্কৃতকে ম্যাট্রিকক্লাশে বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিগণিত করিলেও কোনই ক্ষতি নাই। শিক্ষা বোর্ডের যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের দরকার ইহা একবাক্যে সকলেই বলেন। আমার নিজের ধারণামত আমি মাত্র এইটুকু বলিতে চাই যে, যে ভাষায় আমাদের হিন্দুদের যথাসর্ব্বস্বই নিহিত আছে সে ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্ত ইচ্ছামূলক শিক্ষার ভাবে না রাখিলেই বোধ হয় দেশের মঙ্গল হয়। সংস্কৃত ভাষার মূল্য এখন প্রায় সমস্ত সভ্য জগৎই বুঝিতেছেন। সভ্য জগতের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন এই আদিম মাতৃভাষার সম্মান হইতেছে। অথচ আমাদেরই দেশের পুত্রকন্যারা ষোলো সতের কিম্বা তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিজেদের ঘরের এই রত্ন-ভাণ্ডারের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্কীয় ভাবে থাকিবে ইহা আমার অন্যায় বলিয়াই মনে হয়। আমাদের অতীত যুগ অতীত সাহিত্য সব এই ভাষার অঙ্কেই নিহিত। আমাদের গৌরবের যাহা কিছু সব এই দেবভাষার সঙ্গে একান্ত সংশ্লিষ্ট অথচ আমাদের দেশের কত কত শিক্ষিত সন্তানও যে এই ভাষার সঙ্গে চিরদিন প্রায় অপরিচিতই থাকিয়া যান ইহা দেশের কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। দেশের এই আদিম ভাষাকে শিক্ষার প্রথম হইতেই বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিগণিত করিলে দেশের ছেলেমেয়েদের যে কল্যাণই হইবে একথা দেশের বেশীর ভাগ লোকই বোধ হয় অনুমোদন করিবেন।

এখানে দুঃখের সঙ্গেই আর একটী কথাও একটু তুলিতে হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে দেশের ভাই ভাইরা এখনো স্থানে স্থানে যে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়েই আমাদের বহরমপুর সভায় আমার সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ যুক্তিতর্কের কথা তাঁহাদের জানাইয়াছিলাম। যাঁহারা এই শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের সম্মুখে আজ সেসব কথার উত্থাপনকে আমার বাহুল্য এবং প্রগলভতা প্রকাশ বলিয়াই মনে হইতেছে। তবে তাঁহাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি বলিয়াই মাত্র দুটী একটী

কথা বলিতে চাই। আর্য্য বলিয়া—জগতের আদিম সভ্যজাতি বলিয়া যাঁহারা একটী বিশিষ্ট গৌরব ভাব মনে রাখেন তাঁহারা যেন একথাটাও ভাবিয়া দেখেন যে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হইয়া আজ তাঁহারা সভ্য সমাজের কোন্ পর্য্যায়ে পড়িতেছেন ? যাঁহাদের মধ্যে এই আদর্শবাদের কোন স্থানই নাই তাঁহারাও নিশ্চয় একথা স্বীকার করিবেন যে এই জীবনযুদ্ধের দিনে মেয়েদেরও ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ খানিকটা শিক্ষা না দিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নানা ভীতির সম্ভাবনা আছে। মেয়েদের বিবাহের জন্য মাত্র যথেষ্ট অর্থব্যয়ে বাধ্য থাকিয়া পিতামাতার এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। কন্যার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাও তাঁহাদের এখন মনে রাখিতে হইবে। দেশে এখন আর সেই একান্ন পরিবারের সংঘযুক্ত ভাব নাই। মাত্র স্বামীর অভাবে মেয়েরা এখন শ্বশুর ও পিতৃ উভয়কুলেরই ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। সেই দিনে তাহারা যেন অকূল সমুদ্রে না পড়ে পিতামাতাকে এখন একথাটাও ভাবিয়া রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের দুর্ভাগিনী নারীজাতির শেষ আশ্রয় স্থান ধর্ম্মক্ষেত্র কাশীধামে এখন বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে জীবনোপায়বিহীনা কোন কোন নারী শৈশবে যে শিক্ষার সুযোগ পান নাই, মধ্য বা শেষ বয়সে নানারূপে সেই শিক্ষার কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া নানাকর্ম্মে নিজের দিনপাত করিতেছেন। ছেলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন মেয়ের পড়ার খরচও কিছু ধরিয়া রাখিতেই হইবে। এ আশ্রমের বিদ্যালয়ে যে পিতামাতারা কন্যাদের শিক্ষা দিবার সৌভাগ্যলাভ করিবেন তাঁহাদের আরও একটু সুবিধা এই যে বিদ্যালয়টি অবৈতনিক। আশ্রমের বোর্ডিংয়ে যাঁহারা মেয়ে রাখেন একান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহাদের বোর্ডিং খরচাও দিতে হয় না। আশ্রমে এইরূপ মেয়েই বেশীর ভাগ। গৌরীমাতা আজ দেশের মেয়েদের অবস্থার অনুকূল এত বড় প্রতিষ্ঠানই আজ দেশকে দিতেছেন।

আমার কল্পনাস্বপ্নের এই জাগ্রৎ সত্য প্রতিষ্ঠানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সেই স্বপ্নের আরও একটু অংশ আজ এখানে নিবেদন করিতে চাই। কার্য্যবিবরণীতে আশ্রমের উদ্দেশ্য তিনটীর কথা ((১) হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, (২) সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা এবং অসহায়া মহিলা-দিগকে আশ্রয় দান ও তাহাদের জীবনধারণোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাদান এবং (৩) আদর্শ নারীজীবন যাপনের পথে সহায়তা করার কথা) জ্ঞাত হইয়াছি। এখানে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত রন্ধন, সাংসারিক কাজকর্ম্ম, সূতাকাটা, তাঁতবোনা, সেলাই দর্জ্জির কাজ প্রভৃতিও শেখানো হইয়া থাকে। আমি আজ আরও একটু আশা মাতাজীর চরণে নিবেদন করিতেছি। মেয়েদের এইসব শিক্ষার সঙ্গে সেবাধর্ম্মের অন্তর্গত চিকিৎসা বিদ্যারও কিছু কিছু অনুশীলন করাইলে বোধ হয় ভাল হয়। তাহারা দেশের সেবিকাই হৌক বা গৃহধর্ম্মেই প্রবেশ করুক সর্ব্বত্রই এবিদ্যার প্রয়োজন বিশেষ ভাবেই আছে। আর আশাকরি মাতাজী এবং আশ্রমের মাতৃসঙ্ঘ এই পুণ্য-প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশঃ বাংলার দেশে দেশে শাখায় শাখায় বিভক্ত করিয়া ঘরে ঘরে ইহার ক্রমবিস্তৃতির চেষ্টাও করিবেন। এই আদর্শ হিন্দু-দের ঘরে ঘরে সত্য হইয়া উঠুক ইহাই আজ আমার একান্ত কামনা।

বাক্য চেষ্টার আদ্যে মধ্যে যিনি প্রণম্য, কথার অন্তেও তাঁহাকে প্রণাম করি - যিনি যুগে যুগে নরোত্তমরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যে যুগন্ধর মহাপুরুষের নাম এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত সেই পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ শিষ্য শিষ্যাবর্গকে প্রণাম করিয়া আমার এই সামান্য বাক্য-চেষ্টার সমাপ্তি করিতেছি। ইহাতে যদি কিছু ধৃষ্টতাপ্রকাশ হইয়া থাকে তাহা সকলে মার্জ্জনার চক্ষেই দেখিবেন এ ভিক্ষাও সকলের নিকট জানাইতেছি। আশা করি ভিক্ষা নিষ্ফল হইবে না।

শ্রীনিরুপমা দেবী

"বঙ্কিমের বাড়ী"

দূর্ দূর্, কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে মাল-মসলা দিয়া   গিয়াছে সে নিরমিয়া
তার জোরে সে যে দেবে কালসিন্ধু পাড়ি ।
যত ঝঞ্ঝা যত ঝড়   লাগিবে তাহার 'পর
ততই সৌন্দর্য্য তার উঠিবে রে বাড়ি' ।
তাহাকে ভাঙিতে চায়, কে রে সে আনাড়ী ?

দূর্ দূর্, কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
বাংলার ঘরে ঘরে   পলে পলে যার তরে
কোটি কোটি বঙ্গবাসী হৃদয় নিঙাড়ি',
ঐ দেখ্, ধীরে ধীরে,   মুক্তি-মন্দাকিনী-তীরে
সোণার আনন্দমঠ তুলিতেছে গড়ি',
স্তুতিনিন্দা তোষামোদ   রাজভক্তি রাজরোষ
তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ—যত ধূলা বালি ঝাড়ি'
আকাশ ভেদিয়া দূর,   উঠিছে সে মঠচূড়,
কে তারে করিবে গুড়া, বৃথা বাড়াবাড়ি ।
দূর্ দূর্, কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ি ?

দূর্ দূর্, কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
বঙ্কিম গড়েছে যাহা,   অনন্ত অক্ষয় তাহা
কে পারে রে খসাইতে এক চুল তারি',
নহে ত গড়া সে খালি,   দিয়ে কাঠ চূণ বালি
নুনে জরা এ মাটির ইট কাঁড়ি কাঁড়ি ।
কোটি অনশনক্লিষ্ট   ভারতের "শান্তশিষ্ট"
প্রাণের ভিতরে আছে যে প্রাণ, তাহারি
উপরে বনেদ করি   বঙ্কিম গিয়াছে গড়ি
তাহার সাধের দেশমাতৃকার বাড়ী ।
কোটি বিশ্বকর্ম্মা নারে ফেলিতে উপাড়ি ॥

দূর্ দূর্ কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর অধিরাণী   মহিয়সী দেবীরাণী
রাজরাজেশ্বরীরূপে শোভে বলিহারি ।
দিবানিশি সখী তার,   তুলনা মিলে না যার,
যে বাড়ীতে সূর্য্যমুখী পতিরতা নারী ।
সরলা কমলমণি   অনন্ত প্রেমের খনি
উজল করিয়া আছে সতত যে বাড়ী,
তাহারে ভাঙিতে চায়—কে রে সে আনাড়ী ?

দূর্ দূর্ কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর আঙিনাতে   জীবন-সুরভি-প্রাতে
কুন্দ কুসুমের কলি পড়িতেছে ঝরি'
রক্তমাখা খাঁড়া হাতে   রুদ্র-কাপালিক-সাথে
কপালকুণ্ডলা যেথা সতত প্রহরী ।
যে বাড়ীর পুরদ্বার   রক্ষিতেছে অনিবার
কুমার জগৎসিংহ বক্ষ পরসারি,
বজ্রমুষ্টি-করে ধরি তীক্ষ্ণ তরবারি ॥

দূর্ দূর কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যেথা নারী কুলোত্তমা   নিয়ত সে তিলোত্তমা,
শান্তিময়ীরূপে, মরি, করে পাইচারী ।
মুক্তকণ্ঠা আয়েষার   সুকণ্ঠ বীণার তার
কাঁপি যেথা পেষে আনি জোর করি কাড়ি'
কত সেনাপতি-প্রাণ পদতলে পাড়ি' ॥
প্রতিহিংসানল চক্ষে   প্রতিহিংসা-অসি কক্ষে
বিমলা যেখানে আততায়ী বক্ষ কাড়ি'
রক্তমাখা-করে করে নৃত্য মনোহারী ॥

দূর্ দূর্ কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর পুরোদ্যানে   বীণাপাণি বসি ধ্যানে ;
ঐ শোন্—কি করুণ বাজে বীণা তাঁরি' ।
"কণ্টকে গঠিল" বলি   মৃণালের দুঃখে গলি
ঝরিছে দেবীর অশ্রু-মুক্তা সারি সারি
যে বাড়ীতে,—পীঠস্থান সে যে বাংলারি' ॥
"মেঘেতে বিজলি হাসি   আমি বড় ভালবাসি"
বলি যেথা গিরিজায়া গায় গলা ছাড়ি'
বঙ্কিমের অবিনাশী মানস কুমারী ।

দূর দূর কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যাহার চত্বর মাঝে   নবীন-সন্ন্যাসী-সাজে
আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি উপাড়ি'
ব্রাহ্মণ অনলে ঢালে গ্রন্থ কাঁড়ি কাঁড়ি ।
প্রাবৃট্ চাঁদনী রাতে   ভাসি প্রতাপের সাথে
মরিল রে শৈবলিনী মরিতে না পারি
যে বাড়ীর পরিখায় উন্মাদিনী নারী ॥

দূর্ দূর্ কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর শূন্যঘরে,   অন্তিম শয্যায় পড়ে'
এখনো ভ্রমর কাঁদে আছাড়ি পিছাড়ি ;

যেখানে গোবিন্দলাল   রোহিণীর ইন্দ্রজাল
ভেদিয়া—উদ্‌ভ্রান্ত-প্রাণে আসি তাড়াতাড়ি,
শিহরি শিহরি কাঁদে ভ্রমরে নেহারি।
যে বাড়ীর চারিধারে,   যাহার তোরণ দ্বারে
ইন্দিরার করে ধরি চঞ্চল কুমারী
বিদ্যুদ্‌বিলাসে ফেরে যেন প্রতিহারী ॥

দূর্ দূর্ কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
কুটিল-কৌটিল্য-ধীর   চন্দ্রচূড় জ্ঞানবীর
বজ্রদৃঢ়-করে ধরি প্রজ্ঞাতরবারী
যে বাড়ীর পুরদ্বারে   ভ্রমিতেছে পাদচারে
সিংহের মতন দীপ্র নয়ন বিস্ফারি।
উপকণ্ঠে যে বাড়ীর   প্রিয়পুত্র ভবানীর
ভবানী পাঠক দশা বঙ্গের নেহারি
নীরবে ফেলিছে হায় নয়নের বারি ॥

দূর্ দূর্ কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী?
যথা ভাগীরথীজলে   ধীরে ধীরে কুতূহলে
অন্ধ রজনীরে ঐ নামিতে নেহারি
চিত্রপুত্তলিকাপ্রায়   শচীন্দ্র অবশকায়
বিস্ময়ে নিরখিছে সে "অপূর্ব্ব নারী,"
কে পারে রে বঙ্কিমের ভাঙিতে সে বাড়ী ?
যে বাড়ীর বাঁধাঘাটে   কি জাঁক-জমক-ঠাটে
কতধন-রত্ন-মণি-মাণিক্য বেপারী
পুরন্দর বাঁধিয়াছে ডিঙ্গা সারি সারি,
ভেটীতে সে মনোহরে   যুগল-অঙ্গুরী-করে
কণ্টকিত দেহে হিরণ্ময়ী সুকুমারী,
তীরে দাঁড়াইয়া যেন রাজার ঝিয়ারী ॥

দূর দূর কে ভাঙিবে বঙ্কিমের বাড়ী ?
যে বাড়ীর পুরো ভাগে   সাজাইয়া ভাগেভাগে
মায়ের পূজার পূত-পাদ্য-অর্ঘ্য-বারি
জলদ প্রতিমাস্বনে   থাকি থাকি ক্ষণে ক্ষণে
"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র "সন্তান" উচ্চারি'
পূজিছে মায়ের পদ সর্ব্বদুঃখহারী।
যে মন্ত্রের ধ্বনি কানে   পশিলে অসাড় প্রাণে
ত্রিশকোটি শব-দেহ মোড়ামুড়ি ছাড়ি,'
উৎসাহে বসিতে চায় উঠি' তাড়াতাড়ি।
দূর্ দূর্ বঙ্কিমের কে ভাঙ্গে সে বাড়ী ?

সুদর্শন

আপন কথা

(বার-বাড়িতে)

সেকালের কায়দা অনুসারে একটা বয়েস পর্য্যন্ত ছেলেরা থাকতেম অন্দরে ধরা, তারপর একদিন চাকর এসে দাসীর হাত থেকে আমাদের চার্জ্জ বুঝে নিতো,—কাপড় জুতো জামা বাসন্ কোসোনের মতো করে আমাদের তোষাখানায় নামিয়ে নিয়ে ধরতো, সেখান থেকে ক্রমে দপ্তরখানা হয়ে হাতে খড়ির দিনে ঠাকুর ঘর, শেষে বৈঠকখানার দিকে আস্তে আস্তে প্রমোশন পাওয়া নিয়ম ছিল।

রামলাল যতদিন আমার চার্জ্জ বুঝে নেয়নি ততদিন আমি ছিলেম তিন তলায় উত্তরের ঘরে; সেইকালে একবার একটা সূর্য্যগ্রহণ লাগলো থালায় জল রেখে সূর্য্য দেখা একটা পুণ্য কাজ করে ফেলেছিলেম সেদিন,—মনে পড়ে সেই প্রথম একটা ছাতে বার হয়ে আকাশ

দেখলেম—নীল পরিষ্কার আকাশ তারি গায়ে সারি সারি নারকেল গাছ, পূবদিক জুড়ে মস্ত একটা বটগাছ, তারি তলায় একটা পুকুর—আমাদের দক্ষিণের বাগানের এইটুকুই চোখে পড়লো সেইদিন! এই দক্ষিণের বাগান ছিল বার-বাড়ির সামিল,—বাবুদের চলাফেরার স্থান। এখন যেমন ছেলেপিলে দাসী চাকর রাস্তার লোক এবং অন্দরের মেয়েরা পর্য্যন্ত এই বাগান মাড়িয়ে চলাফেরা করে সেকালে সেটি হবার জো ছিল না! বাবামশায়ের সখের বাগান ছিল এটা,—এখানে পোষা সারস পোষা ময়ূর—তারা কেউ হাঁটু জলে পুকুরে নেমে মাছ শিকার করতো কেউ পাখম ছড়িয়ে ঘাসের উপর চলাফেরা করতো। তিন চারটে উড়ে মালিতে মিলে এখানে সব সখের গাছ আর খাঁচার পাখীদের তদ্‌বির করে বেড়াতো, একটি পাতা কি ফুল ছেঁড়ার হুকুম ছিল না কারু! এই বাগানে একটা মস্ত গাছ-ঘর সেখানে দেশ বিদেশের দামি গাছ ধরা থাকতো, পদ্মফুলের মতো করে গড়া একটা ফোহারা,—তার জলে লাল মাছ সব আফ্রিকা দেশ থেকে আনানো নীল পদ্ম পাতার তলায় খেলে বেড়াতো! বাড়িখানা একতলা দোতলা তিনতলা পর্য্যন্ত পাখীতে গাছেতে ফুল-দানিতে ভর্ত্তি ছিল তখন। মনে পড়ে দোতলায় দক্ষিণের বারাণ্ডার পূবদিকে একটা মস্ত গামলায় লাল মাছ ঠাসা থাকে, তারি পাশে দুটো সাদা খরগোস, জাল-ঘেরা মস্ত খাঁচার মধ্যে সব ছোট ছোট পোষা পাখীর ঝাঁক, দেওয়ালে একটা হরিণের শিং-এর উপরে বসে লালঝুটি মস্ত কাকাতুয়া, শিকলি বাঁধা চীন দেশের একটা কুকুর—নাম তার কামিনী—পাউডার এসেন্সের গন্ধে কুকুরটার গা সর্ব্বদা ভুর ভুর করে। তখন বেশ একটু বড় হয়েছি কিন্তু বৈঠকখানার বারণ্ডায় ফস্ করে যাবার সাধ্য নেই সাহসও নেই এখন যেমন ছেলেমেয়েরা বাবা বলে ছুট্ করে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয় তখন সেটা হবার জো ছিলনা। বাবামশায় যখন আহারের পরে ওবাড়িতে কাছারী করতে গেছেন সেই ফাঁকে একদিন বৈঠকখানায় গিয়ে পড়তেম। 'টুনি' বলে একটা ফিরিঙ্গীর ছেলেও এই সময়টাতে পাখী চুরি করতে এদিকটাতে আসতো—পাখীগুলোকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়ে, জালে করে ধরে নেওয়া খেলা ছিল তার! টুনি সাহেব একবার একটা দামি পাখী উড়িয়ে দিয়ে পালায়, দোষটা আমার ঘাড়ে পড়ে, কিন্তু সেবারে আমি টুনির বিদ্যে ফাঁস করে দিয়ে রক্ষে পেয়ে যাই। আর একদিন সে তখন গরমির সময়—দক্ষিণ বারাণ্ডাটা ভিজে খসখসের পর্দ্দায় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হয়ে আছে, গামলা ভর্ত্তি জলে পদ্মপাতার নিচে লাল মাছগুলোর খেলা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি জোগালো—যেমন লাল মাছ তেমনি লাল জলে এরা খেলে বেড়ালেই শোভা পায়—কোথা থেকে খানিক লাল রঙ এনে জলে গুলে দিতে দেরী হল না, জলটা লালে লাল হয়ে উঠলো কিন্তু মিনিট কতকের মধ্যেই গোটা দুই মাছ মরে ভেসে উঠলো দেখেই বারাণ্ডা ছেড়ে চোঁ চাঁ দৌড় —একদম ছোটপিসির ঘরে। মাছমারার দায় থেকে কেমন করে কি ভাবে যে রেহাই পেয়েছিলেম তা মনে নেই, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত আর দোতলায় নামতে সাহস হয় নি! মনে আছে আর একবার মিস্ত্রী হবার সখ করে বিপদে পড়েছিলেম—বাবামশায়ের মনের মত করে চীনেমিস্ত্রারা চমৎকার একটা পাখীর ঘর গড়ছে—জাল দিয়ে ঘেরা একটা যেন মন্দির তৈরি হচ্ছে দেখছি বসে বসে, রোজই দেখি আর মিস্ত্রীর মতো হাতুড়ি পেরেক অস্ত্র শস্ত্র চালাবার জন্যে হাত নিস্‌পিস্ করে, একদিন তখন কারিগর সবাই টিফিন্ করতে গেছে সেই ফাঁকে একটা বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে মেরেছি দু'তিন কোপ্—ফস্ করে বাঁহাতের বুড়ো আঙ্গুলের ডগাটায় বসলো বাটালির এক ঘা, খাঁচার গায়ে দুচার ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো,—রক্তটা মুছে নেবার সময় নেই,—তাড়া-

তাড়ি বাগান থেকে খানিক ধুলো-বালি দিয়ে যতই রক্ত থামাতে চলি ততই বেশি করে রক্ত ছোটে, তখন দোষ স্বীকার করে ধরা পড়া ছাড়া উপায় রইল না, সেবারে কিন্তু আমার বদলে মিস্ত্রীই ধমক খেলে—যন্ত্রপাতি সাবধানে রাখার হুকুম হল তার উপর! কারিগর হতে গিয়ে প্রথম যে ঘা খেয়েছিলেম আর দাগ্‌টা এখনো আমার আঙ্গুলের ডগা থেকে মেলায়নি, ছেলে বেলায় আঙ্গুলের যে মামলায় পার পেয়ে গিয়েছিলেম তারি শাস্তি বোধ হয় এই বয়েসে লম্বা আঙ্গুল এঁকে শুধতে হচ্ছে সাধারণের দরবারে। আর একটা শাস্তির দাগ এখনো আছে লেগে আমার ঠোঁটে- গুড়গুড়িতে তামাক খাবার ইচ্ছে হল হঠাৎ কোথা থেকে একটা গাড়ু জোগাড় করে তারি ভিতর খানিক জল ভরে টানতে লেগে গেলেম, ভুর ভুর শব্দটা ঠিক হচ্ছে এমন সময়ে কি জানি পায়ের শব্দে চমকে যেমন পালাতে যাওয়া অমনি সখের হুঁকোটার উপর উল্টে পড়া, সেবারে নীলমাধব ডাক্তার এসে তবে নিস্তার পাই—অনেক বরফ আর ধমকের পরে। দেখিছি যখন দুষ্টুমির শাস্তি নিজের শরীরে কিছু না কিছু আপনা হতেই পড়েছে তখন গুরুজনদের কাছ থেকে উপরি আরো দুচার ঘা বড় একটা আসতো না, যখন দুষ্টুমি করেও অক্ষত শরীরে আছি তখনি বেত খেতে হতো নয় তো ধমক, নয় তো অন্দরে কারাবাস, এই শেষের শাস্তিটাই আমার কাছে ছিল ভয়ের,—কুইনাইন খাওয়ার চেয়ে বিষম লাগতো।

অন্দরে বন্দি অবস্থায় যে কদিন আমায় থাকতে হতো সে কদিন ছোটপিসির ঘরই ছিল আমার নিশ্বাস ফেলবার একটি মাত্র জায়গা। 'বিষবৃক্ষ' বইখানাতে সূর্য্যমুখীর ঘরের বর্ণনা পড়ি আর মনে আসে ছোটপিসির ঘর, তেমনি সব ছবি দেশী পেণ্টারের হাতে, কৃষ্ণকান্তের উইলে যে লোহার সিন্দুকটা সেটাও ছিল, কৃষ্ণনগরে কারিগরের গড়া গোষ্ঠলীলার চমৎকার একটি কাচ ঢাকা দৃশ্য তাও ছিল, উলে বোনা পাখীর ছবি, বাড়ির ছবি, মস্ত একখানা খাট—মশারীটা তার ঝালরের মতো করে বাঁধা, শকুন্তলার ছবি, মদন ভস্মের ছবি, উমার তপস্যার ছবি, কৃষ্ণলীলার ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ভর্ত্তি,—একটা একটা ছবির দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কেটে যেতো। এই ঘরে জয়পুরী কারিগরের আঁকা ছবি থেকে আরম্ভ করে, অয়েলপেণ্টিং ও কালিঘাটের পট পর্য্যন্ত সবই ছিল, তার উপরেও, এক আলমারী খেলনা,—কালো কাচের প্রমাণসই একটা বেরাল, সাদা কাচের একটা কুকুর, ঠুনকো কাচের একটা ময়ূর, রঙ্গীন ফুলদানি কত রকমের!—সে যেন একটা ঠুনকো রাজত্বে গিয়ে পড়তেম, এ ছাড়া একটা আলমারি তাতে সেকালের বাংলা সাহিত্যে যা কিছু ভাল বই সবই রয়েছে, এই ঘরের মাঝে ছোট পিসি বসে বসে সারাদিন পুঁথি গাঁথা আর সেলাই নিয়েই থাকেন। বাবামশায় ছোট পিসিকে সাহেব বাড়ি থেকে সেলায়ের বই, রেশম, কতকা এনে এনে দিতেন আর তিনি বই দেখে দেখে নতুন নতুন সেলায়ের নমুনা নিয়ে কত কি কাজ করতেন তার ঠিক নেই! ছোট পিসি একজোড়া ছোট্ট বালা পুঁথি গেঁথে গেঁথে গড়ে ছিলেন—সোণালা পুঁথির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্ট বালা দুগাছি—সোণার বালার চেয়েও ঢের সুন্দর দেখতে! বিকেলে ছোট পিসি পায়রা খাওয়াতে বসতেন,—ঘরের পাশেই খোলা ছাত, সেখানে কাঠের খোপে বাঁশের খোপে পোষা থাক্‌তো—লক্কা সিরাজী মুক্ষি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা, খাওয়ার সময়ে ছোট পিসিকে ডানায় আর পালকে ঘিরে ফেলতো পায়রাগুলো, সে যেন সত্যি সত্যিই একটা পাখীর রাজত্ব দেখতেম—উচু পাঁচীল ঘেরা ছাতে ধরা। বাবামশায়েরও পাখীর সখ ছিল কিন্তু তাঁর সখ্ দামি দামি খাঁচার পাখীর, ময়ূর সারস হাঁস এই সবেরই। পায়রার সখ ছিল ছোট পিসির,

হাটে হাটে লোক যেতো পায়রা কিন্‌তে, বাবামশায় তাঁকে দুটো বিলিতি পায়রা এক সময় এনে দেন, ছোট পিসি সে দুটোকে ঘুঘু বলে স্থির করেন কিছুতেই পুষতে রাজি হন্ না; অনেক বই খুলেও বাবামশায় যখন প্রমাণ করতে পারলেন না,—যে পাখী দুটো ঘুঘু নয়, তখন অগত্যা সেদুটো রট্‌লেজ সাহেবের ওখানে ফেরত গেল! এরি কিছুদিন পরে একটা লোক ছোটপিসিকে এক জোড়া পায়রা বেচে গেল,—পাখী দুটো দেখতে ঠিক সাদা লক্কা কিন্তু লেজের পালক তাদের ময়ূরপুচ্ছের মতো রঙ্গীন, এবার ছোট পিসি ঠকলেন, বাবামশায় এসেই ধরে দিলেন পায়রার পালকে ময়ূরপুচ্ছ সুতো দিয়ে সেলাই করা—একটা তুমুল হাসির হোর্‌রা উঠেছিল সেদিন তিন তলার ছাতে, তাতে আমরাও যোগ দিয়েছিলেম। ঠাকুর পূজো কথকতা সেলাই আর পায়রা এই নিয়েই থাক্‌তেন ছোটপিসি। একবার তাঁর তিনতলার এই ছাতটাতে বাড়িশুদ্ধ সবার ফটো নিতে এক মেম এসে উপস্থিত হল, আমাদেরও ফটো নেবার কথা, সকাল থেকে সাজগোজের ধূমধাম পড়ে গেল, সেই দিন প্রথম জানলেম আমার একটা হাল্কা নীল মখমলের কোট পেণ্ট আছে, ভারি আনন্দ হল কিন্তু গায়ে চড়াবা মাত্রই কোট পেণ্ট বুঝিয়ে দিলে যে আমার মাপে তাদের কাটা হয়নি; এই অদ্ভুত সাজ পোরে আমার চেহারাটা কারু কারু আল্‌বামে এখনো আছে—রোদের ঝাঁজ লেগে চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে, কাপড়টা ছেঁড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে এই ভাব।

ফটো তোলা আর বাড়ির প্লান্ আঁকার কাজ জান্‌তেন বাবামশাই। ড্রয়িং করার নানা সাজ-সরঞ্জাম, কম্পাস্ পেন্‌সিল্ কত রকমের দেখতেম তাঁর ঘরে। বাবামশায় কাছারীর কাজে গেলে তাঁর ঘরে ঢুকে সেগুলো নেড়ে-চেড়ে নিতেম। ঠিক সেই সময় ফার্সি পড়ানো মুন্সী এসে জুটতেন, কথায় কথায় তিনি আলে, বে, পে, তে, জিম্ এমনি ফার্সি অক্ষর আমাদের শোনাতে বস্‌তেন, মুন্সির দু'একটা বয়েৎ এখনো একটু মনে আছে—"গুলেস্তাঁমে যাকে হরিয়েক্ গুল্‌কো দেখা, না তেরী সে রঙ্গ, না তেরী সে বু হ্যায়" আর একটা বয়েৎ ছিল সেটা ভুলে গেছি কেবল ধ্বনিটা মনে আছে—কবুতর্ বা কবুতর্ বাক্ বাবাজ্—! সেকালে ফার্সি পড়িয়ে হলে কানে সরের কলম আর লুঙ্গী না হ'লে চলতো না, মাথাও ঢাকা চাই; ঠিক মনে পড়ে না কেমন সাজটা ছিল মুন্সির।

আর একজন সাহেব আসতো তার নাম রুবারীয়ো—জাতে পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী, মিস্‌কালো। বড় দিনের দিন সে একটা কেক্ নিয়ে হাজির হতো, তাকে দেখলেই শুধোতেম—সাহেব আজ তোমাদের কী, সাহেব অমনি নাচ্‌তে নাচ্‌তে উত্তর দিতো—আজ আমাদের কিস্‌মিস্, সাহেবের নাচন দেখে আমরাও তাকে ঘিরে খুব একচোট নেচে নিতেম। নতুন কিছু পাখী কিম্বা নিলেমে গাছ কেনার দরকার হলে বৈকুণ্ঠ বাবুর ডাক পড়্‌তো—দেখতে বেঁটে খাটো মানুষটি মাথায় টাক্।—রাজ্যের পাখী গাছ আর নিলেমের জিনিষের সংগ্রহ করতে ওস্তাদ ছিলেন ইনি। তখন স্যার রিচার্ড টেম্পল ছোটলাট,—ভারি তাঁর গাছের বাতিক, বৈকুণ্ঠ বাবু নিলেমে ছোটলাটের ডাকের উপর ডাক চড়িয়ে অনেক টাকায় একটা গাছ আমাদের গাছ-ঘরে এনে হাজির করলেন, ছোটলাট খবর পেলেন—গাছ চলে গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে, সঙ্গে সঙ্গে লাটের চাপরাশি পত্র নিয়ে হাজির—ছোটলাট বাগান দেখতে ইচ্ছে করেছেন,—উপায় কী, সাজ সাজ রব পড়ে গেল, আমার মখমলের কোটপেণ্ট আবার সিন্দুক থেকে বার হল, সেজেগুজে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে দেখলেম—ঘোড়ায় চড়ে ছোটলাট এলেন, খানিক বাগানে ঘুরে এক পাত্র চা খেয়ে

বিদায় হলেন, বৈকুণ্ঠ বাবুর ডেকে আনা গাছটাও চলে গেল জোড়াসাঁকো থেকে বেল্‌ভেডিয়ার পার্কে। বৈকুণ্ঠ বাবুর বাসা ছিল পাথুরেঘাটায়, সেখান থেকে নিত্য হাজির দেওয়া চাই এখানে। একবার ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়, বৈকুণ্ঠ বাবু গলির মোড়ে আট্‌কা,—অন্যের যেখানে হাঁটু জল বৈকুণ্ঠ বাবুর সেখানে ডুব-জল —এতো ছোট্ট ছিলেন তিনি—কাযেই একখানা ছোট্ট নৌকা পুকুর থেকে টেনে তুলে তবে তাঁকে চাকরেরা উদ্ধার করে আনে। ছোট্ট মানুষটি কিন্তু ফন্দি ঘুর্‌তো অনেক রকম তাঁর মাথায়, কত রকমই যে ব্যবসার মৎলব করতেন তিনি তার ঠিক নেই। একবার বড় জ্যাঠামশায় এক বাক্স নিব্‌ কিনে আনতে বৈকুণ্ঠ বাবুকে হুকুম করেন, তিনি নিলেম থেকে একটা গরু-গাড়ি বোঝাই নিব্‌ কিনে হাজির, আর একবার এক গাড়ি বিলিতি এসেন্স এনে হাজির বাবামশায়ের জন্যে —দেখে সবাই অবাক্ হাসির ধুম পড়ে গেল। এই ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাণ্ড স্বপ্ন ছাড়া ছোট-খাটো স্বপ্ন দেখ্‌তে কখন দেখ্‌লেম না শেষ পর্য্যন্ত। বিচিত্র চরিত্রের সব মানুষের দেখা পেলেম তিনতলা থেকে ছাড়া পেয়েই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক—বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের বর্ণানুক্রমিক সচিত্র চরিতাভিধান। শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। অকার হইতে ব অক্ষরের কিয়দংশ পর্য্যন্ত (বঙ্গাব্দ ১৩১১ হইতে ১৩১৫ পর্য্যন্ত)।

গ্রন্থখানির নাম পড়িলেই উহার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। আমাদের সাহিত্যে এইরূপ গ্রন্থের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক; এই অতি প্রয়োজনের গ্রন্থ রচনায় শিবরতন মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগ সর্ব্ব-প্রথম। গ্রন্থখানি কতদিনে শেষ হইবে জানি না; উহার শেষখণ্ড প্রায় ১৯ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। যতদূর যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সপরিশ্রম অনুসন্ধানের যথেষ্ট পরিচয় পাই। খুব সম্ভব দেশের লোকের তেমন উৎসাহ পান নাই বলিয়াই গ্রন্থকার এতদিনে এ গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গে প্রকাশিত হইবার পথে একটি বাধা হইয়াছে গ্রন্থকারের অবলম্বিত শৃঙ্খলা। তিনি পরলোকগত সাহিত্য-সেবকদের নামের তালিকা দিয়াছেন বর্ণানুক্রমে; কাজেই যখন তিনি স্বরবর্ণের নামগুলি শেষ করিয়া অন্য বর্ণের নাম আরম্ভ করিয়াছেন, তখন স্বরান্তের যে সকল সাহিত্য-সেবকের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহাদের নাম এই গ্রন্থে স্থান পায় নাই। সাহিত্যসেবকদের নাম বর্ণানুক্রমে না দিয়া যদি যুগ বা কালের হিসাবে দেওয়া হইত তবে এ অসম্পূর্ণতা ঘটিত না; এখন আবার প্রতি বর্ণের নামের তালিকার শেষে নূতন নামের পরিশিষ্ট না দিলে চলিবে না। ত্রুটি সংশোধনের উপায় নাই; এখন যদি দেশের লোকের সাহায্যে ও উৎসাহে ইংরেজি ১৯২৮ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত পরলোক-গতদের নাম মাত্র পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইয়া যায় তবে গ্রন্থখানির পর পর সংস্করণে অতি অল্প শ্রমেই উহার পরিবর্দ্ধন সম্ভব হইতে পারিবে। অন্য আর একটি দিকে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভাষায় রচনার নামে যাঁহারাই সেকালে একালে কালির আঁচড় পাড়িয়াছেন তাঁহাদের সকলের নাম লিখিতে গেলে অনেক হাজার পৃষ্ঠার বই চাই। অথচ, অনেক নাম কিছুতেই রক্ষিত হইতে পারে না। আবার অন্যপক্ষে যাঁহারা যথার্থ সাহিত্য সেবক,

যাঁহাদের জ্ঞানের ও কর্ম্মের প্রভাবে জাতীয় জীবন ও সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে, যাঁহাদের চিন্তাস্রোতের এক একটা ক্ষুদ্র ধারা ধরিয়া অনেক সাহিত্যিকের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা একছত্র কিছু রচনা করিয়া না থাকিলেও সাহিত্যসেবকদের পরিচয়ে তাঁহাদের নাম উল্লেখযোগ্য; একথা মনে রাখিলে গ্রন্থকার অনেক ত্রুটির সংশোধন করিতে পারিবেন।

দুলালী—শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত। ১০১ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা; ভাল বাঁধা।

আমাদের সাহিত্যে এখন গল্প-উপন্যাস রচনা খুব বাড়িয়াছে, আর অনেক গল্পই সুপাঠ্য হয় না। এই দুলালী বইখানির সকলগুলি গল্পই সুপাঠ্য; প্রথম গল্পটির নাম দুলালী, তাহা ছাড়া এগ্রন্থে আরও ছয়টি গল্প আছে। সাধারণ ঘটনার বর্ণনায় ছোট ছোট এই গল্পগুলি বেশ মনোহর ভাবেই রচিত হইয়াছে।

ভগবদ্ গীতিমালা—রায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্ এ, বি এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও ২৩।১।৩ গুরুপ্রসাদ লেন হইতে শ্রীললিত মোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সংগ্রাহক যোগেন্দ্র বাবু একজন অবসর-প্রাপ্ত জেলা-জজ। ৩৪ বৎসর ব্যাপি-সরকারী কার্য্য-উপলক্ষে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যে-সমস্ত মহাপ্রাণ লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাহারই ফল-স্বরূপ জীবনের সন্ধ্যায় এই সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে গুরু নানক, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, দাশরথি, নীলকণ্ঠ, গোবিন্দ অধিকারী, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাধু বিজয়কৃষ্ণ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, রজনী সেন প্রভৃতি ১২৫ জনের রচিত ভগবদ্ বিষয়ক ৬০৬টা গান সন্নিবেশিত আছে। ভক্ত, সাধক ও সঙ্গীত-রসিক সকলেরই নিকট ইহা সমাদর লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পুস্তক।

গৃহাগ্নি বা বধূদাহ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ তত্ত্ববিনোদ প্রণীত;—মূল্য ১৲ এক টাকা। বাঁধান ১।০ পাঁচ সিকা।

হিন্দু সমাজের মধ্যে বধূ-নির্য্যাতন আজকাল আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছে। সংবাদ পত্রে প্রতিনিয়তই বধূ-নির্য্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। গ্রন্থকার কয়েকটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে বধূ-নির্য্যাতনের বিপক্ষে প্রতিবাদ স্বরূপ ও তাহার প্রতীকার কামনায় উপন্যাস আকারে এই পুস্তক খানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয়।

রামায়ণে আর্ট—শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত—মূল্য ॥০ আট আনা।

এখানি ত্র্যঙ্ক ব্যঙ্গনাট্য—কথা, ও নাট্য সাহিত্যের ভিতর দিয়া, মনস্তত্ত্ব ও আর্টের দোহাই দিয়া, হিন্দুর রামায়ণ ও দেবদেবীর যে বিকৃত রূপ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ এই পুস্তকখানি লিখিত। পুস্তকের ৭ পৃষ্ঠায় বাল্মীকিকে কলি বলিতেছেন—"পৃথিবীতে রামনাম বাঁচিয়ে না রাখ্‌লে, আমার মত কীর্ত্তিমানকে পরে নরক থেকে উদ্ধার কর্ব্বে কে? তোমার রামকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যেই রঙ্গের ভেতর দিয়ে তাঁকে সং করেছি।"—কলির এই উক্তির ভিতর গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্ট। পুস্তকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইতেছে।

সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি এ। পৃঃ ৪১ অরুণোদয় আর্ট প্রেস, কলিকাতা। মূল্য।০ আনা। যুগ প্রবর্ত্তক ডাক্তার হ্যানিমানের সুপ্রসিদ্ধ "অর্গ্যাননের" গ্রন্থের উপরই ভিত্তি স্থাপন করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। সুতরাং, ভিত্তিটি সুদৃঢ়ই হইয়াছে। গ্রন্থকারের রচনাভঙ্গী সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

সংক্ষিপ্ত হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞান--উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। পৃঃ ৩৫, মূল্য ।।০ আনা। এই কয় পৃষ্ঠায় যত দূর সম্ভব হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানের মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে। রচনাভঙ্গী ভাল। মূল্য বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এত লম্বা "শুদ্ধিপত্র' প্রেসের প্রতিষ্ঠার হানিকারক।

বুদ্ধবাণী (বুদ্ধদেবের উপদেশ সংগ্রহ)—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। সিদ্ধেশ্বর প্রেস, কলিকাতা, পৃঃ ৩৫ মূল্য ।০ আনা। অনুক্রমণিকায় বুদ্ধদেবের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। পরিশিষ্টে প্রধান চারিটি বৌদ্ধতীর্থের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সার ও মূল ভিত্তি হইতেছে বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃত বাণী। গ্রন্থকার সেই উপদেশ-বাণীর কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। ভাষা ও ভঙ্গী বেশ সরল ও সহজ। "গৃহধর্ম্ম" নামক পরম উপাদেয় অধ্যায়টি মনীষী সত্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

স্ত্রী—শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও কালীঘাট-সঙ্গীত-সমাজ সাহিত্য-বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য একটাকা চারি আনা। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

পাঁচটি ছোট গল্পের সমষ্টি লইয়া এই পুস্তকখানি গঠিত হইয়াছে। যথা—(১) স্ত্রী (২) জ্যোতিষের গণনা (৩) লাটসাহেবের মা (৪) নিষ্কর্ম্মা (৫) আঁধার ও আলো। প্রথম গল্পের নাম অনুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। গল্পগুলি 'বঙ্গবাণী' 'মাসিক বসুমতী' প্রভৃতি কোন না কোন প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলি সুরচিত ও রচনা ভঙ্গীতে নূতনত্ব সম্পন্ন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থারম্ভে কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয় একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তিনি সত্যসত্যই লিখিয়াছেন,—"লেখকের রচনায় অযথা বাগ-বিলাস নাই—অসংযত নাটকীয় উচ্ছ্বাস নাই—গৌণ ব্যাপারে যথাসম্ভব মৌন অবলম্বন করিয়া মূল সূত্রকেই মাল্যে পরিণত করিয়াছেন।"

পাততাড়ি—ছেলে মেয়েদের সচিত্র মাসিক—প্রতি সংখ্যা ১৬।১৭ পৃষ্ঠা,—সম্পাদক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়, —বেহালা (২৮ পরগণা) হইতে প্রকাশিত,—বার্ষিক মূল্য এক টাকা, নগদ মূল্য ছ' পয়সা। বৈশাখে বর্ষারম্ভ।

আমরা সমালোচনার জন্য এই মাসিকখানি পাইয়াছি। সম্পাদক মহাশয় কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"ছেলেদের মনে একটা নূতন ভাব জাগিয়ে তোলাই এর মন্ত্র। পড়ার বাইরেও যে আরও কিছু জিনিষ আছে, যা'র বিশেষ দরকার, আর যাতে আমোদ ও শিক্ষা দুই-ই হয়, সেটা জাগিয়ে দেওয়াই "পাততাড়ি"র কাজ।" সুতরাং উদ্দেশ্য যে সাধু সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকাশিত প্রবন্ধের অনেকগুলিই গুরুপাক মনে হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সহজভাবে লিখিত হইলেও তাহার মধ্যে লেখকের অনবধানতায় যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দ ও রাসায়নিক সংক্ষেপ-প্রকাশ-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, তাহা ছেলে-মেয়েদের উপযোগী মনে হয় না। যেমন—"এন্‌জাইমরা যে কেবল জিনিষ টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভাঙতেই জানে যেমন দুধকে দই করে ফেলে, চিনিকে মদ ও এক রকম বাষ্পে (CO_2) পরিণত করে তা নয়......" "চিনি 'ভাঙ্গিলে' মদ হয়"—ইহা কি ছেলে মেয়েদের ধারণার অন্তর্ভূত? অন্ততঃ যদি বাঙ্গালা মাসিকপত্র চালানই সঙ্গত মনে হয়, তবে তাহার ভিতর "ডালভাঙ্গা" ইংরাজি শব্দ কেন? "অদল বদল" একটি গল্প—তাহার পাত্রপাত্রী বাঙ্গালী—তথাপি গাড়িটা 'ষ্টেজে" পৌঁছায় কেন? অবশ্য, এমন অনেক ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অন্তর্ভূত হইয়াছে যে সেগুলির ব্যবহার দোষের নহে—কিন্তু "ষ্টেজ" কি সেই শ্রেণীভুক্ত? সম্পাদক মহাশয় যদি এই দোষগুলির পরিহার সঙ্গত মনে করেন,

তবে তিনি এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলেই প্রতিকার হইতে পারে। মাসিক-খানির অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকেও দৃষ্টিদান আবশ্যক,— নতুবা এই প্রবল প্রতিযোগিতার দিনে ইহার দীর্ঘজীবন সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে।

পূজাপ্রদীপ—শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত—শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ও প্রকাশিত,—৩৩৮+৯৬ পৃষ্ঠা,—মূল্য দুই টাকা ও বিলাতি বাঁধাই নয়সিকা মাত্র।

নাম শুনিয়া ইহা যেন কেহ "নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি"-শ্রেণীভুক্ত পুস্তক বলিয়া মনে না করেন। ইহা সাধন-ভজন বিষয়ক একখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক। পূজাংশের মন্ত্রগুলি বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে এবং তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা অতি সহজ ও সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে—এবং সাধন-বিজ্ঞান মূলক বিচিত্র ও বিশুদ্ধ চিত্রাবলীর সমাবেশে পুস্তকখানির উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধন-পথের পথিকগণ যে এই পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিবেন ইহা সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

গোরা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণ—৬৪৯ পৃঃ—উৎকৃষ্ট বাঁধাই,—মূল্য তিন টাকা মাত্র।

বলাকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণ,—উৎকৃষ্ট বাঁধাই,—রয়াল ⅛ সাইজ,—মূল্য এক টাকা বার আনা।

শিশু ভোলানাথ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত,—৮৬ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাঁধাই—মূল্য এক টাকা মাত্র।

মুকুট,—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ছেলেদের অভিনয়োপযোগী নাটক,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত,—৬০ পৃষ্ঠা,—মূল্য ছয় আনা।

সঙ্কলন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত গদ্য গ্রন্থাবলী হইতে সংকলিত ৩৬টী প্রবন্ধ,—বি-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট,—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত,—১৮৫ পৃঃ,—মূল্য—১৸৵০ মাত্র।

ঋতু মঙ্গল—(২য় সংস্করণ) শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত। কবিতার বই, ২য় সংস্করণ। বড়ই আশার কথা। বইখানি ১ম সংস্করণের আয়তনের দেড়গুণ বাড়িয়াছে, কতকগুলি নূতন কবিতা সংযোজিত হইয়াছে, ২।৪টি পরিবর্জ্জিত হইয়াছে,—সকলগুলিই পরিমার্জ্জিত হইয়াছে।

পুস্তকের সকল কবিতাই যে সুরচিত একথা বলিতে পারি না—কতকগুলিতে কেবল ছন্দোঝঙ্কারের পারিপাট্য আছে, কয়েকটি কেবল পাদ-পূরণ। অধিকাংশ কবিতা কিন্তু সরস-সুন্দর। আমাদের মতে সামান্য সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও এই পুস্তকখানি কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার রচনা-ভঙ্গিতে যথেষ্ট মৌলিকতা আছে। অন্ততঃ এযুগে কবি এই গ্রন্থেই প্রাচীন রচনা-ভঙ্গির ধারাটি বজায় রাখিয়াছেন। 'ঋতু মঙ্গলে' লক্ষ্য করিতে হইবে, ছন্দের বৈচিত্র্য, ভাষার ঐশ্বর্য্য, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের কলা-চাতুর্য্য, পদ-লালিত্য, রূপ-তান্ত্রিকতা ও রূপ-দক্ষতা, কল্পনা-কুশলতা, বিশ্ব-প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য, চিত্রঙ্কণী প্রতিভা, বর্ণনাচ্ছটা, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির আত্মীয়তা ও রসবৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য, প্রচ্ছন্ন মনস্তত্ত্বের আবিষ্করণ ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ, অনুবাদনে স্বচ্ছন্দতা, সংস্কৃত কবিগণের রচনাভঙ্গি, রূপ-দৃষ্টি ও রস-সৃষ্টির সফল অনুকরণ ও অনুসরণ এবং ভাব-বিবর্ত্তের সহিত বিষয়-বৈচিত্র্যের ধারা-বাহিকতা সংস্থাপন ও সংরক্ষণ।

কবি যেখানে পাঠক-চিত্তকে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যালোকের পরিবেষ্টনীর মধ্যে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন সেখানে তিনি সংস্কৃত কাব্যের ভাষা, অলঙ্কার, কবি প্রসিদ্ধি, কাব্যোক্তি, reference ও allusion ব্যবহার করিয়াছেন।

অধীরচিত্ত পাঠকের ইহাতে বিরক্তি লাগিতে পারে কিন্তু প্রকৃত রসজ্ঞ ও মর্ম্মজ্ঞ সুধীর পাঠক প্রচুর ও নির্ম্মল আনন্দ পাইবেন ইহাই আমাদের বিশ্বাস। এই শ্রেণীর পুস্তকের পাঠক সংখ্যা চিরদিনই "fit though few"ই হইয়া থাকে।

বইখানি পড়িতে পড়িতে আমাদের কল্পনা বিক্রমাদিত্য, শিলাদিত্য, ভোজরাজ ও উদয়নের ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করে। পুস্তকখানির বৈচিত্র্য অপূর্ব্ব, বৈশিষ্ট্য জলন্ত—আজকালকার পুস্তকের স্তূপে ইহা চাপা পড়িবার বা হারাইয়া যাইবার নয়! "ঋতুলক্ষ্মী" "নিদাঘ" "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে," "প্রাচীন কবিদের বর্ষা" "শ্রাবণপ্রশস্তি" "প্রাচীন কবিদের শরৎ" "প্রাচীন কবিদের বসন্ত" প্রভৃতি অপরূপ কবিতাগুলির প্রতি আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়াছেন। গ্রন্থশেষে সংযোজিত কুঞ্চিকা ও টীকা সম্পাদক মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের ও শ্রমশীলতার পরিচায়ক। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই টীকার আবশ্যকতা আছে। ১৩০ পৃষ্ঠায় "ঠাস-বুনানী" পুস্তকের মূল্য ৸৹ বারো আনা সুলভ বলিতে হইবে।

ভাদ্রে

দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—কি করিলে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে লোকে মেলেরিয়া কালাজ্বর প্রভৃতিতে ভুগিয়া না মরে বা অন্য-অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় অথবা কুচিকিৎসায় কস্ট না পায়, কি উপায়ে পল্লীগুলিকে স্বাস্থ্যকর করা যায় ও লোকসাধারণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া মানুষ করা যায় ও কর্ম্মক্ষম করা যায়, ইহাই হইল সকল সমস্যার উপর বড় সমস্যা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই সকল দিকে দেশের উন্নতিবিধানের জন্য সরকারের কাছে যে প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন সরকার এখন তাহারই অনুবর্ত্তনে নূতন বিধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। একাজের দিকে অগ্রসর হইতে গেলে ন্যূনপক্ষে বৎসরে বারলক্ষ টাকা লাগিবে। এটাকা ঐ গুরুতর কাজের জন্য অতি অল্প; প্রকৃতপক্ষে যে বহুটাকা লাগিবে একথা চিত্তরঞ্জনও বলিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টও বলিতেছেন। রাজকোষ হইতে যত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার আলোচনার সময় শুনিতে পাইব; এখন কথা এই, এই কাজের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইলে কাজ পরিচালনার ভার কাহাদের উপর থাকিবে। এখন দেশে যে ২৩০০ ইউনিয়ন বোর্ড আছে ও যাহাতে একুশ হাজার গ্রামবাসী সভ্য আছে সেই ইউনিয়ন বোর্ডের হাতে দক্ষ পরিদর্শনের অধীনে এ সকল কাজের ভার ন্যস্ত হইতে পারে কিনা বিচার করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা বাড়াইয়া সভ্যদের সংখ্যা ও কর্ত্তৃত্ব বাড়াইয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত আছেন; আর এই ইউনিয়ন বোর্ডের লোকেরা এসকল কাজ পরিচালনা করিলে কর্ম্মক্ষম হইবেন, দায়িত্ববোধে উন্নত হইবেন ও গ্রামের যথার্থ প্রয়োজন বুঝিয়া ব্যয়ের সার্থকতা করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে এই আপত্তি হইতে পারে যে অনেক স্থানে ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মে নাই কাজেই সরকারের পরিচালনায় কাজ না চলিলে অনেক অপব্যবহার হইবে। সেকথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব, অথচ এ সকল কাজে দেশের লোককে

শিক্ষিত ও কর্ম্মদক্ষ করিয়া না তুলিতে পারিলে দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে এইজন্য সাবধানতার হিসাবে আমরা ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের দক্ষ পরিদর্শনের কথা বলিয়াছি। শিক্ষিত হিতৈষীদের কর্ত্তব্য যাহাতে গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যদের কাছে জ্ঞানের আলোক প্রচারিত হয় ও লোক সাধারণের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মে তাহার জন্য চেষ্টা করা। ব্যবস্থাপক সভায় যখন কথাটি উঠিবে তখন কর্ম্ম পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ডের দায়িত্বের বিষয় যাহাতে এক সঙ্গে বিচারিত হয় তাহার জন্য ঐ সভার সদস্যদিগকে অনুরোধ করিতেছি।

* * * *

তুর্কীর উন্নতি—দেশের মধ্যে যখন যথার্থ স্বাধীনতা আসে ও দেশের লোকেরা দায়িত্ব-বোধে নিজের দেশকে হীনতা হইতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করে তখন প্রাণের টানে ও সুবুদ্ধিতে অনেক দিকের গোঁড়ামি ছাড়িতে বাধ্য হয়। দেশের লোকে যদি অবাধে নিজেদের বিচারিত বুদ্ধি অনুসারে স্বাধীন ভাবে আপনাদের ধর্ম্মমত প্রভৃতি অবলম্বন করিতে ও ব্যক্ত করিতে না পারে, তবে মানুষের উন্নতি হয় না—দেশের উন্নতি হয় না। মহাত্মা কেমাল পাশা সমগ্র দেশের মধ্যে এই বিধি প্রচার করিয়াছেন যে লোকেরা আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছামত অবাধে যে কোন ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতে পারে ও সেই অনুসারে প্রকাশ্যভাবে সকল অনুষ্ঠান করিতে পারিবে। জোর করিয়া ধর্ম্মে একতা রাখা বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যে অতি বড় গর্হিত আর উহার ফলে যে মানসিক জড়তা জন্মে ও উন্নতির পথ নষ্ট হয় ইহা কর্ম্মদক্ষ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ তুর্কীরা বুঝিয়াছেন।

* * * *

ইংলণ্ডে আদর্শ সাহিত্যের ভাষার বিচার—যেখানে একটি দেশের নানা প্রদেশে ও উপপ্রদেশে একটি ভাষা বিভিন্ন প্রাদেশিকতায় চলে সেখানে প্রদেশকে বা উপপ্রদেশকে প্রাধান্য না দিয়া যে সকলের পক্ষে সহজে শিক্ষণীয় আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা রক্ষা করিতে হয় এ কথা আমরা বুঝি না অথবা কোন প্রদেশ বিশেষের কল্পিত গৌরবের ঝোঁকে ভুলিয়া যাই, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকেরা ও যে সকল দেশে ইংরেজী ভাষা চলে সেই সকল দেশের লোকেরা আপনাদের সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য আদর্শ সাহিত্যের ভাষা রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। যাহাতে সকলের সম্মতিতে বানানের পদ্ধতি সাধারণের সাহিত্যিক উচ্চারণের পদ্ধতি ও শব্দ ব্যবহারের রীতি এক হয় তাহার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, কানাডা, আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রভৃতি স্থান হইতে ভাষা-বিজ্ঞানবিদেরা শীঘ্রই ইংলণ্ডে সমবেত হইবেন ও তাঁহাদের সমিতিতে যাহা ধার্য্য হইবে তাহাই সকলে অবলম্বন করিবেন। এ কাজ না করিলে বিভিন্ন স্থানের ইংরেজী বুঝিবার পক্ষে যে অসুবিধা ঘটে তাহার গুরুত্ব সকলে বুঝিয়াছেন। ঐ সকল দেশের লোকেরা আমাদের মত স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার বুদ্ধিতে যে যাহার যেমন খুসি এক-একটা প্রাদেশিক ভাষা চালাইয়া অন্যের ঘাড়ে তাহা চাপাইবার কুবুদ্ধি পোষণ করেন না। কি ভাবে সাহিত্যের ভাষা এক রাখা যায় ও উহাতে কিরূপভাবে সকলের সুবিধা হয় তাহা একবার বিস্তৃত ভাবে চার-পাঁচটি প্রবন্ধে এই বঙ্গবাণীতে লিখিয়াছিলাম। দেশের উন্নতির জন্য ভাষার এই বিচার অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি ও এদিকে আর একবার ইউরোপের নামের দোহাই দিয়া আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি জানি, যদি কোন বড়লোক

ইহাতে হাঁ বলেন অমনি অনেকের মত বদলাইয়া সুপথে আসিবে, নহিলে যত উপকারী হইলেও আমাদের কথা অনেকের কানে উঠিবে না।

* * * *

আগামী ষ্টেটুটরি কমিশন—শ্রীযুক্ত পটেল মহোদয় বহু সম্মানে ইংলণ্ডে অনেকদিন অবস্থিতির পর দেশে ফিরিয়াছেন। ষ্টেটুটরি কমিশনটি কি ভাবে বসিবার সম্ভাবনা ও উহাতে এদেশের কোন শ্রেণীর লোক কত ভাগে স্থান পাইবেন তিনি তাহার আভাষ দিয়াছেন। কমিশনটিতে যে শ্রেণীর লোক যে ভাবে সভ্য হইবেন তাহার আর অধিক বিচার হইবে না, এইরূপই আমাদের ধারণা হইল। সে যাহাই হউক যে বিষয়টি কমিশনের হাতে বিশেষভাবে বিচারিত হইবে সেই দিকেই এখন আমাদের দৃষ্টি পড়া উচিত। কংগ্রেসের অনেক সুধী সভ্য এ বিষয়ে যে ভাবে বিচার করিতেছেন তাহা আগামী ডিসেম্বরের পূর্ব্বে আমাদের জানা সম্ভব হইবে মনে হয় না; অথচ কমিশনের সভ্যেরা দলেবলে শীঘ্রই তাঁহাদের কাজ আরম্ভ করিবেন। আমরা অবশ্য আমাদের ষোলআনা অধিকারের দাবি কিছুতেই ছাড়িব না কিন্তু আমাদের হাতে সমর বিষয়ের বহির্বাণিজ্য বিষয়ের ও পুলিস প্রভৃতি দিয়া শান্তি রক্ষা করা বিষয়ের অধিকারগুলি যে কিছুতেই ন্যস্ত হইতে পারে না, এ সকল কথা অতি স্পষ্টভাবে অনেক মাতব্বর ইংরেজেরা বলিতেছেন। এদেশে তিল মাত্রে ইংরেজ বণিক্ অথবা প্লাণ্টার প্রভৃতি লোকেরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হ'ন্ ও যাহাতে কোন বিদেশের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল হইতে না হয় সে ব্যবস্থা ইংরেজেরা করিবেনই করিবেন, —আমাদের সকল দাবির কথা উপেক্ষা করিয়া করিবেন। যাহা ঘটিবে তাহার দিকে না তাকাইলে আমাদের অভিমানের চোখ আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে। অবস্থা যত শোচনীয় হইলেও এই মন্ত্র মনে রাখিতেই হয় যে, প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্। যাহা বড় তাহার দাবি ছাড়িব না বটে, কিন্তু ছোটকে উপেক্ষা করিব না—অর্থাৎ ছোটকে কি করিয়া কতখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায় তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে। আমরা আমাদের কৃতিত্ব ও উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহাই বলি ও যে তর্কই উপস্থিত করি না কেন, কমিশনে এ বিষয়ের বিচার হইবেই যে আমাদের লোক সাধারণেরা কতদূর পরিমাণে বুঝিয়া-শুঝিয়া ভোট দিতে পারে ও কতদূর পরিমাণে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ভুলিয়া দেশের স্বার্থ ভাবিতে পারে ও দায়িত্ববোধে জাগিতে পারে। পূর্ব্বে এইমাত্র গ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয় যদি এখন হইতে সুবুদ্ধি হিতৈষীরা গ্রামে গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রসার বাড়াইতে চেষ্টা করেন ও সেখানকার অনেক হাজার সভ্যদের মধ্যে তাহাদের দায়িত্ববোধ জাগাইতে চেষ্টা করেন তবে ইউনিয়নে সংস্পৃষ্ট হিন্দু ও মুসলমানের অলক্ষ্যে আপনাদের প্রাণের টানে ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া বৃথা হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করিবে ও তাহাদের কাজের প্রমাণে কমিশনকে অনেকটা বুঝাইতে পারিবে যে আমরা বহু কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে করিবার উপযোগী। আমাদের অনুরোধ যে অবিলম্বে এমন একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হউক যাহার সভ্যেরা রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যে দলেরই লোক হউন তাহা বিচার না করিয়া এক সঙ্গে জুটিয়া কাজ করিবেন; কারণ আমরা যে কাজটির উল্লেখ করিলাম তাহাতে কংগ্রেসের দলের বা অন্য দলের লোকের মধ্যে কোন ভেদ-বুদ্ধি থাকিতে পারে না।

J. SINHA.

সূচীপত্র

বিষয়সূচী		পৃষ্ঠা
১।	সমাপ্তি (গল্প)	১১৯
	শ্রীশৈলেজানন্দ মুখোপাধ্যায়	
২।	নীহারিকা (কবিতা)	১৪৯
	শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী	
৩।	বিচার (গল্প)	১৫০
	শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	
৪।	ত্রিস্রোতা (কবিতা)	১৫৮
	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	
৫।	তেল-সিঁদুর (গল্প)	১৫৯
	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	

বিষয়সূচী		পৃষ্ঠা
৬।	স্বয়ম্বরা (কবিতা)	১৭৮
	শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন	
৭।	মিথ্যে খবর (গল্প)	১৭৯
	শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত	
৮।	পূজার ছুটি (কবিতা)	১৮৬
	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	
৯।	অম্ল-শূল (গল্প)	১৮৮
	শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	
১০।	মুক্তি-বরণ (কবিতা)	১৯[illegible]
	শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
১১।	"আগমনী"-গীত (স্বরলিপি)	১৯[illegible]
	শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা	

চিত্রসূচী

"বঙ্গবাণী"র নিবেদন

গ্রাহক সংক্রান্ত—

১। ফাল্গুন হইতে 'বঙ্গবাণী'র বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়।

২। বঙ্গবাণীর বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতিমাসে		...	১৮৲
" ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	...	১০৲
" ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	"	...	৬৲
রঙ্গিন ছবির আগের পৃষ্ঠা	"	...	২২৲
শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২২৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১২৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	"	...	৩০৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৬৲
কভারের ৩য় পৃষ্ঠা	"	...	২৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৩৲
কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা	"	...	৩৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৮৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৩৲
সূচীপত্রের সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২০৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১১৲
সূচীপত্রের নীচে অৰ্দ্ধপৃষ্ঠা	"	...	১৩৲

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Managing Proprietor.

৭৭নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড ভবানীপুর, কলিকাতা।

শরীর সুস্থ এবং সবল করুন

সুখ এবং সাফল্য দুইই খাদ্যের উপর নির্ভর করে। সবল, কর্ম্মঠ মাংস-পেশী সুস্থ এবং সতেজ স্নায়ুমণ্ডলী, প্রচুর বিশুদ্ধ শোণিত এবং পরিপুষ্ট ইন্দ্রিয়-শক্তি লাভ করতে হ'লে খাদ্যও তদনুযায়ী হওয়া দরকার। আপনার খাদ্যের উন্নতি সাধন ক'রে, আপনি আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এবং জীবনের সুখ বাড়াতে পারেন। কে তা' না চায়? আপনিও নিশ্চয়ই তা' চান, কিন্তু কি হ'লে মানুষের জীবনের ঐ সম্পদ লাভ করা যায়-- জানেন কি? আপনিও কি ভাবে আপনার শরীরে প্রচুর শক্তি এবং স্ফূর্ত্তি ও কর্ম্মোদ্যম লাভ করতে পারেন, নীচের লেখাটুক পড়লেই জানতে পারবেন।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধ'রে গবেষণা করার পর এতদিনে এক প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন, একে "সঞ্জীবনী সুধা" বলা যেতে পারে। রক্ত পরিষ্কার ক'রে মাংসপেশী, স্নায়ুমণ্ডলী এবং ইন্দ্রিয়-শক্তিকে সতেজ ও পরিপুষ্ট করতে হ'লে যে যে জিনিষের দরকার সে সবই এই খাদ্যে আছে। দেহের গঠন এবং রক্ষণে যে যে জিনিষের আবশ্যক তাহার একত্র সমাবেশে এই খাদ্য প্রস্তুত হ'য়েছে।

এই নূতন বিজ্ঞান-সম্মত খাদ্য এতটা স্বাস্থ্যপ্রদ এবং এমন পুষ্টিকর যে একে "স্যানাটোজেন" অর্থাৎ স্বাস্থ্যদাতা বলা হ'য়ে থাকে। এ খাদ্য এমনই সুপাচ্য যে যাঁদের পরিপাক করবার শক্তি একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে তাঁরা পর্য্যন্তও ইহা অতি সহজে হজম ক'রে ষোলআনা উপকার লাভ করতে পারেন। এজন্য ম্যালেরিয়া এবং রক্তাল্পতা অথবা আমাশয়, পাতলা দাস্ত, এই সব পেটের ব্যায়রামে ভুগে ভুগে যে সব রোগী একেবারে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, চিকিৎসকগণ তা'দের জন্য একমাত্র এই স্যানাটোজেনই ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। যাঁরা স্যানা-

-টোজেন ব্যবহার কর্‌ছেন বা করেছেন, তাঁরা সকলেই ভূপাল রাজ সরকারের মামুদ আলী খাঁ সাহেবের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত হ'বেন। স্যানাটোজেনের সত্ত্বাধিকারীদের কাছে তিনি কি লিখেছেন, শুনুন :—

"স্যানাটোজেন ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ কর্‌বার পর থেকে আমি রোগ যন্ত্রণা থেকে একেবারে অব্যাহতি পেয়েছি। আমার এখন বেশ সুনিদ্রা হয়; এখন সব সময়ে, সব কাজেই একটা নূতন উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মেছে। পূর্ব্বে যা' খেতাম এখন প্রায় তার দ্বিগুণ খেতে পারি। সহস্রাধিক ঔষধের সুফল এক স্যানাটোজেনেই পাচ্ছি"।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রশংসিত

"স্যানাটোজেন" জগতের নর-নারীর পক্ষে দেবতার শুভাশীর্ব্বাদ স্বরূপ। কারণ, এই অতি পুষ্টিকর খাদ্য শুধু যে শরীরে একটা নূতন শক্তি সঞ্চার করে এবং রক্তকে বিশুদ্ধ করে এমন নয়, ইহা স্নায়ু-মণ্ডলী ও মস্তিষ্ককে পরিপুষ্ট ক'রে তোলে। শরীরকে গঠন করবার ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রকে নিরাময় করবার শক্তি ইহার অতুলনীয়। স্যানাটোজেন ব্যবহারে ইন্দ্রিয়গুলি ঠিক সমান এবং সবলভাবে কাজ কর্‌বার শক্তিলাভ করে। এই সব কারণে চিকিৎসা জগতে স্যানাটোজেন উচ্চ প্রশংসার স্থান অধিকার করেছে। ২৪ হাজারের অধিক চিকিৎসক তাঁদের রোগীদের স্যানাটোজেন সেবনের ব্যবস্থা দিয়ে কিরূপ অপ্রত্যাশিত সুফল পেয়েছেন, তাঁরা স্যানাটোজেনের সত্ত্বাধিকারীদের কাছে সে সব কথা লিখেছেন। কোন্ কোন্ ব্যায়রামে এবং কি ধরণের দুর্ব্বলতায় স্যানাটোজেন আপনার অটুট স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আন্‌তে পারে, এখন একবার তা' শুনুন। কয়েকদিনমাত্র স্যানাটোজেন ব্যবহার করলেই কেমন আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, শুন্‌লে আপনি অবাক হ'য়ে যাবেন।

যদি আপনি ক্লান্তি অবসাদ এবং স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পাইতে থাকেন যদি আপনি আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে চান—

তাহা হইলে আজই স্যানাটোজেন

ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য

ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য রোগে ভোগার চেয়ে দুঃখ কষ্ট বোধ হয় মানুষের আর নাই। রোগের কারণ যাহাই হোক্না কেন, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং স্নায়ুমণ্ডলীকে সতেজ এবং সবল করাই এই ভয়ঙ্কর রোগের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায়।

এ বিষয়ে স্যানাটোজেনের ক্ষমতা অতুলনীয়। স্যানাটোজেন আপনার শরীরে টাট্কা নূতন রক্তের সঞ্চার করবে এবং পরিপুষ্ট ইন্দ্রিয়-শক্তি লাভ করতে হ'লে স্নায়ু-তন্তুতে যে শক্তি সঞ্চার করা আবশ্যক, তাহা পর্য্যাপ্ত পরিমানে সরবরাহ ক'রে যৌবন-শক্তিকে ফিরিয়ে আনবে। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মিশ্নার ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য পীড়িত অনেক রোগীকে স্যানাটোজেন দিয়ে চিকিৎসা করেছেন। তিনি লিখেছেন :—"সব জায়গাতেই স্যানাটোজেন ব্যবহার ক'রে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া গেছে এবং কয়েকমাস পরেই রোগী একেবারে সেরে উঠেছে। যা কখনও আশা করা যায়নি, এমন অপ্রত্যাশিত সুফল এতে পেয়েছে।" ডাঃ এম্, মার্গলার—একজন প্রৌঢ় লোক, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, অনিদ্রা এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে ভুগ্ছিল তা'কে স্যানাটোজেন ব্যবহার করতে দিয়ে কি ফল পেয়েছেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখ্ছেন—"চা'র চামচের দু' চামচ হিসেবে দিনে ৩ বার, ছয় সপ্তাহ আমি তা'কে এই ব্যবস্থানুযায়ী স্যানাটোজেন দিয়ে চিকিৎসা করেছিলাম। ছয় সপ্তাহ পরে রোগী স্বাভাবিক ওজন ফিরে পেল, তা'র বেশ সুনিদ্রা হতে লাগ্ল, পরিপাক শক্তি বেড়ে গেল, সে আবার ইন্দ্রিয়-শক্তি লাভ করলে। বেশী দিন নয়, কয়েক সপ্তাহ স্যানাটোজেন ব্যবহার করলেই শরীরের কি পরিবর্ত্তন হয়, কেমন নূতন বল এবং স্ফূর্ত্তি বোধ হয়, পরীক্ষা ক'রে দেখুন। অধিক বিলম্ব করবেন না, কারণ ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য বড়ই ভয়ানক, তা' থেকে না হ'তে পারে এমন কোন ব্যায়রামই নাই। ঐ ব্যাধি শেষটা প্রকৃত উন্মাদ রোগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, কাজেই সময় থাকতে সাবধান হওয়াই ভাল।

অসুস্থাবস্থায় এবং রোগ হইতে উঠিবার পর

রোগাবস্থায় এবং রোগ থেকে উঠ্বার পরে স্যানাটোজেন ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য সুফল পাওয়া যায়। সে সব কথা এত অল্প জায়গায় বলা সম্ভব নয়। বিশেষভাবে, ব্যায়রাম থেকে উঠ্বার পর স্যানাটোজেন ব্যবহার করলে সদ্য সদ্য সুফল প্রত্যক্ষ করা যায়। স্যানাটোজেন ব্যবহারে আপনার হজম
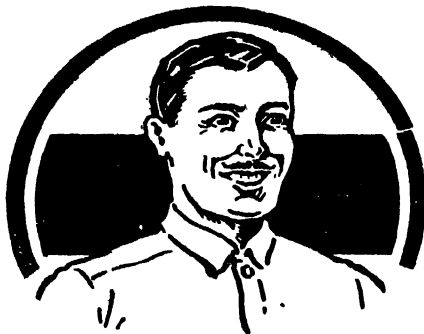
কয়েক হপ্তা স্যানাটোজেন ব্যবহার করার পরই আপনি শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিবেন এবং জীবনের আনন্দ পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিবেন।

শক্তি বৃদ্ধি পাবে, আপনি বেশী খেতে পারবেন, শরীরে নূতন বল ফিরে আসবে। এই সব ক্ষেত্রে স্যানাটোজেন ব্যবহারে কেমন ফল পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের চিকিৎসক কি লিখেছেন, দেখুন ঃ—"দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং, এবং রাজপরিবারের অনেকে স্যানাটোজেন ব্যবহার ক'রে বিশেষ উপকার পেয়েছেন। স্যানাটোজেন অতি মূল্যবান্ স্বাস্থ্য-প্রদ খাদ্য"।

ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগে

রক্তের জোর না থাকলেই এই সব ব্যায়রাম হয়। অনেক চিকিৎসক স্যানাটোজেন ব্যবহার করবার পূর্ব্বে তাঁদের রোগীদের রক্তের অবস্থা কেমন ছিল এবং পরেই বা কেমন হয়েছে, পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। সব জায়গাতেই দেখা গেছে, স্যানাটোজেন ব্যবহারে রক্ত যেমন পরিমাণে বেড়েছে তেমনই তাহা পরিষ্কার ও সতেজ হয়েছে। আপনি স্যানাটোজেন ব্যবহার করুন, আপনার পক্ষেও স্যানাটোজেনের গুণের অন্যথা হ'বে না: আপনিও সতেজ বিশুদ্ধ শোণিত লাভ করবেন এবং অটুট স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন।
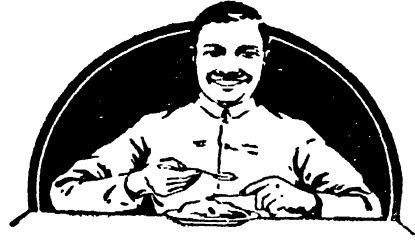
স্যানাটোজেন আপনার ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবে।

স্যানাটোজেন ক্লান্তিনাশক

আপনি যদি অবসাদ, দুর্ব্বলতা কিংবা অসুস্থতা বোধ করেন, যদি শক্তি এবং কর্ম্মোদ্যম বৃদ্ধি করতে চা'ন, যদি আপনি যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য লাভ করতে চা'ন তবে স্যানাটোজেন ব্যবহার করুন। মানুষের শরীর গঠন এবং পোষণে যে খাদ্যের দরকার, স্যানাটোজেনে ঠিক সেই সব খাদ্যই আছে, পূর্ণ জীবনীশক্তি যেন এতে দেওয়া রয়েছে। বাগাচড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, "বঙ্গরত্নে" কি লিখেছেন, দেখুন ঃ—"পেটেন্ট ঔষধের প্রতি চিরদিনই অবিশ্বাস ছিল। কিন্তু আজ সে অবিশ্বাস দূর করিয়াছে—"স্যানাটোজেন"। গত পূজার পর হইতে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া সর্ব্বপ্রকারেই দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতেছিলাম। এখন "স্যানাটোজেন" ব্যবহার করিয়া প্রকৃতই স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতেছি। আমার বিশ্বাস ইহা প্রকৃতই জীবনীশক্তিবর্দ্ধক"

আপনি স্যানাটোজেন ব্যবহার ক'রে এই উপকার ষোল আনাই পেতে পারেন। আজই ব্যবহার করুন। বাজারের সব ঔষধের দোকানেই স্যানাটোজেন কিনতে পাবেন: তৈরীর সময় কিংবা প্যাক্ করবার সময়, কোন সময়েই ইহা হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় না, ইহাতে এমন কোনও পদার্থ নাই যাহার দ্বারা রোগী স্বীয় জাতি বা ধর্ম্ম বিশ্বাস অটুট রাখিয়া ইহা অনায়াসে ব্যবহার করিতে না পারে।

ছেলেমেয়েদের উপহার

—————:০:—————

রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় সম্পাদিত

১৩৩৪

ছবি গল্প ও কবিতায় ভরপূর !

মূল্য ১।০ টাকা

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

কথা সরিৎ সাগরের গল্প

মূল্য ১৲ টাকা

শিশুসাথী সিরিজের গ্রন্থাবলী

প্রত্যেকখানা ।।০ মাত্র

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

পুরস্কার

অভিনব উপন্যাস !

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মায়ের বুকে

প্রাণমাতান উপন্যাস !

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

রাক্ষসের দেশ

রোমাঞ্চকর উপন্যাস !

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মণ্টু

কৌতুহল-উদ্দীপক উপন্যাস !

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ, প্রণীত

মণিমুক্তা

রং—চং—ঢং—তামাসা !

রবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

জলপরী

মাতোয়ারা স্বপন্-রেশ !

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত প্রণীত

দেশের ছেলে

গৌরবময় উপন্যাস !

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

পৌরাণিক গল্প

১ম ভাগ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত

পৌরাণিক গল্প

২য় ভাগ

—ছাপা হইতেছে—

পাটুয়াটুলী ঢাকা | **আশুতোষ লাইব্রেরী** ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। | আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম

জঙ্গলা। সুর

"আবার তোরা মানুষ হ'

৬ষ্ঠ বর্ষ } আশ্বিন { দ্বিতীয়ার্দ্ধ
১৩৩৩-'৩৪ } { ২য় সংখ্যা

সমাপ্তি

তিনকড়ি তাহার যাবতীয় কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

অন্ততঃ নিজে সে তাহাই বলে।

বলে, "আমি কে ?—আমি করি, তিনি করান।"

বলিয়া সেই তিনির উদ্দেশে তিনকড়ি তাহার বড় বড় চোখের তারা দুইটা উলটাইয়া উপরের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকে।

ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক ছাড়া জল খায় না।

মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়াছে,—ঘি দুধ ত' ঘরে ঢুকিবার উপায় নাই। বলে, "মাছ মাংসে ঘেন্না যে কিছু আছে আমার তা নেই। তবে কিনা এই লোভ জিনিষটে ভাল নয়! ওরই জন্যে ঝগড়া-ঝাঁটি, ঘর ভাঙাভাঙি—যা-কিছু ... "

কিন্তু বৌ তাহার লুকাইয়া লুকাইয়া মাছ কেনে। ধরা পড়িলে বলে, "সধবা মানুষ, এক আধদিন না খেলে অমঙ্গল হয়।"

চামারের একশেষ। সোনার গহনা বন্ধক রাখিয়া চড়া সুদে টাকা ধার দেয়; সুদবন্ধকী জমিজমার আয় বেশ মোটারকমের; কিন্তু তবুও তাহার হাঁটুর নীচে কাপড় কোনোদিন নামে না। শীতের দিনে কোঁচার খুঁটেই শীত কাটে।

বলে, "বাবুয়ানি করেই ডুবলো বাছাধনরা সব।"

ঘরে একপাল হাঁস পুষিয়াছে।

গাঁয়ের লোক ফাঁপাইয়া দেয়। বলে, "চাটুজ্যে-মশাইএর হাঁসের পালটি বেশ বেড়েছে যা হোক্!……বাড়বে না কেন বাপু, যত্ন কেমন!"

তিনকড়ি বলে, "কোথা পাবে? খায় যেমন, তেমন দেয় না। ডিম বিক্রি মোটে সাড়ে সাত টাকার! কিন্তু নিজে আমি কোনোদিন হাত দিয়েও ছুঁই না ও-সব।"

কথাটা সত্য। হিসাব রাখে কিন্তু স্পর্শ করে না।

পুত্র নাই, একটি মাত্র কন্যা। স্ত্রীই ওই-সব করে। দুটি বোন আছে, কিন্তু বোন দুটিকে বিশ্বাস হয় না।

ত্রিনয়না আর ত্রিগুণা—দুটি বোন।

কিন্তু ডাকিবার সময় আর জিব উল্‌টাইতে হয় না।—তেনানী আর তিগুণী বলিলেই চলে।

তেনানীর বিবাহ হইয়াছে।

সে এক ভারি মজার বিবাহ।

আষাঢ়ের প্রথমেই সে-বছর বাদল নামিয়াছিল। চারিদিকে ধানের মাঠ, মাঝখানে ছোট্ট একখানি গ্রাম।

সারা রাত ধরিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি ঝরিয়াছে। পরদিন সকালে বাদল তখনও ধরে নাই, এমন সময় সমস্ত গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, গত রাত্রি দ্বিপ্রহরের লগ্নে তিনকড়ির বোন তেনানীর হঠাৎ বিবাহ হইয়া গেছে।

ঢাক নাই, ঢোল নাই, একটা সানাই বাজিল না, অনুষ্ঠান আয়োজন কোথাও কিছুই নাই—বিবাহের মত ব্যাপার অকস্মাৎ গোপনে সম্পন্ন হইয়া গেল।

কৌতূহলী নরনারী বর দেখিবার জন্য বিনা আহ্বানেই জলে ভিজিয়া তিনকড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু বর কেহই দেখিতে পায় নাই, অতি প্রত্যূষেই কুশণ্ডিকা সারিয়া দিয়া বর তখন কি একটা বিশেষ প্রয়োজনে চম্পট দিয়াছে।

তিনকড়িকে সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল।

কিন্তু ভগবানই যাহাকে সব কাজ করান, যে শুধু হেতু হইয়া করে মাত্র, তাহার সম্বন্ধে [illegible] না।

তিনকড়ি দিব্যি সহজ গলায় বলিতে লাগিল, "কি করব দাদা, যে-রকম 'বাদল' তাতে লোকজন ত' ...তবে ভরসা এই যে মালিক তিনিই, আমি আর কে ?"

তা বটে।

তিনকড়ি বলিল, "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। কার বাবার সাধ্যি টলায় !"

কিন্তু কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িতে দেরি হইল না।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—

বালিজুড়ি গ্রামটা সেখান হইতে ক্রোশ দুই-তিন দূরে। পশুপতি মুখুজ্যের হঠাৎ একজোড়া চাষের বলদের প্রয়োজন হয় তাই সে সন্ধান লইয়া এ গ্রামে আসে বলদ কিনিতে,—বিবাহ করিবার জন্য নয়। মুসলমান পাইকারদের কাছে এক জোড়া বলদের দর দস্তুর সবই স্থির হইয়া যায়, কিন্তু পঞ্চাশটি টাকা তাহার কম পড়ে,—মুখুজ্যের বলদ কেনা আর হয় না। টাকা আনিবার জন্য বাড়ী ফিরিতেছিল, হঠাৎ বৃষ্টি নামিল।—যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি ! বাড়ী ফেরা আর হইল না, রাত্রির মত বন্ধু তিনকড়ির বাড়ী আশ্রয় লইল।—বাস্ ! সেই আশ্রয় লইতে গিয়াই এত বড় এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

এই ত গুজব।

কিন্তু আসল কথাটা বোধকরি আরও একটু ঘোরালো।

কিছুদিন আগে বিনা প্রয়োজনেই তিনকড়ি ঘন ঘন বালিজুড়ি যাওয়া আসা করিত।

যাই হোক, ব্যাপারটা ভাল হয় নাই। ঠিকা চুক্তিতে বিবাহ করিয়া বেড়ানোই পশুপতির পেশা, এবং এই পেশাদার লোকটার হাতে তেনানীর মত সুন্দরী মেয়েটিকে চিরদিনের মত সমর্পণ করিবার মত দুরবস্থা তিনকড়ির নয়।

শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গের ষাঁড়গুলাকে যেমন করিয়া তপ্ত ত্রিশূলের ছেঁকা মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তেনানাকেও তেমনি কপালে সিঁদুর দাগিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। মাছ মাংস খাইতে পায়, সধবা নাম,—এই পর্য্যন্ত।

কুমারী ঘুচিয়াছে,—যৌবনও বুঝি-বা যায় !

কিন্তু পশুপতির মত স্বামী, অগ্রিম টাকা হাতে না পাইলে আসে না ! সেই যে বিবাহ করিয়া গিয়াছে তাহার পর আর দেখা নাই।

টাকা খরচ করিয়া তিনকড়ি তাহাকে কোনোদিন আনিবে না জানা কথা। তেনানী নিজেই টাকার জোগাড় করে।

তিগুণীকে বলে, "আয় ভাই, দু'বোনে রোজগার করি।"

ভাই-ঝি বাসনাও তাহাদের সঙ্গ ছাড়ে না।

তেনানী ঢুম্ ঢুম্ করিয়া ঢেঁকির মাথায় পাহার দেয়,—তিগুণী হেঁটমুখে তখন গড়ের মুখে হাত বুলাইতে থাকে। সারাদিন ধরিয়া ধানভানা তাহাদের আর শেষ হয় না।

ধান ভানিয়া রোজগার করে। গতর খাটায়।

ইহার উপর বাড়ী কাজেকর্ম্মে দু'বোনে কোমর বাঁধিয়া ভাত রাঁধিতে যায়, মুড়ি ভাজে, কলাই ভাজে, লোকের বাড়ী-বাড়ী জল আনিয়া দেয়, দুষ্টু গাইএর দুধ দোয়,—দু'চার আনা যা পায়!

তিনকড়ির স্ত্রী—বিন্দু-বৌ, আভাষে-ইঙ্গিতে দু'কথা শুনাইতে ছাড়ে না। খিড়কির পুকুরে জল আনিতে গিয়া হ্যাক্ করিয়া খানিকটা থুতু ফেলিয়া বলে, "ভাইএর ঘরে অন্ন ধ্বংস, আর নিজের সাথক্ ষোলআনা। পরের ধান ভেনে' ভেনে' ঢেঁকিটা আমার গেল......"

তেনানী শুনিতে পায়, কিন্তু কিছু বলে না, চুপ করিয়া থাকে।

দু'আনা হইতে চার আনা হয়, চার হইতে আট, আট হইতে টাকা, টাকা হইতে নোট। টাকা আবার সুদে খাটে। সুদের টাকায় ছাগল কেনে, বাছুর কিনিয়া দামড়া করে আবার দামড়া কিনিয়া বলদ বেচে।

টাকা পয়সাগুলা যেন হাত পা বাহির করিয়া চলিতে থাকে।

কিন্তু অত বাড়াবাড়ি বিন্দু-বৌএর সহ্য হয় না।

সেদিন তেনানী, তিগুণী, বাসনা, তিনজনেই দূরের পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল।

খিড়কির পুকুর হইতে হাঁসগুলাকে তাড়াইয়া আনিয়া বিন্দু-বৌ আপনমনেই বকিতে বকিতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তিনকড়ি তখন চালায় বসিয়া একাগ্রমনে হেঁটমুখে একটা ছেঁড়া কাপড় বিশেষ দক্ষতার সহিত সেলাই করিতেছিল।

বিন্দু-বৌ তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, "না, অত ভালবাসা ভাল নয়! গয়না কাপড় দিয়ে ভালবাসতে পারিস্ ত' জানি যে, হাঁ। ভালবাসা! তা না, নাকে-দমে খাটিয়ে খাটিয়ে মেয়েকে আমার বাড়তে দিলে না!"

ছেলেপুলে বলিতে মাত্র হ্যাংলাপানা ওই মেয়েটি সম্বল; খাটাইলে রাগ হইবারই কথা। কিন্তু বাড়িতে না দেওয়ার অপবাদটা অমূলক। বাসনার বয়স প্রায় তেরোর কাছাকাছি,—বাড়-বাড়ন্ত যথেষ্ট। এমন কি, বিবাহ তাহার আজ দিলেও হয়, কাল দিলেও হয়। তবে চেহারা ভাল নয়—এই যা।

কিন্তু তাহার চেয়ে দেখিতেও ভাল, বয়সেও বড়,—তিগুণীর এখনও বিবাহ হয় নাই।

কথাগুলা তিনকড়ি শুনিতে পাইল না ভাবিয়া বৌ এবার আর একটুখানি চড়া গলায় সুরু করিল, "তোরা খাট্‌চিস্, রোজকার করচিস্, আপনার সাথক্ হচ্ছে, তাতে আমার কি?...... বাসনাকে ঢেঁকিতে পা'র দেওয়ানো কেন বাপু? পা'র দেওয়ার ও জানে কি? আজ বাদ

কাল বিয়ে দেব……মুখ থুব্‌ড়ে পড়েই যদি গেল? পিসিরা কাঁচ খুকি; কিছু যেন জানেন না!"

তিনকড়ি এইবার মুখ তুলিল। সোহাগ করিয়া বলিল, "কি বলছ কি গো, বিধুমুখী?"

বৌ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বলে, আর হবে কি? হাজার হোক্, বোন ত! ……বলি, বোন যে বড়লোক হলো! লুকিয়ে লুকিয়ে পয়সা জোগাচ্ছে, আর তুমি শুধু ভাত-কাপড় জোগাবার মালিক!"

তিনকড়ি তাহার বড় বড় দাঁত কয়টি বাহির করিয়া হাসিল। বলিল,

"তুই চুপ কর্ মাগী, তুই চুপ কর্! ভগবান মালিক! জোগাচ্ছে—জোগাক্ না! আমাকেই দিয়ে যাবে শেষে,—দেখে নিস্!"

বিদুমুখী হাত নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, দেবে তোমাকে খাইয়ে! তিগুণীর বিয়ে দাও, ছেলেপুলে একটা হোক্, তারপর দেখ্‌ব কাকে দেয়।"

তিনকড়ি বলিল, "অনেক দেখলাম। —তু খ্, বাবা জমালে টাকা, দিয়ে গেল মাকে, আবার মা দিয়ে গেল আমাকে; তেনানী জমাচ্ছে,—দিয়ে যাবে তিগুণীকে, আবার তিগুণী দিয়ে যাবে আমাকে। এই হয়ে আসছে, হবেও চিরকাল। ভগবান মালিক বিধুমুখী, ভগবান মালিক।"

বলিয়া সে আবার সেলাই করিতে লাগিল।

বিদু-বৌ বলিল, "তাই দেখা যাবে।"

তেনানীর সমবয়সী বন্ধুদের ছেলেমেয়ে হইয়াছে; স্বামী আসে,—কেহ বা জুতা পরিয়া,—কেহ-বা টেরি কাটিয়া। কেহ-বা চাকরি করে,—কেহ-বা বেকার।

বন্ধুরা সেদিন ভাল ভাল শাড়ী পরে, সেমিজ পরে, চুল বাঁধে; আলতা কামায়, পান খায় আর হাসে।

তেনানীর ইচ্ছা করে তাহাদের সঙ্গে একটুখানি আমোদ-আহ্লাদ করিয়া আসে, —ছেলে মেয়েকে কোলে লইয়া আদর করিয়া চুমা খায়।

কিন্তু কাজের ভিড়ে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না।

সেদিন হরিমতীর স্বামী আসিয়াছিল। লোকটি বেশ ভাল লোক।

তেনানী তাহার কাছে গিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল, "কই একখানি চিঠি লিখে দাও দেখি ভাই, দেখি কেমন লেখাপড়া শিখেছ!"

জামাইটির নাম গিরীশ। কোথায় কোন্ বিদেশী যাত্রার দলে বক্তৃতা করিয়া সংসার চালায়। বলিল, "লিপি? কার কাছে লিপি তব প্রেরিবে সুন্দরী? কে সে ভাগ্যবান মহা পুরুষ-প্রবর?"

হরিমতী ঘোম্‌টা টানিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল। তেনানী বলিল, "ছাখ্ লো ছাখ্, ঢং ছাখ্ বুড়ো মিন্‌ষের! .....না ভাই, সত্যি বলছি, দাও না......দাও না ভাই লিখে!"

গিরীশ বলিল, "বাঃ! কার কাছে লিখবো বলবে না?"

তেনানী তাহার নিষ্করুণ লজ্জাটিকে গোপন করিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিল। বলিল, "কেন, নাই নাকি আমার কেউ চিঠি লিখবার?"

হরিমতী তাহার ঘোম্‌টা তুলিয়া চোখ টিপিয়া গিরীশকে কি যেন ইঙ্গিত করিল।

হরিমতীর লিখিবার সরঞ্জাম ঘরেই ছিল। গিরীশ তৎক্ষণাৎ লিখিতে বসিল। "বল এবার কি লিখিতে হবে বল?"

"জানি নাকো।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে তেনানী দরজার কাছে আসিয়া হরিমতীকে ঘরের ভিতর ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "লিখতে জানেন না, হাতে ধরে লিখিয়ে দিগে ত' ভাই!"

তের-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেকে বাবা-বাছা করিয়া দু'আনা পয়সা দিয়া অনেক কষ্টে অনেক সন্তর্পণে চিঠিখানি দিয়া তেনানী বালিজুড়ি পাঠাইয়াছিল।

ছেলেটা সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিল।

পশুপতি বলিয়া পাঠাইয়াছে, "চিঠিতে আমরা যাই না। টাকা চাই। টাকা পাঠাতে বল্‌গে যা।"

কিছুদিন পরে সেই ছেলেটিকে দিয়াই তেনানী পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

টাকা পাঁচটি পশুপতি লইয়াছে। বলিয়াছে, "পাঁচ টাকায় হয় না, দশ টাকা পাঠাতে বলিস্।"

আবার পাঁচ!

অত কষ্টের টাকা......কিন্তু কিসের জন্য?......

তেনানী আবার পাঁচটি টাকা পাঠাইয়া দিল।

টাকা সে এবারেও লইয়াছে। বলিয়াছে, "কাল যাব।"

পরদিন সকাল হইতে কোনও কাজেই তেনানীর আর মন বসিতেছিল না। বৈকালে জল আনিতে গিয়া লুকাইয়া সে সাবান মাখিয়া আসিল, ফর্সা শাড়ী পরিল। তিগুণী ও বাসনা হয় ত এখনই কিছু বলিয়া বসিবে ভাবিয়া দু'জনকে দুইটি পয়সা দিয়া সে দোকানে পাঠাইয়া দিল। বাসনাকে বলিল, "যাও ত' মা দুজনে, দোকান থেকে পান, এলাচ আর লবঙ্গ নিয়ে এসো ত মা!"

সেই অবসরে তাড়াতাড়ি চুলগুলা খুলিয়া সে মাথা বাঁধিতে বসিল।

কিন্তু হায়, এত আয়োজন তাহার বৃথাই হইয়া গেল। পশুপতি আসিল না। রাতটা যে তাহার কেমন করিয়া কাটিল বলিলেও সে দুঃখের কাহিনী কেহ বুঝিবে না।

অনেকদিন পর্য্যন্ত তেনানী তাহার আশা ছাড়িতে পারিল না।

এই আসে! এই বুঝি আসে!

কিন্তু মাসের পর মাস চলিয়া গেল—

পশুপতি আসিল না।

অথচ মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিবার নয়।

কিছুদিন পরে তেনানী আবার সেই ছেলেটার কাছে আনাগোনা করিতে লাগিল।

"যাও ভাইটি,...... আর-একবার যাও ভাইটি......"

"এবার কিন্তু আমি তিন আনা পয়সার কম ছাড়ব না, তা বলে দিচ্ছি হেঁ!"

"তাই দেব।" বলিয়া তেনানী তাহাকে আবার সেখানে যাইতে রাজী করিয়া আসিল।

এবার দশ টাকা—!

টাকা দশটি ছেলেটির কাপড়ের খুঁটে বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া তেনানী তাহাকে অনেক কথাই শিখাইয়া দিল। বলিল, "বলিস্ যেন—এই শেষ। এবার না এলে টাকাকড়ি কিচ্ছু পাবে না!"

ঘাড় নাড়িয়া ছেলেটি চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বল্‌লে, পরশু যাব সন্ধ্যেবেলা।"

"আর কি বললে রে?—শোন্—শোন্!"

ছেলেটা আর দাঁড়াইল না। বলিল, "আমার বুঝি ক্ষিদে পায়নি?"

কিন্তু এবারও তাই!

কত পরশু পার হইয়া গেল,—পশুপতি আসিল না।

রাগে দুঃখে অভিমানে তেনানী তাহার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

ইহার বেশী আর কিই-বা সে করিতে পারে!

তিনকড়ির সঙ্গে কথা কহিতে ভয় করে। সব সময় তাহার মাথার ঠিক থাকে না।

ঘরের লোক তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে ভাবে বুঝি কিছু চাহিতে আসিয়াছে,—অমনি সে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া তেরিয়া-মেরিয়া করিয়া ওঠে।

তবু সেদিন অতি দুঃখে তেনানী তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, "তিগুণীকে আর আমার মত করে' দিওনা দাদা! তার চেয়ে গাঁয়ে একটি ছেলে আছে,—ওপাড়ার সেই ভোলানাথ, ওকেই দাও!"

তিনকড়ি চোখ দুইটা তুলিয়া বলিল, "কে? ভোলানাথ?—ও! সেই শ্রীহর্ষর ব্যাটা! কিন্তু শ্রীহর্ষ মারা যাবার পর অবস্থা ত' তেমন......"

তেনানী বলিল, "তা হোক্ দাদা, তুমি একবার যাও! ভোলানাথ কোথা চাক্‌রি করে, আজই এসেছে দেখলাম। তবু গাঁয়ে-ঘরে থাকবে,—দেখতে পাব, বলতে পাব......"

তেনানী আর-কিছু বলিতে পারিল না।

পরদিন বৈকালে ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনকড়ি ঘরে আসিয়া বলিল, "না তেনানী হলো না। ছেলেটি দেখলাম। ছেলেটিত মন্দ নয়। মা বোনকে কিচ্ছু দেয় না। তা না দিক্। চাকরি করে,—হাতে কিছু কিছু জোগায় হয়ত'।...বিয়ে দিতে হলে তিনশ টাকা চায়—নগদ। তাও না হয় দেড়শ'তে নামিয়েছি। গয়নাও যা চায় তাই না হয় দিলাম! কিন্তু—বছরে তিন মাপ করে' চাল চায়। বলে, বোন তোমার খাবে কি?......ওইখানেই গোলমাল তেনানী!"

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু! চাল আমি দিতে পারব না।"

তেনানী বলিয়া উঠিল, "তা হোক্ দাদা, চাল না হয় দুখ্-ভিখ্ করে আমি নিজেই দেব। তুমি ওইখানেই ঠিক কর।"

খানিক্ ভাবিয়া তিনকড়ি বলিল, "তবে......তা বেশ! কিন্তু আর একটি ছেলের সন্ধান দেখি তা'হলে! বাসনারও যাতে ওই একসঙ্গেই......দুনো খরচ আমি করতে পারব না বাপু! হাঁসগুলো সব এলো? কই গো! কোথা রয়েছ তুমি?"

বিন্দু-বৌ দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতেছিল। বলিল, "হ্যাঁ এসেছে। শোনো তুমি!"

তিনকড়িকে কোঠাঘরের উপরে লইয়া গিয়া বিন্দু-বৌ যেন একেবারে মার-মূর্ত্তি হইয়া বলিয়া উঠিল, "বছরে তিন মাপ করে' চাল আর দিতে পারবে না তুমি? এই নাও—"

বলিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ-হাতের সোনার বালাটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "এই নাও, আমি দিচ্ছি। ও মা গো! সব্বনাশীর কথা ছাখো দেখি! বলে কিনা, ভোলানাথের সঙ্গে তিগুণীর বিয়ে! আর—আমি আজ পাঁচ বচ্ছর ধরে' ভেবে রাখলাম ওকে আমার বাসনার সঙ্গে বিয়ে দেব! বলি একটি মাত্র মেয়ে আমার, চোখে-চোখে রাখব চিরদিন,—আর তুমি কিনা......

বোনের স্বগ্নবাস, আর দুটো নয় চারটে নয়, একটা মেয়ে,—তারই গলায় ফাঁসি! যা খুসী তাই কর, তোমার যা খুসী .....”

বলিতে বলিতে বিদু-বৌ ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কথাগুলা তিনকড়ির হাড়ে হাড়ে ভিজিল বোধহয়।

বৌএর হাতখানা ধরিয়া বলিল, “কেঁদো না, চুপ কর!”

বলিয়া পরম বিজ্ঞের মত চোখ বুজিয়া তিনকড়ি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, “কিন্তু গোলমালটি করেছ কি, মরেছ তুমি! চুপটি করে’ বসে থাকো! বাস্! ভগবান আছেন মাথার ওপরে, কিচ্ছু ভাবনা নেই!”

এই বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া তিনকড়ি উঠিতে যাইতেছিল, বিদু-বৌ টপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া বলিল, “উঠছো কোথা, বসো! বলে যাও আমার কাছে—”

তিনকড়ি পুনরায় বসিল।

তিনকড়ি খাইতে বসিয়াছে।

তেনানী ভাত দিয়া গেল।

তিনকড়ি বলিল, “দেখলি তেনানী,—মেঘ চাইতেই জল! বাসনার মামার এক চিঠি এসে হাজির! বর একটি ঠিক করেছে, বাসনার ঠিক উপযুক্তই হবে, লেখাপড়া করে, বেশ বুদ্ধিমান।...একদিনেই দিন করে’ ফেলি···না কি বল্? আবার দুনো খরচ কেন?···ভগবান আছেন রে, নারায়ণ আছেন! ভগবান যার সহায়,—অরণ্যেও চারটি অন্ন তার মেলে। নারায়ণ! নারায়ণ!”

বলিয়া সে তাহার অন্নের গ্রাস মুখে তুলিতে লাগিল।

আনন্দে তেনানীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

কয়েকদিন ধরিয়া তিনকড়ির অবসর মোটেই ছিল না।

ভোলানাথের সঙ্গে তিগুণীর বিবাহের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হইয়া গেছে।

তেনানীর আনন্দের আর সীমা নাই। যার-তার কাছে যেখানে-সেখানে বলিয়া বেড়ায়,—নিজের কিছু হইল না, এইবার বোনের যদি কিছু হয়!

ভোলানাথ দিনে-দিনে তাহার কাছে অপরূপ সুন্দর বলিয়া মনে হইতেছে। অমন ছেলে,—জামাই করিবার মত অমন উপযুক্ত পাত্র পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে। কম কেন, নাই বলিলেই হয়। পথ দিয়া পার হইয়া যায় ত’ মনে হয় যেন রাজপুত্র হাঁটিতেছে। যেমন নাক, তেমনি চোখ,—তেমনি গায়ের রং!

তিগুণী ও বাসনার একসঙ্গে, একরাত্রে, একই লগ্নে বিবাহ।

তিগুণীর বর ত গ্রামেই,—বাসনার বর আসিবে তাহার মামার বাড়ী হইতে।

লগ্ন উপস্থিত।

বরের সাজ-পোষাক পরিয়া পাল্কি চড়িয়া ভোলানাথ আসিল, কিন্তু মামার বাড়ীর বর তখনও আসে না।

লোকজন সব এদিক-ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করে, লগ্ন বুঝি-বা ভ্রষ্ট হইয়া যায়······

তেনানী বলিল, "দাদা, লোক পাঠাও!"

তিনকড়ি মহা শশব্যস্ত হইয়া এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছিল, কথা কহিবার অবসর নাই, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "লোকজন আর এসময় পাই কোথা বোন্?···দেখ্ ত' দেখ্ ত'—তোরাই জনকতক মেয়েছেলে ····যা ত' বোন একটা লণ্ঠন নিয়ে······পদ্মপুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াগে যা! যা, যা, দৌড়ে যা!······ও হরিমতী, ও আনি, ও ভানী! যা ত' মা! তেনানীর সঙ্গে যা ত' মা তোরা! নারায়ণ! নারায়ণ!"

বলিবামাত্র হুজুগ পাইয়া মেয়েগুলা লণ্ঠন লইয়া বর দেখিতে ছুটিল।

*

বালিজুড়ি হইতে পশুপতি আসিয়াছে। তিনকড়ি সেদিন নিজে তাহাকে আনিতে গিয়াছিল।

ভোলানাথের সঙ্গে বরযাত্রী বেশি কেহ আসে নাই। জানে ও চামারের বাড়ী গিয়া কোনও লাভ নাই।

তিনকড়ির দিকে পশুপতি তাহার টেরা-চোখের দৃষ্টি হানিয়া বলিয়া উঠিল, "লগ্ন যে যায় হে!"

লগ্নভ্রষ্ট হইলেই সর্ব্বনাশ! দেবতার নামে যে পশু একবার উৎসর্গীকৃত হইয়া গেছে, কোপ্ না বসাইলে তাহারও নাকি খুঁৎ রহিয়া যায়।

তিনকড়ি তাহার নামাবলীর সন্ধানে ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছিল; পশুপতি তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "দেরি কিসের?—দাও এবার!" বলিয়া হাত পাতিল।

তিনকড়ি বলিল, "আঃ! থামোই না হে! হয়ে যাক্ না কাজটা আগে,—চুকেই যাক্!"

কিন্তু পশুপতি অবুঝ নয়। তিনকড়িকে সে চেনে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, হলো না তা'হলে!"

বিন্দু-বৌ কোনোদিন পশুপতির সুমুখে বাহির হয় না। কিন্তু আজ সে অন্ধকার ঘরের কোণে কোথাও লুকাইয়া ছিল, না, উপর হইতে হট্ করিয়া নামিয়া আসিল কে জানে! এবং শুধু নামিয়া আসিয়াই ক্ষান্ত হইল না, পশুপতির প্রসারিত হস্তে দুইটি নোট ও কয়েকটি টাকা গুঁজিয়া দিয়া ঘোম্টা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পশুপতি গুণিয়া দেখিল। কিন্তু পাঁচ টাকা কম। আবার হাত পাতিল। বলিল, "আরও পাঁচ টাকা ?"

তিনকড়ি তখন তাহাকে সেখান হইতে বাহির করিবার জন্য পশ্চাৎ দিক হইতে ক্রমাগত ঠেলা দিতেছিল।

"আর নেয় না, হেঁঃ ! আর নেয় না। চল—চল—!"

পশুপতি আবার ঘাড় নাড়িল।—"আমাদের ভাই যে-কথা সেই কাজ !......নাও বৌ তোমার টাকা-পঁচিশটি ফিরে নাও,—হলো না।"

বিন্দু-বৌএর রাগে তখন প্রায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিবার অবস্থা।

লজ্জা সরম আর রহিল না, ফস্ করিয়া ঘোম্‌টা তুলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনকড়ির দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওই চণ্ডাল আমায় পঁচিশ টাকা বলেছিল।...যাও ঠাকুর-জামাই, যাও তুমি ! আমি দেব টাকা।"

তিনকড়ি বলিল, "টাকা তুই বিয়োবি ?"

কথাটা কিন্তু পশুপতি শুনিতে পাইল না। বিন্দু-বৌএর দিকে সকরুণ লুব্ধদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া টাকাগুলি ট্যাঁকে গুঁজিয়া সে বাহির হইয়া গেল; জীব-ধাত্রী শ্যামা-মায়ের প্রসাদী পুষ্প লইয়া হন্তারক যেমন করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া যায়।

উপরে মেয়েদুটাকে রাখিয়া আসিয়াছে। বিন্দু-বৌকে আবার উঠিয়া যাইতে হইল।—তা হোক্। ঘুল্‌ঘুলির ফাঁকে উঠান পর্য্যন্ত নজর চলে।

দেখিল, মেয়েদুটাকে ঠিক যেমনটি বসাইয়া রাখিয়া গেছে, ছোট সেই জানালাটির ধারে বাসনা ও তিগুণী ঠিক তেমনি করিয়া হলুদ রঙের শাড়ী দুইটি পরিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

......পদ্মপুকুরের পথের পাশে নতুন বরের পাল্কি বেহারার শব্দ আসিবে।......হয়ত বা হঠাৎ ওই গ্রামান্তরালের আঁধার-পথে মশাল জ্বালিয়া দেখা দিবে, কিম্বা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া চৌদলে বসিয়া আসিতেছে,—তাই বা কে জানে !

ভানী ছেলেমানুষ। রাত্রিকালে পদ্মপুকুরের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার ভয় করিতেছিল। বলিল, "না দিদি না, বর আসবে না। চল্—বাড়ী ফিরে চল্।"

কিন্তু তাহার কথা তখন কে-ই বা শোনে !

তেনানী বলিল, "উ-ই ছাখ্ !"

ফাঁকা মাঠের ওপারে, দূরে কয়েকটা গাছের পাশে একটা আলো দেখা যাইতেছিল।

কিন্তু কিসের আলো কে জানে ! তেনানী একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। আলোটা ক্রমশ একটু একটু করিয়া কোথায় কোন্ গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল। এদিক দিয়া আর আসিল না।

তেনানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না। পথের ধারে সে বসিয়া পড়িল। হরিমতী বসিল, আনিও বসিল, ভানীও বসিল।

কোথায় কোন্ মাতাল-শালে মদ খাইয়া কয়েকজন মজুর মাঠের পথ ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহাদের গোলমালে আচম্‌কা মুখ ফিরাইয়া তেনানী বলিল, "কে রে! কোন্ গাঁয়ের তোরা ?"

কে একটা বুড়া-লোক বলিয়া উঠিল, "না মা চোর নই মা !"

আর একজন বলিল, "জোস্না রাতে চোর কোথা পাবে মা ? আঁদার রাতে চোর থাকে।"

আনি, ভানী, দুজনেই ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হরিমতী বলিল, "হাসিস্ না লো হাসিস্ না তোরা ! এদিকে বলে যা হবার তাই হচ্ছে, আর হাসি ছ্যাখো !"

তেনানী বলিল, "ওরে ও......ও মাতালরা ! শুনচিস্ ? আমাদের বর আসবে বাপু, পথে যদি দেখা হয় ত বেহারাদের একটু পা চালিয়ে আসতে বলিস্ !"

"বেশ মা বেশ, বলে' দেব। দেখা হলেই বলে' দেব।"

কথাটা বোধকরি নেশার ঝোঁকে প্রত্যেকেই একবার করিয়া বলিয়া গেল।

কিন্তু কোথায় বা বর আর কোথায় বা পাল্কি !

নিস্তব্ধ গ্রামের প্রান্তে মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও নাই। প্রহর রাত্রি অতীত হইয়া গেছে। শেয়ালগুলা একবার করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল।—দূরের গ্রাম হইতে কয়েকটা কুকুরের ডাক শোনা যায়।

পদ্মপুকুরের জলের ধারে চিড়্‌চিড়ি গাছের ঝোপের ভিতর কয়েকটা ডাহুক্ পাখী বাসা বাঁধিয়াছিল; অন্ধকারে অসময়ে মানুষ দেখিয়া ডাহুকীর বাচ্চাগুলা বোধকরি ভয় পাইয়া এতক্ষণ পরে চেঁচাইতে লাগিল।

এমন করিয়া আর কতক্ষণই বা বসিয়া থাকে !

হরিমতী বলিল, "নাঃ! কোমর-কাঁকাল ধরে' গেল !"

তেনানী উঠিল! বলিল, "চল্ !"

কিন্তু এ নিদারুণ দুঃসংবাদ দাদা তিনকড়ি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে কে জানে !

আনি বলিল, "আচ্ছা, বাসনার কি হবে ভাই তা হ'লে ?"

তেনানী কথা কহিল না।

বাড়ী ফিরিয়া তেনানী যাহা দেখিল, তাহার চেয়ে মাথার উপর আকাশের বজ্র ভাঙিয়া পড়িলেও বুঝি-বা ভাল হইত।

বিবাহ তখন প্রায় শেষ।

পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

বাসনার হাতের উপর ভোলানাথের হাত—

আর তিগুণীর?

তেনানী সে দৃশ্য চোখে আর দেখিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

তিগুণীকে বিবাহ করিতেছে পশুপতি।—তাহার স্বামী!

পাগলের মত বিভ্রান্ত অবস্থায় তেনানী খিড়্‌কির পুকুরের দিকে ছুটিতেছিল, সেখানে কে যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া আসিল।

রান্নাঘরের পাশে যে-ঘরটায় তাহারা থাকে, তাহারই দরজায় গিয়া সে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। মুখ দিয়া কথা সরে না,—চোখ্‌ দিয়া দর্‌ দর্‌ করিয়া জল গড়াইয়া আসে। কি করিবে সে কি করিবে? মরিবে? জলে ডুবিবে? বিষ খাইবে?......তেনানী সেইখানে গড়াগড়ি দিয়া ধূলায়-মাটিতে ঠিক যেন কাটা-ছাগলের মতই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। হরিমতী ধরিয়া তুলিতে গেল, সজোরে তাহাকে এক ঝাঁকানি দিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া তেনানী উঠিয়া বসিল, এবং বসিয়াই দরজার চৌকাঠের উপর মাথাটা তাহার ঠাই ঠাই করিয়া ঠুকিতে আরম্ভ করিল।

মার খাইয়াও হরিমতী ছাড়িল না; মেয়েগুলা সকলে মিলিয়া জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চায়,—কিন্তু কিছুতেই সে মানা মানে না; একেবারে যেন পাগল হইয়া গেছে।

এদিকে বিবাহ শেষ করিয়া তিনকড়ি আসিল। পুরোহিত আসিলেন। মজা দেখিবার জন্য আরও কয়েকজন আসিতে চাহিতেছিল, কিন্তু ডুলোর-মা হেঁসেল হইতে বাহির হইয়া লোহার খুন্তি হাতে লইয়া তাহাদের খেদাইয়া দিল।—"ওদের দুখ্‌ হয়েছে, আহা, তোরা কি জন্যে যাবি বাছা মজা দেখতে?"

বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁহার হাতের লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিতেই তেনানীর বুকের আঁচলটা হরিমতী তুলিয়া দিল। দেখা গেল, কপালটা কাটিয়া রক্তের ধারা চোখের কোণ বাহিয়া গালে আসিয়া জমিয়াছে।

পুরোহিত বলিলেন, "ছি ছি মা, করেছিস্ কি ! করেছিস্ কি ! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—ও কি আর কারও খণ্ডাবার জো আছে মা !"

তিনকড়ি বলিল, "পুরুষ মানুষ তাই চুপ করে' আছি কোনোরকমে, নইলে কি আর হায় হায়......" বলিয়া সে তাহার নামাবলীর খুঁট্টা তুলিয়া দুই চোখের উপর চাপিয়া ধরিল।

তেনানীর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটিল। পাগলের মত চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, "দাদা......" কিন্তু বাকি কথাটা সে আর বলিতে পারিল না। ঠোঁট দুইটি অসম্ভব রকম কাঁপিয়া উঠিল, চোখের অশ্রু গালের রক্তের ধারাটিকে ধুইয়া আনিয়া টপ্ টপ্ করিয়া কাপড়ের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিন্তু দুঃখ—তা সে যত বড়ই হোক্, একমাত্র মানুষই তাহা বর্দাস্ত করিতে পারে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, যেমন চলিতেছিল আবার তেমনি সবই চলিতেছে। বন্ধকী টাকার সুদ দু'পয়সা করিয়া হইলে তেইশ টাকার সুদ যে মাসে সাড়ে এগারো আনা হয়, গয়লা-বৌকে তেনানী সে কথা কিছুতেই বুঝাইতে পারে না।

তিগুণী হাসিতে হাসিতে বলে, "তা হোক্ দিদি, এগারো আনাই হলো, দু'পয়সা না হয় ছেড়েই দে !"

বাসনাও হাসিয়া তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে, "পিসির খালি টাকা আর টাকা, ছেলে আর ছেলে—!"

ছেলের কথাটা শুনিয়া পিসিও হাসে, ভাই-ঝিও হাসে।

বাসনার বুকে হাত দিয়া কাপড়ের তলায় কি যেন খুঁজিতে খুঁজিতে তেনানী বলে, "রেখেছিস্ ত মাদুলিটি ?"

মাদুলিটি বাবা খগেশ্বরের। যে সব মেয়ের ছেলে হয় না, যাহাদের স্বামী আসে না, রবিবার দিন বাবা খগেশ্বরের মন্দিরে গিয়া পূজারীকে দশটি পয়সা দিয়া এই কবচটি তাহারা ধারণ করিয়া আসে। খগেশ্বরের মন্দির সেখান হইতে ক্রোশ খানেক্ দূরে। বিবাহের মাস পাঁচছয় পরেই তিনকড়িকে না জানাইয়া তেনানী তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল।

তেনানী বলে, "ও একেবারে অব্যর্থ। আসতেই হবে।"

লজ্জায় বাসনা একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসে। বলে—"তবে তুইও একটা নিলিনে কেন পিসি ?"

"ওর মুখে আমি ঝাঁটা মারি!" বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তেনানী একবার তিগুণীর মুখের পানে তাকায়। বলে, "এই যে আমার সতীন-কাঁটা !"

বয়স তাহার ষোলয় গিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী। তিগুণী একবার হাসে। শুভ্র দাঁতের পংক্তি দেখা যায়। গাল দুইটি রাঙা হইয়া ওঠে।

এবারেও সতীনের জন্য তেনানীর অনেকগুলি টাকা খরচ হইয়াছে, কিন্তু পশুপতি নির্ব্বিকার। অনেক দুঃখে সেপথে সে চিরদিনের মত কাঁটা দিয়াছে। তিগুণীর আশা-ভরসা আর কিছু নাই।

তাই সে এবার বাসনাকে লইয়া পড়িয়াছে। নিজের না, বোনের না, এইবার ভাই-ঝির যদি কিছু হয়! ছেলে মেয়ে যা-হোক্ একটা কিছু...... ছেলে না হইলে কি আর মানায় গো! এ দুর্নিবার পিপাসা যেন আর কিছুতেই মিটিতে চায় না। নারীজন্ম মনে হয় বুঝি বা ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু ভাই-ঝিরও কপাল মন্দ। তাহাকে লইয়াও আজ এই দুইটি বৎসর ধরিয়া কম টানা-পড়েন্ চলিল না।

তেনানীর সে কল্পিত রাজপুত্র ভোলানাথ কাঙাল-পুত্রেরও অধম হইয়া গেছে।

বিবাহের পর দেড়শটি টাকার মধ্যে পঞ্চাশটি টাকা বিধবা মা-বোনের হাতে তুলিয়া দিয়া সেই যে সে গ্রাম ছাড়িয়া উধাও হইয়া যায়,—ফিরিয়া আসে একটি বৎসর পরে। আসিয়াই মা-বোনের সঙ্গে ঝগড়া!

মা বলে, "তুই যে একটি পয়সা দিবিনে, আমরা খাই কি?

ভোলানাথ বলে, "বৌ নিয়ে এসো। বছরে তিন মাপ করে' চাল আদায় কর, আর খাও।"

কিন্তু প্রস্তাবটা তাহাদের দিক্ হইতে আসিবার আগেই বাসনাকে তেনানী নিজে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।—"এই নাও বেয়ান, তোমার বৌ নাও!"

ভোলানাথ উঠানে বসিয়া জুতা ব্রুশ্ করিতেছিল, আড়-চোখে একবার তেনানী একবার বাসনার দিকে তাকাইয়া নাক সিট্কাইয়া বলিল, "বছরে তিন মাপ চাল দেবার কথা, নিয়ে এসো আগে, নইলে মেয়ে তোমাদের ফিরে নিয়ে যাও!"

তেনানী বলিল, "বিয়ে যখন করেছ বাবা, তখন চাল দিলেও নিতে হবে, না দিলেও নিতে হবে।"

ভোলানাথ বলিল, "মাইরি আর কি! ইয়ারকি বুঝি?"

কিন্তু জবাবটা যে এমন হইবে তেনানী তাহা ভাবে নাই। বলিল, "বেশ। বাসনা রইলো। তারপর চাল তোমার শ্বশুরকে বলে' পৌঁছিয়ে দিয়ে যাব।"

ভোলানাথ তাহার জুতার উপর ব্রুশ্টা খুব জোরে জোরে ঘষিতে লাগিল।—"হ্যাঁ, শ্বশুর বেটা ত' দেবে সবই! চামার কোথাকার ছোটলোক! তিগুণীকে বিয়ে দেবে বলেই রাজি হয়েছিলাম। তা না হয় দিলে না। যাক্, না দিক! কিন্তু এত বড় পূজো গেল ত এক জোড়া

জুতো দিলে না,—একজোড়া ধুতি! একজোড়া জামা!—কিচ্ছু না! মা বোন্ যে ঘরে রয়েছে ত দশটা টাকা? তাও না!"

তেনানী বলিল, "তুমি ত ছিলে না বাবা, থাকলে না হয়,—দাদা না দিক, দুখ্-ভিখ্ করে' আমিই দিতাম।"

ভোলানাথের বিধবা বোন্ বলিল, "তা-মা, দেওয়া তোমাদের উচিত ছিল।"

ইহার উপর আর কথা চলে না। বাসনাকে রাখিয়া তেনানীকে সেদিন তাহার কৃপণ কঞ্জুষ দাদার আচরণের জন্য একটুখানি লজ্জিত হইয়াই বাড়ী ফিরিতে হইল।

দাদা ঘরে ছিল না। ফিরিয়া আসিলে বলিল, "ভোলানাথকে তিন মাপ করে' চাল দেবার কথা, এবার ত' দিতে হয়।"

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল "বেশ, দাও গে—!"

কিন্তু কথার অর্থটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তেনানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনকড়ি বলিল, "ঘরে ত চাষ বলতে এই ক' বিঘে জমি! কিনে খেতে হয় না—এই পর্য্যন্ত। বছরে তিন মাপ করে' চাল······আর চালটা ত' তুই নিজেই তখন দিয়ে দেব বলেছিলি কোনো রকমে। তাই যদি পারিস ত—"

"আমি কোত্থেকে দেব দাদা?" আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা তাহার ছিল, কিন্তু ইহার বেশি তেনানী আর কিছুই বলিতে পারিল না।

এমন সময় বিন্দু-বৌএর হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িল, এবং উঠান পর্য্যন্ত আসিয়াই কি যেন ভুলিয়া আসিয়াছে—এম্নি ভাবে পুনরায় সে ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু এই যাওয়া আসা তাহার নিরর্থক নয়। অনুচ্চকণ্ঠে দুজনকে শুনাইয়াই বলিয়া গেল, "বোন হলে দিত, ভাই-ঝিকে কেউ কখনও দেয়?"

তেনানীর বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিতেছিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, বলিল, "তুমি চুপ কর বৌ, তুমি কোন্ লজ্জায় বলছ?"

কিন্তু বিন্দু-বৌএর লজ্জা না হইলেও তিনকড়ির হইল। বলিল, "আহা-হা, চাল কি আর আমি তোকে দিতেই বললাম রে বাপু? বললাম,—ওটা কথার কথা।······দেব কাকে শুনি? জামাইএর না আছে সাকিম, না আছে মোকাম। বাসনাকে নিয়ে যাক্, ঘরে থাক্, রোজগার করুক, দু'একটা ছানা-পোনা হোক্,—আমি দেখি, তারপর দেব। জামাই-বেটিকে দিতে কি আর অসাধ? কিন্তু আমার বাপু এক কথা। পেটে এক, মুখে আর,—এসব পাবে না আমার কাছে। এক হাতে নেব, একহাতে দেব;—এই ত' জানি।"

কিন্তু তাহাকে দিতেও হইল না, নিতেও হইল না, জামাই ভোলানাথই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

দু'দিন গেল, তিনদিন গেল, ভোলানাথ দেখিল, চাল দেওয়ার নামগন্ধও কেহ করে না, তেনানী সেই যে মেয়েটাকে রাখিয়া গেছে, তাহার পর আর আসেও না, কিছু বলিয়াও পাঠায় না।

সেদিন রাত্রি তখন প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। বাসনা নিশ্চেষ্টভাবে ঘুমাইতেছিল। ভোলানাথ ধীরে ধীরে উঠিয়া প্রথমে তাহার খোঁপার চিরুণী, কাঁটা, ফুল খুলিয়া লইল, গলার হার ছড়াটা খুলিল, পরে হাতের বালা দুইটা খুলিতে যাইবে এমন সময় বাসনা জাগিয়া উঠিল। জাগিয়াই সে ভোলানাথের কাণ্ড দেখিয়া চেঁচাইতে গিয়াছিল। ভোলানাথ বলিল, "চোপ্।"

ভয়ে বাসনার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। হাতের বালা দুটা রহিয়া গেল।

ভোলানাথ বলিল, "কার ?—এসব কার শুনি ?...তোর গায়ে এ-সব মানাবে কেন,—সুঁটকি, কুঁইলি কোথাকার! যার গায়ে মানাতো সে ত' আর...যাক্। বাপ্‌কে বলে' চাল আদায় করে' নিয়ে এসো, এসে তোমার গয়না নিয়ে যেয়ো।"

বাসনা তাহার মাথার উপর অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল।

খানিক থামিয়া ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তিগুণীর বর আসে ? তোর পিসে ? সেই ফোঁকলা পশু ?"

গহনার শোকে বাসনার চোখ দিয়া তখন জল আসিয়াছিল। পিছন ফিরিয়াই ঘোম্‌টা-ঢাকা মাথাটা সে বার কতক নাড়িয়া জানাইল, আসে না।

ভোলানাথ আর কিছু না বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল। পরদিন সকাল হইতে না হইতেই কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাসনা তাহার সাড়ী ও সেমিজখানি গামছায় বাঁধিয়া লইয়া ছুটিয়া একেবারে বাপের বাড়ীর দরজায় আসিয়া দম লইল।

কিন্তু এত বড় ক্ষতি তিনকড়ির পক্ষে বরদাস্ত করা সহজ নয়।

কন্যার মুখে গহনা কাড়িয়া লইবার কথাটা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ ভোলানাথের বাড়ীর দিকে ছুটিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

শুনিল, ভোলানাথ বাড়ী নাই, এবং তাহার বিধবা ভগিনী এই গয়না কাড়িয়া লওয়ার কথা প্রসঙ্গে অভদ্র ভাষায় তিনকড়িকে যে সব কথা শুনাইয়া দিল তাহা শুনিয়া নীরবে চলিয়া আসা ছাড়া তাহার আর কোনও উপায় ছিল না।

তারপর ভোলানাথকে গ্রামে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মাস পাঁচ ছয় আগে দিন কতকের জন্য সে একবার আসিয়াছিল।

খবর পাইয়াই তেনানী বাসনাকে সাজাইতে বসিল।

বাসনা বলিল, "না পিসি, না।"

"আ-মর্! সাধও ত' হয় না ছুঁড়ির!" বলিয়াই তেনানী তাহার মাথার চুলগুলা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, "গয়না কেড়ে নিক্, মারুক্ ধরুক, যা খুসী তাই করুক্,—মরে' যাবি না, একটা ছেলে হোক্, দেখবি তখন, বলবি যে হ্যাঁ পিসি তখন বলেছিল।"

বাসনা সহজে যাইতে চায় না, তেনানী সেদিন রাত্রে তাহাকে সবার আগেই খাওয়াইয়া দিয়া একরকম জোর করিয়াই সঙ্গে লইয়া গেল।

ভোলানাথের মা যে কেমন ধারা মানুষ কে জানে। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কয় না, দিনরাত আপন মনেই বসিয়া বসিয়া ঝিমায়।

মুখ তুলিয়া ইহাদের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোনও কথাই সে বলিল না।

বিধবা বোন নাক সিটকাইয়া বলিয়া উঠিল, "আ, দিতে থুতে নেই শক্তি, পেসাদ পাবার ভারি ভক্তি!"

ভোলানাথ তখন আহারাদি শেষ করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া তেনানী ও বাসনাকে আসিতে দেখিয়াই কোনও কথা না বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং আপন মনেই উঠানটা পার হইয়া গিয়া সদর দরজার কাছ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আজ আর আমি ঘরে শোবো না মা, দরজায় খিল বন্ধ করে' দিস্।"

বোন ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "হলো ত? দিলে ত' তাড়িয়ে?"

তেনানী অবাক্!

কোনো রকমে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাইয়া দু'জনে যেমন আসিয়াছিল তেমনি চুপি চুপি বিদায় হইয়া গেল।

কিন্তু তেনানীর লজ্জা নাই।

পরদিন আবার!

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ভোলানাথের বোন রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রাচীরের দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেছিল, তেনানী একা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।—"ঘুঁটে দিচ্ছ ভানু?"

ভানু মুখ ফিরাইয়া একবার 'হুঁ' বলিয়াই আবার তার নিজের কাজে মন দিল।

তেনানী বলিল, "আসি কি আর সাধে মা? আসি—বহুৎ দুঃখে আসি।......দাদা ত' চামারের একশেষ, তা' ত জানো। কিন্তু আমরা মরি শুধু ওই মেয়েটার দুখে! বলি, আহা, যাই তবু নিয়ে, স্বামী পায় ত' পাক্।" বলিয়াই একটুখানি থামিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—"আজ একটি জিনিষ এনেছি মা তোমার জন্যে,"—বলিয়া পাঁচটি টাকা সে ভানুমতীর বাঁ-হাতের মুঠার মধ্যে অতি সন্তর্পণে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "হেই মা, তোমার হাতে ধরে' বলছি মা, ভাইকে আজ আর যেন যেতে দিও না।"

টাকা হাতে পাইয়া ভানুর মুখের চেহারা তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল। এ যেন ঠিক যাদু-মন্ত্র! বলিল, "দেখলে ত' মা কাল স্বচক্ষে? আমরা ত কিচ্ছু বলিনি!"

তেনানী অত্যন্ত মিনতির সুরে কহিল, "তুমি মনে করলেই হবে মা, আজ শুধু তোমার হিল্লেতেই আসব। যেমন সময় এসেছিলাম ঠিক তেমনি সময় . . ."

ভানুমতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এসো।"

বাসনা সেদিন কিছুতেই আসিবে না, তেনানী তাহাকে একরকম টানিতে টানিতে লইয়া চলিল।

তেনানী বলিল, "চল্ মা চল্! আমরা মরি, আর তুই যে কি দাতের মেয়ে মা কে জানে!"

বাসনা বলিল, "কাল অম্‌নি অম্‌নি তেড়েছিল, আজ ঝাঁটা খেয়ে আসবি।"

তেনানী বলিল, "না, না, টাকা দিয়েছি! টাকা যেটা পাথর-কাটা! - তা জানিস্?"

বাসনা ছেলেমানুষ, কিন্তু বাপের রক্ত গায়ে আছে। টাকার মহিমা সে জানে। কাজটা সেদিন কেমন যেন ঠিক যন্ত্রের মতই নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

ভোলানাথ সেদিনও ঘর ছাড়িয়া অন্যত্রে চলিয়া যাইতেছিল।

বোন বলিল, "না, সে কি? আজকার মত থাক্। ধর্ম্মে পতিত্ হবি যে?"

মাও কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল।

ভোলানাথের আর যাওয়া হইল না। বাসনাও রহিল। রাত্রে রহিল। আবার দিনে চলিয়া গেল।

এমন শুধু একদিন নয়,---এমনি করিয়া চারদিন।

পাঁচদিনের দিন ভোলানাথকে তাহার চাকরির জায়গায় চলিয়া যাইতে হইল।

বাসনা নিষ্কৃতি পাইল।

মাদুলির মাহাত্ম্যে কি না কে জানে!

মাস দুই পরে জানা গেল, বাসনার ছেলে হইবে!

তেনানীর আনন্দ আর ধরে না! কিন্তু তিগুণীকে দেখিবামাত্র আনন্দের উচ্ছ্বাসটা যেন একটুখানি কম পড়ে।

বাসনাকে দিনরাত চোখে-চোখে রাখিতে হয়। যখন যাহা খাইতে চায় তেনানী তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনে।

বিদু-বৌএর ঢেঁকিটা ভাঙিয়া দিলেও আজকাল সে আর কিছু বলে না। ননদের সঙ্গে পুকুরের ঘাটে জল আনিতে যায়। তিনকড়ির অসাক্ষাতে ভাগাভাগি করিয়া ডিম বিক্রি করে।

বিন্দু-বৌ বলে, "এবার তোমার নাতি হবে।"

তিনকড়ি বলিল, "তা না হলে কি আর সহজে ছাড়তাম মনে করছিস্? জামাইএর নামে নালিশ কর্‌তাম আমি। লোকে মন্দ বলতো? তা বলতো ত' বলতো, তাও ছাড়তাম না।"

"ওমা! সে কি গো?"

তিনকড়ি বলিল, "বাঃ! অতগুলো গয়না—একি আর সহজ কথা বাবা! ওর ওই মুখরা বোনটাকে সুদ্ধু আসামী করে দিয়ে—বাস্! যা এবার ছোট আদালতে। আমায় বলে কি না ফাঁকিবাজ, বলে, জোচ্চোর তুমি! এত বড় সাহস!"

তিনকড়ির রাগ তখনও কমে নাই। বলিল, "করলাম না না হয়, ছেড়ে দিলাম।—রাগের মাথায় করেই যদি ফেলতাম হট্ করে', সে কি নিজে আমি করতাম ক্ষেপী? করাতেন।—যিনি করাবার তিনিই করাতেন। আমি শুধু হেতু হতাম মাত্র।—করবার হেতু।"

যাক্—!

কিন্তু মাসখানেক পরে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল।

বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্র তখন চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, এমন সময় পশুপতি আসিয়া হাজির! মাথায় একটা ভিজা গামছা, গায়ে সাদা চাদর, পায়ে চটি, এক হাতে হুঁকা, আর এক হাতে গামছায় বাঁধা ছোট একটি পুঁটুলি। ঘামে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে। বেচারা একটুখানি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

তিনকড়ির সঙ্গে আলাপ-আপ্যায়নের পর, জল খাইয়া বিশ্রাম করিয়া একটুখানি সুস্থ হইয়া, পশুপতি বলিল, "বাড়ী থেকে বেরিয়েছি—তা প্রায় মাসখানেক হবে। এবার কিছু দিতে হবে ভাই, কন্যাদায়ে পড়েছি।"

তিনকড়ি নিতান্ত অন্যমনস্কের মত বলিল, "হুঁ।"

একবার মুখ তুলিয়াও চাহিল না।

ভাবগতিক দেখিয়া বুঝা গেল, সে কিছু দিবে না।

পশুপতি কিন্তু তিনকড়ির ভরসায় আসে নাই।

আসিয়াছে যাহার ভরসায় সে ত' দেখাও দিল না, একটা কথাও বলিল না।

রাত্রে তেনানীর পরিবর্ত্তে তিগুণী আসিল। দেখিয়াই মনে হইল, তাহাকে কোনোরকমে ঠেলিয়া-গুঁজিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।—

কিন্তু সে কি রূপ! কুমারী আজ যুবতী হইয়াছে।

পশুপতির মনে হইতেছিল, নিজের বয়সটাকে কোন রকমে পিছাইয়া লওয়া যায় না ? যাহা তাহার কোনোদিন মনে হয় নাই আজ তাহার সেই কথাই মনে হইতে লাগিল।— ইহাকে বিবাহ করা বোধকরি তাহার উচিত হয় নাই।

পশুপতি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছিল। এ যেন নিষ্প্রভ অঙ্গারের মত! উহাকে স্পর্শ করিতে ভয় করে। মনে হইতেছিল, প্রথম যৌবনে ইহাকে পাইলে বোধকরি সে তাহার এই ঘৃণিত বিবাহ-ব্যবসায়টা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিত, জীবনের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ-দারিদ্র্যকে সে হাসিমুখে বরণ করিত। কিন্তু যাক্,—আজ আর সেকথা নয়।

তিগুণীর হাতে ধরিয়া পশুপতি তাহাকে বিছানায় বসাইল। আলোটা দুজনের পক্ষেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। পশুপতি নিজের হাতে লণ্ঠনটা নিভাইয়া দিয়া যেন খানিকটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

কিন্তু রাত্রির কথা প্রভাতে আর তাহার মনে রহিল না। তিগুণী উঠিয়া যাইতেছিল, পশুপতি খপ্ করিয়া বাঁহাত দিয়া তাহার আঁচলটা ধরিয়া ফেলিয়া, ডানহাতের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া টাকা যেমন করিয়া বাজায় তেমনি একটা ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আছে আছে কিছু তোমার কাছে ? না, সেদিক দিয়ে নমষ্পট্টং ?"

তিগুণী কোনো প্রকারেই তাহার হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না, ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়াই লজ্জায় সে অধোমুখে নিজের পায়ের দিকে তাকাইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না। দিদিকে বলব।"

"বলব নয়, এক্ষুনি—এক্ষুনি বল গিয়ে। বল মস্ত এক কন্যাদায়,—পঞ্চাশ ; না হয় ত' শেষ,—তিরিশ। তা যদি পারে ত' আমি তোমাদের বাঁধা হয়ে রইলাম। মাইরি!"

আঁচলটা ছাড়াইয়া লইয়া তিগুণী চলিয়া যাইতেছিল। পশুপতি আবার হাঁকিল, "শোনো!"

তিগুণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে মুখ ফিরাইল।

"উনি বুঝি আসবেন না ? ধরে নিয়ে আসতে পার ত' আমিই বলি।" বলিয়া একগাল হাসিয়া আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কথাটা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই তিগুণী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তেনানী আর আসে না! টাকার কথাটা তিগুণীরও বলিতে লজ্জা করে। রাত্রে দেখা হইবামাত্র পশুপতি জিজ্ঞাসা করে, "বলেছিলে ?"

তিগুণীর মুখ দিয়া ফস্ করিয়া একটা মিথ্যা কথা বাহির হইয়া পড়ে। বলে, "বলেছে—দেখব।"

পশুপতি বলে, "দেখব নয়। কাল তুমি চেয়ে নিয়ে এসো।"

তিগুণী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে তাহার সম্মতি জানায়।

বিন্দু-বৌ বলে, "আ-মর্! এ মিন্‌ষে মিছেমিছি বসে' কেন গা? বিদেয় করতে পার না যাহোক্ কিছু দিয়ে?"

তিনকড়ি বলে, "হাতে আমার একটি পয়সা নেই বিন্দু!"

বিন্দু-বৌ হাসিয়া বলে, "আমি দেব।"

কিন্তু তিনকড়ির মুখে হাসি ফুটে না। বলে, "পয়সাগুলো ঘাসের বীজ্? কুড়িয়ে পাওয়া যায়;—না?"

তাহার পর ধীরে-ধীরে চোখ টিপিয়া বলে, "চুপ করে' থাকো, আপনিই সরে' পড়বে একদিন।"

আশায় আশায় পশুপতির দিন কাটে।

পাঁচদিন কাটিল। কিন্তু আর নয়।

তেনানী সেদিন কি প্রয়োজনে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছে, পশুপতি ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ পশ্চাৎ দিক হইতে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

তেনানী চলিয়া যাইতে চায়, পশুপতি ছাড়ে না। বলে, "কই, দাও!"

"কী?"---তেনানী মুখ তুলিয়া কট্‌মট্ করিয়া চায়।

পশুপতি বলে, "টাকা! কেন, বোন তোমার বলেনি!"

রাগে ঘৃণায় তেনানীর মুখের চেহারা নিমেষেই অত্যন্ত কঠোর হইয়া ওঠে, বলে, "অনেক টাকা খাইয়েছি তোমায়,—আবার টাকা? লজ্জা করেনা?"

অনুনয়ের সুরে পশুপতি বলে, "সত্যি, মাইরি, ভারি বিপদে পড়েছি। হ্যাঁ, দিয়েছ, দিয়েছ বই-কি, দাওনি তা ত আর—"

তেনানী রুক্ষস্বরে জবাব দেয়, "ছাড়ো! ফের টাকা চেয়েছ কি, মুখে তোমার—" শেষের কথাটা সে আর উচ্চারণ করে না। পশুপতিকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া তেনানী ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

তবে আর আশা বুঝি নাই!

তিনকড়ির কাছে পশুপতি একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল।—"দাও ভাই কিছু? যৎসামান্য,—যা পার। আজ উঠব ভাবছি।"

তিনকড়ি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হায়, হায়, ভগবান এমনি মার মেরে' রেখেছেন আমায়, সে আর কি বলব পশু, বলা না বলা আমার দুই-ই সমান। একটি পয়সা নেই আমার কাছে ভাই, একটি আধলা পয়সা নেই! তবে ভগবান যদি দিন দেন কোনদিন, ত চাইতে হবে না,—আমি নিজে থেকেই পাঠিয়ে দেব তোমায়।......আজ উঠ্‌ছো? তা আজকার দিনটা......কিন্তু আবার এসো যেন! বাসনার সন্তানাদি হবে, অন্নপ্রাশনের চিঠি পেলেই......বুঝলে?...শ্রীহরি! শ্রীহরি!"

পড়্‌তা নেহাৎ মন্দ। মনে মনে তিনকড়িকে গালাগালি দিতে দিতে বেচারা খালি-হাতেই বিদায় হইয়া গেল।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত হইলেও আনন্দের—।

কিন্তু এই আনন্দের সংবাদটিকে লইয়া বিন্দু-বৌ তাহার সংসারটির মধ্যে ভয়ানক একটা নিরানন্দের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

সংবাদ এমন কিছুই নয়। তিগুণীর ছেলে হইবে,—এই সংবাদ।

বিন্দু-বৌএর তাহা সহ্য হইল না। তেনানীর সঞ্চিত অর্থগুলি যাহাতে বে-হাত হইয়া না যায় তাহার জন্য এতদিন ধরিয়া এত চেষ্টা এত অভিসন্ধি যে এমন করিয়া হঠাৎ একদিন ব্যর্থ হইয়া যাইবে তাহা সে ভুলিয়াও কোনোদিন ভাবিতে পারে নাই।

তিনকড়িকে বলিল, "হলোত"? হলোত' এবার? ভগ্নিপতিকে বসিয়ে রাখার সাধ মিট্‌লো ত? নাও এবার বোনের টাকা নেবে বল্‌ছিলে নাও!"

তিনকড়িও প্রমাদ গণিল, কিন্তু হাল ছাড়িল না। বলিল, "দাঁড়াও, আগে হোক্, বাঁচুক্, বড় হোক্,—বহুৎ দেরি! ভগবান আছেন মাথার ওপরে, দ্যাখ না কি হয়!"

"আ-র তোমার ভগমান! ভগমানের মুয়ে মারি ঝাঁটা!"

তাহার পর, এটা ওটা সেটা লইয়া প্রতিদিন তেনানীর সঙ্গে তাহার কথা কাটাকাটি চলিতে থাকে, একটা না একটা ছুতা লইয়া ঝগড়া-ঝাঁটি প্রায়ই হয়। এবং হয় যখন, তখন একেবারে চরমে গিয়া পৌঁছে। তিনকড়িও ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তাহাতে সায় দেয়।

শেষে একদিন এমন হইল যে, একেবারে ছায়া-কাটাকাটি! এ উহার ছায়া মাড়াইবে না, উহারাও যেন ইহাদের ছায়া না মাড়ায়।

ঝগড়ার সূত্রপাত হইয়াছিল অতি সামান্য ব্যাপার লইয়া। দিন-তিনেক আগে ঘাটে বাসন মাজিতে গিয়া তেনানীর হাত হইতে বাসনগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া দৈবাৎ পড়িয়া যায়। অনিষ্ট বিশেষ কিছুই হয় নাই, একটা কাঁসার বাটিতে একটুখানি চিড় খাইয়া গিয়াছিল মাত্র।

বিন্দু-বৌ তাহার অপমানের বাকি কিছুই রাখিল না। তেনানী তাহার দোষ স্বীকার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু এক পক্ষ চুপ করিয়া থাকিলে অপর পক্ষের সুবিধা বিশেষ কিছু হয় না। তাই বিন্দু-বৌ তাহার এই অন্যমনস্কতার একটা সন্তোষজনক কারণ আবিষ্কার করিয়া সকলের সমক্ষেই তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল।—হরিমতীর স্বামী আসিয়াছে, সেই যে ছুঁচলো দাড়িওয়ালা যাত্রার দলের মিনুষে,—মিনুষের স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়, এবং তাহারই সঙ্গে তেনানীর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ত' বহুদিন হইতে আছেই, এমন কি বোন্‌টাকেও সেইখানে ভিড়াইয়া দিয়া তাহার দাদার নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক বংশে একটা দুরপনেয় কলঙ্ক আনিয়া দিল। তাহারই কাছে মন যাহাদের চব্বিশ ঘণ্টা পড়িয়া থাকে, তাহারা অন্যমনস্ক হইয়া পুকুরের ঘাটে বাসন ভাঙিবে না ত' কি করিবে? ইহা শুধু তাহার মুখের কথা নয়, ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ সে বহুদিন পাইয়াছে, কিন্তু অনর্থক একটা কলঙ্কের ভয়ে এতদিন চুপ করিয়াই ছিল; আজ যখন বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি তাহাই ঢাকিবার জন্য গোপনে গোপনে লোক পাঠাইয়া টাকা ঘুষ দিয়া পশুপতিকে পর্য্যন্ত আনা হইল, তখন আর চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তেনানী একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল!—ঝগড়াটা রীতিমত পাকিয়া উঠিতে বেশি দেরি হইল না, এবং ক্রমশ হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া তিনকড়ি নিজেই উঠিয়া আসিয়া ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিল।—তেনানী তিগুণীকে কিছু চাল ও খানকতক বাসন দিয়া পৃথক করিয়া দেওয়া হইল।

তেনানী তিগুণী আলাদা থাকে, আলাদা আপনার রাঁধে, বাড়ে, খায়,—কোনোরকমে দুখ্-ভিখ্ করিয়া দিন চালায়। দাদা, বৌ, এমন কি বাসনার সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ। বাসনা লুকাইয়া লুকাইয়া পিসিদের সঙ্গে কথা কহিবার চেষ্টা করে, কিন্তু বাপ-মায়ের প্রচণ্ড শাসনের ভয়ে তাহা পারে না।

সুখে দুঃখে কয় মাস পার হইয়া গেল।

হঠাৎ রাত্রে সেদিন বাসনার প্রসবের ব্যথা জানাইল।

যাতনায় অস্থির হইয়া বাসনা ছট্‌ফট্ করিতেছিল। শরের ঝাঁপ্ ফেলিয়া চালার একপাশে আঁতুড় ঘর তৈরী হইয়াছে। বেশি দূরে নয়। তেনানী একবার দেখিতে গিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে কুকুর বিড়াল তাড়ানোর মত বিন্দু-বৌ তাহাকে দূর্‌দূর্ করিয়া তাড়াইয়া

দিয়াছে। সেই অবধি তেনানী তাহার ঘরের মেঝেয় বোনের কাছে চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, চোখে তাহার ঘুম আসিতেছিল না।

বাসনার চীৎকার কানে আসিতেই হঠাৎ সে ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

বাসনা ডাকিতেছে,—"পিসি! পিসি!"—

তাহার সে আর্ত্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর থাকা চলে না। তেনানী উঠিয়া দাঁড়াইল। তিগুণী পোয়াতি মেয়ে, একা ঘরে থাকিতে নাই, বলিল, "চল্ দিদি—আমিও যাই।"

দু'জনেই গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিল না।

ঝাঁপের ফাঁকে বিদু-বৌ দেখিতে পাইয়াছিল। সেইখান হইতেই শুনিতে পাওয়া গেল, "লজ্জাও ত' নেই মা! বেগায়া ছুঁড়িরা সব! আসিস্ ত' তোর ওই ভালবাসা-বোনের মাথা খাস্, বোনের পেটে যে আসছে তার মাথা খাস্!"

কিন্তু তেনানী তাহা পারে না। সুতরাং তাহাকে ফিরিতে হইল। তিগুণীও ফিরিল।

সারারাত আর কাহারও ঘুম হইল না। ঘরের চালায় বসিয়া সবই শুনিতে লাগিল, কিন্তু স্বচক্ষে দেখিতে কিছুই পাইল না। শুনিল, বাসনার একটি ছেলে হইল। মেয়ে নয়—ছেলে। সুন্দর ছোট্ট ছেলেটি! বিকলাঙ্গ নয়, কালো নয়, কুৎসিৎ নয়, চোখ, নাক, মুখ, হাত, পা,—মায়ের মত কিছুই হয় নাই, বাপের মত কোঁক্ড়ানো একমাথা কালো চুল, চলচলে চোখ,—ছেলের কান্নার শব্দ শোনা গেল। তেনানীর মনে হইতেছিল, বিদু-বৌএর গলাটা টিপিয়া তাহাকে ওইখানে শেষ করিয়া ছেলেটাকে একবার দেখিয়া আসে·········

কিন্তু ছেলে ত' দেখিতে পাইলই না; এমন কি বাসনাকে একটিবারের জন্য দেখিতে পাওয়ার সাধ হইল; কিন্তু তাহাও হইবার নয়। শুনিল, তাহার নাকি জ্বর হইয়াছে; প্রসবের পর হইতে সেই যে আঁতুড়-ঘরের মেঝের উপর গা এলাইয়া দিয়াছে, তাহার পর আর উঠিতে পারে নাই। লোকে নাকি ডাক্তার দেখাইবার পরামর্শ দিতেছে।

দুপুরে ছেলে দেখিবার জন্য ভোলানাথের মা আসিয়াছিল,—বিধবা বোন ভানুমতী আসিয়াছিল। চার আনা পয়সা হাতে দিয়া ঠান্‌দিদি তার নাতি দেখিয়া গেছে।

যাবার পথে ভানুমতী একবার তেনানীর সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। বলিল, "দেখা পেলাম না যে তোমার দাদাটির! দেখ্‌তে পেলে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে যেতাম!...কেন, হরিমতীর ইয়ে আবার কোন্ যুগ্যের মানুষ মা, যে, তার কাছে যেতে হবে?......শুনেছি মা, সবই শুনেছি। এপাড়া-ওপাড়া হলেও কথা কখনও চাপা থাকে না।"

লজ্জায় তেনানীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। কিন্তু প্রতিবাদ করিল না, একটি কথাও বলিল না। চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া পা মেলিয়া বসিয়াছিল; সুন্দর সুডৌল নিজের পা-দুইটির দিকে

একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল মাত্র। খানিক্‌ক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "ভোলানাথের খবর কিছু পাস্‌নি ভানু ?"

ভানুমতী বলিল, "ওই ছাখো! তোমরাও শুনেছ তা হ'লে? কিন্তু ওসব গুজব, মা, গুজব। কি শুনেছ বল ত ?"

তেনানী অবাক হইয়া গেল। বলিল, "কই কিছুই ত' শুনি নি!"

ভানুমতী বলিল, "বলছে সব,—গাঁয়ে নাকি তিন-চারজন পুলিশ এসেছিল, কনেষ্টোবল্ এসেছিল। কিন্তু কই আমরা ত' কিছুই দেখ্‌তে পাইনি মা, চব্বিশঘণ্টা বাইরে বাইরেই ত' থাকি।"

তাহার পর আবার বলিল, "ভোলানাথ মুখুজ্যের ঘর খুঁজ্‌ছিল। ঘরে কে কে আছে, কখন আসে, স্বভাব চরিত্তি কেমন, এই সব কথা নাকি শুধিয়ে গেছে।—তা, অন্য ভোলানাথ হতেও পারে। আমাদের ভোলানাথ তাই-বা কে বল্‌লে মা! কত গাঁয়ে কত ভোলানাথ আছে!"

তেনানী বলিল, "কেন, কি হয়েছিল, কি করেছিল কি ?"

"কে জানে মা, লোকে বলছে তাই শুন্‌ছি। বলে কিনা, কোথাকার একটি খুব সুন্দরী মেয়ে বার করে' নিয়ে পালাচ্ছিল, পথে ধরা পড়েছে, তারই নাকি মকদ্দমা চল্‌ছে কলকতায়। ......কিন্তু হ্যাঁ মা, এত সব যদি হবে ত' আমরা জানব না কেন? ওই সব দারোগা-টারোগা কি আর আমাদের না শুধিয়ে যেতো কখনও? হ্যাঁ মা, কই তুমিই বল দেখি ?"

তেনানী অবিশ্বাস করিল না। হয়ত বা হইতেও পারে! তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

বাসনার জ্বর ছাড়িয়া বিকার হইল, বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল, চুল ছিঁড়িতে লাগিল, আরও কত কি যে করিতে লাগিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কেহ বলে, ডাক্তার দেখাও, কেহ বলে, ভূতে পাইয়াছে।

ক্রোশ পাঁচছয়ের ভিতর ডাক্তার কোথাও নাই। শহর হইতে আনিতে গেলে খরচ অনেক। ভূতে পাওয়ার কথাটাই তিনকড়ির ঠিক মনে ধরিয়া গেল।

বুধপুর হইতে ওঝা আসিল।

তিনকড়ি একটি পাথরের বাটিতে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত-জল একটুখানি খাওয়াইয়া দিয়া বলিল, "সারে ত' এতেই সারবে, আর না সারে ত' হাতী বেঁধে দিলেও নয়।"

কিন্তু ওঝাও সারাইতে পারিল না, চরণামৃতেও সারিল না।

পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় আপনা হইতেই বাসনার সমস্ত যন্ত্রণা ধীরে-ধীরে ঠাণ্ডা হইয়া আসিতে লাগিল। শেষ ধাক্কা সামলাইতে গিয়া চোখের তারা দুইটা উল্টাইয়া ফেলিল, চোয়ালের পাশ দিয়া খানিকটা জিব তাহার বাহির হইয়াই রহিল। গা, হাত, পা, বরফের মত ঠাণ্ডা—হিম। ডাকিয়াও কেহ সাড়া পাইল না।

ঘরে একটা কান্নাকাটির রব উঠিল।

তিনকড়ি কাঁদিল। বিন্দু-বৌ গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

বাসনা মরিয়াছে শুনিয়া তেনানী তিগুণীর রাঁধা ভাত সেদিন পড়িয়া রহিল।

তেনানীর কান্না কিছুতেই আর থামিতে চায় না।

নীরবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদে, আর একবার করিয়া সেইখানে ছুটিয়া ছুটিয়া যাইতে চায়। তিগুণী তাহার হাতে ধরিয়া বসাইয়া রাখে। বলে, "না দিদি বৌএর মুখ আর দেখিস্‌নে।" বলে, "বাসনাকে জীয়ন্ত দেখতে দিলে না, মরা দেখে' আর হবে ছাই!"

সত্য কথা। যে অপবাদ বিন্দু-বৌ তাহাদের দিয়াছে,—তাহার মুখ আর না দেখাই উচিত। দেখিতে ইচ্ছাও নাই। কিন্তু বাসনা......হায় হায়—

তেনানী তাহার মরা মুখখানি দেখিবার জন্যই বোধকরি ছট্ ফট্ করিতে থাকে।

কিন্তু এক উঠানে মানুষ মরিয়াছে, তাহার উপরে ভাইঝি,—পোয়াতিকে চোখে চোখে রাখিতে হয়।

তিগুণীকে লইয়া তেনানী বেড়াইতে যায়। ইহার উহার ঘরে বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়। গল্প করে, কাজ করিয়া দেয়, আর বাসনার কথা উঠিলেই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদে।

লোকে বলে, "ছেলেটি কেমন হয়েছে তেনানী? আহা, তবু ওই গুঁড়োটুকু বেঁচে থাক্! তবু মায়ের নাম রইবে।"

তেনানী চুপ করিয়া থাকে।

নানান্ লোকে নানান্ কথা বলিতে ছাড়ে না।

বলে, "আঁতুড়ের পোয়াতি মলে শাঁকচুন্নি হয়। আমরা দেখেছি।" কেহ বলে, "ছেলের মায়া কি ছাড়তে পারে মা,—দিনরাত ওই ছেলের কাছে কাছে ঘুরে বেড়ায়।"

কেহ বা হাত পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসে।—"আমাদের জানা কথা মা,—আমাদের গাঁয়ে, শোনো তবে, এক জা আর এক ননদ; একই বয়েস,—খুব ভাব দুজনে। দুজনেই পোয়াতি। প্রথম পোয়াতি,—ভারি ভয়। দুজনে চান্ করতে গেল। চান করতে গিয়ে পুকুরের ঘাটে বলাবলি হলো। এ বললে, তুই যদি ভাই মরিস্ ত, আমায় ডাকিস্, আমি মরলে তোকে ডাকব। বাস্, ঠিক তাই! অবাক্ মা, আমরা ত' অবাক্!" বলিয়া গালে হাত দেয়। দিয়া বলে, "হুঁ, তাই গেল মা। এ গেল একদিনে,—ও গেল একদিনে।"

তেনানী যাহা ভয় করে, তিগুণী যাহা শুনিতে চায় না, যাহার জন্য ঘরে বাস নাই,—টকের ভয়ে পালাইয়া আসিয়া তেঁতুল-তলায় বাসা বাঁধিয়াছে।

তেনানীকে সকলে সাবধান করিয়া দেয়।—"দেখিস্ মা, চোখে চোখে রাখিস্ যেন।"

তিগুণীকে বলে, "ভয় কি ? ভয় তোমার কিসের ?"

দুঃখের দিনে হাসি আসে না, তিগুণী তাই চুপ করিয়া শোনে।

শৈশবের সঙ্গী বাসনা যেন তাহার চোখের সুমুখে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসে।

বেশি দিন নয়,— দিন দুই তিন পরে।

প্রদীপ জ্বালিয়া তেনানী বাহিরের দুয়ারের কাছে সন্ধ্যা দেখাইতে গেল। তিগুণী তখন হেঁসেলের কলসি হইতে জল গড়াইয়া খাইতেছিল।

হঠাৎ কি একটা শব্দ হইতেই তিগুণী একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে,—প্রদীপের স্বল্পালোকে ভাল দেখাও যায় না,—অতি জীর্ণ মলিন একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া বাসনা দাঁড়াইয়া আছে। সে'ও যেন হাত বাড়াইয়া জল খাইতে চায়।

চম্ করিয়া মাথাটা তাহার ঘুরিয়া গেল ; গেলাসটা হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া তিগুণী ছুটিয়া পলাইতে যাইবে, পিতলের একটা জলভর্ত্তি কল্‌সির গায়ে পা ঠেকিয়া টাল্ খাইয়া উপুড় হইয়া পড়িল. অস্ফুটকণ্ঠে চোখ বুজিয়াই একবার ডাকিল,—দিদি ! মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, পেটের যন্ত্রণায় তখন সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। গল্ গল্ করিয়া কাঁচা রক্ত ভাঙিয়া কাপড়টা তাহার ভিজিয়া যাইতেছিল।

তেনানী আসিয়া দেখে— সর্ব্বনাশ !

তিগুণী বলে, "পড়ে গেলাম দিদি।"

তেনানী থর্ থর্ করিয়া কাঁপে, আর শুধায়, "হাঁরে ভয়-টয় কিছু—?"

যন্ত্রণায় তিগুণী আর কথা বলিতে পারে না। ঘাড় নাড়িয়া জানায় যে, না—সে সব কিছু নয়।

কিন্তু একা এ বিপদ সে সামলায় কেমন করিয়া ?

কাঁদিয়া-কাটিয়া ছুটাছুটি করিয়া তেনানী পাড়ার মেয়ে জড়ো করিয়া ফেলিল।

কেহ বলিল, "জল দাও।"

কেহ বলিল, "সেক্ ..."

কেহ বলিল, "কিছুই করতে হবে না .."

কেহ বলিল, "কাঁদিসনে মা, ছেলে হবে।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রাত্রে তেনানী দু'চার জন পাড়া-পড়শীর হাতে ধরিয়া, কাঁদিয়া, খোসামুদি করিয়া, তাহার কাছে রাখিল। সারারাত ধরিয়া আগুনের সেক্ চলিতে লাগিল।

লোকে বলে, "আচ্ছা বৌ, আর আচ্ছা দাদা যাহোক্! আচ্ছা গন্ড ছিল মা তোমার মায়ের!"

পরদিন বেলা তখন প্রায় দশটা। তিগুণী এপাশ-ওপাশ করে, দিদির মুখের পানে এক-দৃষ্টে তাকায়, আর দু' চোখের কোণ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়ে,—সোজা সত্য কথাটা তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত আগাইয়া আসে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই সে বলিতে পারে না।

বলিল যখন—তখন প্রায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। তেনানীর কোলে মাথা রাখিয়া হাতখানা তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তিগুণী ডাকিল, "দিদি!"

চোখের জলে দিদির চোখের দৃষ্টি তখন ঝাপসা হইয়া গেছে।

অতিকষ্টে তিগুণী বলিল, "আমি আর বাঁচব না দিদি।" বলিয়া ঘন ঘন সে তাহার মাথাটা এপাশ-ওপাশ করিয়া নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ চুপ করিল।

দিব্য সজ্ঞানে কথা কহিতে কহিতে তিগুণী মরিয়া গেল।

মাথাটাকে বারকয়েক নাড়িয়া চাড়িয়া, তুলিয়া ধরিয়া, চুমা খাইয়া, কথা কহিয়া, তেনানী কোনপ্রকারেই যখন আর তাহাকে কথা কহাইতে পারিল না, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া গিয়া তিনকড়ির পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল।—"ওগো দাদা গো—একবার দেখে যাও গো!"

বিন্দু-বৌ বলিল, "ওমা একি জ্বালা গা! বোনকে আজ ডাক্তার দেখাতে হবে তাই ছুটে এসেছেন গরবী—"

কথাটা সত্য। কিন্তু এতদিন তিনকড়ি কিছু বলিবার সুযোগ পায় নাই। আজ সে হঠাৎ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তেনানীকে গালাগালি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং ডাক্তার দেখাইবার প্রসঙ্গটা এড়াইবার জন্য সেখান হইতে খানিকটা সরিয়া গিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "ডাক্তার! ডাক্তার না আরো কিছু! পয়সা দেখেছেন সব—আমার পয়সা দেখেছেন।"

কিন্তু ডাক্তার দেখাইবার প্রয়োজন তখন আর নাই, পয়সা দেখিবার জন্যও নয়,—তিগুণী যে মরিয়াছে, কথাটা তিনকড়ির জানিতে বেশি বিলম্ব হইল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তেনানী ত' জানাইয়া দিলই,—কান্না শুনিয়া পাড়ার কয়েকটা মেয়ে ছেলেও আসিয়া জড়ো হইল।

তিনকড়ির রাগ তখন খানিকটা পড়িয়াছে।

যাহা করিবার তাহাকেই সব করিতে হইল। লোকজন ডাকিতে কাঠ-কয়লার জোগাড় করিতেই বেলা পড়িয়া গেল। তাহার পর তিগুণীকে বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ঘর হইতে যখন বাহির করিল, তখন সন্ধ্যা।

কিন্তু একই ঘরে দুইটা মেয়ে এমন করিয়া আগে-পিছে মরিয়া যাওয়া,—এমন কাণ্ড

প্রায়ই ঘটে না। গ্রামের লোক তাহার বাড়ীর পাশে প্রকাণ্ড ঐ নিম গাছটার দোষ দেয়। দেবতার আশ্রয়—অত বড় নিমের গাছ—তিনকড়ি এত বুদ্ধিমান হইয়াও উহাকে যে কেন এতদিন কাটিয়া ফেলে নাই কে জানে!

দুইটি মানুষের অভাবেই ঘর যেন শ্মশান!

তেনানী আর বিদু-বৌ—দুজনে আজকাল আবার একসঙ্গেই থাকে বটে, কিন্তু কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। তিনকড়ি বাহিরে বাহিরেই কাটায়।

বিদু-বৌ তাহার নাতির নাম রাখিয়াছে—দুখিরাম; দুখু বলিয়া ডাকে। দু'মাসের ছেলে —গাইএর দুধে মায়ের দুধের পিপাসা মিটে না,—ছেলেটা তাই হাঁ হাঁ করিয়া এদিক-ওদিক চায় আর কাঁদে; আবার কখন্ আপনা হইতেই আঙুল চুষিতে চুষিতে ঘুমাইয়া পড়ে।

তিনকড়ি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিদু-বৌকে বুঝাইয়া বলে, "ভগবানের ইচ্ছায় সবই ত' হলো বিদু-বৌ! বলেছিলাম সবই হলো। তেনানীর টাকা সেই আমার কাছেই ফিরে এলো ছাখো! যাবার মধ্যে গেল শুধু আমার মেয়েটা।..তবু যাহোক্ একটা চিহ্ন রেখে গেছে, এই যা সান্ত্বনা।"

বিদু-বৌ কাঁদিয়া, দুঃখ করিয়া বলে, "কিন্তু ধন্যি পাষাণ তোমার ওই বোনটি যাহোক্! বাসনা মলো ত' একবার দেখতে পর্য্যন্ত এলো না! এখন আবার খোসামুদি করে আসে দুখিরামকে নিতে। আমি বলি,—না, তোর অত সোয়াগে কাজ নেই বোন।"

তিনকড়ি বলে, "দিয়ো না, দিয়ো না। জব্দ হোক্।"

সস্তায় একটি গাইএর সন্ধানে কয়েক দিন হইতে তিনকড়ি খুব হাঁটাহাঁটি করিতেছিল। সেদিন কি একটা দূরের গ্রামে গিয়া রাত্রে আর ফিরিতে পারে নাই।

বেলা প্রায় দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বিদু-বৌ মাথা চাপড়াইয়া বুক চাপ্ড়াইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

শুনিল, দুখিরামকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গত রাত্রে বিদু-বৌ যখন ঘুমাইতেছিল, সেই অবসরে ছেলেটাকে চুরি করিয়া লইয়া তেনানী কোথায় চলিয়া গেছে, কেহ তাহার কোনও সন্ধান দিতে পারিতেছে না। এবং শুধু ছেলে নয়, রাজু বাউরির কাছে ছাগলের দরুণ আড়াইটি টাকা ছাড়া তেনানীর সঞ্চিত যাহা কিছু—কিছুই সে এখানে রাখিয়া যায় নাই।

"হা ভগবান!" বলিয়া তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিল, এবং চোখের তারা দুইটা উল্টাইয়া মাথার উপরে শূন্য বায়ুস্তরের মধ্যে কাছাকাছি কোথাও ভগবানের সন্ধান করিতে লাগিল বোধ হয়।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নীহারিকা

না জানি সে কোন্ সৃজন উষায়
রাঙা আলো উৎসুক
অন্ধকারের অচিন্ মুকুরে
গোপনে হেরিল মুখ !
কি জানি কি ভেবে বুক হ'তে তার
দীর্ঘশ্বাস উঠে'
আলোর ব্যথায় কালো দর্পণে
নীহার বিন্দু ফুটে !
তাই নিশীথের গগনে গগনে
অশ্রু-বাষ্পে লিখা,
সৃজন-উষার প্রথম বেদন
নীহারিকা নীহারিকা।

তাই আজও হায় ঊষায় ঊষায়
আলো-আঁধারের কূলে
ভেসে-ফুটে-ওঠা ফুলের নয়নে
নীহার-অশ্রু জলে !
সন্ধ্যায় পুন উদাস আকাশে
আশার আভাস ভাসে,
অকূল ঘুমের নিঝুম অতলে
সোনার স্বপন হাসে !
দূরে দূরে জ্বলে আঁধারের তলে
তুষার-শীতল শিখা,
গগন-মরুর মরীচিকা মালা—
নীহারিকা নীহারিকা।

অরূপ তিমিরে পুলকাঞ্চিত
প্রথম রূপের পরী,—
আলো-ছায়া-আঁকা আধ-ঘুমে মাখা
নবজাগা অপ্সরী !
ধূপধূমছায়ে রূপের শিখাটি
ঝাঁপি রাখি' অঞ্চলে
কোন্ অপরূপ রূপের আশায়
জাগিছ আকাশ-তলে ?
প্রলয়ক্লান্ত শঙ্কর ভালে
পড়িল চাঁদের টীকা,
অরূপ সায়রে রূপ ছায়াছবি—
নীহারিকা নীহারিকা !

ভ্রমণ-শ্রান্ত জগতের পথে
তুমি আজও গতিহীন ;
যত টানাটানি, তত ঠেলাঠেলি,
স্থির তুমি অমলিন !
ভাবের প্রভাতে অরুণের রথ
তোমারি ছায়ায় থামে,
তোমারে পরশি' আলোর প্রদোষ
আঁধারবক্ষে নামে ;
মরণ-কৃষ্ণ জীবন সাগরে
অয়ি দিগ্‌বর্ত্তিকা !
রজনীর ঊষা, দিনের সন্ধ্যা—
নীহারিকা নীহারিকা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

বিচার

সব তদ্বির শেষ হ'য়ে গেছে। জেলারবাবু আমাকে নেহাৎ পীড়াপীড়ি ক'রে লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত সই ক'রতে ব'লেছিলেন ; বেচারার আমার উপর যে দরদ, তাতে আমি তাকে' না' ব'লতে পারিনি। তিনিই দরখাস্ত লিখে এনেছিলেন, ছাইভস্ম কি লিখেছিলেন তিনিই জানেন—আমি সুধু সই ক'রেছিলাম।

এর আগে তিনিই আমাকে জবরদস্তি ক'রে হাইকোর্টে আপীল করিয়েছিলেন, আমার পক্ষে একজন বড় উকীলও নিযুক্ত ক'রেছিলেন।

কিছুতেই কিছু হ'ল না। নিস্তারিণীর স্বামী সঞ্জীবকে খুন করার অপরাধে আমার ফাঁসির হুকুম হ'য়েছে। কাল আমার ফাঁসি। বেচারা জেলার বড় হতাশ হয়েছে—আজ আমার সামনে কেঁদেই ফেলেছিল।

লোকটার কি জানি কেন স্থির বিশ্বাস হ'য়েছে যে আমি সুধু নির্দ্দোষ নই, আমি মহাপুরুষ—কি জানি কোন কারণে মিথ্যা অভিযোগে চরম শাস্তি গ্রহণ ক'রছি।

মহাপুরুষ আমি নই, কোনও জন্মে ছিলামও না ; কিন্তু আমি যে এ খুনের দায়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ তার সে অটল বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য। সেদিন ভদ্রলোক আমার পায়ের ধূলো নিতে গিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়লেন। আমি তাকে তাড়াতাড়ি হাতে ধ'রে তুলে বল্লাম, "এ কি ক'রছেন বাবু, আমি খুনী আসামী—আপনার একি দুর্ব্বলতা।"

খুব জোর ক'রে তিনি ব'ল্লেন, "আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দিলেও আমি স্বীকার করবো না যে তুমি খুনী বা পাপী। অনেক অপরাধী জীবনে দেখেছি, অপরাধী দেখলে চিনতে পারি—মহাপুরুষও দু'একজন দেখেছি, মহাপুরুষকেও চিনতে পারি।—তুমি মহাপুরুষ।"

আমি হেসে বল্লাম, "এমন অদ্ভুত বিশ্বাস আপনার কিসে হ'ল বলুন দেখি? আমি নিজে বলছি আমি খুনী—আদালতের বিচারে জুরারা একবাক্যে ব'লেছে আমি খুনী—হাইকোর্ট থেকে লাটসাহেব পর্য্যন্ত এ সিদ্ধান্ত হ'য়ে গেছে, আর কথাটা সত্য, তবু বিশ্বাস ক'রছেন না কেন বলুন দেখি।"

তিনি ব'ল্লেন, "যে দিন তুমি জেলে এলে সেই দিন থেকে আমার বিশ্বাস তুমি নির্দ্দোষ—কিন্তু বুঝতে পারি নি কেন তুমি ডেপুটির কাছে একরার ক'রেছিলে। তারপর দায়রায় তোমার বিচার দেখলাম, শুনলাম—তুমি একটি সাক্ষীকেও জেরায় একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে বললে না—নিজের দোষ ক্ষালন করবার জন্য একটি কথা বল্লে না—তখন বুঝলাম, এ এক মহাপুরুষের লীলা, সাধারণ মানুষের বোঝা অসাধ্য! তারপর তোমাকে রোজ তিন বেলা

দেখছি—এমন প্রশান্ত মূর্ত্তি, দিনরাত ভগবানের ধ্যানে এমন তন্ময়, এমন প্রসন্ন মুখ, আসন্ন মৃত্যুর সম্বন্ধে এত নিরুদ্বেগ, এ মহাপুরুষ নইলে হয় না।”

“এতদিন কয়েদী ঘেঁটে কি এই শিখলেন জেলার বাবু? দেখেন নি কি কখনও যে খুনী আসামী অম্লান বদনে ফাঁসি কাঠে ওঠে।”

“দেখেছি, কিন্তু সে এক ভাব, আর এ এক ভাব। তারা যায়, তাদের অন্তর কাঠের মত হ'য়ে গেছে বলে -দুঃখ-বোধ তাদের স্তব্ধ হ'য়ে গেছে ব'লে। কিন্তু তুমি তো কাঠ নও, তুমি মানুষ! তোমার অন্তর সরস—তোমার হাসিমুখের মধ্যে এক ফোঁটা মেকী নেই! তোমার প্রশান্ত মুখ দেখলে বুঝতে পারা যায় যে তুমি দেখছো ফাঁসী কাঠের ওপারে অন্তহীন আনন্দ তোমার প্রতীক্ষা ক'রছে।”

আমি হেসে ব'ল্লাম, “নারায়ণ! নারায়ণ! আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা! তাই যেন হয়। কিন্তু আপনার মন থেকে এ সব বিশ্বাস দূর করুন। আমি মহাপুরুষ নই—সত্যি সত্যিই খুনে, মহা পাপিষ্ঠ!”

“একথা এমনি ক'রে কোন খুনী আসামী কোনও দিন বলে না ফাঁসী কাঠে ওঠবার সময়! তুমি সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা ক'রে গেলে কিন্তু আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমি তোমায় চিনেছি।”

নারায়ণ! নারায়ণ! কি ভুল লোকের! সত্যি কথা বল্লে এরা বিশ্বাস ক'রতে চায় না, মিথ্যেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে।

এ খুন আমি করিনি সত্যি, কিন্তু খুনী আমি,—আমার খুনের জন্য অন্য লোকের ফাঁসী হ'য়ে গেছে। তাই বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে অপরের খুনের অপরাধে আজ আমার ফাঁসি হ'চ্ছে। কি সূক্ষ্ম বিচার!

ভদ্রলোকের ঘরে আমার জন্ম। লেখাপড়া বেশী শিখিনি, বিশেষ দরকার ছিল না ব'লে,—খাওয়া-পরার কোনও অভাব তো নেই।

কাজেই ছেলে বয়েস থেকেই মতিগতি গেল কেবল ফূর্ত্তির দিকে। পাপের মনোরম পথে ধাপে-ধাপে অগ্রসর হ'য়ে আজ এসে পৌঁছেছি এই খানে।

শরীরে শক্তির চর্চ্চাটা ক'রেছিলাম। আমার মত পালোয়ান, কুস্তিগির এ অঞ্চলে কেউ নেই—এইটাই ছিল আমার স্পর্দ্ধা। দুঃসাহসের তাই আমার অন্ত ছিল না। কোনও একটা শক্ত কাজ, শক্তির পরিচয়ের কোনও অবসর হাতে এলে আমি তার ভিতর ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ক'রতাম না। এমনি ক'রে আমি গ্রামের মধ্যে একটা ভয়ানক দুরন্ত ও দুর্দ্ধর্ষ লোক হ'য়ে উঠেছিলাম।

আমার এক ইয়ার একদিন আমাকে গোপনে বল্লে, এক গোয়ালার ঘরে এক সুন্দরী

বউ আছে—তাকে কিছুতেই বাগানো যায়নি ব'লে সে তাকে রাত্রে চুরি ক'রে নেবে স্থির ক'রেছে। বল্লে, গোয়ালারা বড় ভয়ানক ষণ্ডা, একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধালে মুস্কিল হবে! তাদের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারে এমন পালোয়ান কেউ নেই।

আমার মুখের সামনে আর একজন লোককে শক্তিমান বল্লেই আমার মনটা তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠতো। আমি তাই বল্লাম, "ওঃ ভারীতো পালোয়ান, তাদের তোর এত ভয়! আমি একা ওদের দশটাকে ঘায়েল ক'রতে পারি।"

ইয়ার বল্লে, "ইস, কত বড় সাহস দেখি চলনা একবার আমার সঙ্গে!"

আর ব'লতে হ'ল না। আমি গেলাম, আর বল্লাম, আর কাউকে সঙ্গে নিতে আমি দেব না, আমি একা যাব তার সঙ্গে।

রাতে গিয়ে আমি বন্ধুর সব ফিকির-ফন্দী উড়িয়ে দিয়ে সোজা গয়লার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলাম। আগুনটা একটু ধ'রে উঠতেই গয়লা আর তার বউ হাঁউ মাউ ক'রে বেরিয়ে এলো।

ইয়ার আমার ওৎ পেতে ছিল, বউটা বের হতেই তাকে জাপটে ধরে কাঁধে ফেলে ছুট দিলে। গয়লা লাঠি নিয়ে তাড়া করতে আমি তাকে জাপটে ধ'রলাম। খানিকক্ষণ জাপটাজাপটি ধ্বস্তাধ্বস্তির পর আমি তাকে খুব কায়দা ক'রে ধরে আগুনের একেবারে ভিতরে ফেলে দিলাম। লোকজন তখন এসে প'ড়েছে—আমি লাঠি হাতে ছুটলাম—আর তিনটাকে কারি জখম ক'রে পালিয়ে গেলাম।

আমার গালপাট্টা বাঁধা ছিল, গায়ে একটা অদ্ভুত রকম জামা ছিল- কেউ আমায় চিনতে পারলে না।

আমার ইয়ার কিন্তু ধরা পড়লো। বউটাকে কেউ খুঁজে পেলে না, কিন্তু যা সাক্ষী-প্রমাণ পাওয়া গেল তাতেই আমার ইয়ারের ফাঁসী হয়ে গেল ওই গয়লাকে পুড়িয়ে মারবার অপরাধে।

মোকদ্দমার তদন্ত যতদিন হ'চ্ছিল ততদিন একটা উদ্বেগ ছিল প্রাণে। ফাঁসীটা হ'য়ে গেলে আমি নিশ্চিন্তমনে গয়লা বউকে দখল ক'রে ব'সলাম -কেউ কোনও উপদ্রব ক'রলে না।

গয়লা বউয়ের আগেও অনেকে ছিল, পরেও অনেকে হ'য়েছিল। কারও জন্য আমার এতটা বেগ পেতে হয় নি।

নিস্তারিণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয় এর বছর দশেক পরে। সে ভদ্রলোকের মেয়ে, ব্রাহ্মণী। আমার সঙ্গে একটু দূর সম্পর্কও আছে।

অনেক দিন সে আমাকে এড়িয়ে ছিল, কিন্তু শেষ তাকে ধরা দিতেই হল। আমি

তার চারদিক দিয়ে এমন ক'রে ঘিরে ছিলাম, এত প্রলোভনে তাকে ফেলেছিলাম যে তার ধরা না দিয়ে উপায় ছিল না!

শেষ যখন সে ধরা দিল তখন একেবারে আমাতে সে ডুবে গেল। সে আমার জন্য ঠিক পাগল হ'য়ে উঠলো। ক্রমে তার লজ্জা সরমও ছুটে গেল। দুঃসাহসের তার অন্ত ছিল না—ধরা পড়বার ভয় সে বড় ক'রতো না, যদিও আমি করতাম, তার মান-সম্ভ্রমের খাতিরে। অত লোক-ভরা বাড়ী, তার ভিতর থেকে সে অনেক দিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে পালিয়ে আসতো আমার বজরায়। আমি বলতাম, "এ কি দুঃসাহস তোমার! ফিরে যাও!" সে হেসে গড়িয়ে প'ড়তো আমার কোলের উপর।

নিস্তারিণীর স্বামী কলকাতায় চাকরী করে, ডেলী প্যাসেঞ্জার, কাজেই তার কাছে ধরা পড়বার আশঙ্কা ছিল কম। কিন্তু শেষে নিস্তারিণী ধরা পড়ে গেল তারই কাছে।

দ্বিপ্রহর রাত্রে নিস্তার আমাকে যেতে ব'লেছিল—তার স্বামীর সে রাত্রে না ফেরবার কথা!

আমি যখন গেলাম, তখন নিস্তার দুয়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে, যেন ছট্‌ফট্‌ ক'রছে আমার আস্‌বার জন্য। এমন সে প্রায়ই ক'রে। আমার যখন যাবার কথা, তার একঘণ্টা আগে থেকে সে পাগলের মত ঘর বাহির ছুটাছুটি করে।

আমি যেতেই সে আমাকে সাপটে ধ'রে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল—তার সর্ব্বাঙ্গ তখন থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছে!

ঘরের ভিতর ঢুকে তাড়াতাড়ি সে খিল এঁটে দিলে—ঘর একদম অন্ধকার।

তারপর সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকে মাথা রেখে কেবলি ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—আর তার সারা অঙ্গ ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল।

আমি অবাক্‌ হ'য়ে গেলাম—কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অনেক নারীর সঙ্গে আমি সম্ভাষণ ক'রেছি। কিন্তু এক নিস্তারিণীকেই আমি সত্য সত্যই ভালবেসেছিলাম। তার কান্নায় আমার মনটা আকুল হ'য়ে গেল। আমি তাকে আদর ক'রে, সোহাগ ক'রে সুস্থ করতে চেষ্টা ক'রলাম—বার বার জিজ্ঞাসা ক'রলাম কি হ'য়েছে—সে কোনও উত্তর দিতে পারলে না!—

অনেকক্ষণ পর সে সুধু বল্লে, "সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

আমি বল্লাম "কি হয়েছে?"

সে ঘরের অপর দিকে আঙ্গুল দিয়ে বল্লে "ঐ দেখ।"

ব'লেই সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে একেবারে দেয়াল ঘেঁসে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

আমি কিছুই আন্দাজ ক'রতে পারলাম না। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালতেই

দেখলাম—বীভৎস দৃশ্য! নিস্তারিণীর স্বামীর রক্তাক্ত দেহ খাবার আসনের উপর লুটিয়ে পড়েছে, সামনে তার বাড়া ভাত রক্তাক্ত ও এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে!

আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল! আর একটা দেশলায়ের কাটি জ্বাললাম। ভাল করে দেখলাম। একটা খাঁড়ার ঘায় তার দেহটা প্রায় দুখণ্ড হয়ে গেছে।

খুন আমিও একদিন ক'রেছিলাম, কিন্তু এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না! দেশলায়ের কাটি ফেলে দিলাম—ঘরটা অন্ধকার হ'লে তবে একটু সুস্থির হ'য়ে ফিরতে পারলাম।

খুব চাপা গলায় নিস্তারিণীকে বল্লাম, "একি? এ কে কল্লে?"

নিস্তারিণী আবার আমাকে খুব জোর ক'রে চেপে ধরলো—ভয়ানক কাঁদতে লাগলো—কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"আমার জ্ঞান ছিল না, কেন কি ক'রেছি জানি না—ক্ষেপে গিয়েছিলাম—সব তোমারই জন্যে।"

এমনি সব টুকরো-টুকরো কথা জোড়া দিয়ে যে খবরের আঁচ পেলাম তাতে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত হঠাৎ কেঁপে উঠলো! —আমি তাকে জোর করে দুহাত চেপে সামনে ধরে দাঁড় করালাম—তাকে খুব একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লাম—"তুমি কি বলছো! তুমি খুন ক'রেছ?"

সে যেন আমার কথায় ভয় পেয়ে গেল। তার কান্না হঠাৎ থেমে গেল—সে চকিত দৃষ্টিতে একবার চেয়ে স্তব্ধভাবে সুধু বল্লে "হাঁ"।

আমি তাকে ছেড়ে দিলাম—সে ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

আমি আবার তার হাত চেপে ধ'রে বল্লাম, "আমার জন্য তুমি এ-কাজ ক'রেছ?"

সে বল্লে, "হাঁ"।

নিস্তারিণীকে আমি বড় ভাল বেসেছিলাম,—ভেবেছিলাম, তাকে ছেড়ে আমি কোনও দিন থাকতে পারবো না। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে আমার অন্তরের সব ভালবাসা এক নিমিষে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। আমার চ'খে সে একটা কদর্য্য ক্রিমির মত অস্পৃশ্য ঘৃণাস্পদ হ'য়ে দাঁড়াল।

জীবনে বিবেকের সঙ্গে আমার এই প্রথম পরিচয়। কোনও দিন পাপ-পুণ্যের বিচার করিনি, পাপ বলে কোনও কাজ কোনও দিন জানি নি। আজ প্রথম মনের ভিতর একটা নূতন আলো জ্বলে উঠলো, আমি দেখতে পেলাম—পাপের বীভৎস মূর্ত্তি!

শিউরে উঠলাম, ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'লাম—সরে দাঁড়ালাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "পাপিষ্ঠা!"

আমার ভাব দেখে আর কথা শুনে নিস্তারিণী হঠাৎ আত্মস্থ হ'য়ে উঠলো—নূতন ভয়ে সে আগের ভয় ভুলে গেল। সে বল্লে, "আর যে যাই বলুক, তুমি এ কথা বলো না। আমি যা ক'রেছি—সে যে তোমারই জন্যে; তুমি আমায় রক্ষা কর।"—ব'লে সে কেঁদে ফেল্লে।

যার একটু মুখ ভার দেখলে পৃথিবী অন্ধকার দেখতাম, তার এ তপ্ত অশ্রু আমার অন্তরে কোনও সাড়া দিলে না।

সে বল্লে, "আগে তুমি সব কথা শোন তবে বিচার ক'রো।"

তার পর সে সব কথা বলে গেল। আমি নীরবে মাথা গুঁজে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সেদিন তার স্বামী ব'লে গিয়েছিল রাত্রে ফিরবে না; কিন্তু একটু বেশী রাত্রে সে ফিরে এলো। নিস্তারিণী ততক্ষণ আমার জন্য নানা রকম রান্না ক'রে রেখে, মুখ হাত ধুয়ে খুব যত্ন ক'রে সেজে-গুজে আমার প্রতীক্ষায় ঘর বাহির ক'রছে! হঠাৎ সামনে দেখলে স্বামী!

সে চমকে উঠে বল্লে, "এলে যে বড়, ব'লেছিলে আসবে না!"

স্বামী গম্ভীরভাবে বল্লে, "আসতে হ'ল। সে কথা পরে হ'বে—এখন খাবার কিছু থাকে তো দাও।"

আমার জন্য খাবার তৈয়ারী ছিল. আমার ভোগে আজ আর তা লাগবার সম্ভব রইলো না ব'লে নিস্তারিণী সেই সব বেড়ে তার স্বামীকে দিলে।

তারপর সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লো কোনও মতে আমাকে খবর দেবার আশায়।

স্বামী তার পিছু পিছু এসে তার চুল ধ'রে টেনে ঘরে নিয়ে গেল। বল্লে, "যাচ্ছো কোথায়? এঘর থেকে বাইরে পা বাড়িয়েছ কি এই ছুরী দিয়ে তোমায় খুন করবো।" ব'লে জামার ভিতর থেকে একখানা ধারাল চকচকে ছোরা বের করে দেখালে।

তারপর সঞ্জীব বল্লে, "ভেবেছ আমি কিছু জানি না, বুঝি না। আমি সব জানি, কে আসবে এখন তাও জানি, তার জন্যই যে এ-সব খাবার তাও জানি।"

ভয়ে ভয়ে নিস্তারিণী একটু প্রতিবাদ ক'রতে চেষ্টা ক'রতেই সে বল্লে, "মিথ্যে ভাঁড়াচ্ছ। আমি কাল নিজ চক্ষে আড়ি পেতে সব দেখে গেছি, তাই আজ ক'লকেতা থেকে তোমার প্রিয়তমের জন্য এই উপহার কিনে এনেছি। আজ যখন সে আসবে এই ছোরা দিয়ে তাকে সম্ভাষণ ক'রবো। কিন্তু তুমি সাবধান। যদি টুঁ শব্দটি ক'রে তাকে খবর দেবে তবে তোমাকে খুন করবো।"

তারপর নিস্তারিণীকে বিছানায় বসিয়ে সঞ্জীব খেতে বস্‌লো।

নিস্তারিণী চক্ষে অন্ধকার দেখলো—তার বাহ্যজ্ঞান লোপ হ'ল। সে কেবল দেখতে লাগলো যে আমি গিয়ে ঘরে ঢুকেছি এবং তার স্বামী আমার পিছন থেকে এসে আমায় ছুরী মারছে। এই কল্পনা তার কাছে প্রত্যক্ষের মত বোধ হ'ল। সে তখন উন্মত্তের মত উঠে পড়লো—জ্ঞান তার মোটে রইলো না। ঘরের এক পাশে কালীপূজার খাড়া ঝোলান ছিল—সেই মোহের মধ্যে সে পা টিপে টিপে গিয়ে খাঁড়া নামিয়ে আনলে। তখনও সে সেই জাগ্রত স্বপ্ন দেখছে,—দেখছে আমি সম্মুখে আর তার স্বামী পেছন থেকে আমায় ছুরী মারছে। সে চক্ষু বুজে স্বামীর মাথায় খাঁড়া বসিয়ে দিলে।

তখন তার হুঁস হ'ল। কি সে ক'রেছে ফিরে দেখতে সাহস হ'ল না তার—স্বামীর দিকে পিছন ফিরে সে বাতি নিবিয়ে দিলে—তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর আমি গেলাম।

নিস্তারিণী বলে, "পাপ ক'রেছি আমি, কিন্তু সে তোমায় ভালবেসেছি ব'লে। আজ যদি এমনি ক'রে আমায় পায়ে ঠেলবে তবে এত ক'রে আমায় ভালবাসিয়ে ছিলে কেন? ওগো দয়া কর, দয়া কর! নিষ্ঠুর হ'য়ো না—আমায় রক্ষা কর।"

তার কথাগুলো কানে ঢুকছিল, কিন্তু অন্তরে প্রবেশ ক'রছিল না। অন্তরে আমার একটা দারুণ বিপ্লব হয়ে গিয়েছিল।

যে আলো দপ ক'রে আমার অন্তরে জ্বলে উঠে আমাকে এই মূর্ত্তিমান পাপকে চিনিয়ে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে তার তীব্র রশ্মি পড়লো গিয়ে আমার নিজের অন্তরের উপর। আমার নিজের জীবনের যত সব মহাপাপ ছিল সবগুলি সে আলোর তলায় কিলবিল ক'রে উঠলো—অন্তর আমার জ্বলে গেল। নরকের আগুনে সমস্ত শরীর আমার পুড়তে লাগলো। মনে হ'ল, নিস্তারিণী পাপিষ্ঠা, সে পরপুরুষের জন্য স্বামীকে খুন ক'রেছে—কিন্তু আমিও পাপিষ্ঠ—সাধ্বী নারীকে হরণ করবার জন্য তার স্বামীকে বধ ক'রেছি। কত পাপ ক'রেছি! এই যে নিস্তারিণী এত বড় পাপ ক'রেছে তারও তো মূলে আমি—পাপের পিছল পথে আমিই তো তাকে প্রথম নামিয়েছি! নির্ম্মল তন্দ্রাহীন তীব্র আলোতে আমার সমস্ত অন্তরের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো।

পাপের জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে এলো একটা প্রশান্ত তৃপ্তি ও শান্তি। যত ব্যথা পেলাম ততই অনুভব ক'রলাম আমার সে অতীত মরে গেছে—সে জীবন শেষ হ'য়ে গেছে। একটা নূতন 'আমি' জন্মেছে যে পাপ কিছুতেই ক'রতে পারবে না।

অনেকক্ষণ এই নূতন অভিজ্ঞতার মোহের মধ্যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ নিস্তারিণী আমার সাধ্য-সাধনা ক'রলে। তাকে রক্ষা করবার জন্য কাতর হ'য়ে পায় ধরে প্রার্থনা ক'রলে। বল্লে গয়লা বউকে আমি যেমন ক'রে লুকিয়েছিলাম তেমনি ক'রে তাকে লুকিয়ে ফেলতে—কত কাঁদলে, কত পায়ে জড়িয়ে ধ'রলে—আমার মন একটুও ভিজলো না।

তখন সে উঠে দাঁড়াল। মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ব'সে ভাবলে—তার পর সে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফস ক'রে বাইরে থেকে জোরে শিকল দিয়ে সে চীৎকার ক'রে উঠলো "খুন—খুন—খুন কল্লে রে—"

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম। প্রথমেই মনে হ'ল জানালার গরাদে ভেঙ্গে ছুটে পালাই। ছুটে গেলাম জানালার দিকে। অন্ধকারে কিসে পা পড়ে পা'টা পিছলে গেল। ধপ ক'রে

ব'সে প'ড়লাম। হাতে চট্‌চটে কি লাগলো। উঠে দাঁড়িয়ে দেশলাই জ্বেলে দেখলাম রক্তের ধারা একটা এধারে এসে পড়েছিল, তারই উপর পা পিছলে প'ড়েছিলাম। কাপড়ে ও হাতে রক্ত লেগে গেছে।

একবার চমকে উঠলাম।

তারপর দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল। দেখতে পেলাম বিধাতার আদেশ। আমি পালাতে চেয়েছিলাম, তাই আমাকে এমনি রক্তাক্ত ক'রে ভগবান আমায় জানিয়ে দিলেন, পালালে চলবে না—এ বোঝা আমার বইতে হ'বে। এ আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রলাম না, ক'রতে ইচ্ছা হ'ল না। মাথা নত ক'রে সে আদেশ স্বীকার ক'রলাম। স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে এগিয়ে গেলাম, খাঁড়াখানা হাতে ক'রে দাঁড়ালাম।

একটু পরে দোর খুলে লোকজন ঘরে ঢুকলো। নিস্তারিণী তখন বাইরে পড়ে মরা কান্না কাঁদছে। মেয়ে মানুষ কি বহুরূপী!

তারা এসে আমায় চেপে ধ'রলে।

আমি সবার কাছে স্বীকার ক'রলাম, আমি খুন ক'রেছি।

নিস্তারিণী একবার স্বধু অবাক হ'য়ে আমার দিকে চাইল, তারপর চ'লে গেল।

দারোগা শুনে, তদন্ত ক'রে আমায় চালান দিলে।

নিস্তারিণী আমার বিরুদ্ধে দিব্যি বানিয়ে সাক্ষী দিলে, সে সতী সাধ্বী, আমি তার ঘরে ঢুকেছিলাম—হঠাৎ সঞ্জীব এসে পড়লে আমি খুন ক'রলাম। আমি তাকে কোনও জেরা ক'রতে দিলাম না। উকীল আমার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রলে কিন্তু আমি র'ইলাম অটল।

* * *

নিস্তারিণীকে আমি পাপের পথ দেখিয়েছিলাম। প্রাণ দিয়ে তার জীবন রক্ষা করে যাচ্ছি, এতে আমার প্রায়শ্চিত্ত হ'বে না কি?

অন্তরে নারায়ণের আদেশ শুনতে পাচ্ছি "হবে—হ'য়েছে।" জেলে এসে অবধি দিনরাত নিজ্জনে তাঁকে ডাকছি, বড় আনন্দে আছি। কোনও গোলমাল নেই, কোনও বিঘ্ন এসে মন বিক্ষিপ্ত ক'রে দিচ্ছে না। কেবল আমি আছি আর আমার নারায়ণ আছেন। দেখতে পাচ্ছি তিনি হাসি মুখে আদর ক'রে আমার হাতে এ শাস্তি তুলে দিচ্ছেন, আমিও হাসিমুখে তুলে নিচ্ছি —এ তো শাস্তি নয়, এ যে আমার প্রেমময়ের আদরের উপহার—এ যে তাঁর কাছে অভিসারে যাবার বাসর-সজ্জা আমার! তাই আমার কোনও উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই।

এক একবার স্বধু মনে হ'চ্ছে নিস্তারিণীর কথা—তার যে মহাপাপ! তার কি উপায় হ'বে নারায়ণ?

* * *

আজ ফাঁসি। প্রসন্ন মনে নারায়ণকে স্মরণ ক'রে অগ্রসর হ'লাম।

জেলার বাবু মুখ ভার ক'রে বল্লেন, "কাল রাত্রে নিস্তারিণী হঠাৎ পাগল হ'য়ে আগুনে পুড়ে ম'রেছে।"

মনটা একটু বিষণ্ণ হ'ল। বৃথাই তবে আমি তার জন্য প্রাণটা দিলাম।

তারপর মনে হ'ল, বিধাতার বিচার—আমি এর বিচার করবার কে? অজ্ঞান আমি,—ভাবছিলাম প্রাণ দিয়ে নিস্তারিণীকে বাঁচাব—সাধ্য কি? বিধাতার সূক্ষ্ম বিচার!

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

ত্রিস্রোতা

রসাতলে ভোগবতী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা, স্বর্গে মন্দাকিনী—
এক বিষ্ণুপদী ধারা—কালস্রোত বহে নিরন্তর!
জানি না পাতালে তার কুলু কুলু কিবা কলস্বর,
আকাশ-তরঙ্গে তার ভাসে কিনা সুবর্ণ-নলিনী।
জানি শুধু জাহ্নবীরে,—পুণ্যতোয়া প্রাণ-প্রবাহিণী,
ত্রিধারায় বহে সেও কল্প-কল্প কাহিনী সুন্দর,
ধরাদেহে ত্রিগুণিত স্ফটিকাক্ষ-মালা মনোহর—
যজুঃ-সাম-ঋক্-মন্ত্র গাহে নিত্য সে কলনাদিনী!

অতীত-কল্পনাময়ী যমুনার নীল জলধারা—
ব্রজবনে রাখালের বেণু বাজে তারি তীরে তীরে;
ভবিষ্যের সরস্বতী বালুতলে হয়নি ত' হারা—
আশার অমৃত-বাণী বহিতেছে হৃদয়-গভীরে!
প্রত্যক্ষ-কালের গতি—ভাগীরথী উন্মাদিনী পারা
নৃত্য করে ঊর্ম্মিভঙ্গে চন্দ্রচূড় মহাকাল-শিরে!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

তেল-সিঁদুর

(১)

নন্দ সোমের ছিল একটি ছোট্ট দোকান।

রাস্তার মোড়ের উপর।

আপিস যাবার সময় বাবুরা কিন্‌তেন, সিগ্‌রেট-দেশলাই। ছোট ছেলে-মেয়ের কিন্‌তো, শ্লেট্-পেন্‌সিল।

বারোটার সময় দোকান বন্ধ ক'রে নন্দ খেতে যেতো। দেট্টার সময় ভিড় লাগ্‌তো খদ্দেরের; লিলি বিস্কুট, ল্যাবেনচুষ।

খুচ্‌রো বিক্রি; লাভ অনেক; দুঃখ যা, মাল কাট্‌তে চায় না।

সন্ধ্যার সময় রাস্তায় বেঞ্চির উপর সারি দিয়ে বস্‌তো কন্‌সার্ট পার্টি।

তখন ধারে চল্‌তো চা আর সিগ্‌রেট। একটা নাম-মাত্র হিসেব থাক্‌তো; তাগিদ দিতে নন্দর আবার চক্ষুলজ্জা। যে দিলে সে দিলে; নইলে পড়েই রইলো বাকি-বকেয়া।

নটার সময় 'কতকাল পরে'র গৎটা বাজিয়ে সবাই ফিরতো বাড়ি—মনে মনে গাইতে গাইতে, আর তালে তালে পা ফেলে ফেলেঃ—

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।

এমনি ক'রেই নন্দর দিন কাট্‌ছিল। অসচ্ছলতার তিমির কিছুতেই আর যেন কাটতে চায় না।

মামার দোকানটি যেদিন ভাগ্যবশে হাতে এলো, সেদিন তার মনে হয়েছিল, আর ভাবনা কি? মামা ত' এই দোকান থেকেই পাকা বাড়ি পর্য্যন্ত ক'রে গেছেন!

কিন্তু সেকাল আর একাল! আকাশ পাতাল তফাৎ! পাকা-বাড়ি? সে স্বপ্নের কথা; দিনের খরচ পর্য্যন্ত যে চলে না!

সেদিন সকালে নন্দ মন-মরা হ'য়ে দোকানের এক পাশে ব'সে ব'সে ভাব্‌ছিল—কি তাহ'লে করা যায়?

আজ তিন দিন হ'ল ছোট সম্বন্ধিটি এসেছে; মাছ, দই, মিষ্টি নইলেই বা চলে কি ক'রে?

বাক্সতে সেই সিন্দুর-মাখানো লক্ষ্মী-টাকাটি ছাড়া মাত্র আনা দুই আছে—তাতে কি হবে?

ঢুক্‌তে দোরের মাথার উপর সেই মামার আমলের গণপতি ঠাকুর; রোজকার ধুনোর ধোঁয়ায় তাঁর লাল পেটখানি আব্‌লুশ কাঠের মত চক্‌চকে কালো হ'য়ে গেছে!

নন্দ ভাব্‌লে কালোটা ত বলে ভারি অমঙ্গল ;—তাতেই বা এমন হচ্চে।......

পাশের দোকান থেকে একটু তেল-সিঁদুর কিনে এনে গণদেবের পেটটা টক্‌টকে লাল ক'রে দিয়ে বল্লে, ঠাকুর তুমি মুখ তুলে না চাইলে ত' নন্দ সোম গেল !

হাত ধুয়ে ব'সতে না বস্‌তেই সাইকেলের ব্রেক চেপে নেমে পড়্‌লো সুরপতি বোস।

সুরপতি একটা হাই ইস্কুলের হেড-মাষ্টার। এম-এ পাশ ক'রেছে ; একদিন নন্দর সহ-পাঠী ছিল।

সুরপতি নন্দকে দেখ্‌লেই সুর করে গাইতো ঃ—

নন্দলাল একদা একটি করিল ভীষণ পণ.........ইত্যাদি

কিগো নন্দলাল, ব'সে ব'সে কিসের চক্রান্ত হচ্চে ?

নন্দ অয়েল-ক্লথ মোড়া চেয়ারখানা পুঁছে দিয়ে বল্লে, এসো, বসো ;—চক্রান্ত আর কি করবো ভাই,—না খেয়ে যে প্রাণান্ত হবারই দাখিল !

বটে ! তবে যে বলে বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ ?

দু'জনে ব'স্‌লো।

ব'লে তো অনেকে গেচে, ভাই ; কিন্তু ফলে কৈ ?

সুরপতি গম্ভীর চালে বল্লে, ফল্‌বে, ফল্‌বে হে, ধৈর্য্য ধ'রে থাকো ; Nothing is denied ......জানো কি না ?.........

নন্দ চুপ ক'রে রইল।

সুরপতি চশমার ফাঁক দিয়ে রিস্ট-ওয়াচে সময় দেখে নিয়ে বল্লে, আজ আর দেরী করতে পারবো না, নোদো ; এখুনি ইনেস্‌পেক্‌টার আস্‌বে। বেটা কাল থেকে ভোগাচ্চে......

হঠাৎ তার মনে হয়ে গেল ঃ—

ভালো কথা, তুই পারবিরে এক কাজ করতে ? আমাদের ম্যানুয়ালের খাতা তৈরি করিয়ে দিতে ? শালা ভারি গোল লাগিয়েছে ; বলে, ইস্কুলের নামে খাতা ছাপাও......পার্‌বিরে নোদো ?

নন্দ বল্লে, তা আর পারিনে ?

আচ্ছা, তবে ভাই রাখ্‌ তুই কুড়িটা টাকা......কিন্তু দিতে হবে ১লা, আর দিন কুড়ি-পঁচিশ আছে—মনে থাকে যেন ? ....

এখন তাড়াতাড়ি।......সব কথা পরে হবে, বুঝেছিস্‌ ? দু-পয়সা পাবিরে, ম্যান্‌। বল্‌তে বল্‌তে সুরপতি উধাও।

নন্দ সযত্নে নোট দুটো বুকের পকেটে রেখে—সদ্য-তৈলাক্ত লাল ভুঁড়িটির উদ্দেশে দু'হাত জোড় ক'রে বল্লে,

ঠাকুর, তুমি জাগ্রত দেবতা ঘরে থাক্‌তে—আমি কিনা কেঁদে মরি! আমার সব অপরাধ মার্জ্জনা কর ঠাকুর, আর কোনদিন অবহেলা ক'রবো না তোমায়।

নন্দর মনের মধ্যে হঠাৎ যেন বসন্তের হাওয়া ব'য়ে গেল! ছোট্ট জীবনের ছোট দুঃখগুলিও যেন হঠাৎ পাপ্‌ড়ি-ফোটা ফুলের মত—মনের সামনে হেল্‌চে দুল্‌চে; আর নন্দর মন-মধুপ তার মধুর মৌতাতে মশগুল!

কপাটের আড়ালে, ঘোমটা টেনে ঝি এসে দাঁড়াল।

কি ঝি?......হুঁ, হুঁ, বুঝেচি; চল্ মাছের বাজারে।

রুই মাছের মুড়ো, চিনিপাতা দই, রসকরা............

দাঁড়া, দাঁড়া, চার পয়সার কপ্পূরি পানও কিনে দি।

দোকানে ফিরে, অসম্ভব মন ব'স্‌লো সেদিন বিক্রীতে তার, যেন জীবনের পথ খুলে গেছে—ঐ তেল-সিঁদুরের টক্‌টকে লাল রাস্তায়!

গিন্নী নারাণী মজবুৎ রান্না-বান্নায়, আর পান সাজে যেন ঠিক কাশীর পানওয়ালী।

বিছানায় শুয়ে পান চিবোতে চিবোতে নন্দর মাথায় ঘুরচে অদ্ভুত সব প্ল্যান!

চুপ্ ক'রে ব'সে থাকাটা কিছুই নয়। মানুষের গাঁঠে-গাঁঠে মর্চ্চে ধরলেই সর্ব্বনাশ। হাত-পা চালাও, খুঁটে খাবার চেষ্টা কর। বাবা, আল্‌সেমি ক'রেছ কি গেছ,—সিধে জহন্নাম......

আঃ কি একটা কথা মাথায় এসেও আস্‌চে না......কি একটা.....কাগজের দরটা জেনে আস্‌তে হবে,—ঠিক! ছাপাখানাতেও ঘুরে আস্‌তে হবে!..... নাঃ আরো কি একটা কথা...... মনে আসি-আসি ক'রেও আস্‌চে না......আঃ......

নন্দ আর শুয়ে থাক্‌তে পারে না।

নারাণী ঘরে ঢুক্‌লো; মেজাজ ভালই; সে বল্লে, কৈ আজ যে একটু চোখও বুজলে না? খেয়ে একটু জিরোও না, গো!

নন্দ সে-কথা কানেও তোলে না।

শুন্‌ছো?

কি, কি?......

তেনা যে আজ বাড়ী যেতে চায়।

তা যাক্ না।

তাই বল্‌চি.........

আঃ কি ব'ল্‌চো, খুলেই বল না.. ...

নারাণী জানে কি কষ্টে দিন কাটে, তাই বল্‌তে পারে না।

রেল-ভাড়া চাই ?

ওরা ত কোম্পানী থেকে টিকিট পায়.........

তবে ? ধুতি-চাদর ?

নারাণী দৃষ্টি নত করলে।

মানুষ শত দুঃখের মধ্যেও জানতে দিতে চায় না অন্যকে তার দৈন্যের খবরটা। বিশেষ ক'রে মেয়ে-মানুষে—যাকে জীবনের আহব থেকে দূরে ঠেলে রেখে দিয়েছি আমরা!

পাঠিয়ে দিও পরে......বুঝেছ কিনা ; এখন যা টানাটানি......

সে আর হয়েছে, নারাণী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে।

রাগ করলে ?

নারাণী ঘর থেকে বার হয়ে গেল।

কিন্তু নন্দর সময় ছিল না। সে বেরিয়ে প'ড়লো।

পথে যেতে যেতে একমনে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে—সে কি কথা! সে কোন কথা!—যা' তার মনে আস্‌তে আস্‌তে, এলো না এখনও—

খানিকটা পথ এগিয়ে—মনে হলো! তাইতো এই সোজা কথাটা এক্কেবারে গুলিয়ে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল ? সে আবার বাড়ি ফিরে এলো।

নারাণী ব্যস্ত হ'য়ে এসে বল্লে—ফিরলে যে ? চাবি নিয়ে যেতে ভুলেছ বুঝি ?

পকেটে হাত দিয়ে বল্লে, নাঃ অত ভুল হবার বয়স এখনো হয়নি গো—হয়নি। তার কথার মধ্যে কোন উত্তাপ ছিল না, অনেকখানি আদর।

তাই নারাণীর মনটা হাল্‌কা হ'য়ে গেল।

তবে ?

তবে কি,—কোন্ পতিব্রতার মুখভার দেখে কোন পত্নী-ব্রত স্থির থাক্‌তে পারে ?

নারাণীর রসবোধ ছিল বোধহয় ; সে বল্লে, পত্নী নয় গো, এযে পেত্নি......কিসে আমি তোমার যোগ্য ?......অকাজের ধাড়ি !......কিন্তু সে তবুও হাস্‌লে।

এইবার নন্দ একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—তাইতো তোমায় বলি, এস না, দুজনে মিলেই সংসারের চাকাটা ঠেলি প্রাণপণে......

তবেই হয়েছে !

শোন, শোন, বলে নন্দ নারাণীর হাতখানা ধ'রে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

নন্দ বস্‌লো খাটের ওপর, নারাণী তার পায়ের কাছে ব'সে বল্লে, কি কথা গো ?

কি সুন্দর পান সেজেছিলে তুমি আজ! ফার্ষ্ট ক্লাশ!

ওঃ এই ?

তাই ভাব্‌ছিলুম, যদি অমনি পান, একশো দেড়শো ক'রে উকিলখানায়, কাছারির বাবুদের কাছে সেজে পাঠিয়ে দিতে পারা যায় ত' রোজ সংসারের মাছ-তরকারির খরচটাত তুমিই চালিয়ে দিতে পার।......

নারাণীর চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে উঠ্‌লো, হয় নাকি তাই ? তাতো আমি অনায়াসেই পারি,—খুব পারি... ..

তাই ভাব্‌ছিলুম......আচ্ছা, তোমাকে ধুতি-চাদরের বদলে, একটা জামা দেও না ? সস্তায় হবে।

সে তোমার যা ইচ্ছে হয়, কর, নইলে লজ্জা করে, ছোট ভাইটি এলো।

বেশ তাই হোক্‌,—ব'লে নন্দ ঘরে থেকে বার হয়ে গেল।......

দেট্টা বাজতে বড় বেশি দেরি নেই।

(২)

সংসারের চাকা ঠেলার কাজে নারাণী তার মনটি ঢেলে দিতে একটুও কসুর করলে না।

কাজের মজাই তাই ; যাতে মানুষ আত্ম-নিয়োগ করে, যতই কেন ছোট হোক্ না, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যভরে ফুটে উঠ্‌লে আর পাঁচজনের নজর প'ড়বেই প'ড়বে। প্রাণের পরিচয় মানুষেরও কেমন যেন ভাল লাগে।

একটু চুয়া, একটু কেয়া, এক টুক্‌রো পেস্তা, হয়তো কিসমিস্ দিয়ে, নারাণী পানগুলোকে এমন সরস সুস্বাদু ক'রে দিত যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিমেষে বিক্রি হয়ে যেত !

একটাকার মূলধনে ডবল লাভ। নন্দ-নারাণীর বিস্ময়ের শেষ রইল না।

কিন্তু ব্যাপারটার আর একটা কঠিন দিক ছিল।

সেদিন দোকানে এলো বাচ্ছা-উকিল প্রকাশ মিত্তির। তার বাপ্‌ যদু মিত্তির ঐ ব্যবসায়ে অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রে অনেক নগদ টাকা রেখে গেছে ; তাই প্রকাশের হঠাৎ দুর্দ্ধর্ষ সংস্কারক হয়ে উঠার সুযোগও ছিল, আর অবসরও ছিল অখণ্ড !

অতটুকু দোকানে, অতবড় মানুষকে আস্‌তে দেখে নন্দ কেমন যেন মনে-মনে ঘাব্‌ড়ে গেল। তবুও দোকান ক'রতো ব'লে ধাঁ ক'রে সাম্‌লে যাবার গুণটাও তার গ'ড়ে উঠেছিল।

প্রকাশ ভূমিকা না ক'রেই কথাটা পেড়ে ব'সলো :—

দে-দেখ ন-নন্দবাবু, তো-তোমাকে এ-একটা কথা অ-অনেকেই ব'-বল্‌বে ব'-বল্‌বে ক'-ক'-ক'রছে,—কি-কিছুদিন থেকে, ...এ-এদিক দিয়ে যা-যাচ্ছিলুম, ম-মনে ক'রলুম, ব'-ব'লেই

যাই……ব'ব-লচি তু-তুমি ভে-ভেবে দে-দেখো, রা-রাগ করার বি-বিশেষ কি-কিছুই নে-নেই বি-বিশেষ ক'রে এ-এতে……

নন্দ প্রকাশের কটা-দুটো-চোখের দিকে চেয়ে রইল। তার তোৎলামিতে, হাসি এসেছিল, কষ্টে চেপে রইল।

প্রকাশ বল্লে, দে-দেখো ন-নন্দবাবু, তো-তোমার ঐ পা-পানের ব্য-ব্য-ব্যবসাটা করা মো-মোটেই ভাল হয়নি। ও-ওতে ভ-ভদ্র-লোকদের অ-অনেকটা মু-মুখ হেঁ-হেঁট হয়।

এমন একটা কথা যে, এই প্রথম তার কাছে এলো তা নয়; নন্দ তাই তখনো কোন উত্তর করলে না।

প্রকাশ কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে বল্লে, অ-অবশ্য তুমি এর উ-উত্তরে অ-অনেক কথা বল্‌তে পারো জা-জানি; কিন্তু তবুও তো-তোমার ভেবে দে-দেখা উচিত; —আ-আমরা এমন কোন কাজই ত' ক-করতে পা-পারিনে যা-যাতে স-সমাজ অ-অপদস্থ হয়! বু-বুঝেছ কিনা?

নন্দ এবার কথা কইলে, এতে যে কি করে আমরা সমাজকে আঘাত করি, তাতো বুঝিনে; মুখ্‌খু মানুষ, অত জ্ঞান-গম্মি আমার নেই; প্রকাশ বাবু!

প্রকাশ বল্লে, আ-আমি জা-জা-জানিনে, কি বু-বুঝিনে, কি জা-জানতুম না, এ-এস সব ও-ওজর আ-আইনে দাঁ-দাড়ায় না……তারপর সে খানিকটা হেসে, বল্লে, বু-বুঝেছ কিনা ন-নন্দবাবু —ও-ও-ও ক-কথা আ-আইনে টেঁ-টেঁকে না……

নন্দ উত্তর করলে; আইনের কোন কথাই ত' আমি জানিনে; যেদিন আইনমত চলার দরকার হবে সেদিন জানি, আমাকে উকিলের বাড়ি হাঁটাহাঁটি করতেই হবে।

প্রকাশ গর্ব্ব-ভরে দুল্‌তে লাগ্‌লো।

ঠি-ঠিক ক-কথা ন-নন্দবাবু, ত-তবুও আ-আমাদের রো-রোজকার জীবনের চো-ছোট-বড় স-সকল কা-কাজের ভেতর আ-আইনের তী-তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আ-আছেই আছে, আ-আইন এ-এ-এ-এড়িয়ে চলার ত' উ-উপায় নে-নেই, কোনো শ-শম্মার!

নন্দ বল্লে, তা হয়তো হবে; কিন্তু আমি তা' জানিনে।……আচ্ছা প্রকাশবাবু, আপনিই বলুন না, কি দোষ হয়েছে এ কাজে?

দো-দোষ?—কা-কাজটা ছো-ছোট……বি-বিশেষ ক-করে মে-মেয়েদের অ-অনেকখানি প-প্রশ্রয় দেওয়া হয়; তা-তাদের অ-অনেকখানি বা-বাইরে টে-টেনে এ-এনে, তা-তাদের ল-লজ্জা জি-জিনিসটাকে ক্ষু-ক্ষুন্ন করা হয়, ভে-ভেঙ্গে দেওয়া হয়।……বু-বু-বুঝেছ কিনা?

নন্দ মাথা নেড়ে বল্লে, সত্যি বল্‌চি আপনাকে প্রকাশবাবু, আমি ওটা ঠিক্ বুঝতে পারিনি। প্রশ্রয় কাকে দিয়েছি, আমার স্ত্রীকে? নির্লজ্জতার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছি কাকে বল্‌তে চান? আমার স্ত্রীকে? এদুটোর কোনটাই আমি ক'রেছি ব'লে ত মনে হয় না।

এমন সময় সুরপতি এসে উপস্থিত।

কিহে মিষ্টার মিটার, তোমাকে বেজায় গরম দেখায় যে ?

সুরপতিকে প্রকাশ তেমন যেন পছন্দ কর্‌তো না। তার বিদ্যার জারি-জুরিটা তার কাছে বড় খাটতো না।

প্রকাশ তাই প্রথমে চেপে যেতে চাইলে। কিন্তু নন্দ বল্লে, কৈ প্রকাশ বাবু, কিছু উত্তর দিচ্চেন না ?

উ-উত্তর আ-আর দে-দেব কি ? এ-এখন ত স-সবটাই এ-এসে এ-একজনের ম-মতের ও-ওপর দাঁ-দাঁড়াচ্চে ; যা-যাকে ব-বলে ব্য-ব্যক্তিগত ম-মতামত......

সুরপতি বল্লে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে ? ব্যক্তি থাক্‌লে তার মতামত ত' থাকাই উচিত। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে মত, মতের মিস্‌নোমার ; ওটা মিত্তির, তোমাদের ব্যবসার একটা আর্ট।......ব্যাপার কিহে নন্দলাল ?

ব্যাপার বুঝতে সুরপতির বেশী দেরি হ'লো না।

ওঃ এই ! এতো অতি সোজা কথা। বুঝেছ মিত্তির ? মনে কর তোমার স্ত্রী—মিসেস্ গো, একটা খুব সুন্দর ছবি আঁক্‌লেন—আর সেটা কিন্‌লেন ত্রিপুরার মহারাজা দশ হাজার টাকা দিয়ে—তখন ?

প্রকাশ বোধহয় মনে মনে রাগ করলে—এ-এই তো তোমার আ-আরম্ভ হ-হলো—বা-বাজে ত-তর্ক।

বটে ? আর তোমার ওটা কি ? বাজে নয় হে—এদিকের সপক্ষে আরো কথা আছে —এখেনে জীবন-সংগ্রাম ! ওরা দুজনে গুছিয়ে উঠতে চায় ;—সমাজ তা দেবে না ; এই তো মোট কথা ?

কে-কেউ মা-মানা ক-করেনি, প্রকাশ বল্লে, গু-গু-গুছিয়ে উ-উঠতে, কিন্তু অ-অ-অনেষ্ট মিন্স—সা-সাধু উপায়ে গু-গুছিয়ে উ-উঠ্‌তে হবে।

তাতো বটেই—সুরপতি উৎসাহিত হ'য়ে বল্লে, ওরা পান বিক্রী ক'রে কোন অন্যায় লাভ, কি কারুর অন্যায় ক্ষতি ক'রেছে প্রমাণ করতে পারো ?

প্রকাশ বল্লে, ও-ও-কথা কে-কেউ ব-বলচে না ; ও-ও-তে এ-একজন ভ-ভদ্রঘরের ম-মহিলাকে অ-অযথা নি-নিন্দার ম-মধ্যে টে-টেনে নি-নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পা-পানের ব্য-ব্যবসার সঙ্গে ক-কতগুলো নো-নোংরা এ-এসোসিয়েশন আছে ;—তা-তা তু-তুমিও জা-জান আ-আমিও জা-জানি।

আছে নাকি ? আমিত এই প্রথম্ শুন্‌লুম।......কোন কাজই ছোট নয় ; কাজ তখনই ছোট হয়, যখন মানুষে তাকে ছোট মন দিয়ে করে। ধরনা, তোমার এই ওকালতি,—ঢের

জোচ্চোর উকিল আছে, তাই ব'লে কে ছুটছেনা ওদিকে! টাকার লোভে। লোভ জিনিষটা কিন্তু কোন দিনই ভাল নয়।

গম্ভীর ভাবে প্রকাশ উত্তর দিলে, তা-তা ঠিক, কো-কোন স-সময়েই না।

সুরপতি বল্লে, আরো ধর, এই দোকান করা—আমরা ছোট বেলা থেকে শুনে এসেছি, দোকানদাররা ছোটলোক, তবে নন্দও আজ ছোটলোক, ছোটলোকের স্ত্রীও ছোটলোক...... তোমার আপত্তি থাকে,—পান কিনো না। চুকে গেল লেঠা!

নন্দ হাস্‌তে লাগলো—শুন্‌বে সুরপতি? সব চেয়ে বেশী বিক্রী ঐ উকীলখানাতেই।

উত্তরে সুরপতি বল্লে, সে তো জানা কথা, যত বেটা নিষ্কর্ম্মা, দল বেঁধে বসে আছে ওই গোভাগাড়ে!—দেখ না, ওদের পোষাকগুলোও ঠিক ঐ শকুনিদের মত!

প্রকাশ রাগলে বেশি তোৎলা হয়ে যেত; বল্লে—সা-সা-সা-ট্টা-প্‌......

প্রকাশ বেগতিক দেখে স'রে পড়লো।

পরীক্ষার খাতার হিসাব ক'রে বার হ'লো নন্দর এক বছরে প্রায় ১৫০৲ টাকার লাভ।......

সুরপতি বল্লে, তোমার দপ্তরি খরচটা ত' ধরা হয়নি, বোধহয় টাকা ত্রিশেক যাবে।

নাঃ এক পয়সাও নয়। খাতা কাটা, শেলাই করা—ও সব আমার স্ত্রীই করেছে!

সুরপতি বল্লে, বাঃ বাঃ এইতো চাই।

একটা সেগারেট ধরিয়ে সুরপতি সাইক্লে—স্কুলের দিকে সাঁ সাঁ ক'রে চ'লে গেল।

বিকেলে পুকুর থেকে গা ধুয়ে এসে নারাণী পরের দিনের পানের মশলা গুছিয়ে সাজিয়ে রাখছিল। গন্ধ তেল দিয়ে চুল বেঁধেছে, মস্ত-বড় খোঁপা, তাতে সোনার চিরুনি, বিকেলের আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে। হাতের ফেরফার বালা, মাথায় চিরুনি-ফুল, এ সবই তার পান-বেচার পয়সায়। সংসার চালিয়ে উদ্বৃত্ত পয়সায়, সে নিজের ইচ্ছামত, পছন্দমত এই সব করে।

মিত্তির গিন্নীর গলা অনেকক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল: মধু উকিলের বাড়ি প্রায় তিনি আসেন, মধু উকিল প্রকাশকে কাজ শেখায়; তা শেখাবেই বা না কেন? যদু মিত্তিরের দৌলতেই ত' তার আজ যা কিছু পসার!

নন্দ সোমের বাড়িতে মিত্তির গিন্নী ভুলেও পা দেন না; গরীব-গুরবোদের সঙ্গে বেশী মাখা-মাখি ভাল নয়।

তাই নারাণী নিরুদ্বেগেই নিজের কাজ করছিল। কিন্তু হঠাৎ তাঁর শুভাগমন হ'লো আজ এই দীন-দরিদ্রের বাড়িতে!

কি গো ভাল মানুষের ঝি, বড়-নোকের বৌ! কি করা হচ্ছে?

নারাণী তাড়াতাড়ি তার নিজের হাতের তৈরী ছাঁটা-উলের আসনখানা পেতে দিয়ে বল্লে, আসুন কাকিমা, বসুন।

নাঃ যাই, সন্ধ্যে হয়ে এলো, আর ব'সবো না; এদিকে এসেছিলুম, বলি, দেখে যাই নারাণী কি করছে, অনেকদিন এদিকে আসতে পারিনি।

নারাণী এই ডাহা-মিথ্যা কথা শুনে মনে মনে হাস্‌লে।

ওমা! এ বেশ বালা গড়িয়েছিস্ দেখেছি: বলি, জামাই দিলে না তোর ভাইরা?

নারাণী মুখ টিপে হেসে বল্লে, আমার পান বেচার টাকায়।

তা বেশ তা বেশ; বল্‌তে বল্‌তে মিত্তির গিন্নী বাড়ি ফেরার ভাণ ক'রে—ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন, কিন্তু যাবার আগে তোকে একটা হক্ কথা শুনিয়ে যাচ্ছি।......কাজ কিন্তু তুই ভাল করছিস্ না; নিজের লজ্জা বেচে কোন্ ভদ্দর ঘরের মেয়ে গয়না গড়ায়? তুই যে আমাদের মুখ হেঁট করলি লা!

নারাণী বল্লে, কি করি বলুন্ কাকিমা, নইলে যে সংসার অচল হ'য়ে যায়; ঐ ছোট্ট দোকানের আর কি আয়? আর সেই শীতকালে যা কিছু বই বিক্রী; তাও সেই যে নড়াইএর জন্যে বইএর দাম বেড়েছে, আর ত' কমলো না।

মিত্তির গিন্নী তাঁর উঁচু দুটো দাঁতের তলা দিয়ে যেন অগ্নিবর্ষণ ক'রে বল্লেন অত কথা জানিনে, তবে উকিলখানায় তোকে নিয়ে যা খেলা, যা ঢলা-ঢলি, তাতো আর শুন্‌তে পারিনে। সতীত্ব বিক্রি ক'রে একি গয়না গড়াবার ঢং?

নারাণীর বোধকরি একটু রক্ত গরম হ'য়ে উঠ্‌লো, বল্লে, কেন, শুনেছি কোলকেতায় আজ কাল অনেক ভদ্দর ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের মেয়েও বই নিকে টাকা কামায়।

পোড়া কপাল তাদের, বল্‌তে বলতে এই জাঁদরেল মেয়েটি এক-এক পা ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন—ওমা! ভদ্দর ঘরের মেয়েরা টাকা কামায়, শুন্‌লেও পাপ হয়—তারা বুঝি সব নাম নিকিয়েছে।

নন্দ নারাণী দু'জনেই খুশী হ'লো মিত্তির গিন্নীর ঈর্ষার কথা আলোচনা ক'রে। গরীবদের একটু গুছিয়ে উঠ্‌তে দেখ্‌লে, বড় মানুষদের অমন একটু গাত্র-জ্বালা হবার কথাই!

নারাণী হেসে বল্লে, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনে, তাতে বড় লোকদের কি ক্ষতি হয়?

হয় না? খুব হয়। ব'লে নন্দ তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। নারাণী দুই চোখ ডাগর ক'রে নন্দর কথা শুনতে লাগ্‌লো।

মনে কর রাত্তিরে মা লক্ষ্মী এসে আমাদের ঝিকে অনেক টাকা দিয়ে গেলেন—তা'হলে ও কি কাল আমাদের কাজ করতে আস্‌বে?

তা' কেনই বা আস্‌তে যাবে, ওতো টাকার লোভেই আসে।

নন্দ হেসে বল্লে, তখন তুমি কি করবে ?

আমি ? আমাদের টাকা থাক্‌লে, আর একজন ছোটলোককে ডাক্‌বো।

ছোটলোক নয়, বল গরীবকে ডাক্‌বে।

ওরা ছোটলোক নয় ত' কারা ছোটলোক ?

নন্দ বল্লে, যারা নীচ কাজ করে তারাই ছোটলোক।

নারাণী বল্লে, ওরাই তো ছোট কাজ করে গো।

তবে, নন্দ বল্লে, তবেত' পান বেচাও ছোট কাজ, অন্ততঃ প্রকাশ মিত্তিরের মতে ; তবে ওদের কথায় তোমারও সায় আছে ?

নারাণী ভাব্‌তে লাগলো। তারপর বল্লে, বুঝেছি, বুঝেছি, কোন কাজ ছোট নয় ; ছোট মন দিয়ে কাজ করলে, তবে সে কাজ ছোট হয়।

নন্দ সম্মতির হাসি হেসে বল্লে, ঠিক তাই। হিংসে, পরশ্রীকাতরতা এই সব ছোট মনের কাজ, এতেই মানুষ ছোট হয়ে যায়।

নারাণী বল্লে, বুঝেছি, আমি বেশ বুঝেছি, মানুষের গরীব হওয়াটা তো তার দোষ নয় ; সেই জন্যে তাকে ঘেন্না করলে অপরাধ করা হয়।

নন্দ বল্লে, কতকটা ঠিক বটে, সবটা ঠিক নয়। গরীব হওয়াও মানুষের কতকটা অপরাধ······

নারাণী তাড়াতাড়ি বল্লে, তা কখ্‌খনোই হতে পারে না। আমরা গরীব, তাতে কি আমাদের দোষ শুনি ?

নন্দ বল্লে, আচ্ছা, একজন বড় লোকের ছেলে হঠাৎ গরীব হ'য়ে যেতে পারে না ?

নারাণী ব'ল্লে, তা আর পারে না ! কতো তেমন ত' হয়ে যাচ্ছে।

যাচ্চে তো ? আচ্ছা ভেবে দেখ, কি দোষে তার লক্ষ্মী ছেড়ে যায় ?

নারাণী ব'ল্লে, বড় লোকের ছেলে, মদ খেয়ে, অনাচারী হয়ে বদখেয়ালি করলে, তিন দিনে পথের ভিখিরি হ'য়ে যায়।

নন্দ বল্লে, হাঁ, ও সব ত আছেই আছে ; কিন্তু মানুষের তার চেয়েও একটা বড় অপরাধ আছে ; যা থেকে পৃথিবীর সমস্ত পাপের উৎপত্তি হয়······

কথা শুন্‌তে শুন্‌তে নারাণীর দুচোখ বড় বড় হয়ে উঠ্‌লো। সে আর সবুর করতে না পেরে বল্লে, আঃ বলই না কেন, সে কি পাপ।

নন্দ একটু হেসে বল্লে, কিন্তু শুন্‌লে তুমি বিশ্বাস করবে না—আমাকে ; সেই অপরাধ আর কিছুই নয়, আল্‌সেমি, কুড়েমি, হাত পা না খাটিয়ে জড় পদার্থ, উজ্‌বুক হ'য়ে যাওয়া।

নারাণী নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, ওঃ এই! আমি মনে করেছি, হাতী-ঘোড়া, কি একটা মস্ত কিছু বল্‌বে।

নন্দ মৃদু হেসে বল্লে, ভেবে দেখো মনে-মনে, এইটাই সব সেরা কথা; এর চাইতে আর কোন বড় বেশী পাপ নেইগো, এ সংসারে।

নারাণী বল্লে, তাই কি আর হয়! যাদের টাকা নেই তারাই মরে খেটে; আর যাদের টাকা আছে, তাদের ব'য়ে গেছে! কি দরকার তাদের—অত কষ্ট করবার!

নন্দ আর কথা কইলে না। মনে মনে ভাবলে; বাস্তবিক এই সহজ কথাটি—বুঝতে অনেক দেরি হয় মানুষের। যেদিন লোকে বুঝবে—সেদিন তাদের পথটা কত সোজা হয়ে যাবে!

নন্দ কাজে যেতে যেতে পথ চল্‌তে চল্‌তে মনে মনে বল্লে, কাজ, প্রাণ মন ঢেলে দিয়ে কাজ—তা সে যতই ছোট হোক্—মানুষকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে, পৃথিবীর যোগ্য ক'রে তোলে; জীবনকে প্রাণময় ক'রে তোলে—তা এখন বেশ বুঝতে পারছি!... ..কপাল ব'লে যে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকে, তার কপাল তো পুড়বেই।

(৩)

সেদিন সকালে দোকানের দরজা খুলে নন্দলাল একেবারে শিউরে উঠলো। ভয়ে তার মুখখানি শাক-বর্ণ, আর এতোটুকু হয়ে গেল। মুখ থেকে আচম্বিতে বেরিয়ে এলো, সর্ব্বনাশ!

বাহনদের উপদ্রবে গণপতি বহুদিনের আসন-চ্যুত হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে চূরমার! এ দৃশ্য মর্ম্মান্তিক; ব্যথা-মিশ্রিত একটা ভয়, লোহার বেড়ির মত নন্দর বুকটা যেন চেপে ধ'রে রইল!

ঐকান্তিক অস্বস্তি নিয়ে দোকানের ছোট টুল্‌টির উপর নন্দ ব'সে ব'সে নিবিড় দুশ্চিন্তায় অভিভূত হয়ে গেল।

সেদিনের কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে; সেই তেল-সিঁদুর দিয়ে ঠাকুরের ভুঁড়িটিকে সে কেমন চক্‌চকে ক'রে পালিশ ক'রে দিয়েছিল। তারপরেই তো......

নন্দর ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠ্‌লো; কপালে কি আছে, কে জানে!

তার চোখের সামনে দিয়ে রোজকার মতই লোকজন হেঁটে চলেছে; কিন্তু নন্দর তাতে খেয়ালও নেই, মনও নেই। মনে-মনে প্রকাণ্ড তর্ক-যুদ্ধ চলেছে!

একটি ছোট বাক্সের মধ্যে ভাঙ্গা মূর্ত্তির টুকরোগুলি সে যত্নে রাখলে। কিন্তু কি হবে সে গুলোকে দিয়ে? তবুত' থাক্, এতদিনের জিনিষ—মামার আমোলের;—কিছুই বলা যায় না তো; কিসে কি হয়!

মনে হয়, আমার দোষ কি? আমি ত' আর অনাদর ক'রে টেনে ফেলে দিয়ে ভাঙ্গিনি, যে দেবতা আমার অপরাধ নেবেন?

আবার মনে হয়, নিজের সুখ-সম্পদে উন্মত্ত হয়েছিলুম, কিছুই ভাল ক'রে দেখিনি; হয়ত বা আমারি অসাবধানে, এ হলো!

কিন্তু যাই হোক্, এতো আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। ঠাকুরের পাকা হিসেব, ঠাকুর নিশ্চয়ই অবিচারে মানুষের উপর রাগ করেন না।

আবার মন বলে, দেবতাদের মন নয়তো মতি; কিসে প্রসন্ন, কিসে অপ্রসন্ন, কিছুই ত বোঝার উপায় নেই! কিবা আমরা জানি ওঁদের?

সন্ধ্যার সময় সে আলো জেলে চুপ্ ক'রে ব'সে রইল; অন্য দিন ছোট ধুনোচিতে কয়েকটি টিকে ধরিয়ে ধুনো আর গুগ্‌গুলের ধোঁয়ায় গণদেবের আরতি কর্‌তো। আজ কি করে?

খানিক চিন্তা ক'রে সে আল্‌মারির তলা থেকে টিকের বাক্সটা টেনে খান কয়েক টিকে ধুনোচিতে দিয়ে আগুন ক'রে, সুগন্ধি ধোঁয়ায় সমস্ত দোকানটি আমোদিত ক'রে তুল্লে;—কোণে কোণে ধুনোচি হাতে করে ফিরে ফিরে বল্লে, হে ঠাকুর, তোমাকে অপ্রসন্ন করার মূঢ়তা আমার মনে যেন কোন দিন না আসে। তুমি মাটির মূর্ত্তিতে আজ দোকানে বিরাজ না করলেও, আমি জানি, তুমি তোমার এই অধম সেবককে ত্যাগ করনি; তোমার উদ্দেশ্যে আমি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করচি, তুমি প্রসন্ন হ'য়ে—তা নেও, দয়া করে!

নন্দর মনটা অনেকটা হাল্কা হ'লো।

দুপুরে নারাণী তাকে নানা প্রশ্ন করাতেও সে এত বড় ব্যথার কথা বলেনি। রাত্রে ফিরতে ফিরতে মনে হলো; কাউকেই একথা বলবে না। এসব গূঢ়-গভীর কথা: মুখে বল্লে, হাল্কা হয়ে যায়, অপবিত্র হয়ে যায়!

কিন্তু নন্দর মন সম্পূর্ণ ভয়-মুক্ত হলো না।

যত দিন যায় নন্দর মনে ক্রমেই সাহস বাড়ে! কই দোকানের বিক্রিও কমেনি, আর পানের কাটতিও তেমনি অটুট রয়েছে! লাভের মধ্যে তার যত্ন আর সতর্কতা সহস্রগুণ বেড়ে গেছে!

সে যেন মনে মনে বুঝলে, এতদিন গলাজলে যে পাথরখানির উপর দাঁড়িয়ে ছিল, আকস্মিক ঘটনায় তা পায়ের তলা থেকে স'রে পড়ে গেছে! এখন যদি তলিয়ে না যেতে হয়তো তাকে দুই হাত আর দুই পায়ের জোরের ওপরই নির্ভর করতে হবে।

হঠাৎ তার মনে ক্ষণপ্রভার আভার মত একটা সত্য ঝলক দিয়ে চ'লে গেল! বুঝেছি, বুঝেছি, একেই বলে—আত্ম-নির্ভরতা! ছোট বেলায় বয়ে পড়েছিলাম স্বাবলম্বন!

আত্ম-বিশ্বাসে নন্দর মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করলে!

রবিবার।

সুরপতি, 'করিল ভীষণ পণ' গাইতে গাইতে এসে ঢুকে বল্লে, কিরে নোদো আছিস কেমন?

নন্দ খুসী হয়ে বল্লে, আয় বোস্; অনেকদিন পরে এলি কিন্তু এবার।

সুরপতি বসে বল্লে, উঃ, বড্ড ছোট্ট তোর দোকান নোদো, একটু বড়-সড় ঘর নিলে হয় না? এখন্তো তা পারিস্? না?

নন্দ হাস্‌লে, মনে করিস্, খুব ফেঁপে উঠ্‌ছি, না?

তাতে দোষ কি ভাই? আমিতো চাইই তাই। আমাদের জাতটার ওদিকটা ভারি চেপে র'য়েছে; কেবল চাক্‌রি, চাক্‌রি, চাক্‌রি; আর দেখেছো কোন মাড়বাড়ির ছেলেকে—চাক্‌রি খুঁজে ফিরতে? একমুঠো ছোলা বেঁধে নিয়ে, পিঠের উপর এক মোট কাপড়!—আজ বেড়াচ্চে দোর দোর; আর দুবছর পরে দেখ, বড় বাজারে একখানি ছোট দোকান; আর দশ বছর পরে—প্রকাণ্ড বাড়ি ক'রে, সীতারাম-লছমীদাস—হয়ে ব'স্‌লো! কিবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা! একবর্ণ ইংরিজি না জেনে, কি বিজ্‌নেস্‌টাই চালাচ্চে!

নন্দ অবাক্ হয়ে সুরপতির কথা শুন্‌ছিল। বল্লে, আচ্ছা, ওরা লেখাপড়া না জেনেও কি ক'রে চালায়, তাই আমি ভাবি!

সুরপতি উৎসাহিত হ'য়ে বল্লে, ওরে বাপ্‌রে, কি হুঁসিয়ার! ঐ যে দেখছো গণেশের মত মোটা পেট্‌টি, ওতে হিসেব ভরা।

নন্দ অনেকটা যেন আশ্বস্ত হ'য়ে বল্লে, তাই; তাইতো বলি!

সুরপতি বল্লে, জানিস্ ওদের ছেলেরা সব প্রথমে কি অঙ্ক শেখে?

মাথা নেড়ে নন্দ বল্লে, কৈ না, কি অঙ্ক?

সুরপতি নিজে নিজে খানিকটা হেসে নিয়ে বল্লে, তোর প্রথমে বিশ্বেস হবে না; কিন্তু ভাই আমাকে ক'ষে দেখিয়ে দিয়েছে।

আগ্রহে নন্দ চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল।

সুরপতি বল্লে, মনে কর্ আজ তোর কাছে আমি এক টাকা ধার নিলুম, আজ হ'লো কত?

নন্দ বল্লে, ১২ই শ্রাবণ।

কত শাল?

তাও ঠিক নেই? বলে নন্দ হাস্‌তে লাগ্‌লো।

সুরপতি বল্লে, কি করে থাক্‌বে—বাংলার সঙ্গে কারবারটা কি?

১৩৩৪।

তখন সুরপতি আরম্ভ কর্‌লে, এই ১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৪ সালে আমি যদি এক টাকা ধার করি—সুদে আসলে সেই টাকা ১৪৩৪ এর ঐদিনে একলাখ্ হয়ে যায়।

দূৎ, অসম্ভব, অসম্ভব, ব'লে নন্দ হাস্‌তে লাগ্‌লো।

হাস্‌ছিস্? আমিও হেসেছিলুম; কিন্তু আমাকে ক'ষে দেখিয়ে দিলে।

বটে! তাই ওদের এত টাকা! ঠিক বুঝেছি, হিসেব নইলে টাকা হয় না।

সুরপতি বল্লে, তাইতো গণেশের অত খাতির রে। যদি কোনদিন কাশী যাস্ তো দেখবি ঢুণ্ডি-গণেশের পায়ের তলায় লম্বা লম্বা নাক্-খৎ দিচ্চে—যত বেটা ঐ কিচির-মিচিরের দল!

সুরপতি চলে যাবার আগে ঠিক হয়ে গেল যে আগের মোড়ের দোতালা বাড়িটা আস্‌চে মাস থেকে ভাড়া নিয়ে দোকানটা সরিয়ে নেওয়া।

নন্দর মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল, একটু বে-হিসেব হবে না?

সুরপতি বল্লে, আচ্ছা আমি তোর আর একটা দিক্ খুলে দেবো; তোকে একটা দার্জ্জিলিং চা কোম্পানির এজেন্ট ক'রে দি আয়, মাসে একশো পাউণ্ড চা কাটাতে পারবিনে? তার কমিশনে তোর ভাড়াটা চ'লে যাবে।

নন্দ বল্লে, সোত্তর আশি ত' আজকালই কাটচে—দার্জ্জিলিং হলে একশো কেটে যাবে।

তবে আর কি? ব'লে সুরপতি উঠে পড়লো।

চ'লে যাবার আগে ব'লে গেল, আমি কালই একশ পাউণ্ড চায়ের অর্ডার দিচ্চি—আমার নামে হ'লে ক্রেডিট চল্‌বে, বুঝেচিস্—সে আমার ক্লাশ ফ্রেণ্ড।

নন্দ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

নিরিবিলিতে নন্দ সব ভেবে খতিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো; কি চাই তাহলে? রোস ভেবে দেখি, মেহন্নৎ, অর্থাৎ কিনা, গোড়াতে মুখ বুজে গাধার মত খেটে যেতে হবে; বাবুয়ানি ক'রে গায়ে হাওয়া লাগালে চল্‌বে না। শেঠজি এক একজন—বাড়ি থেকে আসে, লোটা আর কম্বল নিয়ে—তাতো চোখের সাম্‌নেই দেখচি!

তারপর?—কি? হাঁ, সাহস, ঠিক বলেছে; ঘরে ব'সে থাক্‌লে টাকা কি তোমার কাছে আস্‌বে পায়ে হেঁটে? যা থাকে কপালে, লেগেত পড়। কপাল শেষ পর্য্যন্ত ফিরেই যায়।

আর কি? হিসেব; গণনা! এইখেনে এলেন গণপতি; একটি পয়সার এদিক ওদিক হ'তে পারবে না। তাইতো কথায় বলে, হিসেবের কড়ি!......হিসেব চাই, সব কাজের মধ্যে হিসেব চাই......

দোকানটা তুলে নিয়ে যাওয়াটা কি রকম্ হবে? এ ঘরটা ছোটই বটে! কিন্তু মামার দোকান ছিল;—তা ছাড়া বেশ "পয়"ও আছে।

নন্দ এবার মনে-মনে হাস্‌লে; যতই বোঝাও মনকে—ঘুরে ফিরে সেই গর্ত্তেই! তারপর

সে জোর ক'রে বল্লে, আর ঐ নতুন বাড়িতে "পয়" নেই একথাই বা বলে কে ? ছেড়ে দাও ও কথা।.. ...তবে কি না ভাড়াটা বেশী, বারোটাকা বেশী ; এতুই বেশী ? চায়ের কারবার ত' আর এ দোকানে চ'ল্বে না ; ওপরের ঘরটা গুদোম ক'রে—আস্তে আস্তে সব জিনিষই বেশি করা যায়।......

আরে, আর একটা কথা এতক্ষণ মনেই হয়নি, ঐ ওপরের বারান্দাটা তো কন্‌সার্ট পার্টিকে ভাড়া দেওয়া যেতে পারে, নিদেন পক্ষে টাকা তুত্তিনও ত দেবে তারা মাসে।......

বাস্—তবে ঠিক ; নতুন বাড়িতে যাওয়া ঠিক।

নন্দ দোকান বন্ধ ক'রে খেতে চ'লে গেল।

(৪)

প্রকাশ মিত্তির ঘরের খেয়ে বনের মোষ অবিশ্রান্তই তাড়াতে লাগ্‌লো। পান বেচে নারাণীর ঐশ্বর্য্য হয়েছে শুনে প্রকাশের স্ত্রী স্বামীর সহ ধর্ম্ম আচরণ করতে কিছুমাত্র কসুর করলে না।

তার উপর, দোতলা বাড়িতে নন্দর দোকান উঠে গেল শুনে—মিত্তির বাড়ির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে হ'লো। যদু মিত্তিরের বিধবা—জাঁদরেল—আগুন থেকে জলে পড়ে তো জল থেকে আগুনে ঝাঁপায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলেন, ওমা, ছিঃছিঃ ঘেন্নার কথা, শুনেছো, পান বেচে গয়না গড়ায় ! মাগি পুলিশে নাম লিকিয়ে দিয়ে নন্দসোমকে তালাক দিক্ না কেন ?

জনমত লম্বকর্ণ ; পরশ্রীকাতরতায় তার তুই চোখ বন্ধই থাকে। এক কথা বারবার শুনতে শুনতে সেই কথায় তার প্রত্যয় দৃঢ় হয় ; তখন জনমত চাৎকার ক'রে বলে, না রটে তার কিছু তো বটে ! এই জনমতই এককালে সক্রেটিস্‌কে বিষপান করিয়েছিল, যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল, আমাদের দেশে মহাপ্রভুকে কলসির কাণা মেরেছিল !

নন্দ-নারাণী ত ছোট্ট মানুষ—তাদের দুর্গতি-লাঞ্ছনা করা খুব শক্ত নয়।

হলোও তাই।

প্রকাশমিত্তির হাকিমের হুকুম করালে যে বিনা লাইসেন্সে কাছারির হাতায় কেউ কোন জিনিষ বিক্রী করতে পারবে না। উকিল-খানার ঘরের মধ্যে পান বিক্রী বন্ধ হয়ে গেল।

ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা টিপিনের সময় ছেলেদের ইস্কুলের হাতা থেকে বার হয়ে যাওয়া একদম বন্ধ ক'রে দিলেন।

প্রকাশ মিত্তির মনে করলে, এইবার নন্দ-নারাণীর দমও বন্ধ হয়ে যাবে।

সব কথা শুনে নারাণী বল্লে, যদি কপালে থাকে যে আবার উপোস করতে হবে তো তাই ক'রবো।

নন্দ একটু গরম হয়ে বল্লে, তাই কি আর হয়, অত সহজে কেউ উপোসও ক'রে না; আর সত্যি ক'রে কেউ অদৃষ্টের ওপর অমন নির্ভরও করে না।......

নারাণী অবাক হ'য়ে বল্লে, বলো কি তুমি, অদৃষ্ট নেই? কপাল মান্‌বে না? তাই ব'লে নাস্তিক হ'য়ো না!

নন্দ এবার হাস্‌লে, তাই কি আর আমি ব'লেছি, অদৃষ্ট, ভাগ্য, কপাল, এসব ত আছেই গো; কিন্তু আমাদের হাত-পা, চোখ-কান, বুদ্ধি-বিবেচনা, এসবও কি নেই?.. ...দুহাত তুলে চুপটি ক'রে বসে থাক্‌লে কার চলে? কপালকে চক্‌চকে ক'রে তুল্‌তে হ'লে মানুষের দিকের যত কিছু সাধ্যে আছে, সব করতে হবে। আলিস্যি ক'রে ব'সে থাক্‌লে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হন না, সে কথা তুমিও মান, আর আমি হাড়ে হাড়ে জানি!

নারাণী বল্লে, তা মানি, একশবার মানি; বুঝিনে যে আমি যদি পান নিয়ে এত না খাটি তো, আমার ঘরে মা-লক্ষ্মী কিছু পায়ে হেঁটে আস্‌বেন না!......

নন্দ বল্লে, আমিও তো ওই কথাই বলি গো। আরো বলি যে, প্রকাশ মিত্তির মনে করলেই আমাদের উপোস ক'র্‌তে হবে না। তাই যদি হতো তো এত দিনে আমরা না খেয়ে ম'রে ভূত হ'য়ে যেতাম।

নারাণী বল্লে, তবে উপায়, একটা বিহিত তো তোমায় কর্‌তে হবে?

নন্দ বল্লে, দেখি, একবার সুরিকে জিজ্ঞেস করি; সে কি বলে।

নারাণী হাস্‌লে, ওঃ, তোমার বুদ্ধির গণেশ?

সুরপতি রেগে অগ্নিশর্ম্মা, বেটা তো কম শয়তান নয়; ঠিক বলেছেন ডাক্তার রায় যে, ঐ নিষ্কর্ম্মা বেটারা দেশের সর্ব্বনাশ করছে; মাইরি, কি অন্তর্দৃষ্টি! ঐ রকম দু'চারটে লোক যদি দেশে জন্মাতো......নন্দো কুচ পরোয়া নেই—চিয়ার আপ্‌!......তুই ছাড়িস নি ঐ পানের কারবারটা।

নন্দ বল্লে, তা তো ছাড়বো না ভাই; কিন্তু বিক্রির কি হবে?

সুরপতি বল্লে, তোর দোকানেই বিক্রির ব্যবস্থা কর; লোকে একবার জান্‌তে পার্‌লে আর কোন মুস্কিল থাক্‌বে না।

সে কথা বোধহয় ঠিক; আর যদি তাই একবার করতে পারা যায় তো কিচ্ছু ভাবনাই কর্‌তে হবে না।......

সুরপতি উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লে, ঠিক, ঠিক! ছাড়িস্‌নে, কিছুতেই না; দিন পাঁচ-সাত একটু লস্‌ দে না!

আচ্ছা ,তাই হবে, ব'লে নন্দ ফিরে এলো।

কিরে তেৎরা ?

তেৎরা নত হ'য়ে নন্দকে সেলাম করতে, নন্দ তাকে জিজ্ঞেস করলে, কিছু ব'ল্‌তে চাস্‌ ?

তেৎরা একটু একটু হেসে বল্‌লে, বাবু পানটা আমায় ঠিকা দিন, আমি বেচে দেবো ; টাকায় দুআনা ক'রে আমায় দেবেন।

তুই আজকাল কোথায় কাজ করচিস্‌ ?

সেরেস্তাদার বাবুর পাখা টানি।

নন্দ বল্‌লে, ও তুই কাছারীতেই বিক্রি করবি ? শুন্‌চি, ওরা বেচতে দেবে না।

তেৎরা হাস্‌লে, আমাকে সেরেস্তাদার বাবুই আস্‌তে বল্‌লেন। তাঁর এই পান খুব পসিন্‌। ......বাবু, আমি বেচ্‌লে কোন মুস্কিল হবে না।

বেশ, তুই নিয়ে যাস্‌ ; কখন নিবি ?

কাছারি যাবার সময়, আগের দিনের টাকা দিয়ে, পান নিয়ে যাবো।

তেৎরা চ'লে যাবার সময় ব'লে গেল, বাবু, আপনার মামা বাবুর অনেক খেয়েছি, আমি কোন গোল ক'রবো না।

নন্দ চুপ্‌ ক'রে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো ; একি আশ্চর্য্য, একদিকে ভয় আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অভয় ! এ যেন গঙ্গার ভাঙ্গন ; একদিকে ভাঙ্গে ত' অন্য পাড়ে ভরিয়ে দেয় !

মশাই, এই সো-কেশের মধ্যে কি ?

পান।

সাজা, তৈরী পান ?

নন্দ বল্‌লে, হাঁ, একদম তৈরী।

পয়সায় ক'টা ?

দুটো।

দিন্‌ তো, এক পয়সার।

নন্দ বল্লে, ঐ পাশের বাক্সতে পয়সা রেখে ডালাটা খুলে নিন্‌।

কলেজের ছাত্র পথে সিগারেট কিন্‌তে এসেছিল।

বাঃ সুন্দর পান তো ! আরো চার পয়সার নিলুম মশাই।

বেশতো যত ইচ্ছে নিন্‌, আপনাদের জন্যেই ত' যত্ন ক'রে তৈরী।

কলেজ যাবার পথেই নূতন দোকানটা পড়ে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাত্রমহলে পানের সুখ্যাতি রটে গেল। দিনে দ্বিগুণ বিক্রি।

খেতে খেতে নন্দ বল্লে, ওই জামার পকেটে তোমার আজকের পান বিক্রির টাকা পয়সা আছে, বার করে নেও। আমাকে খেয়েই বেরুতে হবে একবার, জজের সেরেস্তাদার ডেকে পাঠিয়েছেন।······দেখতো আজ কত বিক্রি হয়েছে ?

নারাণীর টাকা-পয়সা গুণে মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। আজ যে এরি মধ্যে পাঁচ টাকা!

নন্দ বল্লে, ও বেলাতেও ধরে রাখ টাকা টাক্।. ....কত তোমার খরচ ?

আট আনার পান, আর আট আনার মশলা, গন্ধ।

মজুরি ?

তাও ধর আট আনা।

তা হলে লাভ দেখ্‌চি সাড়ে চার ; আট আনা বাদ দেও ; ধর চার। মাসে ধর চাব্বিশ দিন, চার চচ্ছক চব্বিশ ; আর চার কড়িং আশি ; তাহলে মোট একশ' চার। এ যে একটা এম-এ পাশ স্কুল মাষ্টারও পায় না গো!······টাটাবে না প্রকাশ মিত্তিরের চোখ ?

কি চাও ?

আজ্ঞে, আপনার নামই কি নন্দ বাবু ?

হাঁ, আমিই নন্দ ; কেন বলত ?

আপনার কাছে একটা প্রার্থনা আছে ; যদি দয়া করেন ত বলি।

বল না, বল।

সুরপতি বাবুকে যদি আমার জন্যে একটু ব'লে দেন।

কি তুমি চাও ?

তাঁর স্কুলে একটা চাক্‌রি খালি আছে ; পঁচিশ টাকা মাইনে।

কি পাশ তুমি ?

ম্যাট্রিক।

বটে ? কোথায় বাড়ি তোমার ?

বর্দ্ধমান জেলায়, সোণাফুলি গ্রাম।

এতদূরে কি করতে এসেছ ?

আজ্ঞে, আমার বাপ মাস দুই হ'লো মারা গেছেন, বাড়িতে মা, আর দুটি বোন্।... ..দেশে বড় ম্যালেরিয়া তাই চলে এসেছি এদিকে, যদি একটা কিছু যোগাড় ক'রে নিতে পারি।

নামটি কি তোমার ?

শ্রীরমানাথ দাস ঘোষ।

বটে ? কোথায় আছ এসে ?

মুসাফিরখানায়—মাড়ওয়ারিদের ধর্ম্মশালায়।

ক'দিন এসেছ ?

আজ পাঁচদিন।

খাওয়া হয়েছে ?

না দিনে খাইনে। রাতে রেঁধে খাই। দিনে চাক্‌রির চেষ্টায় ঘুরি, সময় পাইনে।

আচ্ছা, আজ আমার ওখেনে খাবে। বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে সুরপতি রোজ আসে। সেই সময় সব ঠিক ক'রে দেব।......বসো ঐ চেয়ারে। আর ঘণ্টাখানেক পরে আমার সঙ্গেই যেও।

(৫)

সি-সি সিমেণ্টের দ-দ-দর কি, ন-ন-নন্দ বাবু ?

এই যে প্রকাশবাবু, আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

প্রকাশের ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে উঠ্‌লো।—

বসুন।

প্রকাশ চেয়ারে ব'সে বুঝতে পারলে বছর ত্রিনের মধ্যে নন্দ সোমের অবস্থার আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে গেছে।

হাঁ, কি বল্‌ছিলেন, সিমেণ্ট ? নানারকম সিমেণ্ট আছে ; বিলিতির দর, পাঁচ টাকা আর আমাদের দিশির দর পৌনে তিন।

দি-দি-দিশি হো-হোয়েছে নাকি ?

বিলক্ষণ, কোন্ জিনিষ আর দিশি নেই ?

প্রকাশ একটু লজ্জিত হ'লো।

একটা পাঁচ টাকার নোট বার ক'রে বল্লে, আ-আ-মাকে বি-বিলিতি দা-দাও।

নন্দ ডাক্‌লে, রমা ও রমা, একমন পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট দাও ত।

প্রকাশের দিকে চেয়ে বল্লে, লোক আছে সঙ্গে, না আমার কুলি যাবে ?

লো-লোক নেই।

তবে তাকে চার পয়সা দিয়ে দেবেন।

বে-বেশ।

প্রকাশ কিন্তু উঠে না।

আর কিছু চাই প্রকাশবাবু ?

না, বো-বোলছিলুম, এ-এ-একটা কথা। এই র-র-মার সঙ্গে আ-আ-মার ছো-ছোট বো-বোনের বে-হয় না ?

আঃ, ওরা যে ভারি গরীব, প্রকাশ বাবু !

তা-তা-তাতে কি ?

বাকি কথা না ব'ল্লেও প্রকাশের ভাবে-ভঙ্গীতে পরিস্ফুট হ'য়ে গেল, অর্থাৎ তুমিই বা কি ছিলে বছর তিনেক আগে ?

নন্দ মনে মনে রাগ না ক'রে বল্লে, সে কথা সত্যি !

নন্দ বল্লে, বেশ আমি ওর মাকে ব'ল্‌বো, কিন্তু আপনাকেও যেতে হবে তাঁর কাছে।

প্রকাশ বল্লে, মা যা-যা-যাবেন ।

তা হ'লেই হবে।

প্রকাশ উঠ্‌লো।

নন্দ বল্লে, কিন্তু প্রকাশবাবু ভেবে দেখেছেন কি ? আপনার বোন্‌কেও হয় তো বা পানই সাজতে হয় .....

প্রকাশের দুকান লাল হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি বল্লে --আ-আ-আমি বু-বু বুঝেছেন কি না ন-নন্দ বা-বা-বু, আ-আ-আমার সব ম-ম-মত বো-বো-বো-বোদ্‌লে গেছে !

নন্দর মুখ ক্ষমা-সুন্দর হাসিতে ভ'রে গেল, আপনারা উকিল, মত বদলাতে বেশী দেরি হয় না ; এই একটা বিশেষ সুবিধে আপনাদের প্রকাশ বাবু !

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বয়ম্বরা

এল গো আজ চাঁদ বদনী
স্বর্ণ উজল সাঁজে,
ঢেউগুলি তাই নাচে,
উল্লসিয়া, কল্লোলিয়া, ঢেউগুলি তাই নাচে ;
নীল সাগরের বক্ষে আজি লক্ষ ঘুঙুর বাজে !

সোনার নায়ে, সোনা গা'য়ে,
কে এলে গো রাণী ?
ঘোমটা খানি টানি,
বারে বারে নীলাম্বরীর ঘোমটা খানি টানি ;
তোমার মনে কি আছে তা জানি ওগো জানি।

পরের বাতির কোরবে মোরে,
এই ত আছে মনে ?
তাইত সঙ্গোপনে,
হাওয়ার সনে কানাকানি, তাইত সঙ্গোপনে।
মেঘের আঁচল পড়্‌ছে খসে, তাইত ক্ষণে ক্ষণে।

আমি যদি আপন হতে
দিই তোমারে ধরা ?
মিথ্যে যতন করা ;
অমন ক'রে মন ভোলানর মিথ্যে যতন করা,
তোমার তরেই বসে আছি, ওগো স্বয়ম্বরা।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

মিথ্যে খবর

দিয়াশলাইয়ের কাঠির খালি মাথায় চরশের একটা ছোট বড়ি গুঁজিয়া পরাইয়া দিয়া ধনপতি বলিল,—ধর্।

জন্মেজয় ধরিয়া থাকিল।

ধনপতি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া সেই বড়িটাকে খানিকটা পোড়াইয়া লইয়া তাহাকে সিগারেটের তামাকের সঙ্গে চূর্ণ করিয়া মিশাইল; সিগারেটের খালি ঠোস্‌টা সেই মিশ্রিত পদার্থে ঠাসিয়া লইয়া ধরাইল।

······অন্ধকারে তার মাথার আগুন থাকিয়া থাকিয়া দপ্ দপ্ করিতে লাগিল।

এরা দু'টি বন্ধু—

ধনপতি আর জন্মেজয়।

দু'জনায় প্রথম আলাপ হয় আব্‌গারী দোকানের জানালাটার ঠিক্ সম্মুখে।—সূর্য্য অস্তে যায় যায় দেখিয়া তখন দু'জনারই তাড়াতাড়ি। দু'জনাই দু'দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া গবাক্ষের মত ছিদ্রটায় হাত ভরিয়া দিয়াই দু'জনাই এক সঙ্গে হাসিয়া উঠিল।—

কেমন মজা!

রতনেই রতন চেনে······প্রাণের টানে প্রাণ চিনিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইল না।······

সেদিন ঐ পর্য্যন্ত—

আপন আপন ভাব অনুভব করিয়া দু'জন দু'পথে গেল।

পরদিন আবার দেখা; ধনপতি বলিল,—তোমার নামটি কি বন্ধু?

জন্মেজয় বলিল,—পোষাকী জন্মেজয়, আটপৌরে জনু। তোমার?

—ধনপতি, ডাকে সবাই ধনু বলে'।

দু'জনের তখন সে কি হাসি······ধনু আর জনু!······কেমন মিল! এ মিলন বিধাতার ঈপ্সিত।

তারপর দু'জনাই রসিক—

রসের আঠায় প্রণয় নিরেট হইয়া গাঁথিয়া উঠিল।

দুই বন্ধুতে নিরিবিলি বসিয়া একটু আনন্দ করিবার স্থান খুঁজিতে খুঁজিতে যে স্থানটা বেশ পছন্দ হইয়া গেল সেটা খর্জ্জুর-কুঞ্জ।······বড় বেশী লজ্জা বলিয়া নির্জ্জনতা তাদের চাই না—

কেবল দু'টিতে বেশ জমে যেন।

অনেকগুলি খেজুর গাছ বাড়িয়া তাদের মাথা টেলিগ্রাফের তারের লাইন ছাড়াইয়া গেছে; বড় গাছের গোড়ায় গোড়ায় চারা গাছের ভিড়—তিনদিকে তারা সারবন্দী, পাতায় পাতায় মেশামিশি।

গজ চল্লিশ দূরে যাতায়াতের পথ—

বসিলে সেই চারা গাছের আড়াল পড়িয়া রাস্তার লোকের নজর পৌঁছে না; কিন্তু মাথা একটু জোর করিয়া উঁচু করিলেই রাস্তার লোক নজরে পড়ে।

স্থানটিকে আবিষ্কার করিবার আনন্দে সেদিন চরশ পুড়িল দেড় আনার।

ঠোঁট্ চাটা ছাড়া এ-নেশার অন্য চাট্ নাই; সেদিক্ দিয়াও চরশই সস্তা, গরীব ভদ্রলোকের সৌখীনতার উপযোগী।

ধনু বলে,—চরশটা ধরে' অব্‌ধি আছি ভালো; কোষ্ঠ খোলসা হ'য়ে গেছে।

জনু বলে,—আমার কিন্তু উল্টো; কষে' গেছে।

—ডোজ্ চড়াও। বলিয়া ধনু খিল্ খিল্ করিয়া হাসে। বলে,—কিছু বাকি নেই বাবা। কৈফৎ তৈরী হ'য়ে যাচ্ছে; ভগবানের পাদপদ্মে যখন নিবেদন ক'রবো তখন তিনি পিঠ্ চাপ্‌ড়ে' যদি না দেন তবে কি বলেচি।

—ফর্দ্দ শোনাও, ঠিক তালিম আছে কি না দেখি। বলিয়া জনু একটু কাৎ হয়; চোখ্ দুটো তার মুহুর্ম্মুহুঃ টিপ্ টিপ্ করে।

ধনু বলে,—এক নম্বর······যাক্‌গে বাবা, সেখানেই সব বলা যাবে। দু'বার বল্‌বার দম্ আমার নেই। তিনি যদি—

হঠাৎ পথের উপর কেমন একটা শব্দ হইল—

ধনু চকিত হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দেখিল, একটি আব্‌ছায়া রমণীমূর্ত্তি পুকুরে জল আনিতে চলিয়াছে—

শব্দটী কলসী আর কাঁকণের।

স্থানটি নদীমাতৃক নহে—

একটী 'রক্ষিত' পুকুর আছে, তাহারই জল ভদ্রাভদ্রের একমাত্র পানীয়।

রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহার উপর দেওয়া আছে সে দশটি টাকা বেতন ছাড়া অনেক অভদ্রের চাউনি ইমান্ পায়।······অষ্টপ্রহরই এই পুকুরের জল উঠিয়া ঘরে ঘরে যায়—

বেশীর ভাগই কাঁখের কলসীতে।

ভদ্রঘরের মেয়েরাও না আসে এমন নয়—

লজ্জায় তারা অন্ধকারে লুকাইয়া আসে, লুকাইয়া যায়।

কিন্তু কলসীর গায়ে কাঁকণের ঘা লাগিয়া যদি সুর বাজে--

আর তাই যদি কারো কানে হঠাৎ যায় তবে অপরাধী কেউ হয় না; কিন্তু ঘটনার গতি ফিরিতে পারে।

জন্নুর কানেও শব্দটা গিয়াছিল --

ধনু থাবা পাতিয়া মাথা তুলিতেই সে বলিল,—র'সো। নরকের দ্বার নারী।

ধনু বলিল,—কিন্তু কি জানো, আমি অদ্ভুতত্ব বড় ভালবাসি। তোমার সাথে যেদিন আমার প্রথম দেখা সেদিনও আমার ঐ অদ্ভুত রসটাই প্রবল হয়েছিল বেশী। তু'জনেই একসঙ্গে 'চরণ দিন্' বলে' হাত বাড়ানো আমার খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল : চরণ'-ওলা যেন রক্ত-করবীর সেই রাজা, আর আমরা—

জন্নু কলস্বরে হাসিতে লাগিল : বলিল,—তা ঠিক্। কিন্তু মানুষের জল আনতে যাওয়াটা অদ্ভুত মনে না করলেও চলবে।

ধনু বলিল,—উঁহু। আনাটা অদ্ভুত নয়, যে আন্‌তে চলেছে সে-ই অদ্ভুত; চিররহস্যময়ী নারী, একেবারে তুর্ভেদ্য। অদ্ভুত যা' কিছু আছে এ তুনিয়ায় তার মধ্যে নারীই প্রধান।—

সেদিনকার মত অদ্ভুত প্রসঙ্গটা ঐখানেই চাপা পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু ধনুর আর যত দোষই থাক্, অকারণে পিছাইয়া দাঁড়ান' স্বভাব তার নয়।

সন্ধ্যা লাগিয়া আসিতেছে --

খর্জ্জুর-কুঞ্জ ধনুর মনটাকে যেন নাকে দড়ি দিয়া টানিতে লাগিল। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এমন ঘটনা আগে তার চোখের উপর কত ঘটিয়াছে।... রমণীগণ জল ভরিতে নিত্য আসে—দলে দলে, একা একা, বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, সুশ্রী, বিশ্রী......

কিন্তু অমন শব্দটি তার কাণে কখনো যায় নাই।.. ..তাদের কলকণ্ঠ, হাসি, সব ভাসিয়া ভাসিয়া গেছে -

মনের উপর আসন পাতিয়া বসিয়াছে ঐ একটি শব্দ --

যেন গোধূলি ক্লান্তকে গৃহে ডাকিয়াছে -

বিরহীকে ইঙ্গিত করিয়াছে, যামিনী আগত।

ধন্নুর মনে ছবি একখানা আঁকা পড়িয়াছে,—সুন্দরী, যুবতী; একটুতেই সে ভয়ে সারা... ...নিজেকে লইয়া সে অনন্ত বিব্রত......মাটিতে পা ফেলে সে নিদারুণ ভয়ে ভয়ে; অকারণ লজ্জায় সে যত জড়সড় হয় তত তার মনে হয়, আবরণে যেন কুলাইতেছে না—

ধনু আর জনু আসিয়া বসিয়াছে ; চরণ একটান সেবন হইয়াছে।

কিন্তু ধনুর আর শান্তি নাই।

জনু বলে,—গোঁজের ওপর বসেছ না কি হে? ছট্‌ফট্‌ করছ কেন অত?

—গোঁজের ওপরেই বসে' আছি। ভাব্‌টা বেশ প্রকাশ করেছ কিন্তু। বলিয়া জনু দু'চোখ দিয়া পথটাকেই যেন গ্রাস করিতে থাকে।

অস্পষ্ট, ছায়ার মত একটা মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসে; অল্পকাল চোখের সামনে থাকে ; দৃষ্টির আড়ালে যায়।......

ধনু ঠেলিয়া উঠিতে চায়—

জনু ধরিয়া ফেলিয়া বলে,—কেলেঙ্কারী হবে। তোমার কি বাবা, বিদেশী লোক : কোথায় থাকো তার ঠিক নেই। মারা যাবো আমি।

ধনু বলে,—মরে' তুই টিক্‌টিকি হবি। টিক্‌টিক্‌ করে' শুভকর্ম্মে যে বাধা দেয়, তাকে আমি ঐ অভিসম্পাত দি'। লেজ কাটা যাবে ; আমার প্রাণ এখন যেমন ধড়্‌ফড়্‌ করছে, তোর সেই কাটা লেজ তেমনি ধড়্‌ফড়্‌ করবে।

বলিয়া ধনু হাসে—

বড় বড় দাঁত অন্ধকারে ঝক্‌ঝক্‌ করে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা জনু ধনুকে আর খুঁজিয়া পায় না।

কিন্তু না পাইবার কারণ ছিল।

জনু যখন তাহাকে ব্যাকুল হইয়া দিখিদিকে তল্লাস করিতেছে, সে তখন হারাণীর দুয়ারে ধন্না দিয়া পড়িয়া আছে।

এই হারাণী খুব কাজের লোক ; টাকা চাকে বেশী, কিন্তু সিদ্ধি অব্যর্থ—

নিস্ফল চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত একটিও করে নাই বলিয়া হারাণীর নিজেরও বড়াই, তার সাহায্যার্থী যারা হয় তাদেরও সেইটাই ভরসা।

হারাণী বলিল,—কোন্‌ বাড়ীর?

—তা জানিনে।

—তবে? রাজি হয়েছে?

দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া ধনু বিমর্ষ হইয়া যায় ; বলে,—দেখাই হয়নি' তার সঙ্গে।

···বড় বেশী কাজ চাপা'লে বাপু। দেখি; কিন্তু দশটি টাকার এক ছিদেম কমে আমি পারব না। বলিয়া হারাণী গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতে থাকে···

ধনু তার পা ধরিতে যায়।

......যাই হোক, আট টাকায় রফা হইল।

ধনু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া যখন খেজুর তলায় পৌঁছিল, জনু তখন দারুণ অভিমানে ভার হইয়া বসিয়া আছে। ধনু মনে মনে হাসিয়া আপনমনে বসিল; নেশাটা তৈরী করিল; একটান চড়াইলও; তারপর বলিল,—রাগ করা হয়েছে দেখ্‌ছি। তা কর। কিন্তু এই রাগ করে কথা না কওয়ার ফল ভুগ্‌তে হবে, অনুতাপ করতে হবে, তাও আমি বলে' রাখ্‌ছি। লেখাপড়া বৃথাই শিখিনি। গীতায় ভগবানও তাই বলেছেন দশম অধ্যায়ে।

জনু ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল

বলিল,—গীতা আমি পড়িনি, তবে পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি, গীতা ধনপতি চাটুয্যের কথায় পরিপূর্ণ।

দুই জনেই হাসিয়া অস্থির

ধনু আনন্দে আকুল হইয়া ঘাসের উপর গড়াইতে লাগিল।......

দেখা গেল, আজ সে একা নয়; আর একজন কে তার সঙ্গে আছে: চলন দেখিয়া মনে হয় সঙ্গিনী বর্ষীয়সী।

ধনু মনে মনে লাফাইতে লাগিল······

হারাণীকে সে পথ দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছিল; সে-ই একটা ঘটি লইয়া জল আনিবার ছলা করিয়া অপরিচিতার সঙ্গ লইয়াছে।

ধনু তাগিদ্ দেয়।

হারাণীর সঙ্গে সে পিসী পাতাইয়াছে।

বলে,—পিসি, রক্ত আমার জল হ'য়ে যাচ্ছে।

পিসী বলে,—গাছের মাকাল ফলটি ত' নয় বাপু, যে ছিঁড়ে এনে তোমার মুখে তুলে' দেব। তবে কাল একবার খোঁজ নিও।

···সত্যি, পিসি? বলিয়া ধনু উল্লাসে গলিয়া পিসির পায়ের ধূলোই নিল······নাগাল পায় ত' চাটে, এমনি আবেগ।—

পিসিও বামুনের মেয়ে।

খেজুরতলায় ধন্নু বলিল,— কা'ল বেড়া'তে যাবো ভাব্‌ছি।

—কোথায় ?

—কাছেই। কিন্তু একা একা বেড়াতে ভালো লাগে না। মনের মানুষ কেউ সঙ্গে থাকে ত' বেশ সুখ হয়।

—কিন্তু আমি ত' আছি ; মরিনি ত'।

—তুই যাবি কি না……বলিয়া ধন্নু যেন অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিল।

জন্নু বলিল,—খরচ-পত্তর করা ছাড়া আমি সবেতেই আছি।

—আচ্ছা তবে কাল।

—কখন ?

সন্ধ্যার পর।

কি আনন্দ আজ ধন্নুর !……

কিন্তু মাঝে মাঝে যেন দমিয়া আসে……কিসের একটা ছায়া যেন পড়ে, আনন্দ আঁধার হইয়া ওঠে।—

কাছাকাছিই এ-গলি সে-গলি ঘুরিতে ঘুরিতে জন্নু বলে,—কোন্ চুলোয় চলেছি আমরা ?

ধন্নু কথা কহে না—

সে তখন ভাবিতেছে—একটি লজ্জাবতী সতেজ লতার অঙ্গ সে স্পর্শ করিয়াছে ; লতাটি তার স্পর্শের নীচে প্রাণপণে সঙ্কুচিত হইয়া মুড়িয়া আসিতেছে—

সে একেবারে নিঃশঙ্ক—

লতার অঙ্গে কেবল কোমলতা, কণ্টক নাই……

হারাণী দুয়ারেই দাঁড়াইয়া ছিল ; বলিল,—এস।

—এসেছে ? বলিয়াই ধন্নু জন্নুর গায়ের জামা চাপিয়া ধরিল।

—হ্যাঁ। টাকা দাও। এটি কে ?

—আমার বন্ধু। অমনি এসেছে। বলিয়া ধন্নু ট্যাঁক্ খুলিয়া টাকা দিল।

কিন্তু জন্নু বলিল,—সে কি হে ?—জন্নুর বিস্ময় অকপট।

—এখানে গোল করো না। বলিয়া ধন্নু জন্নুকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়াই থম্‌কিয়া গেল—

অপরিচিতার পিতলের কল্সীটা চালার অন্ধকারে কিছুদূরে নাগান রহিয়াছে……ঘরের আলো আসিয়া তার একটুখানি আলো করিয়াছে --

তাহার উপর চোখ পড়িতেই হঠাৎ ধন্নুর মনে হইল, সেটা যেন কার বীভৎস বক্র হাসি ……চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে সহসা সেটা একটি স্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে…… তার ওদিকেই বুঝি দু'টি তীক্ষ্ণ ক্রূর চক্ষু--

কিন্তু মুহূর্ত্তেকের সেটী বিবেকদংশন --

হারাণী বাহিরের দরজার খিল আঁটিয়া দিতেই সেই শব্দে ধন্নুর বিভীষিকা কাটিয়া গেল। বলিল—পালাস্‌নি, আস্‌ছি।

জন্নুর বুক ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল—

তবু তার পা উঠিল না, পালাইতে সে পারিল না।

ধন্নু ঘরে ঢুকিয়া গেল --

দেখিল, আঁচলে মুখ ঢাকিয়া সে প্রাণপণে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া আছে---

ধন্নু অকারণেই একবার চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কোনো বস্তুই তার লক্ষ্য হইল না।……

ধীরে ধীরে তুলিয়া তাহাকে দাঁড় করাইল—

এবং কাড়াকাড়ি করিয়া তাহার মুখের কাপড় তুলিয়া দিয়াই বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

রূপের কল্পনা আগে সে করে নাই -

কিন্তু মেয়েটির নতমুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল, ঘরের ঐ দীপটিই আলাদিনের সেই অদ্ভুত প্রদীপ—

পিসির এ মায়া সৃষ্টি—

প্রদীপ ঘষিয়া ইহাকে সে আনিয়াছে।……

ডাকিল,—এস হে।

যেখানে রাখিয়া গিয়াছিল সেইখানে দাঁড়াইয়াই জন্নুর হাঁটু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল ; ……চৌকাঠে পা রাখিয়া তার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

দেরী দেখিয়া ধন্নুই আগাইয়া গেল—

জন্নুকে ঠেলিয়া ঘরে তুলিল—

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চাহিল—

এবং তারপরেই যে কাণ্ডটা চক্ষের পলকে ঘটিয়া গেল তা' একেবারে অচিন্ত্যনীয়।……

জম্মু মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াই এক লাফে চৌকাঠ পার হইয়া উঠানে পড়িল………দড়াম্ করিয়া বন্ধ দরজার উপর একটা শব্দ হইল………তারপর খিল খুলিবার শব্দ……

তারপর জম্মু ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের সেই অন্ধকারের ভিতর যেন চিরদিনের মত নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।……

মেয়েটি জম্মুরই ভগিনী অমিয়া।

পরবর্ত্তী বুধবারের রাঢ়-দীপিকায় সংবাদ বাহির হইল :—

কোলগ্রামে শোচনীয় দুর্ঘটনা।

পণপ্রথার কুফল

গত শনিবার কোলগ্রাম চৌকি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম নখাজ্ঞির সপ্তদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা শ্রীমতী অমিয়া প্রচলিত প্রথায় আত্মহত্যা করিয়াছে। স্নেহলতার পর পিতামাতাকে কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য কুমারী কন্যাগণের আত্মহত্যার সংবাদ আমরা নিত্য পাইতেছি। ইহার শেষ আমরা কবে দেখিব ! পণপ্রথার কুফল চরমে উঠিয়াছে। হিন্দুসমাজ এখনো সাবধান না হইলে হতভাগ্য বঙ্গদেশের আর কল্যাণ নাই।

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

পূজার ছুটী

দিবসের পর দিবস কেটেছে, মাস কেটে গেছে মাসের পর,
বাকি কটা দিন ঘণ্টা, মিনিটে, কাটিলে প্রবাসী যাইবে ঘর;
দু'দিনের তরে রাখিয়া পিছনে, কুড়ানো বন্ধ তামার ঢেলা,—
যাইবে যেথায় আপনার ঘরে, আপনার মাঝে, চাঁদের মেলা ;
দুনিয়ার সেরা, নিধি বুক চেরা, শ্যামল কুঞ্জে শান্তি নীড়,
স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রীতি ও প্রণয়, ভালবাসা, মধু প্রেমের ভিঁড়।

উদরের জ্বালা ঘুচাইতে ছোটা, গোচে না তো ; আরো বুকের ক্ষুধা—
বেড়ে যায় শুধু ; বুকের খোরাক মেটে কি ভিন্ন,—চাঁদের সুধা !
মেটে না, মেটে না,—মেটাবার তরে পিঞ্জর দৃঢ়, দু'হাতে ঠেলি'—
মন-বিহঙ্গ উড়ে চলে হায় ! নিরুপায় দেহ দুয়ারে ফেলি' ।
সুমুখে তাহার নয়ন জুড়ানো হেরে একখানি মোহন ছবি,
বুড়ো ও বুড়ীর সাঁঝের গগনে, উদিত যেন রে নবীন রবি ;
হৃদয় গলানো স্নেহের দুলাল, মায়ার মূরতি দুলালী মেয়ে,
ছোট, বড় ভাই ভগিনী ক'জন, চক্ষু তৃপ্ত না হয় চেয়ে ;
হাস্য-আনন, লাজ ভরে নতা, ধরণীর মত ধৈর্য্যশীলা—
আছে এক নারী, নাহি কোন তার কর্ম্ম ভিন্ন অন্য লীলা ;
বালক কালের সরস চিত্ত সখারা সকলে মিলিল আসি,
গুরুজন যাঁরা আশীষ ঢালিয়া, আপদ, বালাই, ফেলিল নাশি',
তুফান তুলিয়া প্রাচীন ভৃত্য "কেনা" দাদা হাসি ভরিল গেহ,
মার্জ্জার ঘোরে, সারমেয় লেজ নাড়িছে, "বুধির" ঝরিছে স্নেহ,
নদী কিনারায় পুরাতন বট শাখা-বাহু মেলি' টানিছে বুকে,
কল কাকলীতে কুশল প্রশ্ন করে 'শুক সারী' হাস্য মুখে,
মধু কল্লোল, কুলু কুলু করি ডাকে—"আয়, আয়, সিক্ত করি,
ডাকে—ফুল, ফল, ডাকে—তরু লতা, ডাকে—চাঁদ, বায়ু হস্ত ধরি ।
কল কোলাহল ভেঙ্গে দেয় ঘুম, কেটে যায় মোহ, স্বপন-মায়া,
তার বেঁধা পাখী ছট্‌ফট্‌ করি, ঝাড়া দিয়ে উঠে আপন কায়া ।
স্নেহের কাঙ্গাল, ওরে নিরুপায়, তোরে কোনখানে লুকায়ে রাখি,
সাজে না যে তোর, চিন্তা-বিলাস, ক'দিনের যুগ এখনো বাকি !
বর্ষ মাসের ঘণ্টা মিনিটে, কাটারে ভুলিয়া কর্ম্ম পিছে,
এতদিন যদি গিয়াছে চলিয়া, ক'দিনও যাইবে ভাবিস্ মিছে ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়

অম্ল-শূল

(১)

বাড়ীতে মাত্র তিনটি লোক, যতীশ, তাহার স্ত্রী মানদা এবং এক বৃদ্ধা পিসিমা। এই তিনটি লোকই, আজ দশ বৎসর, চতুর্থ আর এক ব্যক্তির আগমনের সোৎকণ্ঠ প্রতীক্ষা করিয়া হতাশ হইবার মত হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রয়োজনীয় ব্যক্তিটির এ পর্য্যন্ত শুভাগমন হইল না। পিসিমা তাহার জন্য নিত্য মানত করেন, মানদা তারকেশ্বরের হত্যা দিয়া আসিয়াছে, এবং যতীশও যে গোপনে ত্ু' চার কোটি দেবতার কাছে তাহার সকাতর প্রার্থনা জানায় নাই, এমন নয়। কিন্তু সেই বাঞ্ছিতের এ পর্য্যন্ত দয়া হইল না!

সেই অতি-আকাঙ্ক্ষিত চতুর্থ ব্যক্তিটি যতীশের একটি পুত্র সন্তান!

ছাতের আলিসার ইট খসিয়া পড়িতেছে, পাশের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—যতীশ দেখিয়াও দেখেনা। কাহার জন্য? আপিসের চাকুরী করিতে করিতে কোনও দিন হয়ত' মোটর চাপা পড়িয়া অথবা অকস্মাৎ হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইবে—তাহার পর? তাহার পর যতীশচন্দ্র গোস্বামীর বংশের ধারা বিলুপ্ত হইবে, পরলোকবাসী পিণ্ড-প্রয়াসী পিতৃ-পুরুষগণ ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতে থাকিবেন, এবং অপরাধী যতীশকে অভিসম্পাত করিবেন। এই ত' শেষ! তবে কাহার জন্য বাড়ী মেরামত করা, কাহার জন্য এই পতনোন্মুখ দেওয়াল উঠান?

যতীশের মনে ক্ষোভের সীমা ছিল না, কিন্তু তারও চেয়ে বেশী কষ্ট ছিল মানদার! বাঙ্গালীর ঘরে জন্মলাভ করিয়া, ঘরের একমাত্র বধূ হইয়া সে যে একটি মাত্র পুত্রেরও গর্ভধারিণী হইতে পারিল না, ইহার চেয়ে বড় অপরাধ মেয়ে-মানুষের আর কি হইতে পারে? গৃহকর্ম্ম তাহার নিকট বিষ বলিয়া মনে হয়, রাঁধিতে গিয়া বিনা-ধোঁয়ায় অকারণ অশ্রু-মোচন করে, এবং স্বামীর মলিন মুখের দিকে চাহিয়া বুকের ভিতরটা তাহার শুকাইয়া আসে!

অথচ কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পূজার সময় যতীশের ছোট বোন সুরমা আসিয়া উপায়ের কথা বলিয়া দিল। সে বড় লোকের ঘরে পড়িয়াছে, সুতরাং বেশ-ভূষায় কথাবার্ত্তায় কাহারও চেয়ে কম নয়। তাহার গহনার ঝলক দেখিয়া এই বাড়ীর অন্ততঃ ত্ু'টি লোক তাহাকে শ্রদ্ধাও করে কম নয়।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যখন মানদা রান্নাঘরে, তখন ছাদের উপর সান্ধ্য-বৈঠকে কথাটা পাড়িল সুরমাই। কহিল,—এমন ক'রে বাবার বংশ লোপ হ'লে ত' চলবে না। কি বল পিসিমা। আমাদের ত' দোষ নেই, দশ বৎসর দেখা গেল, তবু একটা ছেলে হ'ল না।

বউদিদির যখন বিয়ে হ'ল, তখন ত' আমি ছোট, আর ব'লতে নেই, ষেঠের কোলে, আমার রথীন এখন পাঁচ বছরের! বউদিদির যদি হ'ত ত' এতদিনে সোণার চাঁদে ঘর ভ'রে যেত!

হরিনামের মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে পিসিমা কহিলেন,—বটেই ত!

সুরমা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, এখন আমাদের উচিত হ'য়েছে দাদার একটা বিয়ে দেওয়া! কি বল দাদা?

শুনিয়া যতীশ যেন কাঠ হইয়া গেল। মনে হইল পৃথিবীটা যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে। সে দুই হাতে শক্ত করিয়া মাটি ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মনে হইল, যাহার বিপক্ষে এই চক্রান্ত সে তাহাদেরই আরামের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও হাস্যমুখী; শুধু যতীশের উপরই একান্ত নির্ভর করিয়া! এই দশ বৎসরের ভিতর সে নিরবচ্ছিন্ন সেবা ও ভালবাসা দান করিয়া আসিয়াছে, লতা যেমন করিয়া তরুকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে, তেমনি এই দশ বৎসর মানদা একান্ত তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। তাহার দরিদ্রের নীড়, এই সন্তানহীনার প্রেমেই উত্তপ্ত।

যতীশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হয় না।

শুনিয়া সুরমা ভারী রাগ করিল, যতীশের বুদ্ধিকে দোষ দিল, পিণ্ড-প্রয়াসী পিতৃ-পুরুষের দুঃখে অশ্রুমোচন করিল, এবং অবশেষে কহিল, আমি গাড়ী ডাকিয়ে এখনই চলে যাচ্ছি।

এত বড় একটা অনর্থপাতের সূচনায় পিসিমা শিহরিয়া উঠিয়া তাহাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া, আরও দু' একদিন যতীশকে সময় দিবার অনুরোধ করিলেন।

সুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বোধ করি বা গাড়ী ডাকাইবার জন্য-ই। পিসিমার অনুরোধে যখন পুনরায় আসন গ্রহণ করিল, তখন বোঝা গেল যে তাঁহার সময়-দিবার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

দু' একদিনে কিন্তু সুরমার যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেই ফুস-ফাস মন্ত্রণা এবং চক্রান্ত যেমন দিনের পর দিন চলিতেই লাগিল, তেমনি প্রবল-পক্ষের জয় এবং দুর্ব্বল-পক্ষের পরাজয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়াই চলিল।

(২)

অগ্রহায়ণের রোদ নরম হইয়া গিয়াছে—দিনের কাজ শেষ করিতে না করিতেই মনে হয় দিন বুঝি ফুরাইয়া আসিল। বাঙ্গলার উৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, সেই উৎসবান্তে শীতের শীতল বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে।

আসন্ন বিপদের একটা অজ্ঞাত সাড়া তাহার মনের মধ্যে কয়দিন হইতেই জাগিতেছিল কিন্তু যতীশের উত্তপ্ত স্নেহের কথা মনে করিয়া মানদা ভাবে, এ বিপদ কাটিয়া যাইবে, বাহিরের

শত্রু যেদিন ম্লানমুখে ফিরিয়া যাইবে, সেই দিন আবার তাহাদের পুরাতন সনাতন প্রেমের মধ্যে তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

যতীশ আজ দুদিন বাড়ী নাই, কোথায় যে গিয়াছে তাহাও মানদা জানে না। কোথা হইতে যেন একটা অপরাধের ভার এই বাড়ীটার উপর চাপিয়া বসিতেছে। শীতের দিনে অকস্মাৎ সন্ধ্যার সূচনা দিয়াছে—দূর দিগন্তে চাহিয়া মানদা দেখিতেছিল যেন প্রেতের মত গভীর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

এমন সময় তাহার ঘরের দুয়ার ঠেলিয়া সুরমা ঢুকিল। সঙ্গে লাজ-রক্তমুখী, কম্পিতদেহ আর একজন কিশোরী।

সুরমা উচ্চকণ্ঠে কহিল, বৌদিদি, এই আমাদের নতুন বৌদিদি, তোমার ছোট বোন।

মানদা পাথরের মত বসিয়া রহিল। মনে হইল এই কিশোরীর মুখ-নিবদ্ধ তাহার দৃষ্টিতে যেন কোন অর্থ নাই, তাহার ছাইএর মত মুখে যেন আর এক বিন্দুও রক্ত নাই। চোখ দুইটা যেন কাঁচের চোখের মত, কোনও জ্যোতি নাই, প্রভা নাই।

কিন্তু মুহূর্ত্তেকের জন্য। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া মানদা নববধূর হাত ধরিয়া নিজের কাছে আনিতে আনিতে বলিল, এস বোন।

তাহার পর তাহাকে আপনার পাশে সযত্নে বসাইয়া চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিল, বলিল, আমার বয়স হ'য়েছে বোন, এই-সব ঘরকন্না এখন তোমার, নিজের চোখে দেখে নিজের হাতে সব করতে হবে,—

এমনই সব কত কথা—রোগী যেমন প্রলাপে বলে। তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া মানদা কহিল, কান্না কিসের বোন। ভয় করছে? না ভয় কিছু নেই—আমি তোমাকে কিছু বলব না।

(৩)

সেইদিন রাত্রে একলা ঘরে শুইয়া শুইয়া যতীশের মনে মনে ভারী অনুশোচনা হইল—বোধকরি মৃত্যুর পূর্ব্বে সিরাজউদ্দৌলার অনুশোচনার যে কাহিনী পড়া যায় তাহারই মতন হইবে। স্বপ্ন দেখিয়াছিল কিনা জানি না; কিন্তু সত্যের যে বিভীষিকা দেখিতেছিল, তাহাও বড় কম নয়। এই দুইটি স্ত্রীকে লইয়া হয়ত কাল হইতে যে রণরঙ্গ সুরু হইবে, তাহা তাহার জীবনের সামান্য অবশিষ্ট শান্তি-টুকুকে সমূলে বিনষ্ট করিবে, হয়ত' বা হৃদ্-যন্ত্রের ক্রিয়া-রোধেরও আর বিশেষ বিলম্ব নাই।

অনবরত দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল—তাহার অন্যায়ের কথা ভাবিয়া। এই দশ বৎসরের কথা মনে পড়িতেছিল—মানদার প্রেম উজ্জ্বল অপার শান্তিময়। নিজের হাতে যে-কাণ্ড করিল, তাহার উপায় কি? একবার মনে হইল নূতন বধূকে ত্যাগ করিয়া পুরাতন পথে

আবার নির্বিরোধে জীবন-যাত্রা সুরু করে কিন্তু সুরমার রাগের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া গেল।

ঘুম আর হয় না। পাশের ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুটা বাজিল।

এমন সময় দুয়ার খুলিয়া যে নারী গৃহে প্রবেশ করিল, সেই অত্যন্ত পরিচিতা মানদাকে দেখিয়া যতীশ শিহরিয়া উঠিল।

মানদা বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে দেখিয়া যতীশ সময়োচিত সম্ভাষণার কথা কি বলিবে ভাবিতে লাগিল। মনে হইল বলে তাহার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করিতে ; মনে হইল নব-বধূকে ত্যাগ করিবার গোপন-কল্পনাটা জানাইয়া দিয়া মানদাকে শান্ত করে—

কিন্তু মানদা সময় দিল না। কহিল, যাবার আগে ছুটি নিতে এলাম।

যতীশ এক মুহূর্ত্তে সোজা হইয়া বসিল, ভাঙ্গা গলায় কহিল—ছুটি—মানদা—?

মানদা হাসিল, কহিল, হাঁ ছুটি! আর কি রাস্তা রেখেছ?

যতীশ দুই হাত যোড় করিয়া কহিল, মানদা, মাপ কর, মাপ কর!

মানদা দুই ঠোঁট চাপিয়া সামলাইতে গেল—কিন্তু চোখ-দুটি অশ্রু-প্রবাহে ভাসিয়া গেল। শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

যতীশ দুই হাত ধরিয়া মানদাকে আপনার কাছে টানিয়া আনিতে গেল—কিন্তু মানদা হাত ছাড়াইয়া লইল।

মানদা কহিল—ঢং করতে হবে না। দশ বছর যার কাছে এক মুহূর্ত্তে ছাই হ'য়ে গেল—তার আবার ক্ষমা চাওয়ার দাম কি? তোমার নতুন সংসারের সুখ নিয়ে তুমি থাক, আমি থাকতে চাই নে।

বলিয়া সে সময়-মাত্র না দিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

খানিকটা ঘামিয়া, খানিকটা কাঁদিয়া হৃদ্-যন্ত্র প্রকৃতিস্থ করিতে যতীশের কিছু সময় গেল। তাহার পর সোরগোল খোঁজা-খুঁজি করিল—কিন্তু আর মানদাকে পাওয়া গেল না।

(৪)

কাশীতে পাঁড়ের হাবেলীতে এক ভাড়া বাড়ীতে কয়জন বাঙ্গালী বিধবা বাস করিতেন, তাহার মধ্যে ছিলেন করুণাময়ী, মানদার মাসী মা। ইঁহার সন্তানগণ কৃতী, কিন্তু করুণাময়ী স্বেচ্ছায় এবং পুত্রগণের সম্মতিতে শেষ-জীবন কাশীতেই যাপন করিবার ইচ্ছায় এখানে থাকেন। বাকী বিধবারাও তাঁহারই পরিচিত; দেশস্থ, এবং তাঁহারাও কতকটা তাঁহারই সঙ্গলাভের জন্যই এখানেই আছেন।

গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া করুণাময়ী সবে ফিরিয়াছেন। আহারের আয়োজনের

উদ্যোগ হইতেছে; তাঁহাকে নিজে রাঁধিতে হয় না, তবে রন্ধনের পূর্ব্বে তাঁহার মতামত লইতে হয়।

রোয়াকের উপর বসিয়া করুণাময়ী মালা জপ করিতেছিলেন, আশে পাশে কয়েকজন বিধবা কি কি রন্ধন হইবে তাহার সশব্দ আলোচনা করিতেছিল।

এমন সময় মানদা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

করুণাময়ী সহসা বুঝিতে পারিলেন না কে। দাড়িতে হাত দিয়া চুমা খাইয়া, মানদার মুখ চোখের কাছে আনিয়া দেখিয়া কহিলেন, ভাল চিনতে পারছি না যে মা—আমাদের মানদার মতন বোধ হয় যে!

মানদা কহিল, আমি মানদা।

হাতের মালা কোলের উপর রাখিয়া, সোৎকণ্ঠে করুণাময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, মানদা, তুই একলা এ-সময়ে যে।

মানদা চুপ্ করিয়া রহিল।

করুণাময়ী বাকী সকলকে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলে তাহারা উঠিয়া গেল। তখন তিনি মানদাকে কহিলেন, এবার বল।

মানদা সকল কথা বলিল।

শুনিয়া করুণাময়ীর নারী-হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি মানদাকে আপনার বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন, এবং চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে নিজেও কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, মা, মেয়ে-মানুষের জীবন-ই এই, কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা যে সইতে হয় তার ঠিক নেই! এত অধীর হ'লে চলবে না মা—নিজের ঘর ছেড়ে কোথায় শান্তি পাবি? এখন দিনকতক থাক আমার কাছে, তারপরে ভেবে দেখো মা।

* * * * *

মাস দুই পরে একদিন করুণাময়ী ও মানদা বসিয়াছিলেন, এমন সময় পাশের বাড়ীর মোক্ষদা ছুটিয়া আসিয়া মানদার প্রায় পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, মা, তোকে ওষুধ দিতে হবে মা, আমি ত' আর বাঁচিনে।

মোক্ষদা বর্ষীয়সী কায়স্থ বিধবা—কাশীতেই বাড়ী, তাঁহার পুত্র মোটা মাইনের চাকুরী করেন। আজ সাত বৎসর যাবৎ মোক্ষদা কঠিন অম্ল-শূল রোগে কষ্ট পাইতেছেন, একথা জানা ছিল, কিন্তু মানদা যে কি হিসাবে তাঁহাকে ওষুধ দিবে, একথা কেহই বুঝিল না।

মানদা বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া সরিয়া বসিল, এবং করুণাময়ী কহিলেন,—মানদা কি ক'রে ওষুধ দেবে বোন—ও ত' ও-সব জানে না।

তখন মোক্ষদা উঠিয়া বসিয়া, খানিকটা হাঁপাইয়া, খানিকটা দম লইয়া, কহিলেন, সে

কি বলব দিদি! কাল সন্ধ্যে থেকে ব্যথাটা উঠেছিল, ক্ষিদে নেই তেষ্টা নেই, কেবলই ছটফট করছি। আমার ক্যাদার কত ডাক্তার ডাকালে কত ওষুধ দিলে, কিছুতে কিছু হ'ল না! কত বাবা বিশ্বনাথকে ডাকলাম, বল্লাম বাবা আর বাঁচিনে, যা হ'ক একটা উপায় কর। যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে রাত্রি দুটো আন্দাজ একটু চোখ জুড়ে এসেছে—তখন দেখলাম কি—উঃ বল্লে বিশ্বাস করবে না দিদি, এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে,—দেখলাম যে স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ এসেছেন, হাতে ত্রিশূল, পরণে বাঘছাল, কপালে আগুন ধক্ ধক্ করছে—হাঁ স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ!

মোক্ষদা খানিকটা থামিয়া, দু'বার ঢোঁক গিলিয়া লইলেন।

করুণাময়ী কহিলেন, তারপর?

উত্তেজনা এবং ভক্তিতে মোক্ষদার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, কহিলেন,—বাবা এসে কটমট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—পাপ করেছিস ফল ভুগবি না?

—মনিষ্যি দেহ ধারণ যখন করেছি, তখন পাপ ত' করেইছি বাবা, কিন্তু যন্ত্রণায় যে ম'লাম, বাবা ক্ষ্যামা দেও!

তখন বাবার চোখ নরম হ'ল, আগুনের ধকধকানি কম্‌লো। তিনি ত্রিশূল দিয়ে তোমাদের বাড়ীর দিকে দেখিয়ে বল্লেন, যা মানদা ওষুধ দেবে—সেই ওষুধ খেয়ে ভাল হবি।—হাঁ তিনি মানদাই বল্লেন, এখনও আমার কানে পষ্ট বাজছে।

বলিয়া, মোক্ষদা আবার মানদার পা শক্ত করিয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

মানদা সভয়ে করুণাময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল,—অম্ল-শূলের ত' আমি কিছু ওষুধ জানিনে মাসিমা!

কিন্তু মোক্ষদা না-ছোড়-বান্দা। কহিলেন, শিব-বাক্যি মিথ্যে হয় না মা! তুমি ওষুধ জান, দিতেই হবে, নইলে এইখেনে হত্যে হব।

মোক্ষদার ভাব দেখিয়া করুণাময়ী মানদাকে আস্তে আস্তে কহিলেন, শুনেছি সাধুরা ভস্ম দেন। উনি যখন ছাড়বেন না, তখন একটু ছাই এনে দেও, বিশ্বাস হ'য়েছে তোমার ওপর—কি-সে যে কি হয় বলা যায় না ত' মা।

মানদা একটু ভস্ম আনিয়া দিলে, পরম-ভক্তিভরে মোক্ষদা তাহাকে মাথায় বুকে ঠেকাইয়া একটু গঙ্গাজলের সহিত মিশাইয়া পান করিলেন।

(৫)

মোক্ষদার আরাম হওয়ার পর হইতে বছর তিনেক কাটিয়াছে। এই তিন বৎসরে মানদার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও অম্ল-শূল রোগী পরম-ভক্তিভরে মানদার ঔষধ সেবনার্থ উপস্থিত হয়। বাংলা-দেশের এক সাপ্তাহিকের

সহকারী-সম্পাদক মানদার দৈব-ভস্ম সেবন করিয়া আরাম হওয়ার পর, মোটা মোটা অক্ষরে তাঁহার সাপ্তাহিকে ২২।৩ ডি পাঁড়ের হাবেলী নিবাসিনী এই অপূর্ব্ব ভৈরবীর শক্তি ও ঔষধের বহু গুণ কীর্ত্তন করিয়া গোটা দুই প্যারা লিখেন, তাহার পর হইতেই বাঙ্গালী রোগীর সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং রোগীদের দেখিবার জন্য এখন একটি পৃথক ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতে একটি ছোট-খাটো শিবমূর্ত্তিও রাখিতে হইয়াছে। অনিচ্ছায় অর্থাগমও হয় মন্দ নয়, কারণ রোগীর দল এ বিষয়ে কতকটা নাছোড়-বান্দা।

বর্ষা কাটিয়া গিয়াছে, আনন্দময়ীর আগমনের শুভ-বারতা দিকে দিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষণ-ক্লান্ত শুভ্র লঘু মেঘ, আকাশে নিরুদ্দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নদীর উদ্দাম জলবেগ শান্ত হইয়াছে, এবং সকালের দিকটা শিউলির গন্ধে এমনি মনোরম হইয়া ওঠে, যে মনে হয় যেন আনন্দময়ীর পারিজাত-বনের সুগন্ধ তাঁহারি সঙ্গে ধরিত্রীর পথে ক্ষণেকের জন্যে বহিয়া আসিয়াছে!

আজ মানদার মনের ভিতরও যেন এই শিউলির তাজা গন্ধের সঙ্গে কিসের একটা সাড়া জাগিয়া উঠিতেছে। গঙ্গাস্নান হইয়া গিয়াছে, ভয় হইতেছে এইবার তাহার রোগীর দল বা আসিতে সুরু করে। সে মনে মনে বলে, হে শিব, হে সুন্দর, হে বিশ্বনাথ—আমাকে এ-কি উঞ্ছের ভিতর ফেলিয়াছ—আর চাই না প্রভু, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও!

ঝি আসিয়া বলিল, এক বাঙ্গালী বাবু এসেছে—ওষুধ চায়।

মানদা বলিল, বল আজ দিতে পারব না। ঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, সে ছাড়ে না।

মানদা বলিল, বিকেলে আসতে বল।

ঝি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তবুও যেতে চায় না।

মানদার রাগও হইল, কৌতূহলও হইল। জানালার নিকট গিয়া দেখিল একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

চিনিতে দেরী হইল না, যে সে যতীশ।

চেহারা দেখিয়া মানদা শিহরিয়া উঠিল। সে রং নাই, সে মূর্ত্তি নাই। মুখের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরগত। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া মানদা মনে মনে ডাকিল, বাবা বিশ্বনাথ!

ঝিকে ডাকিয়া কহিল, নিয়ে আয় বাবুকে ঐ-ঘরে।

ঘরের জানালা দুয়ার বন্ধ করিয়া, মানদা অনেকটা ধুনার ধোঁয়া করিল। যাহাতে তাহাকে চেনা না যায়। অন্য-দিন আর কেহ ঘরে থাকে কিন্তু আজ আর কাহাকেও ডাকিল না।

স্বতন্ত্র আসনে যতীশকে বসিতে দিয়া কহিল, কি রোগ?

—কতদিন হ'য়েছে ?

—তিন বছর হবে।

—অনেক—পাপ করেছো।

—করেছি।

—কি পাপ ?

যতীশ খানিকটা চুপ্ করিয়া থাকিয়া চোখের জল মুছিল ; কহিল, সতী-সাধ্বী প্রথম স্ত্রীকে মনোকষ্ট দিয়ে দ্বিতীয়-বার বিবাহ করেছিলাম।

—তারপর ?

—প্রথম স্ত্রী অভিমান ক'রে চলে গেল,—দ্বিতীয় স্ত্রী বছর-খানেকের মধ্যেই মারা গেল।

মানদাও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কহিল,

—তারপর ?

—একা থাকি, প্রথম স্ত্রীর যাওয়ার পর থেকেই যে অম্লশূল হ'ল, তাহাতেই ভুগি।

—আর বিয়ে করবে না ?

যতীশ দুই হাতে দুই কান ছুঁইবার মত করিয়া কহিল, আর না।

—কেন ?

যতীশ চুপ্ করিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, আমি পাপিষ্ঠ, কিন্তু পাপেরও ত' একটা সীমা আছে! ওষুধ দেবেন কি ?

—যদি না দি'।

—বলবার কিছুই নেই। শাস্তি ত' পেতেই হবে!

ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া মানদা কহিল, চিনতে পার ?

যতীশ দুই চক্ষু মানদার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল। যেমন পিপাসী ধরিত্রী বর্ষার জলধারা পান করে তেমনি করিয়া! দেখিয়া দেখিয়া তাহার যেন তৃপ্তি নাই, দুই চক্ষু অপলক।

তাহার পর দুই-হাতে মুখ ঢাকিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মানদা তাহার হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া কহিল, কি রোগাই হ'য়ে গেছ!

যতীশ চুপ্ করিয়া রহিল।

তাহার পর হঠাৎ মানদার হাত জোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, যাবে আমার সঙ্গে বাড়ীতে ফিরে মানদা ?

মানদা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

যতীশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তবে আমি চল্লাম।

—কোথায় ?

—যেখানে চোখ যায়। সেই ভেবেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।

মানদা তাহার হাত ধরিয়া বসাইল। মনে হইল, সেই তের-বৎসর আগেকার কথা, যে-দিন তাহার প্রথম যৌবনে, অগ্নি সাক্ষী করিয়া এই লোকটিকে সে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর দশ বৎসর অনাবিল প্রেমের বিনিময়ে, তাহাদের ছোট ঘরখানিকে তাহারা স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল। সেই প্রেমকে দীপ্তি দিয়াছিল আকাশের চাঁদ, সৌন্দর্য্য দিয়াছিল বসন্তের ফুল, আনন্দ দিয়াছিল ভালবাসা। এই তিনবৎসর সে ভুলিতে চাহিয়াছিল তাহাকেই, কিন্তু প্রতি-দিনের উঞ্ছের মধ্যেও একমাত্র নিত্য-ভাস্বর ছিল সেই প্রেম। ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুই চোখ দিয়া অবিরত তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মনে হইল সেই অশ্রুর সঙ্গে তাহার বুকের সমস্ত ভার যেন গলিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে!

মানদা চোখ চাহিয়া দেখিল যতীশ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে। যতীশের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মানদা আস্তে আস্তে কহিল, চল, বাড়ীতেই চল।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মুক্তি-বরণ

(সুভাষচন্দ্রের প্রতি)

কোথায় বন্ধু, কোথায় তোমারে বরণ করি—
এ আঁধারে কোথা আরতির দীপ জ্বালায়ে ধরি ?
দেশের বিরাট বন্দীশালায়
ক্ষোভে অপমানে তীব্র জ্বালায়,
শত বন্ধনে ক্রন্দন ওঠে জীবন ভরি'।
তোমার শঙ্খ কেঁপে ওঠে হাতে সরমে মরি।

রক্তজবার বরণ মালিকা কোথায় রাখি,
প্রহরী দাঁড়ায়ে ভয় হয় মনে কি বলে ডাকি,
হাতে পায়ে বাঁধা লোহার শিকল
চির-বন্দীরে করেছে বিকল,
কঠিন প্রাকার ঘিরি চারিধার রাঙায় আঁখি,
অনুরাগে রাঙা করবী কুসুম শুকাবে নাকি ?

কোন্‌খানে ওগো, কোন্‌খানে করি পূজার ঠাঁই—
দর্পিত বলে মাটি কাঁপে তোমা কোথা বসাই ?
সাত কোটি প্রাণী আপনার ঘরে
পরের দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরে
জন্মভূমির এতটুকু ভূমি নিজের নাই
তীর্থক্ষেত্রে মেলে না ঠাকুর পূজার ঠাঁই।

বন্দীরে আজ বন্দনা কিসে করিবে কবি,
রক্ত-সন্ধ্যা নিভাল দিনের উজল রবি,
শাসন-দণ্ডে বাণী তার মূক
অপমান-ভয়ে লেখনী বিমুখ
রক্ত-রেখায় ফুটে ওঠে শুধু প্রেতের ছবি
হে "রাজবন্দী" কি গান গাহিবে অভাগা কবি ?

আপনার দেশে স্বদেশী স্বজন নির্ব্বাসিত
আপনার ছায়া হেরি বিহ্বল মরণ-ভীত,
পথে ঘাটে মাঠে বন্দীর দল
বুকে হাত রাখি ফেলে আঁখিজল
গৃহদীপমালা দশাহীন আজ নির্ব্বাপিত,
কারাগার হ'তে তুমি হ'লে দেশে নির্ব্বাসিত।

নির্ব্বাসনের আসনে তোমায় কেমনে ডাকি ;
অভিষেক করি' প্রাণের বেদনা গোপন রাখি,
দাস-জীবনের কলঙ্ক কথা
গ্লানি লাঞ্ছনা বন্ধন-ব্যথা
তোমার অর্ঘ্য ফুল হয়ে ফোটে শোণিত মাখি,
এ নিঠুর পূজা গ্রহণে হৃদয় ছিঁড়িবে না কি ?

অন্তরে তুমি রয়েছ মুক্ত আপন বলে
নয়নে তোমার মুক্তি-পূজার অনল জ্বলে,
অবনত দেশে উন্নত শির
ব্যথার পূজারী নির্ভীক বীর,
তুমি যে মুক্ত বিজয়মাল্য তোমার গলে,
অপমান তব কেমনে করিব পূজার ছলে ?

কঠিন নিগড়ে বন্দী যাহারা আপন ঘরে
কেমন করিয়া তোমারে তাহারা বরণ করে ?
দিবসরাত্রি আর্ত্ত-রোদন
করে ধ্বংসের অকাল বোধন,

তোমার বিজয় যাত্রার পথে নিশান ধরে'
তারা যে কেবল বাড়াবে লজ্জা গর্ব্ব ভরে।

আজিকে দাসের ভবনে ভুবনে মিথ্যা মায়া
অবিরাম ফেলে সর্ব্বনাশা এ প্রেতের ছায়া,
জীবন্ত লয়ে আজি এ শ্মশান
মৃত-যাগে করে নিশা অবসান,
আপনারে শুধু বঞ্চনা করে নাহিক হায়া,
যেন প্রাণবায়ু নিঃশেষ শুধু জাগিছে কায়া।

ছায়া দোলে আর মনের দোলায় মরণ দোলে
মরীচিকা হাসে মৃত্যুর হাসি মরভু কোলে,
দেবতা দৈত্যে বাধিয়াছে রণ
প্রলয়-সিন্ধু করি' আলোড়ন
কি জানি কখন অমৃত ফেলিয়া গরল তোলে
ধূমকেতু ওই মেলিছে পুচ্ছ মেঘের কোলে।

শব পড়ে আছে মহাশ্মশানের বক্ষ 'পরে
শকুনি উড়িছে প্রাণহীন দেহ লক্ষ্য করে
অদৃশ্য হ'তে ওঠে হাহাকার
আঁধার ছেয়েছে এপার ওপার
শ্রাবণের শেষ নিশি-দুর্য্যোগে তোমার তরে,
শবাসন তাই রচিল বিধাতা আপন করে।

গগনে পবনে বনে বনে আর দাসের মনে
শোধন-বহ্নি উঠুক জ্বলিয়া পরম ক্ষণে,
মৃতের অস্থি দহন-জ্বালায়
জাগিয়া উঠুক বন্দীশালায়
বাজাও তোমার হাতের শঙ্খ গভীর স্বনে
শ্মশানের শব উঠিয়া দাঁড়াক সঞ্জীবনে।

ধিকি ধিকি জ্বলে শ্মশান-বহ্নি ; তালবেতাল
ডম্বরু বাজে, বাজে ঘন ঘন নরকপাল,
এই শ্মশানের যোগাসন 'পরে
তোমারে বসাই অভিষেক ক'রে
তোমার কণ্ঠে শব-সাধনার মন্ত্রজাল
অগ্নি-শিখায় দিক ছেয়ে দিকচক্রবাল।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"আগমনী"-গীতের একটী লুপ্তরত্ন

[রচনা—ভক্ত গায়ক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র রায়]

হর দিগম্বর, ভব মহেশ্বর, পিণাকি শঙ্কর, কর আজ্ঞা কর।
স্বয়ম্ভূ আশুতোষ, কোরো না অসন্তোষ, জনকালয়ে যাব, গিরীশ বাঘাম্বর ॥
জননী দেখিতে মন হয়েছে উচাটন, করহে অনুমতি পূজিব সে চরণ,
কোরো না অন্যমন—করহে আজ্ঞা কর ॥
পুত্রশোকে মায়ের নয়নে শতধার, মা বলিতে নাই আর হাহাকার অনিবার :
তিন দিনের জন্য তাঁর—দুঃখ হর হর ॥
সিন্ধু-সলিলে ভাই ডুবিল যে দিনে, সেই দিন হোতে মায়ের ধারা দু'নয়নে :
অচল' হোলেন জনক—শোকেতে নিরন্তর ॥
জ্ঞান কয় কত গুণ ধরগো হরজায়া, যে গুণে গিরিসুতে জননী গিরিজায়া ;
স্বগুণে সেই গুণে—নির্গুণে তারা তার' ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আলা-হিয়া - - ঝম্পক্ (ঝম্পা)।

২´　　　৩　　　০　　　১
| ধা ধা | ধা গি কী | টি কিট্ | ধ্যা কী টি |
| ধী না | ধী ধী না | তী না | ধী ধী না |
১ ২ | ৩ ৪ ৫ | ৬ | ৮ ৯ ১০

স্থায়ী।

৩
II {ধা না -ধা I পা পা | -মা -গা -রগা | মা পা | গা গা -রসা I
হ র ০ দি গ ০ ০ ০ম্ ব র ভ ব ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´
I সা সা | -গা -মা -পধা | না র্সা | র্রা র্সা -না I ধা পা |
ম হে ০ ০ ০শ্ শ্ব র পি ণা ০ কি শ

৩ ০ ১ ২´ ৩
| -ধা -না -র্সনা | ধা পা | মা পা -ধা I না -র্সা | -র্রা -র্সা না |
০ ০ ০ঙ্ ক র ক র ০ আ ০ ০ ০ জ্ঞা

৩
| ধা পা } | { মা মা -গা I গসা সা | র্সা র্সা র্সা | -নর্সা র্রা
ক র স্ব য় ০ ০ম্ ভূ আ শু তো ০ ০ ষ

১ ২´ ৩ ০ ১
| র্গা র্রা -র্গা I র্মা র্মা | র্গা -র্রর্গা র্রা | -র্মর্গা র্রর্সা | পা পা ধা I
কো রো ০ না অ স ০ন্ তো ০০ ষ০ জ ন ক।

২´ ৩ ০ ১ ২´
I -নর্সা না | ধা -পা -মা | গর্রা র্সা | না ধা -পা I মা গা |
০০ ল য়ে ০ ০ যা০ ব গি রী ০ শ বা

৩ ০
I রগা -মপা -ধনা | র্সনা ধপা } II
ষা০ ০০ ০ম্ ব০ র০

অন্তরা।

১ ২´ ৩ ০ ১
II {ধা পা পা I -না ধা | ধা না -র্সা | র্সা -র্সনা | র্সা রা র্গা I
জ ন নী ০ দে খি তে ০ ম ০ন্ হ য়ে ছে

২´ ৩ ০ ১ ২´
I -র্রা -র্সা | র্সা র্সা । | ধা -ধপা | ধা ধা গা I -মা -গা |
০ ০ উ চা ০ ট ০ন্ ক র হে ০ ০

৩ ০ ১ ২´ ৩
| মা মা -পধা | ধা ধনা | র্সা র্গা র্রা I র্সা -া | -না -র্সা র্সা
অ মু ০০ ম তি০ পূ জি ব সে ০ ০ ০ চ

০ ১ ২´ ৩ ০
| র্সা -ধপা} | {গা গা গা I -গমা -পমা | গা -রা রসা | সা -সগা |
র ০ণ্ কো রো না ০০ ০০ অ ০ ন্তু০ ম ০ন্

১ ২´ ৩ ০
| গা গা গা I -পা -া | ধা -া র্সা | র্সা ধপা} II
ক র হে ০ ০ আ ০ জ্ঞা ক র০

সঞ্চারী।

১ ২´ ৩ ০
II {সন্‌া -ধ্‌া সন্‌া I ধ্‌া নধ্‌া | -পধ্‌া ন্‌া ধপ্‌া | -মগ্‌া -মপ্‌া |
পূ০ ০ ত্র০ শো কে০ ০০ মা য়ে০ ০০ ০র্

১ ২´ ৩ ০ ১
| ম্‌া -গম্‌া প্‌া I ধন্‌া -সন্‌া | ধসা -নধ্‌া প্‌া | গপ্‌া -ধসা | রা -গা রা I
ন ০০ য় নে০ ০০ শ০ ০১ ত ধা০ ০ ০ ব

২ ৩ ০ ১ ২´
I সা পৃধ্ | -পৃধ্ নৃসা -নৃসা | সগা -মপা | ধা -া পা I মা -গা |
লি তে০ ০০ না ০ই আ০ ০র্ হা ০ হা কা র্

৩ ০ ১ ২´ ৩
| গা -রা পা | মগা -রসা } | { সা -রগা -রসা I পৃ ধ্পৃ | -পৃধ্ নৃসা না |
অ ০ নি বা০ ০র্ তি ০০ ০ন্ দি নে০ ০র্ ভ্ঞ০ ব্ধা

০ ১ ২´ ৩ ০
| সা -সগা | মা -পধা পা I মা গা | -রা -পা -া | মগা রসা } |
তা ০র্ দু ০০ খ হ র ০ ০ ০ ভ০ র০

১ম আভোগ।

১ ২´ ৩ ০ ১
| { সা -সগা গা I মা পা | পা -া -ধা | মা -মপা | পা পা পা I
সি ন্ ধু স লি লে ০ ০ ভা ০ই ডু বি ল

২´ ৩ ০ ১ ২´
I -না -ধা | -না -র্সনা ধা | ধা ধপা | গা -া -রগা I মা -পমা |
০ ০ ০ ০০ যে দি নে০ সে ০ ০ই দি ০ন্

৩ ০ ১ ২´ ৩
গা গা -গা | রা রসা | গা মা -পা I ধা -পা | -মা গা রপা |
হ তে ০ মা য়ের্ ধা রা ০ দু ০ ০ ন র০

০ ১ ২´ ৩ ০
মগা -রসা } | { সা র্সা র্গরা I র্গা র্রা | -র্গমা -র্গরা র্মা | র্গরা -র্রসা
নে০ ০০ অ চ ল০ হ লে ০ ০ন জ ন০ ০ক্

১ ২ ৩ ০
| না ধা পা I -মা -গা | রা পা -মগা | গরা গসা } II
শো কে তে ০ ০ নি র ০ন্ ত০ র০

২য় আভোগ।

১ ২´ ৩ ০ ১
| { সা -গা -পধা I ধা -া | পা মা -পা | পা -নধা | র্সা র্সা র্সা I
জা ০ ০ন্ ক য় ক ত ০ ঙ ০ণ্ ধ র গো

২´ ৩ ০ ১ ২
I -না -র্সা | -র্গা র্রা র্গর্রা র্গর্মা র্মর্গা র্রা র্গা র্রা I র্মা র্গা
০ ০ ০ গি রি০ জা০ য়া০ নে গু ণে গি রি

৩ ০ ১ ২´ ৩
| -র্রা -র্সা -র্র্সা না ধপা মা গা রগা I সা গা | -সা -রা -গা |
০ ০ ০০ সু তে০ জ ন নী০ গি রি ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০
| মগা মপা } { না ধা সর্রা I র্সা -র্গা | -র্রা র্সা -র্সধা | না পমা |
জা০ য়া০ স্ব গু ণে০ সে ০ ০ ০ ০ই গু০ণে০

১ ২´ ৩ ০
| গা -মপা পধা I না ধনা | -র্সা -র্গা -র্র্সা | -নর্সা ধপা } II II
নি র্গু ণে০ তা রা০ ০ ০ ০০ তা০ ব০ }

কৈফিয়ৎ

আমাদের বাংলা দেশে সুরটার বানান্ আমরা এই রকম করি, যথা—আলেয়া বা অলহিয়া কিংবা অলস্থা। এখানে কিন্তু আমরা লিখেছি—আলা-হিয়া, অর্থাৎ মাঝে একটা হাইফেন বসিয়ে। তা'ই কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলতে বাধ্য হ'তে হ'লী যে, শব্দটী ফার্সী-হিন্দী মিশ্রিত অর্থাৎ উর্দ্দূ শব্দ। ফার্সী শব্দ আলার অর্থ উচ্চ বা মহিমান্বিত। হিন্দী শব্দ হিয়ার অর্থ হৃদয়। একত্রে দু'টার মানে—এমন একটা সুর যা উচ্চ-হৃদয় হ'তেই বেরোয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যেমন—সদর-আলা। অর্থাৎ সদরের উচ্চ বা মহিমান্বিত ব্যক্তি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জেলার জজ্‌কে সদর-আলা বলা হয়। আফিসের বড়-বাবুকে বলা হয় আলা-এ-দফ্তর। অবশ্য লক্ষ্ণৌ-ডিভিজনে বড়-বাবুকে বলা হয় সর্-এ-দফ্তর (Head-Clerk—কেরাণীদের মাথা)। সুতরাং আলা-হিয়া উর্দ্দূ শব্দ; আর তা'ই আলেয়া বা অলহিয়া কিংবা অলস্থা উর্দ্দূ-ব্যাকরণ অনুযায়ী ভুল।

—লেখিকা।

সিরাজির পেয়ালা

(১)

একটি মুখ আমার প্রায়ই মনে পড়ে। টেলিগ্রাফ তারের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকার পর চোখ ফিরাইলেও যেমন তারের ছবি চোখ হইতে মুছিতে চায় না, তেমনি এই মুখখানি কিছুতেই আমার মন হইতে মুছিল না। আজ এই বাইশ বৎসরের কত নব নব অনুভূতির উপরে উপরে সে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ এই মুখের সহিত পরিচয় আমার কত অল্প! কত ক্ষণিকের! ক্ষণিকের মধ্যেই Sewing Machine-এর সূচের ন্যায় সে আমাকে বিদ্ধ করিয়াছে, এবং একটি অক্ষয় গ্রন্থি রাখিয়া গিয়াছে!

তখন আমার বয়স বার তের বৎসর হইবে। আমরা দার্জ্জিলিঙ্ বেড়াইতে যাইতেছিলাম। প্রথমটা মেয়েদের গাড়ীতে আমি ও আমার মা ছাড়া অন্য যাত্রী ছিল না। কিন্তু ট্রেণ ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বে একজন ভদ্রলোক একটি অবগুণ্ঠিতা যাত্রীকে আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

যাত্রীটি গাড়ীতে উঠিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে ঘোম্‌টা খসাইয়া ফেলিলেন, একবার স্মিত মুকুলিত চোখে ও দাঁতে হীরামুক্তার ছিনিমিনি খেলিয়া চারিদিক দেখিয়া লইলেন, তারপর ধপ্‌ করিয়া আমার পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ভাই ?"

আমি। আমার নাম সুকুমারী।

যুবতী। আর তোমার দিদির নাম সাবিত্রী।

আমি কৈ আমার ত দিদি নেই।

যুবতী। নেই ? বাঃ! মাকে জিজ্ঞাসা কর। উনি অবশ্য বড় মেয়েকে দেখ্‌তে পারেন না ব'লে মুখ ফিরিয়ে আছেন।

বাবা। এ ত আলাপন নয়! এ যেন আক্রমণ! এ যেন ভাঁজ করা হৃদয়-আসনকে এক ঝাঁকানিতে মাটীতে বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া পড়া!

পরিচয় হইল।

সাবিত্রীর পিতা যৌবনে একটু সাহেবঘেঁসা লোক ছিলেন। তিনি মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন 'প্রীতিবেণু'। এবং তিন বৎসর বয়সে যখন সে মাতৃহীন হয় তখন তাহাকে মানুষ করিবার জন্য একজন কৃশ্চান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিন্তু তাহার পিতার মতের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তিনি গুরুর কাছে মন্ত্র লইলেন, নূতন করিয়া মেয়ের নামকরণ করিলেন "সাবিত্রী", এবং তাহাকে গীতা ভাগবৎ ইত্যাদি সদ্‌গ্রন্থ শিখাইবার জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন।

শিক্ষয়িত্রী বিদায় হইল। পণ্ডিতের কাছেও বেশীদিন বিদ্যালাভ করিবার অবসর হইল না। কারণ, সে তখন বিবাহযোগ্যা।

সাবিত্রীর জন্য পাত্র যোগাড় করিতে পিতাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। কারণ দেখিতে সুন্দর, লেখাপড়ায় ভাল, উপার্জ্জনক্ষম, অথচ হিন্দুশাস্ত্র ও আচারের প্রতি নিষ্ঠাবান্‌—এমন পাত্র সুলভ নহে। যাহা হউক, অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় পিতা তাঁহার মনের মত পাত্র পাইয়াছিলেন। তবে এটিকে সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

যে ভদ্রলোক সাবিত্রীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন, তিনিই তাহার স্বামী।

আমার মা বলিলেন "সত্যি চাঁদের মত ছেলে। ছেলেটি কি করেন ?"

সাবিত্রী। ডেপুটীর কাজে বাহাল হয়েছিলেন। সম্প্রতি কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাচ্চেন।

মা আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন "কাজ ছেড়ে দিলেন কেন ?"

সাবিত্রী সহজভাবেই উত্তর করিল, "দেশের কাজ করবার জন্য।"

সেটা ১৯০৫ সাল। নবোদিত স্বদেশী আন্দোলনের আতপ্ত অরুণরাগে এই দেশভক্ত যুবক তখন অপূর্ব্ব দীপ্তি-মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল।

মা বলিলেন 'সত্যিই তুমি বড় ভাগ্যবতী।'

সাবিত্রী কোন উত্তর করিল না, একটু হাসিল।

মা। এত বড় ত্যাগ! কটা লোক কর্‌তে পারে?

সাবিত্রী। তা সত্যি। সকলে পারে না।

মা। সকলেই নিজের স্বার্থ আঁক্‌ড়ে ধ'রে থাক্‌তে চায়। যিনি ত্যাগ করতে পারেন তিনি মহাপুরুষ।

সাবিত্রী। তা সত্যি। মাথায় চুল রাখার চেয়ে চুল কামালে আমরা বেশী ভক্তি করি।

সাবিত্রী কি পরিহাস করিতেছে? তাহার মুখ দেখিয়া ত এরূপ সন্দেহ হয় না।

কিছুক্ষণ আমরা সকলেই চুপ করিয়া রহিলাম। সাবিত্রীই প্রথম কথা কহিল। বলিল, "আপনারা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করচেন?"

মা। নিশ্চয়

সাবিত্রী। আমিও কর্‌চি। আমার স্বামী বিলাতী জিনিস ঘরে ঢুক্‌তে দেন না কিনা, তাই।

আমি থাকিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম "শুধু সেই জন্য? তা না হ'লে আপনি বিলাতী জিনিস কিন্‌তেন?"

সাবিত্রী। আমি কিন্‌বো কোথা থেকে? উপার্জ্জনও করি না, বাজারও করি না।

আমি। আপনি যদি নিজে বাজার করতেন তা হলে কিন্‌তেন ত?

সাবিত্রী। সব কিনতুম কি? যে গুলো সস্তা আর দরকারী, কেবল সেইগুলো কিন্‌তুম।

আমার মা বলিলেন 'ছি, ছি! দেশের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে না?'

সাবিত্রী। দেশ? কোন দেশ? কার দেশ? আমার স্বামী দেশের জন্য যুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত হয়ে এসে বল্‌বেন, 'সিরাজি লে আও, সরবৎ লে আও।' আমি পেয়ালা ভ'রে সিরাজি আন্‌বো, সরবৎ আন্‌বো। স্বামী যখন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে এসে বল্‌বেন, 'সিরাজি লে আও, সরবৎ লে আও।'—তখনও আমি পেয়ালা ভ'রে সিরাজি সরবৎ জোগাব। আমাদের আবার দেশ কোথায়?

বলিতে বলিতে সাবিত্রীর দুই চক্ষু দুটা উল্কা-পিণ্ডের মত দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল।

মা বলিলেন 'অবশ্য স্বামীর সেবা করাই আমাদের প্রধান কাজ।'

সাবিত্রী। তাই ত বল্‌চি।

মা। কিন্তু স্বামী যদি অসৎপথে যান, ত তাকে ফিরিয়ে আনাও আমাদের কাজ।

সাবিত্রী। ফিরিয়ে এনে আমাদের লাভ? তিনি ভালই হোন, মন্দই হোন, আমার কাজ থাক্‌বে সিরাজি জোগান।

মা। আমাদের লাভ যদি নাও থাকে, তা হলেও আমাদের যা কর্ত্তব্য তা ত' করতে হবে।

সাবিত্রী। আমার কর্ত্তব্য ত শেষ করে দিয়েছি।

মা। সে কি কথা! শেষ করে দিয়েছ, এমন কথা বোলো না।

সাবিত্রী। হাঁ শেষ করে দিয়েছি। তাঁরা চেয়েছিলেন সাত হাজার টাকা আর এই রূপ। আমার এই দেয় আমি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিয়েছি।

মা। তুমি ভুল করচো। শুধু রূপই কি চেয়েছিলেন? তা নয়। তবে কি জান? যাকে গৃহিণী কর্‌বে তাকে একটু দেখে নিতে হয় বৈ কি।

সাবিত্রী। তাই ত বল্‌চি! দেখে নিয়েছিলেন। চুল খুলে, দাঁত গুণে, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে গায়ের রং দেখে নিয়েছিলেন।

মা। তা দেখুন। কিন্তু দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও চেয়েছিলেন।

সাবিত্রী। না তা চান নি। যে লোক পাপিয়ার সুর শুন্‌তে চায়, সে কি লাল নীল পালক দেখে পাখা কেনে?

মা। তাঁরা নাই বা চাইলেন। তুমি না হয় নিজেই কিছু দিলে।

সাবিত্রী। তাও কি হয়? তাঁদের পাওনার এক কড়াও ত ছাড়েন নি। আমার দেনার চেয়ে এক পয়সা বেশী দোবো কেন?

ঘট্ ঘট্ ঘট্ ঘট্ করিয়া পোড়াদহে আসিয়া গাড়ি থামিল। সাবিত্রী তাড়াতাড়ি মা'র পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "তোমার পাগল মেয়েটীকে ক্ষমা কোরো, মা। আর হয়ত কখনও দেখা হবে না।" তারপর আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল এবং লম্বা ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া গেল। তাহার স্বামী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

উৎসব রজনীর দুর্গন্ধ এসেটিলিন ল্যাম্পটা স্থানান্তরিত হইতেই বুঝিলাম আমরা পড়িয়া আছি আকাশ জোড়া অন্ধকার ও ঔদাস্যের মাঝখানে! সাবিত্রীর কথার মধ্যে অনেকটা ঝাঁজ ছিল, তিক্ততা ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সে এত আপনার হইয়া উঠিয়াছে যে নিজের সাজা পানের মত, তাহাকে বিস্বাদ বলিয়া ত্যাগ করা যায় না। তাহার সকল কথার তাৎপর্য্য তখন বুঝি নাই। তবে যেটুকু বুঝিয়াছিলাম তাহাতে প্রাণের মধ্যে হাহাকার করিতে লাগিল। পছন্দ করিবার মত বর ত সে পাইয়াছে। কন্যার কাম্য রূপ, মাতার কাম্য বিত্ত, পিতার কাম্য শ্রুত,—সবই ত পাইয়াছে। অথচ সে সুখী হইল না কেন? হৃদয় জয় করিবার শক্তি ত তাহার আছে। এমন অনিন্দ্য রূপ, এত মধুর ব্যবহার। স্বামীর কাছে এগুলির কি কোন দাম নাই? একেবারে কান-পর্য্যন্ত-টানিয়া-ছাড়িয়া-দেওয়া তীরের ক্ষুরধার ফলাটা, হায়, হায়!—এ এক কোন অনুপম পাষাণপ্রতিমার পদপ্রান্তে আপনাকে ব্যর্থ করিল!

সাবিত্রীর সহিত আমাদের দু'একখানা চিঠি চলিয়াছিল। শেষে সেই তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। কারণ "বাহিরের লোকের সহিত চিঠির আদান প্রদানের অধিকার পৃথিবীর কোন কয়েদীরই

নাই।" ইহার পরে অনেকদিন তাহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। তারপর একটা কাণ্ড ঘটিল। স্বদেশীর নামে দেশের আবালবৃদ্ধ যখন মাতিয়া উঠিয়াছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে একদল মুসলমানও মাতিলেন। জামালপুরে তাঁহারা নিজেদের মত্ততা, বীর্য্যবত্তা ও পৌরুষের পরিচয় দিলেন, দেবমূর্ত্তি ভাঙিয়া ও হিন্দুনারীর প্রতি অত্যাচার করিয়া। সংবাদ পাইলাম, জামালপুরের রক্ততাণ্ডবে যাহারা নিষ্পেষিত হইয়া গেল, সাবিত্রী তাহাদের মধ্যে একজন।

সাবিত্রী স্বামীগৃহে ফিরিবার চেষ্টা করিল, দেখিল দুয়ার বন্ধ। বন্ধুগৃহে ফিরিবার চেষ্টা করিল, দেখিল, দুয়ার বন্ধ। যে হিন্দুসমাজে সে এতদিন বাস করিতেছিল সে যে কখন শিমুল ফলের মত চৌচির হইয়া ফাটিয়া তাহাকে নিষ্কাসিত করিয়া দিয়াছে সে তাহা জানিতেও পারে নাই। আজ ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িতে উড়িতে সে যে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে তাহা সেই বা কি জানে? অপরেই বা কি জানিবে?

সাবিত্রীর সংবাদে আমার পিতা একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন "হতভাগা দেশ! স্বদেশী করবে! আমি কাল থেকে বিলিতী কাপড় কিন্‌বো। সমাজের ভয়ে নিজের নিরাপরাধ স্ত্রীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়,—তারা আবার দেশ উদ্ধার করবে!"

আমি বলিলাম, 'বাবা, আমাদের কি উচিত নয় তাকে খুঁজে বার করা?'

বাবা বলিলেন, "আমার কি অনিচ্ছা? কিন্তু তাকে ঘরে আন্‌বো কি ক'রে? সমাজের লোকে আমার মাথাটা চিবিয়ে খাবে যে!"

তখন আমার বয়স অল্প। যে উৎপীড়ন করিল তাহাকে দণ্ড না দিয়া, যে উৎপীড়িত, তাহার উপরেই দণ্ডবিধান হইল কোন বিচারে, তখন বুঝিতে পারি নাই।

তখন বুঝিতে পারি নাই। এখন কিন্তু বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।

নারীধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা,দেশের কবাটরক্ষক যুবকের দল যাহাদের ভয়ে ঘরে খিল আঁটিয়া বসিয়াছিলেন, সেই দুর্বৃত্তদের সহিত গায়ের জোরে যে অভাগিনী পারিয়া উঠিল না, তাহার কি কম অপরাধ! সিরাজির পেয়ালাতে কুকুরে মুখ দিয়াছে, এখন তাহাকে টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিতে হইবে, ইহার চেয়ে সহজ কথা আর কি আছে?

আজন্ম যাহাকে পিঁজারায় বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, কখনও রাস্তায় পদার্পণ করিতে দেওয়া হয় নাই, কখনও জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের আকাশের দিকে চাহিতে দেওয়া হয় নাই, হঠাৎ একদিন তাহাকে পথের মাঝখানে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, 'তুমি নিজের পথ দেখ'—ইহার চেয়ে নৃশংসতা আর কিছু থাকিতে পারে না বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এটা কুসংস্কার। উচ্ছিষ্ট পেয়ালাটাকে কাচের আলমারী হইতে বাহির করিয়া আঁস্তাকুড়েই ত ফেলিতে হয়।

ওগো পবিত্র আঁস্তাকুড়, যাহার ঘর নাই, দ্বার নাই, বন্ধু নাই, স্বজন নাই, যাহাকে দয়া

করিবার ভয়ে সমাজ মুখ ফিরাইয়াছে, যাহার প্রতি ন্যায়বিচার করিতে বিধাতার হাত কাঁপে, তুমি তাহাকেও কোল দিয়াছ। তোমার করুণায় কার্পণ্য নাই, পক্ষপাত নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই। তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

(২)

আমার অতীত জীবনের শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে বসিয়া কিছু গোপন রাখিব না। যে কথা কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে নাই, আজ লজ্জার মাথা খাইয়া সে কথাটা নিঃশেষে বলিয়া ফেলি,—কন্যকাবস্থায় একজনকে ভাল বাসিতাম।

দুর্লভের প্রতিই বোধহয় মানুষের লোভ বেশী। শচীশ যে কত দুর্লভ তাহা বুঝিতে আমার বাকী ছিল না। আমি বৈদ্য, আর তিনি কায়স্থ। আমাদের দুজনের মিলন যে কল্পনাতেও অসম্ভব, একথা আমার খুব ভাল করিয়াই জানা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই আমার হৃদয়সিন্ধু যখন উদ্বেল হইয়া উঠিত, সে ত কোন শাস্ত্র মানিত না। শাস্ত্রের দোহাই পাড়িলে সে থামিবে কেন ?

আমার পিতা সরকারী ডাক্তার ছিলেন। কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে অনেক স্থানে ঘুরিতে হইয়াছে। কিন্তু কোথাও তিনি স্থায়ী হইতে পারেন নাই। এই কারণে আমাকে কোন স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় নাই, আমার কোন সঙ্গীও জুটে নাই। আমি private tutor-এর কাছে লেখা-পড়া শিখিতাম, এবং লেখাপড়াতেই অধিকাংশ সময় কাটাইতাম।

পিতা যখন চাকুরী ছাড়িয়া শিবপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে বসিলেন, তখন হইতে শচীশের সহিত আমাদের পরিচয়। তখন হইতে একটা নূতন কাজ পাইলাম।

শচীশবাবু প্রতিদিন বৈকালে দাদার সহিত টেনিস খেলিতে আসিতেন। এই সময়ে আমার কাজ ছিল ground-এ দাঁড়াইয়া থাকা, আর মাঝে মাঝে তাঁহাদের দুএকটা বল কুড়াইয়া দেওয়া! আমার মনের চাঞ্চল্য শচীশের মনেও কি তরঙ্গ তুলিত? বলিতে পারি না। তিনি আমাকে যে দুএকটা হুকুম করিতেন, সহজভাবেই করিতেন। সে হুকুম পালন করিতে গিয়া আমি কিন্তু ঘামিয়া সারা হইতাম। "এক গেলাস জল আন ত।" "আমার ব্যাট্‌টা কোথাও রেখে দিও।" এই রকম দুএকটা কথার অশরীরী স্পর্শে আমার হৃদয়-শতদলের সমস্ত পাপড়িগুলা রী রী করিতে থাকিত! কি জানি, প্রেমের ভাষা ত সকল সময়ে এক নয়!

শচীশ যেদিন পাশ করিয়া বড় বৃত্তি পাইলেন সেদিন সেই সৌভাগ্যগর্ব্বে আমার বুক ভরিয়া গেল। যেদিন ঐ বৃত্তির সাহায্যে তিনি বিলাতে বিদ্যালাভ করিতে গেলেন, সেদিনও আমার গৌরবের দিন। কিন্তু সৌভাগ্যের চন্দ্রসূর্য্য দুটা এক line-এ থাকিয়া আমার মনপ্রাণকে দ্বিগুণতর উদ্ভাসিত করা দূরে থাক, একেবারে গাঢ় তমিস্রায় ডুবাইয়া দিল।

আমি পড়াশুনায় বেশী করিয়া ঝোঁক দিলাম, মায়ের কাছে গৃহকর্ম্ম শিখিতে লাগিলাম,

এবং সন্ধ্যার সময় বাবার কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া আমাদের বাহিরের ঘরে যে তাসের আড্ডা জমাইতেন তাহাতে চা পানের ফরমাস খাটিতে লাগিলাম।

* * * * *

বাবার বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সকলকেই আপনার লোক বলিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলাম। কেবল একজনকে বড় ভয় করিতাম। শুনিয়াছি তিনি এক সময়ে বাবার সহপাঠী ছিলেন। একই ছাঁচ হইতে বাহির হইয়া দুইটি লোক যে এত ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। ভদ্রলোকের নাম ছিল, আশুতোষ। নামের এমন অখণ্ড ব্যর্থতাও কোথাও দেখি নাই। আশু কেন? কোন কালেও যে কেহ তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিবে একথা বিশ্বাস করা শক্ত। ঘরের সাজা পান দিলে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন "Home industry? রক্ষা কর! My mouth is not lined with buffalo hide.'' দোকানের কেনা পান দিলে বলিতেন "গৃহকর্ত্রীকে বাহবা দিই, দোকানদার খাসা পান সেজেছে।"

সকলেই খানিকটা সময় আমার সহিত আলাপ করিতেন; আমি কি পড়িতেছি, কেমন গান শিখিতেছি জানিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিতেন, এবং আমার লেখা প্রবন্ধ বা আঁকা ছবি দেখিয়া তারিফ করিতেন। আশুবাবু কিন্তু এসব বিষয়ে কখনও কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার আলাপ ছিল কাস্তের ঠোকরের মত—

"Come here, Eternal Hottentot." "নাকে ছেঁদা ক'রে একটা কাটি গোঁজা হয় নি যে।" "হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি পরচো কবে?" ইত্যাদি।

তাঁহার প্রতি কথায় আমার গা জ্বালা করিত। ইচ্ছা করিত খুব কড়া কড়া জবাব দিই। কিন্তু নিজের জ্বালা সামলাইতেই সময় কাটিত। জবাব জোগাইয়া উঠিত না।

আমার অবস্থা দেখিয়া মধুবাবুর হয়ত দয়া হইত। তিনি একদিন আশুবাবুর আলাপে বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি কেবল মেয়েটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কর। ও এই বয়সে কত লেখা পড়া শিখেছে জান?"

আশু। জানবার দরকার নেই! বুঝ্‌তে পারচি।

মধু। তার মানে?

আশু। তার মানে শেখালে মেয়েদেরও শেখান যায়। এই সেদিন সার্কাসে দেখলুম একটা পাখী ঘণ্টা বাজাচ্চে!

মধু। তোমাদের মত বড় বড় পণ্ডিতরা কিন্তু এঁদের গর্ভেই মানুষ হয়েছেন।

আশু। অতএব তাঁরা আমাদের চেয়ে বড়?

মধু। নিশ্চয়।

আশু। Same as the eggshell is superior to th e chicken. Q. E. D.

বলরামের মুখ হইতে যেমন করিয়া অজগর বাহির হইয়াছিল, আশুবাবুর মুখ হইতে স্ত্রীজাতির নিন্দা তেমনি অবিশ্রাম বাহির হইতে থাকিত।

তাহার এই প্রবৃত্তিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেই হয়ত বাবা একদিন বলিয়াছিলেন,—"আমি স্ত্রীজাতিকে শ্রদ্ধা করি।"

আশুবাবু অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে বোঝা যাচ্চে, তুমি প্রকৃতিস্থ নও। একটা ভাল কথা বল্‌লে ঘুমিয়ে পড়্‌বে, একটা রসিকতা কর্‌লে কেঁদে ফেল্‌বে, এ জাতির ওপর যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়ে থাকে, ত বিষয়-পত্রের একটা বিলিব্যবস্থা করবার সময় এসেছে।"

বাবা একবার বলিবার চেষ্টা করিলেন, "Caricature ক'রে বাড়িয়ে বল, আপত্তি নেই। কিন্তু—"

আশুবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "Caricature! আচ্ছা, বাংলা দেশের স্ত্রীজাতি বল্‌লে তুমি কি বোঝ শুনি? ওঁদের মত গুণসম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে মিশতে বা কথা কইতে পার?

বাবা। কিন্তু এজন্যে দায়ী আমরা। আমরা তাদের ঠিক মত মানুষ কর্‌চি না।

আশু। বটে! তবে ত রোগ ধরেচ, দেখচি।

বাবা। ধরিচিই ত। পুরুষদের মত তাঁদের শিক্ষা দাও, স্বাধীনতা দাও, তাঁরাও পুরুষদের মত হবেন।

আশু। দেখ গৃহলক্ষ্মীরা ঘরের ভেতর থাকেন, তাই রক্ষে! আমরা মাঝে মাঝে রাস্তায় গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তাঁরা যদি নিজেদের তেল-চপ্‌চপে খোঁপা নিয়ে রাস্তায় বেরুতে আরম্ভ করেন, তা হলে আমাদের sewage pipe-এর মধ্যে গিয়ে বাস কর্‌তে হবে, তা জান?

মধুবাবু বলিলেন, "বলি ধ'রে ক'রে আশুর একটা বে' দিয়ে দাও। তা ত তোমরা শুনবে না। একটা বিয়ে না হলে ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে না।"

আশু। কেন বল দিকি? হাড়ি কাঠে ফেলে মাথাটা বাদ দিলে আর হাড়িকাঠের ভয় থাক্‌বে না, এই তোমাদের theory?

বাবা। আচ্ছা, তুমি অমন কর্‌চো কেন? বাংলা দেশে ভাল স্ত্রী কেউ পায় নি?

আশু। কেউ পায় নি বলি কি করে? একজন ত পেয়েছিল দেখ্‌চি।

বাবা। কে?

আশু। লকিন্দর।

প্রথমটা কেহ ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই! একবাক্যে প্রশ্ন হইল 'লকিন্দর?'

আশু। হাঁ গো লকিন্দর। বেচারা বে'র রাত্রে ম'রে বাঁচ্‌লো।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বাবা বলিলেন, "না সত্যি ঠাট্টা নয়।—একটী মেয়ে আছে।—"

আশুবাবু প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, "আর থাক্, থাক্, থাক্, থাক্, থাক্!" বলিতে বলিতে নিজের লাঠিটা ঘুরাইয়া কাঁধে ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বিদ্বেষ শুধু তাহার মুখের কথায় নয়, জীবনের প্রতি কার্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়াছি নিজের স্ত্রীর প্রতি তিনি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অকথ্য। তাঁহার জীবদ্দশাতেই নাকি ইনি মদ খাইয়া বাহিরে রাত কাটাইতেন। এবং এখনও সে অভ্যাস ছাড়েন নাই। অথচ এ সম্বন্ধে তাঁর কোনরূপ সঙ্কোচ ছিল না। বরং ইহা লইয়া বড়াই করিতেন। এবং নিজের অক্ষুণ্ণ যৌবনের নজির দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে তাঁহার আচরণে কোন পাপ নাই।

আশুবাবুর উপর কেবল আমি নই, আমাদের বাড়ীর কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমার বেশ মনে আছে মা একবার তিরস্কারের সুরে বাবাকে বলিয়াছিলেন, "ও মাতালটা তোমার কাছে আসে কি করতে? ওর সঙ্গে মেশ কোন সুখে?"

বাবা বলিলেন, "কে? আশু? তুমি জান না,—ও লোক খুব ভাল। কেবল কুসংসর্গে পড়ে—

মা। ও! ভাললোক বলে বুঝি কুসংসর্গে পড়েছে?

বাবা। না, সত্যি! ওর স্ত্রীটা ছিল অতি বদ। ও জীবনে সুখ পায় নি!

মা। নিজে সুখ পান নি। তাই বিশ্বশুদ্ধ লোককে অসুখী করতে বেরিয়েছেন!

বাস্তবিক বিশ্বশুদ্ধ লোককে অসুখী করিবার শক্তি তাঁহার ছিল অসাধারণ।

বাবা ভালরকম কিছু জবাব দিতে না পারিয়া বলিলেন, "তা, ও ত রোজ আসে না। কখনো সখনো আসে।"

এইটুকু ছিল আমাদের সান্ত্বনা। লোকটী কলিকাতায় থাকিতেন বলিয়া প্রত্যহ আসিতে পারিতেন না। খামখেয়ালী কালবৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়ার মত কালে-ভদ্রে দেখা দিতেন।

আমি কি জানিতাম এই ঝঞ্ঝাকরাল কালবৈশাখীই আমার নরজীবনের সূত্রপাত করিবে?

(৩)

চাল সিদ্ধ হইতে হইতে হঠাৎ একটা সময় আসে যখন তাহাকে আর অবাধে স্পর্শ করা চলে না। করিলে অপবিত্র হইতে হয়। ঠিক কোন্ সময়ে, এবং কেন, যে এই অপবিত্রতার আরম্ভ হইল জোর করিয়া বলা যায় না। বাঙালীর মেয়ের জীবনে সেইরূপ একটা অবস্থা আসে,—সহজ মানুষ হঠাৎ এক সময়ে অদৃশ্য, অস্পৃশ্য ও অরক্ষণীয় হইয়া পড়ে।

আমারও সেই অবস্থা আসিল। আমার বাহিরের ঘরে যাওয়া বন্ধ হইল। শিক্ষকের কাছে পড়া বন্ধ হইল। ঘরে কাঁঠাল পচিলে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে নীল মাছি কোথা

হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি নানা অজ্ঞাত দেশ হইতে ঘটক ঘটকীর দল আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া ফেলিল, এবং ইঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক একজন লোক আসিতে লাগিলেন আমাকে দেখিতে।

আমার মনে হইল, আমি যেন বাজারের মাছ। হাঁ করিয়া পড়িয়া আছি। রাস্তার যত লোক আসিয়া আমার পেট টিপিবে, কান্‌কো খুলিয়া দেখিবে, তার পর কাহারও পছন্দ হইলে তুলিয়া লইবে।

হরি! হরি! আমাকে কেহ পছন্দ করিল না। কত পাউডার মাখিলাম, টিপ পরিলাম, মোজা গুঁজিয়া খোঁপাটিকে ফুলাইয়া তুলিলাম, ধার করা গহনায় ঝল্‌মল্‌ করিতে করিতে বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলাম, মাতার উপদেশ মত ধীরে পা ফেলিলাম, ধীরে কথা কহিলাম, মুখ নীচু করিয়া থাকিলাম,—কিন্তু কাহারও মন পাইলাম না।

দাদা বলিতেন বঙ্গবীরগণ যে রূপের জন্যই লালায়িত, এ কথা সত্য নহে। ট্যাকশালের ছাপমারা অনেকগুলা রূপার চাকার উপর চড়াইতে পারিলে তিনি আমাকে এক ঠেলায় যে কোন শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইতে পারিতেন। এই চাকাগুলার অভাবেই নাকি জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া আছি।

ভাগ্যনদীর একদিকে যখন বড় বড় ধস্‌ ভাঙিয়া পড়ে, তখন অপর দিকে মাটী জমিয়া জমিয়া নূতন দ্বীপের উদ্ভব হয়। ভাঙনের ধারে বসিয়া আমরা তাহার খবর রাখি না। সহসা একদিন চমৎকৃত হইয়া দেখি, একখানি নয়নভুলান নবীন শ্যামলতা নিতান্ত অস্থানে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে।

চারিদিকের উপেক্ষায় যখন প্রায় ফোঁপ্‌রা হইয়া উঠিয়াছি, ঠিক সেই সময়ে শচীশ দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার মনে হইল আমি যেন সুদীর্ঘ রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আজ প্রথম বাহিরের আলোকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। মনে হইল আমার হৃদয়ে, বাহিরে, জলস্থল আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া, একটী আনন্দের ঐক্যতান যেন সহস্র কোটি যন্ত্রের বুক কাঁপাইয়া ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছে। মনে হইল, আমার হৃদয়বীণার তার যেন সুরের প্রাবল্যে এখনি ছিঁড়িয়া পড়িয়া যাইবে।

আমার দিকে অগ্রসর হইয়া শচীশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ।"

মা বলিলেন "আর বাবা বে'র বয়স হয়ে গেল।"

শচীশ। ভালই ত। আমার কাছে খুব ভাল পাত্র আছে।

তারপর আমার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা, কেমন পাত্র তোমার পছন্দ?' গোত্রমেলের কি যোগাযোগ হ'লে তুমি সুখী হবে?"

দাদা সঙ্গে ছিলেন। তিনি, বলিলেন, "ওর সামনে কেন? চল, আমরা বাইরে গিয়ে কথা কই।'

শচীশ। ওঁর সাম্‌নেই ত কথা হওয়া উচিত। ওঁরই ত বে'।

মা। তা ব'লে নিজের বে'র কথা—

শচীশ। ওঁর পছন্দ কর্‌বার বয়স হয়েছে। এখন আপনারা তার হ'য়ে পছন্দ করে দিলে ত চল্‌বে না।

দাদা। ওর পছন্দ আমাদের জানা আছে। আমরা জানি, গোত্রমেলের যোগাযোগ হ'লেই ও সুখী হবে না। এখন, তোমার পাত্রের আর কি গুণ আছে, বল।

শচীশবাবু দাদার কথার উত্তর না দিয়া, আমাকেই প্রশ্ন করিলেন, "দোষে গুণে আমার মত পাত্রকে বিবাহ কর্‌তে রাজী আছ ?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম "হাঁ।"

দাদা। পাত্রটী কে, শুনিই না।

শচীশ। পাত্র ভাল। সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছে। নাম, শচীশচন্দ্র দত্ত।

দাদা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "না, তুমি বাইরে চল।"

শচীশ। বাইরে যাব কেন ? আমাকে তুমি তাড়াবে কি ক'রে ? মুখে কিছু না বল্‌তে দাও চিঠিতে বল্‌বো। চিঠিতে না বলি, কেতাবে বল্‌বো। কারুর কথা কানে আসতে দোবো না, এমন ক'রে মেয়েকে সামলাতে পার্‌বে না ত।

দাদা কিন্তু তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, আমি একটী প্রশ্ন কর্‌বো শুধু।" বলিয়া আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার কোন আপত্তি নেই ?"

আমি 'হাঁ', 'না', কিছুই বলি নাই। কিন্তু শচীশ হয়ত আমার মনের কথা পড়িতে পারিয়াছিলেন। তিনি নিজের দক্ষিণ হস্ত দাদার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়া আমার দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমিও যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়াইলাম। কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিলাম না। দাদা মাঝখানে আসিয়া জোর করিয়া আমাদের তফাৎ করিয়া দিলেন, এবং শচীশকে প্রায় ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। মা কোন কথা ক'ন নাই। কেবল আমার দিকে একবার চাহিলেন। সে চাহনিতে করুণা ছিল, ভয় ছিল, তিরস্কার ছিল। কিন্তু আমি করিব কি ? শচীশের সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না, এ কথা কি তাঁহাদের চেয়ে আমি কম বুঝিতাম ? কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার প্রসারিত হস্তকে প্রত্যাখ্যান করি কোন্‌ উপায়ে ?

এই ব্যাপার লইয়া শচীশের সহিত দাদার ঝগড়া হইয়া গেল। শুনিয়াছি কোন একদিন বাবা অসবর্ণ-বিবাহের পক্ষে তর্ক করিতেছিলেন। সেই সময়ে শচীশ প্রশ্ন করেন, 'আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে পারেন ?' বাবা বলিয়াছিলেন, "নিশ্চয় !" এই কথার জোরেই নাকি শচীশ বিবাহের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।

বাবা যে কখনও এমন কথা বলিতে পারেন, দাদা বিশ্বাস করেন নাই। আমি কিন্তু করিয়াছিলাম। কারণ বড় বড় কথায় আমার পিতা কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। তর্কের সময় সকলপ্রকার সমাজ-সংস্কারের অতি লোমহর্ষণ সীমানাতেও তিনি চড়িতে পারিতেন।

দাদা এক সময়ে একটা fountain pen কিনিয়াছিলেন। লিখিবার সময় তাহার মুখ হইতে এক আঁচড় কালী বাহির হইত না। কিন্তু তাহার ভিতরে যে কালী ভরা আছে, তাহার প্রমাণ থাকিত হাতে, মুখে, জামা কাপড়ে, সর্ব্বত্র। বাবার প্রতি কর্ম্মে আমার মনে পড়িত এই কলমটিকে।

শচীশের সহিত আমার সেদিনকার আলাপকে আমাদের অভদ্রতা, নির্লজ্জতা, ও ছেলেমানুষীর একটা লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া, আবার নূতন উদ্যমে বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। শেষে একদিন,—

"রাত্রির বসনপ্রান্তে জ্বালাইয়া মশাল-আগুন,
অট্টহাসে, হট্টরোলে,
ঢাক ঢোলে,
ব্যথিত মথিত করি আকাশ, বাতাস, জলস্থল"—

বর আসিল।

জাত-কেরাণীর বাচ্ছা,—ভাড়া-করা তাজ পরিয়া দুদণ্ডের জন্য রাজা বনিয়াছেন! এই নকল রাজা ও তাঁহার পারিষদবর্গের দর্পিত পদভরে বাসুকীর ফণা ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। ইঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতে আমরা গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া পড়িলাম। কিন্তু তুষ্ট করিতে পারিলাম না।

কার্য্যারম্ভেই আমার কাল চামড়ার খেসারৎ বাবদে তাঁহারা পাঁচশত টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। এই টাকাটা সংগ্রহ করা গেল না! বাবা ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দাদা একেবারে বাঁকিয়া বসিলেন। বলিলেন, "টাকা দিয়ে Black mailer-কে তুষ্ট করা যাবে না। এঁদের কাপড়-জড়ান মোটা মোটা লেজে এখন আগুন লেগেছে। এখন যত তেল ঢালা যাবে, ততই এগুলো জ্বল্‌বে বেশী ক'রে।"

বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল।

সে রাত্রের ভ্রষ্ট যজ্ঞ ও নষ্ট জাত বাঁচাইবার একমাত্র উপায় ছিল, তখনি একটি পাত্র সংগ্রহ করা। বাবা তাঁহার দু একজন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া এই একমাত্র উপায়ের সন্ধানে বাহির হইলেন।

তখন রাত্রি নয়টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সহরতলীর বিরলপথিক পথঘাটের দুর্গমতা দ্বিগুণতর করিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়াছে। আমার মনে হইতে লাগিল, বঙ্গমাতা যেন কার রুদ্ধবধির সিংহদ্বারের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বহ্বাবৃত্তিপরিক্লান্ত একঘেয়ে সুরে তাঁহার অশ্রুপরুষ ভেককণ্ঠের আবেদন জানাইয়া চলিয়াছেন।

অনেক রাত্রে বাবা বর লইয়া ফিরিলেন। শঙ্খ ও হুলুধ্বনির সহিত আমি যজ্ঞভূমে নীত

হইলাম। দেখিলাম আমার ভাগ্য-বিধাতা স্বয়ং শ্রীযুক্ত আশুতোষ। পিতার বন্ধুকে নূতন পদবীতে দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলাম। কিন্তু সে পলকের জন্য। আমার বেশ মনে আছে দুঃখ, দুশ্চিন্তা, ভয়, বা বিস্ময়ের কোনটাই বিশেষ করিয়া তখন আমার মনে স্থান পায় নাই। কেবল একটা প্রকাণ্ড বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় তখন আমার মণপ্রাণ ভরিয়া ছিল। যেন কোনরূপে কাজটা চুকিয়া গেলে বাঁচি, ইহার অধিক আর কিছু কামনা করিবার নাই।

আশুবাবু তখন নেশায় ভরপূর। নেশার ঝোঁকে মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাই দুইজন লোক তাঁহাকে পিঁড়ির উপর ধরিয়া রাখিল। তারপর পুরোহিত সংস্কৃত মন্ত্রের দুইটা দুইটা করিয়া অক্ষর বলিয়া গেলেন। আর বর মাঝে মাঝে 'Damn!' 'Bother!' ইত্যাকার চীৎকার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্র ও swearing, God & demon, দুয়ের সাহচর্য্যে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইল। মহিষকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া যেমন করিয়া লাল বাঁধান হয় তেমনি করিয়া আমাকে এই পতিদেবতার পায়ে আঁটিয়া দেওয়া হইল।

সম্প্রদানের পর বাবা মূঢ়ের মত সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। দাদা সে রাত্রের মত কোথায় পলাইলেন, কেহ সন্ধান লইল না। মাতা সংজ্ঞাহীন, স্বজনবর্গ নিরানন্দ, বাসরঘর নির্জ্জন, নিস্প্রভ,—ইহাই হইল আমার সেই পরম-শুভ-রজনীর স্মৃতি। খবর পাইলাম, সেদিন উচ্ছ্বসিত অশ্রুর চাপে সারা পৃথিবীর বুক যখন ফাটিয়া পড়িতেছে, তখন মৃত্যুনদীর পরপারে আমার পিতৃপুরুষগণ না কি এই বিবাহের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন।

হে ভারতের পূজ্যপাদ পিতৃকুল, প্রতি দিবসের প্রতি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটির খবরদারী হইতে এবার সন্তানগণকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও! চার হাজার বৎসরের স্তূপীকৃত শবের ভারে জীবন্ত লোকগুলাকে আর কত কাল নিপীড়িত করিবে?

(৪)

অতীতের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া স্বামীঘর করিতে আসিলাম। কোথায় স্বামী? কোথায় ঘর? স্বামী ও তাঁহার ঘর ছিল অন্যত্র। আমি যে ঠিকানায় আসিয়া জুটিয়াছি, এটী ছিল তাঁর আফিস। দিনের খানিকটা সময় তিনি এখানে কাটাইতেন মাত্র। এখানকার সরঞ্জামের মধ্যে ছিল একটী খানসামা ও একরাশ এলোমেলো আসবাবের বাহুল্য-বিড়ম্বিত দীনতা। আমার জন্য অবশ্য নূতন বন্দোবস্ত কিছু কিছু করা হইয়াছিল। দুইটা ঘর একটু পরিষ্কৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। একজন পাচিকা ও একটী দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সংসারের মাধুর্য্য কিছু বর্দ্ধিত হয় নাই। আমার মনে হইতে লাগিল যেন আব্ড়ো-খাব্ড়ো ছেঁড়া ছোব্ড়ার গদির উপর তাড়াতাড়ি একখানা ফরসা চাদর বিছান হইয়াছে, আমার অভ্যর্থনার জন্য। ইহার চেয়ে অবিমিশ্র দারিদ্র্য ঢের বেশী সুন্দর।

স্বামীর খানসামাকে ডাকিবামাত্র সে 'হুজুর' ! বলিয়া হাঁক দিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তাহার মুখে চ'খে এমন একটা প্রভুত্বের ভাব ছিল যে কিছু ফরমাস করিতে সাহস হইত না। স্বামীর কোন আসবাবে হাত দিলে সে যেন চীৎকার করিয়া উঠিত, 'তুমি কে হে ?'

আমি ভয়ে ভয়ে স্বামীর সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিতে লাগিলাম। তিনিও আমাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপে একই বাড়ীর মধ্যে আমরা দুইজনে পাশাপাশি পৃথক্ সংসার করিতে লাগিলাম।

পরের সংসার দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া আপনার হইয়া উঠিল, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই ব্যাপারের আরম্ভটী আরও অদ্ভুত। বিবাহের সময় অনেক উপহার পাইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে একটী রূপার সিঁদূর কৌটা ছিল—শচীশের দান। যে সোনার বরণ পাখীকে আকুল হৃদয়ের মুঠা ভরিয়া ধরিতে চাহিয়াছিলাম, সে কোন শূন্যে উধাও হইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাহার একটী পালক খসিয়া পড়িয়াছে,—এই সিঁদূর কৌটা ! এইটীকেই জীবনের সাথী করিলাম। অনন্যমনে ইহারই পূজা করিতে লাগিলাম।

এত বস্তু থাকিতে শচীশ আমাকে একটী সিঁদূর কৌটা দিলেন কেন ? ওগো, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি, হে আমার হৃদয় মনের অধীশ্বর, তোমার ইঙ্গিত আমি বুঝিয়াছি। এই সিঁদূর কৌটার মধ্যে তোমার যে আশীর্ব্বাদ আছে তাহাই সফল হউক,—আমার মাথার সিঁদূর অক্ষয় হউক, সুন্দর হউক, সার্থক হউক। ইহার মধ্যে তোমার যে অনুজ্ঞা আছে তাহা পালন করিবার শক্তি দাও।

প্রথমটা ভয়ে ভয়ে, শেষটা বেশ সহজভাবেই স্বামীর সহিত দেখা করিতে আরম্ভ করিলাম। যাহার সেবা করিতে হয়, তাহাকে একটু চিনিতেও হয়। আর, মানুষ পদার্থটী এমনি, যে তাহাকে চিনিতে আরম্ভ করিলে আর ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। দূর হইতে বিন্ধ্যাচলকে একটা সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ভাবিয়া ফিরিয়া যাইতে পার। কিন্তু একবার যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া উপরে উঠ, ত বুঝিতেই পারিবে না যে কোন নূতন পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছ। সেবা-ধর্ম্মের মধ্য দিয়া যেদিন স্বামীর নিকটবর্ত্তী হইলাম, সেদিন আমিও বুঝিতে পারি নাই, অন্য মানুষের সহিত তাঁহার কোথায় প্রভেদ।

কেহ বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু কথাটা সত্য যে শচীশের প্রেমে আমি স্বামীকে ভাল বাসিয়াছিলাম। আমাদের প্রথম আলাপ আমার বেশ মনে আছে। আমি তাঁহার গড়গড়াটা ঠিক করিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। তিনি ফিরিয়া ডাকিলেন। কোনরূপ সম্বোধন করিলেন না। কেবল গলার মধ্যে একটা আওয়াজ করিলেন, একটা কি বলিবার চেষ্টা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিছু বল্‌ছিলেন ?"

স্বামী। হাঁ বল্‌ছিলুম।—What a hell of a life we are living !

আমি। কেন এমন কথা বল্‌চেন ?

স্বামী। বাবা! এ আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়! আমি তোমার বাবার বয়সী, তা জান ?

আমি। তা জানি। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ?

স্বামী। But, damn it, I am your husband, not your গোমস্তা।

আমি। তাতেই বা দোষ কি ?

স্বামী। বটে! তা হ'লে You are either a fool or a Fool.

আমি। তা হবে।

স্বামীর চ'খের কোনে একটা চাপা হাসি ঝিক্ ঝিক্ করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'হাঁ তাই।' তার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, সত্যি বল, আমাদের এক জোয়ালে জোতার জন্য দায়ী কে ?

আমি। দায়ী আমাদের অদৃষ্ট।

স্বামী। Hang your অদৃষ্ট! এটী করেছেন তোমার বাবা। বুঝেছ ?—তোমার বাবা,—the scoundrel!

আমি। যাক্, এখন বেশ ঝর্‌ঝরে হওয়া গেল।

স্বামী। কি বল্‌লে ?

আমি চলিয়া আসিতেছিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন, "আরে রহো! কি বল্‌লে ?"

আমি বলিলাম, আমাদের এ অবস্থার জন্য একজন কেউ দোষী আছেই। দেখা গেল সমস্ত অপরাধ আমার বাবার। এখন আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

আমার স্বামী বিকট ভ্রুকুটী করিয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা আমিও aiding and abetting-এর charge-এ ধরা দিচ্চি।—কিন্তু সত্যি, আমার খুব বেশী দোষ নেই। তোমার বাবা জবরদস্তি ক'রে আমাকে ধরে এনেছিলেন।'

আমি। যাক্, সে কথা আলোচনা ক'রে লাভ কি ?

স্বামী। লাভ একটু আছে। স্বামী সেজে ব'সে থাক্‌বো। অথচ এক কণা ভালবাসা পাব না, একটু শ্রদ্ধাও পাব না, এটা ঠিক ভাল লাগ্‌চে না।

আমি। ভালবাসা পাবেন না কেন ?

স্বামী। আমি বয়সে ঢের বড় ব'লে।

আমি। তা, ঠিকুজি দেখে ত কেউ ভালবাসে না।

স্বামী। shut up!

স্বামীকে পরিপূর্ণরূপে কখনও পাই নাই। তবে তাঁহার বন্ধুত্ব পাইয়াছিলাম, গৃহস্থালীর কর্তৃত্ব পাইয়াছিলাম। এইটুকুই পরম লাভ বলিয়া মনে করিতাম। আমার জন্য তিনি তাঁহার কুঅভ্যাসগুলি ত্যাগ করিবেন বলিয়া অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহার সকল প্রতিজ্ঞাই আনাড়ির হাতের আলুর চপের মত আকার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই ভাঙিয়া গুঁড়া হইয়া যাইত। সেজন্য আমার তত দুঃখ ছিল না। এই প্রতিজ্ঞাগুলির মূলে যে সহৃদয়তা ছিল, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি এক রকম সুখী হইতে পারিতাম, যদি না আমার আত্মীয়গণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমার নিভৃত তপোবনের শান্তিভঙ্গ করিতেন।

আমার পিতা একদিন আসিয়া যখন শুনিলেন আমার স্বামী ঘরে থাকেন না, তখন তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কোথায় থাকেন, কেন থাকেন, ইত্যাদি অনেক গবেষণা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে পূর্ব্বে তিনি যেখানে থাকিতেন এখনও সেইখানে থাকেন, তখন স্বামীর সহিত তখনি একটা বোঝাপড়া করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তারপর দেখিলেন সে পথেও অনেক বিঘ্ন। তখন গর্জ্জন করিলেন, 'আমার ইচ্ছা করে সমাজের বুক চিরে দুঃশাসনের মত রক্ত খাই!' আমি মনে মনে হাসিলাম। সমাজ বলিয়াছে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইও না, ভাল, তাহাই করিব; মেয়েদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেল, তাহাই করিব; মানুষের ছায়া মাড়াইলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হও, আচ্ছা, তাহাই করিব;—সব করিয়া আসিয়া সমাজের বুক চিরিয়া রক্ত খাইব! বীরত্ব বটে!

আমার আত্মীয়েরা হয়ত মনে করিয়াছিলেন, বিবাহ করিলেই স্বামীর চরিত্রদোষগুলি শুধরাইয়া যাইবে,—কাঁচা কলার কাঁদি ঘরে রাখিতে রাখিতেই পাকিয়া উঠিবে। তাঁহাদের সে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে। একটি পরিবর্ত্তন কিন্তু আমি লক্ষ্য করিলাম। এটা কেহ প্রত্যাশা করেন নাই। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার চ'খের দীপ্তি ও গলার জোর কমিয়া আসিতে লাগিল। যে উদ্দাম যৌবন তাঁহার দেহ ও মনের কুহরে কুহরে ঝরণার জলের মত উত্তাল হইয়া ফিরিতেছিল, তাহা নদীর শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া বার্দ্ধক্যের দিকে গড়াইয়া চলিল।

একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহাকে বিছানায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, শরীরটা কি ভাল বোধ হচ্চে না?

স্বামী। না। বোধ হয় জ্বর হয়েছে। গা, মাথা ব্যথা করচে।

আমি। টিপে দোবো?

স্বামী। দেবে?

এ কি প্রশ্ন? তোমার দুঃখ দূর করিতে এতটুকু প্রয়াস করিব, এ বিশ্বাসেরও কি অবকাশ দিই নাই? হয়ত তুমি ঠিকই ধরিয়াছ। এতদিন তোমার যত পূজা করিয়াছি, তাহাতে হয়ত উপচারেরই বাহুল্য ছিল, সাত্ত্বিকতা ছিল না।

আমি পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর মাথা টিপিয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, "তোমাকে সুখী কর্‌তে পার্‌লুম না, সুকু।"

আমি। কেন অমন কথা বল্‌চেন? আমার সুখের অভাব কি? হাতে টাকা আছে, ঘরভরা বই আছে,—

স্বামী। আমি আর একজনের কাছে বাঁধা আছি।

আমি। এটা অন্যায় মনে করেন ত তাকে ছেড়ে দিন না।

স্বামীর গলার স্বর চড়িল। তিনি বলিলেন, বিনুকে ছেড়ে দোবো! কোন অপরাধে? তার মত এত কে করেছে, আমার জন্য! এতদিন একসঙ্গে থাক্‌লুম, বেড়ালুম। আর, আজ তাকে ছেঁড়া চটির মত ফেলে দিয়ে আস্‌বো! তার বুকে বাজ্‌বে না?

আমি। সে কি আপনাকে ভালবাসে?

স্বামী। কি ক'রে জান্‌বো? ভাল না বেসেই কি এত সেবা করেছে?

আমি। শুনেছি, তাদের কাজই ঐ। ভালবাসে না, ভালবাসার ভাণ করে!

স্বামী। আর, তোমরা সকলে ভালবাস, কেউ ভাণ কর না?

আমি। তা কি ক'রে বলি?

"তবে? তবে?" বলিতে বলিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "একবার ভাব, যে সে সত্যই আমাকে ভালবাসে। এখন! এখন কি করি? কি করা উচিত? বল—বল—একটা জবাব দাও। **I'll kill you if you don't answer me!**

আমি তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলাম। বলিলাম, 'অমন excited হবেন না, অসুখ বেড়ে যাবে।' তিনি কিন্তু থামিতে চাহিলেন না। বলিলেন, 'তুমি কোন জবাব দিলে না।' আমি চুপ করিয়া রহিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি কি চুপ ক'রে রইলে চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে?'

আমি। চক্ষুলজ্জা কর্‌বো কেন?

স্বামী। তুমি হয়ত বল্‌তে চেয়েছিলে স্নেহের বদলে লাথি খাওয়া তাদের অভ্যাস আছে। তাই তাদের কাছে অকৃতজ্ঞ হ'লে দোষ হয় না। এই কথা হয়ত বল্‌তে চেয়েছিলে। চক্ষু লজ্জায় প'ড়ে পার নি।

আমি। না, এমন কথা আমি কখনও বল্‌বো না।

স্বামী। তাহ'লে বিনুর কাছে আমাকে ছেড়ে দিলে?

আমি। দিলুম।

স্বামী। আর যে স্ত্রী এমন কথা বল্‌তে পারে, তাকে ছেড়ে দেবো? সুকু,—সুকু—বলিতে বলিতে আমার মুখ দুই হাতে ধরিয়া তাঁহার মুখের কাছে লইয়া গেলেন তার পর ধাক্

দিয়া আমাকে ঠেলিয়া দিয়া চীৎকার করিলেন, 'যাও, যাও, যাও! আমি মাতাল!" বলিয়া হাতের উল্টা দিক দিয়া ঠোঁটের উপর বার বার আঘাত করিতে লাগিলেন।

স্বামীর রোগ বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তিন দিন শয্যাশায়ী থাকার পর তিনি বিনোদিনীর জন্য এত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, যে আমি চিঠি লিখিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনাই। তবে, তাহার হাত ধরিয়া স্বামীর কাছে পৌঁছাইয়া দিবার সাহস ছিল না বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই পলাইয়া রহিলাম।

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল যে আমার পিতা ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু বিনোদিনীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছেন। পাছে ইঁহারা বিনোদিনীকে বাড়ীর মধ্যে পাইয়া অপমান করেন, ইহা লইয়া আমার মনে একটু দুশ্চিন্তা ছিল। তা ছাড়া, কি আলাপ হইতেছে জানিবার জন্য কৌতূহলও ছিল। এই দুই কারণে আমি বাহিরের ঘরের দুয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম। পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহাদের সকল কথাই শুনিতে পাইয়াছিলাম। বিনোদিনী বলিতেছিল, 'কি করি বলুন? আমাদের এই ব্যবসা।'

মধুবাবু বলিলেন, হাঁ ব্যবসা বটে। রূপ বেচা ব্যবসা।

বিনো। আর আপনারা কি উপায়ে লাখপতি হন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি? শুধু চাঁদ মুখের জোরে অর্দ্ধেক রাজত্ব, আর রাজকন্যা পাবার আশায় আপনারা ব'সে থাকেন না? আর্ত্তত্রাণ বিদ্যাকে আপনারা বিক্রেয় বস্তু করেন নি? এটা কি রূপ বেচার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হ'ল? আপনাদের দেশভক্তি, বিশ্বপ্রেম, তত্ত্ববিদ্যা আর ধর্ম্মজ্ঞান খাটিয়ে খান না ত কি ক'রে খান?

বাবা জবাব দিলেন, 'তা না হয় হ'ল। কিন্তু আমরা কি এমনি ক'রে পরের সর্ব্বনাশ করি?'

বিনো। বাবা! সর্ব্বনাশ করেন না! দুরারোগ্য রোগেও রোগীকে বৃথা আশ্বাস দিয়ে আর কতকগুলা বাজে ওষুধ গিলিয়ে, নিজের বাড়ী গাড়ীর ব্যবস্থা করেন না? মোকদ্দমায় হার সুনিশ্চিত জেনেও মক্কেলকে বৃথা উত্তেজিত ক'রে ক'রে তার বসতবাটীর শেষ ইটখানি পর্য্যন্ত নিজের পকেটে পোরেন না? আমরা কারুর কারুর সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলি বটে। তবে আপনাদের মত বলি না, যে তার সর্ব্বনাশটা তার ভালর জন্যেই কর্‌চি।

বাবা। আচ্ছা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনার কি কখনও অনুতাপ হয় না?

বিনো। ও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে নেই। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, ডাক্তার বাবু, আপনার কি কখনো অনুতাপ হয় নি; কখনো কি মনে হয় নি যে আপনার অজ্ঞতা, অক্ষমতা, আলস্য, বা জিদের ফলে রোগীটী মারা গেল? যে দিন এরকম মনে হয় সেদিন থেকে কি ডাক্তারী ছেড়ে দেন?

বাবা। তর্ক ক'রে ত বুঝিয়ে দিলেন, আমরা সকলে একদরের ব্যবসাদার। কিন্তু সমাজে—

বিনো। রক্ষে করুন! ঐ কথাটী আমার সামনে উচ্চারণ কর্‌বেন না। আপনাদের সমাজ, সমাজের যে সব নেতা আছেন, তাঁদের যে সব শাস্ত্র, আর সেই সব শাস্ত্রের বিধাতা যে যে যেখানে আছেন,—তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং—আপনারা অন্য কথা পাড়ুন।

মধুবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'উঠুন, উঠুন, ডাক্তার বাবু। এই সব কথা শোনাবার জন্যেই কি আপনি আমাদের নিয়ে এলেন?'

শৈলেশবাবু বলিলেন, "রূপের দম্ভে এখন কোন কথাই আপনার মুখে বাধে না। কিন্তু 'এ্যাসা দিন নেহি রহেগা।' শেষে এক সময় আস্‌বে যখন পাউডার মেখে বাইরে দাঁড়াতে হবে, আর ফিরে আস্‌তে হবে।"

বিনো। ঠিক যেন বুড়ো কেরাণীর অবস্থা। চাক্‌রী খুইয়ে দরখাস্ত হাতে ক'রে বাড়ী বাড়ী ঘোরা আর ফিরে আসা।—কিন্তু কোন কেরাণীকে ত আপনারা পতিত বলেন না। কারুর সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহারও করেন না।

বাবা। যাই হোক, এ দুঃখের জীবন ত নিজেই বেছে নিয়েছেন।

বিনো। সুখের জীবন পাচ্চি কোথায়? আপনার এই ডাক্তার, উকিল, কেরাণী, কম্পজিটর,—কার জীবন সুখের? নিজের কাজে কে সুখ পায়?

বাবা। কেন, সতীর জীবনে সুখও আছে, গৌরবও আছে।

বিনো। ওটা মিথ্যা কথা। সতীর জীবন সুখেরও নয়, গৌরবেরও নয়। 'অঙ্কেস্থিতাপি যুবতী পরিশঙ্কনীয়া।' এই হ'ল আপনাদের "শাস্ত্র"। নরকের ভয় দেখিয়ে, সামাজিক উৎপীড়ন করে, রসারসি দিয়ে বেঁধে আপনারা মেয়েদের সতী রাখেন। আপনাদের দোষ দিতে পারি না। আপনারা জাতকে জাত অক্ষম, অকর্ম্মণ্য, অসুন্দর। বেঁধে সেধে না রাখ্‌লে আপনাদের ঘরে বৌ টিক্‌বে না, এ বিশ্বাস হওয়া আপনাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তবে আপনাদের যদি একটু রসবোধ থাক্‌তো, ত এ সতীত্বের বড়াই কর্‌তেন না। বিশেষতঃ আমার কাছে। আমি সতী ছিলুম যে। অনেক সতীকে ফুটবলের মত লাথির ঘায়ে বাপের বাড়ী থেকে মামার বাড়ী, মামার বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেখিছি যে।

সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া বিনোদিনী বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমাকে ব্যবসা ছাড়্‌তে বল্‌চেন,—আশুবাবুর মত খদ্দের ছেড়ে দিতে বল্‌চেন,—তারপর খাব কি করে শুনি? শিক্ষয়িত্রী হব?—দেবেন আপনাদের মেয়েদের আমার ইস্কুলে? তা পার্‌বেন না।—তবে কি থিয়েটারে যোগ দোবো? আমাদের অভিনয় আবার আপনারা দেখ্‌তে চান না,—বলেন, চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। বলিহারি চরিত্র বল!—তবে কি দাসীবৃত্তি কর্‌বো? তাও কি করতে দেবে লোকে?—আর, আমি যে এত সাধনা করে লেখাপড়া শিখ্‌লুম, গান বাজনা

শিখলুম,—সে কি কেবল কড়া মাজবার জন্য ?—তার চেয়ে, আপনারা যদি আমাদের মত লোকদের বিবাহ কর্‌তে চান,—"

ব্রজেন বাবু নিজেকে উদার মতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিতেন। তিনি কথার মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ তা পারি! বিনা দোষে যে লোক পতিত হয়েছে,—'

বিনো। "বিনা দোষে কেন, মশাই ? নিজের দোষেই যদি পতিত হয়ে থাকি, তা হলে আর আপনারা উদ্ধার কর্‌বেন না ?" ব্রজেন বাবু কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন। বিনোদিনী বাধা দিয়া বলিল, 'ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের হাতের দেওয়া স্বর্গও কামনা করি না।'

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বিনোদিনী পর্‌দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিল। আমি স্তম্ভিত হইয়া দেখিলাম, এ যে সাবিত্রী! সাবিত্রীও আমাকে দেখিবামাত্র থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তাহার ভ্রূকুটী-কুটিল মুখে একবার হাসি ফুটিবার মত হইল। পর মুহূর্ত্তেই সে মুখ ফিরাইয়া লইল, এবং দ্রুতপদে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

সাবিত্রীকে দেখিয়া আমার মনের ভাব কি হইয়াছিল ঠিক প্রকাশ করিতে পারি না। একবার মনে হইয়াছিল, চ'খের সাম্‌নে যেন একটা লীলায়িত শাঁখিনী সাপকে যাইতে দেখিলাম। বিষের ভয় না থাকিলে হয়ত তাহাকে মালার মত কণ্ঠে ধারণ করিতাম।

বিনোদের কবল হইতে আমার স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য আমার পিতামাতা দেবতার কাছে বহু প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল। স্বামী মুক্তি পাইলেন। কিন্তু আমরা আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাইলাম না। বিনোদের সহিত দেখা হইবার পর, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তিনি আর চারিদিন মাত্র বাঁচিয়া ছিলেন।

আজ নিজেকে ধিক্কার দিয়া শেষ করিতে পারি না, যখন ভাবি, স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আমরা বিনোদিনীকে দিই নাই। সে নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইল,—দুর্ঘটনার পরদিন। তাহাকে দেখিয়া লজ্জা, ভয়, করুণা ও অনুশোচনায় মরিয়া যাইতে লাগিলাম। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। হয়ত পলাইবার ইচ্ছা ছিল। সে কিন্তু ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। তারপর পরস্পরের অশ্রুসিক্ত কাঁধের উপরে মাথা রাখিয়া অনুভব করিলাম তাহার হৃৎপিণ্ড ঠিক আমারই তালে তালে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে।

সেদিন দিগন্ত প্রসারিত অশ্রুপ্লাবনের মধ্যে দুইটী অসহায় জীব পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইল,—মানুষ আর সাপ। তারপর, প্রথম পসলাটা ধরিতেই তাহারা নিঃশব্দে যে যার স্থানে ফিরিয়া গেল। শাঁখিনীর বিষদাঁত দুটা ঠিক কোথায় ছিল খবর লওয়া হইল না।

(৫)

আপনাকে মাপকাটি করিয়া মানুষ জগৎকে বিচার করে। আমি নিজে অতি ছোট বলিয়াই হয়ত সাবিত্রীকে কখনও ছোট করিয়া দেখিতে পারি নাই। সে 'পতিতা,' আর আমি 'সতী'। অথচ তাহাকে দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত করিতে পারিলাম কৈ ? আমি যে দেখিতেছি তাহাতে আমাতে বিশেষ কিছু ভেদ নাই। বনের ডাক আমারও কানে আসিয়া বাজে, ছুটিবার নেশা আমাকেও মাঝে মাঝে মাতাল করিয়া তোলে। তবে আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল লাগাম বাগাইয়া ধরিবার মত প্রচণ্ড কোচম্যান। তাহার সে সুযোগ ঘটে নাই। দড়ি ছিঁড়িয়া, চাবুক লাগাইয়া, তাহাকে দিশাহারা করিয়া ছুটাইয়াছে,—দেশের দুরন্ত ছেলের পাল। শুধু এইটুকু তফাৎ। শুধু এইটুকু তফাতের উপরে কি শ্রেণী-বিভাগ করা চলে ?

বুভুক্ষিত ব্যক্তি নর্দ্দামার উপর হইতে উচ্ছিষ্ট ভাত, ডাল, তরকারী, খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতেছে দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, সাবিত্রীর ঘৃণিত জীবনের প্রতি আমার সেইরূপ একটী মনোভাব ছিল। ইহাকে ঠিক অভক্তি বলিতে পারি না। তবে, অভক্তি যদি কিছু থাকিয়া থাকে, ত' তাহা নিঃশেষে লোপ পাইল, যে দিন দেখিলাম, আমার স্বামীর শোকে সে আকুল হইয়াছে।

তখন ভাবিয়াছিলাম, এই আকুলতার মূলে যে প্রেম আছে, তা না জানি কত গভীর! এই প্রেমকে যে ধারণ করিতে পারে, সে হৃদয় না জানি কত মহান্! আজ নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছি, আমাদের জীবনে এই শোকোচ্ছ্বাসের কোন মূল্য নাই। ইহা উৎকর্ষের পথে আমাদিগকে একপদও অগ্রসর করে না। উচ্ছ্বাস ও আবেগ দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয় মাত্র, ভাবের গভীরতাকে প্রকাশ করে না। এবং দুর্ব্বলতা কোন কালেই শ্রদ্ধেয় নয়।

আর, এই যে একটা পশুবৃত্তি,—ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি আকর্ষণ,—যাহাকে আমরা প্রেম বলি, এবং যাহার মোহর দাগিয়া আমরা তামা, নিকেলের দর চড়াইয়া চলিয়াছি,—বাক্যে ও কাব্যে,—তাহাও অতি তুচ্ছ। প্রেমের সংস্পর্শে মনের যে পরিণতি হয়, তাহার মধ্যে পূজার্হ কখনও কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু পরিণতি ত সকল সময়ে সমান হয় না। যে আগুন লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করে, তাহাই বাতিকে গলাইয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়, তাহাই প্লাটিনমকে ক্ষণিকের জন্য রাঙাইয়া তুলে মাত্র, তাহাতে কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন ঘটায় না।

একটা কথা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই।—যে কারণে সাবিত্রীর উপর হঠাৎ শ্রদ্ধা আসিয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই নিজের উপর আমার অশ্রদ্ধা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয় নাই। স্বামীর জন্য শোকপ্রকাশ আমি ত পূরা উদ্যমে চালাই নাই। আমার এই সংযম অনেকের চক্ষে অত্যন্ত অশোভন ঠেকিয়াছিল, অনেকের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। আমি দুঃখিত হইয়াছি জানিলে তাঁহারা সুখী হইতেন। কিন্তু একজনের মৃত্যুদর্শনে আর একজনের দুঃখ হইল, ইহার মধ্যে এমন কি আছে? এই দুঃখ দেখিয়া কি এই দুইজনের ভিতরকার প্রীতির পরিমাপ করা যায়? আমার মনে আছে, একবার একটা পাগলা শৃগালের ভয়ে আমরা দুইদিন বাটির বাহির হইতে পারি নাই। পরে দেখিলাম, শৃগালটা আমাদেরই পথের ধারে মরিয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া তখন আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! অথচ শৃগালের সহিত আমার কোন স্নেহবন্ধন ছিল না।

স্বামীর শোকে কতটা কাতর হইয়াছিলাম, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার বিরহ আমার প্রাণে কেমন করিয়া বাজিয়াছিল, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছিলাম। সমস্ত দোষ সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহাকে বুকের কাছে না পাইলেও, বুকের মাঝে পাইয়াছিলাম, বিশেষ অভাব বোধ করি নাই। কিন্তু তিনি যে আমার কতখানি বুক জুড়িয়া আছেন, তাহা টের পাইলাম, যে দিন তাঁহাকে হারাইলাম। একহাত মাত্র ভূমির উপর যে গাছ বাড়িয়া চলিয়াছে, উৎখাত হইবার সময় সে যে পাঁচ হাত জমির বুক শূন্য করিয়া, এবং দশ হাত জমিতে ক্ষত রাখিয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।

এক বৎসরের কিছু অধিককাল স্বামীর ঘর করিয়াছিলাম। এই অল্পদিনে এত দূরে আসিয়া

পড়িয়াছি যে আর অতীতে ফিরিয়া যাইতে পারি না ; এত বড় হইয়াছি যে পিতা বা ভ্রাতার গৃহে আর খাপ খাইবে বলিয়া মনে হয় না।

পথের দূরত্ব, সময়ের দ্বারা না করিয়া, যদি উপলব্ধির বহুত্ব, বা বৈচিত্র্যদ্বারা নির্ণয় করা হয়, ত' বলিতে হইবে আমার বিবাহিত জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা সুদীর্ঘ। আমার মধ্যে এতটা পরিবর্ত্তন আর কিছুতে ঘটায় নাই। তের মাসে একেবারে বুড়ী হইয়া গিয়াছি। আমার চ'খের অসংশয় ও মনের অহংকার,—দুইই লুপ্ত হইয়াছে। এখন ধূম দেখিবামাত্র বহ্নির অনুমান করিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। এখন বজ্রগর্জ্জন, আর বিদ্যুৎস্ফুরণে জলভরা মেঘকেই মনে পড়ে, কোন অগ্নিকাণ্ডের কথা মনে হয় না।

* * * *

স্বামীর শোকে কোন্ কোন্ সময়ে আমার আহারে অনিচ্ছা হইবে, কোন্ কোন্ খাদ্যের উপর অরুচি হইবে, এবং সাজসজ্জার কোন্ কোন্ বিশেষ অংশের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তাহা শাস্ত্রকারগণ ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। আমার মনের কথা তাঁহারা নিশ্চয়ই ভাল বুঝিতেন। কারণ, আমি নিজে আমার মধ্যে বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাই নাই। আমার মনে হইত আমার ভোগস্পৃহার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। থান পরিবার সময়েও, মিহি পাইলে আর মোটা পরিতাম না. ধোয়া কাপড় পাইলে আর কোরা কাপড় পরিতে চাহিতাম না। আহার না করিলেও ক্ষুধা বোধ করিতাম পূর্ব্বের মতই। এবং মুখরোচকের প্রতি রুচি আমার পূরাদমেই ছিল। তাই আমিষের বদলে তরকারীতে কাঁচা লঙ্কা মিশাইতে লাগিলাম।

শুনিতে পাই, আমার এই (কৃচ্ছ্রসাধন বলিব না) কৃচ্ছ্রভোগ না কি ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল। তাই এক দিন মাতাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "হাঁ মা, থান পর্‌লে যদি ব্রহ্মচারী হওয়া যায়, ত দাদাকে থান পরাও না কেন ? তাঁকে বিবাহ কর্‌তে দেবে না, ব্রহ্মচারী হতেও দেবে না ?"

মা বলিয়াছিলেন, "কি কর্‌বো মা ? যে সমাজে বাস করি, তার আইন পূরাপূরি মেনেই চল্‌তে হবে।"

আইন যে মানিতেই হইবে, তাহাতে যে কোন শৈথিল্য করা চলিবে না, এ বিষয়ে মাতার মনে কোন সংশয় ছিল না। আমার পিতা কিন্তু প্রচার করিতেন, সমাজকে অবজ্ঞা করিতে পারাই পুরুষত্ব। তাই তিনি যেদিন প্রথম দেখিলেন আমি থান পরিয়াছি, সেদিন আমাকে প্রায় তিরস্কার করিলেন, 'থান্ পরেচিস্ না কি ? তোকে থান্ পরতে বল্‌লে কে ?'

আমি। মা বল্‌ছিলেন, থান্ না পর্‌লে লোকে আমার নিন্দা কর্‌বে।

বাবা। নিন্দে কর্‌বে ! হতভাগা লোকেরা নিন্দে কর্‌বে, তাই থান পর্‌তে হবে ! কারুর কথা শুনিস নি তুই। আমি কালই তোকে সরু পাড়ওলা কাপড় কিনে এনে দোবো। থান পর্‌বে !

আমি। তা, থান পর্‌তে বারণ করেন, আমার নিজের ত অনেক সাড়ী আছে। কাপড় কিন্‌তে হবে কেন ?

বাবা। সাড়ী ? না সাড়ীটা প'রে কাজ নেই। কি কর্‌বো বল ? লোকগুলা যা মুখে আস্‌বে, বল্‌বে যে ! কাজ নেই। আমি তোর জন্য সরুপাড়ওলা কাপড়ই এনে দোবো।

আমার দাদা সকল সময়ে সকলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ। ঐ নরুন পাড়ের নল্‌চে আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষা কোরো।'

শুনিয়াছি, বাবা এই সময়ে আমার পুনর্ব্বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন। সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া যিনি বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তিনিও এমন নল্‌চে আড়াল দিলেন কোন্ জুজুর ভয়ে, বলা শক্ত।

সত্য কথাই বলি, আর একবার বিবাহ করিতে আমার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু শুনিলাম বাবা বিবাহের আয়োজন করিতেছেন জানিয়া শচীশ দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব করেন, এবং এবারে বাবা তাঁহাকে দূর করিতে পারেন নাই।

আমার মনে হইল, আমার অদৃষ্টের তলে তলে শচীশ যেন প্রস্রবণের মত প্রবাহিত হইতে থাকিবেন, এবং এমনি করিয়া মাঝে মাঝে উৎসারিত হইয়া উঠিবেন,—অনন্তকাল। তাঁহাকে কিছুতেই এড়ান যাইবে না।

এতদিন যাঁহারা সমাজের সকল নিষ্ঠুর নিদেশ নির্ব্বিচারে পালন করিয়াছেন, হঠাৎ তাঁহাদের এতটা ভাবাধিক্য হইল যে বিধবা বিবাহে সম্মত হইলেন, অসবর্ণ বিবাহেও আপত্তি করিলেন না। কিন্তু মনের সম্ভাব্যতার সীমা ত আমার জানা নাই। আমি জানি জীবন্ত পদার্থের বালাই এই, যে তাহাকে কাঁথা কম্বলের মত কোন প্যাকিং বাক্স ভরিয়া লেবেল আঁটিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আমি দেখিয়াছি যে শৈত্যকাতর বালক প্রাণপণে জলের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলে, তাহাকে লজ্জা, ভয় বা লোভের তাড়নায় যদি জলের মধ্যে এক ধাপ নামান যায়, ত আরও দুইটা ধাপ সে স্বেচ্ছাতেই নামিতে পারে।

যাহা হউক, অসম্ভবই যদি হয় ত এ অসম্ভব একদিন সম্ভব হইয়াছিল—শচীশের সহিত আমার বিবাহ স্থির হইয়াছিল। এই বিবাহ লইয়া শচীশের সহিত আমার আলোচনাও হইয়াছিল। ইহাকে ঠিক প্রেমালাপ বলা চলে না। কারণ, তাঁহার সকল আলোচনাই ছিল দোকানদারের হাতচিঠার মত হিসাব-কণ্টকিত। এই কণ্টকিত আলোচনার মধ্য দিয়া আমরা পরস্পরকে দ্বিতীয়বার বরণ করিলাম। মাকালের বর্ণ বা রসালের গন্ধ যাহা করিতে পারিত, চোরকাঁটার কাঁটা সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিল।

বিবাহের উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইল। নিমন্ত্রণ পত্রও ছাপা হইয়া গেল। এতক্ষণে আমার পিতামাতার চৈতন্য হইল। যে শ্মশানবৈরাগ্যে তাঁহারা পথে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন, এতক্ষণে তাহা কাটিয়া গেল। এইবার তাঁহারা বুঝিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই। এখন কোনরূপে অতীতের বংশকুঞ্জ-কবলিত শ্বাসরোধক শান্তির মধ্যে ফিরিতে পারিলে বাঁচিয়া যান,—এইরূপ অবস্থা। অথচ কি করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

আমিই তাঁহাদের উদ্ধার করি। যে ইঁদুরটা তাঁহাদের ভাঁড়ার ঘরে উৎপাত করিতেছিল, আমিই এক লাঠির ঘায়ে তাহার মাথাটা ছর্‌কুটিয়া দিই। এখন তাঁহাদের সংসার নিষ্কণ্টক হইয়াছে। আমার প্রাণ কিন্তু আজও সেই ইঁদুরটার মত থাকিয়া থাকিয়া খাবি খাইয়া উঠে।

শচীশ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিবাহের আর দুই দিন মাত্র বাকী আছে। তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলাম, 'আমাকে মাফ করুন, আমি এ বিবাহ করতে পারবো না।'

শচীশের হাস্যতরল মুখশ্রী এক মুহূর্ত্তে বরফের মত কঠিন হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'আর দু'দিন আগে এ কথাটা বল্‌লে ভাল হ'ত।'

আমি। তখন আমি নিজের মন ঠিক বুঝতে পারি নি।

শচীশ। তুমি বলচো, বাড়ীর মন বুঝ্‌তে পারি নি? তোমাদের নিজেদের ত কোন মন নেই। তোমরা বিসর্গ। আকারের পর থাক্‌লে আঃ কর, উকারের পর বসলে উঃ কর।

আমি। না, আমি নিজের কথাই বল্‌চি। আমি সংযম পালন কর্‌তে চাই।

শচীশ। বিবাহ কর্‌লেই মানুষ অসংযত হয়ে ওঠে না।

আমি বুঝাইলাম, আমি পূরা ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিতেছি।

শচীশ বলিলেন, "Total abstinence? কি উদ্দেশ্যে?"

এত অসম্ভব প্রশ্ন তিনি করিতে পারেন! আমি বলিবার চেষ্টা করিলাম, 'কেন, ব্রহ্মচর্য্যের জন্য ব্রহ্মচর্য্য—'

তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অনাবশ্যক। তুমি সাধনা কর্‌লে বড় বড় ঝামা চিবিয়ে খেতেও পার। খাবার দরকার নেই। তুমি ভাবচো, ব্রহ্মচর্য্য একটা খুব বড় জিনিষ! তা নয়। ওর মধ্যে শ্রদ্ধেয় একেবারেই কিছু নেই। আমি জানি অনেক বড় লোক ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, বড় কাজের মধ্যে প'ড়ে। এঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি, সেই সব বড় কাজের জন্য,—ব্রহ্মচর্য্যের জন্য নয়। কোন নিষ্কর্ম্মা নিউটন শুধু ব্রহ্মচর্য্যের জোরে অমর হ'তে পারতেন না।"

আমি জোর করিয়া বলিলাম, 'আপনি যাই ভাবুন, আমি ব্রহ্মচর্য্যকে পালনীয় মনে করি।'

শচীশ। মিথ্যা কথা। তুমি বিবাহিত জীবনই যাপন কর্‌তে চেয়েছিলে।

আমি বলিবার চেষ্টা করিলাম, 'কিন্তু—'। আমাকে উত্তরের অবকাশ না দিয়াই তিনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, "কতদিনের জন্য চেয়েছিলে? এক বৎসরের জন্য? কোন্ ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন কর্‌তে চেয়েছিলে? কে সে লোকটা? যাঁর সঙ্গে ধ'রে বেঁধে তোমার বে' দেওয়া হয়েছিল?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার প্রাণের ভেতর থেকে কোন যুক্তি আস্‌চে না। বানিয়ে কথা তৈরী কর্‌তে হচ্চে তাই, এমন কাবু হয়ে পড়্‌চো।"

আমি উত্তর দিলাম, "আচ্ছা, আমি মনের কথাই বলি,—আমি বাপ মা'র মনে কষ্ট দিতে চাই না।"

শচীশ। এও তোমার মনের কথা নয়। তোমার বাপ মা তোমার ওপর যথেষ্ট নিষ্ঠুরতা করেছেন। তাই একটা childish way of revenge আবিষ্কার করেছ,—নিজেকে চিরদুঃখী করা। আর তা না হয়ত, কেবল তাঁদের তাক লাগাবার জন্য একাজ কর্‌তে যাচ্চ। এও childishness.

আমি। আপনি আমার বাপ মা'কে জানেন না—

শচীশ। আমি হয়ত জানি না। কিন্তু তুমি জান, যে এঁরা তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু মানের নেশা ছাড়্‌তে পার্‌বেন না। তাই যযাতির মত নিজের যৌবন দান কর্‌তে বসেছ, এই ক্ষুদ্র স্বার্থপর বৃদ্ধ বাপ মা'র খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য।—তুমি বল্‌লে তাঁদের মনে কষ্ট দিতে চাও না। কষ্ট দাওনি কখনো? কষ্ট দেবার কারণ ঘটে নি কখনো?

আমি। অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর দিতে চাই না।

শচীশ। একজনকে খুন কর্‌লে যদি তাঁরা সুখী হন, ত খুন কর্‌বে?

আমি। না, তা কেন কর্‌বো?

শচীশ। তাই ত কর্‌চো। আমার জীবন ত নষ্ট কর্‌চো।

তাঁহাকে এত উত্তেজিত হইতে কখনও দেখি নাই। আমার কান্না আসিতে লাগিল। আমি হাত জোড় করিয়া বলিলাম, আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার বয়স আছে, সুখী হবার নানা পথ আছে। আমার বাপ মা বৃদ্ধ—

শচীশ কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কে তোমার বেশী আপনার? আমি তোমাকে সুখী দেখে সুখী হতে চাই। আর তোমার বাপ মা তোমার বিষণ্ণ মুখ না দেখ্‌লে সুখী হবেন না।"

আমি আর নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না। দুই হাতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন।' হায়! কোথায় দয়া! কোথায় ক্ষমা!

তিনি বেশ জোর করিয়াই আমার হাত ছাড়াইয়া লইলেন। একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন 'I am disappointed!' তারপর আমার দিকে ভৎর্সনার তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ, এই যে তোমার attitude,—এই যে সত্যকে সহ্য কর্‌তে পার না, এই যে নিজের মত-বিশেষকে ছলে বলে কৌশলে, বাঁচাবার জন্য প্রাণপাত কর্‌চো,—এই যে শুধু তাক্ লাগাবার লোভে দুটো জীবন নষ্ট কর্‌চো, এই যে একটা তুচ্ছ জিনিসকে আর সকলের ওপরে স্থান দিচ্ছ,—তোমার এই attitude, অত্যন্ত অসংযত ইন্দ্রিয়াসক্তির চেয়ে কম ক্ষতিকর নয়, সমাজের পক্ষে। তোমার এই mentality নিয়েই লোকে slave trade আর কৌলীন্য প্রথার সমর্থন করে, আত্মহত্যা করে, মোটর ডাকাতী করে।"

কথা শেষ করিয়াই, শচীশ চট্ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এবং বিদ্যুদ্‌বেগে বাহির হইয়া গেলেন। একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না। শচীশের সহিত ইহাই আমার শেষ সাক্ষাৎ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম এতবড় আঘাতটা আর সামলাইতে পারিব না। আজ কিন্তু নিজের অন্তরের দিকে চাহিয়া দেখি, ক্ষতের কোন চিহ্নই নাই। এক একবার ভাবি, এত নির্ম্মম হইলাম কিরূপে? কিন্তু ইহাই বোধ হয় জীবনের ধর্ম্ম। জীবনের প্রবহমান চোরা বালিতে হয়ত কোন চিহ্নই স্থায়ী হয় না।

ছেলেবেলায় আমার নখের উপর একটা সাদা দাগ হইয়াছিল। এ দাগ থাকিলে না কি রন্ধনবিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করা যায়। আমার কিন্তু এরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জনের দিকে কোন উৎসাহ ছিল না। আমি এই দাগটাকে উঠাইবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছি! সাবান ঘসিয়া, ঝামা ঘসিয়া, কিছুতেই তাহাকে মুছিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম দাগটা বুঝি এইরূপই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু থাকে নাই ত। নখের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কখন সে আপনা হইতেই খসিয়া পড়িয়াছে।

শচীশও আমার জীবন হইতে এমনি করিয়া খসিয়া পড়িয়াছেন! তিনি যে সিঁদূর কৌটাটী দিয়াছিলেন,—আশ্চর্য্য!—সেটীকেও ভুলিয়া গিয়াছি। যেদিন হইতে সিঁদূর পরা ঘুচিয়াছে, সেদিন

হইতে আজ পর্য্যন্ত, একদিনের জন্যও কৌটাটী বাহির করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই!—

মাঝে মাঝে জানিতে ইচ্ছা করে, শচীশও কি আমাকে ভুলিয়াছেন! এতদিনে নিশ্চয়ই ভুলিয়া গিয়াছেন। হয়ত সংসারী হইয়াছেন, কাচ্ছা-বাচ্ছা লইয়া আমারই পাশের বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন; হয়ত আমারই দুয়ারের পাশ দিয়া প্রত্যহ বাজার করিতে যান!—একবার তাঁহার মুখের উপর বলিতে ইচ্ছা করে "Oh! I am disappointed at you!" —না, না, না! এমন কথা আজ আমি বলিব না। আজ আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিলাম।

(৬)

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছি। পতির মৃত্যুর পর এই ষোলবৎসর থান পরিয়াছি, একসন্ধ্যা আহার করিয়াছি, মৎস্য, মাংস বর্জ্জন করিয়াছি, এবং দেহকে কোনরূপে অপবিত্র করি নাই। কিন্তু ইহাতে আমার কি লাভ হইল, সংসারেরই বা কি লাভ হইল,—বুঝিতে পারিতেছি না।

চাকরী ছুটিয়া গেলে উর্দ্দী ছাড়িতে হয়। ইহার নাম কি ত্যাগ? কয়েদখানায় বাস করিবার সময় কদন্ন আহার করিতে হয়, বিলাস-বর্জ্জন করিতে হয়, কাহারও সহিত যৌন-সম্বন্ধ রাখিতে নাই,—ইহার নাম কি ব্রহ্মচর্য্য?

নোটিস্ টাঙ্গাইয়া আমার খাওয়া পরা ঠিক করিয়া দিবে অন্য লোকে,—এত বড় অপমানের ব্যাপার ত আর কিছু খুঁজিয়া পাইনা। পতির জীবদ্দশায় আমাকে বিলাসী হইতেই হইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত বিলাসিতা বর্জ্জন করিতে হইবে, আবশ্যককেও ত্যাগ করিতে হইবে,—আমার উপর এতবড় জুলুম করিবার স্পর্দ্ধা ও অধিকার সমাজ কোথা হইতে পাইল? পাইল,—দেহকে বিক্রয় করিয়াছি বলিয়া,—ইহাতে আর আমার কোন স্বত্ব নাই বলিয়া।

সাবিত্রীও দেহ বিক্রয় করে। কিন্তু তাহার কেনা বেচার মধ্যে স্বাধীনতার গৌরব আছে। ইচ্ছা করিলে সে তাহার বিক্রেয় বস্তু দান করিতেও পারে, ইচ্ছা করিলে কাল তাহার বিক্রয় বন্ধ করিতেও পারে। আমার সে অধিকার নাই। চিরকালের মত বিক্রীত হইয়া গিয়াছি! ওগো সকল কালের অন্তর্যামী, সৃষ্টির আদিম বসন্তোৎসবে, যে দিন অগণিত সূর্য্য-চন্দ্র গ্রহনক্ষত্রকে মুঠা মুঠা আবীরের মত আকাশে ছুড়িয়া ছিলে, সেদিন এই উৎক্ষিপ্ত কণিকাগুলির মধ্যে কি কোন জাতিভেদ ছিল? সেদিন কি জানিতে, ইহাদেরই দু একটা কণা, তোমার বিরাট ব্যোমরাজ্য হইতে বিচ্যুত-বিক্ষিপ্ত হইয়া, ধ্বস্ত-বিগলিত-দেহে ধরণীর মাটীর মাঝে মুখ লুকাইয়া আত্মালোপ করিবে? যদি জানিতে, তবে দুদিনের জন্য তাহাদিগকে চন্দ্রসূর্য্যের কোঠায় স্থান দিলে কেন? তাহাদের অন্তরে ধূমকেতুর অনন্ত গতিবেগই বা কেন দিয়াছিলে?

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন—ভাদ্রের সংখ্যায় "গুপ্তধন" শীর্ষক গল্পে ২য় অনুচ্ছেদের প্রথম শব্দ (১০ পৃষ্ঠা) "অষ্টাবিংশ" না হইয়া অষ্টাদশ হইবে।

শোকসংবাদ

স্বামী সারদানন্দ

গত ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ২টা ৩৫ মিনিটের সময় বাগবাজার উদ্বোধন মঠে স্বামী সারদানন্দ ৬৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। স্বামী সারদানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। যখন ইনি দক্ষিণেশ্বরে যান তখন ইনি তরুণ যুবক, কলেজের ছাত্র ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সেই সময় তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইনি আকুমার ব্রহ্মচারী ও কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিবার জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামী সারদানন্দ ভারতবর্ষের নানাতীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন হিমালয়ের অন্তর্গত হৃষীকেশে অবস্থান করিয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলীর সাধন ভজন লোকহিতকর কর্ম্ম গোপনে হইয়া থাকে, বাহিরের লোকের চক্ষে শুধু অনুষ্ঠানগুলি ধরা পড়ে। তাই ইহাঁদের জীবনের অনেক কাহিনী লোকচক্ষুর অগোচর। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে ইংলণ্ড ও মার্কিণে বেদান্তধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় অনেকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পরে তিনি এদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে ইহাঁর অসামান্য অধিকার ছিল। ইহাঁরই পরিশ্রমে ও সম্পাদকতায় স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী সাধারণে প্রকাশ পাইয়াছে। স্বামী সারদানন্দের মত তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বর্ত্তমানে কেহ ছিলেন না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। "ভারতে শক্তিপূজা" গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত চিন্তাশক্তি ও অপূর্ব্ব সাধনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ" গ্রন্থে ইনি সরল প্রাঞ্জলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বসমূহ অতি সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।—ইনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা —ইহাঁরই প্রাণপাত পরিশ্রমে ও পরিচালনায় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম ও প্রচার-কেন্দ্রসমূহ সুশৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত হইয়া—বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। মাতৃজাতির উন্নতিকল্পে নিবেদিতার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শত শত যুবক ইহাঁর মধুর সংস্পর্শে আসিয়া দুর্ভিক্ষে, বন্যায় ও মড়কে, সেবাকার্য্যে উদ্বোধিত হইয়াছে এবং অনেকে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।—তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতির অন্তরালে করুণার ফল্গুনদী প্রবাহিত হইত। লর্ড কার্ম্মাইকেল, নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি ইহাঁর পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—এবং তাঁহারা ইহাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। বলিতে কি, নীরব কর্ম্মীর ও নীরব সাধকের ইনি আদর্শ ছিলেন। সারদানন্দ স্বামিজীর অভাবে আজ বাঙ্গালীজাতি শোকাচ্ছন্ন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী নিরাশার অন্ধকারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন।—আজ তাঁহার মত সাধককর্ম্মীর অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি।

ছিটে-ফোঁটা

স্বরাজ

বর্ষা ফুরায় বর্ষ না হ'তে শেষ।

স্বরাজ, স্বরাজ !
স্বরাজ বিহনে জীবনে মোদের
সব সুখ আশা mirage !
আজি তৃষাতুর ভারতবর্ষ,—বর্ষা ফুরায়
বর্ষ না হতে শেষ।
অনুপ্ত ভূমি,—ক্ষুধিত কৃষাণ হর্ষ হারায়,
কর্ষিবে কেবা দেশ ?

মশক তাড়াবে কে ?

স্বরাজ না হ'লে এ দীন দেশের বিভব বাড়াবে কে ?
নিরুদ্যমীর নিদ্রা ছাড়াবে কে ?
বাঁশের বাগিচা অক্ষত রেখে, মশক তাড়াবে কে ?
স্বরাজ মোদের বিকল-রাষ্ট্র-মোটর বাসের garage,
সকল জীর্ণ চূর্ণ তাহার পূর্ণ করিতে স্বরাজ !
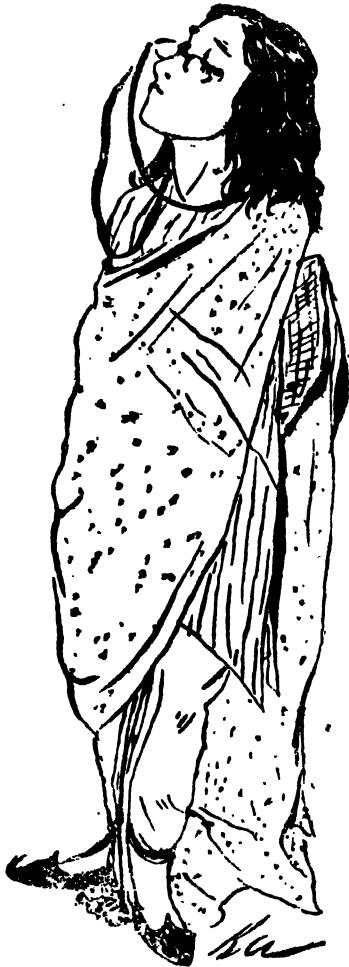
জগত সভায় হব মোরা সর্‌ফরাজ

(২)

স্বরাজ ! স্বরাজ !
কতদিনে হায় জগত সভায়
হব মোরা সর্‌ফরাজ ?
কবে বাণিজ্য-লক্ষ্মীরে ঘরে ধরিব আনি
বাঁধিয়া চর্‌কা সুতায় ?
কবে বিজাতীয় রাজশক্তির করিব হানি,
বাঁধিয়া তর্ক ছুতায় ?

কবে হবে প্রতি দরখাস্তেতে পূর্ত্তি সন্ধাশার,
করিতে হবে না চর্চ্চা পর ভাষার,
খবর রাখিতে হবে না সাহেব সুবার ঘরবাসার ?
কবে ঘরে ঘরে হাজারে হাজারে কেরাণী করিবে বিরাজ ?
কবে হব মোরা A. G., D. G., জজ ? কবে পাব মোরা স্বরাজ ?

নিজেরাই হব A. G., D. G., জজ

(৩)

স্বরাজ ! স্বরাজ !

স্বরাজের পথে বিঘ্নের লেশ

রাখিতে আমরা নারাজ।

নারীদের তাই রেখেছি পঙ্গু অন্ধ ক'রে,

পাছে তারা পথ ভুলায়।

রেখেছি তাদের বিজন পিঁজরে বন্ধ ক'রে,

পাছে তারা মত ঘুলায়।

যবে দিগন্ত ভরি রণভেরি বাজিবে ভৈরবে,

স্ত্রীগুলারে পিঠে বাঁধি, সগৌরবে

ছুটিয়া চলিব মৃত্যুকুটিল সমর রৌরবে।

বুক না ফুলে, ত মুখ ফুলাইয়া

করিব যুদ্ধ দরাজ।

আমরা যে চাই অমর মরণ,

আমরা যে চাই স্বরাজ !

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

আশ্বিনে

উৎসব আসিতেছে। নানা স্বার্থের সংঘর্ষণে, হিংসা-বিদ্বেষের তীব্রতায় ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় এবৎসর সারা পৃথিবীতে নানা উপদ্রব ও উৎপাত ঘটিয়াছে। যে জলপ্লাবনে ভারতের পশ্চিমভাগে গুজরাট ও পূর্ব্বভাগে ওড়িশা অতিশয় দুঃস্থ ও পীড়িত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও সেইরূপ জলপ্লাবনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দুঃখ সহিয়া ও দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে মানুষ হইতে হয়। মানুষেরা একদিকে দুঃখকে পরাভূত করিবার জন্য আনন্দের উৎসব করে, আবার অন্যদিকে উৎসবের অনুষ্ঠানে তাঁহাকেই বরণ করে যিনি জীবনে সঞ্জীবনী শক্তির উৎস। কোনরূপে দুঃখ ভুলিয়া আনন্দের বা আমোদ-প্রমোদের কোলাহলে চিত্ত-বিনোদন করা সম্ভবপর হয় বটে, কিন্তু উৎসব যদি স্থায়ী জীবনীশক্তি লাভের সহায় না হয়, তবে আমাদের আনন্দ উৎসবের বাসি ফুলের মত শুকাইয়া যায়। উৎসব আসিতেছে; আমরা যেন এই উৎসবের দিনে শক্তিদাত্রীর বরে স্থায়ী শক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি। বঙ্গের শারদীয় উৎসবের এই চিরন্তন প্রথাটি যেন বিস্মৃত না হই, যে আমাদিগকে হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করিয়া, শত্রুর শত্রুতা ভুলিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ করিতে হইবে। উৎসবের শেষ দিনে মিলনের অকপট মন্ত্রে সারা ভারতবর্ষকে প্রাণে প্রাণে গাঁথিবার কথা যেন তিলমাত্র না ভুলি,—যেন প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা শক্তি সঞ্চিত বাহু-প্রসার করিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিতে পারি।

নিগৃহীত ভারত—আমরা আর কতদিনে পার্লামেণ্টের ব্যবস্থায় মানুষ-মাত্রের প্রাপ্য অধিকারগুলি পাইতে পারিব, তাহা অনিশ্চিত। এদেশে জেতা জাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ও অন্য ইউরোপীয় জাতির স্বার্থের পথে বাধা না ঘটাইয়া আমাদিগকে কতখানি অধিকার দেওয়া যাইতে পারে, পার্লামেণ্ট কেবল তাহাই বিচার করিয়া দেখিবেন,—মানুষ মাত্রের অধিকারের কথা বিচার করিবেন, মনে হয় না। অতি পরিমিত ও সীমাবদ্ধ গোটাকতক অধিকারের বিচার হইবে শুনিয়াই বিদেশীয়দের অনেকেই বিচলিত হইয়াছেন, ও আমরা যে অকর্ম্মা ও বর্ব্বর, তাহা বুঝাইবার জন্য অনেকে বহু চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কুমারী কেথেরাইন্ মেয়ো "মাদার ইণ্ডিয়া" বা "ভারত মাতা"-রূপ জাঁকাল নাম দিয়া যে বই লিখিয়াছেন তাহাতে পাতান মায়ের হীনতা, বর্ব্বরতা ও সদাচারভ্রষ্টতা এমন করিয়া লিখিয়াছেন যাহাতে প্রমাণিত হয় যে ভারতবাসীরা অধিকারের দাবি না তুলিয়া যদি ইংরেজের অধীনতাতেই বাস করে তবেই কেবল তাহার মঙ্গল হইতে পারে। ইঁহার বইখানি বিলাতে লাখে লাখে কাটিতেছে শুনিয়া বুঝিতে পারা যায় যে মেয়ো ঠাকুরাণী যাহা লিখিয়াছেন তাহা জেতা জাতির লোকের অতি মুখরোচক হইয়াছে। অনেক পণ্ডিত ইংরেজ সারা জীবন ভারতে কাটাইয়া আমাদের যে অপরাধ ত্রুটি দেখাইতে পারেন নাই, মার্কিণকুমারী ছমাস ধরিয়া একবার এই দেশ বেড়াইয়াই তাহা যে আবিষ্কার করিতে পারিলেন ও তাঁহার আবিষ্কৃত বিবরণ যে এত আদৃত হইতে পারিল ইহাই অতি আশ্চর্য্যের কথা।

যে ইংরেজেরা এই বই পড়িয়া মনে মনে খুসী অথচ আমাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করিতে চান্, তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন যে আমাদের উচিত ঐ বইখানি সমালোচনা করিয়া অন্য বই লেখা। তাহাতে যে কিছুমাত্র ফল হইবে না ইহা অতি বোকা লোকেও বুঝিতে পারে।

যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের হীনতার বর্ণনা পড়িতে, তাঁহারাই ঐ বই পড়িয়া সুখী হইয়াছেন আর সেই জন্যই ঐ বইখানির কাটতি হইয়াছে অত অধিক। এক্ষেত্রে সেই বইএর বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া ধৃষ্টতা। একজন ছয়মাসের অভিজ্ঞতায় ভারতের আচার ব্যবহার, শিক্ষা লিখিয়া যখন আদর পাইয়াছেন, তখন যাঁহারা আমাদের প্রতি বিমুখ তাঁহাদিগকেই আত্ম-স্বার্থের কথা বলিয়া কিছুই বুঝান অসম্ভব। এ সম্পর্কে একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত শিক্ষাপ্রদ হইবে; নামজাদা বড় সরকারি কর্ম্মচারী স্যর্ অতুল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতবাসীরা ইংলণ্ডে কুমারী মেয়োর অসার ও অসাধু উক্তির বিরুদ্ধে সংযত ভাষায় যাহা বলিয়াছিলেন, টাইম্‌স্ পত্র তাহা মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। আমাদের সাধ্য নাই ইউরোপকে কিছুই বুঝাই।

বিলাতের লোকেরা বলিতে পারেন যে কুমারী মেয়ো নিরপেক্ষভাবে সকল কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থের আদর হইয়াছে, আর আমরা কিছু লিখিতে গেলেই অভিসন্ধি লইয়া লিখিব। অভিসন্ধির কথা এইটুকু বলিতে পারি যে, যখন ফিলিপাইনের অধিবাসীরা আপনাদের স্বাধীনতার দাবি করিতেছিল ও সেই দাবির কথা আমেরিকায় সমালোচিত হইতেছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই কুমারী মেয়োর মন ফিলিপিনোদের উপকারের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, আর তিনি দম্ভসহকারে বুঝাইয়াছিলেন যে, ফিলিপিনোরা অতি অল্পমাত্রায় স্বাধীনতা পাইলেও সে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। ঠিক আবার যে মুহূর্ত্তে ভারতের দাবির কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইতেছে সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ছয়মাস ভারত ঘুরিয়া এদেশের অশিষ্টতা, বর্ব্বরতা, প্রভৃতির কথা লিখিয়া ফেলিলেন। আমাদের সে শক্তি নাই যাহাতে আমাদের ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে পারি। ক্ষমতাশালীরা যে যাহা বলিবে ভাগ্যদোষে আমাদিগকে তাহা সহিতেই হইবে; প্রত্যুত্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু বলিলে সে ক্রোধ কেবল আমাদিগকেই আপনার আগুনে পোড়াইবে,—পরের গায়ে তাহার তাত লাগিবে না।

যেরূপ নীচতায়, কাপুরুষতায় ও ধৃষ্টতায় একজন পার্লামেণ্ট সভার সদস্য অতি জঘন্য কুৎসিৎ ভাষায় ভারতের তিনকোটি বিধবাকে অপবিত্রতার অপবাদ দিয়া অপমান করিয়াছে তাহা উল্লেখের অযোগ্য,—আর সেই নীচপ্রকৃতি ব্যক্তির নাম লিখিয়া আমরা এই পত্রিকার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে চাই না। অতি ক্ষুদ্র একটি স্বাধীন দেশের কোন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে যদি এরূপ কুৎসিৎ অপবাদ প্রকাশিত হইত আর স্বাধীন ক্ষুদ্র দেশটির একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী বা রাজমন্ত্রী যদি অপবাদকারীর বিরুদ্ধে তাঁহার দেশের রাজসভায় অভিযোগ জানাইতেন, তবে তৎক্ষণাৎ অপবাদ প্রচারকটির দণ্ড হইত। কিন্তু আমরা মনুষ্যবর্গের এত বাহিরে বলিয়া বিবেচিত যে এরূপ গুরুতর বিষয়েও বিলাতের রাজশক্তি তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না,—অথচ কথায় কথায় শুনিতে পাই যে আইনের ন্যায্য বাঁধনে না-কি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এক সঙ্গে গাঁথা। আমরা প্রতি পদে নানা অশিষ্ট ব্যবহারে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হইতেছি, আর সেই নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার প্রতীকার নাই।

* * * * *

হিন্দু-মুসলমান—বঙ্গবাণীর জন্মদিন হইতে আমরা এ পর্য্যন্ত ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছি যে মানুষেরা যদি সে শিক্ষা না পায় যাহাতে যে যাহার আপনার ধর্ম্মমত নিজের মনে পোষণ করিয়া রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য এক সঙ্গে মিলিতে পারে তবে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও

কোলাহল কিছুতেই মিটিতে পারে না। প্রতিদিন ভারতের নানা স্থান হইতে সংবাদ আসিতেছে যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধির পাপে কত নরহত্যা ঘটিতেছে। পঞ্জাব সীমান্ত হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে একই মুসলমানদের দুই সম্প্রদায়ে অর্থাৎ শিয়া ও সুন্নিতে কিরূপ ভীষণ বিদ্বেষের লড়াই চলিতেছে। বিদ্বেষের লড়াই বাধিবার মূল কোথায় তাহা ইহাতে কথঞ্চিৎ সূচিত হয়। পাপ যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন ধর্ম্মের নামে উহা অনুষ্ঠিত হইলে কেন যে বিশেষ বিচারে উহা বিচারিত হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি না। সাধারণ ভাবের লুটতরাজ, নরহত্যা প্রভৃতি যেরূপভাবে দণ্ডিত হয় সেই ভাবেই এই সকল সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বিচার ও দণ্ড হওয়া উচিত; লড়াইয়ের মূলে ধর্ম্ম-বিশ্বাসজনিত বিদ্বেষ আছে কি-না তাহা তিলমাত্রেও উল্লিখিত হওয়া উচিত নয়। এই সকল বিবাদ ও পাপের অভিনয়ের পর সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মিল ঘটাইবার জন্য সভা-সমিতি বসিবার ফলে দুর্ব্বৃত্তেরা মনে করিয়াছে যে তাহাদের ডাকাতি ও নরহত্যা খানিকটা ধর্ম্মের নামে আবৃত থাকিতে পারিবে। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আমাদের কি-কি কাজ করা কর্ত্তব্য আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকের কি-কি কাজ করা চাই তাহা যদি আমরা খোঁটাইয়া খোঁটাইয়া আলাদা আলাদা তালিকায় লিখিতে পারি তবে নিশ্চয়ই লোকসাধারণের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে যে রাষ্ট্রের কাজে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা উঠিতে পারে না। একদিকে আমরা সে কাজ করিতেছি না, আর অন্যদিকে চাকুরি পাইবার সংখ্যা নির্ণয়ের কোলাহলে এমন ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনা বাড়াইতেছি যাহাতে স্থায়ী স্বার্থের কথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেছি। বিশেষভাবে দেশের হিন্দু-মুসলমান নেতাদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে রাষ্ট্রীয় কোন ব্যবস্থায় অথবা চাকুরি পাইবার উপযোগী লোকেদের চাকুরির ব্যবস্থায় পাপকারীদের পাপের অনুষ্ঠান নিবৃত্ত হইবে না। যাহারা প্রতি দিন নানা অপরাধের জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেছে তাহারা নিশ্চয়ই এক একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক; তাই বলিয়া সেই অপরাধীদের বিচারের সময়ে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মাতব্বর ডাকিয়া পাপ নিবারণের জন্য সভা করা চলে না।

* * *

মিরাটে সাহিত্য সভা—বাঙ্গলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল বাঙ্গালীরা বাস করেন, তাঁহারা পাঁচ বৎসর ধরিয়া উত্তর ভারতের নানা স্থানে বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনী করিয়াছেন, ও এবার উহার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন মিরাট সহরে হইবে। সাহিত্যের উন্নতি কল্পে ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বাড়াইবার পক্ষে ইহা অতি হিতকর অনুষ্ঠান। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সাহিত্য সভার উন্নতি কামনা করিতেছি। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মিরাটে এই সভার অধিবেশন হইবে। বঙ্গদেশ হইতে অনেক সাহিত্যিক যদি ঐ সময়ে মিরাটে যান্ তবে তাঁহাদের নিজেদের ও প্রবাসী বাঙ্গালীদের অনেক উপকার হইবে। এক সময়ে বাঙ্গালীরা উপার্জ্জনের উপায় খুঁজিয়া উত্তর ভারতের নানা স্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সেদিক দিয়া অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালীর প্রসার অত্যন্ত কম হইয়াছে, আর যে কারণেই হউক্ অন্যান্য প্রদেশে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের সভায় এমন কিছু অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত যাহাতে অন্য প্রদেশের লোকেদের সঙ্গে বাঙ্গালীরা আগেকার মত সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারে।

দ্রষ্টব্য—বঙ্গবাণীর কার্ত্তিক সংখ্যা ১লা কার্ত্তিক প্রকাশিত হইবে

সাহিত্যের রীতি ও নীতি

শ্রাবণ মাসের "বিচিত্রা" পত্রিকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত উক্ত ধর্ম্মের সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একান্ত শ্রদ্ধাভরে কবির উদাহরণগুলিকে রূপক এবং যুক্তিগুলিকে সবিনয়ে রসরচনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উভয়ের মত-দ্বৈধ ঘটিয়াছে প্রধানতঃ আধুনিক সাহিত্যের আব্রুতা ও বে-আব্রুতা লইয়া।

ইতিমধ্যে বিনা দোষে আমার অবস্থা করুণ হইয়া উঠিয়াছে। নরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধ দলের শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত "শনিবারের চিঠি"তে আমার মতামত এম্‌নি প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন যে ঢোক গিলিয়া, মাথা চুল্‌কাইয়া হাঁ ও না একই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া পিছ্‌লাইয়া পলাইবার আর পথ রাখেন নাই। একেবারে বাঘের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

এদিকে বিপদ হইয়াছে এই যে, কালক্রমে আমারও দুই চারিজন ভক্ত জুটিয়াছে; তাঁহারা এই বলিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন যে, তুমিই কোন্ কম? দাওনা তোমার অভিমত প্রচার করিয়া।

আমি বলি, সে যেন দিলাম, কিন্তু তার পরে? নিজে যে ঠিক কোন্ দলে আছি তাহা নিজেই জানি না, তা'ছাড়া ওদিকে নরেশবাবু আছেন যে! তিনি শুধু মস্ত পণ্ডিত নহেন, মস্ত উকিল। তাঁর যে-জেরার পরাক্রমে কবির যুক্তি-তর্ক রস-রচনা হইয়া গেল, সে-জেরার প্যাঁচে পড়িলে আমিত এক দণ্ডও বাঁচিব না। কবি তবুও অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির কোঠায় পৌঁছিয়াছেন, আমি হয়ত ব্যাপ্তি অব্যাপ্তি কোনটারই নাগাল পাইবনা, ত্রিশঙ্কুর ন্যায় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিব! তখন?

ভক্তরা বলে, আপনি ভীরু।

আমি বলি, না।

তাহারা বলে, তবে প্রমাণ করুন।

আমি বলি, প্রমাণ করা কি সহজ ব্যাপার! 'রস-সৃষ্টি' 'রসোদ্বোধন' প্রভৃতির রস-বস্তুটির মত ধোঁয়াটে বস্তু সংসারে আর আছে না কি? এ কেবল রসরচনার দ্বারাই প্রমাণিত করা যায়,—কিন্তু সে সময় আপাততঃ আমার হাতে নাই।

এ তো গেল আমার দিকের কথা। ও-দিকের কথাটা ঠিক জানিনা কিন্তু অনুমান করিতে পারি।

প্রিয়-পাত্ররা গিয়া কবিকে ধরিয়াছে, মশাই আমরা ত আর পারিয়া উঠিনা, এবার আপনি অস্ত্র ধরুন। না না, ধনুর্বাণ নয়, ধনুর্বাণ নয়,—গদা। ঘুরাইয়া দিন ফেলিয়া ওই অতি-

আধুনিক-সাহিত্যিক-পল্লীর দিকে। লক্ষ্য? কোন প্রয়োজন নাই। ওখানে একসঙ্গে অনেক গুলি থাকে।

কবির সেই গদাটাই অন্ধকারে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহাতে ঈপ্সিত লাভ না হোক শব্দ এবং ধূলা উঠিয়াছে প্রচুর। নরেশচন্দ্র চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, এবং বিনীত-ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বারম্বার প্রশ্ন করিতেছেন, কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন বলুন? কেন করিয়াছেন বলুন? হাঁ কি না বলুন?

কিন্তু এ প্রশ্নই অবৈধ। কারণ, কবি ত থাকেন বারোমাসের মধ্যে তেরো মাস বিলাতে। কি জানেন তিনি কে আছে তোমাদের খড়গহস্তা শুচি-ধর্ম্মী অনুরূপা, আর কে আছে তোমাদের বংশী-ধারী অশুচি-ধর্ম্মী শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-কালিকলমের দল? কি করিয়া জানিবেন তিনি কবে কোন্ মহীয়সী জননী অতি-আধুনিক-সাহিত্যিক দলন করিতে ভবিষ্যৎ মায়েদের সূতিকাগৃহেই সন্তান বধের সদুপদেশ দিয়া নৈতিক উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, আর কবে শৈলজানন্দ কুলি-মজুরের নৈতিক হীনতার গল্প লিখিয়া আভিজাত্য খোয়াইয়া বসিয়াছে? এ সকল অধ্যয়ন করিবার মত সময় ধৈর্য্য এবং প্রবৃত্তি কোনটাই কবির নাই, তাঁহার অনেক কাজ। দৈবাৎ এক-আধটা টুক্‌রো টাক্‌রা লেখা যাহা তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইতেই তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যের আব্রুতা এবং আভিজাত্য দুইই গিয়াছে। সুরু হইয়াছে শুধু চিৎপুর রোডের খচো-খচো-খচ্‌কার যোগে একঘেয়ে পদের পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত গর্জ্জন। আধুনিক সাহিত্যিকদের প্রতি কবির এত বড় অবিচারে শুধু নরেশচন্দ্রের নয়, আমারও বিস্ময় ও ব্যথার অবধি নাই।

ভক্ত-বাক্যের মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য আর কি আছে? অতএব, তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস জন্মিয়াছে আধুনিক সাহিত্যে কেবল সত্যের নাম দিয়া নর-নারীর যৌন মিলনের শারীর ব্যাপারটাকেই অলঙ্কৃত করা চলিয়াছে। তাহাতে লজ্জা নাই, সরম নাই, শ্রী নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রস-বোধের বাষ্প নাই,—আছে শুধু ফ্রয়েডের সাইকো-এনালিসিস্। অথচ, যে-কোন সাহিত্যিককেই যদি তিনি ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন ত শুনিতে পাইতেন তাহারা প্রত্যেকেই জানে যে সত্য মাত্রই সাহিত্য হয় না। জগতে এমন অনেক নোঙ্‌রা সত্য ঘটনা আছে যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোনমতেই সাহিত্য রচনা করা চলে না।

কবির হঠাৎ চোখে পড়িয়াছে যে, সজিনা, বক, কুমড়া প্রভৃতি কয়েকটা ফুল কাব্যে স্থান পায় নাই। গোলাপ-জাম-ফুলও না, যদিচ সে, শিরীষ ফুলের সর্ব্ববিষয়েই সমতুল্য। কারণ? না, সেগুলা মানুষে খায়। রান্নাঘর তাহাদের জাত মারিয়াছে। তাই উদাহরণের জন্য ছুটিয়া গিয়াছেন গঙ্গাদেবীর মকরের কাছে। অথচ, হাতের কাছে বাগ্দেবীর বাহন হাঁস খাইয়া যে মানুষে উজাড় করিয়া দিল সে তাঁহার চোখে পড়িল না। কুমুদ ফুলের বীজ হইতে ভেটের খৈ

হয়, এমন যে পদ্ম তাহারও বীজ লোকে ভাজিয়া খাইতে ছাড়ে না। তিল ফুলের সহিত নাসিকার, কদলী বৃক্ষের সহিত সুন্দরীর জানুর উপমা কাব্যে বিরল নহে। অথচ, সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার প্রতি বিতৃষ্ণার অপবাদ কোন কবির বিরুদ্ধেই শুনি নাই। আজ নরেশচন্দ্র বৃথাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে গিয়াছেন যে, বিম্বফল অনেকে তরকারি রাঁধিয়া খায়। উত্তরে কবি কি বলিবেন জানি না, কিন্তু তাঁহার ভক্তরা হয়ত ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিবেন, খাওয়া অন্যায়। যে খায় সে সৎ-সাহিত্যের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি বশতই এরূপ করে।

কিন্তু এই লইয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিরর্থক। এগুলা যুক্তিও নয়, তর্কও নয়, কোন কাজেও লাগে না। অথচ, এই ধরণের গোটা কয়েক এলো-মেলো দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া কবি চিরদিনই জোর করিয়া বলেন, এর পরে আর সন্দেহই থাক্‌তে পারে না যে আমি যা বল্‌চি তাই ঠিক এবং তুমি যা বোল্‌চ সেটা ভুল।

কিন্তু এ কথাও আমি বলি না যে আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে দুঃখ করিবার আদৌ কারণ ঘটে নাই, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের এবম্বিধ মনোভাব একেবারেই আকস্মিক। তাঁহার হয়ত মনে নাই, কিন্তু বছর কয়েক পূর্ব্বে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, সেদিন তাঁহার বিদ্যালয়ের একটি বারো তেরো বছরের ছাত্র 'পতিতা'র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়াছে।

আমার ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের ছোড়দা হঠাৎ কবি-যশোলুব্ধ হইয়া কাব্য-কলায় মনোনিবেশ করিলেন। এবং বাঙলা ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয় না বলিয়া ইংরাজি ভাষাতেই কবিতা রচনা করিলেন। রচনা করিলেন কি চুরি করিলেন জানি না, কিন্তু কবিতাটি আমার মনে আছে।

A lion killed a mouse
And carried it into his house ;
Then cried his mother,
And therefore cried his sister !

ছন্দঃ ও ভাবের দিক দিয়া কবিতাটি অনবদ্য। কিন্তু তুমুল তর্ক উঠিল, মদার কার? সিঙ্গীর না ইঁদুরের? বড় বৌ ঠাকরুণ ক্ষণকাল কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন, না না ওদের নয়। ও কবির মদার। 'পতিতা' গল্প রচনার বিবরণ শুনিলে বৌ ঠাকরুণ হয়ত বলিবেন, এ ক্ষেত্রে কাঁদা উচিত ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের। আর কাহারও নয়। এ তো গেল অসাধু-সাহিত্যের দিক। আবার সাধু-সাহিত্যের দিকেও তরুণ কবির অভাব নাই। এদিকে যিনিই কবিতা বা গান লেখেন, তিনিই লেখেন, তোমার বীণা আমার তারে বাজিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমার ঝিলিক্‌-মারা অরূপ মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইতেছি, বুকের মাঝে তোমার নিঃশব্দ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, খেয়ার ঘাটে বসিয়া বসিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কাণ্ডারি! এখন পার কর। ইত্যাদি।

একটা উদাহরণ দিই। ভাদ্র মাসের 'কেতকী' পত্রিকায় গান ছাপা হইয়াছে—

তোমার ভাঙার গানে তোমায় নেব চিনি
পরাণ পাতি শুনবো পায়ের রিনি ঝিনি!
(তোমার) কাল বোশেখির ঝড়ে তোমায় নেব দেখে
(তোমার) শ্রাবণ ধারা অঙ্গে আমার নেব মেখে।
আমার বুকের মাঝে তোমার আঘাত চিহ্নখানি—
আমার রোদনের মাঝে তোমার দৈববাণী!
ভুল ক'রে যে ভুলবো তোমায় হবে না তা
(তোমার) আঘাত এলে কোথায় বা তার
লুকাবো ব্যথা?
আমার ছড়িয়ে প'ল সকল খানে—
সারা বুকে
আমার জড়িয়ে গেল সকল হিয়া
দুঃখে সুখে!
সেথায় আমি তোমায় খুঁজে নেব চিনি—
(আমার) পরাণ পাতি শুনবো নূপুর রিনি ঝিনি।

উপরে উদ্ধৃত ইংরাজী কবিতাটির ন্যায় এ গানখানিও অনবদ্য। কি ঝঙ্কারে, কি ভাবের গভীরতায়, কি বৈরাগ্যের বেদনায়! 'কেতকী'র তরুণ সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিলাম, রচয়িতার বয়স কত? সে বন্ধু-গৌরবে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, আজ্ঞে, পোনর ষোলর বেশি নয়!

মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলাম, দেশশুদ্ধ সাহিত্যিক বালক-বালিকার দল যখন প্রহ্লাদ হইয়াই উঠিল, এবং 'ক' লিখিতে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিল, তখন ওরে অতিবৃদ্ধ! এক মাথা পাকা চুল লইয়া আর বাঁচিয়া আছিস্ কিসের জন্য?

সাহিত্য সৃষ্টি অনুকরণের মধ্যে নাই। ভালর-ও না, মন্দের-ও না। হৃদয়ের সত্যকার অনুভূতি আনন্দ ও বেদনার আলোড়নে অলঙ্কৃত বাক্যে বিকশিত হইয়া না উঠিলে সে সাহিত্য পদবাচ্য হয় না। বৃদ্ধ কবির গীতাঞ্জলিও যত বড় কাব্যগ্রন্থ তাঁহার যৌবনের চিত্রাঙ্গদাও ঠিক তত বড়ই কাব্য-সৃষ্টি। লাঞ্ছনার আঘাত ও গৌরবের মালা যেমন করিয়াই তাঁহার শিরে বর্ষিত হৌক না। অথচ অনুভূতিহীন বাক্য যত অলঙ্কৃতই হৌক ব্যর্থ। পতিতার অনুকরণও ব্যর্থ, গীতাঞ্জলির অনুকরণও ঠিক ততখানিই ব্যর্থ। দেশের সাহিত্য-সম্পদ ইহাতে কণামাত্রও বর্দ্ধিত হয় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি রস-বস্তু লইয়া আমি আলোচনা করিতে পারিব না। কারণ,

ও আমি জানি না। রসিক অরসিকের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতেও আমি অপারক। কবির বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধা ঠিক যে কি এবং কিসে মেটে সে আমার অনধিগম্য। কিন্তু একটা কথা জানি যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য একবস্তু নয়। আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্য ত নয়ই। সোনার তরীর যা লইয়া চলে চোখের বালির তাহাতে কুলায় না। সজিনা ফুলে বক ফুলে সোনার তরীর প্রয়োজন নাই, কিন্তু বিনোদিনীর রান্নাঘরে সেগুলা না হইলেই নয়। তেপান্তর মাঠ এবং পক্ষীরাজ ঘোড়া লইয়া কাব্যের চলে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের চলে না। এখানে ঘোড়ার চার পায়ে ছুটিতে হয়, পক্ষবিস্তার করিয়া উড়ার সুবিধা হয় না।

কবি সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "মধ্য যুগে এক সময়ে য়ুরোপে শাস্ত্র-শাসনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন অভিভূত করেছে। সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে একথা বল্‌তে গেলে মুখ চেপে ধরেছিল—ভুলেছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাধিপত্য—তার সিংহাসন ধর্ম্মের রাজত্বসীমার বাইরে। আজকের দিনে তার বিপরীত হ'ল। বিজ্ঞান প্রবল হয়ে উঠে কোথাও আপনার সীমা মান্‌তে চায়না। তার প্রভাব মানব-মনের সকল বিভাগেই আপন পিয়াদা পাঠিয়েছে। নূতন ক্ষমতার তক্‌মা পরে কোথাও সে অনধিকার প্রবেশ করতে কুণ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞান পদার্থটা ব্যক্তি-স্বভাব-বর্জ্জিত—তার ধর্ম্মই হচ্চে সত্য সম্বন্ধে অপক্ষপাত কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিত্যকেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরেচে।"

কবির এই উক্তির মধ্যে বহু অভিযোগ নিহিত আছে, সুতরাং কথাগুলিকে একটুখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। বিজ্ঞানের প্রতি কবির হয়ত একটা স্বাভাবিক বিমুখতা আছে, কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বলিতে যে কি বুঝায় আমি বুঝিলাম না। বিজ্ঞান বলিতে যদি শুধু Sex-Psychology, Anatomy অথবা Gynæcology বুঝাইত তাহা হইলে সাহিত্যের মধ্যে ইহার অবারিত প্রবেশে আমিও বাধা দিতাম। কেবল অবাঞ্ছিত বলিয়া নয়, অহেতুক ও অসঙ্গত বলিয়া আপত্তি করিতাম। পৃথিবী সূর্য্যের চারিপাশে ঘোরে ইহা যতবড় কথাই হৌক সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তাধারার ফল এই জিনিসটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক উপন্যাসের চলে না। বিজ্ঞান ত কেবল অপক্ষপাত কৌতূহল মাত্রই নয়, কার্য্য-কারণের সত্যকার সম্বন্ধ বিচার। চার এবং চারে আট হয়, এবং আট হইতে চার বাদ দিলে চার থাকে ইহাই বিজ্ঞান। এ মনোভাবকে ভয় কিসের ? কিন্তু তাই বলিয়া নোঙ্‌রামি যে সাহিত্যের অন্তর্গত নয় একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিজ্ঞান হইলেও নয়, অবিজ্ঞান হইলেও নয়, সত্য হইলেও নয়, মিথ্যা হইলেও নয়। গল্পের ছলে ধাত্রী-বিদ্যা শিখানোকেও আমি সাহিত্য বলি না, উপন্যাসের আকারে কামশাস্ত্র প্রচারকেও আমি সাহিত্য বলি না। বোধ হয় বাঙলা দেশের একজনও অতি-আধুনিক সাহিত্য-সেবী একথা বলে না।

বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া ধর্ম্ম পুস্তক রচনা করা যায়, আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করা যায়, রূপকথা-সাহিত্যও রচনা করা না যায় তাহা নহে, কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে। রাজার পুত্র গেলেন চব্বিশ বছর বয়স এবং তেপান্তর মাঠের দুর্গম পথ পার হইয়া রাজকন্যার সন্ধানে। কোটাল পুত্রের ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধি তাঁহার নাই, সওদাগর পুত্রের বেনে-বুদ্ধি তাঁহার নাই, আছে শুধু রস। গিয়া বলিলেন, তুমি যে তুমি এই আমার যথেষ্ট। এই রস উপভোগ করিবার মত রসজ্ঞ ব্যক্তির সংসারে অভাব নাই তাহা মানি, কিন্তু ভিন্ন রুচির লোকও ত সংসারে আছে? তাহারা গিয়া যদি বলে, রাজপুত্র, তোমার মনের মধ্যে রাজকন্যার রূপ-যৌবন স্থান পায় নাই, যৌতুক স্বরূপ অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রতিও তোমার কিছুমাত্র খেয়াল নাই, তুমি মহৎ। কন্যাটি যে ঘুঁটে-কুড়োনির কন্যা নয় রাজার কন্যা ইহাই তোমার যথেষ্ট। মনস্তত্ত্বের অবতারণায় প্রয়োজন নাই, কিন্তু রাজপুত্র! তোমার মনের কথাটা আরও একটু খোলসা করিয়া না বলিলে ত এই উচ্চাঙ্গের রস-সাহিত্যের সমস্ত রসটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছিনা, ত ইহাদের মুখেই বা হাত চাপা দিবে কে?

এই ধরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের সাহিত্য রচনায়। পরলোকগত সাহিত্যিকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছিনা, করিতেছি হাতের কাছে একটা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির অসম্ভব কল্পনার উদাহরণ পাইতেছি বলিয়া। বাঙ্‌লা দেশে তাঁহার পাঠক-সংখ্যা বিরল নয়। আমি নিজে দেখিয়াছি মুদির দোকানে একজন গ্রন্থ পাঠ করিতেছে এবং বহুলোকে গলদশ্রুলোচনে সেই সাহিত্য-সুধা পান করিতেছে। নিষ্ঠাবান সচ্চরিত্র দরিদ্র নায়ক মা কালীর কাছে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া সাত ঘড়া সোনার মোহর গাছতলা হইতে খুঁড়িয়া বাহির করিয়া বড়লোক হইল। ছেলে মরিল কিন্তু ভয় নাই। শ্মশানে জটা-জূট-ধারী তেজঃ-পুঞ্জকলেবর এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক আবির্ভাবে ছেলে চিতার উপরে 'বাবা' বলিয়া উঠিয়া বসিল। রসজ্ঞ শ্রোতার দল কাঁদিয়া আকুল। তাহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান নাই। সেখানে কেহই ঠেলা দিয়া প্রশ্ন করে না, কেন? কিসের জন্য? তাহারা বলে, দরিদ্র নায়ক বড়লোক হইয়াছে ইহাই ঢের। মরা-ছেলে প্রাণ পাইয়াছে ইহাই আমাদের যথেষ্ট,—ইহাতেই আমাদের বোধের ক্ষুধা আত্মার ক্ষুধা মেটে। ইহা অনির্ব্বচনীয়,—এই প্রকার সাহিত্য-রসেই আমাদের হৃদয়ের বসন্তলোকে কল্পলতায় ফুল ফুটে।

কলহ করিবার কি আছে? কিন্তু, আমি যদি এ কাজ না পারি, নিজের গ্রন্থের দরিদ্র নায়ককে মা কালীর অনুগ্রহ জোগাড় করিয়া দিতে সক্ষম না হই, জটা-জূট-ধারী সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া না পাইয়া মরা-ছেলেকে দাহ করিতে বাধ্য হই, ত নিশ্চয় জানি আমার বই তাহারা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছাড়িবে। কিন্তু উপায় কি? বরঞ্চ, হাত জোড় করিয়া চতুরাননের কাছে গিয়া বলিব, তাহারা আরও খান কয়েক বই আমার পুড়াক, সে আমার সহিবে, কিন্তু এই

রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আত্মার ক্ষুধা বোধের ক্ষুধা মিটাইবার সৌভাগ্য শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।

কিন্তু কেন? কেন এইজন্য যে কাব্য-সাহিত্য ও কথা-সাহিত্য এক বস্তু নয়। ইহাদের ধর্ম্মও এক নয়, ধর্ম্মের সীমানাও এক নয়। এবং মানুষের বোধের ক্ষুধা ও আত্মার ক্ষুধার জাতি-ভেদ এতই গভীর ও বিস্তৃত যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব-নিয়ন্ত্রিত কল্পনাকে বিসর্জ্জন দিলে ইহাদের অর্থই প্রায় থাকেনা।

কবির কাঁকর-পদ্মের উদাহরণে নরেশচন্দ্র বলিতেছেন, ইহা যুক্তিও নয়, নৈয়ায়িকের দৃষ্টান্তও নয়। অতএব, ইহা রস-রচনা। আমার বোধ হয় উপাখ্যান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অতিশয় দুরূহ। আমি ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। বস্তুতঃ, কাঁকর বরণীয় কি পদ্ম বরণীয়, চড়াই পাখী ভালো কি মোটর গাড়ী ভালো বলা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু কবি তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্মে নর-নারীর যৌন-মিলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমার মনে হয় উপন্যাস-সাহিত্যেও তাহা খাঁটি কথা। তাঁহার বক্তব্য বোধ হয় ইহাই যে ও ব্যাপারটা ত আছেই। কিন্তু মানুষের মাঝে যে ইহার দুটি ভাগ আছে, একটি দৈহিক এবং অপরটি মানসিক, একটি পাশব ও অন্যটি আধ্যাত্মিক, ইহার কোন্ মহলটি যে সাহিত্যে অলঙ্কৃত করা হইবে এইটিই আসল প্রশ্ন। বাস্তবিক, ইহাই হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। নরেশচন্দ্র বলিতেছেন ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দাও। কিন্তু সুস্পষ্ট সীমা-রেখা কি ইহার আছে না কি যে, ইচ্ছা করিলেই কেহ আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে? সমস্তই নির্ভর করে লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও শক্তির উপরে। এক জনের হাতে যাহা রসের নির্ঝর অপরের হাতে তাহাই কদর্য্যতায় কালো হইয়া উঠে। শ্লীল, অশ্লীল, আব্রু, বে-আব্রু এ সকল তর্কের কথা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আসল উপদেশটি সকল সাহিত্য-সেবীরই সবিনয়ে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা উচিত। নর-নারীর যৌন-মিলন যে সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি এ সত্য কবি অস্বীকার করেন নাই। তথাপি মোট কথাটি বোধ হয় তাঁহার এই যে, ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক্। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য্য রচনা করা চলে। গাছের শিকড়, গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যত প্রয়োজনীয়ই হোক তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্য্যও যায় প্রাণও শুকায়। এ সত্য যে অভ্রান্ত তাহাত না বলা চলেনা। অবশ্য, ঠিক এ জিনিষটিই আধুনিক সাহিত্যে ঘটিতেছে কি না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র।

নরেশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে অনেকগুলি নজির তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন, "শারীর-ব্যাপার মাত্রই তো অপাংক্তেয় নয়, কেননা, চুম্বনের স্থান সাহিত্যে পাকা করিয়া দিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকল সাহিত্য-সম্রাট। আলিঙ্গনও চলিয়া গিয়াছে।" আমি নিজেও

ত একজন ছোট সম্রাট, কিন্তু আলিঙ্গন ত দূরের কথা চুম্বন কথাটাও আমার বইয়ের মধ্যে কোথাও দিতে পারিলাম না। নর-নারীর মধ্যে ইহা আছেও জানি, চলেও জানি, দোষেরও বলিতেছি না, তবুও কেমন যেন পারিয়া উঠিনা। আমাদের সমাজে এ বস্তুটিকে লোকে গোপন করিতে চাহে বলিয়াই বোধ হয় সুদীর্ঘ সংস্কারে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ন্যায় ইহার প্রকাশ্য demonstration-এ লজ্জা করে। খুব সম্ভব আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু ভাবি, এই দুর্ব্বলতা লইয়াই তো অনেক প্রণয়-চিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি, মুস্কিলে তো পড়ি নাই। কাব্য-সাহিত্য এক, কথা-সাহিত্য আর। 'হৃদয়-যমুনা' 'স্তন' 'বিজয়িনী' 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে যাহাই ঘটুক কথা-সাহিত্যে মনে হয় আমারই মত কবি এ দৌর্ব্বল্য কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বোধ করি এই সকল এবং এম্নি আরও দুই একটা ছোট খাটো ত্রুটির কথা লোকের মুখে শুনিয়া কবি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। "বিদেশের আমদানি" কথাটা তাঁহার ক্ষোভেরই কথা। দেশ ভেদে সাহিত্যের ভাষা আলাদা হয়, কিন্তু সত্যকার সাহিত্যের যে দেশ-বিদেশ নাই এ সত্য কবি জানেন। এবং সকলের চেয়ে বেশি করিয়াই জানেন। তা না হইলে আজ বিশ্বশুদ্ধ লোকে তাঁহাকে বিশ্বের কবি বলিয়া মর্য্যাদা দিত না। কবির সৃষ্টি সমুদ্রের ন্যায় অপরিসীম। নজির আছে জানি, তথাপি সেই সমুদ্র হইতেই স্বমতের অনুকূলে নজির তুলিয়া তাঁহাকে খোঁটা দেওয়া শুধু অবিনয় নয়, অন্যায়।

কবি বলিয়াছেন, "ভারতসাগরের ওপারে (অর্থাৎ য়ুরোপে) যদি প্রশ্ন করা যায় তোমাদের সাহিত্যে এত হট্টগোল কেন ? উত্তর পাই, হট্টগোল সাহিত্যের কল্যাণে নয়, হাটেরই কল্যাণে। হাটে যে ঘিরেচে। ভারত-সাগরের এপারে যখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তখন জবাব পাই, হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী।"

এ জবাব কবিকে কে দিয়াছে জানি না, কিন্তু যে-ই দিয়া থাক্ আমি তাঁহার প্রশংসা করিতে পারি না।

নরেশচন্দ্র বলিতেছেন "* * * হাট জমিবার একটু চেষ্টা না হইতেছে এমন নয়। তা' ছাড়া হাট জমিবার আগে হট্টগোল সাহিত্যের ইতিহাসে অনেকবার শোনা গিয়াছে। রুশো ও ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন বলিয়াই ফরাসী বিপ্লবের হাট জমিয়াছিল। এবং আজ বিশ্বব্যাপী ভাব বিনিময়ের দিনে বিলাতে যেটা ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে আমরা নিরপেক্ষ থাকিতে পারি কি ? যে-হাট আজ পশ্চিমে বসিয়াছে তাতে আমার সওদা করিবার অধিকার কোনও প্রতীচ্যবাসীর চেয়ে কম নয়।"

আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট কথা এম্নি নির্ভয়ে আর কেহ বলিয়াছেন কি না জানি না।

সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা, সকল

দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষার ও জাতির কল্যাণকর কি না। বিদেশের আমদানী কথাটা মুর্গী খাওয়ার অপবাদ নয় যে শুনিবামাত্রই লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হইবে। অতএব, সাহিত্যিকের শুভবুদ্ধি যদি কল্যাণের নিমিত্তই ইহার আমদানী প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেন এমন কেহই নাই যে তাঁহার কণ্ঠরোধ করিতে পারে। যত মত-ভেদই থাক্ গায়ের জোরে রুদ্ধ করিবার চেষ্টায় মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলই অধিক হয়। কিন্তু এই সকল অত্যন্ত মামুলি কথা কবিকে স্মরণ করাইয়া দিতে আমার নিজেরই লজ্জা করিতেছে। ইহা যে প্রায় অনধিকার চর্চ্চার কোঠায় গিয়া পড়িতেছে তাহাও সম্পূর্ণ বুঝিতেছি, কিন্তু না বলিয়াও কোন উপায় পাইতেছি না।

এ প্রবন্ধের কলেবর আর অযথা বাড়াইবনা। কিন্তু উপসংহারে আরও দুই একটা সত্য কথা সোজা করিয়াই কবিকে জানাইব। তাঁহার সাহিত্য-ধর্ম্ম প্রবন্ধের শেষ দিকটার ভাষাও যেমন তীক্ষ্ণ শ্লেষও তেমনি নিষ্ঠুর। তিরস্কার করিবার অধিকার একমাত্র তাঁহারই আছে একথা কেহই অস্বীকার করেনা, কিন্তু সত্যই কি আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য রাস্তার ধূলা পাঁক করিয়া তুলিয়া পরস্পরের গায়ে নিক্ষেপ করাটাকেই সাহিত্য-সাধনা জ্ঞান করিতেছে? হয়ত, কখনো কোথাও কাহারও ভুল হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এত বড় দণ্ডই কি সুবিচার হইয়াছে?

কবি বলিয়াছেন, "সে দেশের সাহিত্য অন্ততঃ বিজ্ঞানের দোহাই পেড়ে এই দৌরাত্ম্যের কৈফিয়ৎ দিতে পারে। কিন্তু যে-দেশে অন্তরে-বাহিরে বুদ্ধিতে-ব্যবহারে বিজ্ঞান কোনখানেই প্রবেশ ধিকার পায়নি—"এই যদি সত্য হইয়া থাকে ত ভারতের দুঃখের কথা, দুর্ভাগ্যের কথা। হয়ত প্রবেশাধিকার পায় নাই, হয়ত এ বস্তু সত্যই ভারতে ছিল না, কিন্তু কোন একটা জিনিষ শুধু কেবল ছিল না বলিয়াই কি চিরদিন বর্জ্জিত হইয়া থাকিবে? ইহাই কি তাঁহার আদেশ? পরের লাইনে কবি বলিয়াছেন; "সে-দেশের (অর্থাৎ বাঙ্‌লা দেশের) সাহিত্যে ধার-করা নকল নির্লজ্জতাকে কার দোহাই দিয়ে চাপা দেবে?"

দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন নাই, চাপা দেওয়াও অন্যায়, কিন্তু ভক্তের মুখের ধার-করা অভিমতটাকেই অসংশয়ে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাতেই কি ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না?

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম্মের জবাব দিয়াছেন নরেশচন্দ্র। হয়ত তাঁহার ধারণা অনেকের মত তিনিও একজন কবির লক্ষ্য। এ ধারণার হেতু কি আছে আমি জানিনা। তাঁহার সকল বই আমি পড়ি নাই, মাসিকের পৃষ্ঠায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই শুধু দেখিয়াছি। মতের একতা অনেক যায়গায় অনুভব করি নাই। কখনো মনে হইয়াছে নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে তিনি প্রচলিত সুনির্দ্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখানেও নিজের মতকেই অভ্রান্ত

বলিয়া বিবেচনা করি নাই। নরেশচন্দ্রের প্রতি অনেকেই প্রসন্ন নহেন জানি। কিন্তু, মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে মাধুর্য্যহীন রূঢ়তাকেই শক্তির লক্ষণ মনে করিয়া পালোয়ানির মাতামাতি করিতে তাঁহাকে কোন বইয়েই দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিনা। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার নাই, কখনো তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হয়না, কিন্তু পাণ্ডিত্যে, জ্ঞানে, ভাষার অধিকারে, চিন্তার বিস্তারে এবং সর্ব্বোপরি স্বাধীন অভিমতের অকুণ্ঠিত প্রকাশে বাঙলা সাহিত্যে তাঁহার সমতুল্য লেখক কেহ আছেন বলিয়াও ত স্মরণ হয়না। বাঙলা সাহিত্যের অবিসম্বাদী বিচারক হিসাবে কবির কর্ত্তব্য ইঁহার সমগ্র পুস্তক পাঠ করা। কোথায় বা শীলতার অভাব, কোথায় বা কাব্যলক্ষ্মীর বস্ত্রহরণে ইনি নিযুক্ত, স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেওয়া। তবে এমনও হইতে পারে কবির লক্ষ্য নরেশচন্দ্র নহেন আর কেহ। কিন্তু সেই আর-কেহরও সব বই তাঁহার পড়িয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। নিজের সাহিত্যিক জীবনের কথা মনে পড়ে। এই তো সেদিনের কথা। গালিগালাজের আর অন্ত ছিল না। অনেক লিখিয়াছি, সকলকে খুসি করিতে পারি নাই, ভুল করিয়াছিও বিস্তর। কিন্তু একটা ভুল করি নাই। স্বভাবতঃ নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক বলিয়াই হৌক, বা অক্ষমতা বশতই হৌক, আক্রমণের উত্তরও দিই নাই, কাহাকে আক্রমণও করি নাই। বহুকাল হইয়া গেলেও কবির নিজের কথাও হয়ত মনে পড়িবে। সংসারে চিরদিনই কিছু কিছু লোক থাকে যাহারা সাহিত্যের এই দিকটাই পছন্দ করে। এখন বুড়া হইয়াছি, মরিবার দিন আসন্ন হইয়া উঠিল, গাল-মন্দ আর বড় খাইনা। শুধু পথের দাবী লিখিয়া সেদিন মানসী পত্রিকার মারফতে এক রায়সাহেব সব্-ডেপুটির ধমক খাইয়াছি। বইয়ের মধ্যে কোথায় সোনাগাছির ইয়ার্কি ছিল অভিজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে তাহা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল। সে যাই হৌক, আমাদের দিন গত হইতে বসিয়াছে। এখন একদল নবীন সাহিত্য-ব্রতী সাহিত্য-সেবার ভার গ্রহণ করিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করি। এবং যে কয়টা দিন বাঁচিব শুধু এই কাজটুকুই নিজের হাতে রাখিব।

কিন্তু কিছুদিন হইতে দেখিতেছি ইঁহাদের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড অভিযান সুরু হইয়াছে। ক্ষমা নাই, ধৈর্য্য নাই, বন্ধুভাবে ভ্রম-সংশোধনের বাসনা নাই, আছে শুধু কটূক্তি, আছে শুধু সুতীব্র বাক্যশেলে ইঁহাদের বিদ্ধ করিবার সঙ্কল্প। আছে শুধু দেশের ও দশের কাছে ইঁহাদের হেয় প্রতিপন্ন করিবার নির্দ্দয় বাসনা। মতের অনৈক্য মাত্রই বাণীর মন্দিরে সেবকদিগের এই আত্ম-ঘাতী কলহে না আছে গৌরব না আছে কল্যাণ।

বিশ্বকবির এই সাহিত্য-ধর্ম্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে, বাঙলা-সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাহারা তাঁহার কানের কাছে "গুরুদেব" বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Editor : Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya, at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal.

351 WINCHESTER
SELF LOADING
SOFT POINT
প্রসিদ্ধ
বন্দুক বিক্রেতা
কে. সি. বিশ্বাস এণ্ড কোং
১নং চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা।

গাছ ও বীজ

রোপণ ও বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত; আপনার অর্ডার পাঠাইতে দেরী করিবেন না।

এই সময়ের বপনোযোগী নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী বীজের প্রতিতোলার মূল্য :—বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৲, রিডল্যাণ্ড ড্রামহেড ১৲, ব্রানস্থইক ১৲, মারিকেলী ৸৹, ড্রামহেড অলহেড ক্যাক্সি, স্থাভর ও লাল বাঁধাকপি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল (ফুলকপির রাজা) ৪৲, রিলায়েবল ২৲, আলজিয়াস, লিনরমণ্ডস্ আর্লি পারিস প্রত্যেক ১।৹, ফুলকপি ফেবারিট (সকল জল বায়ুতে জন্মায়) ১৲, ওলকপি সাদা, ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲, ও ৸৹, শালগম, গাজর, বীট ও লাল সাদা কাল রংয়ের মূলা প্রত্যেক।৹, বাঁধা ছালাদ, টামাটো, কাঁটা শূন্য /৶ সেরা বেগুন, চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা বর্ণের বড় পেঁয়াজ, প্রত্যেক ১৲, সেলেরি শতমুখী বাঁধাকপি, ব্রোকলি বৃহদাকার লাউ, কুমড়া সাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৸৹, আমেরিকান মটর শুটী ফ্রেঞ্চবীন /৹ (সের ৪৲) উল্লিখিত বীজের স্বাভাবিক বর্ণের ছবিযুক্ত প্যাকেট সহ আমেরিকান আদত টীন বাক্স :—১০ রকম ৩৲ ১৫ রকম ৪৲, ২৫ রকম ৫৲, পাটনাই ফুলকপি ॥৹, পেঁয়াজ।/৹, কাঁথির লাল মূলা ৵৹ (সের ৬৲) বোম্বাই লাল মূলা ৶৹ (সের ১২৲), বোম্বাই লম্বাকৃতি পেঁপে ৸৹, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ৶৹ (সের ৪৲) এই সময়ে বপনোপযোগী ১০ রকম দেশী শাক সব্জীর বীজ ডাক খরচ সহ ১॥৹। মনোহর মরসুমী ফুলের বীজ প্রত্যেক রকম।৹, ৫ প্যাকেট ৫ প্রকার একত্র ডাক খরচ সহ ১॥৹, তামাক বীজ ৵৹ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। মাশুলাদি ক্রেতাকে দিতে হয়।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ ফল, ফুলের চারা ও কলম এবং ক্রোটন, পাম, পাতাবাহারের গাছ সর্ব্বজন প্রশংসিত অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। অর্দ্ধ আনার ডাক টিকিটসহ পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠানো হয়। গাছের অর্দ্ধ মূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

ইষ্ট বেঙ্গল নর্শরী
২৫৬ নং আপার চিৎপুর রোড
পোঃ বাগবাজার কলিকাতা

মৎস্য ধরা হুইল

হুইল ২ ইঃ পায়ে হ্যাণ্ডেল ২।৹, ২॥৹ ইঃ ২৸/৹। বিলাতী হুইল

পিতলের ৩।৹, ২৸৹। ষ্টিলের ৪॥৹, ৩৸৹। নিকেল ৩৸৹ ৩৲। মুগা সুতা ১।৹ ও ১॥৹ ভরি, বঁড়শী—জোড়া ৵৹ ৶৹। ছিপের কড়া ১২টা।৹, ফাৎনা ১টী ৵৹ বিলাতী বঁড়শী হাজার ৪॥৹ টাকা। মাছ ধরা চার, কৌটা ৵৹ আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
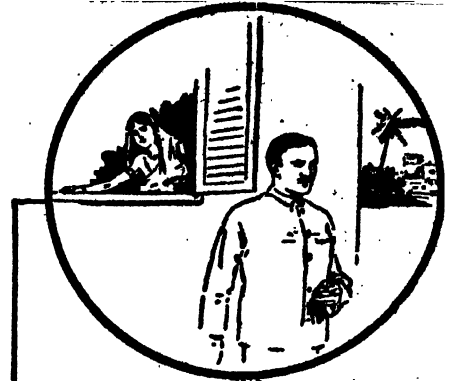
শক্তি ও সৌন্দর্য্য

পুরুষ যেমন সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী, নারী তেমনি শক্তির উপাসক। স্যানাটোজেন ব্যবহার করিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন। যে সমস্ত উপাদান হইতে শক্তি লাভ করিতে পারা যায়, জীবনী-শক্তির পরিবর্দ্ধক স্যানাটোজেন শরীরের প্রতি কোষে ও রক্তে সেই সমস্ত উপাদান প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়; এই জন্যই একজন স্যানাটোজেন ব্যবহারকারী বলিয়াছেন,—

"যাঁহারা স্যানাটোজেন ব্যবহার করেন, তাঁহারা কখনই নিস্তেজ ও নিরুদ্যম হন না,—বরং সর্ব্বদাই যতদূর সম্ভব স্বাস্থ্যসম্পন্ন বোধ করেন।"

আজই স্যানাটোজেন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুন—তাহা হইলে আপনি শক্তি ও আনন্দ—দুইই অনুভব করিবেন। যে কোন ডাক্তারখানায় ও ঔষধের দোকানে পাইবেন।

হস্তদ্বারা স্পর্শিত নহে।

সূচীপত্র

বিষয় সূচী — পৃষ্ঠা

বিষয় সূচী

চিত্রসূচী

"বঙ্গবাণী"র নিবেদন

গ্রাহক সংক্রান্ত—

১। ফাল্গুন হইতে 'বঙ্গবাণী'র বর্ষারম্ভ। সুতরাং কেহ বৎসরের যে কোন সময়ে গ্রাহক হইলে তাঁহাকে ফাল্গুন হইতে কাগজ লইতে হয়।

২। বঙ্গবাণীর বিজ্ঞাপনের মূল্যের হার—

সাধারণ ১ পৃষ্ঠা বা দুই কলম প্রতিমাসে		...	১৮৲
" ½ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	...	১০৲
" ¼ পৃষ্ঠা বা ½ কলম	"	...	৬৲
রঙ্গিন ছবির আগের পৃষ্ঠা	"	...	২২৲
শেষ পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২২৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১২৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠা	"	...	৩০৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৬৲
কভারের ৩য় পৃষ্ঠা	"	...	২৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৩৲
কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা	"	...	৩৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৮৲
কভারের ২য় পৃষ্ঠার সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২৫৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১৩৲
সূচীপত্রের সম্মুখের পৃষ্ঠা	"	...	২০৲
ঐ অৰ্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	...	১১৲
সূচীপত্রের নীচে অৰ্দ্ধপৃষ্ঠা	"	...	১৩৲

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
Managing Proprietor.

কল্লোল

বিশ্বেশ্বর রস

দেশীয় গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত বটিকা

কি নূতন, কি পুরাতন প্লীহা ও লিভার ঘটিত ম্যালেরিয়া জ্বরে দেশীয় গাছ গাছড়া হইতে
এমন আশ্চর্য্য মহৌষধ এ পর্য্যন্ত কেহ বাহির করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালী পত্রিকা বলেন—"আমরা নূতন ও পুরাতন ম্যালিরিয়াগ্রস্ত কয়েকটির উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বিশ্বেশ্বর রস ম্যালেরিয়ার সকল অবস্থায় উপকারী। শুনিয়াছি ইহাতে কুইনাইন নাই, ব্যবহারেও ইহা জানিতে পারিয়াছি। কুইনাইন ব্যবহারে যে সকল উপসর্গ হয়, বিশ্বেশ্বর রস ব্যবহারে তাহা হয় না।" বাঙ্গালা—১৭ই মাঘ, ১৩২৭ সাল।

নায়কের সুযোগ্য সম্পাদকপ্রবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন:—"বিশ্বেশ্বর রস বটিকার ম্যালেরিয়া জ্বর ও প্লীহা নাশে—অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি, অনেকে ইহা ব্যবহারে আশ্চর্য্য সুফল লাভ করিয়াছেন; ইহা খাঁটি গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত।"—নায়ক, ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সাল।

বসুমতী ২রা ফাল্গুন ১৩২০ সাল—কুইনাইন ব্যবস্থা করিয়াও যাহাদের জ্বর বন্ধ হয় নাই, বিশ্বেশ্বর রস ব্যবহারে তাঁহারা অতি অল্পদিনের মধ্যেই সারিয়া উঠিয়াছে, অথচ এই ঔষধটি কেবল গাছ গাছড়ায় তৈয়ার, * *
বসুমতী ২রা ফাল্গুন, ১৩২০ সাল।

আপনাদের ফেব্রামা পিল (বিশ্বেশ্বর রস) ১ কৌটা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা ম্যালেরিয়া জ্বর নাশক দেশীয় গাছগাছড়ায় প্রস্তুত। যাঁহারা এই ঔষধ বিশেষতঃ বৃহৎ প্লীহা ও যকৃতে একবারমাত্র ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারা এই ঔষধের গুণ বিশেষরূপে প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি ম্যালেরিয়া পীড়িত দেশের সর্ব্বব্যাধি নাশক দেশীয় গাছ গাছড়ার ঔষধ আবিষ্কারের একমাত্র প্রশংসনীয় পাত্র। ইহার মূল্যও অতি সুলভ। অমৃতবাজার পত্রিকা, ২রা এপ্রিল ১৯২১।

মূল্য ১ কৌটা—১৲, তিন কৌটা—২।৵০, ডাকে লইলে আরও ।৵০ বেশী লাগে।

ডাক্তার কুণ্ডু এণ্ড চাটার্জ্জি ২৭৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আর্থিক উন্নতি

মাসিক পত্র বার্ষিক মূল্য সাড়ে চার টাকা।

বঙ্গবাণীঃ—বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে এইরূপ একখানি পত্রের বড়ই আবশ্যকতা হইয়াছিল। অধ্যাপক বিনয় কুমারের কৃপায় সে অভাব পূরণ হইল। ইনফরমেশনের তিনি জাহাজ। তাঁহার লেখায় বাজে কথা নাই, সবটুকুই জানিবার ও শিখিবার। "অলস অঙ্গ শিথিল কবরী"র আর দিন নাই। এখন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"র দিন আসিয়াছে। এসময়ে এইরূপ সঙ্কেত-বহুল পত্রের অতীব প্রয়োজন। বিনয়কুমার বঙ্গভাষার একটা বিরাট দৈন্য দূর করিতে বসিয়াছে। * * * বাংলার সম্পদ্ অধ্যায়টী বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বাঁধাইয়া রাখার ও দৈনন্দিন পাঠের উপযুক্ত।

Forward—It is a journal on a novel plan and devoted to economic news service. * * * * It shows how comprehensive the journal is. It embraces varied subjects and every issue is really a mine of knowledge Intellectuals of Bengal are expected to give it a cordial welcome. It will repay close study.

The Modern Review:—Prof Benoy Kumar Sarkar......is doing pioneer work through his newly published economic journal Arthik Unnati As an all round economic journal keeping its readers well informed on all topics of economic importance Arthik Unnati can give points to the best English journals of a similar nature in India. The London School of Economics has shown its appreciation of the paper by requesting Prof Sarkar to put the school's name in the mailing list of his journal.

Professor Julius Jolly (Wuersburg, Germany, Late Tagore Law Lecturer, Calcutta)—*Arthik Unnati* appears to be a very valuable new review like the previous works of Professor Benoy Kumar Sarkar which I value very highly. I hope it will soon have a wide circulation. Economics is such an

ফর্ম্মামিণ্ট

ব্যবহারে গলার বেদনা দূর করুন !

শীতের রাত্রি ও বর্ষার দিনে গলায় বেদনা ও ক্ষত হইয়া থাকে।

ফর্ম্মামিণ্টের বড়ি খাইয়া শীঘ্রই আপনার গলক্ষত নিবারণ করুন ; তাহা হইলে ডিপ্‌থিরিয়া, স্কার্লেট ফিবার (আরক্ত জ্বর), ইনফ্লুয়েঞ্জা, হামজ্বর প্রভৃতি বিপজ্জনক রোগের আর ভয় থাকিবে না।

ফর্ম্মামিণ্ট ব্যবহারে মুখ ও গলার ব্যথা দূরীভূত হয়, নিশ্বাস সুগন্ধযুক্ত হয় এবং গলক্ষত সত্বরই স্থায়িভাবে আরোগ্য হয়।

আজই একশিশি কিনিয়া আনুন

সব বাজারেই পাওয়া যায়।

FORMAMINT

সব ডাক্তারখানায়ই পাওয়া যায়।

জীবাণু-নাশক গলার রোগের বড়ি।

সমস্ত রকম বিবাহের গহনা বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। আবশ্যক হইলে ২৪ ঘণ্টায় যে কোন গহনা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। গিনি সোনার ও পানমরত্তার

গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় আমাদে: প্রস্তুত পুরা গহনা উ: পানমরত্ত বাদে গিনি সোনার মূ: সর্ব্বদাই খা: করিয়া পা: ক্যাটালগে: জন্ত পত্র লিখুন।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের

পর্ণপুট

(১ম ভাগ)

চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইল।

অতর্কিত আক্রমণ

নিজামির খামসার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে প্রসিদ্ধ শিল্পী মাস্তার মহম্মদ কর্তৃক

[কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সৌজন্যে

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয়

ঢাকা (কারখানা ও হেড্ আফিস্), কলিকাতা ব্রাঞ্চ—৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট, ২২৭ হ্যারিসন রোড, ১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৭১।১ রসারোড, কলিকাতা। অন্যান্য ব্রাঞ্চ—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রঙ্গপুর, শ্রীহট্ট, গৌহাটী, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, সিরাজগঞ্জ, মাদারীপুর, মেদিনীপুর, বহরমপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, পাটনা, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি।

চ্যবনপ্রাস ৩৲ সের।

মকরধ্বজ ৪৲ তোলা।

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম ও সুলভ ঔষধালয়

(১৩০৮ সনে স্থাপিত)

সারিবাদ্যরিষ্ট—৩৲ সের।
সর্ব্ববিধ রক্তদুষ্টি, সর্ব্ববিধবাতের বেদনা, স্নায়ুশূল, গেঁটেবাত, ঝিঁঝিঁবাত, গণোরিয়া প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় প্রশমিত করে।

বসন্তকুসুমাকর রস—৩৲ সপ্তাহ। সর্ব্ববিধ প্রমেহ ও বহুমূত্রের অব্যর্থ মহৌষধ।

সিদ্ধমকরধ্বজ—২০৲ তোলা। (চতুর্গুণ স্বর্ণঘটিত ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত) সকল প্রকার ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, স্নায়বিক-দৌর্ব্বল্য প্রভৃতির শক্তিশালী অব্যর্থ মহৌষধ।

অধ্যক্ষ মথুরবাবুর ঢাকা শক্তি ঔষধালয় পরিদর্শন করিয়া হরিদ্বারের কুম্ভমেলার অধিনায়ক মহাত্মা শ্রীমৎ **ভোলানন্দ গিরি** মহারাজ অধ্যক্ষকে বলিয়াছিলেন—"এছা কাম সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিমে কোই নেই কিয়া **আপ্ তো রাজচক্রবর্ত্তী হ্যায়**"।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় ও বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড লীটন** বাহাদুর—"এরূপ বিপুল পরিমাণে দেশীয় উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করণ নিশ্চয়ই অসাধারণ কৃতিত্ব (a very great achievement)"

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর **লর্ড রোনাল্ডসে** বাহাদুর—"এই কারখানায় এত বহুল পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় দেখিতে পাইয়া আমি **বিস্ময়াবিষ্ট** (**astonished**) হইয়াছি।"

বেহার ও উড়িষ্যার **গবর্ণর সার হেন্‌রী হুইলার** বাহাদুর—"আমার এরূপ ধারণাই ছিল না যে, দেশীয় ঔষধ এরূপ বিপুল আয়োজনে ও পরিমাণে কোথাও প্রস্তুত (manufactured) হয়।"

দেশবন্ধু **সি, আর, দাস**—"শক্তি ঔষধালয় কারখানার ঔষধ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আশা করা যায় না।" ইত্যাদি

(ষড়গুণবলিজারিত)

মকরধ্বজ—৮৲ তোলা।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—৬৲ সের। সর্ব্বজন প্রশংসিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত মহোপকারী কেশ তৈল।

দশনসংস্কার চূর্ণ—৵০ কৌটা। যাবতীয় দন্তরোগের মহৌষধ।

বৃহৎ খদির বটিকা—৵০ কৌটা। (কণ্ঠশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তাম্বুল বিলাস।)

দাদমার—৵০ কৌটা।
দাদ ও বিখাজের অব্যর্থ মহৌষধ। উচ্চহারে কমিশন। নিয়মাবলীর জন্য পত্র লিখুন।

চিঠি-পত্র, অর্ডার, টাকা কড়ি প্রভৃতি পাঠাইতে সর্ব্বদাই প্রোপ্রাইটারের নামোল্লেখ করিবেন।

ক্যাটালগ ও শক্তি পঞ্জিকা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়।

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ ১৩৩৩-'৩৪ | কার্ত্তিক | দ্বিতীয়ার্দ্ধ ৩য় সংখ্যা

লাবণ্য

লাবণ্য সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিকার বল্লেন :—মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় এবং স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত অঙ্গ সকলে যে চাকচিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহাকেই লাবণ্য বলে! শ্রীরাধার অঙ্গদ্যুতির সঙ্গে মণিময় মুকুর এবং শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশের সঙ্গে মরকত মুকুরের তুলনা দিয়ে এটা বোঝালেন রসশাস্ত্রকার। বৈষ্ণব কবিতায় লাবণি শব্দ অনেকবার ব্যবহার হচ্ছে দেখি— "ঢল ঢল কাঁচা সোনার লাবণি"। বৈষ্ণব কবিদের মতে লাবণ্য হল—প্রভা, দীপ্তি, স্বচ্ছতাবশতঃ ঔজ্জ্বল্য, চলতি কথায় পালিস বা চেকনাই! অভিধানের মানের সঙ্গে মিলছে না—লবণস্ত ভাব অর্থাৎ লবণিমা কথাটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিৎ দিচ্ছে স্বাদের, যাকে ইংরিজিতে বলে Taste তাই। রূপ দিয়ে প্রমাণ দিয়ে ভাবভঙ্গী দিয়ে যা রচনা করা হল তা Tasteful লাবণ্যযুক্ত করা হ'লতো হ'ল ভাল। 'ভাব লাবণ্য যোজনম্'—ভাব-যোজনা এবং লাবণ্য-যোজনার কথা বলা হয়েছে চিত্রের ষড়ঙ্গে। যা'তে যেটা নেই তাতে সেইটি মেলালেম যখন তখন বল্লেম—এটি যোজনা করা গেল। রূপকে বা রূপরেখাকে ভাবযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই লাবণ্যযুক্ত করার কথা উঠলো। রন্ধন-শিল্পে লবণিমা বা লাবণ্যের যোজন একটা বড় রকম ওস্তাদি, সেখানে বেশি লবণ কম লবণ দুয়েতেই বিপদ আছে। রান্নাতে যখন নুন মিশলো তখন সমস্ত জিনিষের স্বাদটি ফিরিয়ে দিলে লবণ-সংযোগ,

লবণ জিনিষটাও তখন পৃথক নেই, সবার সঙ্গে মিলে একটা চমৎকার স্বাদে পরিণত হয়ে গেছে। তেমনি সকল রচনার বেলাতেই সূপকারের মতো রূপকারও একটুখানি লাবণ্য যোগ করে, যাতে করে স্বাদু হয়ে ওঠে রচনাটি !

রসশাস্ত্রকার বলেছেন,—"মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয়" তাহাকে লাবণ্য বলি, এতে করে বোঝাচ্ছে রূপের প্রমাণের ভাবের অন্তর্নিহিত হয়ে বর্ত্তমান থাকে লাবণ্য, শুধু শিল্পির অপেক্ষা রচনার কৌশলে সেটিকে প্রকাশ করা। খনির মধ্যে সোনা যখন আছে তখন লাবণ্য তার থেকেও নেই, কারিগরের হাতে পড়লো তো লাবণ্য দেখা দিলে সোনায়—'ঢল ঢল কাঁচা সোনার লাবণি' ; মুক্তার বেলাতেও এই কথা,– আর্টিষ্টের স্পর্শসাপেক্ষ হ'ল লাবণ্য। যিশু খৃষ্ট বলেছিলেন 'Ye are the Salts of Earth'. এ কথার দুটো অর্থ হয়—মাটির নিমকে তোমরা মানুষ, কিম্বা ধরাতলের লাবণ্যই তোমরা, মর্ত্ত্য-জীবনে স্বাদ দিতে তোমরা,—আজকের বায়োকেমিক মতে মানুষ নানা প্রকার লবণের সমষ্টি—এটা খৃষ্টের আমলে জানা ছিল কি ছিল না—কিন্তু বহু পূর্ব্বে থেকে মানুষ লবণ নিমক লবণিমা লাবণ্য নানা অর্থে নানা ভাবে প্রয়োগ করছে দেখা যায়। এক কথায় বলতে হ'লে বলতে হয়—স্বাদ ফিরে যায় যার দ্বারায় এবং স্বাদু ক'রে তোলে যে বস্তুটিকে কিম্বা রচনাটিকে সেই হয় লাবণ্য।

মুক্তা ফলের লাবণ্য এক রকম, হীরকের লাবণ্য অন্য, পাকা কাঁচা আমের লাবণ্য, মানুষের কালো চামড়ার লাবণ্য, সাদা চামড়ার লাবণ্য, মাথাঘসা দিয়ে মাজা চুলের লাবণ্য, গন্ধ তৈলে চিক্কণ চুলের, পাকা-চুলের কাঁচা-চুলের লাবণ্য সবই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকমের, কড়ি দিয়ে মাজা সূতোর কাপড়ে যে লাবণ্য সিল্কের কাপড়ে সে লাবণ্য নেই, পাথর বাটির লাবণ্য আর চিনের বাটি কি সোনা রূপোর বাটির লাবণ্য সমান নয়। লাবণ্য প্রচ্ছন্ন রইলো এবং লাবণ্য প্রকাশ পেল এটা বলা চল্লো, লাবণ্য হারালো বস্তুটি এও বলা গেল,—নতুন টুকটুকে মলাটের বইটি, নিভাঁজ ধোয়া কাপড়খানি, হাতে হাতে চট্‌কাচট্‌কিতে হারিয়ে ফেল্লে লাবণ্য—রঙ জ্বলে গেল ধোপ মরে গেল অপছন্দ করলে সাধারণ লোকে, কিন্তু আর্টিষ্ট দেখলে দুটির মধ্যেই আর একটুকু নতুন ধরণের লাবণ্য পুরাতনের স্বাদ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে; অলঙ্কার শিল্পে ওল্ড্‌গোল্ড (Old Gold) বাদ গেল না,—উজ্জ্বল সোনা মেড়মেড়ে সোনা দুই ধরণের লাবণ্য দেখালো ! পাথরের লাবণ্য সে পাথরে আছে, সোনার লাবণ্য সোনাতেই, জলের একটুখানি লাবণ্য আছে—যেটা সমুদ্রে এক, নদীতে অন্যভাবে প্রকাশ পায়, মাটিতে জলের লাবণ্য নেই মোটেই, এখন নদীজল আঁকতে সমুদ্র-জলের লাবণ্য দিলে যেমন বিস্বাদ হয় ছবিটা তেমনিই মাটিকে জল করে লিখলেও ভুল হ'য়ে যায় জলে স্থলে। তবেই দেখা গেল এক এক বস্তুর ধাত বুঝে তবে ছবিতে লাবণ্য যোজনা করাই হ'ল কাজ।

স্বভাবের নিয়মে গাছ পাতা ফুল স্বাভাবিক লাবণ্য পেয়েছে ; ধূলো পড়লো, রোদে তাত্‌লো, —লাবণ্যটুকু ঢাকা পড়লো ; বৃষ্টিজলে ধোয়া হ'য়ে গেল গাছ-পালা—প্রকাশ হ'ল পূর্ব্ব লাবণ্য

তাদের। জলভরা মেঘ সে,—এক লাবণ্য এক সোয়াদ দিলে চোখে ও মনে, জলঝরা মেঘ সে,—আর এক লাবণ্য আর এক সোয়াদ ধরলে সামনে।

লবণের সংযোগে বস্তুর স্বাভাবিক তারের সঙ্গে সুস্বাদ যেমন মিল্‌ছে দেখি রন্ধন শিল্পে, তেমনি লাবণ্যের যোগে অন্যান্য শিল্পেও রূপ প্রমাণ ভাব সমস্তই চোখের এবং মনেরও তৃপ্তিদায়ক হ'য়ে উঠছে এবং তখন দর্শকের শ্রোতার পাঠকের ভাল লাগছে রচনাটি! লাবণ্য তো অনুভব করি এবং চোখেও দেখি এক সঙ্গে, অথচ জিনিষটা এমনই যে পাকাপাকি একটা ব্যাখ্যার মধ্যে ধরাছোঁয়া দিতেই চায়না। কথায় বলে মণিকাঞ্চন যোগ—পিতল ও মণি—কিম্বা তাম ও মণি, দন্ত ও মণি, রজত ও মণি অজস্র শিল্পকাজে ব্যবহার হচ্ছে দেখি। মণি সোনায় বাঁধা হ'য়ে একটি লাবণ্য দেয়, পিত্তলে তামায় রৌপ্যে ও গজদন্তে বাঁধা হ'য়ে আর এক রকমের লাবণ্য পায় দেখি, এমনি শিল্প রচনাটি ভাবভঙ্গীর দিক দিয়ে, মান পরিমাণের দিক দিয়ে এবং রূপের দিক দিয়ে লাবণ্যের সংস্পর্শ পেয়ে গেল তবেই সুন্দর তার দিলে আমাদের। রূপ সমস্ত বিভিন্ন, প্রমাণ তারাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, ভাব সমুদয় নানা ভঙ্গীতে বিভক্ত, লাবণ্যের ঘেরে এরা এক হ'য়ে বাঁধা পড়ে যখন তখনই হয় মনোহর। সোনাতে সোহাগার কাজ করার মতো কাজ হ'ল লাবণ্যের। "মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিব" তরঙ্গায়মান হচ্ছে লাবণ্য এই বল্লেন রসশাস্ত্রকার,—রূপে প্রমাণে ভাবে একটা তরলতা দেয় লাবণ্য এই হল ভাবটা। যেসব রেখা রূপ দিতে আছে, মান পরিমাণের বাঁধুনি শক্ত করে বেঁধে দিতে আছে ভাবভঙ্গী বাঁধা রকমে প্রকাশ করতে আছে—সেই সব দস্তুর মতো টানা রেখা রুল কম্পাসের শক্ত রেখা, তারি মধ্যে লাবণ্য যোজনা করা চাই তবে তারা আর্টের কাজে আসে—না হ'লে আফিসের দপ্তরখানার মিস্ত্রীখানার মধ্যেই বদ্ধ থেকে যায়! সাদা কথায় বলা গেল—উত্তরের আকাশে মেঘ লেগেছে—ঘটনাটা বোঝালে কাটা কাটা কথাগুলো, কিন্তু নড়েনা চড়েনা যতটুকু বলবার বলে চুকলো এক আঁচড়ে; এই কথাগুলোকে একটু গুছিয়ে বলা গেল—'উত্তরেতে মেঘ লেগেছে,'—বেশ একটু দোলন পেলে লাবণ্যের স্পর্শ হ'তেই কাটা কাটা কথা, আরো সুন্দর হ'ল যখন বলেন কবি—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' ইত্যাদি। লাবণ্যের ছন্দ ধরে লেখা যায় না বলেই গদ্য অনেক সময়ে কানে খটোমটো ঠেকে।

কবিতাতে ছন্দ গতি দেয় কথাগুলোকে, নানা লয়ে বিলয়ে পা ফেলে চলে কথাগুলো ছন্দের বশে। কথার লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা গেলনা কিন্তু ছন্দে গাঁথা গেল কথাগুলো, তাতে করে কাজ হলনা,—দুএক ছত্র কবিতা থেকে বোঝাতে চেষ্টা করি,—মা সরস্বতীর পাদপদ্মে যেন ভক্তি থাকে, এ হল নিছক কেজো কথা, এইটেই শুধু ছন্দে গেঁথে ফেল্লেম লাবণ্যের দিকে নজর না রেখেই

—"হে মা ভারতি! দিলাম প্রণতি—

তোমারি সরোজ চরণে"

আবার আর এক কবি ঐ কথাই কথার এবং ছন্দের লাবণ্য বজায় রেখে বল্লেন—

"নমি নমি ভারতি—
তব কমল চরণে"

শুধু ছন্দে গতিমান হয়েও কথা বেশিক্ষণ চলতে পারেনা, লাবণ্য দিয়ে ছন্দে গাঁথা হল কথা, তবে হল রচনাটি উত্তম। এমনি ছবির বেলাতেও রূপ-রেখাগুলি লাবণ্য দিয়ে বাঁধা হলো তবে হল কাজ।

গাড়ির চাকা মিস্ত্রী ঠিক ছন্দে বাঁধলে কিন্তু কারখানার বড় মিস্ত্রী দুচার পোঁচ চর্ব্বি মাখিয়ে দিলে তবে নিখির্‌কিচ্‌ চাকা ঘুরলো! আনাড়ির হাতের রান্না কিম্বা তার প্রস্তুত করা জিনিষে লাবণ্যের অতিরেক কিম্বা ব্যতিরেক ঘটেই,—হয় বেশি নুন্‌ নয় কম নুন্‌,—পাউডার মাখলে তো এমন মাখলে যে একটা রাক্ষুসী সেজে দাঁড়ালো মেয়েটা, ছেলেটা চুল বাগালে তো এমন ছাঁটন দিলে যে তার চেয়ে মাথাটা মুড়িয়ে এলে ভালো দেখাতো। লবণিমার ওজন বোঝা সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার, সূপকারের পক্ষে এই কথা রূপকারের পক্ষেও ঐ কথা। এটাতো রোজই দেখা যায় যে—মাসিক পত্রের হাফটোন ও ত্রিবর্ণের ছবিতে আসলের লাবণ্যটি ভেস্তে যায় এবং কাগজওয়ালা সেইগুলো দেখেই আর্টিষ্ট ও আর্ট-শিক্ষার্থীর মর্ম্মান্তিক সমালোচনা করে বসে। আসল ছবির বিচিত্র বর্ণচ্ছটাকে তিন বর্ণের কাট-ছাঁটের মধ্যে ধরাতে জিনিষটার লাবণ্য আরবী থেকে বাংলাতে তর্জ্জমা করার চেয়েও বেশি পরিমাণে ভেস্তে যায় অথচ গম্ভীরভাবে সমালোচক বসে যায় চিত্র সমালোচনায়, যথা:—"হরপার্ব্বতী" তিন বর্ণের, শিল্পি অমুক—নিতান্ত কাঁচা; "মুসাফির" তিনবর্ণের, শিল্পি (অমুক)—ভাল; "বিরহী যক্ষ" তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—বেচারা যক্ষের অবস্থা শোচনীয়; "পদ্মাবতী" তিনবর্ণের, শিল্পি (অমুক)—গোড়াতেই রঞ্জনের অভাব, প্রস্ফুটিত না হইলেই ভাল হইত; ওমার খৈয়ামের ছবি, শিল্পি (অমুক),—পণ্ডশ্রম; "আড়িপাতা" তিনবর্ণের, শিল্পি (অমুক)—তুলি ছাড়িয়া পেন্সিল ধরা আবশ্যক; ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনবর্ণের রঙের টিন্‌গুলোর উপরে বসে মাছি চিত্র সমালোচনা যদি করতে চলে তবে সে চিত্রের লাবণ্য বাদ দিয়ে রূপ বাদ দিয়ে রং বাদ দিয়েই বকে চলে যা তা নিশ্চয়ই। চট্‌কানো পদ্মে বসে ফুলের লাবণ্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে লাবণ্য অনেকখানি হারিয়েছে ফুল চট্‌কানোর দরুণ কিন্তু ফুলের রচয়িতাকে উপদেশ দিইনে ফুল সৃষ্টি ছেড়ে মাছিক্‌ পত্রিকা লিখতে। এই লাবণ্য আছে বলেই সুকুমার শিল্পের নকল দেখে আসলটাকে বোঝাই শক্ত হয় এবং সেজন্যে অনেক সময়ে শিল্পিকে অযথা দায় দোষে পড়তেও হয় কাগজওয়ালার কাছে।

আলো মাখা হয়ে ফুল একটি লাবণ্য পাচ্ছে, ছায়াতে ফুল আর এক লাবণ্য পাচ্ছে, শিশিরে ধোয়া ফুল, বৃষ্টিজর্জ্জর ফুল লাবণ্য সবটাতেই রয়েছে শুধু অবস্থা ভেদে লাবণ্যের বিভিন্নতা ঘটছে মাত্র। কবি কালিদাস বিরহী যক্ষকে একটি চমৎকার লাবণ্য দিলেন—

"কনকবলয় ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠ"—এটা ম্যালেরিয়া রোগীর লাবণ্য বলে ধরা চলেনা—অবস্থা বিশেষে ক্ষীণ-চন্দ্রকলার মতো লাবণ্যময় রূপটি দিয়েছেন যক্ষকে কবি; আবার যক্ষ যখন ফিরেছিল অলকায় তখনকার তার লাবণ্য যদি দিতেন কালিদাস তবে সেটা স্বতন্ত্র রকমের নিশ্চয়ই হতো,—এমনি সকল দিকেই দেখবো লাবণ্যের প্রকার ভেদ হচ্ছে অবস্থা ও পাত্রভেদে অনেক জিনিষের সঙ্গে তুলনা দিয়ে লাবণ্যের প্রকার-ভেদ বোঝাতে চলেছেন প্রাচীন কবিরা, যেমন :— "চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণীরে", কিম্বা "তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর", "অখিল ভুবন উজারকারি কুন্দ কনক কাঁতিয়া". "অপরূপ হেমমণি ভাস অখিল ভুবনে পরকাশ" এই হল গৌরাঙ্গের লাবণ্য বোঝাতে অনেকগুলো ধাতু এবং ফুলের অবতারণা ; তারপর শ্যাম-লাবণ্য বোঝাতে বলা হল, যথা :—"জনু জলধর রুচির অঙ্গ" ইত্যাদি; রাধাকৃষ্ণ দুজনের লাবণ্য বোঝাতে বলা হল : —"ও নব জলধর অঙ্গ, ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ; ও বর মরকত ঠাম, ইহ কাঞ্চন দশবাণ", আবার যেমন : —ও তনু তরুণ তমাল, ইহ হেম যুথী রসাল, ও নব পদুমিনী সাজ, ইহ মত্ত মধুকর রাজ, ও মুখ চাঁদ উজোর" ইত্যাদি মানুষের লাবণ্য তারপর কাপড়ের লাবণ্য তার বেলাতেও বল্লেন কবি :—"বিজুরী বিলাসিত বাস", গলার হারের লাবণ্য :—"হার কি তারক দৌতিক ছন্দ", হাসির লাবণ্য :—"হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ", পদতলের লাবণ্য :—"পদতলে থলকি কমল ঘনরাগ", করতলের লাবণ্য :—"করকিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ"। শুধু রঙ বোঝাতেই নানা তুলনা তা নয় লাবণ্যটি বোঝানোর দিকে বিশেষ লক্ষ রেখে বৈষ্ণব কবিরা একটি একটি বস্তুর উপমা দিয়ে চলেছেন যেমন :—কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ—বর্ণের ও লাবণ্যের ছন্দ এক সঙ্গে পাই এখানে, আবার :—"মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল", কিম্বা "কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর, কালিম কান্তি কলোল" লাবণ্যের কল্লোল পাচ্ছি! ভাবের লাবণ্য বোঝাতে নানা ভঙ্গী বা ভঙ্গের অবতারণা করেছেন কবিরা যেমন :—"হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ", যেমন তেমন করে তেড়া বাঁকা নয় ভঙ্গীটি। ভুরুর ভঙ্গী "কামের কামাল জিনি ভাঙ বিভঙ্গ" আবার যেমন :—"ও মুখ-চাঁদ উজোর, ইহ দিঠি লুবধ চকোর" কিম্বা "অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ"—লাবণ্যের পরিসীমা না পেয়ে কবির বিভ্রম ঘটলো। বিশেষণ হিসেবে শুধু যে কথাগুলো নানা পদাবলীতে বসালেন কবিরা তা তো নয়, বিশেষ ক'রে লাবণ্যটী বোঝাতে চেষ্টা পেলেন তাঁরা। ভাবের ভঙ্গীমার সঙ্গে লাবণ্যের যোগাযোগ দেখলেম, এখন মান পরিমাণের সঙ্গে তার যোগের দু'একটা দৃষ্টান্ত কবিদের কাছ থেকে দেবো, যেমন—"বিশদ বারণ বাহু বৈভব", "কনক লতায় তমালহুঁ কত কত দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ", "মাঝহি মাঝ মহামরকত সম শ্যামর নটরাজ" "অবনি বিলম্বিতবলি বনমাল", "বনি বনমাল আজানুলম্বিত", "কামিনী কোটি নয়ননীলউতপল পরিপূরিত মুখচন্দ", —মুখচন্দ্রে লাবণ্য সৌন্দর্য্য মাপযোপ এক সঙ্গে পেয়ে গেলেম! রাধিকার রূপের লাবণ্য জানাচ্ছেন কবি—"পঞ্চম রাগিণী রূপিনীরে",—সুরে লয়ে বিশুদ্ধ রূপের লাবণ্যটি পাই এখানে,

আবার "তনু তনু অতনু অযুত শত সেবিত, লাবণী বরণি না যাই!" চুল বাঁধার ছাঁদ ও লাবণ্য দেখাচ্ছেন কবি,—"ধনি কানড়া ছাঁদে কবরী বাধে" কিম্বা "দলিতাঞ্জন গঞ্জ কালো কবরী, ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী" হাতপায়ের নখের লাবণ্য,—"নখচন্দ্র ছটা ঝলকে অনুপম, হেরি গোবিন্দ দাস তঁহি পরণাম!"

লাবণ্য যেখানে তরঙ্গিত হচ্ছে মুক্তাফলের কান্তির মত তারি বর্ণন দিচ্ছেন কবি :—

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকয় হোতি
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই
* * * *
যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ বিলোল
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ! —(গোবিন্দদাস)

লাবণ্যের ঠিক প্রতিশব্দ ইংরাজি ভাষায় নেই, Grace বল্লে সবটা বুঝায় না, Beauty তাও বলা গেল না। লাবণ্য স্বাদ পেঁীছে দেয় সেইজন্য তাকে বলতে পারি Taste, লাবণ্য চমৎকার সামঞ্জস্য দেয় ভাবেভঙ্গিতে মানে পরিমাণে ও রূপের বিভিন্ন অংশে সেজন্যে তাকে বলা চলে Unity এই ভাবে Quality এবং Balance তাও এসে পড়ে লাবণ্যের কোঠায়। Taste সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসী শিল্পি Rodin বলছেন,—"It is the human soul's smile on the house and its belongings" লাবণ্য-যোজন ছাড়া এ আর কি বোঝাচ্ছে?—অন্তরের লাবণ্য-চ্ছটা বাহিরকে লাবণ্য দিচ্ছে, "যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস, তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ!" Quality বা গুণ তার বেলাতেও ইউরোপী পণ্ডিতেরা লাবণ্যের ইঙ্গিত করলেন :—We say a line a tone a colour an action has quality—when the artist has succeded in endowing it with such beauty within itself (লাবণ্য-যোজন) that gives an interest quite beyond its purpose as storytelling mechinary.

এই ভাবে লাবণ্য বলতে অনেকগুলো হিসেব বোঝায় দেখতে পাচ্ছি—কালে কালে নানা গজদন্ত নানা রূপে পিতলের জিনিষের উপরে মৃদু লাবণ্য আপনা হতে দেখা দেয়, পুরোনো শানের রঙে একটি চমৎকার লাবণ্য আসে যেটা নতুনে থাকে না, প্রাচীন অয়েলপেন্টিংগুলোও

এই ভাবে একটি স্বতন্ত্র লাবণ্যযুক্ত হয় কাল বশে! কাজেই নতুনের লাবণ্য এবং পুরাতনের লাবণ্য দুই প্রকার হল। এমনি আকাশ জল স্থল এদের লাবণ্য ঋতুতে ঋতুতে বদল হচ্ছে—নবজলধরের লাবণ্য, শরতের মেঘের লাবণ্য, এমনি নানাপ্রকার ভেদ দেখি লাবণ্যে এবং এই লাবণ্য ভেদ দিয়ে বস্তুর তারও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাই আমরা,—বর্ষার আকাশ এক ভাব দিচ্ছে এক স্পর্শ দিচ্ছে মনে, শীতের আকাশ অন্য ভাব ধরছে মনে, দিনের আকাশ, রাতের আকাশ, সকালের আকাশ, সন্ধ্যার আকাশ বিচিত্র বিভিন্ন লাবণ্যে ভরে উঠছে দেখি এবং সেই সঙ্গে মনের ভাবেরও বদল হচ্ছে আমাদের।

জাপানি চিত্রকরেরা যে রেশমের পটের উপরে আঁকে,—অপরূপ তার একটুখানি লাবণ্য আছে যেমন তেমন একটা পটে তারা আঁকেই না। আমাদের দেশে মোগল শিল্পিরা যে কাগজ আঁকতো তার লাবণ্য এখনকার কোনো কাগজেই নেই। আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে মোগল পেন্টি'এর মতো এখনকার ছবি হতেই পারে না; এইটির প্রধান কারণ হচ্ছে লাবণ্যে মাজা এক টুকরো কাগজের অভাবে, আর্টিষ্টের ক্ষমতার অভাবে নয়। যেমন পাটা তেমন পট এ তো জানা কথা, দেওয়ালে আঁকা ছবি আর গজদন্তের পাটায় আঁকা ছবিতে লাবণ্যের তফাৎ অনেকটা হয়ে যায়। ছাপাখানায় কিছু ছাপাতে দিলে প্রুফ আসে এক কাগজে, ছাপা শেষ হয় গিয়ে অন্য কাগজে, এখন দুই কাগজের quality বা গুণ দুই রকমের লাবণ্য দেয়, প্রুফকপির আকাট্ লাবণ্য এবং প্রকাশিত বইটার কাটছাঁট লাবণ্য সুস্পষ্ট দুটো স্বাদ দেয় চোখে ও মনে, এমনি ছবির বেলাতেও আসল ছবি আর তার নকল এবং তিনবর্ণ প্রতিলিপি এক লাবণ্য দেয় না, দিতে পারেও না। এই লাবণ্যের ছোঁয়াচ্ নিয়ে শিল্প কাজের উচ্চনীচ ভেদ স্থির করা চলে, একটা মোমের পুতুলের লাবণ্যে আর আসল মানুষটির লাবণ্যে এই ভাবে ভেদাভেদ লক্ষ করি আমরা এবং বলে থাকি—আহা মেয়েটি যেন মোমের পুতুল! সেকালের গিন্নিদের মনে ননীর পুতলী বলে একটা বিশেষ রকম লাবণ্যের বাটখারা ধরা ছিল,—এখনো সুন্দর কিছু বলতে ঐ বিশেষণটা চলছে ভাষায়। আর্টের জগতে কিন্তু নিছক ননীর পুতুলের লাবণ্যের মূল্য বড় বেশি নেই। সংসারে ননীর পুতুল বৌ এনে গিন্নি নিশ্চিন্ত, বৌটি ননী খেয়ে খেয়ে ক্রমে ননীর তাল হয়ে গিন্নি-জগতে উচ্চ স্থান অধিকার করতে চল্লে খুসিই হতো সেকালে সবাই কিন্তু ছবিতে মূর্ত্তিতে এরূপ ঘটনা লাবণ্যে ঘটতে দিলে বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে, এই অতি লাবণ্যের নিদর্শন বাংলার নধর মূর্ত্তি মহাদেবের অঙ্গে সুস্পষ্ট বিদ্যমান জার্ম্মান প্রিণ্ট তাতেও পাবে; বিবাহের সময় মেয়েরা 'শ্রী' বা ছীরী বলে একটা মাখনের তাল গড়ে তোলে সেইটেই পুরাকালের লাবণ্যময়ীর আদর্শ ছিল হয়তো! এই ননীর পুতুলে যেমন অতিলাবণ্য দেখি তেমনি পিটুলির পুতুলে আর একরকম অতির দেখা পাই, কাজেই আর্টের দিক থেকে লাবণ্য-যোজনের বেলাতেও বলা চল্লো—'অতিশয় কিছু নয়'!

বিশ্বকর্ম্মা লাবণ্য দিচ্ছেন সকল রূপে সকল ভাবে নানা উপায়ে—আলো ছায়া দিয়ে, রঙবেরঙ মিলিয়ে, কঠোরে কোমলে একত্রে বেঁধে; নিছক্ কড়ি নিছক কোমল সুর নিয়ে সঙ্গীতে যেমন কাজ হয় না বিশ্ব জগতেও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি রস-সৃষ্টির কাজে আসে না নিছকের নিয়ম; সেখানে দেখি—একেবারে ভয়ঙ্কর শক্ত পাথর তার উপর দিয়ে বইছে একেবারে তরল ঝরণা, নয় তো সবুজ শেওলাতে কোমল হয়েছে পাথরগুলো, পাহাড় শক্ত ঠেকে তখনই যখন তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়ে হাতুড়ি পিটে দেখি, কিন্তু আকাশের আলো যখন তাকে নানা লাবণ্যে বিভূষিত করেছে তখন কতখানি কমনীয় হ'য়ে গেছে পাহাড় তা তো দেখতেই পাই। জলের মধ্যে সবটা তরল বস্তু, মেঘ সবটাই বাষ্প কিন্তু আশ্চর্য্য উপায়ে বিশ্বশিল্পি তিনি জলেতে মেঘেতেও কড়ি এবং কোমল দুই সুরই ধরেছেন, বাতাসেও কখনো ঘন কখনো ফুরফুরে কখনো তীব্র কখনও ক্ষুরধার নানা লাবণ্য দিয়ে পাঠাচ্ছেন শিল্পি। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীটাই কেবলি বাজছেনা বিশ্ববীণাতে, সেখানে জীবন-মরণ হাসি-কান্না আলো-অন্ধকার সবই বাজছে এক সঙ্গে সুরে বেসুরে চমৎকার এবং সমস্ত ব্যাপারটি দেখি একটি লাবণ্যের পরিপূর্ণতার ঘেরে ধরা পড়ে যাচ্ছে, একেই আর্টের ভাষায় বলা হয় Unity; লাবণ্যের ঘেরের মধ্যে বিচিত্র রূপ প্রমাণ ভাবভঙ্গী সবই একটি অপূর্ব্ব একতা পাচ্ছে কিনা এইটেই লক্ষ্য করবার বিষয় ছবিতে মূর্ত্তিতে। হাড়ে-মাসে জড়িত দিব্য লাবণ্যযুক্ত শরীর—তার স্থানে আছে আর্ট কিন্তু শুধু মাস শুধু হাড় বা কঙ্কাল রূপসৃষ্টির বেলাতে অদেয় পৃথক ভাবটা ঘুচিয়ে না দিলে কিছু রচনা করা অসম্ভব,—তবে হাড়ের জুস কিম্বা মাংসের কোপ্তা হ'তে পারে কিন্তু তাতেও কিছু কিছু লবণ সংযোগ না ক'রে উপায় নেই! পাখির পালকে প্রজাপতির ডানাতে কিংখাব মখমলের কাপড়ে যে লাবণ্য তা শুধু কোমল সুর দিয়ে তৈরি হয় না—শক্ত সোনার তার, শক্ত কাঁটা, আঁস, বিচিত্র বিভিন্ন রকমের কত কী দিয়ে এই লাবণ্যের সৃষ্টি ক'রে আর্টিষ্ট তবে চোখে লাগে মনে ধরে রচনাটি। লাবণ্য-যোজনার কৌশল শেখা-বিদ্যের বাইরের জিনিষ, শিল্প বিদ্যাপীঠে পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে ডিগ্রী নিয়ে সেটা দখল করা যায় না, এটি আপনাতে রইলো তো ফুটলো আপনার কাজে, লাগলো ছোঁয়াচ ওর তবে সুন্দর হ'ল নিজের ঘরের সাজ ও বাইরের সজ্জা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতী

শাপভ্রষ্টা সরস্বতী, এলে বুঝি ভারতীর রূপে
মণ্ডনমিশ্রের গৃহে, দীনবেশে পুস্তকের স্তূপে
করিলে অজ্ঞাতবাস। শঙ্করের প্রচণ্ড জিগীষা
প্রবুদ্ধ করিল নব সাধনায় তোমার মনীষা।
তারপর ব্রহ্মপুত্র সহ যেন মিলন পদ্মার,
শঙ্করের যাত্রাপথে মহাশক্তি করিলে সঞ্চার।
বহু সাধনায় তাঁর রণার্জ্জিতা শিষ্যা অনুব্রতা
তপোলব্ধা বিদ্যাসম। পুণ্য তব ইতিহাস-কথা।

আজি স্মরি সেই দিন—ভারতের সে গৌরবদিন,—
যে দিন শঙ্কর করি' দিগ্বিজয়-পতাকা উড্ডীন
অতিথি তোমার দ্বারে,—তর্করণে পতিরে তোমার
করিল আহ্বান, তাহে তোমা ন্যায়-বিচারের ভার
দিল তর্কমল্লগণ, 'গুণিজনে গুণই পূজাস্থান',
নহে বংশ বয়োলিঙ্গ এ বাণীর করিতে প্রমাণ।
যাদের মানসমাতা নারীরূপে দেবী সরস্বতী
কেমনে নারীত্বে তব সঙ্কুচিত হবে তারা, সতি ?
শঙ্কর যাহার পাশে বিচারার্থী, তাঁর মহিমার
ভাষায় আভাস দিব—সে শক্তি ত নাহি মা আমার।

প্রাণাধিক পণ রাখি তর্করণ!—'জিনিলে শঙ্কর
মণ্ডন মুণ্ডিয়া শির হবে তাঁর শিষ্য অনুচর,
শঙ্কর নির্জ্জিত হ'লে দণ্ড ভাঙি করিবে বরণ,
মণ্ডনের শিষ্যরূপে নতশিরে গৃহীর জীবন।'

চিরতরে পতিসহ বন্ধচ্ছেদ প্রত্যাসন্ন জানি',
শিষ্যপরিষদ্ মাঝে দুর্ব্বিষহ পরাজয় গ্লানি,
পাণ্ডিত্যের অভিমানে শেলাঘাত মৃত্যুসম, তবু
সত্য যে সবার বড় ভুলিলে না—'ভুল' নাই কভু।

মণ্ডনের পরাজয় দৃঢ়কণ্ঠে করিয়া ঘোষণা
রাখিলে সত্যের মান—ধন্য তুমি, ধন্য বীরাঙ্গনা।

জানি না, জাগিল কি না, পতিব্রতা, তব মনে মনে
কোন' দ্বন্দ্ব, কোন' দ্বিধা, জীবনের মহাসন্ধিক্ষণে।
প্রেম সত্য পরস্পরে মাতিল কি সংশয় সমরে
বাহিরের বিতণ্ডার সাথে সাথে তোমার অন্তরে?
রক্তাক্ত সত্যের কণ্ঠে জয়মাল্য করিলে অর্পণ?
অশ্রু দিয়ে করিলে কি বিজয়ীর বিজয় তর্পণ?
জানি না সে সব কথা,—জানি শুধু জিনি সব বাধা
ঋতব্রতা, পতিব্রতা, রাখিয়াছ সত্যেরই মর্য্যাদা।

সত্য চিরজয়ী হোক্—প্রেম সেও তবু তুচ্ছ নয়,
অন্তর্গূঢ় ব্যথা মর্ম্মে জ্বালেনি কি এই পরাজয়?
অভিমানদৃপ্তকণ্ঠে কহিলে মা, "ধন্য হে শঙ্কর!
আজি এ বিজয়ে তব বিস্ময়-বিমুগ্ধ চরাচর,
কিন্তু এতো অর্দ্ধোদয়, অর্দ্ধ তব রহিয়াছে বাকি
মোরে জিনে পূর্ণ কর'—আমি তোমা তর্করণে ডাকি।"

চলিল বিতণ্ডারণ দিনত্রয় এবে অবিরাম,
শার্দ্দূলের সঙ্গে তুমি সিংহীসম করিলে সংগ্রাম,
বেদ-সাংখ্য-তন্ত্র-গীতা-সংহিতার সমস্যা অশেষ
মন্থন করিলে দোঁহে। সর্ব্বশক্তি নিঃশেষে নিবেশ
করি মা ক্ষেপিলে শত প্রশ্নবাণ খর তীক্ষ্ণতম,—
বিফল,—শঙ্কর-দেহে অর্জ্জুনের শরবর্ষ সম।
সমস্যা জটিলজাল চারিপাশে করিলে বয়ন
শাণিতধী প্রতিদ্বন্দ্বী একে একে করিল ছেদন।
সমগ্র সভাটি হলো একশ্রুতি, একটি নয়ন,
নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তথা কাঁপে তার উৎকণ্ঠ জীবন।
সংশয়ের হিন্দোলায় জয়লক্ষ্মী দুলি বার বার
শঙ্করের শিরে শেষে পাণিপদ্ম রাখিলেন তাঁর।

দিগ্বিজয়ী সহ তব দয়িতের তর্করণ ফল
জানি না করিল কি না নারীচিত্ত চঞ্চল বিহ্বল ;
জয়দৃপ্ত পৌরুষের সহ রণে নারীত্ব তোমার
হ'লো কিনা অসম্বৃত, অসতর্ক,—সন্ধান তাহার
কেবা রাখে ? শুধু জানি সে দিনের তব পরাভব
শঙ্করের জয় হতে ঢের বেশী বাড়াল গৌরব।

সন্তানে মর্য্যাদা দিতে গূঢ় কোন' ইষ্ট সাধিবারে
সাধ করে পরাজিতা বাগ্দেবী কি তোমার মাঝারে ?
অথবা প্রেমেরি তরে অনুসরি স্বামীর নিয়তি
পরাজয়চ্ছলে শেষে স্বামিব্রত বরিলে কি সতি ?
সে কথা কে জানে ? দোঁহে অনুগামী হ'লে বিজয়ীর
অদ্বৈতের পিছে পিছে দ্বৈতবাদ চলে নতশির।
নবরূপে বিশ্বে যেন ঋক্-যজু-সামের মিলন
বেদদ্বেষী নিরীশ্বর বৌদ্ধদর্প করিতে শাসন।
তিনের মনীষা নব শঙ্করের ত্রিশূলে সংহত !
'বলা-অতিবলা' নব কৌশিকের হলো অধিগত !

মণ্ডনের গৃহধর্ম্মজীবনের হইল মরণ,
লভিতে নবীন জন্ম সহমৃত্যু করিলে বরণ !

শ্রীকালিদাস রায়

স্বপ্নজাল

কলিকাতা সহরের অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় একটা সরু গলি। গলিটার একদিকে পড়েছে একটা পাটের গুদামের পশ্চাৎদিক, আর একদিকে রাজ্যের যত খোলার ঘর আর মাট্‌কোটা। গলিটা যেখানে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, সেইখানটায় দেখা যাচ্ছে একটা অনেককেলে পুরোনো বাড়ীর সেকেলে ধরণের গুলো-দেওয়া দরজা;—এত সেকেলে যে গলির জমি থেকে দরজার চৌকাঠ হাত খানেক নেমে গেছে। দরজাটার ভিতর দিয়ে উঁকি মারলে দেখা যায়, ভিতরে একটা উঠান আছে, এবং তারও শেষে আছে পূজার দালানের ইটবারকরা ভাঙ্গা সিঁড়ি আর গোটাকতক ভাঙ্গা থাম—কোনটার আধখানা, কোনটার সিকিখানা কোনটার বা তলাকার পিল্লে টুকু। উঠানের তিন দিকে চক্‌মিলান বারান্দা এবং তার কোলে সারি সারি ছোটবড় ঘর,—কারুর ছাত আছে, কারুর ছাত নেই, কারুর বা তিনদিকের দেয়াল পড়ে গেছে, একদিকের মাত্র অবশিষ্ট—আর একটি বর্ষার ওয়াস্তা। কেবল ভাল করে ঠাউরে দেখলে দেখা যায়, বাড়ীর একটেরে দু-চারটে ঘর কে যেন একটু আধটু সারিয়ে সুরিয়ে মাথা গোঁজবার মত করে নিয়েছে।

গলির আশপাশের লোকে এই গলিটার ভিতর দিনের বেলায়ও সাহস করে কখন কস্মিন কালেও ঢুকতো না—ঢোকবার প্রয়োজনও হোতো না। তারা নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে কেবল দেখত, কত রকমের জীব এই গলিটার মধ্যে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত গতায়াত করছে তার মধ্যে উড়ে আছে, মেড়ো আছে, মুসলমান আছে, বাঙ্গালী আছে, ইহুদী আছে, ফিরিঙ্গী আছে, কাবুলী আছে, শিখ আছে এবং আরও কত কি। কেউ বল'ত কোকেনের আড্ডা—কেউ বল'ত নোটজালের কারখানা, কেউ বল'ত আরো কিছু;—মোট কথা কেউ কিছুই ঠিক করে বলতে পারতো না—এবং কিছু ঠিক করে বলতে পারতো না বলেই অনেক কিছু বল'ত।

বেলা প্রায় ৮টা হবে। ভাঙ্গা বাড়ীটার উঠানের এক পাশে ৭।৮টা লোক আপাদমস্তক কাপড়মুড়ি দিয়ে মড়ার মত পড়েছিল। হঠাৎ তাদেরই মাঝখান থেকে একটা লোক ধীরে ধীরে নড়ে উঠল। গায়ের কাপড়টাকে সরিয়ে উঠে বসে সে প্রথমে গণ্ডা চারেক হাই তুলে নিলে—তারপর হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করে বসে রইল—যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে। ভাঙ্গা বাড়ীটার পশ্চিমদিকের একটা দেয়ালে কোণাকুণিভাবে শরৎকালের পীতরৌদ্রটুকু এসে পড়েছে,—সেইদিক পানে চেয়ে চেয়ে আজ কেন কে জানে তার ভারি ভাল লাগছিল; বেশ একটি মোলায়েম এবং অলস তৃপ্তি সে মনের মধ্যে নেশার মত অনুভব করছিল। দুনিয়াটা আজ তার কাছে বেশ যেন ভাল লাগছে। ভাঙ্গা বাড়ীটা, তার কার্ণিসের ফাটলের চারা অশ্বত্থ গাছটা, মাথার উপরকার শরতের ধোয়া-মোছা নির্ম্মল নীল আকাশ—সবের মধ্যেই সে যেন আজ বেশ

একটি সুর খুঁজে পাচ্ছিল।—শরীর তার ঝিম ঝিম্ করছিল—মাথা ঘুরছে—সর্ব্বশরীর যেন টল্‌মল্ করছে ; চব্বিশ ঘণ্টারও উপর সে নেশার ঘোরে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল—এইমাত্র জেগে উঠছে।

লোকটার মাথায় একরাশ চুল—তৈলাভাবে রুক্ষ এবং কটা। শরীরখানা পাকিয়ে গিয়ে ধনুকের মত বেঁকে গেছে। বিষ্ণুপঞ্জরগুলি একটি একটি করে গোণা যায়। গায়ের রং ফর্সা কি কালো তা বলতে গেলে গবেষণার দরকার। বয়স নিরূপণ করা তারও চেয়ে কঠিন। এখানে সকলে তাকে বেচু বলে জানে। সম্ভবতঃ তার ভাল নাম ছিল বেচুরাম বা ব্যাচারাম—বা ঐ রকম আর একটা কিছু—কিন্তু থাক্ সে কথা এখন।

বেচুরামের আশে পাশে যে ভূতগুলি আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে পড়ে ছিল, তাদেরি একজনের বস্ত্রাবরণ ফুঁড়ে একটা বিশ্রী নাকডাকার আওয়াজ এতক্ষণ অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল,—হঠাৎ এক সময় সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সেইদিক পানে কান যেতেই বেচুরামের মন হঠাৎ অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠলো,—এযেন নেহাতই বেখাপ্পা—নেহাতই খাপছাড়া—বিশ্রী—কদাকার—বেসুরা। “কেরে লক্ষ্মীছাড়া” বলে তার মুখের উপর থেকে ময়লা কাপড়খানার খানিকটা তুলেই সে তাড়াতাড়ি সেটা আবার মুখের উপর চাপা দিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।—কি বিশ্রী—কি কদাকার—কি বীভৎস লোকটার মুখখানা!—কপাল এবং ঠোঁটের মাঝখানে যে স্থানটায় লোকের নাক থাকে সেখানটা একবারে সমতল—চাঁচা-পোঁচা ;—আছে কেবল একটা কদাকার বিশ্রী গহ্বর ; এবং তারি ভিতর দিয়ে একটা সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ আসছে। তাড়াতাড়ি মুখের উপর কাপড়টা ফেলে দিয়ে বেচু লাফিয়ে উঠলো।—শরতের পীতরৌদ্রটুকুর মধ্যে কোন রহস্য নেই ; ভাঙ্গাবাড়ীর পোড়ো দেয়ালগুলো কি বিশ্রী—কি কদাকার!—মাথার উপরকার নীল আকাশটা কি নিষ্ঠুর—কর্কশ।

এক ছুটে ভাঙ্গা বাড়ীটার দরজা পার হয়ে গলির মোড়ে এসে সে দাঁড়াল,—তার পরেই হঠাৎ কি মনে করে নিজের নাকের ডগাটাকে সে খুব জোরে জোরে চিমটি কাটতে লাগলো ;—কৈ খুব লাগছে না ত!—তবে কি তার নাক অসাড় হয়ে গেছে!—ভয়ে তার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল।—অনেকদিন আগে তারি একজন আলাপী লোকের মুখে সে শুনেছিল—বহুদিন ধরে কোকেন খেতে খেতে শেষকালে নাকের ডগা এবং হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো অসাড় হয়ে যায়—তারপর একটু একটু করে খস্‌তে সুরু করে। এই মাত্র যে বিশ্রী কদাকার মুখখানা সে দেখে এল—তারি ছবিখানা তার চোখের সম্মুখে বার বার ভেসে উঠতে লাগলো,—সে মনে মনে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো—“আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও!”

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ সে চলতে সুরু করে দিলে।—কোন উদ্দেশ্য নেই—কিছু নেই,—কোথায় চলেছে জানে না, কেন চলেছে তাও জানে না;—পা দুটো তাকে

নিয়ে চলেছে।—হঠাৎ সে দেখে—বিডন্ স্কোয়ারের সুমুখে এসে পড়েছে। কি মনে করে সে চুপ করে একটা গ্যাস্ পোষ্টে ঠেস দিয়ে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াল। একটা ঠিকে গাড়ী তার সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল —তার মধ্যে কি কলরব—সে যেন একটা পাখীর বাসা। গাড়ীর মধ্যে আছে একটি মাত্র পুরুষ, —আর রাজ্যের যত ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীলোকের দল—দেখলেই বোঝা যায়—পাড়াগাঁ থেকে এসেছে সহর দেখ্‌তে। বিডন স্কোয়ারের দিকে হাত বাড়িয়ে রীতিমত মুরুব্বিয়ানা চালে লোকটা বলে যাচ্ছিল—"এই হচ্ছে হেদুয়াতলা—আর ঐ যে দেখছ লম্বাবাড়ী ওটা হচ্ছে মেটিয়া-কলেজ!"—কি উৎসাহ এবং আত্মপ্রসাদ তার মুখে চোখে!—সেই দিক পানে চেয়ে বেচুর হঠাৎ কেন কে জানে কান্না পেতে লাগলো,—তার মনে হতে লাগলো—খানিকটা সে যদি চেঁচিয়ে কাঁদতে পায় তাহলে তার বুকের বোঝাটা খানিক নেমে যেতে পারে সে আস্তে আস্তে বিডনবাগানের ফটকটার দিকে এগুচ্ছিল—হঠাৎ চোখে পড়ল—তারি বিপরীত দিক থেকে আসছে গোটাকতক প্রাণী—পুরুষ এবং নারী,—হাতপা তাদের ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে জড়ান; আর তাদের নাকগুলো—ওঃ! সে চোক কান বুজে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়ে ছুটতে ছুটতে একটা গাছতলায় এসে বসে পড়ল।—কি করবে—কোথায় যাবে সে?—পাগলের মত নিজের সর্ব্বাঙ্গে সে চিমটি কাট্‌তে লাগলো,—অসাড় —অসাড়—সর্ব্বাঙ্গ অসাড়!—হতাশ হয়ে সে গাছতলায় ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল,—তারপর ঠিক ছোট ছেলের মত করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

খানিকক্ষণ কাঁদবার পর তার মনে হলো বুকের ভিতরটা খানিকটা যেন হাল্কা হয়েছে। শরতের পীতরৌদ্রটুকু সবুজ ঘাসের উপর এসে পড়েছে—সে যেন কেবল স্বপ্ন—আর স্বপ্ন।—বেচু চুপ করে বসে রইল, —তার মনে হতে লাগল,—সে যেন জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে। দূরে রাস্তার গাড়ী চলাচলের শব্দ, জনকোলাহল, গেঁকি কুকুরের কর্কশ একঘেয়ে চীৎকার—সবই যেন স্বপ্ন আর স্বপ্ন! হঠাৎ একসময় তার মনে হল—ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে,—তাড়াতাড়ি সে নিজের ট্যাক্‌টাকে হাত বুলিয়ে অনুভব করলে—কিচ্ছু নেই—কিচ্ছু নেই—একটি কপর্দ্দকও না!—হঠাৎ তার মনে হল তার ক্ষিদে দশগুণ বেড়ে গেছে,—আর এক মুহূর্ত্ত সে না খেয়ে থাকতে পারবে না—কিছুতে না—কোনো মতে না! তার নাড়ীতে পর্য্যন্ত যেন টান্ ধরছে।

একটি ভদ্রলোক তারি দিকে আসছিল—সঙ্গে তার একটি ছোটছেলে। ছেলেটি কত রকম প্রশ্ন করছিল—"এটা কি বাবা—ওটা কি বাবা!"—বেচু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"আমাকে কিছু খেতে দাও—আমি মরে যাচ্ছি!" লোকটা তার দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ এক সময় পকেট থেকে একটা পয়সা বার করে তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, "ও কে বাবা?" "গুলিখোর ফুলিখোর হবে আর কি।"—বলে

ভদ্রলোক পকেট থেকে দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার চলতে স্বরু করলে।

পয়সাটা ট্যাঁকে গুঁজে বেচুর মনে হল তার অর্দ্ধেকেরও উপর ক্ষিদে চলে গেছে। সে আবার চুপ করে বসে রইল—কোন উত্তেজনা নেই—ভয় নেই—ভাবনা নেই—কিচ্ছু নেই,—আছে কেবল একটা নিঝ্‌ঝুম্‌ নেশার ঝোঁক—একটা অলস জড়তা। গোটাকতক হাই তুলে সে আবার গাছতলায় শুয়ে পড়ল। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি,—স্বপ্নে দেখলে—সে যেন দেশে ফিরে গেছে ;—সেই তাদের ছোট্ট গ্রামখানি।—শরতের যে পীত রৌদ্রটুকু সে এই মাত্র জেগে জেগে অনুভব করছিল—স্বপ্নে দেখলে—তাদের সেই ছোট্ট গ্রামখানির উপর ঠিক তেমনি একটি অসল পীত-রৌদ্র এসে পড়েছে। সেই তাদের ছোট্ট কুটির খানি—একরাশ বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—মাথার উপরকার নীল আকাশটা—সে যেন স্বপ্ন। তারপর কুটিরের স্বমুখে এসে সে দাঁড়াল।—কে একটি স্ত্রীলোক কাঁকে কলসী নিয়ে কুটীরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল—তাকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি একহাত ঘোমটা টেনে ছুটে আবার কুটিরের ভিতর ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুমটাও ভেঙ্গে গেল।—চোখ চেয়ে দেখে—আশে পাশে একরাশ ছেলে মেয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—আর রাজ্যের যত ঝি চাকর একটু তফাতে বসে তাদের সুখদুঃখের কথায় একবারে মসগুল হয়ে উঠেছে। স্বমুখের একটা তেতালা বাড়ীর চিলের ছাতের আড়াল থেকে সূর্য্যদেব চারিদিকে মুঠো মুঠো আবির ছড়াচ্ছেন।

ছেলে মেয়েগুলো কি হুটোপাটিটাই না করছে!—তাদের হাস্য কোলাহল—তার বুঝি আর বিরাম নেই। এত হাসি তার একটুও ভাল লাগল না—এ যেন নেহাতই বাড়াবাড়ি।—নাঃ—এখান থেকে তাকে উঠতে হোলো নেহাতই।—সে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু একি!—মাথা টলছে যে—পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে যে।—তার মনে পড়ে গেল—আজ দুদিন সে কিছু খায় নি। এখুনি তাকে পেটে কিছু দিতে হবে—তা না হলে মরে যাবে সে-—। অতি কষ্টে নিজের ক্লান্ত দুর্ব্বল দেহটাকে সে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল্ল। আবার সেই রাজপথ—সেই গাড়ীঘোড়ার ঘড়ঘড়ানী—সেই লোকের ধাক্কাধাক্কি। রাস্তায় এসে পড়ে স্বমুখেই একটা মুড়ির দোকান দেখে সে আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ট্যাঁক্ থেকে পয়সাটা বার করে দোকানদারের হাতে দিয়ে বল্লে—"এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি দাওত ভাই!" মুড়ি চিবুতে চিবুতে সে সেই দোকানেরি ধারে ফুটপাথের উপর বসে পড়ল। কিন্তু ক্ষিদে ত মরল না—উল্টে বেড়েই গেল যে। স্বমুখে একটা কল ছিল—টিপে দেখে এক ফোঁটা জল নেই। দোকানীকে অনেক করে বলতে সে একটা ঘটি করে খানিকটা জল এগিয়ে দিলে। এক পেট জল খেয়ে বেচু খানিকটা যেন সুস্থ বোধ করলে। কিন্তু আরো কিছু খেতে পারলে হয়।

আচ্ছা ভিক্ষে চাইলে হয়ত। কিন্তু কেন কে জানে হঠাৎ তার ভিক্ষে চাইতে ভয় হতে লাগলো। সকাল বেলাকার সেই হাতে-পায়ে ন্যাকড়া-জড়ান নাকখসা লোকগুলোর ছবি সহসা তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো। তার মনে হতে লাগল—দুদিন পর তারও অমনি চেহারা হবে, আর অমনি করে হাতে পায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে তাকেও একদিন পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে। ভিক্ষে করার সঙ্গে ঐ কদাকার বিশ্রী চেহারাগুলো এক হয়ে গিয়ে তার মনের মধ্যে ভিক্ষে করার রূপটাকে এমনি কদাকার এবং বিশ্রী করে তুলেছিল, যে সে কথা মনে আসতেই সে ভয়ে বার বার শিউরে উঠতে লাগলো।---না না ভিক্ষে করবে না সে—মরে গেলেও না। কিন্তু হাতে একটি পয়সা নেই যে—কাল খাবে কি সে ?

পকেট মারলে হয় ত !—কতবার ত সে ও-কাজ করেছে। সময় সময় ধরা পড়েছে বটে—কিন্তু বেঁচেও ত গেছে বহুবার। তবে তাই করা যাক্ --হ্যাঁ সেই ভাল ! পরক্ষণেই তার মনে হোলো তার পাঁজরা গুলোর উপর কে যেন হাতুড়ি পিটছে। বেশী দিনের কথা নয় সে,—পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়ে কি মারটাই না সে খেয়েছিল—ওঃ কি বেদম প্রহার—কি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর প্রহার—এক একখানা হাড় যেন খসে পড়ছে—পাঁজরা গুলো যেন ধসে যাচ্ছে। সে কথা মনে পড়ে আজ তার বুকের পাঁজরা গুলো সহসা আপনা হতে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে উঠতে লাগলো।—আচ্ছা আড্ডায় ফেরা যাক্ না !—কিন্তু তারা ত আর ঠাঁই দেবে না—তাদের কাছে অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে যে। নাঃ আর ভাবতে পারা যায় না—যা হয় তাই হবে—এখন ত যেখানে হোক এক জায়গায় পড়ে রাতটা কাটিয়ে দিক সে—তারপর কালকের ভাবনা কাল আছে।

আবার সেই বিডন বাগান। একটা বেঞ্চের উপর গিয়ে সে সটান্ শুয়ে পড়ল।—আঃ কি আরাম !—কিছু পূর্ব্বে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বাগানের গাছপালার ফাঁক দিয়ে ওপারের বাড়ী গুলোর আলো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেচু চুপ করে বেঞ্চের উপর পড়ে রইল।—হঠাৎ কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই টের পায়নি—ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখলে—সে বাড়ী ফিরে গেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সে ভাত খাচ্ছে ; তার বুড়ো মা সুমুখে বসে "এটা খা ওটা খা" বলে তাকে একবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। পেটে আর ধরে না—তবু ছাড়ান ছোড়ান নেই।—সে স্বপ্নটা কেটে গেল—আর একটা স্বপ্ন এসে হাজির—তার স্ত্রী যেন তার পায়ে ধরে কাঁদছে—আর কখন সে যেন তাকে ফেলে চলে না যায়।—সে কি কান্না !—সে কান্না দেখে বেচুরও কান্না পেতে লাগলো—সেও খুব কাঁদলে—সে কান্নার বুঝি শেষ নেই—এত কান্না। তারপর সে স্বপ্ন কেটে গিয়ে আর একটা স্বপ্ন চোখের উপর ভেসে উঠলো—সে যেন তার বুড়ো মা, তার স্ত্রী আর রাজ্যের যত ছেলে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় এসেছে—তাদের সহর দেখাতে। একটা ঠিকাগাড়ী ভাড়া করে সে তাদের সহর দেখিয়ে বেড়াচ্ছে—কি অদম্য

কৌতূহল তাদের চোখে মুখে। ঘুমের মাঝখানেও সে তিন চার বার চেঁচিয়ে উঠলো—"ঐ লালদীঘি, ঐ লাটসাহেবের বাড়ী—ঐ ঐ!"—হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সে ধড়মড় করে উঠে বসল।—"বাহার যাও! গেট বন্ হোগা!"—কি গম্ভীর গলার স্বর! বেচু আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।—ওঃ কি নিশ্চিন্ত আরামটাই না সে ভোগ করছিল এতক্ষণ!—কিন্তু এখন সে যায় কোথায়?—যেখানে হোক যেতেই হবে তাকে। রাত্তিরটা এক জায়গায় কাটাতে হবে ত!—দূরে একটা থামওয়ালা বাড়ী দেখা যাচ্ছে না?—ওর রেলিংএর ধারে পড়ে থাকলে হয় ত! —সেই থামওয়ালা বাড়ীটার রেলিংএর ধারে গিয়ে সে চুপ করে বস্‌ল।—শুতে ইচ্ছে করছিল না—একটুও না—যে স্বপ্নটা সে এতক্ষণ দেখছিল তারি জাবর কেটে সারাটা রাত বসে থাকতে তার ইচ্ছে যাচ্ছিল। আজ ৬।৭ বৎসর হোলো সে বাড়ী যায়নি—না—একটি বারের জন্যও না! মনে পড়তে লাগল সেই একদিনের কথা যেদিন প্রথম সে কলকাতায় এসে পাঁউরুটির দোকান খোলে —সে আর তাদের গ্রামের পরাণ বাইতি। তারপর দোকান বেশ চলতে লাগল, বেশ দু-পয়সা আয়ও হতে লাগল। তারপর কেমন করে একটু একটু করে বন্ধুবান্ধব জুটলো—কেমন করে নেশা ঢুক্‌লো—বদখেয়াল ঢুক্‌লো—আরো কত কি আনুষঙ্গিক তার সঙ্গে। না—আর না!—এবার সে দেশে ফিরবে—বদ সঙ্গ ত্যাগ করবে—নেশাভাঙ্ ছাড়বে—এবার সে ভাল হবে। দু-চার ছিলিম তামাক আর তারি সঙ্গে এক আধ ছিলিম গাঁজা—বাস্—আর কিচ্ছু না।

আর বদখেয়ালের কথা?—পাড়ার ভূতো বা বনমালী নেহাতই যদি ধরে পড়ে ত কালে ভদ্রে কখন-সখন—বাস্। তার মনে হতে লাগলো, একছুটে সে এখুনি দেশে পালিয়ে যায়।

রাত্তিরটা কাটলে হয়!—বেলা সাড়ে দশটায় ট্রেণ।—কিন্তু ট্রেণভাড়া সে পাবে কোথায়?—এক আধ পয়সা নয়—আড়াই টাকা!—সে-টাকা কোথা থেকে জুটবে?—জুটবে —নিশ্চয়ই জুটবে—না জুটলে চলবে কেন?—সে যদি কোন ভদ্রলোককে গিয়ে তার মনের সব কথা খুলে বলে তাহলে কেউ কি তাকে দয়া করবে না?—নিশ্চয়ই করবে—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই!

তার বাড়ীফেরার পথে যত রকম অন্তরায় মনের মধ্যে এসে দেখা দিতে লাগলো—সবগুলোকে সে একে একে সরিয়ে ফেলতে লাগলো—সে বাড়ী ফিরবেই কাল—সাড়ে দশটার ট্রেণে। সে বদখেয়ালীর জন্যে টাকা চাইছে না—নেশাভাঙ্ করবার জন্যেও না—বাড়ী গিয়ে ভাল হবে বলে সে টাকা চাইছে—লোকে দেবে না?—নিশ্চয়ই দেবে—এখন রাতটা কোনো রকমে কাটলে হয়—আর যেন ধৈর্য্য থাকে না। আস্তে আস্তে সে শুয়ে পড়ল তারপর আবল তাবল কত কি কল্পনা তার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগলো। তাদের সেই ছোট্ট কুটিরখানির দাওয়ায় বসে সে যেন নিশ্চিন্ত মনে ছিলিমের পর ছিলিম পোড়াচ্ছে—কোন ভাবনা নেই

—উদ্বেগ নেই, কিচ্ছু নেই !—কলকাতায় সে আর জীবনে ফিরছে না—কিছুতেই না।—দেশে সে যদি ছোটখাট একটি মণিহারির দোকান খুলে বসে!—কিচ্ছু না,—প্রথমে মেয়েদের চুলের ফিতে, ঘুনসি, ছেলেদের লাট্টু—কাপড় কাচা সাবান এমনি ছোটখাটো কমদামি জিনিষ দিয়ে আরম্ভ করতে হবে—তার পর ক্রমে ক্রমে মাল বাড়ান।—চলবে না ?—নিশ্চয়ই চলবে। সমস্ত দিন দোকান চালিয়ে—সন্ধ্যার সময় হিসেব-পত্তর শেষ করে ভূতো আর বনমালীর সঙ্গে দোকানে বসেই দু-ছিলিম গাঁজা চড়িয়ে যে যার ঘরে লক্ষ্মী ছেলেটির মত সুড়-সুড় করে গিয়ে ঢুকবে—বাস্—এই পর্য্যন্ত।—এর বেশী সে আর এগুচ্ছে না। এমনি সব নানান আবোল তাবোল ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল—চোখ চেয়ে দেখে, অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে—তার চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে রোদ্দুর এসে পড়েছে। সে গামোড়া দিয়ে উঠে বসল। ওঃ কি দারুণ ক্ষিদে!—চুলোয় যাক্ ক্ষিদে এখন। এক-বার কোন রকমে বাড়ী গিয়ে পৌঁছুতে পারলে হয়—তখন আর ক্ষিদের জন্যে ভাবতে হবে না। শরতের পীতরৌদ্র—মাথার উপর নির্ম্মল নির্মেঘ নীলাকাশ—চমৎকার!—চমৎকার!—বাড়ী—বাড়ী—বাড়ী!—আজ সে বাড়ী যাবে। বেচু উঠে দাঁড়াল।—পা চলে না যে—ওঃ কি দুর্ব্বল সে!—চুলোয় যাক্ দুর্ব্বলতা।—বাড়ী গিয়ে দুবেলা দুপেট খেতে পেলে ও-সব সেরে যাবে অখন। কোন রকমে একবার বাড়ী পৌঁছান—বাস্!—সে চলতে সুরু করলে। একটা পানের দোকানের সামনে এসে আরশীতে সে নিজের চেহারাখানা একবার দেখে নিলে।—ওঃ কি বিশ্রী তার চেহারাখানা হয়েছে—দেখলে ভয় হয়।—তা হোক্ গে!—দেশে গিয়ে বেশ করে সর্ব্বাঙ্গে তেল মেখে চান করে ফেল্লেই আবার চেহারা ফিরে যাবে অখন।—কিন্তু টাকা?—তা না হলে কিছুই হবে না যে।—টাকা!—টাকা!—টাকা!

প্রকাণ্ড একটা বাড়ীর দরজার সামনে গাড়ীবারান্দার তলায় চেয়ারের উপর একটি মোটা সোটা লোক বসেছিল—সে গিয়ে হঠাৎ সুমুখে দাঁড়িয়ে কোন রকম ভূমিকা না করেই বলে উঠলো—"আমাকে আড়াইটা টাকা দেবেন মশাই?"—লোকটা ত অবাক!—"তুমি পাগল না কি হে?"

"আমি পাগল নই মশাই—সত্যি বলছি পাগল নই—আমি নেশাভাঙ্ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে ভালো হবো তাই—"

লোকটা চোখ রাঙ্গিয়ে উঠলো—"বেরো ব্যাটা এখান থেকে—ন্যাকামী করবার আর জায়গা পাও নি!"

হোলো না এখানে—নাই হোক্—আর এক জায়গায় হবে। বড্ড ভুল হয়ে গেছে!—প্রথমেই টাকার কথা না পেড়ে আগে সমস্ত কথা খুলে বল্লে ভাল হোতো। এবার তাই করতে হবে।

সুমুখের ঐ কাপড়ের দোকানটাতে ঢুকলে হয় না ?—ঐ যে রোগা মতন লোকটি কোলের কাছে ক্যাস বাক্স নিয়ে বসে আছে—ঐ লোকটাই মালিক হবে নিশ্চয়ই!—লোকটাকে দেখে মনে হয় প্রাণে যথেষ্ট দয়া মায়া আছে। দোকানের ভিতর পা দিতেই একটা লোক্ বেশ একটু কড়া কণ্ঠে বলে উঠলো—"কি চাই এখানে ?"

"আজ্ঞে মালিকের সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই!"

"বেরোও এখান থেকে শিগ্‌গির—ব্যাটা পকেট-কাটা কোথাকার—এখুনি পাহারওয়ালা ডেকে ধরিয়ে দেবো—বেরোও শিগ্‌গির!"

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বেচু একটা গ্যাস্‌পোষ্টে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তবে কি তার বাড়ী যাওয়া হবে না ?—ওঃ কি ভয়ানক ক্ষিদের জ্বালা!—আর ত পারা যায় না! সমস্ত দেহ যেন ভিতর থেকে টান্‌ছে। তার ডাক ছেড়ে চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছে হতে লাগলো—আড়াই টাকা—শুধু আড়াই টাকা—তা হ'লেই তার জীবনটা একেবারে বদলে যায়—একেবারে জন্মের মত। সুমুখের একটা দোকানের ঘড়ির দিকে চেয়ে সে দেখলে সাড়ে আটটা বেজে গেছে—আর দুটো ঘণ্টাও হাতে নেই। এর মধ্যে তাকে টাকা যোগাড় কর্‌তে হবে—তা না হ'লে চল্‌বে না যে!—টাকা!—টাকা!—টাকা!—

দূরে অত লোকের ভিড় কেন ? কেউ গাড়ী চাপা পড়েছে বোধ হয়। ওঃ কি ঠেসাঠেসি ভিড়!—বেচু সেই দিক পানে এগুতে লাগলো। বুকটা তার ভিতরে ভিতরে দুর্ দুর্ ক'রে উঠলো।—ও কিছু না—কিছু না!—ভয় পেলে হাত কেঁপে যাবে, আর হাত কাঁপলেই—তার মনে হলো হঠাৎ কে যেন তার বুকের উপর চেপে বসে হাতুড়ি পিটছে। তা পিটুক—তাকে বাড়ী ফিরতে হবে। ঐ লোকটা,—হ্যাঁ ঐ লোকটাই ঠিক হবে।—আচ্ছা আর একটু ঘেঁসে দাঁড়ান যাক্,—হুঁ, পকেটটা বেশ ভারি ভারি ঠেকছে বটে—ঠিক্ হবে ঠিক্ হবে!—হাত কিন্তু বড্ড কাঁপছে যে—আচ্ছা হয়েছে হয়েছে!

তার পরেই হঠাৎ সে কি চীৎকার, আর সে কি প্রহার! বেচু প্রাণপণ বলে চীৎকার করে উঠলো—"আমি চুরি করি নি—মা কালীর দিব্যি আমি চুরি করি নি—আমি বাড়ী যাবার জন্যে টাকা নিয়েছি—আমি চুরি করি নি—দোহাই তোমাদের—আমি চুরি করি নি!" মার বন্ধ হয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা হাসির রোল উঠলো—"ব্যাটা চুরি করে নি—বাড়ী ফেরবার জন্যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে কর্জ্জ নিচ্ছিল।" তার পরেই আবার মার।—মার—মার—মার!—উন্মত্ত জনতা তার অচেতন দেহখানাকে টেনে হিঁচড়ে একটা পাহারওয়ালার জিম্মায় দিয়ে যখন নিশ্চিন্ত মনে যে যার গন্তব্য পথের দিকে যাচ্ছিল—তখন তাদেরি ভিতর একটি লোক আর একটি লোককে বল্‌ছিল—"ব্যাটার পাঁজরাগুলো কি শক্ত মশাই—এখন পর্য্যন্ত হাত টন্ টন্ কর্‌ছে—তবু রোজ ওয়াই, এম, সি, এ-তে Boxing practice কর্‌ছি।" শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

বিদায়

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !
পঞ্চাশ বছর ধরি' রেখেছিলে বুকে করি'
স্নেহের আঁচলে ঢাকি' মাখি' মমতায়,
কত ভালো বেসেছিলে, কত কি-না করেছিলে
সতত তুষিতে মাগো, এই অভাগায়।
একা বসি' নিরজনে ভাবি যবে মনে মনে,
নয়ন ঝিমিয়া আসে যেন জড়তায়,
এত ভালো কেন মাগো বাসিলি আমায় ॥

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !
আজি ছেড়ে যেতে হবে, এই কথা ভাবি যবে,
চারিদিক্ ঘেরে আসে গাঢ় কুয়াসায়।
শৈশবের খেলা-ঘর, যৌবনের মনোহর
নন্দন-কানন মোর ছিলে বসুধায়।
কত দেশ ঘুরিয়াছি কত-কি-না দেখিয়াছি
এমন সুন্দর মাগো দেখিনি' কাহায় ;
এমন বটের ছায়া যেন মায়াবিনী-মায়া !
শারদ-চাঁদিনী-রাতে তটিনীর কায়
এমন সুন্দর আর আছে মা কোথায় ?
নিশিতে ঘুমের ঘোরে যখন দেখি মা তোরে,
ঢল ঢল তনু—মাখা স্বর্গ-সুষমায়।
কি-যেন-কেমন হই—পাগলের প্রায় ॥

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !
শ্যামা-দোয়েলের গান এমন করিয়া প্রাণ
কোন্ দেশে জননি গো বলত ভুলায় ?

পরি' খদ্যোতের মালা, ভুবন করিয়া আলা
কানন-কুন্তলা নিশি বসি' জোছনায়
নীহারের মুক্তা-ফলে শতহার দোলে গলে,
বিহগ-কাকলী-ছলে কোথা গান গায় ?
এমন বকের পাঁতি কোথা মাগো মালা গাঁথি'
সুনীল-আকাশে ভাসি' দিগ্-বালিকায়
কত-না আদরে হাসি যতনে সাজায় !

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !
সায়াহ্নে নদীর তীরে ভাসি মা নয়ন-নীরে
দাঁড়ী যবে সারি গেয়ে তরী বেয়ে যায় ;
তালে তালে পড়ে দাঁড়, কুল্-কুল্ ধ্বনি তা'র
অনুকূল তান্ ধরি কি সঙ্গীত গায় !
কি মোহিনী সেই গানে, যে শুনেছে, সেই জানে,—
সে-ই জানে—বুক যা'র ভেঙেছে ধরায় !
তেমন সঙ্গীত আর আছে মা কোথায় ?
নিদাঘ-রৌদ্রের তাপে, ধরণী যখন কাঁপে,
তখন প্রান্তর-শেষে তরুর ছায়ায়
সরলা কৃষক-বালা গাঁথিতে গাঁথিতে মালা
গলা ছাড়ি' গান ধরি' শুক-সারিকায়
কোথায় শ্যামল ক্ষেত্রে বলত উড়ায় ?

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !
দীর্ঘ দিবসের শেষে ধূলি-ধূসরিত বেশে
ধেনু লয়ে ধীরে ধীরে গো-ধূলি-বেলায়
মুগ্ধ রাখালের দল কোথায় জননি, বল্
"বেলা গেল সন্ধ্যা হলো—তার হে আমায়"
বলি ডাকে তারস্বরে, সান্ধ্য-সমীরণ তরে
সে ডাক্ মুরছি' পড়ি' অসীমের পায়
কোন্ সে অজানা-সিন্ধু-পারে যেতে চায় !!

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !
যাহাদের লক্ষ্য করি' বেয়ে চলে ছিনু তরী
এ দীর্ঘ জীবন ভরি' আশা-দুরাশায়,
কল্পনার কম-করে মাগো যাহাদের তরে,
সাজাইয়াছিনু ঘর কত-না সজ্জায় ;
কি যেন নেশার ঘোরে আকাশ-পাতাল ঘুরে
দিবানিশি মাগো অনাহারে অনিদ্রায়,
স্নেহের কবচে ঢাকি' সদা বুকে বুকে রাখি'
কত-কি-না করিলাম যাহাদের হায়,
কোথা তারা আজি এই জীবন-সন্ধ্যায় !

বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায়,
আজি এ বিদায়ক্ষণে এই ভিক্ষা ও চরণে,
যদি পুন নরজন্ম পাই বসুধায়,—
তবে যেন আসি ফিরে এই বাংলায়।
চাহি না মা পারিজাতে, চাহি না স্বরগে যেতে,
চাহি না সম্পদ-সুখ-সুললিত কায়।
পথের ভিখারী কোরে' যদি মা পাঠাও মোরে
আশীষ্ বলিয়া তাহা ধরিব মাথায়—।
পাঠিও জননি, বঙ্গে পাঠিও আমায়।
বিদায় মা বঙ্গভূমি, বিদায় বিদায় !!

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৪

সুদর্শন

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

সময়ে সময়ে দেশে এমন এক এক জন মানুষ আসেন, যাঁহারা উত্তর-কালে দেশবাসীর নিকট একটী বিশিষ্ট সত্যের প্রতীকরূপে গৃহীত ও পূজিত হইয়া থাকেন। লোকে সব সময়ে ইঁহাদের বিস্তারিত বিবরণ মনে করিয়া রাখেনা,—ইহাঁদের পিতা মাতা কে, জন্ম-সময় কখন, নিবাস কোথায়, আকৃতি কিরূপ ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণের প্রায় কোনো কৌতূহল দেখা যায় না। পরিবর্ত্তে বরং ঐরূপ ধরণের মানুষকে জড়াইয়া চতুষ্পার্শ্বে তাহারা এমন সব কাহিনী ও কিম্বদন্তী লতাইয়া তুলে যাহা হিসাবী লোকে, বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন তার্কিক পণ্ডিতে হাসিয়াই উড়াইয়া দেন। ইদানীন্তনকালে জীবনী লেখকের অভাব নাই, অনেকেই আবার নিজের জীবনী নিজেই লিখিয়া সাধারণকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়া যান। কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর আগের দেশ ঠিক্ এমনতর ছিল না। তাই কোনো জীবনী না থাকিলেও বলা যায় যে দেশের লোক চণ্ডীদাসকে এক বিশিষ্ট সত্যের প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। মহাপ্রভু কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন, বাঙ্গালার একটী সুবৃহৎ সম্প্রদায়ে চণ্ডীদাসের পূজা, আমাদের এই অনুমানের সমর্থন করে।

বর্ত্তমানযুগ মানবতার যুগ; কিন্তু এ যুগ একদিনে আসে নাই। সাধারণতঃ মনে হয় মানব-সাধনার ক্রমবিকাশের পাঁচটী প্রধান স্তর বা যুগ-পর্য্যায় আছে। আনুষ্ঠানিকতা—যাগযজ্ঞ বা ক্রিয়া যোগাদি,—ইহাই প্রথমস্তরের লক্ষণ। সাংখ্য বা জ্ঞানের যুগকে দ্বিতীয় পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিতে পারি। তৃতীয় স্তরে ভক্তি; ইহার পর নীতিধর্ম্মকে চতুর্থ এবং পরবর্ত্তী স্তরকে মানবতার যুগ নামে অভিহিত করা যায়। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া একদিকে পুরাণ ও অন্যদিকে তন্ত্রের আলোচনায় এই স্তরভেদেরই সমর্থন পাই। পাই,—কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে পাই,—একখানি গ্রন্থের মধ্যে এই পাঁচটি স্তরভেদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। ভাগবতের আর একটি লক্ষণ—ভাগবত একাধারে প্রভু, মিত্র এবং প্রিয়া। এদেশে একটা কথা আছে "বেদ-প্রভু, পুরাণ এবং তন্ত্র মিত্র, আর কাব্য প্রেয়সী"। শ্রীমদ্ভাগবতে এই তিনেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কাব্যের মধ্য দিয়াই আমরা মানব হৃদয়ের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ দেখিতে পাই। কাব্যের রস, আর যোগী জ্ঞানী বা ভক্ত সম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্ত-প্রতাপাদিত রস—মূলে একই। এই মহাসত্যের উপরেই মানবের ভগবত্তা এবং ভগবানের মানবতা চিরপ্রতিষ্ঠিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কথিত "নরলীলা" এই মহাসত্যেরই দ্যোতনা। মহাকবি চণ্ডীদাস এই নরলীলার আদি প্রচারক।

ভাগবতের কাব্যাংশে এদেশে নূতন রূপ দিয়াছিলেন বীরভূমের কবি জয়দেব। তাঁহারই পদাঙ্ক-অনুসরণে কিন্তু সম্পূর্ণ অভিনব ভঙ্গীতে পরবর্ত্তী কবি চণ্ডীদাস সে রূপকে এমন এক

রসে উজ্জীবিত করিয়া তুলেন যাহার ঔজ্জ্বল্য ও মাধুর্য্য জীবনকে পবিত্র করে জাতিকে মহিমান্বিত করে। কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম ভাষ্যরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দুবিল্বের কবিকুঞ্জে যে ভাবের অমিয়-উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, যে ভাবধারা কোথাও বা গিরিবক্ষ-বিলম্বিত নির্ঝরিণার ন্যায়, কোথাও বা সিকতাতলবাহী ফল্গুধারার মত সমাজের বক্ষ বহিয়া ফিরিতেছিল, কবি চণ্ডীদাসের সাধনা ও সঙ্গীতে কূলপ্লাবিনী তটিনীর নটন-ভঙ্গীতে তাহা এক আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই ভাবপ্রবাহ পরবর্ত্তী কালে নিতাই চৈতন্যের অশ্রুধারায় উত্তাল হইয়া মানবকে সাগরসঙ্গমের সন্ধান দান করিয়াছে, অনন্ত পথযাত্রীর পথ প্রদর্শক হইয়াছে। তাই চণ্ডীদাসের গান বৈষ্ণবের কণ্ঠভূষণ, সাধনের অন্যতম অবলম্বন। তাই বলিয়াছি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার একটি বিশিষ্ট সত্যের প্রতীক!

চণ্ডীদাস নরলীলার আদিপ্রচারক, এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন তাহার পুঁথি—তাহার শাস্ত্রগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড এই নরলীলার কাহিনীতেই পরিপূর্ণ। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে দেবতা-মানুষে একটা সম্বন্ধ পাতাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। মূলতঃ পুরাণ এবং তন্ত্র তাহার উৎপত্তিস্থল হইলেও—

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথঃ॥

গীতা'র এই মহাবাণীই তাহাকে প্রবল করিয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহারই পরম পরিণতি— "আমি যেমন ভগবানের জন্য ব্যাকুল, ভগবানও তেমনি আমার জন্য ব্যাকুল"। মঙ্গল কাব্যের বনিয়াদ প্রধানতঃ এই ভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত,—"আমি না চাহিলেও দেবতা আমাকে চাহেন, আমার পূজা গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন"—ইহাই মঙ্গলকাব্যের সারকথা।

কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা—দেবতা। পূজা গ্রহণের জন্য যে-কিছু উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তাহা তিনি দেবশক্তির সাহায্যেই করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার ঠিক উল্টা দিক্‌টাই দেখিতে পাই। কৃষ্ণ ত্রিদশের নাথ, তিনিই দশাবতারে দশরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং বহু দৈত্য-দানব মারিয়াছেন; এখনও কংশ তাঁহার ভয়ে নিদ্রা যায় না, কিন্তু তিনিই নররূপ ধরিয়া রাধিকার জন্য দাসী সাজিয়াছেন, ডিঙ্গি বাহিয়াছেন, ছাতা ধরিয়াছেন, ভার বহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত নরলীলার কথা কহিয়াছেন—অতি সন্তর্পণে। ভাগবতের নায়ক পরীক্ষাচ্ছলে রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন, একটু অভিমানের অছিলা পাইয়া নায়িকাকে পথে বসাইয়া লুকাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দে নায়িকাই অভিমানে রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছেন এবং সেই নায়কই সেই দুঃখে মণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার অনুসন্ধানে ফিরিয়াছেন। অবশেষে যে মানিনীকে ভাগবতে তিনি মানের জন্যই ত্যাগ করিয়াছিলেন, গীতগোবিন্দ তাঁহার

পায়ে ধরিয়া সেই মান ভাঙ্গাইয়া দেন। পাদ-পতনের ব্যবস্থা অতি পুরাতন, বাৎস্যায়নও মান-ভঞ্জনের এই ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ' বলিয়া যাঁহাকে বন্দনা করিয়াছি 'সমর শমিত দশকণ্ঠ' বলিয়া যাঁহার নিকট কুশল চাহিয়াছি, তাঁহাকে দিয়া নায়িকার পায়ে ধরানো কম সাহসের কথা নহে। তথাপি গীতগোবিন্দেও ঠিক্‌মত মানুষ খুঁজিয়া পাই না, চণ্ডীদাসই সত্যকার মানুষ লইয়া ঘর-করণা পাতিয়াছেন। বিদ্যাপতি জয়দেবকেই পল্লবিত করিয়াছেন, তাহার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। চণ্ডীদাস বহু দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। ভারখণ্ড ছত্রখণ্ডাদি তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীন রচনা। হয়তো সেকালের পল্লী-প্রচলিত গীতিগাথায় এ সবের আভাষ ছিল, হয়তো বা ছিল না, এই থাকা না-থাকা কিছু বেশী কথা নহে। কথা এই যে, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে এত বড় হৃদয় লইয়া, হৃদয়ে এমন কবিত্ব ও প্রেম লইয়া কোনো শক্তিমান কবি এমন উদ্দাত্ত মধুর কণ্ঠে এ গান গাহে নাই।

মঙ্গলচণ্ডীর গান, বিষহরির গান খুব পুরাতন। কোথাও বা সাম্প্রদায়িকতার জন্য, কোথাও বা তাহার সমন্বয় সাধনের জন্য এই সব গানে এক একজন বিরুদ্ধ মতের সাধক থাকেন। দেবতার যত কিছু ব্যগ্রতা তাহারই পূজা গ্রহণের জন্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় কোনো রূপে রাধার মনোহরণ করা, তাঁহাকে আপনার করিয়া লওয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নায়কের উদ্দেশ্য। নায়ক-নায়িকার প্রেম বর্ণনীয় বিষয় হইলেও এই প্রেম প্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় কৃষ্ণ কীর্ত্তনের কৃষ্ণ যেন কোনো বিরুদ্ধ মতাবলম্বিনী সাধিকাকে আপনার দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম প্রথম রাধিকারও এ দিক্‌টায় যেন মোটেই কোনো স্পৃহা ছিল না। মঙ্গলকাব্যে যেমন বুঝাইতে হয়,—যে দেবতা পূজা গ্রহণের জন্য লালায়িত, তিনি সত্যকারের দেবতা, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিত শক্তি, তাঁহারই ইঙ্গিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, তেমনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের নায়কও সেই একই বিষয়ই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—আমি ত্রিদশের নাথ, আমায় ভজনা কর ইত্যাদি। মঙ্গল-কাব্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পার্থক্যের ইঙ্গিত প্রথমেই দিয়াছি, ভঙ্গীতে যেখানে ঐক্য আছে উপরে তাহাই ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কথা উঠিতে পারে দেবতা-মানবে এই নাগর-নাগরী ভাব মঙ্গল কাব্যের বিষয় নহে। কিন্তু শিবের গানে এই ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। অবশ্য শিবকে লীলার জন্য মানুষ হইয়া জন্মাইতে হয় নাই, তিনি যাহা করিয়াছেন স্বরূপেই করিয়াছেন, তথাপি আর একটা দিকে উভয়তঃ ঐক্য পাইতেছি।

বাঙ্গালায় যে দুইটি নায়িকার অপরূপ চিত্র অতি প্রাচীন কাল হইতে কাব্যে গাথায় গানে বাঙ্গালীর চিত্তপট অধিকার করিয়া আছে,—তাহার একটি গৌরী, অন্যটি রাধা। উভয়েই রাজকন্যা, রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সুখের কোলে লালিতা, কিন্তু প্রেমের জন্য ইঁহাদের যে ত্যাগ, যে তপস্যা তাহার তুলনা হয় না। ইঁহাদের প্রেমের পাত্র দুটিও অতুলনীয়—কে হারে জিনে দুজনে সমান। একজনের একেতো বয়সের গাছ পাথর নাই, তার উপর এমন নেশা-

খোর যে সিদ্ধি গাঁজায় সানায় না,—বলেন 'নাগিনী বোলাও'! বিষ পানেও মৃত্যু হয় না। গৃহ নাই, শ্মশানে থাকেন, তৈজসাভাবে মড়ার মাথার খুলী ব্যবহার করেন। এই স্বামীকে লইয়া গৌরীকে ঘর করিতে হয়। পর্ব্বত-রাজদুহিতা স্বেচ্ছায় এই ভাঙ্গড়কে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। কালিদাস যাঁহার কবি তাঁহাকে ভাষায় আঁকিতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। আমরা শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে ইহারই অংশবিশেষ লইয়া সাবিত্রী সৃষ্ট লইয়াছিলেন, বেহুলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, খুল্লনা গড়িয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহার মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী ভক্তের প্রাণে স্বর্ণকাশী নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার অপর নাম মহাশ্মশান, জগতের অন্নদাত্রী সেখানেও ভিক্ষুকঘরণী। বাঙ্গালীর সাধনায়, গাথায়, গানে, সাহিত্যে, প্রবচনে এই শ্মশানচারিণী অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

আর একজন প্রেমপাত্রের বয়স অল্প কিন্তু রূপে অ-সদৃশ। রং এমন কাল যে কালা নাম যোগরূঢ় হইয়া আজিও তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। ননীচুরী এবং গোচারণ তাঁহার পেশা, কতকগুলি গোরাখাল আর বনের বানর হরিণ ময়ূর তাহার সাথী, পথে পড়িয়া পাওয়া ময়ূরের পাখা এবং বনের ফুল আর বনের কাষ্ঠ তাহার প্রসাধনের বস্তু। পর্ব্বতসমান কুলশীল ত্যাগ করিয়া এই চিরচঞ্চল অতিকুটীল রাখালের সঙ্গে পরকীয় প্রেমে মজিয়া রাধা কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। প্রেম—নন্দনবক্ষে প্রবাহিত মন্দাকিনী ধারা, প্রেম ভগবানের দয়ার দান। এই প্রেম পরকীয় বলিয়াই এতদিন নিন্দিত ছিল, সমাজ তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। এই অমানুষী প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া, সমাজ সংসার লোকাচার কাহারো মুখ না চাহিয়া আপন আপন হৃদয়ের বলে অ-লোক পন্থীকে পংক্তিতে বসাইয়া, 'পঞ্চমকে' চতুর্ব্বর্গের অগ্রবর্ত্তীরূপে পুরুষার্থের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাধিকা তাঁহার প্রেমের আরাধনা সার্থক করিয়াছিলেন। কালার গরলভরা বাঁশীর গানে যে জ্বালা, গৌরী শিবের পাশে থাকিয়া ভুজগী নিঃশাসেও তাহা অনুভব করেন কিনা সন্দেহ। গৌরী তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন, চারিদিনের দিন স্বয়ং শিব আসিয়া শ্বশুরের দ্বারে টণ্ডাই দিয়া বসেন। আর রাধিকার—নিকটে থাকিয়াও বন্ধুর দর্শন মিলিত না। যদিই বা পলকের জন্য দেখা হইত, দুই দিক হইতে প্রবল বাধা—একদিকে নিজের লজ্জা, আর একদিকে গুরুজনের ভয়! এততেও দুঃখের ভরা সম্পূর্ণ হয় নাই, অদর্শন ক্লেশ শতবর্ষ ব্যাপিয়া সহিতে হইয়াছিল। তুলনা করিব না কিন্তু ইহার বেদনার কিছুমাত্র বহন করিতে পারে, বিরহের লহমা মাত্র সহ্য করিতে পারে, বাঙ্গালার সাহিত্যে এ হেন নায়িকা আজিও সৃষ্ট হয় নাই। ইহার অনুরূপ অথবা প্রতিরূপ গঠনে অসমর্থ হইয়া এই মহাভাবস্বরূপিনীর ভাবের বন্দনা গাহিয়া বাঙ্গালী কবি শেষে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—

"পরকীয় ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥"

এই দুইটী নায়িকার প্রেমের আদর্শ পৃথক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় তাহা নহে। আমরা বলিতেছিলাম যে শিবের গানের সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ঐক্য আছে। শিবের গানে গৌরী যেমন মাছ ধরিবার জন্য শিবকে দিয়া ক্ষেতের জল সেচিয়া লইয়াছিলেন, আবার চাষের কাজে খাটাইয়াছেন, রাধিকাও তেমনি কৃষ্ণকে দিয়া ভার বহাইয়াছেন, ছাতা ধরাইয়াছেন, ইত্যাদি। উভয় কবিই এই ধারার অনুসরণে মুলে শ্রীমদ্ভাগবতের নিকট ঋণী, এবং মনে হয় শিবের গানের ঐ অংশ পরকীয় ভাবের প্রভাব পুষ্ট, হয়তো বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পরে রচিত।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনেক স্থানে রাধিকা চন্দ্রাবলী নামেও অভিহিতা হইয়াছেন। ইহার মূলে একটি রহস্য আছে। কথিত আছে 'কন্যা গৌরবে হিমালয়ের সম্মান দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। একবার সুমেরুর গৌরব স্পর্দ্ধা করিয়া দেবমায়ায় অগস্ত্যের জন্য তাঁহাকে নত হইতে হইয়াছিল, এবার যাহাতে সেরূপ কিছু না ঘটে, তজ্জন্য তিনি আগে হইতেই দেবারাধনায় মনোনিবেশ করেন। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দেন "তুমি এমন দুইটি কন্যা লাভ করিবে যাহাদের স্বামী রাজেন্দ্র হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকে পরাস্ত করিবেন।" সেই কন্যাই রাধিকা ও চন্দ্রাবলী। শ্রীরূপ গোস্বামী ললিতমাধব নাটকে রাধা ও চন্দ্রাবলীর জন্ম সম্বন্ধীয় এই প্রাচীন রহস্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাধা ও চন্দ্রাবলী মাতৃগর্ভ হইতে বিন্ধ্যমহিষীর গর্ভে সঙ্কর্ষিতা হইয়াছিলেন। প্রসবের পর তথা হইতে অপহৃতা হইবার কালে নদীগর্ভে পতিতা হন, পরে বৃন্দাবনে নীতা হইয়াছিলেন। হয়তো চণ্ডীদাস এই রহস্য অবগত ছিলেন, কিম্বা তাঁহার সময় লোকে যমজ ভগিনীর কথা ভুলিয়া রাধা ও চন্দ্রাবলীকে এক করিয়া ফেলিয়াছিল।

চণ্ডীদাসের সময়ে দেশের অবস্থা তথা সাহিত্যের আবহাওয়া কেমন ছিল ঠিক জানা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, নূতন সুর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, গীতি গাথা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যাহা অনুরূপ স্বরগ্রামে ধ্বনিত হইবার সুযোগ পাইতেছিল না, চণ্ডীদাসের কণ্ঠে তাহা আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহা বিকাশ পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিল।

বৌদ্ধগান ও দোঁহায় অনেক রাগরাগিণীর নাম পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও অনেক রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহার রচনার ধারা মঙ্গলকাব্যের নহে,—এ ধারাকে ঝুমুর বলা চলে। ঝুমুরের আর একনাম ধামালী। শিবের গানের মত কৃষ্ণধামালীও অতি পুরাতন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কি ভাবে গাওয়া হইত অনুমান করা শক্ত। তবে ধরণ দেখিয়া ঝুমুর বলিয়াই মনে হয়। পল্লীর আসরে ঝুমুরের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী—সেকালেতো ছিলই এখনো অনেক স্থানেই আছে। মনে হয়—বর্ত্তমান প্রচলিত কীর্ত্তন, যাত্রা, পাঁচালী কবি বহুলাংশে এই ঝুমুরের নিকট ঋণী।

কতকগুলি স্ত্রীলোক মিলিয়া, অথবা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য ও গীত, ইহাই ঝুমুরের সংক্ষিপ্ত রূপ। রাস হইতে যেমন হল্লীষক, তেমনি হল্লীষক হইতে ঝুমুরের উদ্ভব হইয়াছে। ঝুমুরে নাচিবার সময় পায়ে নূপুর পরিতে হয় এবং আরম্ভের মুখে বিনাগানে কিছুক্ষণ কেবল নাচিতে হয়। মনে হয় গোড়াকার এই নাচের ঝমর ঝমর ধ্বনি হইতেই ঝুমুর নাম চল্ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীত দামোদর বলেন—

প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমুরীর্লোকে বর্ণাদি নিয়মোজ্‌ঝিতা।

—আদি রসের বহুলতা, মাধ্বীকের (দ্রাক্ষাজাত সুরার) মত মধুরতা ও মৃদুতা, আর বর্ণাদির কোন বাঁধা ধরা নিয়ম না থাকাই ঝুমুর গানের লক্ষণ।

ঝুমুর গানে শ্রোতাকে সব কথাই বিস্তারিত ভাবে বুঝাইতে হয়, চাপান উত্তরও পরিষ্কার হওয়া চাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিকেও সর্ব্বদাই শ্রোতাগণকে সম্মুখে রাখিয়া গান রচনা করিতে হইয়াছে, পদে পদে কৈফিয়ৎ তলবের আশঙ্কা! ভাবের মুখে যদিই বা বলিয়া ফেলিয়াছেন "বাঁশার শব্দে মোর আউলাইলো রান্ধন," কিন্তু পরেই তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। রান্ধন আউলানোর অবস্থাটা কিরূপ, তিনি কি রান্ধিতে কি রান্ধিয়াছেন তাহার একটা লম্বা ফর্দ্দ দিয়া তবে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অস্থির, বলিলেন—'মন্মথ-বাণ সহিত পারিতেছি না।' বড়াই অমনি প্রশ্ন করিলেন "কোথা সে মন্মথ কোথা সে বাণ"! বিরহ মাথায় থাকুক এখন বড়াইয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতেই প্রাণান্ত! কানাইকে কোথায় খুঁজিতে হইবে বড়াইকে সমস্ত ঠিক্ ঠিকানা বলিয়া দিয়াও নিস্তার নাই। বড়াই বলিলেন 'কেমনে বেড়ায় কানু কিবা রূপ ধরে' একে একে সব কথা আমায় বল। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র!

ঝুমুরের আর একটি প্রথা দুইদলে সম্বন্ধ পাতাইয়া সম্বন্ধ মোতাবেক পরস্পরকে গালাগালি দেওয়া। প্রাচীন কালে মুখে রং মাখিয়া (রাঙ্গামুখ) কৃষ্ণানুচর ও (কালামুখ) কংসানুচর সাজিয়া দুইদল লোক দ্বন্দ্বের অভিনয় করিত, হয়তো পরস্পরকে গালাগালিও দিত। কিন্তু সেতো ছিল দেব ও দৈত্য সাজিয়া অভিনয়। এ-যে দেবতার সম্বন্ধ লইয়াই গালাগালি। কাশীখণ্ডে সাম্প্রদায়িকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে আছে। বৌদ্ধ প্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের প্রচার কার্য্যেরও অনুমান করা যায়। এইরূপ কোনো কিছু হইতে ঝুমুরে দুইদলে গালাগালি দেওয়ার রীতি আসিয়াছে কিনা অনুসন্ধানের বিষয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ ও রাধিকার ভাগিনেয় ও মামী সম্বন্ধের অজুহাতে প্রেম নিবেদনের সময় প্রথমে রাধিকা এবং পরে কৃষ্ণ দুজনে দুজনকে খুব গালি পাড়িয়াছেন।

এ সব সত্ত্বেও রচনা এবং কাব্যের দিক্ দিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন আলোচনার যোগ্য। তথা-কথিত অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট বলিয়া ইহাকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখা চলিবে না। কারণ 'কৃষ্ণ কীর্ত্তনকেই আদর্শ ধরিয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বিচার করিতে হইবে,' অধুনা এইরূপ একটা

কথা উঠিয়াছে। কথাটী উপেক্ষা করিবার নহে। আমাদের বিশ্বাস পদাবলীর প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস একই ব্যক্তি। সুতরাং আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের দিক্ দিয়াই পদাবলী যাচাই করিয়া লইতে চাই।

বারান্তরে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পরিত্রাণ

(১)

অসময়ে—বেলা গড়াইয়া গেলে, শৈলেশকে আপিসে আসিতে দেখিয়া, তাহার আপিসের বন্ধু বিমল বলিল, " কিরে! ব্যাপার কি ? "

টুপীটা টেবলের উপর রাখিয়া শৈলেশ একগাল হাসিয়া বলিল, "আর চাকরী করছি না—বিলেত যাচ্ছি।"

আপিসের বড়বাবু তখনই সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শৈলেশকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, " শৈলেশ বাবু, ম্যানেজার তোমার ব্যবহারে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রায় কামাই, তার উপর আজ কারখানার কাজে এখন আস্‌ছ। "

উপেক্ষাভরে শৈলেশ বলিল, "আমিত আর চাকরী কর্‌ব না। আজই আমি কাজে ইস্তফা দিতে এসেছি।"

ঘরের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ৮০৲ টাকা বেতনের কাজ। শৈলেশের মত তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত যার বিদ্যা, সে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেয়!

বড়বাবু বলিলেন, "বেশ! দরখাস্ত আজই দিও।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বিমল বলিল, "ব্যাপারখানা কি ? রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপ পেলি নাকি, ভাই ? "

গম্ভীরভাবে, মুরুব্বীয়ানা চালে, কৃষ্ণবর্ণে দেহের উপর প্রকাণ্ড মাথাটা হেলাইয়া শৈলেশ বলিল, "বিলেত যাচ্ছি। ফোরম্যান্ হয়ে বিলিতী সার্টিফিকেট আন্‌তে পার্‌লে রেলে বড় চাকরী মারে কে ?"

লক্ষ্মীনারায়ণ দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছে, সে বলিল, "ভায়া ত বিলেত যাচ্ছ; কিন্তু রসদ যোগাবে কে ? "

উচ্চহাস্যকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া শৈলেশ বলিল, "তার যোগাড় না করে কি যাচ্ছি! শাশুড়ী বেটী প্রথমে দিতে রাজী হয়নি—বিলেত গেলে নাকি মানুষ বাঁদর হয়ে আসে! তারপর দু'এক চাল দিতেই কিস্তিমাৎ। বাবা, ১৫ হাজার টাকার বিষয়ের আয়, একটা ছেলে তার মালিক। মেয়েটা বুঝি ভেসে এসেছে? নগদ ২ হাজার দিয়ে এমন কুলীনের ছেলে সস্তায় পেয়েছে। এখন বিলেতে যাবার খরচ দেবে না?"

বিমল তাহার বন্ধুর সৌভাগ্যে বোধহয় একটু ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সে বলিল, "কিন্তু ঘরে সোমত্ত স্ত্রী!"

নোয়াখালীবাসী চন্দ্রকান্ত স্পষ্টবক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে টানিয়া টানিয়া বলিল, " বিমল বাবুর যে ভারী টান্। সোমত্ত স্ত্রীকে ত আর বিসর্জ্জন দিয়ে যাচ্ছে না!"

লক্ষ্মীনারায়ণ একটা পান মুখে ফেলিয়া, এক টিপ জরদা গ্রহণ করিল। তারপর কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "তা শৈলেশ-ভায়া বিবাহিত জীবন ত বছরখানেক ধরে ভোগ করে এসেছে। এখন কয়েকবছর খাস্ বিলেতের—তা সেখানকার জল হাওয়া ভাল।"

শৈলেশ সম্ভবতঃ বিলাতের—স্বাধীন দেশের, স্বাধীন, মুক্ত জল হাওয়া এবং আনুষঙ্গিক সুখময় জীবন যাপনের মধুর চিত্র কল্পনানেত্রে দেখিয়া আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে তিনবার 'প্রমোশন' না পাইয়া সে দশবৎসর পূর্ব্বে মা সরস্বতীর মুখ-দর্শন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছিল। তারপর নানা কৌশলে সে মার্টিন কোম্পানীর কারখানায় হাতুড়ীপেটা কাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। বিদ্যা না থাকিলেও স্বাভাবিক বুদ্ধি ও শরীরে শক্তি তাহার যথেষ্ট ছিল। সে জানিত, জোগাড়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই চারিবৎসর লোহা পিটাইয়া সে উল্লিখিত কারখানাতেই মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনের একটা কাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশে থাকিতেন। সেখানে সংসার চলিবার মত কিছু সম্পত্তি ছিল। সুতরাং শৈলেশ কলিকাতা সহরে আপনাকে জমীদারের ছেলে বলিয়া কোন কোন স্থানে চালাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

চাকরী হইবার পর শ্যামবাজারের এক ভদ্র-পল্লীর কোনও মেসে সে একটা ঘর ভাড়া লইয়া বেশ পরিচ্ছন্নভাবে থাকিত। বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে তাহার একটা বিশেষ খেয়াল ছিল। পল্লীতে পূর্ব্ববঙ্গের এক জমীদারের একটি বাড়ী ছিল। একমাত্র পুত্র ও একটি বয়স্থা কন্যা লইয়া পরলোকগত জমীদারের বিধবা স্ত্রী সেই বাড়ীতে সম্প্রতি বাস করিতেছিলেন। পুত্রটি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে; কন্যাটিকে কোনও কুলীন ভদ্র সন্তানের হস্তে সমর্পণ করিয়া কন্যা জামাতাকে বাড়ীতেই প্রতিপালন করেন, এমন ইচ্ছা বিধবার আছে জানিতে পারিয়া, শৈলেশ পূর্ব্ববঙ্গের কিশোর জমীদার পুত্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

তাহার বেতন তখন ৭০ টাকা। প্রতিদিন অপরাহ্ণকালে শৈলেশ পরিচ্ছন্নবেশে, এসেন্স-চর্চ্চিত দেহে ললিতের পড়িবার ঘরে আসিত। আপিসে তাহার কাজ ছিল, বেলা ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত। তাহার দেহের বর্ণ কাল হইলেও আবলুসকাষ্ঠ-নিন্দিত নহে। স্বাভাবিক-শ্রী এত কদর্য্য নহে যে, ভদ্রসমাজে অচল। পাত্র বুঝিয়া সে অতি মোলায়েমভাবে আলাপ করিতে বিশেষ দক্ষ ছিল। সুতরাং আজন্ম পল্লী সহরে বর্দ্ধিত ললিতকুমার প্রকৃতই শৈলেশকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। শৈলেশের একটা মস্ত গুণ ছিল, সে মজলিসী। নানা দেশের নানা সংবাদ সে সত্য মিথ্যা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিত।

দুই মাসেই সে ললিতের মাতার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই সে বিধবাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। কথায় কথায় শৈলেশ জানাইয়া দিয়াছিল, সে মহাকুলীনের সন্তান এবং তখনও তাহার কৌমার্য্যের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। শৈলেশের চাল-চলন, বিনয়নম্র ব্যবহার, শোভন আত্মীয়তা এবং তাহার কৌলীন্যমর্য্যাদা বিধবার মনকে তাহার প্রতি অনুকূলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। গোপনে সন্ধান লইয়া তিনি জানিয়াছিলেন, প্রকৃতই শৈলেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান, তবে অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু তিনি ত কন্যাজামাতার পালন ভার লইতে চাহেন, সুতরাং ভাল অবস্থার পাত্র ত ঘরজামাই হইয়া থাকিবে না।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এড়াইবার উপায় নাই। সুন্দরী, তরুণী লীলার সহিত শৈলেশের বিবাহ হইয়া গেল। দেশ হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সাক্ষীগোপাল কর্ত্তারূপে ভ্রাতার বিবাহ দেওয়াইলেন। অবশ্য শৈলেশ নগদ ২ হাজার টাকা হইতে কিছু টাকা বিবাহে ব্যয় করিয়াছিল। বাকি টাকাটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে তাহার নামে জমা ছিল।

বিলাতে গিয়া একটা হোমরা-চোমরা হইবার সাধ তাহার বরাবরই ছিল। জমীদারের জামাতা হইয়া সে সেই সাধ মিটাইবে না? শ্বশ্রূমাতা শ্যালক এবং স্ত্রী তাহাকে বিলাত-যাত্রার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার যথেষ্ট করিয়াছিল; কিন্তু শৈলেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিলাতে না যাইতে দিলে সে হয় বিবাগী হইয়া যাইবে, নয় ত আত্মহত্যা করিবে, এই কথা প্রকাশ করিবার পর অপর পক্ষ হইতে অগত্যা মত দিতে হইয়াছিল; কিন্তু আপিসের বন্ধুদিগের নিকট শৈলেশ সে কথাটা প্রকাশ করিল না।

বিমল একটু ক্ষুণ্ণ মনে বলিল, "তা হ'লে কবে যাচ্ছ?"

"আসছে সপ্তাহে—বোম্বে মেলে।"

"যাও ভাই, ফিরে এসে যেন মনে থাকে।"

হা হা করিয়া হাসিয়া গুরুগম্ভীর চালে শৈলেশ বিদায় হইল।

(২)

তিন বৎসর পরে শৈলেশ গুহ এডিন্‌বরার কোনও কারখানা হইতে ছাপান ডিপ্লোমা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার আগমনে বিরাট পৃথিবীতে কোনও পরিবর্ত্তন না দেখা গেলেও তাহার শ্বশুরালয়ে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ট্রেণ হইতে নামিবার সময়, স্বাধীন দেশের জলহাওয়া এবং আহার্য্যপুষ্ট—বর্দ্ধিতায়তন দেহকে ধুতি ও পাঞ্জাবীতে পরিশোভিত করিয়া শৈলেশ যখন কায়দাদুরস্ত হাসিমুখে, চুরুটিকা শোভিত হস্তে কামরা হইতে বাহির হইল, তখন তাহার বন্ধুবান্ধব এবং শ্যালকও বিস্মিত হইয়াছিল।

শৈলেশ জানিত, স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বিলাতী হ্যাটকোটের মর্য্যাদা অপেক্ষা বাঙ্গালীর ধুতি, পাঞ্জাবীর সম্ভ্রম দেশবাসীর নিকট অনেক অধিক। তাই সে অবলীলাক্রমে গাড়ীর মধ্যে ভোল ফিরাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য সেজন্য তাহার সাহেবীয়ানা-মুগ্ধচিত্ত একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সংসারে যাহারা চালাকীর দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিতে চাহে, মনের বালাই তাহারা বড় একটা আমলে আনিতে চাহে না।

বাড়ীতে বা বন্ধুসমাজে ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবীর বাহার প্রকট হইলেও শৈলেশ 'খানাপিনা' সম্বন্ধে একটা রফা করিয়া লইল। ভাত, ডাল, মাছ তরকারী চলুক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মাটির উপর আসন বা পিড়া পাতিয়া বসিয়া—আরে ছিঃ! সে টেবল ও চেয়ারকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইল। অন্তঃপুরে বাড়ীর লোক ছাড়া আর কেহ ত সে ব্যাপার দেখিতে আসিতেছে না। অন্যত্র, নিমন্ত্রণ সভা প্রভৃতিতে, সামাজিক ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে সে কোন সময়েই পশ্চাৎপদ নহে।

তাহার প্রচণ্ড যুক্তি ও গলাবাজির জোরে অল্পদিনের মধ্যে শ্যালক ও পত্নীকেও টেবলে বসিয়া বিলাতী কায়দায় ভাত তরকারী ভক্ষণে রাজী করাইয়া লইল।

শুধু বিধবা শাশুড়ীকে সে খানার টেবলে তখনও বসাইতে পারে নাই।

বিলাত প্রত্যাগতের শুভকামনায় ছোটখাট উৎসব ভোজ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি মিটিয়া গেল। শৈলেশ গুহ প্রত্যহ ১১টার সময় সুখভোজ্যপুষ্ট বিপুল দেহকে প্যাণ্টকোটে আবৃত করিয়া টুপী মাথায় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দিকে অভিযান করিত। সন্ধ্যার পর দুই একটা ইংরাজী গানের চরণ কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠে সুরে বেসুরে আওড়াইতে আওড়াইতে সে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিত। বিলাত ফেরৎ জামাতার ভোগের জন্য শাশুড়ী ঠাকুরাণী নানাবিধ ফল মূল ও জল খাবারের আয়োজন করিয়া রাখিতেন।

দিনগুলি যেন চির বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

শৈলেশ চাকরীর দরখাস্ত করে নাই এমন কথা নহে, কিন্তু চাকরী সে পায় নাই বা করে নাই। বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নে সে বলিত, ৫ শত টাকা বেতন না হইলে সে কোন চাকরি

করিতে পারেনা—তাহার ইজ্জত নষ্ট হইবে। কিন্তু এই বিশাল ভারতবর্ষে তাহার মর্য্যাদা কেহই বুঝিল না। ৫ শত টাকা প্রাথমিক বেতন দিয়া কোনও রেল কোম্পানি তাহার বিলাতী প্রশংসা-পত্রের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না।

কিন্তু তাহাতে সংসার অচল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। জমীদারের জামাতার রাজভোগ পূরামাত্রাতেই চলিতে লাগিল। বিলাতি ভদ্রতার অনেকগুলি লক্ষণ শৈলেশ গৃহে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লব এবং ঘোড়দৌড়—প্রত্যেক ভদ্রলোককেই ইহাতে যোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক, নহিলে সে ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয়। এ বিষয়ে শৈলশকে কেহ দোষ দিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, লীলার অনেকগুলি অলঙ্কার তাহাদের নিভৃত স্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছে। কিন্তু সে গোপন তথ্যটা বিধবা ও তাঁহার পুত্র ললিত ব্যতীত আপাততঃ অন্যের অগোচর রহিল।

কোন কোন শনিবার সন্ধ্যার পর শৈলেশ তাহার প্যাণ্টের পকেট চাপড়াইয়া অতি প্রফুল্ল-চিত্তে বাড়ী ফিরিত সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে দিন ঝম্‌ঝম্ করিয়া টাকা ও নোটের তাড়া সে লীলার সম্মুখে ফেলিয়া দিত।

শৈলেশের আর একটা গুণ ছিল, বিলাতের কাহিনী সে অসঙ্কোচে গল্প করিয়া যাইত। প্রথমতঃ বন্ধুবান্ধব, পরিশেষে শ্যালক, স্ত্রী ও শাশুড়ীর নিকটও কুণ্ঠাহীনভাবে সে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছিল।

স্বাধীন দেশের, স্বাধীন মতবাদপুষ্টা নারীরা পুরুষের সহিত সময় অসময়ে মিশিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। কি মধুর তাহাদের ব্যবহার। তাহাদের যে কাপড় কাচিত, তাহার কুমারী কন্যা 'কেটি' শৈলেশের 'লেডীফ্রেণ্ড'। প্রতি শনিবারে কেটী তাহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইত। সপ্তাহে উভয়ের মধ্যে তিন চারিখানি পত্র ব্যবহার না হইলে দিন যেন ভারী হইয়া থাকিত। প্রবাসের দুঃখ সে কেটীর জন্য একদিনও অনুভব করে নাই। সে তাহার এমনই অন্তরঙ্গ বন্ধু যে কলিকাতায় আসিবার পরও প্রতি মেলে পত্র লিখিয়া শৈলেশের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। সেও প্রতি মেলে তাহার মধুর, মিষ্ট পত্রের উত্তর দিয়া থাকে।

স্ত্রী তেমন ইংরাজী জানে না, সুতরাং শৈলেশ তাহাকে অনুবাদ করিয়া পত্রের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিত। অবশ্য ইহাতে লীলার আননে যে প্রীতির আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিত এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না।

শ্যালক তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। সে ভগিনীপতির লজ্জাহীনতায় অনেক সময় আরক্তমুখে বলিয়া উঠিত, "শৈলেশ, বিলেতে তুমি যাই করে থাক, আমার ছোট বোন্‌টির কাছে অন্ততঃ একটু সমঝে চল। তোমার কেটীর ঐ অভদ্র ও ইতর ভাষায় লেখা পত্র তুমি অমূল্য সম্পদ বলে কাছে রাখ্‌তে চাও, তাতে আপত্তি করে লাভ নেই; কিন্তু আমাকে ওসব দেখিও না।"

শৈলেশ শ্যালকের এইরূপ কথায় অত্যন্ত চটিয়া উঠিত এবং কয়েকদিন তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিত। ইহাতে ললিতের মাতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িতেন। ললিতও স্নেহাস্পদা ভগিনীর মুখে ম্লান ছায়া দেখিয়া আবার শৈলেশের মনোরঞ্জন করিত।

(৩)

বচনে শৈলেশ স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুরকেও অতিক্রম করিতে পারিত। বিলাতী আবহাওয়ায় তিন বৎসর বাস করায় সে শক্তিটা সত্যের সীমা রেখা ছাড়াইয়া ক্রমে প্রান্তরাজ্যের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

কোন কোন স্পষ্টবক্তা আত্মীয় বা বন্ধু যখন তাহার উপার্জ্জনের পরিমাণ শুনিয়া বলিতেন যে, এমন অবস্থায় তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র স্ত্রীসহ বাস করাই সঙ্গত। তাহার সন্তানাদি হইতেছে, অর্থেরও যখন অভাব নাই, তখন কেন আর শ্বশুরালয়ে 'কায়েম মোকাম্' হইয়া থাকা।

শৈলেশ তখন গম্ভীর হইয়া বলিত, "কি জানেন, ওদের জমীদারীর আয় যা শুনেছেন, তা ঠিক নয়। কর্ম্মচারীরা চুরি করে করে সব নষ্ট করে ফেলেছে। কোন রকমে সদর খাজনা, আর মালেকের টাকা দেওয়া চলে। আমি আছি তাই ওদের দু'বেলা চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চলে। এখন যদি চলে যাই, সেটা ভাল দেখাবে না। সংসার খরচটা ত আমিই দেই।"

শ্রোতা অবশ্য এই নির্জ্জলা সত্য সংবাদে কতটা প্রত্যয় করিতেন, তাহা বলা যায় না, তবে শৈলেশের মুখ যে, এই সংবাদ প্রচার করিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত।

এ সংবাদ যে ললিত ও তাহার মাতার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব ঘটিত তাহা নহে। ললিত মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া ভগিনীপতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিত ; কিন্তু মাতার সান্ত্বনা বাক্যে এবং কনিষ্ঠ সহোদরার মুখ চাহিয়া সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইত।

একদিন শৈলেশ প্রচার করিয়া দিল, সে একটা বড় ইংরাজ কোম্পানীর অংশী হইয়াছে। লাভের চারি আনা অংশ তাহার প্রাপ্য। সে কোম্পানীর ম্যানেজার। কাজের জন্য আপাততঃ তাহাকে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইটালী ঘুরিয়া আসিতে হইবে—ইংলণ্ডেও কয়েকদিনের জন্য যাওয়া প্রয়োজন। খরচপত্র সবই কোম্পানী বহন করিবে। তবে ৫ হাজার টাকা নিজের তহবিল স্বরূপ সঙ্গে না রাখিলে চলিবে না। ললিত ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সে টাকাটা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।

ললিত ইদানীং শৈলেশের ব্যবহারে ভণ্ডামীর পরিচয় পাইয়া তাহার উপর একান্ত বিরূপ হইয়াছিল। শুধু ভগিনীর মুখ চাহিয়া সে শৈলেশের সর্ব্ববিধ উপদ্রব সহ্য করিত। মাতার

ঘরজামাই রাখিবার দুর্নিবার বাসনার ফলেই যে সে অমন চমৎকার মেয়েটীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিত। কিন্তু এখন ত আর উপায় ছিল না।

জামাতার প্রস্তাব শুনিয়া বিধবা জিজ্ঞাসুনেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পানে চাহিলেন। তিনি নিজে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

ললিত তখন মেডিকেল কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে কোন উত্তর করিল না।

শৈলেশ বলিল, "মা, দু' তিন দিনের মধ্যে টাকাটা আমার চাই। ললিতকে বলুন, একখানা চেক্ লিখে দিক্।"

ললিত উজ্জ্বল দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "টাকা দিতে পার্ব না।"

শৈলেশ বোধ হয় এই উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল। সে গম্ভীরকণ্ঠে অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "দিতেই হবে। না দিলে—"

বিদ্রূপ ভরে ললিত বলিল, "তার মানে? না দিলে কেড়ে নেবে না কি?"

শৈলেশ বলিল, 'দর্কার হলে তাও নিতে হবে বৈ কি।"

"বটে!—"

মাতা মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ললিত!"

ললিত আত্ম সংবরণ করিয়া কোটটা আলনা হইতে টানিয়া লইল।

শৈলেশ বলিল, "বিষয়টা তোমার সত্য; কিন্তু তোমার বোনও ত ভেসে আসে নি। তাকে ৫ হাজার টাকা তুমি দেবে না কেন?"

ললিত স্থিরস্বরে বলিল, "বোনকে দেই না দেই, তা জান্বার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার বোন্ সে আমি বুঝব!"

"আর আমি যদি বুঝ্তে চাই!"

"দেখ, শৈলেশ, আমি সোজা বল্ছি, তোমাকে টাকা দিতে পার্ব না।"

শৈলেশ তখন অভিনেতার ন্যায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বলিল, "তবে এও জেনে রাখ, আমি বিলেতে যাচ্ছি, আর ফিরে আস্ব না। কেটীকে নিয়ে সেখানে যা তা করে জীবন কাটাতে পারব। তোমার বোন্ তোমার ঘাড়েই চিরদিনের জন্য থাকবে।"

ললিত মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এই পাষণ্ডের হস্তে সে তাহার মধুরস্বভাবা, সুন্দরী ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছে! লোকটা শুধু হৃদয়হীন নহে, এমন পশু!

সে চাহিয়া দেখিল, তাহার মাতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দরজার অপর প্রান্তে দণ্ডায়মানা সহোদরার অশ্রুসজল নেত্র তাহার সংকল্পকে টলাইয়া দিল।

নত মস্তকে সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, কাল তোমাকে চেক্ দেব।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

(৪)

মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ললিত বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু সংসারে অহেতুক অশান্তির বিরাম ছিল না। অশ্বত্থ বৃক্ষ শত শত পাদশিরার দ্বারা যেমন অট্টালিকার ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া ক্রমেই উর্দ্ধে ও প্রস্থে বাড়িতে থাকে, শৈলেশও তেমনই তাহার পরিবারে দৃঢ়মুল হইয়া বাড়িতেছিল। তাহার হেয় সাহেবীয়ানার প্রভাব অন্তঃপুরকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত। অবশ্য ললিত আধুনিক মতাবলম্বী হইলেও কতকগুলি বিষয়ে সে রক্ষণশীল ছিল। অপরিচিত অথবা সদ্যঃ-পরিচিত কাহারও সম্মুখে নির্ব্বিচারে স্ত্রী ভগিনীকে টানিয়া বাহির করা সে আদৌ সমীচীন বলিয়া মনে করিত না,—ট্রামে বা বাসে দশজনের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখে পরিবারস্থ কোনও নারীকে লইয়া বায়ু সেবনে অথবা থিয়াটার বায়স্কোপ-দর্শনের অত্যন্ত বিরোধী ছিল। মুক্ত আলো ও বায়ু, নারীর পক্ষে পুরুষের ন্যায়ই সমান প্রয়োজন। কিন্তু যে দেশের পুরুষ নারীকে সম্ভ্রমের সহিত দেখিতে ও ব্যবহার করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই আত্মবিস্মৃত দেশের লোকের সম্মুখে নারীকে ঐরূপভাবে বাহির করায় কিছুমাত্র বীরত্ব নাই বরং অপরাধ আছে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। যাহারা যথার্থ ভদ্র এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের, তাহাদের নারীরা খোলা ট্যাক্সী মোটর অথবা ফিটনে চড়িয়া বেড়াইয়া থাকেন কিন্তু ট্রামে বা বাসে চড়িয়া অপরিচিত দশজনের সঙ্গে যাইতে চাহেন না। শৈলেশ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করিত। এজন্য ললিতকে অনেক সময় তাহার অভিজাত সম্প্রদায়ের উদার মতাবলম্বী উচ্চশিক্ষিত আধুনিক বন্ধুগণের নিকট হইতেও তীব্র মন্তব্য শুনিয়া পরিপাক করিতে হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। পল্লীর অনেকের গৃহে শৈলেশ অযাচিত উপদেষ্টা। বৈষয়িক, সাংসারিক অথবা সামাজিক সকল ব্যাপারেই সে অনাহূত হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিত। কোনও পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দজীবন যাপন করিতেছে—দুই ভ্রাতার পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি আছে; কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবিত নাই। শৈলেশ সেই পরিবারে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয় নাই। শৈলেশ বন্ধুত্বের অবকাশে এমনভাবে কথা রটাইয়া দিল যে, বিধবাকে বঞ্চিত করিবার জন্য দেবর গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতেছে। এইত সে দিন রাস্তার জন্য যে জমীটা কর্পোরেশন কিনিয়া লইয়াছে, তাহার একপয়সাও বিধবাটি পাইবে না। ২০ হাজারের প্রত্যেক পয়সাটি দেবরের নামে ব্যাঙ্কের খাতায় জমা হইয়া গিয়াছে। ইত্যাদি।

কথাটার মধ্যে সত্য থাকুক আর নাই থাকুক। সেই সংসারে একটা জটিল সমস্যা গজাইয়া উঠিত এবং পরিশেষে ললিতকে সেজন্য নানা অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইত।

লোক বলিত, মানুষের কাজ কর্ম্ম না থাকিলেই খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করিয়া থাকে। পাড়া-প্রতিবেশীর তাহার সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রীতিকর ধারণা জন্মিলেও শৈলেশ তাহাকে অহেতুক মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিত।

শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ললিত কোনও মফস্বল সহরে সরকারী হাঁসপাতালে চিকিৎসকের কাজ যোগাড় করিয়া লইল। চাকরীর প্রয়োজন না থাকিলেও, হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইলে পরিশেষে সে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। পৈতৃক সম্পত্তি যাহা আছে থাকুক। অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন না হইলে বর্ত্তমানযুগে জীবনযাপন করা অসম্ভব। তাহারও সংসারে নবীন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

গোপনে মাতা-পুত্রে কথা হইতেছিল।

মাতা বলিলেন, "লীলাকে ছেড়ে আমি থাক্‌ব কি করে, বাবা!"

ললিত বলিল, "কেন? লীলাও আমাদের সঙ্গে যাবে। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে থাক্‌বে। সরকারকে হুকুম দিয়ে যাব, মাসে দু'শ টাকার বেশী কলকাতায় খরচ কর্‌বে না। তাতে ওদের বেশ চলে যাবে।"

"তা তুই যে জন্যে পালাচ্ছিস্‌, শৈলেশ যদি সেখানে গিয়ে থাক্‌তে চায়!"

ললিত হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা নেই, মা। কলকাতার এই সব আকর্ষণ ছেড়ে ওরকম পাড়াগাঁয়ে ও দুদিনের বেশী তিন দিন কখন থাক্‌তে পার্‌বে না।"

"আচ্ছা, আমাদের উপর রাগ করে যদি বিলেত-টিলেত চলে যায় তবে লীলার আমার কি হবে?"

ললিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ, মা! বিলেতে যার টাকা নেই, কেউ তার মুখের দিকে চায় না। আর তুমি বুঝি মনে করেছ ওর সেই কেটী না বেটী এখনও ওর আশায় বসে আছে? সে আমি জানি, কবে বিয়ে করে সে সংসার ধর্ম্ম কর্‌ছে। আর যদিই বা যায়, লীলার একটা ছেলে একটা মেয়ে, তাদের ভার আমার উপর। আমি লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানুষ করে দেব। লীলাকে একখানা বাড়ী কিনে দেব, আর হাজার দশেক টাকা তার নামে ব্যাঙ্কে জমা করে রাখ্‌ব। তুমি কিছু ভেব না মা। আমি সব ঠিক করে রেখেছি।"

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পরিত্রাণের আশায় উৎফুল্ল হইয়া ললিত বিদেশ-যাত্রার আয়োজনে মন দিল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

মা

একদা বসন্তে কোন্—পল্লবিত ফুলেল্ ফাল্গুনে
প্রাণ-পুষ্প মম
উঠেছিল প্রস্ফুটিয়া অদৃষ্টের লৌহ-জাল বুনে
দীর্ঘ দৃঢ়তম
তোমার তরুণ অঙ্কে—স্মরণের অতীত দিবসে
মা গো মা আমার !
স্নেহে আর্দ্র চিত্ত তব ভরেছিল কী অমৃত রসে !
ক্ষুধিত আত্মার
মিটেছিল কী পিপাসা !—যুগান্তরের সঞ্চিত বেদনা
মৌন ভাষাহীন
লভিল মুহূর্ত্তে শান্তি—অকস্মাৎ জাগিল চেতনা
অপূর্ব্ব নবীন !

প্রতিষ্ঠিত মাতৃত্বের নিষ্কলঙ্ক রত্ন-বেদী পরে
খোকা কোলে নিয়া
আনন্দ-স্পন্দন তব অঙ্গে অঙ্গে নয়নে অধরে
উঠিল নাচিয়া !
সে দৃশ্য দেখিল শিশু ;—স্বপ্নাতুর মেলি দুটি আঁখি
বুঝেছিল কি ও—
জীবদাত্রী তুমি তার—তুমি তার জগতে একাকী
একান্ত আত্মীয় ?
প্রত্যেক শোণিতবিন্দু, অনুভূতি চিন্তা ও কামনা
সর্ব্বস্ব তাহার,
তোমার অন্তর হতে পেল তারা প্রাণ ও প্রেরণা
নির্দ্দিষ্ট আকার ?

বসন্ত বিদায় নিল, আবার বসন্ত এলো ফিরে
চমকি ভুবন,
মাধুরী উঠিল ফুটি তৃণে পুষ্পে সলিলে সমীরে
আলোকি নয়ন ;

ডাগোর হয়েছে খোকা টলে' টলে' চলে দিকে দিকে
মানা নাহি মানে,
রাজ্যের দুরন্তপনা যত কিছু নিয়েছে সে শিখে
কি করে কে জানে!
অন্ত নাই বায়নার—দুধ খেতে করে সমারোহ
ভোলালে না ভোলে,
ভেঙে চুরে তচ্‌নচ্‌ এটা সেটা করে সে প্রত্যহ,
নাহি রয় কোলে!

সে অশান্ত শিশুটিরে কী কৌশলে বাঁচালে মা তুমি
করি প্রাণপাত,
রঙীন খেলেনা দিলে দিলে বাঁশী দিলে ঝুম্‌ঝুমি
ভরে' দুটি হাত!
কত না বিনিদ্র রাতি শয্যা-প্রান্তে বসি একাকিনী
রুগ্ন শিশু কোলে
কেটেচে তোমার মাগো—উপবাসে মরি কত দিনই
গিয়াছে না চলে'!
পুত্রের কল্যাণ মাগি করিয়াছ দেবতা চরণে
কত না মানত্‌,
অতীত শৈশব কথা থেকে থেকে নড়ে' ওঠে মনে
স্বপ্ন-স্মৃতিবৎ!

কালো ছেলে আলো করে নয়নে অঞ্জন দিলে টানি,
ভালে দিলে টিপ্‌;
নাচাতে আঁখির আগে কয়ে কত অর্থহীন বাণী
সাঁঝের প্রদীপ!
মৃদুল গুঞ্জন করি শুনাইতে ঘুম-পাড়ানিয়া
সুমধুর সুরে,
নীল পাখী লাল ফুল কোথা হতে দিতে যে আনিয়া
ভোলাতে শিশুরে।

সহসা সে একদিন মোহময় রঙীন প্রাসাদ
ভেঙে চুরমার,
চাহিয়া দেখিল খোকা—লভিতে সে জ্ঞানের আস্বাদ
বন্দী পাঠাগার!

ফাঁকে ছেড়ে দিতে তারে কিছুতেই চাহিত না মন,
না দিলেও নয়,
একে সে চঞ্চল শিশু, গাড়ী ঘোড়া পথে অগণন,
কখন কি হয়!
যদি না সে পারে পড়া, লেখা যদি যায় এঁকে বেঁকে
যদি মার খায়!
যদি খোকা ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে মা মা বলে' ডেকে
কি হবে উপায়!
যদি সে অবাধ্য ছেলে পাঠশালে খেলা নিয়ে মাতে
করে হৈ চৈ!
যদি সে কলহ করে তার কোন সহপাঠী-সাথে
ছিঁড়ে দেয় বই!

অসংখ্য আশঙ্কা ভরে থর থর কাঁপিত হৃদয়
দীপশিখা সম!
দারুণ বাজিত বুকে যদি তার ব্যথা কোথা রয়
অতি ক্ষুদ্রতম!
তোমার উদ্বেগ শঙ্কা স্নেহের শ্রাবণ-ধারা মরি
অজস্র অসীম,
জীবনের খর তাপে দগ্ধ-প্রাণ আজো আমি স্মরি
স্নিগ্ধ অকৃত্রিম!
মোর বাল্য শৈশবের ইতিহাসে রয়েছে সে লেখা
পাতায় পাতায়,
সহস্র নয়ন-জলে সে উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষর রেখা
মুছিয়া না যায়!

নাহিক সে দিন আজ কালগর্ভে হয়েছে বিলীন,
তুমি গেছ চলে ;
সংসার শ্মশানে ভ্রমি ডাকি নাই ও সে কত দিন
মা মা মা মা বলে !
জগতের কোলাহল ভেদি উঠে চীৎকার ধ্বনি
নাই নাই নাই !
সে সুন্দর অবয়ব স্নেহ-মণিমাণিক্যের খনি
হয়ে গেছে ছাই !
নির্ম্মম নিষ্ঠুর বাণী কানে যেন বিষ দেয় ঢেলে,
তীক্ষ্ণ শেল বেঁধে,
পৈশাচিক অট্টহাসি হাসে তার লক্ষ জিভ্ মেলে,
মরি আমি কেঁদে !

মিশিয়া গিয়াছ তুমি অনন্তের অমৃত সত্তায়
—দার্শনিক কহে,
আমার বিদ্রোহী আত্মা সে কথায় নাহি দেয় সায়,
কহে—নহে নহে !
নব নব রূপ ধরি জন্মান্তের প্রবাহে ভাসিয়া
চলিয়াছ ছুটে,—
কহে বিজ্ঞ শাস্ত্রবিৎ—মূঢ় মোর সমীপে আসিয়া;
বুক জ্বলে ওঠে !
সেই পরিচিত রূপে পুনর্ব্বার দিবে মোরে ধরা—
জানি আমি জানি,
প্রেম দিয়ে বিধাতার মর্ম্মান্তিক পরিহাস করা—
নাহি আমি মানি।

তোমার উদ্দেশে আজ পাঠালেম অসংখ্য প্রণাম,
লহ মাগো লহ !
শান্তিহীন সুখহীন এ কঠিন জীবন সংগ্রাম
হয়েছে অসহ !

কবে ডেকে নেবে মোরে ?—ঝাঁপ দিয়ে কোলে ছুটে যাবো—
পড়িব লুটিয়া ;
আমার বেদনাগুলি একে একে তোমারে শোনাবো
খুঁটিয়া খুঁটিয়া !
মিশিবে তোমার অশ্রু মোর তপ্ত অশ্রুধারা সাথে
দীর্ঘকাল পরে,
ফুটিবে অশোক চাঁপা মিলনের সেই পূর্ণিমাতে
থরে থরে থরে !

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

(চরিত-কথা)

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চরিতাখ্যান আলোচনা করিবার জন্য সমুপস্থিত হইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, সেই প্রসিদ্ধতম ছয় গোস্বামিপাদ—যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন, শক্তিসঞ্চার ও কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ প্রাণপ্রিয় শ্রীগৌরাঙ্গের উপাস্যত্ব প্রসঙ্গ গৌরাঙ্গ দেবেরই নিষেধক্রমে * আলোচনা করিতে পারেন নাই। একারণ শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রসঙ্গের আলোচনার সৌভাগ্য হইতেও তাঁহাদের বিরত থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের উপরে এরূপ নিষেধ ছিল না, যথা,—মহাকবি কর্ণপুর, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহানুভবগণ, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা এবং তৎসহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-লীলাকথা সবিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের লিখিত বিবরণই আমাদের প্রধান উপজীব্য।

মহাপ্রভুর দ্বিতীয় বিবাহের কারণ।

বিষ্ণুপ্রিয় দেবী মহাপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী। সন্তানহীনা প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর দেহান্তের পর, প্রচলিত রীতি এবং মন্বাদি শাস্ত্রের বিধি (১) অনুসারে মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন।

* মহাপ্রভুর নিষেধ থাকায় ছয় গোস্বামী মহাপ্রভুর উপাস্তত্ব বর্ণনা করেন নাই এবং তাঁহাদের গ্রন্থে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাস্তত্বও বর্ণিত হয় নাই। যাঁহাদের উপর এরূপ নিষেধাজ্ঞা ছিল না, তাঁহাদের গ্রন্থে সেসব আলোচনা আছে।

(১) এবম্বৃত্তাং সবর্ণাং স্ত্রীং দ্বিজাতিঃ পূর্ব্বমারিণীম্।
দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ যজ্ঞ পাত্রৈশ্চ ধর্ম্মবিৎ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পিতার নাম শ্রীসনাতন মিশ্র। তিনি নিষ্ঠাবান, বিষ্ণুভক্ত ও মহাপণ্ডিত ছিলেন ও নবদ্বীপের তৎকালিক প্রধান ব্যক্তি বুদ্ধিমন্ত খানের সভাপণ্ডিতের আসন অলঙ্কৃত করিতেন (২)। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার নাম শ্রীমতী মহামায়া দেবী। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের দুইটী সন্তান হয়। প্রথমা বিষ্ণুপ্রিয়া ও দ্বিতীয় যাদব।

বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতৃ-পরিচয় ও বাল্যজীবন।

"এক কন্যা জনমিল নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।
আর এক পুত্র হইল নামেতে যাদব॥" (শ্রীপ্রেম-বিলাস)

বাসন্তী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দায় বর্ত্তমান নবদ্বীপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মালঞ্চপাড়া নামক স্থানে, পিতৃগৃহে বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম হয়। শিশু বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ-সৌন্দর্য্য অপার্থিব ছিল।

"বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গ জিনি লাখ বাণ সোনা।
ঝলমল করে যেন তাড়িত প্রতিমা॥" (শ্রীলোচন দাস।)

এই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যময়ী কন্যা লাভ করিয়া মিশ্র-দম্পতির আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা যথাকালে কন্যার নামকরণ করিলেন—বিষ্ণুপ্রিয়া। বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া, বার-ব্রত-নিয়মাদি যথাযথভাবে পালন করিতে লাগিলেন। হিন্দু-সংসারের পবিত্র আচারানুষ্ঠান সকল তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। আট বৎসরের কন্যাটীকে লইয়া মহামায়া দেবী প্রতিদিনই দুই তিনবার গঙ্গাস্নানে গমন করেন। পথিমধ্যে মহাপ্রভুর জননী শচীমাতার সহিত প্রায়ই তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। দেখা হইলেই মাতৃ-আদেশে বিষ্ণুপ্রিয়া বিনীত হইয়া শচীমাতাকে প্রণাম করিতেন। শচীমাতা প্রীত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং ভাবিতেন—এই কন্যার সহিত নিমাইয়ের বিবাহ হইলে বড়ই শোভন হয়। তখনিই আবার দুঃখের সহিত মনে মনে বলিতেন—এ দুরাশা, ধনবান সনাতন মিশ্র তাঁহার আদরিণী কন্যাকে দুঃখীর ঘরে কেন দিবেন?

বঙ্গদেশে বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সংখ্যা চিরদিনই অত্যন্ত অল্প। কন্যার বয়োবৃদ্ধির সহিত মিশ্র দম্পতির চিন্তার অবধি নাই। যোগ্যপাত্র অত্যন্ত দুর্লভ হইতেছে। (শ্রীজয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মতে—) এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া সনাতন মিশ্র একদিন ঘটকপ্রবর কাশীনাথ পণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিলেন,—জগন্নাথদেবের আদেশ ও তাঁহার প্রীতির জন্য আমার কন্যাকে যোগ্য পাত্রে দান করিতে হইবে, কিন্তু আমি

বিবাহ।

ভার্য্যায়ৈ পূর্ব্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্ম্মণি।
পুনর্দ্দার ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পুনরাধানমেব চ॥
(মনু ৫ম অঃ, ১৬৮ শ্লোক।)

(২) "বল্লালচরিত" লেখক আনন্দভট্টের মতে বুদ্ধিমন্ত খাঁন্ সে সময়ে নবদ্বীপে রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

তো বুঝিতে পারিতেছি না কিরূপে তাহা সম্ভবপর হয়? কাশীনাথ যেন ভগবৎ আদিষ্ট হইয়া জ্ঞাত হইলেন, সেই যোগ্যবর বিশ্বম্ভর ও তিনি রাজপণ্ডিতকে জানাইলেন—আপনি নিমাইকে কন্যাদান করুন, তাহা হইলেই জগন্নাথ দেবের আদেশ পালিত হইবে। (শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণনা মতে শচীমাতার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কাশীনাথ ঘটক সনাতন মিশ্রের নিকটে এই বিবাহ প্রস্তাব করেন।)

হেন মতে বিদ্যারসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর॥
* * *
সেই নবদ্বীপে বৈসে মহাভাগ্যবান।
দয়াশীল স্বভাব শ্রীসনাতন নাম॥
* * *
তাঁর কন্যা আছেন পরম সুচরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রায় সেই জগন্মাতা॥
শচী দেবী তানে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
সেই কন্যা পুত্রযোগ্যা বুঝিলেন মনে॥
শিশু হইতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান।
পিতৃমাতৃ বিষ্ণুভক্তি বই নাহি আন॥
আইরে (৩) দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে-দিনে।
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্যপতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ॥"
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"একন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা॥"
রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্বগোষ্ঠী সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যাদান নিজ মনে॥

(—শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

কাশীনাথ ঘটক, শচীমাতার পক্ষ হইতে যখন এই বিবাহের প্রস্তাব সনাতন মিশ্রকে জানাইলেন, রাজপণ্ডিত তখন আনন্দে অধীরপ্রায় হইয়া বলিলেন—

মোর ভাগ্য সম ভাগ্য কাহার হইব।
পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দে কন্যা সমর্পিব॥

(চৈঃ মঃ লোচন দাস।)

বৈষ্ণব গ্রন্থ সকলের বর্ণনা হইতে অনুমান হয়, বিবাহ কালে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বেশ জ্ঞান হইয়াছে, সম্ভবতঃ তখন তাঁহার বয়স ১১।১২ বৎসর হইয়াছিল। বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইলে গৌরসুন্দর তাঁহার ভাবী শ্বশুরের আগ্রহাতিশয্যের একটু পরীক্ষা করিলেন। সনাতন মিশ্রের দ্বারা গণকঠাকুর দিন-লগ্নাদি স্থির করিতে শচীমাতার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন, পথে গৌরাঙ্গদেবের সহিত তাঁহার দেখা হইলে তিনি বলিলেন—আগামী কল্য তোমার বিবাহের অধিবাস হইবে। তাহাতে গৌরাঙ্গদেব বলিলেন—কাহার বিবাহ, কোথায় বিবাহ! গণক ঠাকুর তো আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন; যাঁহার বিবাহ তিনিই জানেন না, তবে আর শচীমাতার নিকট গিয়া লাভ কি? তিনি ফিরিয়া আসিয়া সেই বিবরণ সনাতন মিশ্রের নিকট বর্ণনা করিলেন।

---

(৩) চৈতন্যদেবের জননী—শচীমাতাকে এই গ্রন্থকার মান্য করতঃ 'আই' অর্থাৎ মাতামহী (বা পিতামহী) বলিতেন।

কালি শুভ অধিবাস হইবে তোমার।
বিবাহ হইবে শুন বচন আমার॥
এ বোল শুনিয়া তেঁহো করিলা উত্তর।
কহ কোথা কার বিভা কেবা কন্যাধর॥
আমার সাক্ষাতে কথা কহিল এমন।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি কর আচরণ॥

গণক ঠাকুরের বাচনিক এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন মিশ্রের শিরোদেশে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি যে প্রাণময়ী কন্যার বিবাহের জন্য অশেষ প্রকার আয়োজনে ব্যস্ত—বড় আশা গৌরসুন্দরকে কন্যাদান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবেন। তিনি আকুল আবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

নানা দ্রব্য কৈনু আমি নানা অলঙ্কার।
কাহারে বা দোষ দিব করম আমার॥
আমি কোন কিছু অপরাধ নাহি করি।
অকারণে আদর ছাড়িলা গৌরহরি॥
হা-হা গোরাচাঁদ বলি ভূমেতে পড়িলা।
গৌরাঙ্গ-সম্বন্ধ-সুখ ধন হারাইলা॥
ফুৎকার করিয়া কান্দে বোলে হরি-হরি।
তোমা না পাইয়া বিশ্বম্ভর আমি মরি॥

(চৈঃ মঃ জয়ানন্দ।)

এইরূপ ক্রন্দন করিতে করিতে সনাতন মিশ্র, ভগবান জ্ঞানে সেই অভয়শরণ চৈতন্য দেবেরই স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। প্রভু আমার লজ্জা নিবারণ কর, কৃপা কর, বাকদত্তা এ কন্যাকে গ্রহণ কর—নবদ্বীপ সমাজে আমার সম্মান রাখ বলিয়া খেদোক্তি করিতে লাগিলেন।

জয় পাণ্ডবের পরিত্রাণ বিশ্বম্ভরে।
রাখিলে ভীষ্মক বাঞ্ছা বিদর্ভ নগরে॥
জয় রুক্মিনীর বাঞ্ছা রক্ষক মুরারী।
আনিলেন অকুমারী যতেক সুন্দরী॥
তা সবারে করিল বিভা জানি তার মর্ম্ম।
মোর কন্যা বিভা কর তুমি সত্য ধর্ম্ম॥
মোরে ঘৃণা না করিবে পতিত বলিয়া।
কত-কত পণ্ডিতেরে লৈয়াছ তারিয়া॥
জয় বিশ্বম্ভর জগজন ত্রাণদাতা।
জয় সর্ব্বেশ্বর বিধির-বিধাতা॥
মুঞি সে অধমাধম মতি অতি মন্দ।
কভু না পাইল তোর ভজনের গন্ধ॥

স্বামীর দুঃখে সান্ত্বনাচ্ছলে মহামায়া দেবী বলিতে লাগিলেন—তুমি দুঃখ করিও না, আমাদের দুরাশা ভগবানকে জামাতৃরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, ইহাতে দেশের লোকের নিকট নিন্দাভাজন হইবার কিছুই নাই।

আপনে যে বিশ্বম্ভর না করিল কাজ।
তোমারে কি দোষ দিবে নদীয়া সমাজ॥
স্বতন্ত্র পুরুষ সেই সবার ঈশ্বর।
ব্রহ্ম-রুদ্র-ইন্দ্র আদি যাহার কিঙ্কর॥
সেজন কেমনে হইবে তোমার জামাতা।

*　*　*

—(চৈঃ মঃ জয়ানন্দ।)

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও যে কিরূপ কাতর হইয়াছেন তাহা অনুমানসাধ্য। শ্রীগৌর সুন্দরের ন্যায় অপরূপ রূপবান পতি—জ্ঞান-বিদ্যায় যাঁহার খ্যাতিতে বঙ্গদেশ মুখরিত, যাঁহাকে লাভ করিবার বাসনা তিনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পোষণ করিতেছেন—তাঁহার সহিত সমাগত-প্রায় মিলন এরূপে ভঙ্গ হইবে তাহার যে তিনি কল্পনাতেও ভাবিতে পারেন নাই। এইরূপ পরীক্ষা-শেষে অচিরাৎ আকাশ মেঘমুক্ত হইল। চৈতন্যদেব বলিলেন—আমি রহস্যচ্ছলে গণক মহাশয়কে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ধর্ত্তব্য নহে, মা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহার অন্যথা হইবে না। এই বিবাহ অতি আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। নবদ্বীপের তদানীন্তন কালের প্রধান ধনী বুদ্ধিমন্ত খাঁন্ তাঁহার সভাপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের জামাতার পক্ষের সমস্ত ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিমন্তের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া নবদ্বীপ প্রদেশের অন্যতম ধনবান ব্যক্তি মুকুন্দ সঞ্জয়, এই বিবাহের আয়োজন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য ব্যয়ের কতকাংশ গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পরিবারে যেরূপ সামান্য ব্যয়ে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, এ বিবাহে তাহা না হইয়া বিশেষ সৌষ্ঠব সহকারে সম্পন্ন করিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বুদ্ধিমন্ত খাঁন্ বোলে শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিয়া মত কিছু এ বিবাহে নাই॥
এ বিবাহে পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন॥

—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত।)

শুভ শঙ্খধ্বনি এবং বেদপাঠের সহিত অধিবাস সম্পন্ন হইল। ব্রাহ্মণগণকে গুয়া-চন্দন ও মাল্য প্রদান করা হইল। একবার প্রাপ্ত হইয়াও ব্রাহ্মণগণ পুনর্ব্বার চাহিতেছেন দেখিয়া, প্রতি ব্রাহ্মণকে তিনবার করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য বিতরণ করা হইল। সকলে বলিলেন যে, লক্ষেশ্বরেরও এরূপভাবে অধিবাস হয় নাই। যাহা মাটিতে পড়িয়া গেল তাহাতেই বোধ হয় পাঁচটী বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন হয়। অপরদিকে দেবপূজা ও পিতৃপূজাদি সমাপন করিয়া সনাতন মিশ্রও যথাবিধি কন্যার শুভ অধিবাস সম্পন্ন করিলেন।

নিমাইকে বরসজ্জায় সজ্জিত করা হইল, মাল্য-কুঙ্কুম-চন্দনাদি সহ দিব্যবসন ও অলঙ্কারাদিতে তাঁহাকে বিভূষিত করা হইল। তিনি নিজ জননীকে প্রদক্ষিণ ও তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া, নমস্য ও বিপ্রগণকে প্রণামাদি করতঃ সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলে উপবিষ্ট হইলেন। তখনকার সেই ত্রিলোক-ভুলান রূপের বর্ণনা হয় না। একে পূর্ণ যুবক, তাহাতে সেই অপার্থিব রূপ—তখন তাঁহার বয়স একবিংশতি বৎসর মাত্র হইবে, তদুপরি সেই দিব্য-বরসজ্জা, সত্যই তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণনা হয় না। যে প্রাণারাম মাধুর্য্যকে—'রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত' বলিয়া, ভাব সৌন্দর্য্যখনি বৈষ্ণব-সাহিত্য তাহার সকল রসকে নিঃশেষ করিয়াছেন, তাহার কল্পনা হৃদয় মধ্যে করিতে হয়। মানস-মূর্ত্তি গড়িয়া ভক্তিরস-গন্ধে আজ বিশ্বের কত-শত নর-নারী যাঁহাকে গৌর-

দেবতা বলিয়া আরাধনা করিতেছে, মুগ্ধবিস্ময়ে জীবকুল মুক্তি কামনায় সাশ্রুবিনত নয়নে যাঁহার দিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছে, তিনি অন্তরে যেমন অপার গুণসাগর ছিলেন, তেমনি বাহিরেও সুরাসুর-কাম্য অলোক-রূপ-সৌন্দর্য্যের আধারভূত ছিলেন। আজ তাঁহাকে রূপ ও গুণের মুর্ত্তিমান দেবতার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে একপ্রহর দিবা থাকিতে বিবাহের শোভা-যাত্রা বাহির হইল। বহুপ্রকার পতাকা, বাদ্যভাণ্ড, নর্ত্তক ও পদাতিকগণ পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহারা প্রথমে গঙ্গাতীরে আগমন করিলেন। গৌরাঙ্গসুন্দর জাহ্নবীকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে এক প্রহর কাল নবদ্বীপের রাজপথ সমূহে শোভাযাত্রা সহ পরিভ্রমণ করিয়া গোধূলি কালে রাজপণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলেন। কুলপ্রথামত সনাতন মিশ্র পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্রালঙ্কার দিয়া বিশ্বম্ভরকে বরণ করিলেন। সনাতন মিশ্র বলিলেন—বরকর্ম্ম করণায় ভবন্তমাহং বৃণে, বিশ্বম্ভর বলিলেন—ওঁ বৃতোঽস্মি।

মহিলাগণের দ্বারা স্ত্রীআচার হইল। প্রচলিত প্রথানুযায়ী কন্যা দ্বারা পাত্রকে সপ্ত প্রদক্ষিণ করা উভয়ের মাল্য পরিবর্ত্তন এবং শুভদর্শনাদি সম্পন্ন হইল।

তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥

* * *

আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম সমর্পণে॥
তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥

* * *

উচ্চ করি বর কন্যা তোলে হর্ষ মনে।
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে॥

—(চৈঃ ভাঃ।)

অন্তঃপট ঘুচাইল চারি চক্ষে দেখা হৈল
দোঁহে করে কুসুম বিহার।

—(চৈঃ মঃ লোচনদাস।)

এক্ষণে সনাতন মিশ্র, কন্যাকে সভাক্ষেত্রে আনিতে আদেশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপলাবণ্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ-বিস্ময়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। "বিষ্ণু-প্রীতি" কামনা করিয়া সনাতন নিজ দুহিতাকে বিশ্বম্ভরের হস্তে দান করিলেন। যথাবিধি বেদোক্ত মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া নিমাইচাঁদ, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আপন সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন।

তবে সেই সনাতন মিশ্র দ্বিজরতন
কন্যা আনিবারে আজ্ঞা দিল।
রত্ন সিংহাসনে বসি ত্রৈলোক্য রূপসী
অঙ্গ ছটায় বিজুরী পড়িল ॥
—(লোচনদাস।)

তবে রাজপণ্ডিত পরম হর্ষ মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা সম্প্রদানে ॥
* * *
বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা।
প্রভুর শ্রীকরে সমর্পিলেন দুহিতা ॥
—(চৈঃ ভাঃ।)

সনাতন মিশ্র বিবাহের যৌতুকস্বরূপ জামাতাকে প্রভূত দ্রব্যাদি দান করিলেন।

তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥ —(চৈঃ ভাঃ।)

বিবাহের পর পুরমহিলাগণ মঙ্গলধ্বনিসহ বর-কন্যাকে বাসর ঘরে লইতে আসিলেন। গমনপথে লজ্জানতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়ার দক্ষিণ চরণাঙ্গুষ্ঠে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইতেছে দেখিয়া, অন্যের অলক্ষ্যে নিমাই চাঁদ নিজ দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই স্থান চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহাতেই রক্তপাত বন্ধ হইল। (লোচন দাস)।

ভোজনাদির পর বাসর ঘরে পরম আনন্দে রাত্রি অতিবাহিত হইল।

ভোজন করিয়া সুখ রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী কৃষ্ণ একত্র হইলা কুতূহলে ॥
—(চৈঃ ভাঃ।)

বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়া বাসরে বসিলা গিয়া
আইহগণ করে অনুমান।
এই লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণু বিশ্বম্ভর হঞা
পৃথিবীতে কৈল অবধান ॥
—(চৈঃ মঃ।)

কেহো বোলে দেবর হও সম্বন্ধে শালাজ কও
দুহ তত্ত্বে সম্বন্ধ হৈতে পারি।
তোমার প্রেমার বাণী শুনিতে মধুর ধ্বনি
কেহো বোলে পাশরিতে নারি ॥
—(লোচনদাস।)

সনাতন মিশ্র এ বিবাহে অজস্র ব্যয় করেন। তিনি সমবেত নিমন্ত্রিত, ও অনাহূত অতিথিবৃন্দকে যথোচিত-সম্বর্দ্ধনা ও ভোজনাদি করাইয়া আদর আপ্যায়ন করিলেন।

শ্রীরাজপণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে ॥
—(চৈঃ ভাঃ।)

তৎপর দিন প্রাতে যে সমস্ত লোকাচার ছিল, তাহা সম্পন্ন হইল। অপরাহ্ণকালে পাত্র-কন্যার বিদায়ের সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্ব ভুবনের সার॥
অপরাহ্ণে গৃহে আসিবার হৈল কাল। —(চৈঃ ভাঃ।)

অপরাহ্ণকালে নিমাইচাঁদ নববধূসহ নিজগৃহে ফিরিলেন। উভয়ে সমস্ত গুরুজনদের চরণে প্রণাম করিলেন। কন্যা-বিদায়ের দুঃখ এবং হর্ষ মিশ্রদম্পতির নয়নে মুক্তাফলের সৃষ্টি করিল। বাদ্যভাণ্ড ও নটগণের প্রবল রোলে আবার দিগন্ত মুখরিত হইল। মিশ্রগোষ্ঠীর আনন্দধ্বনি, রমণীগণের উলুরব ও বিপ্রগণের আশীর্ব্বাদসহ নবদম্পতি চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিলেন। প্রচলিত প্রথামত কন্যার পিতৃভবনের কাহাকেও তাহার প্রথমবারে শ্বশুর-গৃহে গমন কালে যাইবার জন্য, বিষ্ণুপ্রিয়ার একমাত্র ভ্রাতা যাদবকে মনোনীত করা হইল।

তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্যগণ।
লক্ষ্মী সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ॥

* * *

ঢাক পড়া সানাই বরগোঁ করতাল।
অন্যোন্য বাদ্য করি বাজায় বিশাল॥
—(চৈঃ ভাঃ।)

প্রভু যায় চতুর্দ্দোলে জয়-জয় আনন্দ রোলে
উতরিলা আপন ভবন। —(চৈঃ মঃ।)

এইরূপে সবধূ গৌরচন্দ্র নিজ আবাসে পৌঁছিলেন। শচীমাতার আনন্দের সীমা নাই। উভয়ে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং গুরুজনবর্গকে প্রণাম ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তৎপরে বহির্দ্দেশে আসিয়া বিপ্রগণ ও প্রার্থী আত্মীয়স্বজনকে বস্ত্রাদি দান করিলেন। উদারচেতা ধনিবর বুদ্ধিমন্ত খান্‌কে আলিঙ্গন ও ধন্যবাদ দানে পরিতুষ্ট করিলেন। বাদ্যকর, নট, ভাট প্রভৃতিকে যথোচিত বস্ত্র ও অর্থাদি দানে বিদায় করিলেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া কর ধরি শ্রীবিশ্বম্ভর হরি
গৃহে প্রবেশিলা শুভক্ষণে।
—(চৈঃ মঃ।)

গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হইল সকল ভুবন॥

* * *

তবে যত নট ভাট ভিক্ষুকগণেরে।
তুষিলেন বস্ত্র ধন বচনে সবারে॥
বিপ্রগণ আপ্তগণ সবারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥
—(চৈঃ ভাঃ।)

পরদিনে মহাসমারোহে কুশণ্ডিকা ও পাকস্পর্শ সম্পন্ন হইল। সনাতন মিশ্র অপরিমিত দ্রব্যসম্ভার প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের নরনারীবৃন্দ আজ পরিতোষসহ নিমাই পণ্ডিতের গৃহে ভোজন করিলেন। গৌরসুন্দর নিজে পরমোৎসাহে সকলকে পরিবেশন করিতেছেন। দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণকে আহারাদি করাইতে রাত্রি হইয়া গেল। তৎপরে সকলে জাহ্নবী সলিলে লীলাকৌতুকমগ্ন হইয়া অবসাদ বিদূরিত করিলেন। গৃহে আসিয়া সকলে সানন্দে পানভোজন সমাধা করিলেন। তৎপরে আবার আনন্দ কোলাহল উঠিল। আজ তাঁহাদের ফুল-শয্যা, বিচিত্র বেশ-ভূষায় সাজাইয়া দিতে সখা-সখীগণ উন্মত্ত হইয়াছেন। কিন্তু কোন্ উপকরণে—কি দিয়া তাঁহাদের সাজান যায়, তাঁহারা আপন বিভায় আপনিই যে অপরূপ। সেই নবীন-যুগলের রূপমাধুরীতে সকলেই বিভোর হইলেন।

কেহ বোলে এই হেন বুঝি হর গৌরী। কেহ বোলে এই দুই কামদেব-রতি।
কেহ বোলে হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি॥ কেহ বোলে ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥
কেহ বোলে হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।
এই মত বোলে সর্ব্ব সুকৃতি বনিতা॥
—(চৈঃ ভাঃ।)

সৌন্দর্য্যের যত কিছু উপাদান তাঁহাদের জানা ছিল—প্রসাধনের যে কিছু কলা তাঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন, সকল প্রকারে আজ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াকে সাজান হইল। কিন্তু ফুলের সাজ, চন্দন-তিলক, বিচিত্র বসন-ভূষণ, চূয়া, অগুরু-কেতকী নির্য্যাস—সমস্তই সে যুগল রূপ-মাধুর্য্যের নিকট অতি সামান্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। বোধ হয় পাঠক শ্রেণীর সকলেরই চিত্ত-চকোর সেই যুগল সৌন্দর্য্য ধ্যানে বিভোর হইতেছে। প্রত্যক্ষদর্শী সফল-জীবন কবি লোচনদাস ঠাকুর, তাঁহার মানস-চিত্র-বিলাস-মন্দিরে, বিনোদ-ভাষাকলা-মাধুর্য্য-রসে, ইন্দ্রধনুর-রঙে, প্রেমার-তুলিকা সম্পাতে অমিয়া-মথিত সেই যুগল-মূর্ত্তির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সন্দর্শন করিয়া আমাদের আঁখির পিপাসা কতকাংশে প্রশমিত হউক।

গৌরচন্দ্র চিত্র,—

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো
এক কৈল শুধুই সুনেহ॥
অনুরাগে মথিখানি প্রেমার সাঁচনা দিয়া
কে না গড়িলে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহ লহু-লহু কথাখানি
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥

অখণ্ড পীযুষ ধারা কেনা আউটিল গো
সোনার-বরণ হইল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি ওঠাইল গো
হেন বাসি গোরা অঙ্গখানি॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো
চান্দে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত্র নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥

সকল পূর্ণিমার চান্দে　বিকল হইয়া কান্দে
করপদ পদমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায়　জগৎ করেছে আলো
আঁখি পাইল অনমের অন্ধে॥
এমন বিনোদ রায়　কোথাও দেখিয়ে নাই
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে　কান্দিয়া বিকল গো
নারী কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের রাশি　বিলাস হৃদয়খানি
কে না গড়িল রজ দিয়া।
রদন বাঁটিয়া কেবা　বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে মো মলুঁ কান্দিয়া॥

ইন্দ্রের ধনুক আনি　গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপে যত　কুলের কামিনী গো
দুই হাত করিতে চাহে পাখা॥
রঙ্গের মন্দির খানি　নানা রত্ন দিয়া গো
গঢ়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা　ভাবের বিলাস গো
মদন বেদনা ভাবি কান্দে॥
না চাহে আঁখির কোণে　সদাই সভার মনে
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির পিয়াস দেখি　মুখের লালস গো
আলসল জরজর গায়॥
—(চৈঃ মঃ।)

বিষ্ণুপ্রিয়া-চিত্র—

ফণধর জিনি বেণী মুনি মন মোহে।
কপালে সিন্দুর সে তুলনা দিব কাহে॥
ভুরুভঙ্গ অনঙ্গ সারঙ্গ মনোহর।
শুক-ওষ্ঠ জিনি নাসা পরম সুন্দর॥
কুরঙ্গ নয়ন জিনি নয়ন যুগল।
গৃধিনীর কর্ণ জিনি কর্ণ মনোহর॥
অধর বান্ধুলী জিনি অনুপাম শোভা।
দশন মোতিম জিনি ঝলমল আভা॥
কম্বুকণ্ঠ জিনিয়া জগত মনোহারী।
সিংহগ্রীব জিনিয়া সুন্দর গ্রীমধারী॥
বাহুযুগ কনক মৃণাল শোভা জিনি।
করতল রাতাপদ্ম জিনি অনুমানি॥

অঙ্গুলী চম্পক কলি জিনি মনোহর।
নখ চন্দ্র জিনি শোভা অতি ঝলমল॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া পদ গঢ়িল বিধাতা।
ডগমগ করে পদতল পদ্ম রাতা॥

* * *

গন্ধ চন্দন মাল্যে করাইলা বেশ
বিনি বেশে অঙ্গছটা আলো করে দেশ॥
ত্রৈলোক্য-মোহিনী কন্যা রূপেতে পার্ব্বতী।
অঙ্গের ছটায় ঝলমল করে ক্ষিতি॥

কিন্তু সাধকপ্রবর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের প্রাণ এ চিত্রে তৃপ্ত হইল না, তাঁহার অফুরন্ত ভাণ্ডারে আরও যে সব মণি-মাণিক্য ছিল তাহা দ্বারা মা-কে তিনি সাজাইলেন। যথা,—

কনক দামিনী জিনি অঙ্গের বরণ।
কত কোটী চাঁদ শোভা সুচারু বদন॥
বেণী ভুজঙ্গিনী শোভে নিতম্ব উপরে।
গ্রন্থিত কনক-ঝাঁপ বকুলের হারে॥

কুটিল কুন্তল যেন ভ্রমরের পাতি।
দুই গণ্ড ঝলমল মুকুরের ভাতি॥
কর্ণে সাজে মণিময় কর্ণিকা-ভূষণ।
নিম্নে দোলে স্বর্ণ ঝাঁপা মুকুতা খিচন॥

কর্ণভূষা তার ভয়ে সুবর্ণ শিকলে।
শলাকা সহিতে বদ্ধ করি শ্রুতিমূলে॥
স্বর্ণসূত্রে সূক্ষ্ম মুক্তা করিয়া রচন।
পদ্মরাগ মণি মাঝে সিঁথার বন্ধন॥
কপালে সিন্দুর বিন্দু প্রভাতে অরুণ।
কস্তুরী চিত্রিত তার পাশে সুশোভন॥
মৃগমদ বিন্দু শোভে চিবুক উপরে।
সুরঙ্গ অধরে মৃদু হাস মনোহরে॥
চকিত চাহনি যেন চঞ্চল খঞ্জন।
ভুরুর ভঙ্গিমা দেখি কাঁপয়ে মদন॥
তিল ফুল জিনি নাসা গজমুক্তা দোলে।
গলে চন্দ্রহার তহি মালতীর মালে॥
ছোট বড় ক্রম করি সুবর্ণের হারে।
কণ্ঠদেশে শোভা করিয়াছে থরে-থরে॥
কুচযুগ শোভা স্বর্ণ-কলস জিনিয়া।
কনক-চম্পক কলি উপরে বেড়িয়া॥
চন্দনের পত্রাবলী যাহাতে লিখন।
গজমতি-হারে মণি চতুষ্কি শোভন॥
সুবর্ণ মৃণাল ভুজযুগের বলন।
শঙ্খমণি কঙ্কণাদি তাহে বিভূষণ॥
বাজুবন্ধ বলিয়া বন্ধন ভুজমূলে।
তহি বদ্ধ পট্ট আদি স্বর্ণ-ঝাঁপা দোলে॥
রাঙ্গা করতলাঙ্গুলি মুদ্রিকা মণ্ডিত।
তর্জ্জনীতে শোভে হেম মুকুরে জড়িত॥
পরিধানে শোভে দিব্য পট্ট মেঘাম্বরে।
অঞ্চল নির্ম্মাণ মণি মুকুতা ঝালরে।
গুরুয়া নিতম্ব আর ক্ষীণ মধ্যদেশে।
কিঙ্কিনী রসনামণি তাহাতে বিলাসে॥
রাতুল চরণ-যুগ যাবক মণ্ডিত।
বঙ্করাজ রতন নূপুর বিভূষিত॥
মধুর গমন গতি হংসরাজ জিনি।
চটক গুঞ্জরে যেন নূপুরের ধ্বনি॥*

—(শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত অনুবাদ।)

ক্রমশঃ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

যাত্রার জের

যাত্রা কি এক শুনেছিলাম
অনেক দিবস আগে
আজও তাহার নিবিড় স্মৃতি
বুকের মাঝে জাগে।
ভরাট আসর, মৌন নীরব
স্তব্ধ অযুত প্রাণ,
আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিলে
আবেশ-ভরা গান।

পূর্ণ শশীর উজ্জল আলো
ধূসর বেলা পর,
আলো-ছায়ার কুহেলিকা
রচলে মনোহর।
সেদিন যেন সবাই শ্রোতা
চন্দ্র এবং তারা,
থমকে চলে অজয় নদীর
গীত-পিয়াসী ধারা

* লেখক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শ্রোতা এবং অভিনেতা
সকলে তন্ময়,
বুঝতে নারে সত্য সেটা
কিম্বা অভিনয়।

বহুদিনের সুপ্ত যারা
জাগ্‌ল তারা আজ,
পুরাতনের বোধন যেন
নূতন ধরা মাঝ।
কাব্য এলো মূর্ত্তি ধরে
গঠন দিল সুর,
অতীত যুগের যবনিকা
করলে কে আজ দূর!
কোথা হতে হঠাৎ এলো
অমৃত হিল্লোল,
সরস্বতী দৃশদ্বতীর
জাগলো রে কল্লোল!
রচ্‌লে নূতন বৃন্দাবন আজ
এ কার বাঁশী গান
নূতন করে কালিন্দী হায়
বইলো রে উজান!

জল যে চোখের শুকায়নিকো
ভাঙ্‌লো রে আসর
সুরের ধাঁধাঁ রেখেই গেল
সাবাস যাদুকর।
কেটে গেছে অনেক বরষ
তবু ক্ষণে ক্ষণ,
অচেনা সে দলের লাগি
মন করে কেমন।
উড়ো পারাবতের ঝাঁকের
গুঞ্জিত নূপুর,
রয়ে রয়ে স্মরায় মোরে
সেই সে সুরপুর।
উড়ন্ত সে ভ্রমরগণের
জন্য কাঁদে প্রাণ
অরূপ মাঝে দিলে যারা
রূপেরি সন্ধান।

যাত্রা তাদের এইখানে কি
হয়েই গেল শেষ,
ভাবতেও পাই দারুণ ব্যথা
বড্ড যে হয় ক্লেশ।
সে অভিনয় ফুরায়নিকো
ফুরায়নিকো ভাই।
সুধা যারা বিলায় তাদের
মৃত্যু জরা নাই।
সত্য তারা নিত্য তারা
অনিত্য আর সব,
নূতন করে জগৎ গড়ে
বক্ষেরি বৈভব।
অফুরন্ত আসর তাদের
তেমনি বসে রোজ
চক্রবালের অন্তরালে
পাইনে মোরা খোঁজ।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দশচক্র

(৮)

তখন শ্রাবণ মাস। মসীকৃষ্ণ সমুদ্র তখন দলিতফণ ভুজঙ্গমের মত ফুলিয়া ফুলিয়া তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। এক সপ্তাহকাল শশী জাহাজের কেবিন হইতে বাহির হইতে পারে নাই। এই এক সপ্তাহকাল সে বিছানায় শুইয়া জগচ্চরাচরে কোথাও একটী স্থির পদার্থ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। Beef, ham, kidney, liver, ইত্যাদির নামে তাহার বমি আসিতে লাগিল। বিলাতের অন্ন যাহা কিছু উদরসাৎ করিয়াছিল তাহার শেষ কণাটী পর্য্যন্ত উদগীর্ণ করিয়া সে যখন শুদ্ধচিত্তে গৈরিকবসনা ভাগীরথীর শান্তশীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল, তখন সে প্রাণ খুলিয়াই বলিয়াছিল

"ত্বত্তীরে-তরুকোটরান্তর্গতা গঙ্গে বিহঙ্গো বরং।
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।

এ ভক্তি কিন্তু বেশীক্ষণ রাখা গেল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই শশীর নজরে পড়িল মাঝিদের কাল কাল উলঙ্গ মূর্ত্তি। এমন উলঙ্গ মানুষ সে গত তিন বৎসরের মধ্যে কোথাও দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে কি Zululand-এ প্রবেশ করিতেছে? পোষাকের উপর অবশ্য মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না। কিন্তু পৃথিবীর সভ্যসমাজে এ উলঙ্গদের আসন কোথায়? এই নগ্নকৃষ্ণ মূর্ত্তিগুলা শশীর ভাবাকাশের ঈশানকোণে একখণ্ড কাল মেঘের মত দেখা দিল। তারপর দেখিতে দেখিতে সেখানে যে ঝড় উঠিল তাহাতে তাহার কল্প লোকের ভারতবর্ষ চূর্ণ-দীর্ণ-বিকীর্ণ হইয়া গেল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত জ্ঞানে, প্রেমে, শশীর যোগ ছিল না। ভারতবর্ষ বলিতে সত্যই সে বঙ্গদেশকে বুঝিত। দূর হইতে এই বঙ্গদেশ নভশ্চর জ্যোতিষ্কের মত জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। আজ কাছে আসিতেই দেখা গেল তাহা ইট মাটীর স্তূপ মাত্র। তাহার প্রতি হীনতা, মলিনতা ও বন্ধুরতা শশীর চক্ষুকে পদে পদে ব্যথিত করিতে লাগিল। কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আলোকপাত করিয়া আর সেগুলাকে মহিমান্বিত করা গেল না। একথা সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না যে, বাঙালী তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিরাট দৈত্যটাকে জড়ত্বের ক্ষুদ্র ভাণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, কেবল হাই তুলিয়া জীবন কাটাইতে চায়। সে এম্ এ, পাশ করিবে নোট মুখস্থ করিয়া, দরজী হইবে কাঁচি না ধরিয়া, দেশের গোধন রক্ষা করিবে ভক্তির রসে, এবং পরহস্তকবলিত বাণিজ্যলক্ষ্মীর দিকে কেবল লোলুপ কটাক্ষে চাহিয়া থাকিবে। সে লোকারণ্যের মাঝখানে নিশ্চিন্ত নির্লজ্জ গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রতা অর্জ্জন করিবে, অথচ পরিচ্ছন্নতার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস করিবে না; দুর্গন্ধ জঞ্জাল ঘরের কোণে জমা করিয়া রাখিবে

এবং নিষ্ঠীবনাবনদ্ধ দেয়ালের পার্শ্বে মলিন কন্থায় নাকমুখ গুঁজিয়া পরম নিরুদ্বেগে পড়িয়া থাকিবে। দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে সে গরু, ছাগল, হাঁড়ি, সরার মত ভোগের বস্তু রূপে ব্যবহার করে; অথচ এগুলাকে সুস্থ ও সুন্দর রাখিবার মত তাহার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, ইহাদিগকে নিজের দখলে আট্‌কাইয়া রাখার মত বুকের পাটাও নাই। ভেদ ও নিষেধের ফলা চালাইয়া নিজেকে সে সহস্র খণ্ডে ভাগ করিয়াছে; এই খণ্ডগুলার একটাতে ডাকাত পড়িলে আর একটা উৎফুল্ল হয়। একটার ঘর জ্বলিলে আর একটার গায়ে লাগে না। সে গ্রহণ করিতে জানে না, কেবল বর্জ্জন করিতেই শিখিয়াছে। বর্জ্জন করিতে করিতে **efflorescent salt**-এর মত গুঁড়া হইয়া যাইতেছে, তথাপি চৈতন্য নাই। আকাশ-জোড়া অনাস্থা, আলস্য ও ঔদাসীন্যকে সে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া প্রচার করে; এদিকে গোরা ফিরিঙ্গি, পুলিশ, পিয়ন চাপরাসী, আরদালী সকলের সেলাম জোগাইয়া কোনরূপে ঐহিক প্রাণটা বাঁচাইয়া চলে,—পথে ঘাটে পরের জুতা পরিপাক করিয়া ঘরে আসিয়া সেগুলা উদ্গার করে অসহায় শিশু ও অবলাদের উপর। এই কাপুরুষ জড়ধর্ম্মী হিন্দুর স্বজাতীয় বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে শশীর লজ্জা বোধ হইল। এদিকে কৃশ্চান সমাজে অন্ত্যজ হইয়া থাকিতেও তাহার ইচ্ছা নাই।

সে দেখিল আজ যদি সে মুসলমান হয়, তবে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান তাহাকে কোল দিবে; সে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত একাসনে বসিতে পারিবে, এক পাত্র হইতে আহার করিতে পারিবে। সাম্য ও ঐক্য পৃথিবীর কোথাও যদি থাকে ত ইঁহাদের মধ্যেই আছে। কিন্তু এ সাম্য ও ঐক্য শশীকে লুব্ধ করিল না। সে দেখিল শ্রীক্ষেত্রের সাম্যের মত মুসলমানের সাম্য তাহার নীচকে স্পর্দ্ধিত করিয়াছে, উচ্চকে বিনীত করে নাই, এবং সকলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায় নষ্ট করিয়াছে। কাল যাহারা রাজত্ব করিয়াছে আজ তাহারা রাজমজুর হইয়াই পরিতৃপ্ত। ইহার উর্দ্ধে উঠিবার তাহাদের আগ্রহ নাই, আবশ্যকতাও নাই। মুসলমান সমাজের অতিকায় **Dinosaur** শুধু আয়তনের জোরে কতদিন বাঁচিয়া থাকিবে? মুসলমানের মধ্যে একতা আছে সত্য। কিন্তু শশীর মনে হইল এ একতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা, অসংশয় ও আত্মম্ভরিতার উপর। বিধর্ম্মী মাত্রেই অশ্রদ্ধেয়, জগতে একমাত্র তাহারাই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র; এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ নাই বলিয়া তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। কেহ মুসলমানকে অপমান করিয়াছে শুনিলে, পাড়ার সমস্ত মুসলমান অপমান-কারীকে প্রহার করিতে পারে। প্রশ্ন করে না, বিচার করে না, নিঃসঙ্কোচে প্রহার করিতে পারে ইহাই তাহাদের একতার একমাত্র না হোক, প্রধান নিদর্শন। কোথাও বন্যাপীড়িত, বা দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে উদ্ধার করিবার জন্য মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া আপনার গণ্ডীর বাহিরে ছুটিয়াছে, এমন একটী ঘটনাও শশীর মনে পড়িল না। তাহার মনে হইল অজ্ঞতার নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদেশ-সঞ্জাত এই একতার নিরবচ্ছিন্ন মেঘমালা একটু জ্ঞানের ফুৎকারেই বিচ্ছিন্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

কোন নূতন সমাজে প্রবেশ করিবার পক্ষে সাম্য বা ঐক্যই একমাত্র আকর্ষণ নয়। যাহাদের সমকক্ষ হইতে চাই তাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় কিছু থাকা আবশ্যক। বিরাট মুসলমান সমাজে শ্রদ্ধেয় কোথাও কিছু আছে বলিয়া শশীর জানা নাই। ইতর সাধারণের ন্যায় সে মনে করিত মুসলমান অহিরাবণের মত জন্মগ্রহণ মাত্র হাতিয়ার হাতে দেখা দিয়াছেন এবং তরবারির খোঁচায় নিজের দল পুষ্ট করিয়াছেন। নিরুপদ্রব কাফেরকে কোতল্ করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়,—এই বিশ্বাসে পুষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে একটা রক্তমদিরতা আছে, এবং এই রক্তমদিরতা তাঁহাদের বিশেষ গর্ব্বের বিষয়। এক সময়ে তাঁহারা art-এর চর্চ্চা করিয়াছিলেন; অনেক সময়ে কিন্তু ধর্ম্মের দরবারে art-কে কুর্ণিশ করাইয়া ছাড়িয়াছেন,—তাহাকে তিনপদ অগ্রসর হইতে দিয়া দুই পদ পিছাইয়া দিয়াছেন, তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পরের ভাল যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছেন ভাঙিয়া তচ্‌নচ্‌ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শশী জানিত এতদিনের একটা বিরাট ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার এই ধারণা হয়ত ভ্রমাত্মক। কিন্তু লোকের মনের এই বদ্ধমূল ধারণাকে দূর করিবার দিকে মুসলমানের নিজের ত কোন চেষ্টা দেখা যায় না। ধর্ম্মপ্রচারের দিকে তাহাদের যতটা আগ্রহ আছে, নিজের ধর্ম্মের প্রতি পরের ভক্তি উদ্রিক্ত করিবার দিকে তাহার কণামাত্রও নাই। লোভ বা ভয়কেই ইঁহারা প্রচারকার্য্যে প্রধান সহায় বলিয়া মনে করেন।

শশী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল লাঠির গুঁতায় যে "বিশ্বাস" পরের মনে প্রবিষ্ট করান যায় সে কেমনতর বিশ্বাস!

চিন্তা করিতে করিতে শশী হঠাৎ দেখিতে পাইল যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল একটী মাত্র স্থানে আশ্রয় পাইয়া সে শান্তিলাভ করিতে পারে,—ব্রাহ্মসমাজ। দিগন্ত-প্রসারিত লবণাম্বু-রাশির মধ্যে তালিবনশ্যামল দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ তাহার নয়নমনকে আকৃষ্ট করিল। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা পুরুষ, যাঁহারা কর্ম্মী, যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের সেবা করিয়াছেন, দীনকে সমান আসন দিবার জন্য দীনতাকে বরণ করিয়াছেন, সত্যের জন্য স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং মনুষ্যত্বকে স্থান দিয়াছেন শাস্ত্রের উপর, ইহা তাঁহাদের সমাজ। শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অনুসরণে যাঁহারা নিন্দা বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত অপ্রিয়, অসুন্দর ও অনাবশ্যককে বাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ উন্মাদের ন্যায় সবটা বর্জ্জন করেন নাই, ইহা তাঁহাদের সমাজ। এখানে অন্ধ সাম্য নাই, সখ্য আছে; একতা নাই, সহৃদয়তা আছে। এখানে সে প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা দিতে পারিবে, এবং নিজে অশ্রদ্ধায় নিপীড়িত হইবে না।

সরোজের সাহায্যে সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে স্থির করিল।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত সরোজের নাম জড়িত হইলেই একটী হাস্যকর চিত্র শশীর মনে

জাগিয়া উঠে। একবার এক মৌলবীর সহিত একজন হিন্দুর তর্ক হইতেছিল। সরোজ ও শশী সেখানে উপস্থিত ছিল। মৌলবী বলিলেন "আমরা ত মহম্মদকে একমাত্র প্যায়গম্বর বলিনা। তাঁকে শেষ অবতার বলি। তাছাড়া Jesus, Moses, সকলকেই ত আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে স্বীকার করি।" হিন্দু বলিলেন "আমরাও ত ঐ কথা বলি গো। তবে এত লাঠালাঠি হয় কেন ?"

মৌলবী বলিলেন "আপনারা যে ঈশ্বরকে পুতুল বলিয়া পূজা করেন। এই জন্যই ত আমাদের হিংসা।"

হিন্দু। হিংসা একেবারে ? মনে করুন আমরা বোকা, ভুল বুঝি।

মৌলবী। বলে দেওয়া হচ্চে, তবু ভুল বুঝবেন ?

এই সময়ে সরোজ গায়ে পড়িয়া বলিল "মৌলবী সাহেব, আমাদের ও-দলে ফেল্‌বেন না। আমরা ব্রাহ্ম, পুতুল পূজা করি না। এবং এই জন্য হিন্দু ভায়াদের সঙ্গে আমাদের মোটেই বনিবনাও হয় না।"

মৌলবী। কিন্তু আপনি কি রোজা, নামাজ করেন ?

সরোজ। না, তা করিনা। হাঁ, তা করি না-ই বা কেন। উপাসনা ত করি। আর বাইবেল, কোরান, পুরাণ সব থেকে সারসংগ্রহ করে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তৈরী হয়েছে।

মৌলবী বলিলেন "ও খিচুড়ি ক'রে কিছু হবে না, মশাই। একটা ধরুন। একজন ভাল মৌলবী রেখে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ভাল ক'রে বুঝুন। বুঝে গ্রহণ করুন।"

ঘটনাটী স্মরণ করিয়া শশী হাসিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল ব্রাহ্মেরা উপযাচক হইয়া সকলের সহিত আত্মীয়তা করিতে চায়, কেবল হিন্দু ছাড়া। কৃশ্চান হইবার পর শশীর নিজের মনের অবস্থাও ঐরূপ ছিল। ঠিক তাহারই মত ব্রাহ্মেরা প্রাচ্য মনোভাবের যুথী, মালতীর ডালে কলম করিয়াছেন বিলাতী ভাবের Dahlia, Magnolia-র। এগুলি বিঘ্ন না হইয়া তাহার অনুকূলই হইল। সে দেখিল ব্রাহ্মদের সহিত অনেক বিষয়ে তাহার মনের মিল হইবে।

কেবল একটী কথা ভাবিবার আছে, Lucy যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হয়। তাহাতে তাহার কি ? আশ্চর্য্য! আজও সে Lucy-কে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া মনে করিতেছে! পা কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। এখনও অবর্ত্তমান আঙ্গুলের বেদনা সে ভুলিতে পারিল না।

কিন্তু, নিজের জীবন হইতে Lucy-কে ত সে বাদ দেয় নাই। বাদ দিতে পারিবে বলিয়াও ত মনে হয় না। বাদ দিবার এমন কারণই বা কি ? সে দাস বলিয়া। কে বলিল সে দাস ? সে বা তাহার সন্তানেরা যদি দাস হইতে না চায়, তবে তাহাদের দাস করিবে কে ? নির্ম্মম নির্লিপ্ত রাজশক্তি দুঃখ দিতে পারেন, দাস করিতে পারেন না। প্রভুত্ব বা দাসত্ব একে-

বারেই ব্যক্তিগত। আপামর সাধারণ কোথাও প্রভুও হয় নাই, দাসও হয় নাই। পৃথিবীতে দাসের জাত কোথাও নাই। রাজা-প্রজায় যখন মনের মিল নাই, তখন প্রজার কতকগুলা দুঃখ থাকিবেই। এ রাজা স্বদেশী হউক, কি বিদেশী হউক, একজন হউক, কি দশজন হউক, কিছু আসিয়া যায় না। নেপালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমান পাপে সমান দণ্ড পায় না; রুশিয়ায় দেশের অর্থ, দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়িত হয় না; ফ্রান্সের সকল প্রজা মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবার অধিকার পায় নাই। ইংলণ্ডের minority of autocrats কতবার, অনিচ্ছুক majority-কে যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তনদীতে ডুবাইয়া মারিয়াছেন। কৈ নেপালী, রুশিয়ান ফরাসী, ইংরেজকে ত কেহ দাসের জাত বলে না। ইংরেজের বদলে হিন্দু বা মুসলমান autocrat-এর হাতে পড়িলে ভারতের দুঃখ ঘুচিবে না, দাসত্ব ঘুচিবে; ইংরাজরাজ্য যদি আজ প্রজাতন্ত্র হইয়া পড়ে তবে ভারতবাসীর দুঃখ ঘুচিবে, কিন্তু দাসত্ব ঘুচিবে না; ইহাই কি সত্য? ভারত যদি সত্যই কখনও আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করে তবে তাহার স্বরাজ্য হইতে ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতিকে বহিষ্কৃত না করিলে কি সে স্বাধীন হইবে না? মিথ্যা কথা। দাস সে নয়। তাহার দেশে রাষ্ট্রীয় দুঃখ ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক এইটুকুই সত্য। কেবল এই কারণেই যদি Lucy-কে ত্যাগ করিতে হয়, তবে Russian-এর উচিত নয় American-কে বিবাহ করা। রাষ্ট্রীয় দুঃখ যদি বিবাহের অন্তরায় হয়, তবে প্রাকৃতিক দুঃখই বা হইবে না কেন? তবে রাজপুত কোন সাহসে চেরাপুঞ্জীতে বিবাহ করিবে? মেদিনীপুর কি বলিয়া কলিকাতার মেয়েকে ঘরে আনিবে? না। Lucy-কে সে ছাড়িবে না। ইংরাজের autocracy সেইদিনই ঘুচিবে যেদিন ভারতবাসী তাহার সখা ও স্বজনরূপে বরেণ্য হইবে। ভারতের সেই সুদূর সুচিরেপ্সিত ভবিষ্যৎকে শশী Lucy-র হাতে হাত মিলাইয়া এক পদ অগ্রসর করিয়া আনিবে।

(৯)

শশী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনরূপ যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইলেন Lucy-র পিতা Mr A. W. Kerr স্বয়ং। তিনি Alfred William Kerr হইলেই পারিতেন। তাহা না হইয়া হইয়াছিলেন অরুণোদয় কর, একেবারে খাঁটি বাঙালী, এক্ষণে Blue serge-এর suit পরিয়া একটু "নীলবর্ণঃ সঞ্জাতঃ।" ইনি বিলাতে বিদ্যালাভ করেন। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।' ইঁহাকে কিন্তু বিনয় দিতে পারেন নাই। উপসর্গ একটু বদলাইয়া দিলেন পরিণয়। Kerr সাহেব যখন Civil Service পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সঙ্গে আনিলেন একজোড়া গালপাট্টা ও একটি সিতপক্ষ্ম স্ত্রী। ইনি হিন্দু কৃশ্চান প্রভৃতি সকল সমাজ ও ত-বর্গের প্রায় সব কয়টা অক্ষর বর্জ্জন করিয়া জীবন ব্যাপার বেশ লঘু করিয়া আনিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার মেম সাহেব এক কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন, সের তিনেক সর্ব্বনাশ! এইবার সাহেবের টনক নড়িল। তিনি বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন

তাঁহার hard collar ও খাটো কুর্ত্তার নীচে একটী ভেতো বাঙালী নিতান্ত বেখাপ্পা রকম লট্‌পট্‌ করিতেছে। মেয়ে Shopgirl, Actress বা School mistress হইয়া জীবন কাটাইলে এ ব্যক্তি সুখী হইবেন না। অথচ কোন ভদ্র ইংরাজ বা ভারতবাসী সহজ অবস্থায় তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। একজন যে-সে ফিরিঙ্গীকে ধরিয়া জামাতা করিতেও তিনি রাজী নন। তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল তাঁহারই মত বিলাতফের্ত্তা গোখাদকদের উপর। কিন্তু ভবিষ্যৎ গোখাদকদের তবর্গ বিদ্বেষ কতটা থাকিবে জানা না থাকাতে তিনি কন্যাকে বিলাতী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও উর্দ্দু শিখাইয়াছিলেন এবং লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া নিজেও তাহার সহিত অনেক সময়ে বাংলায় কথাবার্ত্তা কহিতেন।

শশীর মত সুপুরুষকে জামাতারূপে লাভ করিবার সম্ভাবনায় Mr. ও Mrs. Kerr দুজনেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন শশী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া আসিবে! কিন্তু সে আসিল না। কাজের অজুহাতে কেবলি বিলম্ব করিতে লাগিল। তখন ইঁহাদের ভয় হইল সে হয়ত পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পলাইবার কারণ কি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে নিজে কৃশ্চান। জাত খোয়াইবার ভয় রাখে না। তবে একটা কথা,—সে যদি আর কোন পাত্রীকে পছন্দ করিয়া থাকে। কিন্তু Lucy-র চেয়ে ভাল পাত্রী সে আর কোথাও পাইবে নাকি? করসাহেবের একবার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেকালকার দু-একজন বিবাহিত যুবকের মত শশী কেবল খেলার ছলে নারীহৃদয় জয় করিয়া প্রবাস-দুঃখ কমাইতে চাহে নাই ত? এ সন্দেহের উত্তর শশী নিজেই বহিয়া আনিল।

মাসাধিককাল সে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করিতেছিল। Lucy-কে বিবাহ করিবার অধিকার তাহার নাই, এই কথাটা বলিবার মত সাহস সে কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিতেছিল না। সেদিন যেমনি মনে হইল সে অযোগ্য নয়, অপাত্র নয়, অমনি তিনশত মাইল পথ তিন পলকে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এখানে আসিয়া যখন দেখিল Mr. Kerr বাঙালী এবং Lucy বাঙালীর কন্যা, তখন প্রথমটা সে বড় দমিয়া গেল। এতদিন সে Lucy-র সম্পূর্ণ পরিচয় লয় নাই কেন ভাবিয়া তাহার আত্মগ্লানি হইল। এতদিন অকারণ কষ্ট পাইয়াছে ও দিয়াছে বলিয়া অনুতাপ হইল। কিন্তু আজিকার আনন্দের Colossus হতাশা ও অনুশোচনার দুইটা দ্বীপকে পদদলিত করিয়া আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিল।

শশীর অশোভন ঔদাসীন্য লুসীর মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিল। এত দিন পরে সে যে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া যাইবে ইহা অসহ্য। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল শশীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। তাহার কাছে আপনার হৃদয়দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিবে।

কিন্তু শশীর সহিত দেখা হইবামাত্র একটা বিদ্রোহী হর্ষোচ্ছ্বাস হাস্যের ডিনামাইটে তাহার গাম্ভীর্য্যের প্রাচীরে চীড় ফুটাইল। ইহাতে লুসী অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়িল। কারণ, শত্রুর কাছে এতটা দুর্ব্বলতা ধরা পড়িবার পর আর যুদ্ধ করা চলে না।

এ বাড়ীর সকলের ইচ্ছা শুভকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যাক্‌। কিন্তু শশী এখনও কোন পাকা কাজে বহাল হয় নাই বলিয়া বিলম্ব করিতে চাহিল। করসাহেবও ইহাতে সমর্থন করিলেন। সপ্তাহখানেক পরে শশী একটা ভাল চাকুরী পাইবার আশা রাখে। মধ্যের এই সময়টা সে এখানে ছুটি ভোগ করিয়া যাইবে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

কিন্তু মধ্য পথে একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটিল। এখানে আসার পর দিন অপরাহ্নে Lucy-র সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে শশী ডেপুটীবাবুর আয়াকে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আয়া ডেপুটীর baby-কে perambulator-এ করিয়া বেড়াইতে আনিয়াছে।

শশী একবার 'Excuse me' মাত্র বলিয়া ছুটিয়া গিয়া আয়ার সহিত আলাপ করিল। তারপর যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন সে এতই অন্যমনস্ক যে তাহার সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করা চলে না। লুসী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলে শশী আপত্তি করিল না। বরং, আগ্রহের সহিত তাহাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া একাকী বাহির হইয়া গেল।

তাহার ব্যবহার লুসীর কাছে এত বিসদৃশ লাগিল যে সে মাতাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। Mrs. Kerr চিন্তিত হইলেন। তারপর করসাহেব আসিয়া যখন বলিলেন যে তিনি পথে শশীকে একটা আয়ার সহিত গল্প করিতে দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার চিন্তা অতি কুৎসিত আকার ধারণ করিল।

সন্ধ্যার অনেক পরে শশী ফিরিয়া আসিল। তাহার তখনকার মুখ দেখিয়া কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। সে কোন সুযোগ দিল না, ঘরে ঢুকিয়াই বলিল একটী বিশেষ প্রয়োজনে কালই তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।

করসাহেব বলিলেন, 'আয়ামহলে তোমার এক বন্ধু আছে দেখ্‌লুম।'

কথার সুরটী শশীর ভাল লাগিল না। সে উত্তর করিল 'ঠিক্‌ ধরেছেন।'

বাল্যের দুরন্ত শশী আজ সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। করসাহেব কি ইঙ্গিত করিতেছেন তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না। এই বৃদ্ধ সিবিলিয়ান কি মনে করেন সে তাহার কোন গোপন সম্বন্ধ এমনি করিয়া পথে ঘাটে প্রকাশ করিবে? সে এতই অশ্রদ্ধার পাত্র যে তাহাকে সোজাসুজি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এমন করিয়া জেরা করিতে বসিয়াছেন? স্নেহভীরু পিতার সঙ্গত ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করিবার সে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার পোষকতা করিল। করসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁর জন্যই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কল্‌কেতায় যেতে হবে।" সে বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ। একে নিজের কাছে রাখ্‌বো ঠিক করেছি।"

কর। as an aya ?

শশী। না।

কর। as a—as a—

শশী। না।

কর। আয়ার সঙ্গে তোমার প্রকৃত সম্বন্ধ কি আমার জানবার দরকার নেই।—

শশী। জানালেও বুঝতে পারবেন না।

কর। Any way, save me from friends of Aya's.

শশী। লুসীর দিকে ফিরিয়া বলিল "লুসীরও কি সেই মত ?"

'Miss Kerr, please,' বলিয়া লুসী বাহির হইয়া গেল।

কামনার গগনস্পর্দ্ধী Babel Tower অর্দ্ধপথে মিলাইয়া গেল দেখিয়া শশী একটু হাসিল।

* * * * *

Drawing Room-এ বসিয়া লুসী হয়ত পাখার বাতাস খাইবার চেষ্টা করিতেছিল। চেষ্টা সফল হয় নাই। Fanটাকে লইয়া অন্যমনস্কভাবে একবার খুলিতেছিল, একবার বন্ধ করিতেছিল।

এমন সময়ে শশী ঘরে ঢুকিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "May I offer an explanation ?"

লুসী কোন কথা বলিল না। উঠিয়া আসিয়া fan-এর বাড়ি তাহার বামগণ্ডে সজোরে আঘাত করিল, এবং বাহিরের দরজা দেখাইয়া দিয়া ইঙ্গিতে দূর হইয়া যাইতে বলিল।

শশী ইংরাজী কায়দায় একটী ছোট bow করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে এখনও সেই হাসি লাগিয়া আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

আগমনী না চিরন্তনী ?

বঙ্গনারীর আগমনী পড়লুম। বঙ্গনারীর প্রবন্ধ আমরা সকলেই আগ্রহের সহিত পড়ি। তাঁর এক একটি প্রবন্ধ মনকে এত ধাক্কা দেয় যে তাল সামলাতে সময় লাগে। অতএব আগমনী পড়তে ও বুঝতে যে আমার সময় লেগেছে সেজন্য লজ্জিত হবার কারণ দেখি না। কিন্তু বইখানি পড়ে যে আনন্দিত হয়েছি, এই খবরটী ছাপার অক্ষরে বার কোরতে সঙ্কুচিত হচ্ছি। আমার বন্ধুরা জানেন যে আমি ঘোরতরভাবেই স্ত্রীসাম্যের বিরোধী। এ পৃথিবীতে কোথাও, কোন কুলেই সাম্য নেই। সমতা অর্জ্জন করা একপ্রকার অসম্ভব। আদর্শ অবস্থা যদি স্থিরবিন্দু হত' এবং আমাদের অবস্থা ও আদর্শটি যদি কাল প্রবাহের অতিরিক্ত হতে পারত তা'হলে সমতার কিছু মানে থাকত। কিন্তু জীবনের সত্যকারের আদর্শ গতিশীল, অন্তরেই উৎপন্ন, অন্তরেই উপলব্ধ। আবার প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মানুষ বদলে যাচ্ছে। সুতরাং একমানুষই ক্ষণকাল পরে পূর্ব্বের আদর্শ উপলব্ধি কোরতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সাম্য মৃত্যুর চিহ্ন, অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্রের কথা। ন্যায়ের যুক্তি ছেড়ে দিলেও ব্যবহারিক জগতে স্ত্রীর আদর্শ ত পুরুষ! বর্ত্তমানের স্ত্রীশিক্ষা পুরুষেরই তৈরী এবং সে শিক্ষা দাসত্বকে চিরন্তন ও মোলায়েম করবার জন্যই গিল্টি করা লোহার শিকল। এই যেমন আমাদের দেশে কাউন্সিলে যাবার অধিকার, ভোট প্রভৃতি। আদর্শ অন্য দেশের পুরুষ, তার শিক্ষা, দীক্ষা ও পৌরুষ হলে তবু রক্ষা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশের পুরুষ আমাদের দেশেরই স্ত্রীজাতির তুলনায় হীন, কুশিক্ষিত এবং জীবন্মৃত। আমাদের দেশের স্ত্রীসাম্য বাতুলের প্রলাপ। এই প্রকার মত পোষণের সঙ্গে আগমনী পড়ে আনন্দিত হবার বাহ্যতঃ একটী দ্বন্দ্ব আছে। সেইজন্য এতদিন বইখানি সম্বন্ধে নীরব ছিলাম। কিন্তু বইখানি দ্বিতীয়বার পড়ে' বুঝেছি যে দ্বন্দ্ব ভিতরের নয়, নিতান্তই বাইরের। আমি সাম্যবাদ না স্বীকার কোরলেও অন্তরের স্বাধীনতা মানি। স্বাধীনতার আধার অনুসারে স্বাধীনতার সত্তা ভিন্ন হয়ে যায়। আদৎ কথা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা। পুরুষ-জাতির স্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা দুটি আলাদা বস্তু নয়। আলাদা মনে হয় দুটি কারণে। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত পার্থক্য, যেটি পুরুষ ও স্ত্রীজাতির প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই আছে, দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতার প্রতিকূল অবস্থা, অর্থাৎ অত্যাচার। অত্যাচার অনেক প্রকারের। তার মধ্যে বঙ্গনারীর আলোচ্য বিষয় এবং আমার মতে নিষ্ঠুরতম অত্যাচার সমাজের, যাকে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন। বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করবার পর থেকেই দুটি প্রাণী যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হল সেই বন্ধনই দৃঢ়তম। বন্ধন জোর কোরতে গেলে আবদ্ধ প্রাণী দুটির যে জীবন সংশয় হয়ে' ওঠে সেদিকে পুরোহিত মশাইয়ের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি মন্ত্র পাঠ করে দিয়েই খালাস। এই অত্যাচার দূর করা সমাজ-সংস্কারকের কায। আমার মতে সেটি খুব বড়

কাজ নয়, কেননা স্বামীর আজ্ঞায় পর্দ্দা না মেনেও, স্বামীর সোহাগে গলে গিয়েও, স্ত্রীর ব্যক্তিগত সত্তা যেমন অপ্রকাশিত থাকতে দেখেছি, তেমনি স্ত্রীর দ্বারা প্রপীড়িত না হয়েও অনেক পুরুষেরই মনের বালাই নেই দেখেছি। গোড়ার মাটী খুঁড়ে ও কাঁটাবন সাফ কোরলেই যে ঘেঁটুফুল গোলাপ ফুলে পরিণত হবে স্বীকার কোরতে দ্বিধা হয়। মন থাকলেই মনের স্বাধীনতা। বিবাহিত জীবনে—অর্থাৎ সামাজিক-জীবনে, স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরকে সম্বোধন করে বোলতে পারেন, 'নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে'? যে বস্তুর অবর্ত্তমানে বিবাহিত জীবন সুখের হয়, সামাজিক জীবন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শানুযায়ী হয়, পুরোহিত সম্প্রদায় কেবলমাত্র মন্ত্রোচ্চারণ কোরেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় থাকতে পারেন, সেই বস্তুর সন্ধান আগমনীতে পাওয়া যায়। বঙ্গনারীর মূলকথা প্রত্যেক ব্যক্তির মনের স্বাধীনতা। একথা কার্য্যে পরিণত কোরলে বর্ত্তমান সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, সেজন্য অনেকের ক্ষতি হবে, তাঁরা বঙ্গনারীকে গালাগালি দেবেন। যাঁরা লাভ অলাভ খতিয়ে দেখেন না, নিজের নিয়মে, নিজের প্ররোচনায় চলা এবং নিজেকে বুঝে আত্মস্থ ও আত্মজ্ঞানী হওয়াই ব্যক্তির চরম আদর্শ মনে করেন তাঁরাই পুস্তকখানি পড়ে প্রীত হবেন।

যে-কালে প্রত্যেক ব্যক্তির মনের স্বাধীনতা এই নবযুগের প্রধান কথা বোলে বিবেচিত হচ্ছে, তখন বইখানির নাম আগমনী দেওয়া ঠিক হয়েছে বোলেই মনে হয়। কিন্তু নবযুগ কি এখনও আসে নি? রোজই শুনি মুস্কিল আসান আসিতেছেন। অরবিন্দের পণ্ডিচেরী থেকে আসার মতন! কিন্তু যেমন অরবিন্দের বাণী, তাঁর আগমনের অপেক্ষা করে না, তেমনি স্বাধীনতার বাণী কোন নবযুগের অপেক্ষা করে না। যখন বেশীর ভাগ মানুষ চিরকালই পরাধীন, তখন বাণীর ভাষা ও ভঙ্গী নতুন, অর্থাৎ যুগধর্ম্মানুযায়ী হলেও, তার মর্ম্ম চিরন্তন। সেই হিসাবে বইখানির নাম—চিরন্তনী রাখাই উচিত ছিল। শুধু স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার করবার জন্য এমন চিরন্তন সত্যকে নব কলেবর দেওয়ার প্রয়োজন বেশী নেই। স্ত্রীর যদি মন না থাকে, আর স্বামীর যদি মন থাকে, তা হলে স্ত্রী চিরকালই স্বামীর দাসী হয়ে থাকবে। বিপরীত ক্ষেত্রে স্বামী চিরকালই স্ত্রৈণ হবে। এবং দুজনের কারুর যদি ও-বালাই না থাকে তাহলে আদর্শ বিবাহিত জীবন হতে পারে। এ অতি পুরাতন কথা, কিন্তু অতি খাঁটি কথা।

অনেকে বলেন পরাধীনতার বোঝা অদূর ভবিষ্যতে নদীতে নিমজ্জিত গাধার পিঠে নুনের বোঝার মতন আপনি নেমে যাবে। আগামী যুগে প্রত্যেক ব্যক্তি যে স্বরাট হবেন, তা নয়। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি, যাঁর অতীতের সঙ্গে কোনও স্বার্থের সম্পর্ক নেই, আশা করেন সেই যুগে বাঁচতে যখন পুরাতনের সংস্কারগুলি চলে যাচ্ছে এবং নব যুগের সংস্কার তৈরী হচ্ছে, কিন্তু দানা বাধেনি। এই মধ্যস্থিত যুগের অস্তিত্ব ন্যায়শাস্ত্র স্বীকার কোরবে না, কেননা প্রত্যেক যুগই মধ্যস্থিত, কিন্তু ইতিহাসে এই প্রকার যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ রয়েছে। থাকতে বাধ্য, কেননা

ইতিহাসের একমাত্র কাজ ন্যায়শাস্ত্রকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া। বঙ্গনারী বিশ্বাস করেন এই যুগ বন্যার মতন এসে পড়েছে। এই অদূর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষার সম্পর্কেই আগমনী সঙ্গত ও শোভন। যাঁরা এই অনাগতকে ভয় করেন, যাঁদের স্বার্থ নষ্ট হবার আশঙ্কা আছে, যাঁদের কল্পনা মানে স্মৃতি-শক্তির ভাবোচ্ছ্বাস, তাঁরা আগমনীর বোধনকে কয়েদী পালানর সময় জেলের ঘণ্টাই ভাববেন।

দু' একজন পাঠিকা আমাকে বোলেছেন বইখানি বঙ্গনারীর দ্বারা লিখিত হলেও প্রত্যেক বাঙ্গালী পুরুষের জন্য লিখিত। দু' একজন পাঠক ঠিক্ উল্টো কথাই আমাকে বোলেছেন। আমার বিশ্বাস বঙ্গনারী শুধু নারী কিম্বা পুরুষজাতির জন্য বইখানি লেখেন নি'। কেবলমাত্র স্ত্রীজাতির জন্য কোনও মহিলা বই কিম্বা প্রবন্ধ লেখেন না। লিখলে সে রচনার কোনও বিশেষ মূল্য থাকে না। আজকাল মাসিক পত্রিকার standard যে এত নেমে যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ পত্রিকার পাঠকের অপেক্ষা পাঠিকার সংখ্যা বেশী, এবং পাঠিকারা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ গল্পই পড়তে চান। অনেক পাঠকেরাও তাই চান, বাকী পুরুষ পড়েন না, সমালোচনা করেন। শিক্ষিতার সংখ্যা শিক্ষিতের অপেক্ষা কম বোলেই চিন্তাশীল রচনার পাঠিকা ও রচয়িত্রী কম। কিন্তু অন্য কারণ আছে। কারণটি বীরবলই প্রথমে আমাকে ইঙ্গিত করেন, আমারও মনে লেগেছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। তিনি বলেন আমাদের দেশের লেখিকারা নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং স্বভাবানুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টি না কোরে, পুরুষালী ছাঁদে লিখ্‌তে যান। অবস্থার দুর্বিপাকে মেয়েরা জনকয়েক পরকে আপন করেন, আপন কোরে ভালবাসেন, তাঁদের দোষ দেখেন না, এবং আপন জনের জন্য স্বার্থত্যাগ করেন। যাঁরা আপন নয়, তাঁরাই পর, তাঁদেরই দোষ আছে, তাঁরাই মানুষ, দেবতা নন্। স্বজন না হলেই তাঁদের কাছে সকলে দুর্জ্জন; যেমন সমাজের আদিকালে পুরুষের মনোভাব ছিল। সাহিত্য মানুষ নিয়ে কারবার করে। 'আপন নয়' মনোভাবটী আচরণের ক্ষেত্রে, না হয় অনাসক্তি, নয় ঘৃণা, না হয় পরনিন্দা, এবং আর্টের জগতে বহির্মুখিনতা, যেটী নাটক নভেল লেখবার সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পরনিন্দার এই প্রকার বহির্মুখিনতা ও বিপ্রযুক্ত কৌতূহল প্রকাশ পায়। মুখ থেকে কলমে এলেই পরনিন্দা নভেল পদবাচ্য হয়ে ওঠে। সেইজন্য সব বড় নভেলিষ্টই পরনিন্দা কোরতে পারেন এবং যাঁরাই পরনিন্দা করেন না তাঁরা সব মরমী কবিতা লেখেন। এই কারণেই বোধ হয় মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা বড় নভেলিস্ট হবার দাবী রাখেন। কিন্তু দুঃখের কথা বাংলাদেশের মেয়েদের অত বড় দাবী থেকেও তাঁরা বড় নভেলিস্ট হতে পারলেন না। ইংলণ্ডের জেন অষ্টেন, ডারবেগে, ফ্রান্সের জর্জ স্যাণ্ড, সেভিনি, ষ্টেল, মেনটেননের রচনা পরনিন্দার চরম বিকাশ। তাঁদের নভেল কিম্বা চিঠির প্রতি ছত্রে মানুষ অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর, দেহের ও মনের দুর্ব্বলতা, কিম্বা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিলেতে যা হয়, অন্ততঃ যা' হত', এদেশে তা' হয় না কেন? কারণ, বোধ হয় এ দেশের মেয়েদের প্রকৃতি, পাতা থেকে যেমন কাঁটা হয়, তেমনি ধর্ম্মের তাড়নায় খর্ব্ব হয়ে গিয়েছে।

আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি সব ধর্ম্মপ্রাণা। অর্থাৎ পুরুষের মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্মোপদেশ শুনে প্রত্যেক স্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে নিজের স্বভাবকে লোকসমাজের অন্তরালে লুকিয়ে রাখাই পুণ্য। আর্টিষ্ট হচ্ছেন সম্পূর্ণ ব্যক্তি, অসম্পূর্ণতা ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু আর্টের পরিপন্থী। রচনায় যে যেমনটী সে তেমনি ফুটে উঠবে। অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য হবেন এ কথা শুনে, কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা লিখতে গিয়ে সব পুরুষ মানুষ হন্। স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে অমিয়া চৌধুরীর প্রত্যেক লেখাটী পুরুষ মানুষে লিখতে পারতেন। অথচ ঘরে বাইরের মক্ষিরাণীর জা-এর মতন পরিস্ফুট স্ত্রী চরিত্র কোন মহিলা অঙ্কিত কোরেছেন বোলে মনে হয় না। কোন লেখিকা বঙ্কিম, রবিবাবু ও শরৎবাবুর সমান পংক্তিতে—একটু দূরে অবশ্য—বোসতে পারেন কিনা জানিনা। সব লেখিকার লেখাতেই কিরকম শ্রেষ্ঠত্বের অভাব!—অনুরূপা দেবীর লেখাতে খুব বড় আদর্শের কথা আছে, সে আদর্শ পুরুষের, বিশেষ কোরে মহাত্মা ভূদেবচন্দ্রের। সেই জন্য অনুরূপা দেবীর নভেল পড়লে কোনও মহাপুরুষের জীবনী পড়ছি কিম্বা সদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ পড়ছি বোলে মনে হয়, সাহিত্য উপভোগ করছি মনেই হয় না। বঙ্গনারীর আগমনীও সবুজ পত্রের যে কোনও লেখা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য "দেহচর্য্যা ও বেশ ভূষা." "গৃহকর্ম্ম ও নারী", "কেরাণী ও তাঁহার পত্নী" প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্গনারীর গার্হস্থ্য অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু কামিনী সেন প্রথমটি, ৺ভুদেব বাবু দ্বিতীয়টি, ও শৈলজানন্দ তৃতীয়টি বেশ ভাল কোরেই লিখতে পারতেন, মনে হয়। নারীর মূল্য প্রণেতা অনিলা দেবী বাকী প্রবন্ধগুলি লিখতে পারতেন, অবশ্য ভাষা আরও ঝরঝরে হত। কিন্তু সেই তেজ, সেই ঝাঁঝ, সেই কূটতর্ক বুদ্ধি, সেই আন্তরিক সহানুভূতি সেই স্বাধীনতার অদম্য ক্ষুধা, অন্যায় অত্যাচারের সেই বিদ্রোহ সবই এখানে রয়েছে। শুনেছি অনিলা দেবী শরৎবাবুর ছদ্মনাম, এবং এও জানি যে বঙ্গনারী আমার একবন্ধুর ভগ্নী এবং অন্য একটী স্বর্গীয় বন্ধুর জননী। সেই জন্য বলছি পুস্তকখানি নারীর দ্বারা লিখিত হলেও, পাঠিকার মধ্যে পুরুষালী শিক্ষায় শিক্ষিতাদের জন্য, এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল পুরুষের জন্য লিখিত হয়েছে, এবং পুরুষের মনোভাব নিয়েই রচিত হয়েছে। যাঁরা স্ত্রীপুরুষের স্বভাব ভিন্ন ভাবেন এবং শিক্ষা দীক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত ভাবেন, তাঁরা এ বইখানি হয়ত পছন্দ কোরবেন না। যাঁরা স্ত্রীপুরুষের স্বভাব, মনোবিকাশ ও মানসিক পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ভেবেও, উভয়েরই মন আছে এবং প্রত্যেকেরই স্বাধীন হবার বাসনা ও দাবী আছে স্বীকার করেন, তাঁরা বঙ্গনারীকে তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না কোরে থাকতেই পারবেন না।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গিরীশ-স্মৃতি

(৮)

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পূজনীয় মহাত্মা ৺দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের জীবন চরিত লিপিবদ্ধ ক'রে শ্রীযুক্ত গিরীশ বাবুকে তাহা সংশোধন কর্‌তে অনুরোধ ক'রে হস্তলিখিত পুস্তক-খানি গিরীশ বাবুর নিকটেই রেখে যান। শরৎ বাবু পণ্ডিত, বিদ্বান ও ভক্ত; সংস্কৃত স্তোত্রাদি, গীত রচনা এবং স্বামীশিষ্য সংবাদ পুস্তকে ভাবুকতা ও রচনা-নৈপুণ্য তাঁর বেশ প্রকাশ পেয়েছে। ইনি সর্ব্বদা সহাস্যবদন এবং এঁর সরল পবিত্র সঙ্গ বেশ আনন্দপ্রদ। কার্য্যানুরোধে শরৎ বাবু গিরীশ বাবুর নিকট যেতে না পেরে আমাকে বারম্বার অনুরোধ করেন যাতে আমি গিরীশ বাবুকে তাগিদ ক'রে তাঁর রচিত "নাগ মহাশয়" বইখানি গিরীশ বাবুর দ্বারা ভাল ক'রে সত্বর দেখিয়ে নিতে পারি। সন্ধ্যার পর গিয়ে দেখি গিরীশ বাবু ঘরে বসে আছেন, নিকটে দুই একজন পাড়া-প্রতিবেশী রয়েছেন। বোধ হয় তাঁদের মধ্যে কেহ তাঁর চিকিৎসাধীনে ছিলেন। গিরীশ বাবুর নিকট হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসিত হবার জন্য অনেক রোগী আস্‌তেন। গিরীশ বাবুও তাদের বিনামূল্যে ঔষধাদি দিতেন এবং রোগের ব্যবস্থাও ক'রতেন। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর গিরীশ বাবুকে শরৎ বাবুর "নাগ মহাশয়" বইখানি দেখে দিতে অনুরোধ কর্‌লাম আর শরৎ বাবুর সবিনয় অনুরোধ ও আগ্রহ জানালাম। গিরীশ বাবু বল্‌লেন "দেখ শরৎ বইখানি রেখে যাবার পর আমি এতদিনেও একটু সময় কর্‌তে পারিনি। তুমি বইখানি দেখেছ?"

আমি বল্‌লাম—হ্যাঁ দেখেছি তবে সে হিসেবে দেখিনি। নাগ মহাশয়ের জীবনের ঘটনাগুলি আগ্রহভরে পড়েছি।

গিরীশ বাবু। শরৎ ভাল ভাবে put কর্‌তে পেরেছে?

আমি। তাইতো বলছি সে হিসেবে পড়ে দিখিনি। তবে যা তাড়াতাড়ি পড়েছি তাতে ভাল রকম well-arranged হয়নি ব'লে বোধ হয়।

গিরীশ বাবু। ঐযে শরতের বইখানি রয়েছে—তুমি আমাকে প'ড়ে শোনাও আর marginএ পেন্সিলে আমার মন্তব্য লিখে রাখ।

আমি পড়ে গেলাম ও গিরীশ বাবুর মন্তব্য বইএর marginএ নোট ক'রে যেতে লাগলাম।

পরে আর এক অধ্যায় পড়তে তিনি বইখানি রাখ ব'লে বল্লেন "দেখ যা দেখ্‌চি তাতে ভাল রকম arrange কর্‌তে হ'বে, ভালরকম put করা হয় নি। আমার নিজের অবকাশ কম। ব্যাং বাবুকে দিলে ঠিক হ'বে।

ব্যাং বাবু সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসু।

আমি। ব্যাং বাবু কি নাগ মহাশয়ের জীবন ভাল ক'রে দেখে দিতে পারবেন ?

গিরীশ বাবু। ব্যাং বাবু the only reliable person যার উপর এই সব বিষয়ে আমি নির্ভর করতে পারি—বেশ শক্তিশালী লেখক।—তিনি খাঁটী সাহিত্যিক true literary man, তোমার সঙ্গে ভাল আলাপ পরিচয় হয় নি বুঝি ?

আমি। হ্যাঁ, তাঁকে আমি আপনার এখানে অনেক দিন দেখেছি।

গিরীশ বাবু। তুমি তার সঙ্গে আলাপ ক'রো। Literary artএ সে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু সে আমার ছায়ার মত অনুসরণ করে—বড় দুঃখ হয় যে আমার আওতায় থেকে সে প্রকাশ পেলে না!

আমি। ইনি যখন শক্তিশালী লেখক তখন নিজেকে কেন assert করতে পারেন না ?

গিরীশ বাবু। দেখ—ওর আমার উপর এত শ্রদ্ধা আর অনুরাগ যে ও মনে করেনা যে ওর নিজের দেবার কোনও বস্তু আছে। এই রকমই হয়ে থাকে। আবার আমার লেখা ওকে দেখালে ঠিক satisfaction হয়। কারণ আমি ব'লে যাই অন্যলোকে লেখে—ও যদি পড়ে ব'লে, ঠিক আছে তবে আমাকে আর দেখতে হয় না। গানটান সুন্দর রচনা করতে পারে। শরতের "নাগ মহাশয়" দেখে দিতে he is the fittest man—আমার, চেয়ে ও ভাল করবে, কেননা অত thoroughly দেখতে আমি সময় পাব না। বুঝেছ ?

আমি। আজ্ঞা হ্যাঁ। তবে শরৎ তো ব্যাং বাবুকে তেমন জানেনা—বরং আপনি দেখবেন না শুনে সে দুঃখিত হবে।

গিরীশ বাবু। তাকে তুমি আমার নাম ক'রে বলো যে ব্যাং বাবুর উপর ঠিক আমার নিজের মতেই বিশ্বাস আছে। লেখায়, চিন্তায় এবং সাহিত্যিক হিসেবে তাকে আমি কারুর চেয়ে কম মনে করি না। তবে শরতকে বলো ব্যাং বাবু ভাল ক'রে সংশোধন ক'রে দেবার পর শুধু তার খাতিরে আর নাগমহাশয়ের জীবনলীলা ব'লে আমিও বিশেষ ক'রে দেখবো। সে নাগ মহাশয়ের জীবন চরিত ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেনি—ঘটনাগুলি স্তরে স্তরে পারম্পর্য্য রেখে সাজাতে হবে। জীবন চরিত লেখবার প্রধান আর্ট গ্রন্থকার নিজেকে যত পারেন গুপ্ত রাখবেন কিন্তু সে যা লিখেছে তাতে সে নিজেকেই বিশেষ ক'রে প্রচার করেছে। সে সব কেটে ছেটে ঠিক্ ক'রে দিতে হবে। ব্যাং বাবুর সাহায্য না পেলে আমি এর কিছুই ক'রে উঠতে পারবো না। বুঝেছ ?

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি শরতকে ভাল ক'রে বোঝাব। ব্যাং বাবুর কথাও আপনার নাম ক'রে তাকে বলব। ব্যাং বাবু দেখার পর আপনি দেখে দেবেন শুনলেই সে নিশ্চয় খুসী হবে।

গিরীশ বাবু। হ্যাঁ তাকে বলো যে এই গ্রন্থের ভার আমি একমাত্র বিশ্বস্তভাবে ব্যাং

বাবুকে দিতে পারি। সে শুধু suggestions দেবে তা নয়—যেমনটী হ'লে ভাল well-arranged হ'বে—তা সে ক'রে দেবে। সে আমাকে বিশেষ ভক্তি করে, আমি তাকে বিশেষ ক'রে বল্‌বো। সে ঠাকুরকে দর্শন করেছে, মঠের সাধুদের সঙ্গ করে ও তাঁদের প্রগাঢ় ভক্তি করে, সে নাগ মহাশয়কেও বিশেষ ভক্তি করে,—ঠিক যোগ্য পাত্রেই ভার দেওয়া হবে। তাকে ব'লো ব্যাং বাবুর উপর এসব ব্যাপারে আমার খুব faith আছে।

আমি। আচ্ছা, জীবন চরিত লেখায় এত দেখা-শুনা কি? এর ফোটাবেন কি? জীবনের সব ঘটনাগুলি তো লিপিবদ্ধ আছে। সেইগুলিই তো তার মহত্ত্ব ঘোষণা করবে।

গিরীশ বাবু। জীবন-চরিত লেখা বিশেষ ক্ষমতার দরকার। কিছুমাত্র মিছে বা অতি-রঞ্জিত না হয় অথচ চরিত্রে যে বীজগুলি নিহিত আছে তা জীবনের ঘটনার দ্বারা বিশেষ ভাবে দেখাতে হবে। নাগ মহাশয়কে প্রথমে নাগ মহাশয় ক'রে খাড়া করলে তো হবে না। লোকেও তা নেবে কেন? আর তা তো প্রকৃত fact-ও নয়। ছেলেবেলা থেকে মরণ কাল পর্য্যন্ত—তাঁর ভাব, ভাষা, কার্য্যপ্রণালী পর্য্যন্ত কেমন ক'রে সাধারণ থেকে বদলে গেল তা দেখাতে হবে। নাটক নভেলের চেয়েও এক হিসেবে জীবন-চরিত লেখা বেশী শক্ত। কেননা সেখানে কল্পনার খেলা দেখানো চল্‌বে না। সাবধানে চরিত্রের প্রধান বীজ বের ক'রে তাই দেখাতে হয়—তাতে কেমন ক'রে ধীরে ধীরে সেই মহান্ জীবন—বৈচিত্র্যময় হ'য়ে তরুণ শ্যামল বৃক্ষরূপে ফলফুলে লাবণ্য পরিপূর্ণ হ'য়ে ঢল ঢল করতে লাগ্‌লো তাই দেখাতে হয়। কি প্রধান সুরের তরঙ্গে—কি মহান্ ব্রতে—সে জীবন উদ্বেলিত হ'য়ে দীপ্তিময় হ'য়েছিল—জীবন-চরিতে তাই দেখাতে হয়। ঠিক তাঁর ভাব, তাঁর কার্য্যকলাপ—তাঁর জীবনের বাণী কেমন ক'রে ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো, আলো অন্ধকারের দ্বন্দ্বে—ঘাত প্রতিঘাতে তার সৌন্দর্য্য তার মাধুর্য্য কেমন ক'রে বিকশিত হ'তে লাগ্‌লো—ঠিক ঠিক তার জীবনের প্রধান ঘটনার সন্নিবেশ ক'রে সেই আসল মানুষটীর যথার্থ রূপ—প্রকৃত স্বরূপ দেখাতে পারাই জীবন-চরিত লেখকের প্রধান কৃতিত্ব। সেখানে কল্পনা থাক্‌বে না—নিজের ভাবকে মুছে ফেল্‌তে হবে—নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে হবে। এই জন্যই চিন্তাশীল লেখক ইতস্ততঃ করে, ভয় পায় পাছে শিব গড়্‌তে না বানর গড়ে। মহাপুরুষদের জীবন লেখা খুব শক্ত কাজ সন্দেহ নেই। অবতার মহাপুরুষদের জীবন-চরিত যে সে লিখ্‌তে পারে না। যিনি লিখ্‌তে পারেন তাঁকে ব্যাসদেব—ব্যাসাবতার ব'লে সম্মান করা হয়। আমাদের বাংলা ভাষায় ঠিক ঠিক জীবন-চরিত দুর্লভ। দেখ বৈষ্ণব যুগে বৈষ্ণব-সাহিত্য কত গৌরবময় হয়েছিল—জগতের সাহিত্যের প্রদর্শনীতেও এই বাংলা দেশ নিজের সৌন্দর্য্যের গরব দেখাতে পারে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "শ্রীচৈতন্য ভাগবত" "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে"র মত দুইটী গ্রন্থের মত আর গ্রন্থ হয় নি। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে" মহাপ্রভুর লীলা ও লীলার ব্যাখ্যা কি সুন্দর। অথচ দেখ কবিরাজ গোস্বামী ভাবে মিশে গিয়ে নিজেকে গুপ্ত রেখেছেন।

আমি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মত অপূর্ব্ব গ্রন্থ, যে কোনও ভাষায় দুর্লভ। দেখুন কবিরাজ গোস্বামী ষড়্‌দর্শনে পণ্ডিত ছিলেন—নিজে সাধক ছিলেন—৮০ বৎসর বয়সে শ্রীবৃন্দাবন ধামে আদেশ হ'ল, বৈষ্ণব গোস্বামীদের অনুরোধে সেই সাধক দার্শনিক পণ্ডিত যে গ্রন্থ লিখ্‌লেন —সে গ্রন্থ লিখ্‌তে তাঁর প্রায় ১০ বৎসর লেগেছিল—প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে যে গ্রন্থ রচনা শেষ হ'ল—তা' ভক্তিসূত্রের মহাভাষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতের মহাভাষ্য—শ্রীচৈতন্যলীলার মহাভাষ্য। ভক্তিশাস্ত্রে এমন গ্রন্থ আর নেই।

গিরীশ বাবু। ঠিক কথা! মহাপ্রভুর জীবন যাঁর সাধনার লক্ষ্য—সেই সুরে যাঁর নিজের জীবন তন্ত্রের তার বাঁধা—সেই মহান্ চরিত্রের পদতলে যিনি আপনাকে লুটিয়ে দিয়েছেন, তিনি —তাঁর জীবনের লীলাগুলি—সেই প্রফুল্ল নির্ম্মল স্বর্ণকমলের দলগুলি গুটি গুটি করে দেখাবেন না তো আর কে দেখাবেন! মহাপুরুষদের জীবন-চরিত ঠিক সেই লিখ্‌তে পারে—যে সেই ভাবের পায়ে নিজের প্রাণ সত্যি সত্যি বিকিয়ে দিয়েছে—নিজের মান অভিমান নেই। —কতকগুলো প্রাণহীন ঘটনা লিপিবদ্ধ করাই জীবনচরিত নয়।—জীবনচরিত সংবাদপত্র বা মাসিক গল্পসাহিত্য নয়—জীবনচরিত একটা জীবন্ত সাধনা—একটা যুগবাণী—একটা প্রাণ-সঞ্চারিণী সঞ্জীবনী শক্তি-মন্ত্র।—শক্তিমান পুরুষ ছাড়া, সাধক ছাড়া কে তা প্রচার কর্‌তে পারে?

আমি।—তা তো দেখ্‌তে পাচ্চি—আজ পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায় বা কেশব বাবুর ঠিক জীবনচরিত প্রকাশ পায় নি। যা প্রকাশ পেয়েছে—তা কতকগুলো প্রবন্ধাকারে লেখকের বা লেখকদের নিজের ভাবের উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি।

গিরীশবাবু। তাই দেখ সাধারণের প্রাণস্পর্শ কর্‌তে পারে না। দোষ হয় কি জান— যে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত লিখ্‌তে যায় সে মনে করে—সে যেন একজন দ্বিতীয় রামমোহন রায়, বা যে কেশববাবুর জীবন লিখ্‌চে, সে মনে করে দ্বিতীয় কেশব সেন। সে নিজের কথাই বল্‌তে ব্যস্ত—তাঁদের জীবনচরিত—তাঁদের বাণী যেন তার ব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করে! সাধনা কোথায়—আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া কোথায়—সে ভাবের সাধক কোথায়? তুমি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিতে পার—হাজারবার নমস্কার কর্‌তে পার—কিন্তু ঠিক প্রাণ বিলিয়ে দাও নি। তোমার প্রাণ তোমার আছে—তাই তোমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে—তোমার প্রাণ দিয়ে —তোমার ভাব দিয়ে তাদের বোঝাতে যাও আর আসল জিনিষটা ধামা-চাপা প'ড়ে থাকে। —রামমোহনের বা কেশববাবুর কেমন ক'রে কোন্ প্রভাবে জীবন-পদ্ম বিকসিত হয়েছিল, —কোন্ ভাবের সৌরভে তাঁরা মাতোয়ারা ছিলেন—কোন্ বাণী তাঁদের জীবন-পদ্মের দলে দলে ধ্বনিত হয়েছে—তা কে দেখাতে যায়? আমি নিজে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে, আমার সেই ভাবকে কেন্দ্র ক'রে তাদের জীবন-কাহিনী লিখ্‌ব। যে কথাগুলো, যে কাজগুলো

আমার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে তাই মস্ত ক'রে দেখান হ'বে। তাদের ভাবকেন্দ্রকে কে অবলম্বন করে?—আর যে statistics দিয়ে গবেষণা দেখিয়ে লিখে গেল—সে তো মস্ত বাহাদুর। কিন্তু যাঁর জীবনবাণী ঘোষণা করতে যাচ্চ—তা রইল ধামা-চাপা।

আমি। তা হ'লে শরৎকে আমি বল্‌বো যে আপনি ব্যাং বাবুকে বইখানি দেখে সংশোধন করতে দিলেন, পরে আপনি দেখে দেবেন।

গিরীশ বাবু। হ্যাঁ—তাই ব'লো।

তারপর অন্যান্য কথা-প্রসঙ্গে আমাদের দেশীয় যাত্রার কথা উঠ্‌লো।

আমি বল্লাম মশায় আগে যাত্রাগুলোতে একটা নিজস্ব ভাব ছিল—এখন থিয়েটারের অনুকরণে যেন প্রাণহীন হ'য়ে গিয়েছে। থিয়েটার, থিয়েটার হিসেবে ভাল লাগে কিন্তু যাত্রায় থিয়েটারী ভাবের অভিনয় একদম ভাল লাগে না।

গিরীশ বাবু। দেখ আমি যদি কোনও ভাল যাত্রাওয়ালার অধিকারীকে পেতাম তবে একটু তুক শিখিয়ে দিতাম—তাতে যাত্রা popular হ'ত।—যাত্রার দল একেবারে উঠে গেলে দেশের ক্ষতি। দেশের জনসাধারণের ভিতর একটী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান লোপ পাবে। দেশের ভাবের সঙ্গে অবশ্য সংস্কার আবশ্যক। সেইটুকু শুধু বাত্‌লে দিতে চাই।

আমি। আমার বোধ হয় যাত্রাই পূর্ব্বে আমাদের দেশে গ্রাম্য সাধারণের থিয়েটার ছিল। গ্রীকদের প্রাচীন থিয়েটার -আমাদের "রামায়ণ গান" "চণ্ডীর গানের" মত হ'তে হ'তে যাত্রার মত হ'য়ে দাঁড়াল—এইতো আমার ধারণা।

গিরীশ বাবু। তোমার অনুমান কতকটা ঠিক বটে। প্রাচীন গ্রীকেরা এথেনিয়ানেরা কোনও দেবস্থানে দেবপূজার অঙ্গস্বরূপ অভিনয়ের সূত্রপাত করতো। Veritage feast or Dionysus-এর পূজার উৎসবে গ্রাম্য থিয়েটারের উদ্ভব। এই উৎসবে গেঁয়ো চাষারা—দেবতার মহিমাসূচক গান গাইত। সে গান সমবেত কণ্ঠে হ'ত। পরে তার সংস্কার হ'ল—কোরাসের যে মূল গায়েন ছিল—সে হয়তো Dionysus-এর অভিনয় করতো কিম্বা তার লীলাকাহিনী কীর্ত্তন করতো আর কোরাস গায়কেরা ভাবের মাতান তুলে দিত। এই রকমে নাটকের বীজ ধীরে ধীরে উপ্ত হ'ল। কোরাসের এই মাতানো গানগুলির নাম হ'ল Dithyramb. থেস্‌পিস্ এক নটের প্রবর্ত্তন করলেন এই নটের নাম হ'ল Hypocrite কিম্বা উত্তরসাধক। এই নটের সঙ্গে মূল গানের কথোপকথন ছলে Dionysus-এর লীলাকাহিনী বর্ণিত হ'ত—আর কোরাসের দলে গান গেয়ে তাই কীর্ত্তন করতো। এইরূপভাবে যেতে যেতে Æschylus পৌরাণিক গল্প নিয়ে Tragadyর প্রবর্ত্তন করলেন। তিনি আবার আর একটী নটের সৃষ্টি করলেন—তখন দুই নট আর কোরাসের মূল গায়েন কথাবার্ত্তাচ্ছলে মূল বিষয় বর্ণনা করতে লাগ্‌লেন—আর কোরাসের দল গান গেয়ে তাদের অভিনয়ের সাহায্য করতে লাগ্‌লো।—এতে কোরাসের প্রাধান্য চলে

গেল।—কিন্তু আবার Euripidesএর সময়ে মূল অভিনয়ের সঙ্গে কোরাসের বিশেষ কোনও সম্বন্ধই রইল না।

আমি। আচ্ছা মশায় তখন কি stage ছিল—দৃশ্যপট ছিল?

গিরীশ বাবু। থিয়েটার মুক্ত আকাশ-তলেই হ'ত।—Savage Armstrong প্রাচীন গ্রীকদের থিয়েটারের বেশ বর্ণনা করেছেন। তিনি গ্রীসে গিয়ে সে প্রাচীন রঙ্গস্থল দেখেই লিখেছিলেন—

> "This carven seat—while fast the dying day,
> Drenches Hymettus as with ruddy wine,
> And dry Illissus darkens—shall be mine,
> To seat within and dream. And now I stray
> Backward in fancy, and the thick array
> Of faces seems to throng the theatre,
> Bench above bench excited and astir
> While in the Chorus marches and the line
> Of Sophocles in thunder strikes mine ear,
> Ringing around the Acropolis, and I see
> The form of Odipus in magic light
> Torn by the furies of a nameless fear,
> Uplifting his strong arms in agony
> Toward the pale stars and gathering gloom of night."

আমি। আর্ম্মষ্ট্রঙ্গের Garland from Greece পড়্লে কতকটা প্রাচীন গ্রীকদের সমাজ মনে পড়ে। কিন্তু Thymele বা Dionysusএর বেদী রঙ্গস্থলের মধ্যস্থানে স্থাপন ক'রে—কোরাস গেয়ে গ্রীক থিয়েটার আমার মনে স্মরণ করিয়ে দেয় চণ্ডীর গান, রামায়ণ গান। তারপর নয় আস্তে আস্তে কৃষ্ণযাত্রার মত যাত্রায় পরিণত হ'ল।

গিরীশবাবু।—কিন্তু তখনও তো stage বা scene ছিল, orchestra ছিল।

আমি। দর্শক তো থাক্‌তো দশ, বিশ, ত্রিশ হাজার। Sceneএর ভেতর কাঠের পরদায় কি কাপড়ের টুক্‌রোয় একটা মন্দির কিম্বা রাজপ্রাসাদ আঁকা থাক্‌তো—এই তো scene!

গিরীশবাবু।—হ্যাঁ, এখনকার মত দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন ছিল না। কিন্তু আবশ্যক হ'লে ঐ দেবমন্দিরের বা রাজপ্রাসাদের দৃশ্যপটও অভিনয় মধ্যে পরিবর্ত্তিত হ'ত। তা ছাড়া ষ্টেজের পাশে এক রকম ঘূর্ণ্যমান দ্বার থাক্‌তো—তা ত্রিকোণাকৃতি পুরু কাঁচ নির্ম্মিত pivots-এর উপর থাক্‌তো।—এতে নানা রঙের আলোতে দৃশ্যপটের উপর বর্ণবৈচিত্র্য দেখিয়ে একটু পরিবর্ত্তন দেখাতো, আবার দেবতাদের শূন্যে আবির্ভাব দেখাবার জন্যে—"Deus ex machina" ছিল। সদর অন্দর দেখাবার জন্য ষ্টেজের পশ্চাদ্ভাগ উন্মুক্ত কর্‌তো কিম্বা ভিতরটা খুলে দিত। বিশেষ কিছু দেখাতে হ'লে চল্‌তি চক্ররথের উপর রেখে তা দেখিয়ে যেত।—এইগুলো আমাদের দেশের যাত্রা বা রামায়ণ বা চণ্ডীর গান থেকে পৃথক। এইগুলো প্রাচীন গ্রীক রঙ্গালয়ের ক্রমবিকাশ!

আমি। কিন্তু পশ্চিমে রামলীলার তো সাজগোজ দৃশ্যপট আছে।

গিরীশবাবু।—সে আধুনিক থিয়েটারের দেখাদেখি হয়েছে। চিত্রাঙ্কণ আমাদের দেশের পর্ব্বে ছিল—মিছিলের সঙ্গে নানা রকম মূর্ত্তি, অভিনয়ের ছবি দেখাত বটে কিন্তু তা কোনও যাত্রা বা রামায়ণ গান, চণ্ডীর গানের জন্য ব্যবহার হত ব'লে এ পর্য্যন্ত তো দেখা যায় নি।

আমি। আপনি বোধ হয় ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখেন নি?

গিরীশবাবু। না।—তুমি দেখেছ?

আমি। আজ্ঞে হাঁ।—সেই মিছিলে দুই রকমের চিত্রশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়—বড় চৌকী আর ছোট চৌকী।

গিরীশ বাবু। বড় চৌকী কি?

আমি। মিছিল বের হবার আগে দেখা যায় রাস্তার চৌমাথায় কিম্বা রাস্তার prominent place-এ কতকগুলো বাঁশ পোতা হ'য়ে আছে কিন্তু যাই মিছিলের procession চলে গেল অমনি সেই বাঁশগুলি নেই, তার পরিবর্ত্তে সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক ছবি বা কোনও পৌরাণিক ঘটনার অভিনয় জীবন্তভাবে সাজান। সব রঙ্গীন কাগজের তৈয়ারী, বাঁশগুলি সব রঙ্গীন কাগজে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যে আবৃত। খুব artistic—ঢাকার প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শন।

গিরীশ বাবু। আর ছোট চৌকী কি?

আমি। Procession-এর সঙ্গে দেবমূর্ত্তি বিগ্রহের সঙ্গে কুলির কাঁধে যে নানা চিত্র-বিচিত্রে সজ্জিত কোনও মূর্ত্তি বা অভিনয় দেখান হয় তাদেরই ছোট চৌকী বলে। সেগুলোতে শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা আছে। আমি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রেছি কিন্তু ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিলের মতন এমন শিল্প-চাতুর্য্য-পরিপূর্ণ উৎসব দেখিনি। বোধ হয় প্রাচীনকালে এটা একটা বহুদিনব্যাপী বিরাট উৎসব ছিল। আর বোধ হয় বড় চৌকীর সামনে পূর্ব্বে নৃত্যগীতও হ'ত।

গিরীশ বাবু। তার কোনও চিহ্ন দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি?

আমি। না। জিজ্ঞেস ক'রেও বিশেষ জান্‌তে পারি নি।

গিরীশ। তবে ঠিক বলা বড় শক্ত।

আমি। মশায়, গ্রামে গ্রামে দেখা যায় এক রকম পালা গান হয়। মুর্শিদাবাদ বা মালদ'র গ্রামে গ্রামে ঝুমুরের গান খুব চল্‌তি।

গিরীশ বাবু। ঝুমুর কি?

আমি। গ্রামে কোনও উৎসব বা পর্ব্বোপলক্ষে একদল বা কোনও স্থানে দুই দল উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়ে গান করে। সে সব পালা কোন গ্রাম্য কবির রচনা। চাসা-ভুষো নিরক্ষর গ্রাম্য লোকদের দেখেছি যে ঝুমুর শোনবার জন্য পাগল। এতেও কোরাসের গান আছে—মূলগায়েনের

সঙ্গে দলের কেহ কথোপকথন ক'রে সেই পালার ঘটনা বিবৃত করে। আবার আদিরস, হাস্যরস সব রকম রসের অবতারণাও আছে।

গিরীশ বাবু। কতকটা কবির দলের মত বোধ হয়।

আমি। না, কবির দলের মতো নয়। এ না-যাত্রা না-কবির গান, অথচ মাঝামাঝি এক রকম কোরাস গান।

গিরীশ বাবু। প্রাচীন গ্রীকদের অভিনয় বা গান আমাদের প্রাচীন পালা গানের মতই কতকটা ছিল তার সন্দেহ নেই। তবে কি জান—আমাদের দেশে রঙ্গালয়, নাট্যশালা—যাত্রা পালাগান ঝুমুর প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সে হিসেবে তুলনা করতে গেলে ইউরোপীয় যে কোন প্রাচীন জাতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষের তুলনা হ'তে পারে না। রামায়ণে, মহাভারতে যে নাট্যশালার বৃত্তান্ত জানতে পারা যায়, প্রাচীন গ্রীক বা রোমক থিয়েটারের চেয়ে তা ঢের বেশী উন্নত ছিল।

আমি। কিন্তু গ্রীসে নাটক লেখার উদ্ভব হ'ল কেমন ক'রে?

গিরীশ বাবু। সাহিত্যের একটা স্তর আছে। জাতীয় জীবনে প্রথমে এপিকের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। Epic জাতীয় জীবনের গৌরবময় জীবন্ত ছবি—পরিপূর্ণ আদর্শ। একটা জাতির যথার্থ প্রাণ—যথার্থ বীরত্ব—যথার্থ ধর্ম্ম সব পরিস্ফুটভাবে এপিকে প্রকাশ পায়। বাস্তবিক প্রাচীনকালে এই রকম ভাব ও শিল্পের ইমারত কেমন ক'রে সেই আদিম সভ্যতার বিকাশোন্মুখ যুগে গড়তো তা চিন্তা করলে বিস্মিত হ'তে হয়। অমানব প্রতিভা—অতি-মানবের কল্পনা—দ্রষ্টা ঋষি, এই সব মনে করতে হয়। কত হাজার হাজার বছর চ'লে গেল তবুও রামায়ণ মহাভারতের মত এপিক জন্মাল না—ইলিয়াদ ইনিয়াসের মত এপিক আর রচিত হ'ল না। কিন্তু এই এপিকের মূল পুরাণ বা যা আধুনিকেরা বলেন mythology.

আমি। মশায়, আমি কিন্তু আমাদের পুরাণগুলিকে mythology বলতে নারাজ—আমাদের পুরাণ তো myth নয়।

গিরীশ বাবু। সে সব আলোচনা তর্কের বিষয়। আমি তা বলছি না। যে ভাবেই হোক এই পুরাণ বা mythology Epic-এর অগ্রদূত। আবার Epic আর mythology-র সংমিশ্রিত প্রভাবে ধীরে ধীরে নাটকের সৃষ্টি। গ্রীক-সাহিত্যে আমরা দেখতে পাই cyclic Poets ব'লে এক জাতীয় কবির দল গ্রীক Epic ও গ্রীক পুরাণ থেকে কবিতা বা গীত রচনা করতো। Proclus গদ্যে এই cyclic poetsদের রচনার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন। Æschylus এই source থেকে তাঁর নাটকের বিষয় নিয়েছেন। যদিও তিনি বলেছেন যে, তিনি হোমরের বিরাট ভোজ থেকে কয়েকটি কণিকা সংগ্রহ ক'রে তার ট্র্যাজেডি রচনা করেছেন, তবুও তাঁর বলবার ভঙ্গী হোমরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শুধু ভাষায় ছন্দে প্রভেদ নয়—এপিক আর

নাটকে যে প্রভেদ—হোমার থেকে Æschylus-এর রচনার সেই প্রভেদ। অথচ গ্রীক পুরাণ থেকে দুই জনেই উপকরণ সংগ্রহ ক'রেছেন। আমাদের দেশেও তাই ঘটেচে। সংস্কৃত নাটকের উপকরণ পুরাণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। মহাভারতের শকুন্তলা আর কালিদাসের শকুন্তলা কত প্রভেদ। এপিক ও নাটকের এই পার্থক্য।

আমি। কিন্তু মশায় Æschylus বলুন, Sophocles বলুন, Euripides বলুন এরা কি ঠিক নাটক রচনা করেছেন—আমার বোধ হয় এঁরা ঠিক বাংলার মত পালাগান রচনা করেছেন।

গিরীশ বাবু। কিন্তু জেন পালাগানই নাটকের আদিম অভিব্যক্তি। তবে নাটকের প্রধান প্রাণ actions গ্রীক নাট্যকারদের ভেতর আছে। ঘটনা,—actions—Euripidesএর—নাটকে বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। Trilogy—পালাগানের মতই একরকম চলন ছিল। Orestia, Choepphori আর Eumenides এই তিন ট্র্যাজেডিতে Æschylusএর Trilogy শেষ হ'ত। Sophocles নটদের সুন্দর চাকচিক্যময় পোষাক আর অলঙ্কারে সুসজ্জিত ক'রে অভিনয় করাতে লাগলো। গীতের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে বার জনের পরিবর্ত্তে পনেরো জন দিয়ে কোরাস্-দল গঠিত ক'র্‌লে। নটের সংখ্যাও একজন বৃদ্ধি কর্‌লে। দেবচরিত্রে পৌরাণিক চরিত্রে মানুষের আবছায়া ভাবের প্রকাশ কর্‌লেন। আর নটের সংখ্যা-বৃদ্ধি করাতে নাটকীয় কথোপকথনে নাটকের সৌন্দর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হ'তে লাগ্‌লো।

আমি। কিন্তু মশায়, Euripides তো প্রাচীন গ্রীক নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। Milton এঁরই নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন,—

"The repeated air
Of sad Electra's poet had the power
To save the Athenian walls from ruin bare!

যখন Peloponnesian war শেষ হয়—বিজয়ী Lysander সেনাপতির দল নিয়ে ভোজোৎসবে মত্ত হ'য়ে এথেন্সকে ভূমিসাৎ ক'রে ভেড়া চর্‌বার মাঠে পরিণত কর্‌বার কল্পনা আর প্রস্তাব কর্‌ছিলেন তখন একজন Phocian, Euripides রচিত Electra নাটক থেকে Agamemnonএর কন্যার শোচনীয় বর্ণনা আবৃত্তি করতে লাগ্‌লো। বিজয়ী Lysander এবং সমাগত সেনানীবৃন্দ কবির সেই মর্ম্মভেদী বর্ণনা শুনে বর্ত্তমান এথেন্সের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ ক'রে কবিজননী এথেন্সভূমির ধ্বংস কর্‌বার কল্পনা ত্যাগ করলে। এটা কিন্তু কবির কবিত্বের অবিনশ্বর কীর্ত্তি—অপূর্ব্ব প্রভাব।

গিরীশ বাবু।—তা আর বল্‌তে! Euripides-এর প্রতিভাও অসামান্য। প্রাচীন আর আধুনিক নাট্যশিল্পের মধ্যস্থলে Euripides-এর স্থান। Romantic নাটকের স্রষ্টিকর্ত্তা প্রকৃত-

পক্ষে এই গ্রীক কবি। জার্ম্মান সমালোচক Schlegel যাই বলুন Euripides তাঁর অসামান্য প্রতিভা বলে ইউরোপে প্রকৃত নাটকের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

আমি। Æschylus আর Sophocles এরা Euripides এর অপেক্ষা কিসে কম শক্তিশালী? Sophocles Trilogyর চরিত্রগুলির ভিতর নূতন পরিবর্ত্তন এনেছিলেন। তিনি মানবীয় ভাবে এবং কর্ম্মে এই অতি মানবদের চরিত্রগুলিকে মনোজ্ঞ করেছিলেন, Æschylus এর মত তিনটি পালা এক সমসূত্রে গ্রথিত না ক'রে প্রত্যেক পালা পৃথক ক'রে complete in itself—প্রত্যেক play একটি independent plot—করেছিলেন, এই সংস্কার বড় কম নয় তা স্বীকার করতে হবে।

গিরীশবাবু। তুমি যা বল্‌চো তা ঠিক কিন্তু একটা বিষয় ভুলে যাচ্চ। Æschylus আর Sophocles প্রাচীন গ্রীক নাট্যসাহিত্যের শিল্পী, এপিক মহাকবিদের মত Æschylus-এর প্রতিভা বিরাট কল্পনার প্রসূতি। Sophocles মানব সহানুভূতি ও সমবেদনায় প্রাচীন গ্রীক নাট্য-শিল্পে মাধুর্য্যবিকাশ ক'রেছেন সত্য কিন্তু প্রাচীন দলভুক্ত ছিলেন। আর মনে রেখ, গ্রীক জাতিই ইউরোপীয় সভ্যতার আদিগুরু। অন্যান্য পাশ্চাত্য জাত থেকে প্রাচীন গ্রীকের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—গ্রীক জাত শুধু শিল্পী আর দৃঢ়নীতিপরায়ণ নয়—তার ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর। গ্রীক এপিকের নায়কেরা গ্রীকদেবসম্ভূত, তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গ্রীকদেবতার বরে ও আশ্রয়ে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত ছিল তাই তাদের বিশ্বাস, অপর কোন বর্ব্বরজাতির বিরুদ্ধে লড়াই হ'লে গ্রীক দেবতারা তাহাদের সাহায্য করবে। প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারেরা তাই সাধারণ মানব জাত থেকে—মানবীয় স্বাতন্ত্র্য বিকাশ থেকে গ্রীক জাতির বিকাশই পরিস্ফুট ক'রে দেখাবার প্রয়াস পেত। কিন্তু Euripides প্রাচীন গ্রীকের এই দেবভাবমূলক ভাবপ্রাণতা ত্যাগ ক'রে বাস্তব চরিত্র মানবের স্বাভাবিক রাগ অনুরাগ শোক দুঃখ প্রবল মনোবেগ এঁকে প্রাচীন গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে মহাবিপ্লব নিয়ে এলেন।—সময়ও তখন তাঁর অনুকূল ছিল। দেবতা বা প্রাচীন পৌরাণিক বীরদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গ্রীক মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হয়েছিল তাই গ্রীক, প্রাচীন ধর্ম্মে অনাস্থাপন্ন হ'তে আরম্ভ ক'রেছিল। তাই Euripides Romantic নাটকের প্রবর্ত্তনা করতে সাহস ও সুবিধা পেলেন। কিন্তু Comedyর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা Aristophanes প্রাচীন গ্রীক-নাট্যেও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটন ক'রেছেন।

আমি। Aristophanes কি Comedyর প্রতিষ্ঠাতা?

গিরীশবাবু। না। এটা জেন যে কবিতার, নাট্য সাহিত্যের বা যে কোন শাস্ত্রের কেহ একজন ব্যক্তিবিশেষ প্রবর্ত্তক নয়।—অনাদি কাল মানুষের কল্পনা আছে। পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ মনোবৃত্তির বিকাশ দেখায়! ভাষার যেমন কেহ একজন প্রবর্ত্তক নেই, অথচ মানুষ তার মনোভাব প্রকাশ কর্ব্বার জন্য আকার-ইঙ্গিত

করতে করতে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে বাক্য উচ্চারণ করলে যে বাক্-বৈভবে ভাষার উৎপত্তি ; আনন্দ বিহ্বলতার অঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্যের আবির্ভাব,—নৃত্যের তালে তালে ছন্দের সৃষ্টি, ছন্দ থেকে সুরের, সুর থেকে গীতের ঝঙ্কার। এই ছন্দ সুর গীতির সমন্বয়ে কাব্য নাটকের উৎপত্তি। কে যে এপিকের সৃষ্টিকর্ত্তা, কে যে নাটকের প্রথম রচয়িতা এটা কে বলতে পারে ? তেমনিই গ্রীক নাট্যকার কত জন্ম গ্রহণ করেছে তার সংখ্যা কে করবে ? কে বল্‌বে কোন্ রচয়িতা—পথ-প্রদর্শক !

আমি। Tragedy আর Comedy এই দুই বিভিন্ন প্রণালীর উৎপত্তি কি ভাবে হ'ল ?

গিরীশবাবু। এপিকের অতিমানব চরিত্রের আদর্শে পুরাণের বারত্ব গাথায় লোকে কণ্ঠে কণ্ঠে গান গেয়ে যে রস আস্বাদন করতো তাই উপভোগ করতে দেব বিগ্রহের উৎসবে Tragedy নাটকের উৎপত্তি,—গ্রীক রঙ্গালয়ের ক্রমবিকাশে—Æschylus, Sophocles, Euripides প্রধান পুরোহিত ছিলেন—তা ছাড়া আরও অন্যান্য গ্রীক-নাট্যরথী ছিলেন যাঁদের নাম কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। Prynichus, Thespis এঁরাও গ্রীক নাট্যরঙ্গের উন্নতি সাধন ক'রেছেন। Dionysus-এর উৎসবোপলক্ষে যেমনি লীলা কাহিনীর স্তোত্র-গান গীত হত, তেমনি লোকে আনন্দোচ্ছ্বাসে রং-তামাসা করতো। এই রং-তামাসা ফুর্ত্তির অবাধগতি ছিল,—কোনও সভ্যতার বাঁধন বা সুরুচির ধার দিয়েও যেত না। যে লোকগুলো দল বেঁধে এই সব করতো তাদের দলের নাম ছিল Comus। পরে এই Comus থেকে Comedy-র উৎপত্তি। কিন্তু এদের প্রতিপত্তি ছিল গ্রামের ভিতর—গ্রীক শব্দে গ্রামকে Come বলে—সেই থেকে Comus-এর উৎপত্তি এও কেহ কেহ ব'লে থাকেন। Spartans-দের উৎসাহে এর আদিমাবস্থায় উন্নতি, কিন্তু Epichanus সিসিলিতে Comedy-কে popular করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তখন কতকটা burlesque pantomine জাতীয় Comedy ছিল। কিন্তু সেই সব শ্লেষ রং তামাসার মধ্যেও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দার্শনিক চিন্তার ধারা দেখা যেত। তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বড় বড় লোকদের শ্লেষ বিদ্রূপ করা। এই কায কখনও ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃত নাম প্রকাশ ক'রেই করত, আবার কখনও প্রকৃত ব্যক্তির কাল্পনিক নাম দিয়ে Comedy রচনা হ'ত। পরে ব্যক্তিগত শ্লেষ শ্রেণীগত চরিত্রের আক্রমণে পরিণত হ'ত।

আমি। শ্রেণীগত আর ব্যক্তিগত মানে কি ?

গিরীশ বাবু। ব্যক্তিগত কি জান—মনেকর দেশের কোন Public man কিম্বা উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর দোষকে অতিরঞ্জিত ক'রে তাই শ্লেষ-ব্যঙ্গে আক্রমণ ক'রে—আনন্দ পাওয়া। শ্রেণীগত মানে এক এক type এর—রকমের চরিত্র আছে। হয় তো সমাজ দর্শনসাহিত্য প্রভৃতির উপরও কশাঘাত করা হল। আবার Magnes, mimetic danceএর প্রবর্ত্তন করেন—সকল পশুর অনুকরণ করে নৃত্য (কোরাসের দলকে Birds and frogs পক্ষী ও ব্যাং নামে তিনি Comedyতে উল্লেখ করতেন)। কিন্তু Aristophanes প্রকৃত ভাবে Comedyর

বর্ত্তমান form-এর সূচনা করেন। Aristophanes-এর সরল জ্বলন্ত শ্লেষ অতি কোমল সাহিত্যিক সমালোচনার সুতীব্র কষাঘাত, হাস্যরসের সঙ্গীত—গ্রীক সাহিত্যের অবসাদ দূর ক'রে এক যুগান্তর এনে দিয়েছিল। কিন্তু Euripides-এর শক্তি আরও অধিকতর বৃহৎ ও উদার।

আমি। কিন্তু গ্রীক ও রোমক নাট্যসাহিত্যের প্রভেদ কি ?

গিরীশ বাবু। Unities of Time, Place and Action—এই তিন জিনিষ নিয়ে। Aristotle, Unity of Placeএর কথা কিছু উল্লেখ করেন নি, Unity of Time সম্বন্ধে তিনি বলেছেন সূর্য্যের আবর্ত্তনের মধ্যে—কিম্বা আরও কিছু সময় দেওয়া যেতে পারে—এরই ভিতর ট্র্যাজেডির ঘটনার সন্নিবেশ কর্‌তে হবে। কিন্তু ফরাসী নাট্যশিল্পীরা এইখানটায় গুলিয়ে ফেল্লে। তারা Unity of Time and Place নিয়ে একটা অচল প্রাচীর তুলে দিলে। Unity of Action নিয়ে অবশ্য Aristotle ব'লেছেন।

আমি। Unity of Action মানে কি ?

গিরীশ বাবু। একটি সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন গল্পের বাঁধুনি। প্লটের অবয়ব এরকম সুগঠিত ও সুগ্রথিত থাক্‌বে যে কোন অংশই বাদ দেওয়া যেতে পারে না। যদি কোন অংশকে অপসারিত করা যায়, কিম্বা অন্যস্থানে যোজনা ক'রে দেওয়া যায় তবে plotটা আগাগোড়া সংস্কার করতে হয়, পরিবর্ত্তন করতে হয়। এমনভাবে গল্পটীতে রেকতার গাঁথুনী থাক্‌বে। ঘটনাগুলি সীমাবদ্ধ ভাবে থাক্‌বে—কোন ঘটনাই অসংহত অদৃঢ় বা শিথিল এবং আকস্মিক হবে না। অন্তর্দ্বন্দ্বে কারণ-পরম্পরায় ঘটনার এক একটী চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠবে—সেটা জীবন্ত ও সহজবোধ্য হবে। কিন্তু গ্রীক কবিরা Unity of Place এবং Continuity of Time বোঝাবার জন্যই কোরাসকে বরাবর Ochestra-য় উপস্থিত রাখতো। অভিনয়ের সময়ে তারা রঙ্গমঞ্চেই থাক্‌তো। তখন drop scene, পট-পরিবর্ত্তন, অঙ্ক কি গর্ভাঙ্কের কোনও বিভাগই ছিল না—শুধু কোরাসই দর্শকরূপে দাঁড়িয়ে ঘটনার ক্রমবর্দ্ধমান গতিকে নির্দ্দেশ করে দিত।

আমি। কিন্তু Roman dramatistরা কি এই Unity of place, time and action-কে বেশী ক'রে মানতো ?

গিরীশ বাবু। হ্যাঁ—Seneca, Plautus, Terence—এঁরা Unity of Time and Place বেশী ক'রে দেখ্‌তেন—এমন কি এদের নীচে Unity of Action. এই Roman-নাট্যকারদের প্রভাবে ফরাসী-নাট্যকারেরা প্রভাবান্বিত হ'য়েছিল। Moliere কিম্বা Corneille, Racine এঁরা Seneca, Terence, Plautus-এর কাছে বেশী ঋণী। Western critics, Romantic School এবং Classical School—নাটকের এই দুইটি ধারার নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন।

আমি। Romantic আর Classical-এ প্রভেদ কি ?

গিরীশ বাবু। মানুষের হাসি কান্না সুখ দুঃখ নিয়ে যেখানে সম্বন্ধ—তাই Romantic. দেব

অতিমানব নিয়ে Classic. Classic লেখকেরা Comedy Tragedy পৃথক ভাবে নিরীক্ষণ করতেন, কিন্তু Romantic লেখকেরা—মানবজীবনে যেমন হাসি কান্না দুইই আছে তেমনি তাঁরা Tragedy Comedy-র সম্মিলিত ধারায় নাটক রচনা করেন। ক্লাসিক-লেখকেরা আদর্শবাদকে লক্ষ্য করে আঁকতেন, রোমান্টিকেরা বাস্তবতা-প্রিয়। এলোমেলো রহস্যজনক ঘটনার পরিবর্ত্তে যাহা বোধগম্য যুক্তিসঙ্গত তাই রোমান্টিকদের প্রিয়। Euripides Romantic-এর প্রতিষ্ঠাতা—সেক্ষপীর আবার Romantic লেখকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। সেক্ষপীর রোমান ও গ্রীক আর্টকে সমন্বয় ক'রে নাটকে নূতন প্রাণময় নাট্যকলার সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবিক ইউরোপীয় সাহিত্য পাঠ করলে সেক্ষপীরের অমানুষিক প্রতিভা বুঝ্‌তে পারা যায়।

আমি। কিন্তু মশায় Ben Johnson, Marlowe, বোমেণ্ট, ফ্লেচার, Greene, Peele—এঁরাও তো প্রায় সেক্ষপীরের সমকক্ষ। সেক্ষপীর যে নাট্যকলাকে অবলম্বন ক'রেছেন, এঁরাও তো তাই করেছেন—তবে ইউরোপীয় নাট্যকলাকে সেক্ষপীর কি নূতন জীবন দান ক'রেছেন ?

গিরীশ বাবু। Ben, Marlowe, বোমেণ্ট ও ফ্লেচার, Greene, Peele-এর ভেতর Classic School-এর প্রভাব বেশী দেখতে পাবে। Romanticism এদের ভেতর আছে ফরাসী ও রোমান প্রভাবান্বিত হয়ে। কিন্তু সেক্ষপীর Unities of Time and Place and Action-এ তাঁর নিজের স্বাধীন ভাব দেখিয়েছেন—কোনও নিয়মের তিনি বিশেষ বশবর্ত্তী হন নি। মূল Plotটির প্রতি তাঁর অভিনিবেশ বেশী ছিল—সেইটী স্বচ্ছ গতিতে স্বাধীনভাবে চলতে গেলে যে Unity of Time, Place and Action এসে পড়ে—তিনি তাই মেনেছেন। বিশেষ কোনও নিয়মের বশে লেখেন নি। তা ছাড়া মানবের মনস্তত্ত্ব ও মানব-চরিত্রের বাহ্য বিকাশকে তিনি নাট্যকলার একটা পূর্ণ আদর্শ দিয়েছেন।

আমি। কিন্তু মশায় Euripides-এর উপর Schlegel-এর এত গায়ের জ্বালা কেন ?

গিরীশ বাবু। হয় তো ষ্টেজের অনুন্নত অবস্থা থাকাতে Euripides-এর নাটকগুলি উন্নত ষ্টেজে সুন্দরভাবে অভিনীত হ'তে পারে নি। ষ্টেজের সহিত নাটকের অভিনয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

আমি। নাটকের সহিত ষ্টেজের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ?

গিরীশ বাবু। ষ্টেজের ভাল অভিজ্ঞতা না থাক্‌লে ভাল নাটক রচনা করা কঠিন। পাশ্চাত্য নাট্যকারেরা সকলেই ষ্টেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন।—শুধু তাই নয়—সাধারণ রঙ্গমঞ্চে—ব্যবসার খাতিরে—রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রী দেখে নাটক রচনা কর্‌তে হয়। দেখ, প্রাচীন গ্রীসে এপিক থেকে একরকম লিরিকের সৃষ্টি হ'ল—যা দাঁড়াল কোরাসে—পরে তাই থেকে নাটকের উদ্ভব।—কিন্তু ষ্টেজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের পরিপুষ্টি ও শ্রী বর্দ্ধিত হ'তে লাগ্‌লো। শুধু নাটক রচনা কর্‌লেই তো হ'ল না—তা অভিনয় করা চাই সে অভিনয়ে

লোকের মনোরঞ্জন হওয়া চাই।—অভিনেতা অভিনেত্রীর দক্ষতার উপর নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে সুদক্ষ অভিনেতারা নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। নাট্যকারের শুধু কল্পনায় বিভোর হ'য়ে নাটক লিখ্‌লে হবে না—রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীদের study করা চাই—রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা পরিচ্ছদ দৃশ্যপট—আর লোকের রুচি দেখে নাটক রচনা কর্‌তে হয়। এই সব ঠিক ঠিক হ'লে তবে নাটক ষ্টেজে জম্‌বে।

আমি। মশায় এটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। নাট্যকারের তো অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনায়াসে ভূমিকাগুলি হাবভাব সহিত শিখিয়ে দিলেই হল।– তা আবার তাদের দেখে নাটক লিখ্‌তে হবে কেন ?

গিরীশ বাবু। বটে ! দেখ সোজা কথায় বোঝ যে সকলের সকল ভূমিকা suit করে না। যে নায়ক হবে—তার সেই বইয়ের নায়কোচিত চেহারা, স্বর ও মাধুর্য্য থাকা চাই।

আমি। তা তো paint ক'রে দিলেই চল্‌তে পারে।

গিরীশ বাবু। যার মূলে চেহারা বা স্বর নেই তাকে পেণ্ট করেই বা কি কর্‌বে ? আবার যে ভূমিকা গ্রহণ ক'র্‌বে সে ভূমিকা অভিনয় কর্‌তে তার দক্ষতা আছে কি না তা বুঝ্‌তে হবে। যে ভূমিকা গ্রহণ কর্‌বে তার ভাব বোঝবার অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ক্ষমতা আছে কি না— তা দেখ্‌তে হবে। সে কতটা "ষ্টেজ ফ্রি" Tragedy Comedyর ভিতর কার tragic veins আছে কার comic veins আছে তা দেখা চাই। কার দ্বারা কোন্ ভূমিকা হ'লে অভিনয় সুন্দর হ'তে পারে তা দেখ্‌তে হয়। অভিনেতা অভিনেত্রীদের চাল-চলন হাব-ভাব দেখে কার কি রকম capacity আছে তা study ক'রে বুঝ্‌তে হয়।

আমি। এতো বড় বিষম কথা, অভিনেতা অভিনেত্রী দেখে নাটক লিখ্‌তে হবে ?

গিরীশ বাবু। হ্যাঁ—শুধু তাই নয় অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভিতর কেহ born actor actress আছে আবার কেহ ঘসে-মেজে এক রকম। এই দ্বিতীয় স্তরের অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রথম স্তরেব অভিনেতা অভিনেত্রীদের মনে মনে হিংসে করে। তাদের আবার মন যুগিয়ে নাটকের part রাখ্‌তে হয়। সবাইকে খুসী রাখ্‌তে হয়—তবে রঙ্গালয়ের নাট্যকার অধ্যক্ষ হওয়া যায়। কখনও দেখা যায় বিরুদ্ধবাদী থিয়েটার কোম্পানী ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেল—তখন এমন নূতন ভাবে নাটক লিখতে হয় যাতে উপস্থিত অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে তাদের কারও বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে নাটক রচনা ক'রে ষ্টেজে জমানো চলে। হয়তো সেই নাটকে পূর্ব্বের নগণ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী ব'লে সম্মান ও আদর পেলে, আর নাটকেরও ষ্টেজে খুব success হল। আবার হয় তো মনে কর—তিন চারি জন খুব উৎকৃষ্ট প্রতিভাবান অভিনেতা আর দুই তিন জন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী আছে—এদের দেখে নাটক রচনা কর্‌তে হয়, যাতে এরা সকলেই নিজ নিজ ভূমিকা নিয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পারে—যাতে তাদের

প্রত্যেকেরই সম্মান গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে—যাতে তারা অভিনয়ে নিজ নিজ ভূমিকায় রস পেয়ে অভিনয়-কৌশল দেখাতে প্রাণ দিতে পারে। বুঝেছ ?

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ! তা হ'লে তো public stage-এর বিশেষ বিশেষ রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রী জানা না থাক্‌লে ষ্টেজে নাটক জম্‌বার কোন chance-ই থাকে না।

গিরীশ বাবু। না, তাতো থাকে না। নাটক রচনা হলেই তা ষ্টেজে অভিনয়ে ঠিক হবে কি না—সাধারণের রুচিকর হবে কি না—রঙ্গালয়ের অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাটকের স্বীয় স্বীয় ভূমিকার ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারবে কি না—তা বুঝতে হয়। একটা আঙ্গুলের হেলনে, পদক্ষেপে, চক্ষের চাহনিতে, মুখের ভাব বিকৃতিতে অভিনয় কত সুন্দর হ'তে পারে তা তাদের বোঝাতে হয়। সুদক্ষ প্রতিভাবান অভিনেতা থাকলে নাটকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে নূতন ভাবের স্রোতঃ বা চরিত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারে। সুদক্ষ অভিনেতারা নাটকের প্রকৃত ব্যাখ্যাকার। এদের অভিনয়ে নাটকের প্রকৃত রস আস্বাদ করা যায়।

আমি। আমাদের দেশে প্রাচীন যুগ থেকে রঙ্গালয়, যাত্রা, রামায়ণ গান, চণ্ডীর গান, ঝুমুর পালাগান, গম্ভীরা, নৃত্যগীত গ্রাম্যপর্ব্বে চাষার গান এত রকম প্রতিষ্ঠান আছে যার ইতিহাস সংগ্রহ করা উচিত। কেন না এই প্রতিষ্ঠানগুলিই আমাদের জাতীয় ভাবের অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করছে। মুসলমানদের আমলে তয়ফা, বাই খেমটা প্রভৃতি নূতন আমদানী দেখা যায়—মাঝে মাঝে সংকীর্ত্তন বাউল মালসী গানেরও সৃষ্টি। আবার ইংরাজ জাতের সংস্রবে আমাদের দেশের আধুনিক থিয়েটার কনসার্টের দল হাফ আখড়াই আর ফুল আখড়াইর আবির্ভাব। পাঁচালী আর কবিগানকে দূর ক'রে দিয়ে একদিন বাঙ্গালী হাফ আখড়াই আর ফুল আখড়াই-এর মজলিসে মজেছিল। আমাদের ছেলে বেলায়ও হাফ আখড়াইএর শেষ মহলা দিতে দেখেছি।

গিরীশবাবু।—হাফ্ আখড়াই-এর গান কতকটা কবির গানের নূতন সংস্করণ, অবশ্য তাতে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আমাদের তাঁতের যন্ত্রের তারের যন্ত্রের খুব উন্নতি হয়েছিল—বেহালা সেতার এস্রাজ বীন্ তানপুরা এর পরিচয়। একতারায়ও একটা সুরের ঝঙ্কার আছে। তা ছাড়া দেখ,—ঢোলক, তব্‌লা, পাখোয়াজ, মৃদঙ্গ তার-যন্ত্রের সঙ্গে সুন্দরভাবে সঙ্গত ক'রে থাকে।—কিন্তু হারমনিয়াম পিয়ানো ব্যাঞ্জো ভায়োলিন—ফ্লুট কর্ণেট পাইপ, ব্যাগ পাইপ এক নূতন সুরের ঝঙ্কার দিলে—বাঙালী তাতেই মোহিত হ'য়ে গেল।—বিশেষ, দেশীয় যন্ত্রবাদ্য থেকে ইউরোপীয় যন্ত্রবাদ্য সহজে শেখা যায় আর আয়ত্ত করা যায়। দেশী পটোর ছবি দেশী কুমরের মূর্ত্তিগড়া থেকে পাশ্চাত্য চিত্র ও পুতুল আমাদের বেশী মনোমুগ্ধ করতে লাগ্‌লো।—পাশ্চাত্য শিল্পকলা আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বক্ষের উপর ভারতীয় শিল্পকলাকে চেপে রেখেছে।

আমি। পাশ্চত্য শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব'লেই কি ভারতে তার বিজয় ঘোষণা ক'রছে ?

গিরীশবাবু। না—শ্রেষ্ঠ বলে নয়। নূতন ব'লে—নবীন বলে। সবুজ রংএ তরুণদের চিরকেলে নেশা আছে। কি জান, ভারতীয় শিল্পকলা ভারতীয় জাতীয় জীবনের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে অবনতির পঙ্কে ডুবে যাচ্ছিল—সব জিনিষে অবসাদ এসে যাচ্ছিল।—নব নব উন্মেষ-শালিনী প্রতিভা জন্মাল না। ফলে সবই নামে মাত্র বেঁচে ছিল—এই সময় ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘর্ষে ইউরোপীয় সাহিত্য—শিল্পকলা—এক নূতন ইন্দ্রজাল চ'খের সম্মুখে ধরলে—কল্পনার নূতন কল্পলোক।—সে ঢেউ এখনও ষোল আনা টানে চলেছে। তাই ভয় হয়, পাছে এই স্রোতে আমাদের রত্নগুলি না ভেসে যায়—আমরা এই বানের জোয়ারে না তলিয়ে যাই।—কিন্তু জেনো সত্য অবিনশ্বর—আমাদের দেশের সাহিত্যকলা এই নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে নবীন রসে পুষ্ট হ'য়ে ধীরে ধীরে জগতে ছড়িয়ে যাবে, সব বিষয়ে বিকাশ বিস্তারই প্রাণেরই স্পন্দন।—মাটীর নীচে বীজ যখন থাকে—তখন কে তাকে দেখ্‌তে পায় ? সমস্ত প্রাণ-শক্তি যখন বীজাকারে নিহিত থাকে তখন সে অন্ধকারাচ্ছন্ন মাটীর তলা ভেদ ক'রে তার জীবনী-শক্তির বিকাশ দেখাবার চেষ্টা ক'রে। ধীরে ধীরে মাটী ভেদ ক'রে ওঠে। তখন আলো জল বাতাস—বিশ্বের জীবনী শক্তির স্পর্শে—সেই বীজ—ক্ষুদ্র চারা হয়ে পরে শ্যামল পল্লবে পত্রে পুষ্পে ফুলে ফলে সজ্জিত হ'য়ে আকাশ ভেদ কর্‌বার জন্য মাথা তুলে দাঁড়ায়—তার নিজের বিস্তার ও বিকাশের সঙ্গে তার প্রাণশক্তির প্রচার করে।—ভারতের সাহিত্য শিল্প—এক সময়ে নিজের গন্ধে নিজে অভিভূত হয়ে দিক্ আমোদিত ক'রেছিল—দেশ বিদেশে সে সৌরভ বিকীর্ণ হয়েছিল।—আবার কাল-প্রভাবে প্রাণশক্তি মুদিত হয়েছে—আবার ধীরে ধীরে তার প্রাণ-শক্তির স্পন্দন হচ্চে,—পাশ্চাত্যের স্পর্শে আবার তার নিজের রূপ ধরে দাঁড়াবে—বানের জলে যেমন পলি প'ড়ে ভূমিকে উর্ব্বর করে তেমনি এই পাশ্চাত্যস্রোতে তার আবর্জ্জনা দুর্ব্বলতা ভেসে যাবে—নীচে পড়ে থাক্‌বে পাশ্চাত্য কল্পনার নূতন কল্পলোক—তাতে ভারতীয় সাহিত্যশিল্প নবীন যৌবনে জেগে উঠ্‌বে! Forms of expressions চিরকাল বাইরের আবর্ত্তনের সঙ্গে বদ্‌লায়।—এটা প্রকৃতির নিয়ম।—বিশেষ এই সমন্বয়ের যুগে ভারতে নূতন সমন্বয় বাণী ধ্বনিত হয়েছে—সেই ধ্বনি জলদ গম্ভীর নির্ঘোষে ভারতের বাণী ঘোষণা করবে। সে শক্তিতে সমগ্র জগৎ কেঁপে উঠ্‌বে। ভারতে সে দিন—সেই গৌরবময় দিন—আস্‌বে!

গিরীশ বাবুর আবেগময় মেঘমন্দ্রস্বরে এই বাণী যেন দৈববাণীর মত ধ্বনিত হ'ল। ধীরে ধীরে তাঁর নিকট বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানবচেতনা ও রহস্যবোধ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মানবের প্রথমাবস্থায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত না হওয়ায় তাহাকে অদৃষ্টশক্তির তাড়নায় চালিত হইতে হয়। কিন্তু আত্ম-প্রতীতি বা আমি বোধের সুস্পষ্টতার সঙ্গে সঙ্গেই সে কতকটা আপনার ইচ্ছানুযায়ী গতি নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করে। সে স্বতন্ত্রতার পথে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করে। প্রথম দৃষ্টিতে এই চেষ্টা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয়। মনে হয় যে, যে বিশ্বশক্তি অজ্ঞাত থাকিয়া জগৎযন্ত্র চালনা করিতেছে, তাহার উপর কোনও রকমেই হাত দেওয়া সম্ভব নয়; এই বিরাট যন্ত্রের ক্ষুদ্রতম চাকাটিরও গতি নিয়মিত বা নিরোধ করা ক্ষুদ্র মনুষ্যশক্তির অনায়ত্ত। এই অনন্ত বিশ্ববৈচিত্র্যের অপার লীলা-খেলার কথা একটু নিবিষ্ট হইয়া ভাবিতে গেলেই মানবজ্ঞানের ক্ষুদ্রতা যে মানবভাগ্যের উপর একটা উপহাস মাত্র তাহা মনে না হইয়া পারে না। দিন দিন মানব-চেতনা যতই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে থাকে, ততই তাহার জ্ঞান ও অনুভবের ক্ষুদ্র পরিধি রেখাটি স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং এই জীবন-ঘেরা কোন্ অজ্ঞাত রহস্যসিন্ধুর গোপন বিশাল অস্তিত্ব দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের রহস্যময় ভাষার মত অন্তরে আসিয়া বাজিতে থাকে। মানুষের ক্রমাগত চেষ্টা এই যে, সে কেবলই যতকিছু জীবনে ও জগতে রহস্যময় রহিয়াছে তাহাকে দিবালোকের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায়; কিন্তু কৌতুক এই যে, এই বিশ্বরহস্যোচ্ছেদের চেষ্টার ফলেই রহস্য আরও নিবিড় আরও গূঢ় হইয়া উঠিতেছে অর্থাৎ জানার প্রচেষ্টা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে 'অজানার' এবং অজ্ঞানের বিপুল পরিধিও ততই মানবদৃষ্টিকে নিরাশাপীড়িত ও শ্রান্ত করিয়া তুলিতে থাকে। গ্রীকযুগের চেতনাও একদিন আপনাকে অনন্তের মাঝে ব্যাপ্ত করিতে গিয়া বেদনাভরেই বলিয়াছিল 'আমি শুধু এই জানিলাম যে আমি কিছুই জানি না'। যখনই যে দেশে মানবচেতনা সম্প্রসারিত হইয়া সীমার গণ্ডী পার হইয়া যাইতে চাহিয়াছে তখনই সেই দেশে জীবন-রহস্যবোধ তীব্র ও জীবন্ত হইয়া মানুষের চিন্তায় ও কর্ম্মে, সাহিত্যে ও সাধনায় স্পষ্টরূপ লইয়া দাঁড়াইয়াছে। য়্যারিষ্টট্‌ল বলিয়াছেন ভাবুকতার জন্ম বিস্ময় বা রহস্যবোধে, কিন্তু মনে হইতেছে শুধু আরম্ভ নয়, পরিণতিও রহস্যবোধেই।

ইউরোপ ও রহস্যবোধ

ইউরোপের জীবনেও আজ চেতনার তীব্রতা বিপুল রহস্যবোধকে জন্ম দিয়াছে; ইউরোপের অন্তরাত্মা তাহার বিরাট প্রাণ চেষ্টার ফলেই জীবনের প্রতিকর্ম্মে এক রহস্যময় শক্তির অসীম লীলা অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মণে হইতেছে, এই অনন্ত জগদ্ব্যাপার, মানব-জীবনের এই নানা বিচিত্র ভঙ্গিমা, সমস্তই কোন্ অদৃষ্ট শক্তির ক্রীড়ামাত্র। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট মানুষটির মনে তাই আজ একটি বড় ব্যথিত প্রশ্ন, যাহা কিছু হইতেছে তাহার মাঝে এই ক্ষুদ্র

মানুষটির কি কোনই নিয়ন্তৃত্ব, স্ববশত্ব নাই ? অন্ততঃ তাহার কম্পিত বক্ষের আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত অজানার কি এতটুকু সহমর্ম্মিতা পর্য্যন্তও নাই ?

এই সংশয়াকুল প্রশ্নের বেদনায় বিদ্ধ হইয়া আহত প্রাণ তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু এই বেদনা ভয়াতুরতাকে ডাকিয়া আনে নাই। অজেয় সাহসে যুবা প্রাণ অজানার অন্ধ-গুহায় পথ খুঁজিতেছে। সেই 'আদ্যিকালের বুড়াটা'কে ধরিবার জন্য 'নবযৌবনের দল' আসিয়া গুহাদ্বারের সমুখটায় পৌঁছাইয়াছে। 'বিনা অস্ত্র বিনা সহায়' আজ সে অজানাকে জয় করিবে বলিয়া ছুটিয়াছে আজ আর সেই দেবতা নাই যিনি দিব্য অস্ত্র দিয়া দিব্যজ্ঞান দিয়া মানবকে তাহার অদৃষ্টপথের সহস্র বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন। যত পরিচিত দেবতা ছিলেন সকলেই আজ নামহীন অরূপের মাঝে দেহত্যাগ করিয়াছেন ; চারিদিকে আজ শুধু অস্পষ্ট অস্তিত্বে ছায়াময়, মায়াময়, রহস্যময় আভাস ও ইঙ্গিত। অন্তর কিন্তু কিছুতেই এই অস্পষ্টতাকে লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারে না, পারিতেছেও না, তাহার প্রশ্ন এই অস্পষ্টতার সত্যস্বরূপ কি ?

বিশ্বসত্য সম্বন্ধে ধারণা ও জীবন

যাহা জীবনের নিয়ামক, তাহার সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস বা ধারণা লইয়া জীবন বেশীদিন চলিতে পারে না। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্ তাহা লইয়া একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই-ই চাই। জীবনের চরম সত্য সম্বন্ধে একটা কোনও ধারা দিয়া জীবনকে গঠিত না করিয়া ত্রাণ নাই। পরীক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবনজগৎ সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস তাহার কর্ম্ম ও অনুভবকে প্রতিনিয়তই নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কথাটা হয়ত আংশিক সত্য মাত্র ; কারণ ধারণাই যে শুধু জীবনকে গঠিত করে তাহা নয়, জীবনও আবার নব নব ধারণাকে জন্ম দেয়। যে প্রথম হইতেই মনে করে যে এই জীবন-জগৎ সব দুঃখময়, তাহার নিকট যেমন সকল কর্ম্ম, সকল চেষ্টা দুঃখেরই অগ্রদূত বলিয়া মনে হয়, তেমনই যে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে ক্রমাগতই দুঃখই পাইতে থাকে সেও সেই দুঃখময় অভিজ্ঞতা হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বিশ্বাসকে গড়িয়া লয়। মোট কথা, এই ধারণার বিভিন্নতা জীবনেও একটা বিশিষ্টতার দিকে নিশ্চিত ইঙ্গিত করে। যাহার অন্তর যে-কারণেই হোক্, ভবিষ্যৎকে আপনার সকল আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার ব্যর্থ মরণভূমি বলিয়া কল্পনা করে, আর যে জন ভবিষ্যৎকে তাহার সকল আশার সফলতার ক্ষেত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের উভয়ের জীবনে বিস্তর প্রভেদ হইবেই। কেবল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নয়, বিশ্ববিধান সম্বন্ধে ধারণা জীবনকে নানা বিচিত্রভাবে গড়িয়া তুলিতে থাকে ; জীবনের বৈচিত্র্যের ও বিভেদের মূলই এইখানে।

বিচারের মাপকাঠি

সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, অজ্ঞেয় বিশ্বসম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলিই আমাদের জীবনকে বিশিষ্টতা প্রদান করে। এই জানা-জগৎ সম্বন্ধে ধারণা সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সকলেরই নিকট এক ; ইহা লইয়া বিশেষ কোনও একটা মতান্তর নাই বলিলেও বলা যায়, কিন্তু যাহা আমাদের প্রত্যক্ষের বাহিরে, তাহা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিলেই দেখা যাইবে যে সেখানে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য ও কল্পনার বৈচিত্র্যের আর সীমা সংখ্যা নাই। ভাল মন্দ, সত্য

মিথ্যা, সুন্দর কুৎসিত এই রকমের সহস্র বিচার করিয়া তবে আমরা জানা-জগৎটাকে গ্রহণ করিতেছি; বিনা মাপে, বিনা বিচারে কিছুই গ্রহণ করিব না, ইহাই যেন মানব মনের পণ। কিন্তু বিচারের এই মাপকাঠিটি কি? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে এই বিশ্বজগৎ ও জীবনের যাহা কিছু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তাহার সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে যে একটি ধারণা ও বিশ্বাস রহিয়াছে উহাই আমাদের এই মাপ-কাঠির নির্ম্মাতা, উহাই অন্ধের যষ্টি।

বিশ্বাস ও জীবনের বৈশিষ্ট্য

ভগবান্ আছেন কিনা তাহা কে জানে! কিন্তু এই একটা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস দিয়াই কি আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত কর্ম্মের মূল্য নির্দ্দেশ করিতেছি না? উহাই আমাদের কষ্টিপাথর; উহারই উপর কষিয়া চার্ব্বাক্ জীবনের এক অর্থ বাহির করেন আর ভগবদ্ভক্ত আর এক অর্থবাহির করেন। অজানা সম্বন্ধে এই ধারণা ও অনুভব যেমন ব্যক্তিগত হিসাবে, তেমনি জাতি হিসাবে এমন কি কালচক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেও নানা পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতেছে। 'ফাল্গুনী'র সেই বুড়াটাকে না দেখিয়াই নানাজন যেমন নানা রকমের কল্পনা করিল আমরাও তেমনি অদৃশ্য ও বোধ-করি অজ্ঞেয় সত্যটিকে নিজ নিজ ভাবানুযায়ী কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তদনুযায়ী কেহ আনন্দ, কেহ বেদনা, কেহ অনুতাপ, কেহ নিরাশা এবং ভয়কে জীবনের মাঝে ডাকিয়া আনিতেছি। যাঁহার বিশ্বাস 'ওই অজানা আমার পরম প্রেমাস্পদ, আমরাই মরমের দরদী' তাঁহার জীবন এক সুরে ফুটিয়া উঠিল, আর যাঁহারা বিশ্বাস বিশ্ববিধানের মূলে যে মহাশক্তি রহিয়াছে উহা খেয়ালী দমকা হাওয়ার মত কখন যে জীবনের শঙ্কাকম্পিত দীপটিকে এক দাপটে নিবাইয়া দিবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই, তাঁহার জীবন অন্য রাগিণীতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিষাদে হওয়াটাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। ফলকথা, এই বিশ্বাসই জীবনকে বৈশিষ্ট্য ও রূপ দিয়া থাকে।

আদর্শবাদ ও মেটারলিঙ্ক

তবে মনের মত যে কোন একটা বিশ্বাস করিয়া লওয়াই কি তবে প্রার্থিত? ইউরোপীয় আদর্শবাদ ইহার একটা উত্তর দিয়াছে। তাহার মতে মানব-হৃদয়ের উচ্চতম আশা ও আকাঙ্ক্ষার চরম পরিপূর্ণতাই মানব সাধনার আদর্শ বা ভগবান্। আমাদের শ্রেষ্ঠতম চাওয়াটির দিকে আমরা চলিব, কেবলই চলিব, অনন্তকাল ধরিয়া বিশ্বমানব সেই দিকে চলিতে থাকিবে, ইহাই আদর্শ। যুগে যুগে এই আদর্শ নব নব রূপে আসিয়া মানব-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে অনন্ত অভ্যুদয়ের পথে কেবলই ডাকিতে থাকিবে, ইহাই মানব ভাগ্য। এই অভ্যুদয়ের কোথাও শেষ নাই। মোটের পরিপূর্ণ প্রাপ্তির মাঝে চলার অবসান এই আদর্শবাদ কল্পনাই করিতে পারে না। মেটারলিঙ্ক এই কাল্পনিক আদর্শকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে আদর্শটি হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার গোলাপী রঙে রাঙা হইলেই চলিবে না; সবচেয়ে আগে আদর্শটি সত্য হওয়া চাই। যাহা এত বড় প্রার্থনার ধন, অন্তরের একান্ত সাধনার লক্ষ্য, তাহা একটা 'সোনার স্বপন' হইলেই হইল একথা কবির সহসা-উদ্ভাসিত আনন্দ মুহূর্ত্তের উচ্ছ্বাসোক্তি মাত্র হইতে পারে, কিন্তু জীবন-ব্যাপী সুকঠোর প্রচেষ্টার মন্ত্র হইতে পারে না। কাল্পনিক আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়া অভ্যুদয় আর ফলহীন বৃক্ষের নিকট অমৃতফল প্রার্থনা উভয়ই ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র।

আদর্শের সত্যতা

সুতরাং যে বিশাল বিশ্বসত্য আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কোন একটা বিশ্বাস গড়িয়া লইবার পূর্ব্বে তাহার সত্যতার যাচাই করিয়া লওয়া জীবনের সার্থকতার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। চরম আদর্শবাদীরা আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন যে, যাহা প্রকৃত সত্য তাহা অজ্ঞেয় এবং অনন্ত বলিয়াই তাহাকে বিশেষ কোনও দেশে বা বিশেষ কোনও কালের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেখা একেবারেই অসম্ভব। আগে হইতেই জানিয়া লওয়া ত সম্ভব নয়ই, কোনও বিশেষ জীবনের মধ্যেও তাহাকে লাভ করিবার কল্পনা একটা আকাশ-কুসুম মাত্র। তাহা হইতে পারে এবং বোধ করি সত্যও বটে। এই অতি-করুণ অসম্ভাব্যতাই ব্যক্তিজীবনের যত ব্যর্থতা, যত বেদনা, যত ট্র্যাজেডির মূল কারণ। মানবজ্ঞান পরিপূর্ণ নয় বলিয়াই ত' কখন কোন্ দিক হইতে অনাহূত, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, নির্ম্মম সত্য নিয়তির মত আসিয়া এই জীবনকে অন্ধকারে দলিয়া চলিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু সে যাহাই হোক্, সাধারণ সহজবুদ্ধি বলে, হৃদয়ের কল্পনা মাত্রই সুন্দর এবং উজ্জ্বল হইলেও, সত্য নাও হইতে পারে বটে, এবং যাহা আদর্শ অর্থাৎ যাহার মাঝে শেষ পাওয়া নাই অথচ যাহাকে নিঃশেষ করিয়া পাইতে সাধ হয়, তাহার সত্যতার পরিপূর্ণ পরখ যদিও সম্ভব নয় সত্য, তথাপি কতকটা বিচার করা যে চলেনা, তাহাও বলা যায় না। যদি জীবনের পথখানি এতই অনিশ্চিত হইত, তাহা হইলে অতীত লক্ষ কোটি বৎসরের মাঝ দিয়া জীবন যে পথখানি ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, আমরা তাহা এমন করিয়া নির্দ্দেশই করিতে পারিতাম না; জ্ঞানান্বেষী মানুষ বিশ্ববিধানের মাঝে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলাকে যে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ এই যে জীবনের সম্ভাব্যতার একটা সীমা-রেখা আছে, এবং সেটি যে কোথায়, তাহার বোধও সাধারণভাবে আমাদের সকলের মাঝেই রহিয়াছে; ক্ষুদ্রতম জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও আমরা জীবনের যে সব লীলা প্রত্যক্ষ করি, সৃষ্টির সেরা মানুষের মধ্যেও তাহারই অনুরূপ লীলাই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই জন্যই আদর্শের সত্যতা বিচার একেবারেই অসম্ভব, এ কথাটি স্বীকার করা চলে না। তবে সর্ব্বত্রই যে এই সত্যতা বিচার বর্ত্তমান মানবজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব তাহা বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে; জীবনের মর্ম্মস্থানে বোধ করি নিত্যকালই ওইটুকু অনিশ্চিত রহস্য থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু আদর্শের সত্যতা নির্ণয় যতই সুকঠিন ও অনিশ্চিত হোক্ না কেন, যতক্ষণ মানব এটি না করিতে পারে, ততক্ষণ তাহার আর স্বস্তি নাই; উঠিতে বসিতে মন তাহার কেবলি কি-জানি-কি-হবে ভাবিয়া সংশয়াকুল হইয়া উঠিতে থাকে। অথচ বিচার বিতর্ক ছাড়িয়া যতক্ষণ না সে অনুভবের রাজ্যে উপস্থিত হয় ততক্ষণ কিছুতেই আর ধ্রুবের সন্ধান মিলে না, চিত্তের পরম প্রশান্তি আসে না। এইজন্য প্রথম জিজ্ঞাসাই, আদর্শের সত্যাসত্য লইয়া, প্রথম কথাই, কি লইয়া আছি? যাহা নাই তাহারই স্বপ্নবিহ্বলতায় এই জীবন আমার রহিয়া যাইতেছে না ত? এই ভুলই যে একদিন জীবনকে চিরতরে অন্ধকারে হাহাকারময় করিয়া যায়! এক যুগে মানব যাহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে ও জানিয়াছে, অন্য যুগের মানুষটিও যখন বিনা বিচারে অন্ধের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরে, তখনই জড়তা ও আধ্যাত্মিক মৃত্যু আসিয়া অন্তরকে অভিভূত করিয়া অসাড় করিয়া ফেলিতে থাকে। অনুভবহীন হইয়া জীবন তখন অন্ধবিশ্বাস ও মিথ্যায় ভরিয়া উঠে, হৃদয় তাহার সত্যনিষ্ঠা হারাইয়া ফেলে।

সত্যের প্রকাশে চিরনবীনতা

এই কথাটি আমরা ভুলিয়া যাই যে সত্য হয়ত এক এবং নিত্য, কিন্তু জীবনে এই সত্যের প্রকাশ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে এক থাকিতে পারে না। জীবন বস্তুটি একটি চলমান সত্য, রূপ তাহার সহস্রভঙ্গী ধরিয়া অনন্ত দেশ-কালের আবরণমুক্ত হইয়া স্ফুরিত হইতেছে। মানবেতিহাসে একদা এক মহা বিস্ময়ের যুগ আসিয়াছিল। এক অনন্ত অজ্ঞাত শক্তির রহস্যময় সঞ্চরণের সাড়া পাইয়া মানব সেদিন ভয়ে বিস্ময়ে আপনাকে তাহার নিকট নত করিয়াছিল। তখন দিগন্তব্যাপ্ত বৃক্ষলতাময় অরণ্যানী, গগন-মথন ঝঞ্ঝা, অপূর্ব্ব আলোক ও রহস্যাচ্ছন্ন অন্ধকার—ইহাদের প্রত্যেকটি বস্তু, প্রত্যেকটি ঘটনা তাহার হৃদয়কে বিচিত্র চেতনা দান করিতে পারিয়াছিল। আকাশে বাতাশে দিকে দিগন্তে তখন সে এক বিরাট শক্তির সহস্রধা দ্যুতিমান রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ঋক্‌ছন্দে কত গানই গাহিয়াছিল। সেদিনকার সেই অপরূপ রহস্যবোধ তাহার জীবনকেও একটি অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। আজ কিন্তু সেই রহস্যবোধ নাই। মানবজীবনের সেই বিশেষরূপটিও আর নাই। কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বহু পরিবর্ত্তনের মাঝ দিয়া আজ সে যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে বিশ্বরহস্যের এক নূতন মূর্ত্তি নবভাবে তাহাকে চঞ্চল ও বিহ্বল করিতেছে। আজ যদি সে পূর্ব্বের মত গাছলতাকে, আকাশ বাতাসকে দেবতা বলিয়া পূজা করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই পূজা কি তেমন জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারিবে? অনুভববিহীন কেবল আচার-চালিত জীবন-যাপন-প্রণালী সুন্দর দেখাইলেও তাহাতে কোনও নৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাহাতে জীবন সত্যকে প্রাপ্ত হইতে পারে না।

আজ সমগ্র জগৎটাই রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই জগৎই যেন আর নাই। এই বিশ্ব রহস্যকে তাই আবার নূতন করিয়া জানা চাই, তাই বুঝি ফিরিয়া ফিরিয়া সত্য যুগ আসিয়া থাকে! সেই জন্য আজ মানব-যাত্রী এই অকূল রহস্য-সমুদ্রে তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও অনুভবের নৌকা লইয়া ভাসিয়া পড়িয়াছে, সে কত উৎসাহ, কত কৌতূহল ও কত আনন্দ! কত অপূর্ব্ব সুন্দর বিহঙ্গকূজন-মুখরিত দ্বীপ তাহার দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়া, শ্রান্ত বাহুদ্বয়কে ক্ষণিকের বিশ্রাম দিল, কিন্তু 'অকূলের কূল, দরিয়ার সায়র' আজিও মিলিল না, চিরন্তন রহস্য কুজ্ঝটিকা তেমনই দিগন্ত প্রসার লইয়া দৃষ্টিকে ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। তবে কিছু প্রভেদ হইয়াছে বই কি! আলোকের বর্ণভেদ ঘটিয়াছে, আজ আকাশের যে প্রান্ত হইতে আলোক আসিতেছে তাহা আর কখনও যেন মানবের দৃষ্টিপথে আসে নাই—জীবনের উপর আজ তাই এক নূতন আলোকের কম্পন; হৃদদের দ্বারে আজ একটা গূঢ়তর অর্থ ও ইঙ্গিত লইয়া সে উপস্থিত হইয়াছে। রহস্য বোধের এ এক অভিনব আত্মপ্রকাশ।

মেটারলিঙ্কীয় অদৃষ্টবাদ

মেটারলিঙ্ক এই রহস্যের কোন্ রূপটিকে দেখিয়াছেন তাহা জানিতে হইলে প্রথম আরও কয়েকটি কথার আলোচনা প্রয়োজন। অ-দৃষ্টকে মানব যে-ভাবে কল্পনা করিয়া লয় তাহারই উপর এই রহস্য-বোধের বিশিষ্টতা নির্ভর করে। একদিকে মানবের অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মজ্ঞান, অপর দিকে অদৃষ্ট, ইহাদের পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই জীবন বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সুতরাং মানবজীবনের উপর অদৃষ্টের প্রভাব এবং অদৃষ্টের সহিত মানবের অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মজ্ঞানের

সম্পর্ক বিচার করিয়া মেটারলিঙ্ক কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। তিনি বলেন যে 'অদৃষ্ট যখন আসিয়া আমাদের জীবনে উপস্থিত হয়, তখন সে কতকগুলি ঘটনা পরস্পরার রূপ ধরিয়াই আসে এবং ইহারাই আমাদের জীবন গঠনের পক্ষে প্রয়োজন, সত্য, কিন্তু শুধু ইহারা কখনও জীবনকে বিশেষত্ব দিতে পারে না।' অবশ্য বাহিরের দিক হইতে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় ঘটনাগুলি যখন মানব ইচ্ছার অনধীন তখন অদৃষ্ট-চালিত না হইয়া আর উপায় নাই; যে ভাবে ঘটনাস্রোত বহিবে জীবনকেও সেই ভাবেই চলিতে হইবে। ঘটনা-স্রোতকে ছাড়িয়া জীবন-তরণী বাহিয়া চলিবার আর ত অন্য পথ নাই! কিন্তু মেটারলিঙ্ক ঘটনার প্রকৃত স্বরূপ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে 'ঘটনাগুলি বাহ্যতঃ আমাদের অপেক্ষা রাখে না বটে, তথাপি তাহাদের প্রভাব আমাদের অন্তরের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে'; বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে ঘটনা এক, তাহার আন্তর মূর্ত্তি (inner meaning বা significance) বিভিন্ন লোকের নিকট আপনাকে বহুধা প্রকটিত করিয়া থাকে। ভবিয়া দেখুন সেই ক্রৌঞ্চমিথুন বধের কথা; ঘটনাটি নিষাদ যেমন পাখী মারা বলিয়া জানিত, বাল্মীকিও তাহা বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু ঘটনারই ভিতরকার রূপটি দুজনের দৃষ্টিতে কত ভিন্ন! একজনের চক্ষে স্বার্থময় আনন্দ লইয়া সেই ঘটনা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আর একজনের চক্ষে তাহা করুণা ও বিষাদের মূর্ত্তি ধরিয়া অমর কবি বাল্মীকির জন্মকে অভিনন্দিত করিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে ঘটনা শুধু আত্মবিকাশের একটা সুযোগ ও অবসর লইয়া আসে, সে কখনও আপন শক্তি দিয়া অন্তরকে একেবারে তাহার নিজস্ব কোন ভাবে ভাবান্বিত করিতে পারে না। ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া অন্তর আপন স্বভাবের অনুযায়ী বিকাশ মাত্র প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই বলিতে পারা যায় যে বাহির হইতে অদৃষ্ট ঘটনাকে গড়িয়া তুলিতেছে আর অন্তরের দিক হইতে মানবই ঘটনাকে অর্থ দিয়া সম্পূর্ণ করিতেছে, অদৃষ্টকে রূপ দিয়া ফুটাইয়া তুলিতেছে। তাই মেটারলিঙ্ক বলিয়াছেন, মানুষ আপনার বাসনানুযায়ী কর্ম্মকেই ডাকিয়া আনে বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। 'ঘটনারাশি অদৃষ্টের পাত্র হইতে নির্ম্মল জলের মত বাহির হইয়া আসে, কদাচিৎ ইহার কোনও স্বাদ বর্ণ বা গন্ধ থাকে। কিন্তু ঘটনাগুলি যে অন্তরে আশ্রয় পায়, তদনুরূপ হইয়া ইহারা সুখময় বা দুঃখময়, প্রিয় অথবা ঘৃণিত, প্রাণান্তক অথবা প্রাণ ময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' *

মেটারলিঙ্ক বলেন 'যদি তুমি প্রতারিত হইয়া থাক, বাহিরের দিক দিয়া সেই প্রতারণায় (অন্তরাত্মার) কিছুই যায় আসে না। দেখিতে হইবে ক্ষমা, মহত্ত্ব, অন্তর্দৃষ্টি এবং ক্ষমার পরিপূর্ণতা অর্থাৎ যে সব গুণ জীবনকে শান্তি ও আলোকে লইয়া যায়, এই প্রতারণা তোমার অন্তরে সেই সব গুণগুলিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল কি না। যদি এই প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়া তোমার অন্তরে আরও সরলতা, উচ্চতর বিশ্বাস এবং প্রেমের প্রসার না ঘটিয়া থাকে, তবেই বৃথাই তুমি প্রতারিত হইলে, কারণ সত্য বলিতে তোমার জীবনে এই ঘটনাটা কিছুই নয়†' এইরূপ প্রতি ঘটনাই আত্মবিকাশের সুযোগ লইয়া আসে। কিন্তু আসিলেই ত আত্মবিকাশ হয় না। যে জন জাগিয়া আছে, যাহার সতর্ক দৃষ্টি সুযোগের পথ চাহিয়া আছে, সেই শুধু ঘটনাগুলিকে সত্য ভাবে গ্রহণ করিয়া আপনার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট ও সার্থক করিতে পারে; আর যাহারা অচেতন,

---

* Wisdom & Destiny Sec. 8.
† Wisdom & Destiny Sec. 9.

তাহারাই কেবলই ক্রীড়াপুত্তলির মত ঘটনা-তাড়িত হইয়া লক্ষ্যহীন ভাবে বহিয়া চলে। এখানে রবীন্দ্র-কবিতায় ব্যক্তির জন্য অনন্তের অনন্ত প্রতীক্ষার কথা মনে পড়ে। কতবার কত ঘটনার বিচিত্র বেশে অনন্ত অদৃষ্ট আসিয়া মানবাত্মাকে তাহার অমর মহিমা ও প্রেমের আনন্দলোকে লইয়া যাইবার জন্য ডাকিয়া চলিয়া যায় কিন্তু 'হতভাগিনী' তবু জাগে না। কিন্তু একবার যদি অন্তর জাগিয়া উঠে, তবে অদৃষ্টের চালন ও তাড়ন শক্তি আর থাকিতে পারে না; মানব আপনার অদৃষ্টকে জয় করিতে সমর্থ হয়। এই সত্যই মেটারলিঙ্কের আনন্দবাদের ভিত্তি। নব্য ইউরোপ অজ্ঞেয় অদৃষ্টবাদকে আশ্রয় করিয়া নিরাশার স্বরে বলিতেছিল 'মানুষ নিতান্তই অদৃষ্টের ক্রীতদাস; পিতৃক্রমের (Heredity) লৌহ শৃঙ্খলে সে একেবারে হাত পা বাঁধা, পিতামাতার সংস্কার ও কর্ম্ম, আদমের আদিম পাপ আমাদিগকে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক বহন করিতেই হইবে, ইহা হইতে আর নিষ্কৃতি নাই।' মেটারলিঙ্ক আপন অন্তরের আনন্দালোকে জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'কথাটা ঠিক নয় গো ঠিক নয়', আমরা স্বাধীন। যদিও স্বীকার করিতেছি যে বাহ্য জগতের ক্ষুদ্রতম ঘটনাটিও আমার ইচ্ছানুগত নয়, তবু বলি অন্তরে আমি স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

প্রজাপতির দৌত্য

(১০)

রাম নন্দকে একটুও সন্দেহ করে নাই। কিন্তু জননীর কথাও সে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইল না।

মনে যখন ছুইটা পরস্পর-বিরোধী ভাব অধিকার বিস্তার করিতে চাহে তখন মনটা কেমন পঙ্গু বিকল হইয়া পড়ে। রামের স্তব্ধতা নন্দর ভাল লাগিত না; সে ভাবিত, সংসারের চাপে তাহাকে এতখানি আড়ষ্ট করিয়াছে। তাই অপরিসীম সমবেদনায় নন্দর মন রামের প্রতি ধাবিত হইল। তাহার সুখ-সুবিধার প্রতি নন্দর প্রখর দৃষ্টি রামকে যেন অধিকতর ব্যতিব্যস্ত করিয়া দিল।

আসন্ন পরীক্ষার জন্য রাম কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিল। আহার-নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। রাত্রে পড়িতে পড়িতে অশক্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে নন্দ ধীরে ধীরে আলো সরাইয়া দিয়া তাহার নির্বিঘ্ন ঘুমের ব্যবস্থা করিত; সকালে রামের ঘুম না ভাঙ্গিলে, ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া যাইত।

সেদিন অপরাহ্ণে নন্দ রামকে জোর করিয়া বেড়াইতে বাহির করিয়াছিল। রাম কিছুতেই যাইতে চাহে না; বলে, সে আগাগোড়া সব ভুলিয়া গিয়াছে; এক মিনিটও সে অপব্যয় করিতে পারে না; সেই সময়টুকুতে, সে অনেক-কিছু ঝালাইয়া লইতে পারিবে।

নন্দ হাসিল, চল্ ভাই, এই সময়টুকু মোটেই অপব্যয় হবে না, দু'জনে আলোচনা করলে, বই পড়ার চেয়ে বেশী কাজ হবে।......

রাম অবশেষে অনিচ্ছায় কোনক্রমে রাজি হইল।

পথে যাইতে যাইতে রামকে নন্দ বলিল, অত দ'মে গেলে কি চলেরে?......বিপদ আসবেই আস্‌বে......

রাম কথার উত্তর দিলনা বটে, কিন্তু মনে মনে বলিল, উপদেশ দেওয়া খুব সহজ।

রামের মনের এইরূপ কঠিন অবস্থার কথা জানা থাকিলে নিশ্চয়ই নন্দ তাহার সহিত লঘু-চাপল্যের রসিকতা করিত না। কিন্তু নন্দ বুঝিয়াছিল অন্যপ্রকার, সে হাসি-ঠাট্টা করিয়া রামের ভারাক্রান্ত মনটি হাল্কা করিয়া দিবার বিধিমত চেষ্টাই করিতেছিল।

গোলদীঘীর পাড়ে তখনো তরুণের দল ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ঘুরিতে আরম্ভ করে নাই, কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ আসিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পথশ্রমের শ্রান্তি দূর করিতেছেন।

নন্দ এবং রাম গিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। পশ্চিম আকাশ, অস্তগত সূর্য্যের রশ্মিতে তখনো লাল।

নন্দ রামকে বলিল, ওই সেনেটের বাড়িটা দেখে তোর কিছু মনে হয়?

রাম সংক্ষেপে বলিল, নাঃ।

নন্দ হাসিয়া বলিল, আমার কিন্তু ভয় লাগে।.....সেদিন সন্ধ্যার পর ঠিক মনে হচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড দৈত্য দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আছে--যেন ছেলেদের ধরে গিলে খেতে চায় ওটা! তোর মনে হয় না, রাম?

আমার মনে অত কবি-কল্পনা নেই,—বলিয়া রাম চুপ করিল।

আমিই কোন্ একটা কবিকঙ্কণ চণ্ডী?...তা নয়, বলিয়া নন্দ ভনিতা করিয়া বলিতে লাগিল, তোর পরীক্ষার পড়ার বহর দেখেই বোধহয় আমার ঐ কথা মনে হয়,...কথাটা বলিয়াই নন্দ বুঝিল যে রামের মনে আঘাত লাগিতে পারে,---তাই সে সাম্‌লাইবার জন্য বলিল, আর কথাটা, নিতান্ত বাজে নয়, কত ছেলের যে স্বাস্থ্যের মাথা খেয়েছে—ঐ মোটা-থাম, কুৎসিত বাড়িটা...

ধাঃ, বাড়িটার দোষ কি? রাম বলিল।

তাই কি আমি ব'লচি? যে বাড়ির ইট-কাট-পাথরের দোষ, না ঐ পাথরের মূর্ত্তিটার দোষ...বাড়িটাই এশোসিয়েশন আনে...

রাম বলিল, কারুর দোষ নয়, দোষ আমাদের।

নন্দ বলিল, তা আমি কিছুতেই মান্‌তে রাজি নই...কি বলিস্ রাম? এই বি-এ যদি আমাদের মাতৃভাষায় দিতে হ'তো তো—যা তুই খাটচিস্ তার সিকির সিকি খাটলে—জুতিয়ে পাশ করতিস্।

বাংলায় বি-এ? শুন্‌লেও হাসি পায়! রাম বলিল, তোমার কল্পনা আছে বটে!

তবে কি বাংলায় বিয়ে--অর্থাৎ বিবাহ? এই কথা বলিয়া নন্দ যতখানি আমোদ পাইল, তাহার বেশী দমিল রাম কথাটি শ্রবণগোচর করিয়া।

কিন্তু নন্দ থামিল না, সে বলিল, সত্যি বল্‌চি রাম, ওটা বিয়ের মতই সুখদায়ক হ'তো!

রাম একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। নন্দর মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া অকস্মাৎ তাহার মনের উপর দিয়া কতকগুলি দুঃখের ছবি বিদ্যুতের গতিতে উদ্ভাসিত হইয়া নিমিষে মিলাইয়া গেল!

কিছুক্ষণ পরে রাম আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাল থেকে আর আস্‌বোনা, আজ উঠি, এখন।

কিন্তু রামের উঠা হইল না।

অদূরে কয়েকজন দলবদ্ধ হইয়া গোল করিতে করিতে আসিতেছিল, সকলেই পরীক্ষা দিবে বোধহয়, তাহাদের উল্লাস আর ধরে না।

নন্দ তাহাদের দু'একটি কথা শুনিয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মশায়? ব্যাপার কি?...আমাদের ও সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ...

একজন উত্তর করিল ডেট্‌ পেছিয়েছে...

নন্দ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আঁ্যা, বলেন কি মশাই, সুখবরের ঝুটোও ভাল। কেন বলুন তো?···কেন?

তাহারা বলিল, আজ চারদিন হলো যে জাহাজে পেপার আসার কথা ছিল তার কোন পাত্তাই নেই···কাল মিটিং-এ ডেট্‌ পেছিয়ে যাবে।

নন্দ বলিল, নিছক গুজব নয়তো?

একজন উত্তেজিত হইয়া বলিল, কি বলেন মশাই? খোদ কর্ত্তার মুখে থেকে শোনা...

তাই নাকি? নন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, তাঁকে পেলেন কোথায়?

এই, এইতো বাড়ি গেলেন। উত্তর হইল।

নন্দ বলিল, তাহ'লে পরশু সঠিক খবরটা পাওয়া যাবে বোধহয়......

আরে কর্ত্তার মুখ থেকে যা একবার বেরিয়েছে তাকে না করে—কার ঘাড়ে দুটো মাথা আছে!···তবে কাল এসে জেনে যেতে হবে মিটিং কোন তারিখ ফেলে।

নন্দ আনন্দে প্রায় নৃত্য করিতে লাগিল; আঃ, তবুও ক'দিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাঁচা যাবে।

রাম বলিল, সর্ব্বনাশ আমার হ'লো।

ঔৎসুক্য ভরে নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কেন?

রাম কথা কহিল না, ধীরে ধীরে চিন্তাকুল হইয়া পথ চলিতে লাগিল।

নন্দ আবার জিজ্ঞাসা করিল, বল্‌না ভাই রাম···বল্‌না?

রাম বলিল, তুমিতো সব জান, আমরা কথা দিয়েছি, আমার পরীক্ষার তিন মাসের মধ্যে দেনা শোধ কর্‌বো; তারপর শুভির বে দিতে হবে।

এই শেষের কথাটি রাম অনেক কষ্টেই বলিল, এই কথা বলিবার প্রতিশ্রুতি সে মানদার কাছে করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতার জন্য তাহা এতদিন পারে নাই।

নন্দ বলিল, দুমাসে শোধ হয়ে যাবে; আমিও তো ফ্রি, আমিও কিছু একটা ক'রবো—তাহ'লে চট্‌ ক'রে হ'য়ে যাবে। আমার কামানো টাকা নিবিনে?

রাম বলিল, আমি কিছুই ব'লতে পারিনে, মা যদি না নিতে চান্…

নন্দ হঠাৎ উন্মনা হইয়া গেল। এ বিষয়ে আর কোন কথাই হইল না।

শালগ্রামের শোয়া-বসার মত পরীক্ষার দিন পিছাইয়া যাওয়াতে নন্দর বড় একটা বেশী কিছু আসিল যাইল না।

কিন্তু তাহার মাথায় একটা গুরু চিন্তা তাহাকে সেইরাতে বহুক্ষণ জাগাইয়া রাখিল। সেটি শুভদার সহিত তাহার বিবাহের কথা।

দেশে থাকিতে সে কতকটা যেন বুঝিতে পারিয়াছিল যে মানদা তাহার পিতার উপর বিরূপ, শেষদিকে তাঁহার তাহার প্রতি ব্যবহারটাও কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল; কিন্তু সে, রাম সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিল এবং ইহাও জানিত যে রাম সকল কথা শুনিলে পিতার শেষ ইচ্ছা এবং আদেশকে অবহেলা করিতে পারিবে না!

তাহার অতিমাত্র বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল রামের ব্যবহারের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনে। আজ সে এই প্রথম শুনিল যে জননীর আদেশ ব্যতীত রাম তাহার অর্জ্জিত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না। এতদিন তাহাদের মধ্যে অদেয়-অগ্রাহ্য কিছুই ছিল না।

নন্দ ভাবিতে বসিল, রামের এ হইলই বা কি?

অবশেষে সে স্থির করিল যে পরীক্ষার পর সে সে সকল কথা একখানি পত্রে লিখিয়া রামকে জানাইবে। পরীক্ষার পূর্ব্বে বলিলে হয়ত রাম সকল চিন্তা হইতে মুক্ত হইতে পারিত; কিন্তু তাহার সাহস হইল না; যদি কোনক্রমে উল্টা ফল হয়, তাহা হইলে রামের যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করা সহজ নহে।

(১১)

পরীক্ষার পর কুসুমপুরে ফিরিবার কল্পনা রামের একেবারেই ছিল না; অধিকন্তু সে নন্দদের বাসায় পড়িয়া থাকিবে না ইহাই স্থির করিয়াছিল। কিন্তু নন্দকে কোন কথা সে বলিল না। বলিলে সে জানিত নন্দ হৈ-হৈ করিয়া সব ভণ্ডুল করিয়া দিবে।

পরীক্ষা রাম ভালই দিয়াছিল। তবুও তাহার মনে হইত সে পাশ করিতে পারিবে না: কারণ গুরু-নিপাতের বৎসর মানুষ কোন সৌভাগ্যের সুফল আশা করিতে পারে না।

নন্দও বাড়ী গেল না; বলিল, কলকাতায় থেকে চেষ্টা চরিত্র করলে আমার মত অপদার্থ লোকেরও কিছু জুটে যেতে পারে!

কার্য্যতঃ ঘটিল তাই। সে দিদির সহিত দেখা করিতে গিয়া সন্ধান লইয়া আসিল যে শ্যাম-পুকুরের বিনোদিনীর দেবরের বন্ধু মিস্টার নবীনকিশোর চৌধুরী থাকিতেন; তাঁহার পুত্র আগামী বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, তাহার জন্য একজন ভাল লোক চাই।

নন্দ একদিন প্রাতে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সে মনে মনে ভয় পাইতেছিল যে নবীনকিশোরের হয়তো একদম সাহেবী মেজাজ, তাহার সহিত পাল্লা দেওয়া শক্ত হইবে; কিন্তু কাজটা যোগাড় করার একান্তই প্রয়োজন ছিল, সে যদি নাই পারিয়া উঠে তো রাম তো পারিবে। রামের অধ্যবসায়ের উপর নন্দর খুবই শ্রদ্ধা ছিল।

কিন্তু নবীনকিশোর ছিলেন একান্ত সাদা-সিধে গোছের মানুষ; তিনি লোকের সহিত সোজা ব্যবহার করিতে ভালবাসিতেন।

নন্দ যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখনো তিনি উপর হইতে নামেন নাই।

খানসামা বলিল, সাহেবের সহিত মুলাকাৎ হইতে আরো অনেক দেরি হইবে। সাহেব উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু মেম সাহেবের উঠিতে কিঞ্চিৎ দেরি হয়। তাহার পর চা-পান করিয়া সাহেব নীচে নামেন, এবং গাড়ী করিয়া মেম সাহেব গড়ের মাঠে বেড়াইতে যান।

নন্দ একবার মনে করিল ফিরিয়া যায়; কিন্তু নিজের ভিতর হইতে একটা কৌতূহলের তাগিদ তাহাকে নিরস্ত করিল।

সাহেবের ফুল গাছের সখ ছিল, পাখী পুষিবার সখ ছিল। নন্দ বাগানে ঘুরিয়া ফুল দেখিল, খাঁচায় যে সকল বিচিত্র রংএর পাখী ছিল তাহাও দেখিল।

হঠাৎ একটা ঢিলা পোষাকে নবীনকিশোর নীচে নামিয়া আসিলেন। এইরূপ আসা তাঁহার নিয়ম নহে, তাই চাকর বাকর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

নবীনকিশোর নন্দকে বাগানে ফুল দেখিতে দেখিয়াছিলেন। যে-মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে খুটিনাটি করিয়া দেখে, নবীনকিশোর তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাই বোধ করি আলাপ হইবার পূর্ব্বেই তিনি নন্দর প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

নীচে নামিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, নন্দ একদল পাখীর খাঁচার সামনে দাঁড়াইয়া তাহাদের সকালের উল্লাস লক্ষ্য করিয়া নিজে খুসী হইয়া উঠিয়াছে।

নন্দ তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিল, তিনি স্মিত-বদনে নিজের ডান হাতটি কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, আপনি কি কোন প্রয়োজনে এসেছেন?

নন্দ নিজের আগমনের উদ্দেশ্যটি বলিলে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে আপনাকে আরো একটু অপেক্ষা করতে হ'বে······গৃহ-শিক্ষক নির্ব্বাচনের ভার ঠিক আমার উপরে নয়, ও কাজটি আমার পত্নীই করেন। তাঁর শরীর ভাল নয় ব'লে তিনি একটু বেলাতেই উঠেন।.. ...ততক্ষণ না হয় আপনি আজকের কাগজটা পড়ুন।

কাগজটা টেবিলের উপরেই ছিল।

উপরে উঠিতে উঠিতে নবীনকিশোর নামিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি এখনি আসচি, অভ্যাগতকে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়ার ত্রুটি মাপ করবেন।......আমি এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করবো। বলিয়া নবীনকিশোর তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন।

নন্দ কাগজখানা খুলিয়া তাহাতে মন দিতে পারিল না কিন্তু। নবীনকিশোরের সহজ সুন্দর সৌজন্যের মধুর স্নিগ্ধতায় তাহার মনটি ভরিয়া গিয়াছিল।

কোথায় সে ভাবিয়াছিল কট্‌মটে এক সাহেবি মেজাজের মানুষের পাল্লায় আসিয়া পড়িবে, না এ কি? নন্দ মনে মনে বলিল, কি চমৎকার বিবেচনা! আমাকে একলা ফেলে যাচ্ছেন, তার জন্যে এসে মাপ চাইলেন! বাস্তবিক মানুষের সঙ্গে ব্যবহার না করলে, কিছুই শিখ্‌তে পারা যায় না।

নন্দর কল্পনা তখন অত্যন্ত সজীব এবং সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল—তাই অনুমান এক দীর্ঘ লম্ফ দিয়া স্থির করিল, নবীনকিশোরের মত ভদ্রলোক এই পৃথিবীতে আর একজনও আছে কিনা সন্দেহ!

নন্দ জানিত এ কথা কতখানি ভিত্তিহীন, তবুও তাহার এই কথা বারবার মনে করিতে কেমন যেন একটা আরাম বোধ হইল।

খানিক পরে বেয়ারা আসিয়া নন্দকে উপরে যাইতে বলিল। এবারে স্বয়ং মেম সাহেব সেলাম দিয়াছেন।

নন্দ উপরে গিয়া দেখিল সাহেব-মেমে কলহ বাধিয়াছে।

মেম বলিতেছেন, তুমি যখন জান্‌লে যে উনি বড় দিদির ভাই, তখন তুমি কি ব'লে ওঁকে বাইরে বসিয়ে এলে? উনি কি তোমার মক্কেল?

সাহেব বলিলেন, দোষ তো আমি স্বীকার কর্‌ছি, আর ওঁকেও জিজ্ঞেস কর, ওঁর কাছেও আমি মাপ চেয়ে এসেছি। আমি কি ওঁর সঙ্গে মক্কেলের ব্যবহার ক'রেছি?

মেম সাহেবের যে শরীরের সুখ নাই তাহা দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়! এবং দেহের অসুস্থতা মনকে অনেক পরিমাণে স্পর্শ করিয়া আছে—তাহাও বুঝিতে নন্দর দেরি হইল না।

নন্দ আসিয়া একখানি চেয়ারের উপর বসিতে মেম সাহেব বলিলেন, সাহেবের রূঢ় ব্যবহারের জন্য আপনি হয়ত' মনে দুঃখ পেয়েছেন?

নন্দ টেবিলের উপর দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া বলিল, সাহেব আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার ক'রেছেন······আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ওমা! ঠিক বড় দিদির মতই তো গলার আওয়াজটি পর্য্যন্ত। তিনি ডাকিলেন, শরৎ, ও শরৎ······

একটি রুগ্ন ছেলে আসিয়া মার পাশে দাঁড়াইল, কি ব'লছ মা?

তিনি বলিলেন, এই দেখো, তোমার মাষ্টার মশাই······

নবীনকিশোর তাঁহাদের বাধা দিয়া বলিলেন, যাদুমণি, আগে ওঁর সঙ্গে কথা শেষ কর, তারপর ইন্‌ট্রোডাক্‌শন হবে এখন .....

যাদুমণি একটু হাসিয়া ইংরাজিতে বলিলেন, এতক্ষণ পরে একটা বুদ্ধির কথা বলেছ—শুনে সুখী হ'লুম।

তিনি শরৎকে বলিলেন, আচ্ছা পরে এসো······

শরৎ চলিয়া গেল।

যাদুমণির হিত কথা কহিয়া নন্দ বুঝিল যে তিনি দুইজন লোক চাহেন, একজন শরতের জন্য আর একজন অরুণার জন্য।

অরুণা প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলেজে পড়িতেছে।

নন্দ হাসিয়া বলিল, আমরাও দুজন।

যাদুমণি এবং নবীনকিশোর দুই জনেই তাহার দিকে বড় বড় চোখ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাদের মুখের ভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রশ্ন হইল, সে আবার কি?

নন্দ যে তাহা বুঝে নাই তাহা নহে, তথাপি সে কোন উত্তর না দিয়া বলিল, কিন্তু আমি একটি সর্ত্তে কাজ করতে পারি।

কি ? যাদুমণি প্রশ্ন করিলেন।

আপনি আমার দিদিকে ব'লতে পাবেন না যে আমি আপনার ছেলে-মেয়েদের পড়াই।

নবীনকিশোর এবার কথা কহিলেন, কেন ? তা কি আমরা জানতে পারি ?

নিশ্চয়; বলিয়া নন্দ লজ্জায় মাথা নত করিল। সে খানিক পরে বলিল, যদি কোন রকমের অবিনয় হয় তো আমার অপরাধ আপনারা মার্জ্জনা করবেন ...

আপনারা জানেন কিনা বলতে পারিনে, আমাদের অবস্থা ভাল, বাবা জীবিত আছেন, তিনি কুসুমপুরের জমীদার; অতএব তাঁর কাণে এ কথা পৌঁছিলে তিনি আমার ওপর রাগ ত' ক'রবেনই, আর মনে বড় দুঃখ পাবেন। ....আমি এই কাজ আমার বন্ধুটির জন্য করছি। সম্প্রতি তার পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তারা ঋণে জড়িয়ে গেছে। তিন মাসের মধ্যেই সেই ঋণ শোধ করার কড়ার আছে। তাই দুই বন্ধুতে মিলে পরীক্ষার পর এই কাজে লেগে যাবার চেষ্টা করছি।

শ্রোতা দুইজনের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যাদুমণি প্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, আমি কথা দিচ্চি, এ কথা কোন দিন বড় দিদির কাণে পৌঁছবে না......

নবীনকিশোর বলিলেন, যাদুমণি কত টাকা ক'রে এঁদের দেবে ?

কেন ? ওঁরাই ত' তা আগে বলবেন, কত টাকা ঋণ ?

নন্দ বলিল, দেড়শর কিছু বেশিই বোধ হয়।

বেশ, যাদুমণি বলিলেন, ত্রিশ, ত্রিশ ষাট আমি দেবো। আপনারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ ক'রে নেবেন, সময় ঠিক ক'রে নেবেন, আমাদের আর বলার কিছুই রইল না।

নন্দ বিজয়োল্লাসে বাসায় ফিরিল।

(১২)

রাম মাথায় একটা ফেটি বাঁধিয়া তখনও বিছানায় পড়িয়াছিল। নন্দ অনেক মতলব আঁটিতে আঁটিতে আসিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সে কতকটা ভয় পাইয়া গেল, কারণ সকালে বিছানায় পড়িয়া থাকার মানে রামের গুরুতর অসুস্থতা।

নন্দর পায়ের শব্দে রাম চক্ষু চাহিয়া তাহার দিকে স্থিরভাবে দেখিতে লাগিল।

নন্দ আসিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া বলিল, মাথাটা ধরেছে বুঝি ? গায়ে হাত দিয়া বলিল, জ্বরও তো হ'য়েছে দেখ্‌ছি। জ্বর কখন হলো, রাম ?

রাম বলিল, শেষরাতে ভারি শীত ক'রছিল, বোধহয় তখনি জ্বর এসেছে।

তাইতো, বলিয়া নন্দ একটা বড় গোছের নিশ্বাস ছাড়িল .... ম্যালেরিয়া, না কি রে ?

বোধহয়, গাও একটু একটু বমি-বমি ক'রছে......একটু কুইনেন্ দেনা......

নন্দ বলিল, দূৎ, এই নতুন জ্বরে কুইনেন খাবি, না আর কিছু! আজকের দিনটা টেনে একটা উপোস দে, সব গ্লানি চ'লে গিয়ে শরীর ঝর-ঝরে হয়ে যাবে......

রাম মাথা নাড়িল, উঁহুঁ, ওবেলা আমাকে বেরুতেই হবে, নইলে নতুন পড়ানটা থাক্‌বে না, ওরা লোক তেমন সুবিধের নয়, বিশেষ ক'রে মেয়ে-মানুষ কর্ত্তা......

নন্দ হাসিল, তাতে কি ? মেয়ে-মানুষ মাত্রেই লোক খারাপ হয় ?

রাম উত্তরে বলিল, কতকটা তাই বটে, মেয়েদের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ, তারা একটু বেশী স্বার্থপর……

নন্দ বলিল, এ তোমার সুইপিং জেনারালিজেশন্……এইটি আমাদের দেশের লোকের ব্যাধি বিশেষ……

রাম বলিল, তুমি বোধহয় বাংলা ছাড়িয়ে আর কোথাও বাস কর ?

নন্দ বলিল, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য করার সৌভাগ্য ঘটে ছিল ; আমি এখন কিছু ব'লতে চাইনে ;……নিজেই বুঝবে, আমার কথা সত্যি কিনা ।

রাম এই রহস্যময় কথার কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিল না ; তাই নন্দর মুখের পানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল ।

নন্দ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, একটু চা যদি পাওয়া যেত ……তাহার পর চাকরকে ডাকিয়া চা করিবার হুকুম দিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তোর বিকেলে বেরনো—হ'তেই পারে না ; তবে তার উপায় হবে নিশ্চয়, আমি যাব……

তুমি পারবেনা, বলিয়া রাম পাশ ফিরিয়া শুইল ।

পারবো না ! বলিস্ কি রাম ?

হুঁ, ছেলেটা ভারি বেদ্‌ড়া, সেখেনে তোমার গিয়ে কাজ নেই……

তুই যতো না বলবি ততই যাবার জন্যে আমার মন উস্-খুস ক'রবে……নাঃ আমাকে যেতেই হবে দেখ্‌চি, বলিয়া নন্দ হাসিতে লাগিল ।

বিকালের দিকে রামের শরীর আরো খারাপ হইল। সে ক্রমেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল, তাইতো না গেলে কাল তারা অন্য লোক ডাক্‌বে !

নন্দ বলিল, আমায় ঠিকানাটা ব'লে দেনা, আমি একটা হাজিরিও দিয়ে আস্‌তে পারি, ব'লে আস্‌তেও ত পারি না হয় যে জ্বর হয়েছে তোর ?

অগত্যা রাম তাহাকে ঠিকানা বলিয়া দিল, সে বাড়ির নম্বর আছে কিনা জানিনে, গলির নাম কি তাও ত জানিনে—বৌবাজারের মোড়ের দক্ষিণে হৃদরাম বাঁড়ুজ্যের গলি, সেটা দিয়ে মিনিট কয়েক গিয়ে ওঁক্কুড় দত্তর লেন, তাতে মিনিট দুই গিয়ে বাঁ হাতি একটা ব্লাইণ্ড লেন, সেই গলিতে ঢুকে শেষের দিকের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে পঞ্চানন কি গজানন ব'লে ডাক দিলে একটা দরজা খুলে যাবে। দরজাটা পঞ্চাননের মা খুলে দেবেন, তাঁকে তুমি ব'লে দিও যে আমার জ্বর, দিন দুই আস্‌তে পারবো না ।

নন্দ বলিল, এত বড় ঠিকানা মনে রাখার চেয়ে তো বি-এ একজামিন্ সহজ রে ; এই ভীষণ জায়গার খোঁজ তোকে দিয়েছিল কে ? সকাল সকাল বেরুস্, আমার জানা পথেই গোল বাধে —ত' একেবারে গোলক ধাঁধাঁ ।

নন্দ আর দেরি না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে দুই-একখানা পুরাণ বই উল্টাইয়া গোলদীঘীতে গিয়া দু-এক চক্র দিয়া বৌবাজারের মোড়ে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর গলির নাম পড়িতে পড়িতে সে গিয়া সেই ব্লাইণ্ড লেনের শেষে উপস্থিত হইয়া ডাকিল, পঞ্চানন, গজানন ।

আরব্যোপন্যাসের গল্পের মত একটি দরজা খুলিয়া গেল, এবং ভিতর হইতে একজন বলিলেন, পঞ্চু খেলা দেখ্‌তে গেছে, আপনি বসুন, সে এখুনি আস্‌বে……

নন্দ বলিল, আমি রামবাবু নই, অন্যলোক, রামবাবুর জ্বর হয়েছে, তিনি বোধহয় দিন দুই আস্‌তে পারবেন না সেই খবর আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর বন্ধু……

ভিতর হইতে স্ত্রীলোকটি বলিলেন, তা' হোক ; আপনি ভিতরে এসে বৈঠকখানায় বসুন ; আপনিই না হয় পাত দুই পড়িয়ে দিয়ে যান্—পঞ্চু এখুনি আস্‌চে……আপনি চ'লে যাবেন না……বলিতে বলিতে তিনি বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, এদিকে আসুন।

নন্দ বৈঠকখানায় গিয়া বসিল।

একটি আধহাত উঁচু চৌকির উপর একখানা ছিন্ন মাদুর পাতা, তাহাতে বোধহয় কোন দিন ঝাঁট পড়ে নাই। তাহার উপর একটা তাকিয়া, তাহার ওয়াড় নাই এবং রংটি তেল চুকচুকে কাল।

নন্দ অতি কষ্টে সেখানে বসিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পঞ্চানন আসিয়া উপস্থিত।

সে জানিত না যে রাম না আসিয়া নন্দ আসিয়াছিল ; একলাফে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, উঃ মাষ্টার মশাই, আজ যা চমৎকার খেলেছে মোহন-বাগান, সে আপনাকে কি ব'লবো ‥ · বলিতে বলিতে পঞ্চানন হঠাৎ দেখিল যে একজন অপরিচিত লোকের নিকট সে এই সকল কথা বলিতেছে—তখন হঠাৎ জিভ কাটিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ?

নন্দ হাসি চাপিয়া বলিল, আমি তোমাকে পড়াব ব'লে বসে আছি।

আর তিনি ?

তাঁর অসুখ হয়েছে।

নূতন লোক দেখিয়া পঞ্চানন অতিরিক্ত দমিয়া গিয়াছিল। সে চৌকির একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আমি আজ প'ড়বো না……

এই কথাগুলি উচ্চারিত হইতে না হইতে ভিতর হইতে অতি কঠিন কর্কশ কণ্ঠে গৃহিণী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, হতভাগা, হাবাতে, পড়বিনি তো' ক'রবি কি ছোঁড়া, বাঁদর……ইত্যাদি।

পঞ্চানন মাথা অবনত করিয়া সেই অজস্র গালি-বর্ষণ সহিয়া লইয়া—মাথা তুলিয়া নন্দর মুখের দিকে চাহিয়া নির্লজ্জের হাসি হাসিয়া বলিল, বড্ডো ক্ষিদে পেয়েছে. তবে খেয়ে আসি ?

নন্দ হাসি সম্বরণ করিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, যাও. কিন্তু বেশী দেরি হ'লে আমি চ'লে যাবো

এই কথা শুনিয়া পেটমোটা খর্ব্ব বালকটি বাড়ির মধ্যে ত্বরিৎ পদে চলিয়া গেল।

নন্দ ভাবিল বালকটির নাম পঞ্চানন না রাখিয়া—লম্বোদর রাখিলেই ভাল হইত।

ভিতর হইতে চাপা-গলার ফিস্-ফিস্ এবং তাহার সঙ্গে নিরুত্তর পঞ্চাননের অন্নের গো-গ্রাস গ্রহণের সপাসপ্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।

আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া পঞ্চানন আসিয়া বসিলে নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, আর গজানন কই ?

পঞ্চু বিকট হাস্য করিয়া বলিল. আমিই পঞ্চানন, আমিই গজানন……

সেকি ? বিস্মিত হইয়া নন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

আমার নাম পঞ্চানন, আমি ছেলে বেলায় বড্ডো বেশী খেতুম ব'লে পিসিমা আমাকে গজানন বলতেন, তাই থেকে কেউ আমাকে পঞ্চানন, কেউ গজানন বলে......

বটে! বলিয়া নন্দ কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। পঞ্চাননের টাইপের আর একটি গজানন বাহির হইলে, বিপদের কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই!

পঞ্চানন একটু পরে শুইয়া পড়িল। আর বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সে ছিন্ন একখানি ইংরাজি রিডার বাহির করিয়া সুর করিয়া চেঁচাইল,

The boy stood on the burning deck.

জ্বলন্ত জাহাজের বালকের করুণ কাহিনীর চেয়ে পঞ্চাননের জীবনের কাহিনী একটুও কম করুণ নহে। তাহার মাতৃদেবীর কথাগুলি জ্বলন্ত অঙ্গারের চেয়ে কিসেই বা কম?

বার দুই হাই তুলিয়া পঞ্চানন বলিল, মাষ্টার মশাই, রামেরা দুই ভাই, এর ইংরিজি কি হবে?

নন্দ ভাবিতে লাগিল, ইত্যবসরে পঞ্চ পুস্তকের উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা দেবীর আরাধনা করিতে লাগিল।

নন্দ পঞ্চাননকে তুলিবার বহুবিধ চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ঘুমাইলে আর উঠে না।

নন্দ বাড়ি যাইবার সময় নেপথ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আপনাদের পঞ্চানন, একেবারে ঘুমিয়ে গেছে। তাকে তুলে শোয়াবার ব্যবস্থা করুন।

এই কথা বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

বাংলা কাব্যে ভাবতান্ত্রিকতা ও রহস্যময়তা চরমে পৌঁছিয়াছে—মনে হয় ইহার স্বাভাবিক অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া আসন্ন এবং সে প্রতিক্রিয়া আসিবে কাব্যে বস্তুতান্ত্রিকতার অনুশীলনের প্রতিপ্রয়াসে। রবীন্দ্রনাথ রহস্যময় বাউলী ভাষায় যে ভাবগুলিকে গোপন রাখিয়াছেন, পরবর্ত্তী কবিরা সেই ভাবগুলিকে অলঙ্কৃত ধ্বনিগম্ভীর ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবে এবং বাস্তবিকতায় মূর্ত্তিদানের জন্য প্রয়াসী হইবে। সেজন্য মনে হয়, সুসংস্কৃত সুমার্জ্জিত যুক্তাক্ষর-বহুল সমাস-সঙ্কুল ভাষা আর একবার কাব্যরচনার চেষ্টা করিবে অর্থাৎ মধুসূদনের পৌরুষসবল ওজস্বী ভঙ্গি আর একবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবে। মহাকাব্য না হোক্—অন্ততঃ গীতিকবিতা ছাড়া অন্যান্য প্রকারের কাব্যরচনার চেষ্টা হইবে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের ভাবে বিভোর ও মুহ্যমান হইয়া আছে—এই বিহ্বলতার ঘোর একটু কাটিয়া যাইলেই—রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভঙ্গি, ভাষা, রহস্যময়তা ও রবীন্দ্র-কাব্যের অন্যান্য সকল উপাদান উপকরণকে

যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া চলিবার একটা প্রয়াস যে অদূরভবিষ্যতেই কাব্যরচনায় আসিবে, সে অনুমান বোধ হয় খুব অসঙ্গত নয়।

মুসলমান-কবিগণ ইরাণী ও আরবী শিক্ষাদীক্ষা সংস্কার ও প্রভাবকে বঙ্গকাব্যে 'অনুসীবন' করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—কোন' কোন' হিন্দুকবিও এই বিষয়ের অভিনবতা ও বৈচিত্র্যে আকৃষ্ট হইয়া নানা ভাবে ইরাণী ঋণ গ্রহণ করিতেছেন—ওমার খৈয়ামের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। ভবিষ্যতে মুসলমান-কবিরা আরবী ও ইরাণী বৈদগ্ধ্য ও রসপদ্ধতিকে অধিকতর উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত প্রবর্ত্তন করিবেন বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়—তখন হিন্দু-কবিদের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রতিঘাত অনুভূত হইবে—তাঁহারাও তখন প্রাচীন ভারতের (বৈদিক পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগের) শিক্ষা দীক্ষা বৈদগ্ধ্য সংস্কার ও সভ্যতা-গৌরবকে বঙ্গসাহিত্যে পুনঃ-প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিবেন—ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। মুসলমান কবিরা যেমন পারশী ও আরবী সাহিত্য, ধর্ম্মগ্রন্থ ও ইতিহাস অনুশীলনে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিবেন, হিন্দুকবিরা তেমনি সংস্কৃত ও পালি ভাষায় লিখিত সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানশাখার গ্রন্থ অধ্যয়নে উপাদান ও নব নব রচনাভঙ্গি আহরণ করিতে থাকিবেন—এইরূপ অনুমান স্বতঃসিদ্ধ। এই প্রতিক্রিয়াও হিন্দুকবিদের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—কবিবর সত্যেন্দ্রনাথই কোন' কোন' দিক দিয়া সুরু করিয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যাপকতা, ভারতের প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতাসম্বন্ধে বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্বগত গবেষণা, অনুশীলন ও গ্রন্থপ্রকাশ, নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যাভিমান, রবীন্দ্রনাথের জগদ্ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠার সহিত হিন্দু ভারতেরই গৌরব বৃদ্ধি, ভাষ্য টীকাটিপ্পনী সমালোচনা ও অনুবাদ সহ প্রাচীন গ্রন্থের সুসংস্কৃত মুদ্রণ ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের প্রভাব অদূর ভবিষ্যতে কাব্যসাহিত্যকে আবিষ্ট না করিয়া থাকিতে পারেনা—তাহার অনিবার্য্য ফলে, ছন্দে, অলঙ্কারে, ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে, ও কলাসৌষ্ঠবে বঙ্গকাব্যসাহিত্য সংস্কৃতের ও প্রাচীন বাংলার নানা জ্ঞানশাখার দ্বারা নানাভাবে প্রভাবান্বিত হইবে—এইরূপ অনুমান, বোধহয় অসঙ্গত নয়।

শ্রী............

দুঃখ-জাগানিয়া

প্রত্যূষে ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গেই অমরের মনে হ'ল যেন কোন এক মায়া-স্পর্শে আকাশের চেহারা একেবারে বদ্‌লে গেছে। সোনালি রৌদ্রের আভা তাহার ললাটে চক্ষে কোমল পরশ বুলিয়ে শরতের আগমন জানিয়ে দিলে। অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত বিশ্বপ্রকৃতির পানে সে স্তব্ধ-নেত্রে চেয়ে রইল। তার শুধুই মনে হতে লাগল "বৃথা এই জীবনের কোলাহল।" তার কবিচিত্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। কর্ম্মজীবনের দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকায় আজ কিছুতেই সে মনঃ-সংযোগ কর্‌তে পারছিল না।

অধ্যয়ন ও কর্ম্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে সে চিত্রশিল্পের সাধনা করেছিল। আজ তার কেবলই মনে হতে লাগল, কলালক্ষ্মী যেন হাতছানি দিয়ে তাকে কোন্ সুদূরের পথে ডাক্

দিচ্ছে। শারদ প্রভাতের এই অপরূপ শ্রী তাকে বিভোর করে তুল্‌লে। সে মনে মনে ঠিক্ করলে, এই ঝলসিত শ্যামল-অঙ্গ, কনককিরণ-কিরীট-বিমণ্ডিত, শেফালি-গন্ধ-মাল্য-ভূষণা শারদ-লক্ষ্মীর অপরূপ রূপ, এই "মধুর মহিমা হরিতে হিরণে" সে তুলির রংয়ে ফুটিয়ে তুল্‌বে, আর সেইটাই হবে তার Masterpiece.

অমর আপিস থেকে তিন মাসের ছুটি নিলে। বহুদিন-পরিত্যক্ত সাঁওতাল পরগণার মাঠের ধারের ছোট বাঙ্গলোটী সংস্কার করে সজ্জিত করবার জন্য লোক পাঠালে। তারপর এক শুভমুহূর্ত্তে তল্পিতল্পা বেঁধে পরিবারবর্গ নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়ল,—কর্ম্মমুখর মহানগরীর কোলাহল থেকে দূরে নির্জ্জনে সে কলালক্ষ্মীর সাধনা করবে, হৃদয়ের সমস্ত ভাব দিয়ে, সমস্ত প্রেরণা দিয়ে সে শারদলক্ষ্মীর অমলিন শ্রী ফুটিয়ে তুল্‌বে, তার Masterpiece আঁক্‌বে।

*　　　　*　　　　*

মাঠের মাঝে ছোট্ট বাড়িটী। সাম্‌নে দিগড়িয়া পাহাড়ের পাশে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চাতে গর্ব্বসমুন্নত মস্তকে ত্রিকূট খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। পার্শ্বে শালের বনের শাখায় শাখায় বাতাসের দোলা লেগে মর্ম্মরধ্বনি জাগিয়ে তুল্‌ছে, রক্তের মত লাল রাস্তাটী বিশ্বনারীর সীমন্তের সিঁদুরের মত জ্বল্‌ছে।

অমরের কবিচিত্ত পুলকে নৃত্য-করে উঠ্‌ল। এই ত তার সাধনার উপযুক্ত স্থান। এইখানেই তার কল্পনা মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠ্‌বে!

কাল প্রভাতেই সে আঁক্‌তে সুরু করবে। মডেলের অভাব সে কখনও অনুভব করেনি। তার-স্নেহলাবণ্যমণ্ডিতা স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী ছিলেন তার আর্টের একজন প্রধান উপাসিকা। তাঁকে সাম্‌নে রেখে অমর অনেক ছবিই এঁকেছে। এই অনিরুদ্ধ-যৌবনা কল্যাণীই হবে তার Masterpiece-এর মডেল।

(২)

প্রভাতের আলো ফুটে উঠেছে। স্ট্যাণ্ডের ধারে তুলি, রং সাজিয়ে নিয়ে, মডেলের গলায় শেফালির মালা দুলিয়ে, মাথায় মুকুট পরিয়ে হাতে ধানের গুচ্ছ দিয়ে, নীলাম্বরীর আঁচল দুলিয়ে দিয়ে, তাকে দূরে সোফায় বসিয়ে, অমর শিল্পীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে চারকোল তুলে নিয়ে ক্যান্‌ভাসের উপর রেখার পর রেখা টেনে চল্‌ল। কখনও ক্লান্ত চক্ষু পাহাড়ের দিকে জঙ্গলের দিকে ন্যস্ত করে প্রভাতের রূপসুধা পান করে নিতে লাগল। নির্জ্জন গৃহের ছায়া-সুশীতল প্রাঙ্গণে, বিশ্বপ্রকৃতির বুকের উপরে শিল্পী অমর ভাবপ্রণোদিত হয়ে একাগ্রভাবে রেখার পর রেখা টেনে চলেছে।

"বাবুজী"—

কেরে মূর্ত্তিমতী বাধা। অমরের কল্পনার নেশা ছুটে যেতে লাগল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে বাইরের দিকে ফিরে তাকালে,—এক চীরধারিণী ভিখারিণী।

"বাবুজী ময় কালসে ভূঁখা হুঁ—"

করুণ স্বর। কল্পনা ছুটে গেল। অমর একখানা চেয়ারে এলিয়ে বসে পড়ল। করুণ-হৃদয়া মডেল উঠে গিয়ে এই অনশনক্লিষ্টাকে কিছু খাদ্য পানীয় এনে দিয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে এসে বসল।

ভিখারিণী আহার করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে শিল্পী চিত্ত সংযত করে তার পানে চেয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু আর চোখ ফেরাতে পারলে না। এই ছিন্নবসনার মুখে যেন কি একটা দীপ্ত শ্রী আছে। কে এই নারী! অনশনক্লিষ্ট বদনে, অকালবার্দ্ধক্যের বলিরেখায়, রুক্ষকেশে, ছিন্নবেশে বিরাট দৈন্যের ছাপ। কিন্তু অশ্রুভরাদীপ্ত চক্ষু দুটির পানে চাইলে মনে হয়, এর যেন সবই ছিল,—হ্রীশ্রীরূপ যৌবনসম্পদ; যেন মনে হয় আছে আছে এর সবই আছে কিছু যায় নাই, শুধু দৈন্যরাহু-গ্রস্ত শুধু ভস্মাচ্ছাদিত। অমর এই সর্ব্বস্বহারা সর্ব্বসম্পদ-শালিনীর দিকে আর চাইতে পারছিল না।

সে উঠে গিয়ে আবার মডেলের দিকে তাকিয়ে ক্যানভাসের উপর রেখা টান্‌তে আরম্ভ করলে। প্রতিভার আকাঙ্ক্ষা তাকে উন্মাদ করে তুলেছে। কিন্তু রেখার টান আর বেশীদূর অগ্রসর হল না। শিল্পী যতবার চক্ষু মুদ্রিত করে, তার আরাধ্যা ফুল্লাধরা শারদলক্ষ্মীর ধ্যান করে, ততবারই এই ভিখারিণীর করুণ বদন দীপ্ত চক্ষু মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে উঠে।

বিরক্তিভরে 'চারকোল' ফেলে দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। ভিখারিণী তখন চলে গেছে।

(৩)

তিনদিন পরে। কাঠামো খাড়া হয়েছে। অমর তুলির রংয়ে তার "শারদলক্ষ্মীর" প্রশস্ত ললাটে, ভ্রূযুগলে, চূর্ণকুন্তলদামে ভাব ফুটিয়ে তুল্‌ছে। চিত্ত তার ভরপুর। প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশের নেশায় সে মস্‌গুল।

"বাবুজী"—

অমরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। আবার সেই বাধা! স্বামীর বিরক্তি বুঝতে পেরে অমরের স্ত্রী তাড়াতাড়ি কিছু খাদ্য এনে দিয়ে আগন্তুকের মুখ বন্ধ করে দিলে। ভিখারিণী খেতে লাগল। অমর আবার আঁকা সুরু করে দিলে। মডেলের দিকে উদ্‌গ্রীব চোখে চেয়ে, স্তিমিত নেত্রে সে কল্পনালক্ষ্মীকে মূর্ত্ত করতে লাগল। কিন্তু বারবার যেন কিসের আকর্ষণে তার চোখ ওই মূর্ত্তিমতী দৈন্যের ওই সর্ব্বস্বহারার মুখের উপর গিয়ে পড়তে লাগল। কি করুণ কি বিষাদভরা ঐ মুখ।

নিজেকে সংযত করে চিত্ত সমাহিত করে অমর আবার তুলির টান দিতে লাগ্‌ল। সে তার চিত্রের প্রশস্ত দীপ্ত চক্ষু দুটিতে মধুর মহিমামণ্ডিত আনন্দোজ্জ্বল অপরূপ ভাব ফুটিয়ে তুল্‌বে। বার বার চক্ষে তুলির টান দিয়ে সে দূরে সরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কৈ কোথায় সে স্নিগ্ধ হাসির আভা। এ যে দীপ্তচক্ষুদুটীতে শুধু বিষাদের কালিমা ফুটে উঠছে। এ কি হ'ল।

ঐ ভিখারিণী, ঐ চিরধারিণী, ঐ তার বিষাদ করুণ দীপ্ত দৃষ্টি! শয়তানের মত তাকে পেয়ে বসেছে। তার সমস্ত অন্তর ব্যেপে শুধু ঐ চোখ দুটী জেগে রয়েছে।

তার "শারদলক্ষ্মীর", তার Masterpiece-এর আশা চুরমার হয়ে গেল।

"সর্ব্বনাশী"——হাতের তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দুই হাতে মাথা চেপে অমর চেয়ারে এলিয়ে পড়ল।

স্ত্রী কাছে ছুটে এল।

কঠোর কণ্ঠে অমর বল্লে "যাও"।

ভিখারিণী বাইরে থেকে ক্ষীণ করুণার্দ্র স্বরে বল্‌লে "বাবুজী"।

অমর বজ্র-কঠিন নিনাদে হেঁকে উঠ্‌ল—"যাও—ভাগো"।

(৪)

উদ্ভ্রান্ত অমর আর ছবি আঁকে না। তার মনের আনন্দ কোথায় মিলিয়ে গেল। মডেল আবার গৃহধর্ম্মচারিণীরূপে গৃহকর্ম্মে স্বামীর সেবা-যত্নে মনোনিবেশ করেছে। অর্দ্ধ-অঙ্কিত চিত্র ষ্ট্যাণ্ডের উপর নির্ব্বাকভাবে দাঁড়িয়ে অমরের অকৃতকার্য্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। আপন রূপের পরিপূর্ণতায় শরতের আকাশ ঝলমল কর্‌ছে। ভিখারিণী আর আসে না, কিন্তু তার বিষাদ-করুণ মুখ অমরকে প্রেতের মত অনুসরণ কর্‌ছে।

কয়েকদিন পাগলের মত কাটিয়ে শিল্পী আবার নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করলে। সে আঁক্‌বে, আবার আঁক্‌বে। কোন মডেলকে লক্ষ্য করে নয়, কোন চিন্তালব্ধ প্রতিকৃতিকে সে রূপ দেবে না। নিজেকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে শুধু অন্তরের প্রেরণা দিয়ে এঁকে যাবে। ফেলে দেওয়া তুলি আবার সে তুলে নিলে।

অমর এঁকে চলেছে—দিনের পর দিন। পার্থিব কোন বস্তুতে তার আকর্ষণ নেই। ক্যান্‌ভাসের উপর তুলির টানে রংয়ের পর রং ফুটে উঠ্‌ছে। চিত্রে ভাব যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌ছে। কিসের এক মাদকতায় বিভোর হয়ে সে মন প্রাণ দিয়ে আঁক্‌ছে।

শেষ দিন। বহু আয়াসের বহু সাধনার চিত্রের ভাবদীপ্তচক্ষে শেষ তুলির রেখা টেনে দিয়ে দূরে সরে এসে শিল্পী তার রচনার পানে অনিমিষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

অপূর্ব্ব বর্ণবিন্যাসে একি মনোহর মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। এ'ত তার কল্পনার, তার ধ্যানের, হরিতে-হিরণে-শ্যামলিমায়মণ্ডিত হর্ষোজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী শারদলক্ষ্মী নয়। এ যে রুক্ষকেশা-চিকুরবসনা-দুঃখদৈন্যক্লিষ্টা-বিষাদস্তিমিতদীপ্তলোচনা অপরূপ মূর্ত্তি! কি সুন্দর! কি মধুর! কি ভাবময়ী!

মুগ্ধনেত্রে অমর চিত্রের পানে তাকিয়ে রইল। সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে তার মাথা নত হয়ে গেল।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠ্‌ল—"বুঝেছি, মা ভারতলক্ষ্মী, বিলাসশ্রীমণ্ডিতা রমণীকে আশ্রয় করে আমি তোমার ধনসৌভাগ্যগর্ব্বস্ফুরিতাধরা—"শারদলক্ষ্মী" রূপ আঁক্‌তে চেয়েছিলাম। মা, সে'ত তোমার সত্যরূপ নয়। তাই তুমি চিরধারিণী ভিখারিণীর বেশে দেখা দিয়ে, আমার সমস্ত চিত্তে ব্যেপে থেকে তোমার স্বরূপ প্রকাশিত করে নিলে। কল্পনার মোহে ভুলে আর রঙ্গীণ স্বপ্ন দেখ্‌তে চাইনে। মাগো, তোমার এই "দুঃখ-জাগানিয়া" মূর্ত্তি যেন আমার অন্তরে বাহিরে জেগে থেকে আমায় চিরদিন কষাঘাত করে।"

শ্রীশান্তিকুমার রায় চৌধুরী

গয়া

(প্রতিবাদ)

শ্রাবণের বঙ্গবাণীতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গয়া সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি কয়েকটী প্রশ্ন করিতে চাই। ভরসা করি তিনি আমার এই বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন।

১। তিনি লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি জাপান সম্রাটের দান। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ আছে কি না?

২। বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার মঠের মোহন্তমহারাজ শ্রীযুক্ত ডাক্তার মজুমদার মহাশয়ের মতে বৈষ্ণব। এই কথাটী তিনি কোথায় পাইলেন? তাঁহার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের নিকট এইরূপ কথা কেহই প্রত্যাশা করিতে পারে না। মোহন্ত মহারাজ ও তাঁহার শিষ্যগণ শৈব বলিয়াই জানি।

৩। বোধিবৃক্ষ তলে খুব কম হিন্দুই পিণ্ডদান করেন। তিনি যে পূতিগন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন উহা কিরূপ? আমরা বহুবার বুদ্ধগয়ায় গিয়াছি—মোহন্তমহারাজের ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর যতই দোষ থাকুক না কেন মন্দির ও তন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান সব সময়েই পরিষ্কার থাকে। সরকারী মন্দির রক্ষক (Custodian of the temple) ও ঐ বিষয়ে দেখিতে বাধ্য।

৪। পরিশেষে নিবেদন এই যে মন্দিরে যাঁহার যেরূপ পূজার অভিরুচি তিনি সেইরূপই পূজাধিকার ভোগ করেন। অখাদ্যভোজী ভূটীয়া ও তিব্বতীগণ যেরূপ মাংসের ভোগ দিয়া তৃপ্ত হন, গো-খাদক সিংহলীগণও তদ্রূপ নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পূজা দেন। মন্দিরে সকলেরই অবাধ গতি বলিয়া আমরা জানি—জানি না অধ্যাপক ডাক্তার মজুমদার মহাশয় এই সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন কি না।

বসুমতীতে' এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম এবং উহারই ফলে অধ্যাপক মজুমদার মহাশয়ের উক্তিগুলি অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে। আমি জিজ্ঞাসু হিসাবে তাঁহাকে উপরোক্ত কয়েকটী প্রশ্ন করিলাম—ভরসা করি তিনি অপরাধ লইবেন না।

শ্রীননীগোপাল সমাদ্দার
'পাটলিপুত্র' বাঁকিপুর

(প্রত্যুত্তর)

১। এই বুদ্ধমূর্ত্তিটী অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের পুরোহিত বলিলেন যে ইহা জাপান সম্রাট দান করিয়াছেন। ইহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না। বিশেষতঃ মূর্ত্তিটী জাপানী ঢংয়ের বলিয়া মনে হইল।

২। মোহন্ত মহাশয়ের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল—তিনি বলিলেন যে বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার। অতএব বৈষ্ণবদের এই মন্দিরে সম্পূর্ণ অধিকার আছে—ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে মোহন্ত বৈষ্ণব—এতদ্ব্যতীত বহুদিন পূর্ব্বে দৈনিক সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে এক বৈষ্ণব মোহন্ত বুদ্ধগয়ার মন্দির দখল করিয়াছেন। যাহা হউক উপরোক্ত দুইটী বিষয়ে আমি আরও অনুসন্ধান করিতেছি—অনুসন্ধানের ফলাফল বঙ্গবাণী মারফতে পাঠকবর্গকে জানাইব।

৩। প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর অন্য কোন প্রমাণ নাই। আমি স্বয়ং দুর্গন্ধ অনুভব করিয়াছি ও পিণ্ডাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সুতরাং এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

৪। এ সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই। ভূটীয়া, তিব্বতী, সিংহলীরা নিজের রুচি অনুসারে বুদ্ধগয়ায় পূজা দিবে ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

প্যারীচাঁদ মিত্রের বঙ্গভাষা

(৪)

বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন ঃ—"পঠদ্দশা হইতেই প্যারীচাঁদ মিত্র নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপরায়ণ যুবক। ইংরাজি ও সংস্কৃত ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ এবং মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য পুস্তক ছিল। শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। তাই অল্প বয়সেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ জগতের স্রষ্টা, ও পালন কর্ত্তা, এক ঈশ্বর। দ্বিতীয় কোন শক্তি বর্ত্তমান নাই। এক ঈশ্বরই সর্ব্বমূলাধার। তাই তিনি সেই অল্পবয়সেই একেশ্বরবাদী বা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তাঁহার সেই নবীন বয়সের ধর্ম্মবিশ্বাস বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ও দৃঢ় হইয়া পরিণত বয়সে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছিল।"

প্যারীচাঁদ মিত্রের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; নিজ বাটী নির্ম্মাণের সময় তৎসম্মুখে শিবমন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠতার জন্য প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণের পৈতৃক ধর্ম্মে বিশ্বাস কতকটা শিথিল হইয়া যায়।*

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ অনুজ কিশোরীচাঁদের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম অনুশীলনার্থে Hindu Theophilanthropic Society নামে একটি সভা স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানের একটি বাঙ্গালা নামও ছিল। কারণ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবী ইহার সহিত বিশেষভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন এবং সভার মাসিক অধিবেশনে সময়ে সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতেও বক্তৃতা হইত। আমরা এই সভাকে "হিন্দু বিশ্ব-প্রেমোদ্দীপনী সভা" বলিয়া আখ্যা দিব। সভার প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির ভূমিকায় এইরূপ লিখিত আছে;—"ভারতের নবজীবন যে তাহার নৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতির প্রতি যত্নবান না হইলে সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই যে সত্যটি অপ্রতিহতভাবে উত্থিত হইতেছে—ইহাই এই সভার জন্মহেতু।" অপরন্তু এই ভূমিকাতে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ ব্যক্ত আছে, "হিন্দুগণকে পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বজাতীয়গণ এবং আপনাদিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্রতম কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করান ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য।" এই সভা প্রায় চারি বৎসর কাল স্থায়ী ছিল।

ইহার পর ইনি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সাধনা করিতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, American Unitarian Association হইতে ধর্ম্মযাজক সি, এচ, এ, ডল সাহেব এদেশে আগমন করিয়াছিলেন এবং Unitarian Society for the Propagation of Gospel in India নামক একটী একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসভা স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই সভাতেও প্যারীচাঁদের সহানুভূতি ছিল।

* বঙ্গবাণীতে ১৩৩০ সালে বৈশাখ মাসে (দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়) শ্রীশিবরতন মিত্র মহাশয় প্রণীত রাজা রামমোহন রায় প্রবন্ধ।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর লোকান্তরগমন ঘটিলে প্যারীচাঁদ পত্নী-বিয়োগে কাতর হইলেও, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ম্লান না হইয়া বরং অধিকতর শক্তি লাভ করিল। তিনি এই সময় হইতে পরলোকতত্ত্ব ও মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রেততত্ত্ববাদীদের সহিত পত্রালাপ আরম্ভ করেন এবং তৎসঙ্গে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন।

লণ্ডন মহানগরী হইতে প্রকাশিত Spiritualist, আমেরিকা মহাদেশ হইতে প্রকাশিত American Year-book of Spiritualism, Banner of Light, Medium and Daybreak প্রভৃতি পত্রিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ার Harbinger of Light পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অসামান্য গুণসম্পন্ন কর্ণেল অলকট্ ও ম্যাডাম ব্লাভেটস্‌কি নিউইয়র্ক মহানগরীতে Theosophical Society গঠিত হইবার অব্যবহিত পরে প্যারীচাঁদের ধীশক্তি ও গবেষণার গুরুত্ব অবগত হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের মণ্ডলীর ব্রাদারহুড-ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এসিয়া মহাদেশের কোনও মহাপুরুষ এই সম্মানে সম্মানিত হন নাই। পরে যখন ইঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন প্যারীচাঁদের অনুরাগপূর্ণ আগ্রহের ফলে কলিকাতা নগরীতে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার সর্ব্বপ্রথম সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

আমরা প্যারীচাঁদ প্রণীত "উপাসনা" নামক একটি প্রবন্ধ নিম্নে প্রকাশ করিলাম। বলাবাহুল্য প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ নহে এবং তাঁহার জীবিতাবস্থাতে ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

উপাসনা

উপাসনা নানা প্রকার হইয়া থাকে। যে, যে প্রকার করিয়া মনের তৃপ্তি পায়, তাহার সেইরূপ করিয়া উপাসনা করাই ভাল। নাস্তিক হওয়া অতি ভয়ানক। নাস্তিকের মুক্তি ইহলোকে হয় না। জগতে উপাসনা নানা প্রকার আছে। উপাসনা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সাকার ও নিরাকার। সাকার উপাসনায় বহু দেবতার উপাসনা হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ উপাসনাতে ক্রমশঃ নিরাকার উপাসনা আইসে। নিরাকারবাদী বলিলেই নিরাকারবাদী হয় না। নিরাকার উপাসনা করিতে গেলে বিশেষ সাধনা করিতে হইবেক। সে সাধনা কিরূপ হইবেক তাহা বলি শুন।

দেহ পঞ্চভৌতিক পদার্থে গঠিত। তাহা হইতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই সকল জ্ঞান অনুভব করা যায়। এই সকল হইতেই রিপু সকলের উৎপত্তি। ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি কিছুই ব্যর্থ করেন নাই। স্বর্ণ যেমন অগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ হয়, তেমনি মানবসকল সাধনার দ্বারা রিপু সকলকে নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করে।

আত্মা ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থিত। ইহার শক্তি সমস্ত শরীরে চালিত হয়। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ভ্রূর মধ্যে, তথা হইতে কণ্ঠে, কণ্ঠ হইতে হৃদ্দেশে, হৃদ্দেশ হইতে মণিপুরে, তথা হইতে গুহ্যে, এইরূপে আত্মা কুলকুণ্ডলিনীতে নিক্ষেপ করত, প্রাণায়ামের দ্বারা মেরুদণ্ড দিয়া ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীকে অবলম্বন করিয়া পুনরায় ব্রহ্মরন্ধ্রে চালিত হয়। ঐকান্তিক ভক্তির সহিত ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া সাধন করিবে। এইরূপ করিতে করিতে শম (বিষয় হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ), দম (বাহেন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি), উপরতি (ঈশ্বর, পরলোক ও আত্মচিন্তা), তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা, অর্থাৎ সমাহিত ও শান্ত অবস্থাতে থাকা),—এই সকল অভ্যাস করিতে হইবেক। সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তার দ্বারা এই সকল অভ্যাসিত হইয়া আসিলে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইতে থাকিবে। যত সূক্ষ্ম শরীরের উদ্দীপন হইবে, ততই পারলৌকিক জ্ঞানের বৃদ্ধি হইবে ও ধ্যান শক্তির দ্বারা উত্তমতা বোধ হইবে। যত এইরূপ শক্তি পাইবে, ততই শরীরে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশ হইবে। যতই ব্রহ্মজ্যোতি বৃদ্ধি হইবে, ততই মঙ্গলময়ের মঙ্গলভাব মনোমধ্যে আসিবে,

তখন আর বৈকারিক ভাব মনকে কলুষিত করিতে পারিবে না। শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, শরীরে যে ষট্‌চক্র আছে, তাহা হইতেই বৈকারীয় ভাবের উৎপত্তি তাহাকে প্রাণায়ামের দ্বারা বশীভূত করিতে পারিলে জীবের ভববন্ধন মোচন হয়, পার্থিব বাসনা নির্ব্বাণ হয়। সদাই আনন্দলাভ করে। যত এইরূপ ধ্যান করিবে, তত মনে হইবে, তুমি যেন এজগতে নাই, তোমার আধ্যাত্মিক জগতের সহিত যোগ স্থাপিত হইতেছে। শারীরিক ভাব খর্ব্ব হইতে থাকিবে ও ব্রহ্মজ্যোতিই জীবনস্বরূপ জ্ঞান হইবে। তখন আর আত্মপর জ্ঞান থাকিবে না। এই ষট্‌চক্রের এক এক স্থানে এক এক ভাবের উৎপত্তি হয়। সর্ব্ব নিম্নে কেবল পশুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। তদুপরেও ঐরূপ বৈকারিক ভাবের উৎপত্তি হয়। এই ষট্‌চক্রের মধ্যে চার চক্রে কেবল রজ ও তম ভাবের উৎপত্তি অধিক হয়। আর উর্দ্ধের দুই চক্রের মধ্যে সাত্ত্বিকভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন মানব চক্রাতীত হয়, তখনই ব্রহ্মজ্যোতি লাভ হয়। যখন মানুষ ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকে তখন তাহার আর পার্থিব সুখকে সুখবোধ হয় না, দুঃখকেও দুঃখবোধ হয় না। তখন তাহার সকলই সমজ্ঞান হয়। তিনি ভাবেন, আমি ইহ জগতে নাই; আমার দেহ হইতে আমি স্বতন্ত্র; আমার আত্মা ঐশ্বরিক পদার্থ; আমি তাঁহাকেই লাভ করিতে এই মর জগতে আসিয়াছি; আমার সকলের সহিত সম্বন্ধ অল্প দিনের জন্য; যাঁহার সহিত যোগস্থাপন করিতে হইবে, তাঁহার সহিত যোগস্থাপন, করাই আমার জীবনের মহৎ কার্য্য ও তাহাই উদ্দেশ্য। এ সংসারে থাকিয়া কেবল তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্য করেন—আর সেই মঙ্গলময় পিতার ধ্যানে মগ্ন থাকেন। সংসারের কোন বস্তু তাঁহা অপেক্ষা তাহার প্রীতিকর হয় না। তিনি সর্ব্বদা ইহা মনে করেন যে, আমি সংসারে অল্প দিনের জন্য আসিয়াছি; কেবল ব্রহ্মলাভই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাহা যাহাতে করিতে পারি, আর তাঁহার কার্য্যে জীবন যদি উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আপনাকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করি। ইহ জগতে তাঁহার কেহ শত্রু নাই, সকলকে তিনি সেই মঙ্গলময়ের সন্তান ভাবিয়া সকলকেই আত্মীয় জ্ঞান করেন ও সকলের সুখে সুখী ও সকলের দুঃখে দুঃখী হন। আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, তিনি তাহার মূলে বর্ত্তমান। তাঁহা ছাড়া আমরা মৃতবৎ, কোন শক্তি আমাদের এমন নাই যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কার্য্য করি।

যে মানব আপনার শক্তি প্রকাশ করে, সে অতি ভ্রান্ত, আমাদের নিজের বল এমন নাই যে, তাঁহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া চলি; আমাদের অন্তরে তিনি সর্ব্বদা ধর্ম্মবল দিয়া ধর্ম্মের পথে আকর্ষণ করিতেছেন। শিশু যেরূপ প্রতি পদে পদস্খলিত হয়, আমরাও তেমনি এই সংসারক্ষেত্রে চলিতে প্রতি পদেই প্রলোভনে পড়িয়া পদস্খলিত হইতেছি। কিন্তু কৃপাময়ের কৃপায় তিনি জীবসকলকে সন্তাননির্ব্বিশেষে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন। আমরা যত দুর্ব্বল হই না কেন, পাপী হই না কেন, তাঁহার অসীম দয়াতে কেহ কখন বঞ্চিত হইব না। সন্তান যতই দোষী হউক না কেন, মাতা যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ বিশ্বজননীর অনিমেষ দৃষ্টি সকল প্রাণীতেই রহিয়াছে। যাহার যেরূপ অবস্থা উপযোগী, তাহাকে সেইরূপ অবস্থাতে রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন। আমরা কেবল বহির্জগতের প্রতি দৃষ্টি করি, কিন্তু অন্তর জগতের ব্যাপার কিছুই অনুভূত করিতে পারি না। কিন্তু তিনি উভয় জগতের কার্য্য-শৃঙ্খলায় মানবকে নিযুক্ত করিতেছেন। আমরা তাঁহার অসীম শক্তির ব্যাপার কিরূপে বুঝিতে পারিব? তবে আমাদের সকলের উচিত, সেই মঙ্গলময় পিতার যাহাতে অধীন হইয়া থাকি, তাহাই উচিত। মনের মধ্যে ইহা ভাবা উচিত যে, আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম, কে আমায় এত সুখে রাখিয়াছেন? কৈ আমি তাহার প্রতিদান কি করিতেছি? তাঁহাকে কি দিতে হইবে? প্রতিদানে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দিতে হইবে। আর তো তিনি কিছুই চান না।

শ্রীস—

স্বদেশ-সেবার নব্য-ন্যায়*

মানুষের মুড়োর বেপারী

কলিকাতার বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়ান আমার কিছু কিছু অভ্যাস আছে। আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না, আমি দেখেছি কোন কোন মেছুনি মাছের মুড়োর কারবার করে, মুড়ো সাজিয়ে রাখে, কোনটা কাতলা, কোনটা বোয়াল, কোনটা রুই ইত্যাদি। কারো ইচ্ছা হয় দাঁড়িয়ে দেখে, কারো ইচ্ছা হয় কিনে, কেহ বা ওদিকে তাকায়ও না। ঘটনাচক্রে এই মছুনির ব্যবসার সঙ্গে আমার ব্যবসার কিছু সাম্য আছে। আমার ব্যবসাও মুড়োর ব্যবসা, তবে সে মুড়ো মাছেরও নয়, পাঁঠারও নয়, ভেঁড়ারও নয়। এ হচ্ছে মানুষের মুড়োর কারবার। অবশ্য মুড়োগুলোকে রক্ষাকালীর বাচ্চার মতন থালায় সাজিয়ে রেখে ঘুরে ঘুরে বেড়ান অথবা মা জগদম্বার মতন মুণ্ডমালা পরে ধেই ধেই করে নাচা আমার কারবার নয়। আমার কারবার মুড়োগুলিকে জরীপ করা। প্রথমেই দেখি মাথার ভিতর ঘি কতকটা আছে, কোন্ দিকে মাথাটা চল্‌ছে, ডাইনে কি বাঁয়ে। পুরোণো মগজগুলিতে কি রকম চিন্তা কিলবিল করত, এখনকার গুলিতেই বা কি রকম করে। দ্বিতীয় নম্বর কারবার হচ্ছে - মানুষের মুড়োগুলির বাড়া-কমা তদ্‌বির করে বেড়ান। কে বড় হল, কে ছোট হল, কোন্ মুড়োটা পচে গেছে, কোন্ মুড়োটা নতুন কিছু করে ছাড়বে—এই সব খোঁজ করা আমার মুড়ো-তদবির করার সামিল। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে—মানুষের মুড়োর চাষ চালানো। মগজগুলিকে ঘাড়ের উপর ঠিক রেখে তার আবাদ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এই ব্যবসার অন্তর্গত।

ন্যায়-শাস্ত্রের জন্ম-জীবনের অভিজ্ঞতায়

আজ যে কথা বল্‌ছি তাতে কাজের কথা পাবেন না, কোন কাজের ফর্দ্দ নিয়ে এখানে দাঁড়াই নি। নতুন ঢঙের কতকগুলি মুড়ো আবাদ করা যায় কিনা তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আজকার কাজ। অর্থাৎ নতুন রংএর চিন্তাপ্রণালী বা নতুন ধরণের খেয়াল আজকার আলোচ্য বস্তু! এরই নাম নব্য-ন্যায়। আমরা সকলেই ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করে' থাকি। মানুষ মাত্রেই নৈয়ায়িক। কিন্তু মামুলি ন্যায়শাস্ত্রে আর আমি যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা করি তাতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আপনাদের ন্যায়শাস্ত্র থাকে কেতাবে, বিশ্বকোষে,—আলমারীতে টেবিল চেয়ারে, ইস্কুল-মাষ্টারের দপ্তরে, বড় বড় পণ্ডিতের ঘরে। আর আমি যে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা চালিয়ে থাকি সেটা বিরাজ করে রামা-শ্যামার হাঁড়িকুঁড়ির ভিতর, মুড়িমুড়কির ভিতর, প্রতিদিনকার খাওয়া-দাওয়ার ভিতর, প্রত্যেক মানুষের উঠাবসার ভিতর। যখন দেখতে পাই মজুরের সঙ্গে মনিবের কিছু কোন্দল চল্‌ছে তখনই বুঝি কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র চুঁইয়ে পড়্‌ছে। আবার যখন মেথরের সঙ্গে মোলাকাৎ হয় তখনও কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র দখল করি। রিকসওয়ালার সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা বলে' তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হই তখন দেখি যে খানিকটা ন্যায়শাস্ত্র আমার প্রাণে

* জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত বক্তৃতার শর্টহ্যাণ্ড বিবরণ। শর্টহ্যাণ্ড লইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার চৌধুরী।

পদার্পণ করছে। যখন স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া চল্‌তে থাকে তখনও আবার নিংড়ে নিংড়ে খানিকটা ন্যায়শাস্ত্র আমি পাকড়াও করতে পারি। এই ধরণে যখন যেখানে মানুষের প্রাণ, মানুষের ছায়া মানুষের আশা, মানুষের দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখ্‌তে পাই, তখন সেখানে কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র আমা সঙ্গে দেখা করে। দেখতেই পাচ্ছেন—ঝালে ঝোলে অম্বলে, ছেলেছোকরাদের হোস্টেল-মেসে, ষ্টীমার-খালাসীদের ইউনিয়নে, কেরাণীদের ঘোঁটমঙ্গলে,—যত রাজ্যের জায়গায় হতে পারে,—সর্ব্বত্র চল্‌ছে আমার ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা। প্রত্যেক বিন্দু মাথার ঘাম আর প্রত্যেক মাংসপেশীর নড়ন-চড়ন এক একটা ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিমূর্ত্তি। অর্থাৎ এই যে মানব-জীবন, মানুষের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কাজ, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা, এর কোথাও ন্যায়শাস্ত্র বাদ পড়ে না। কাজেই বুঝা যাচ্ছে মামুলি ন্যায়শাস্ত্রে আর আমার ন্যায়শাস্ত্রে প্রভেদ কত বড়।

স্বদেশ-সেবা ও স্বরাজ-সাধনা

আমি আজকে স্বদেশ-সেবার কথা বলচি, স্বরাজ-সাধনা বা স্বরাজ-সেবার কথা বল্‌ছি না। এখানে মামুলি ন্যায়শাস্ত্রে আর নব্য-ন্যায়ে একটা বড় প্রভেদ। মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তায় স্বরাজ-সাধনা ও স্বদেশ-সেবা প্রায় এক বস্তু। আলজেব্রার "ইকুয়েশনে" এ সাম্যের চিহ্ন ব্যবহার করা দস্তুর। তেমনি মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের বিধানে স্বরাজ-সেবা আর স্বদেশ-সেবা ঠিক যেন একই সাম্য-সংযোগের দুই তরফ মাত্র। কিন্তু নব্য-ন্যায় বলছে—এই "ইকুয়েশন" বা সাম্য-সম্বন্ধটা সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কিনা সন্দেহ। এই দুই জিনিষে কমসে কম ৩।৪ রকম পরস্পর সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া সম্ভব। (১) স্বদেশ সেবা যে করছে সে হয়ত স্বরাজ কোন দিন নাও আন্‌তে পারে। (২) যে লোকটা স্বরাজ স্বরাজ করে বেড়ায় সে লোকটা হয়ত একদম স্বদেশ-সেবক নয়। (৩) স্বদেশ সেবা কর্‌তে কর্‌তেই স্বরাজটাকে এনে হাজির করা হয়ত একদম অসম্ভব নয়। (৪) স্বরাজ-সেবকেরা কেহ কেহ হয়ত স্বদেশ-সেবকও বটে। দেখাই যাচ্ছে যে, আমি তর্কশাস্ত্রের কচ্‌কচানির ভিতর এসে পড়েছি। মোটের উপর যখন-তখন যেখানে-সেখানে স্বরাজ-সাধনা আর স্বদেশ-সেবাকে একার্থক বিবেচনা করার বিরুদ্ধে একটা সন্দেহ সৃষ্টি করা নব্য-ন্যায়ের বিপুল কাজ। এই সংশয়-বাদ যদি জেগে উঠে তাহলে বুঝ্‌ব নব্য-ন্যায়ের কাজটা চল্‌ছে ভাল।

বিদেশ-দক্ষতা ও স্বদেশ-সেবা

আগেই বলেছি যে, আমার ন্যায়-শাস্ত্র যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়—ইস্তক জেলখানা পর্য্যন্ত। সুভাষ বেরিয়ে এল জেলখানা থেকে। অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের লোক এসে হাজির আমার কাছে। বল্লে "নানা লোকে নানা প্রকার মত দিচ্ছে। তোর কি বক্তব্য ?" জবাব দিলাম, —"সুভাষ, যাও চলে ইয়োরোপে, যাও চলে আমেরিকায়, যাও চলে জাপানে" ইত্যাদি। মজার কথা সেই সময়ে দেশের লোকে সকলে বলছে—টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম, চিঠির পর চিঠি আস্‌ছে, সকলে বল্‌ছ—"যাক বাঁচা গেল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল।" অতএব বুঝুন নব্য-ন্যায়ে আর মামুলি ন্যায়ে তফাৎ কতটা। তারপর দেশের লোক সকলে সুভাষকে পরামর্শ দিচ্ছে। বল্‌ছে, "সুভাষ, লেগে যা আবার দেশের কাজে।" নব্য-ন্যায় অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফতে বলে দিলে,—"সুভাষ, থাকো ভুলে দেশটাকে ২।৪।৫।৭ বৎসরের জন্য।" আবার বুঝুন মামুলি ন্যায়ে আর নব্য-ন্যায়ে ফারাক কি মারাত্মক রকমের।

সরকারী তদন্তগুলার ধরণ-ধারণ

প্রশ্ন হচ্ছে---নব্য-ন্যায় এতটা বিদেশী-আন্দোলন, বিদেশ-দক্ষতা, বিদেশ-নিষ্ঠা প্রচার করছে কেন? কথাটা অতি সোজা। একটা দৃষ্টান্তে পরিষ্কার হবে। ১৯১৫ হতে ১৯২৭ সন এই ১১।১২ বৎসরের ভিতর আপনারা দেখেছেন গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি কমিশন বসিয়েছে। একটার নাম শিল্প (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল) কমিশন, আর একটার নাম খাজনা তদন্ত সমিতি (ট্যাক্‌সেশ্যন এন্‌কোয়ারী কমিটি), আর একটার নাম আর্থিক অনুসন্ধান সমিতি (ইকনমিক এন্‌কোয়ারী কমিটি), একটার নাম শুল্ক তদন্ত সমিতি আর একটার নাম কারেন্সী কমিশন। এই সবগুলা আমার বিদেশে থাকার সময় বসেছিল। এসে দেখছি কৃষি-কমিশন বস্‌ল। কালকে হয়ত বসবে শাসনপ্রণালী সম্পর্কীয় (কনষ্টিটিউশন্যাল) কমিশন। এই ৫।৭টী কমিশন আপনারা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছেন বসেছে।

এখন জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই কমিশনগুলির কার্য্য প্রণালী কিরূপ? প্রথমতঃ এই কমিশনের সভায় দুই ধরণের লোক বসে:—(১) ইংরেজ, সাদা চামড়াওয়ালা, (২) ভারত সন্তান। এই কমিশনগুলির ভিতর দেখতে পাচ্ছেন—বিদেশী আদ্‌মি রয়েছে। আপনারা বল্‌তে পারেন—দেশটা যখন সাদা চামড়াওয়ালাদের তখন কমিশনগুলির ভিতর বিদেশী মুড়ো থাকবে তাতে আশ্চর্য্য কি? এখানে বলতে চাই কারণটা কি তার আলোচনার প্রয়োজন নাই, দেখতেই পাচ্ছেন---বর্ত্তমান ভারতটাকে চালাবার জন্য যে-কয়টা অনুসন্ধান-সমিতি বসেছে, তার ভিতর কতকগুলি বিদেশী মুড়ো আছেই আছে। এই গেল প্রথম কথা। দ্বিতীয়তঃ এই কমিশনগুলির কাজ কর্ম্ম কিছু বিচিত্র রকমের। ওরা ভারতবর্ষের এক একটা সহরে এসে কতকগুলি লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে, সাক্ষীর জবানবন্দী নেয়। কিন্তু মাত্র এতে সানায় না। কমিশন ভারতের অনুসন্ধান খতম করে ইংরেজ সমাজে যায়। সেখানে গিয়ে ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-যম সকলকে ডেকে বলে, "ভারতবর্ষে একটা কিছু করা হচ্ছে, তোদের কি মতামত? কি করলে দেশটা উন্নত হবে মনে করিস?" তারপর ইংরেজদের মাসতুত ভাই আমেরিকাকে ডেকে পাঠায়। ফরাসী জার্ম্মাণ ইতালিয়ানদের এখনো বড় একটা ডাকে না। তবে বিদেশের মাথাওয়ালা লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালানো একটা প্রধান দস্তুর বেশ বুঝা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে উন্নত করবার জন্য যতগুলি প্রণালী আছে তার ভিতর একটা প্রণালী হচ্ছে বিদেশী মুড়োগুলির মতামত গ্রহণ করা।

তারপর কমিশনের রিপোর্ট ছাপা হয়ে বের হয়। সেই রিপোর্টে কি থাকে? বাঙ্গালীরা কয়জন সেই রিপোর্ট পড়ে দেখেন জানিনা। তবে আমাদের খবরের কাগজওয়ালারা অবশ্য সে সব পড়্‌তে বাধ্য। সূচীপত্র খুল্লে দেখা যায় যে, ভারত বর্ত্তমানে কি অবস্থায় এসে পৌঁছিয়েছে একথাত থাকেই, তার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনের রিপোর্টগুলোয় আর একটা নতুন জিনিষ থাকে। সেটা হচ্ছে ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণ, আমেরিকান, জাপানী ইত্যাদি সমাজ ট্যাক্‌স্ সম্বন্ধে, শিক্ষা সম্বন্ধে, ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে, কবে কোন্ প্রণালী অবলম্বন করেছিল ও তার ফল কি হয়েছে। আর আজকাল তারা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী কোন্ আইন চালাচ্ছে তারও একটা চুম্বক দেওয়া থাকে। দেখুন দেশটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। কিন্তু কমিশন বস্‌ছে "ঘরে বাইরে।" তারপর প্রকাশ করা হচ্ছে বিদেশের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় কিম্বা সামাজিক উন্নতি-অবনতির ইতিহাসের এক ছটাক। এইরূপ দেশী-বিদেশীর তথ্য-পঞ্জিকা রূপে রিপোর্টগুলা আমাদের সকলের কাছে এসে হাজির হয়।

রামচন্দ্র মল্লিক, হরিহর পোদ্দার, ইস্মাইল, আবদুল ইত্যাদি লেখক-পাঠক-সম্পাদক-সাংবাদিক-উকিল-বক্তা সকলকেই বইগুলার খতিয়ান করা দরকার হয়। প্রশ্ন হচ্ছে—এই বইগুলা আমরা ভাল রকম বুঝি কি? খবরের কাগজওয়ালাদের যখন জিজ্ঞাসা করি—"ট্যাক্স সম্বন্ধে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কি মত দিচ্ছ ভায়া?" তখন সাধারণতঃ তারা বলে থাকে, "আরে ভাই, এ সব আমরা বুঝি টুঝি না। এসব বিশেষজ্ঞের জিনিষ। আমরা খবরের কাগজ চালাই, এ বিষয়ে আমরা এক্সপার্ট নই।" খবরের কাগজওয়ালারা হয়ত বা অতিমাত্রায় বিনয়ী। এই জন্যই হয়ত এতটা নম্রতা। তবে আমি আমাদের কাগজগুলা পড়ি, বিদেশেও এগুলো পড়েছি। এইসব কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে দেখ্‌ছি যে, বাঙ্গালী লেখক নিজ নাম সই করে' এ "স্বাধীন" কোনো সমালোচনা ছাপে নি। ৫।৭টী কমিশন হয়ে গেল। কিন্তু কোনো সমালোচনা স্বপক্ষে হ'ক বিপক্ষে হ'ক বাঙ্গালীর কলমে বেরিয়েছে কি? হয়ত বা কিছু কিছু বাঙ্গালীর লেখা স্বাধীন সমালোচনা বেরিয়েছে। কিন্তু আমার নজরে বড় একটা পড়ে নি।

যাক্ সে কথা। রিপোর্টগুলার সমালোচনা করা কিরূপ কাজ? ধরা যাক্ একখানি বই আছে। তার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে বলবার অধিকার হয় কখন? বইএর ভিতর যে মাল আছে তা যখন দখল করতে পারি তখন। স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বল্‌তে হয় বইএর মালটা আগে হজম করতে হবে। পাঠকদের ভিতর যারা স্বপক্ষে বা বিপক্ষে বলছে তাদের হয়ত বা এই বইএর মাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, তা নইলে এ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পারে না। এ অতি সোজা কথা। বইটা বুঝ্‌তে হলে কি কি জানা দরকার? অনেক-কিছু; কিন্তু প্রধানতঃ বিদেশ, কেননা ইংরেজেরা, ফরাসীরা, জার্ম্মানরা, মার্কিনরা, জাপানীরা ১৯১৮ সন হতে ১৯২৫ সন পর্য্যন্ত এই এই করেছে, ১৯২৬।২৭ সনে এই এই করতে চাচ্ছে এ সব কথা রিপোর্টগুলায় লেখা থাকে। এ সম্বন্ধে সমালোচনা হতে পারে কখন? আমি যদি জানি যে জার্ম্মানি ১৯১৮ সনে বাস্তবিক পক্ষে অমুক অমুক কাজ করেছে, জাপান ১৯২৫ সনে এই এই করেছে, ১৯১৫ সনে ইংরেজরা অমুক ধরণের কাজ করেছে তবেই এই সকল তথ্যবিষয়ক বইয়ের সমালোচনা করা সম্ভব।

যখন সুভাষকে বল্লাম—"থাকো ভুলে দেশকে বছর কয়েক, আর যাও চলে ইয়োরোপে আমেরিকায় জাপানে" তখন গোটা ভারতকে একথা বলেছি। ভারতের নরনারীকে ঠেলে তুলবার কলই হচ্ছে বিদেশ-নিষ্ঠা। এই বিদেশ-নিষ্ঠার যুক্তিশাস্ত্রটা আরও তলিয়ে বুঝা যাক। মামুলি ছাত্রের মতন বিদেশ থেকে ডিগ্রী আন্‌বার কথা বল্‌ছি না। যে লোকটা দেশেই এম-এ, বি-এ, পাশ-ফেল করেছে, অথবা যে লোকটা বিদেশ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে, যে লোকটা এম, বি, এল, এল ডি, পাশ টাশ করবার পর ২।৪ বৎসর কাজ করেছে উকিল ভাবে ডাক্তার ভাবে ব্যাঙ্কার ভাবে, গবেষক ভাবে, খবরের কাগজের সম্পাদক ভাবে, লেখক ভাবে,—যে ভাবেই হউক কাজ করেছে—বলা হচ্ছে তাকে বিদেশে যেতে। দেশে-বিদেশে লেখাপড়া করবার পর কাজ কর্ম্ম করেছে—তারপর জেল খেটেছে—সেটাও কাজের মত কাজ—যতগুলি গুণ বা অভিজ্ঞতা থাকা দরকার দেখ্‌তে পাচ্ছি সুভাষের আছে সব। তার উপর আর একটা চীজ্ তার আছে যা অন্যান্য অনেক গুণবানের নাই—সে হচ্ছে ট্যাঁকে পয়সা। এর মতন লোক যদি ৩।৪ বৎসর বিদেশে থাকতে চায় অথবা দু' দু' বছর পর কয়েক মাসের জন্য বিদেশে যেতে চায় ত পরের দুয়ারে ভিক্ষা করতে হবে না। আমাদের মতন গরীবের বেলায় সব কাজেই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে—রূপচাঁদ! রূপচাঁদ যদি থাকত তাহলে যুবক বাংলায় অন্ততঃ পাঁচশ' জন "গুণবান্" আছে যারা

বিদেশে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলে দেশটাকে ঠেলে অনেক উঁচুতে তুল্‌তে পারত। জাপানের জাহাজ, ফরাসী বিজলী, বিলাতী টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল, আমেরিকার কৃষি এই সব কর্ম্ম-ক্ষেত্রের ধুরন্ধরদের সঙ্গে কাজ করে' ২।৩ বৎসর পর পর যদি বাঙালীরা ফিরে আস্‌তে পারত তাহলে গোটা বাংলা দেশ বুঝত,—এর নাম আমেরিকা, তার নাম ফ্রান্স, ওর নাম জার্ম্মানি ইত্যাদি। এই রকম পাকা লোক যদি বাংলা দেশে ৫০০ জন থাকে তা'হলে তারা—ঐযে ৫।৭টী কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে সে সব দেখবামাত্র টকাটক বলে দিবে,—"লেখকরা এখানে জুয়াচুরি চালিয়েছে, ওখানে ঠিক আছে। ১৯০৯ সনে বাস্তবিক জার্ম্মানি এ কাজটা করেছিল, ফরাসী ঠিক সেইদিন অন্য পথে চলেছিল" ইত্যাদি। কথা হচ্ছে, বিদেশ-দক্ষতা আর বিদেশ-নিষ্ঠা আমাদের ভারতে দেশোন্নতির একটা মস্ত বড় কর্ম্মশক্তি।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জার্ম্মানি বনাম ইংল্যাণ্ড

আজকাল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা চলছে। কয়জন বাঙালী বা ভারতবাসী এই বিষয়ে আলোচনা করছে? রামচন্দ্র মল্লিক আর হরিহর পোদ্দার, হরিহর পোদ্দার আর রামচন্দ্র মল্লিক, ইসমাইল আর আবদুল, আবদুল আর ইসমাইল। ব্যাস। এই পর্য্যন্ত। কজনের নাম করা হল? দুজন, চারজন না আটজনের? যে কজনেরই হোক,—এই কটা নামও বাস্তবিক পক্ষে গোটা বাঙ্‌লায় ঢুঁড়ে পাওয়া যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোনো বাঙ্গালী "স্বাধীনভাবে" এ পর্য্যন্ত কিছু বলেছে কি না সন্দেহ। যদি ভারতে কেহ কিছু বলে থাকে তারা বোধ হয় সকলেই অ-বাঙালী। গুন্‌তিতেও তারা দুচারজনমাত্র। তবে একথাও জানা আবশ্যক যে, তারাও যা-কিছু বলেছে সবই বিদেশ-সম্বন্ধে তাদের যতটুকু জ্ঞান আছে তারই জোরে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ভারতে স্বদেশ-সেবক হিসাবে পাকা লোক মাত্র সেই কয়জন যাদের বিদেশী ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালী আর ধরণ-ধারণ অল্পবিস্তর জানা আছে,—বই পড়েই হ'ক বা বিদেশে গিয়েই হ'ক।

যাক্‌, এই ব্যাঙ্কটা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে দু-একটা কথা বলে যাচ্ছি। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক" নামটা এসেছে আমেরিকা হতে। কিন্তু এর যা-কিছু কাম—সে সমস্ত এসেছে জার্ম্মানি থেকে। অথচ রিপোর্টের ভিতর কোন জায়গায় জার্ম্মানির নাম পর্য্যন্ত আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু রগড়ের কথা জার্ম্মানি এই প্রণালীটা পেলে কোথায়? ১৮৭৫ সনে জার্ম্মানি একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করে। তারা দেখলে ইংরেজ ১৮৪৪ সনে ঐ রকম কারবার করেছিল। সেটা ৩০ বৎসর ধরে চলে আসছে। তার সঙ্গে ফরাসীদের অভিজ্ঞতা তুলনা করে' জার্ম্মানি বুঝল যে, ব্যাঙ্ক খাড়া করতে হলে ইংরেজকে নজীর করতে হবে। ইংরেজকে নজীর করে' জার্ম্মানি এমন কতকগুলি নতুন প্রণালী চালিয়ে দিলে যার সঙ্গে ইংরেজের কোন সম্বন্ধ নাই। সোজা কথায়, —ইংরেজের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হচ্ছে অতিমাত্রায় স্থিতিশীল, আর ব্যাঙ্ককে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা দরকার ইংরেজ সে সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সতর্ক। জার্ম্মানি সে সব ত অবলম্বন করেছেই, তা-ছাড়া স্থিতিশীলতা বদলে' তারা ব্যাঙ্কটাকে গতিশীল করেছে। ইংরেজ যা করেছে সমস্ত হজম করে' তার পরের ধাপে গিয়ে জার্ম্মানি পৌঁছিয়েছে। তার বৎসর দশেক পর জাপান ঐ রকম একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করেছে। জাপান দেখলে জার্ম্মানির উপরে যাওয়া সম্ভব নয়। তারা একেবারে হুবহু নকল করে বসিয়ে দিল জার্ম্মাণ ব্যাঙ্ক জাপানী নামে। তার প্রায় বৎসর আঠাশেক পর, ১৯১৩

সনে আমেরিকা যখন ব্যাঙ্ক খাড়া করতে গেল সে দেখল ফরাসী প্রণালী চলবে না আর ইংরেজের প্রণালীটা ঠিক তার উল্টা। ফরাসীরা অতিমাত্রায় গতিশীল, আর ইংরেজ তার একদম উল্টা, অতিমাত্রায় বাঁধাবাঁধির দাস। তারা জার্ম্মানির ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, কেন না জার্ম্মানি একটা মাঝামাঝির পথ আবিষ্কার করেছে। আমাদের কমিশনে যে দেশী-বিদেশী মুড়ো ছিল তারা জার্ম্মানির নামও করেনি। তারা আমেরিকার মতামত নিয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত নাম দিয়েছে মার্কিণ ধাঁচে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কিন্তু কর্ম্মপ্রণালীটা নিয়েছে জার্ম্মানি থেকে,—বোধ হয় বা অজ্ঞাতসারেই!

আগেই বলেছি—জাপানী মার্কিণ আর জার্ম্মানির প্রণালী হচ্ছে ইংরেজ প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত,—সেটা হতে উন্নত। আমি বলতে চাচ্ছি—ভারতের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কমিশন বসিয়েছে তাতে ইংরেজের এক্তিয়ার থাকা সত্ত্বেও তারা ইংরেজ প্রণালীটা নেয়নি। যে প্রণালীটা আজ দুনিয়ায় টেকসই বলে জগতের লোক স্বীকার করে—গতিশীল ব্যাঙ্ক—সেই প্রণালী তারা ভারতবর্ষে এনে হাজির করতে চায়। কোন বাঙ্গালী বোধ হয় "স্বাধীন" ভাবে তার স্বপক্ষে কি বিপক্ষে সমালোচনা করেনি। তবে বাঙ্‌লাদেশে আর ভারতে এমন লোক আছে যারা গবর্ণমেণ্ট যা করচে তার বিরুদ্ধে কিছু বলবেই বলবে। বাঙ্গলার বাইরে যারা আলোচনা করছে তারা বলেছে "এই কমিশন থেকে যখন একটা গতিপন্থী ব্যাঙ্কের মেসোবিদা বেরিয়েছে তখন এর ভিতর ইংরেজদের নিশ্চয়ই সয়তানি বুদ্ধি আছে। আমরা ঐ প্রণালী চাই না। আমরা চাই স্থিতিশীল বিলাতী প্রথার ব্যাঙ্ক !!" যাচ্‌চলে। ১৮৪৪ খ্রীঃ এর মান্ধাতার আমলের যে ব্যাঙ্ক প্রণালী তাকে নতুন গড়ন দিয়ে জার্ম্মানি জাপান আমেরিকা একটা ভাল কিছু খাড়া করল, আর আমাদের স্বদেশ-সেবকগণ স্থির করলেন তার বিরুদ্ধে বলতেই হবে। এর ফলাফল আমার আলোচ্য নয়। আমি কাজের কথা কিছু বলছি না, বলেছি স্বদেশসেবার শুধু আলোচনা-প্রণালীটা বিশ্লেষণ করছি।

সেটা হচ্ছে এই। ভারতবর্ষে যে সব কাজ চল্‌ছে তার যদি সমালোচক হতে চান, তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলতে চান অথবা দেশটাকে যদি হিড় হিড় করে চিন্তাক্ষেত্রে আর কর্ম্মক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যেতে চান তাহলে আপনাকে বিদেশ-দক্ষতায় পেকে উঠ্‌তে হবে। কোন্ মতটা ভাল, কোন্ মতটা খারাপ সে কথা সম্প্রতি বলছি না। বলছি,—স্বদেশ-সেবকের পক্ষে চাই বিদেশ-দক্ষতা। নব্য-ন্যায় বিদেশ-নিষ্ঠার সূত্র প্রচার করছে নিম্নরূপ :—

শত সহস্র শক্ত মাথা যে চাহিছে এই দুনিয়া,
হৃদয় যাদের হেলায় টানিবে সারা বিশ্বের হিয়া।
চুমুক লাগাবে পুরোণো গ্রীসেতে মিশরে ও এশিয়ায়,
জাপ-জার্ম্মান-ইংরেজে আর ইয়োরো-আমেরিকায়।
স্বদেশের মাপকাঠিতে বিচার চাহে না শক্তিধরে,
তার বিদ্যাবুদ্ধি হবে নিরূপিত বিংশ শতাব্দী করে।
হজম করে যে বিদেশকে বেশী সেই তো স্বদেশী খাঁটি,
দেশের আদর্শ ছেড়ে দেখাবে সে শত কাজ পরিপাটি।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের পতন

এইবার দেখাচ্ছি নব্য-ন্যায়ের আর এক মূর্ত্তি। ফেল মেরেছে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক। অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেসের আড়কাটি এসে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, "ব্যাঙ্কের দরজায় ত খিল দেওয়া হয়েছে এখন কি বল্‌তে চান ?" দেশের লোক তখন হায় হায় করছে, হা হুতাশ ছাড়া কথা নাই। আমি বলে দিলাম, "আজ এই মুহূর্ত্তে আমাদের জাতীয় জীবনের নবীন সুপ্রভাত"। নব্য-ন্যায়ে আর মামুলী ন্যায়ে বামুন-শূদ্দুর ফারাক। এতদিন আমাদের দেশে যে কেহ যা কিছু স্বদেশী করেছে তাকেই আমরা মনে করেছি পাঁড়। "অমুক লোক নামজাদা, বাপরে! তার সমালোচনা করিস না," এই ছিল আমাদের চিন্তার ঢঙ্। ঢাক ঢাক গুড় গুড়। "অমুক ফণ্ডে অমুক লোক একবার তিনশ টাকা দিয়েছে। ভবিষ্যতেও হয়ত আবার দুচার পয়সা দেবে। অতএব যা চেপে। তার দোষ গুলা বাজারে নাই বেরুল।" এই রকম কেবল চেপে যাওয়া আর চেপে যাওয়া। যখন একজন কেহ স্বদেশী-মার্কা হলেন এবং তিনি কংগ্রেস টংগ্রেসে একটা বক্তৃতা কর্‌লেন, আর যাবে কোথায় ? "দেশের নেতা" বনে' গেলেন! "নামজাদা লোক! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্‌বি ? আরে, তাহলে দেশের মুখে চুন কালি পড়্‌বে যে!" এই চিন্তাপ্রণালী চলছিল। সকলেই তোয়াজ, প্রশংসা, গুণকীর্ত্তন আর পদলেহন। সমালোচনা, বিশ্লেষণ, তুলনাসাধন,—এ সবের ধার কেহই ধারতেন না। এহেন স্বর্ণযুগে, যুবক বাঙ্গলার জন্মকালে বিশ একুশ বৎসর পূর্ব্বে যে-প্রতিষ্ঠান দাঁড়িয়ে ছিল সেটা একেবারে হাতে হাতে আত্ম-সমালোচনা নিয়ে হাজির হল। বাঙ্গালীর সাধের এই স্বদেশী ব্যাঙ্ক বলে দিলে,—"মধুর বহিবে বায়ু বেয়ে যাব রঙ্গে, মানব জীবন তা না। যে জিনিষটা নিজের হাতে গড়া তাকেও নিষ্ঠুরভাবে ভাঙ্গতে শিখা দরকার। ভেঙে আর একটা কিছু গড়তে হবে। তার জন্য আবশ্যক এক প্রকার আধ্যাত্মিক চরিত্র-বল। যখন তখন যাকে তাকে স্বদেশ-নিষ্ঠ বলে গড়াগড়ি করেছিস্! আহাম্মুক তোরা।" ইত্যাদি। যখন সকলে বলছে, "হায়, বাংলা দেশের কি হবে ? বাংলা দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য একদিনে ধূলিসাৎ হল" নব্য-ন্যায় তখন বলে দিলে, "এই মুহূর্ত্তে বাংলা দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য নিরেট বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চল্ল—শুধু, বোলচালের উপর নয়। কেননা বাঙ্গালীর গলদ খোলাখুলি বেরিয়ে পড়েছে। বাঙালী আর নামজাদা লোক মাত্রের পা চাট্‌তে ঝুঁক্‌বে না, অথবা স্বদেশী শব্দে আহ্লাদে আটখানা হবে না।"

মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-মাহাত্ম্য

আমরা মনে করি ১৯০৫ কিংবা ১৯১৫।২৫ সনে যে কয়টা লোক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেছে সেই কয়টা লোকই বুঝি বাংলাদেশে একমাত্র "ন্যাশন্যাল"। যে লোকটা নিজের ঢাক পিট্‌তে পারে সেই লোকটাকেই দেশের লোক কর্ম্মবীর ও স্বদেশী নেতা বলে থাকে। কিন্তু বিপদ হচ্ছে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের মত শ'তিনেক কি সাড়ে তিন শ' ব্যাঙ্ক বাংলা দেশের জেলায় জেলায় রয়েছে। একটা চরম কথা বলছি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই ধরনের ১০০ ব্যাঙ্কও যদি আজ পটল তুলে, তবু বাঙ্গালীর ট্যাঁকে দেড়শ দু'শ আড়াইশ ব্যাঙ্ক থাক্‌বেই থাকবে। আপনারা জানেন —মফঃস্বলে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে ১৩,০০০। এই যে শ'তিনেক ব্যাঙ্কের কথা বলছি সে সব আলাদা,—খাঁটি জয়েণ্ট ষ্টক প্রণালীতে শাসিত। কাজেই আপনি যদি বলেন "হায়, সর্ব্বনাশ হয়ে

গেল, বাঙ্গালীর মুখে চূণকালী পড়ল "আমি বলব "এসব হচ্ছে অতিরঞ্জিত কথা,—অবুঝের মতন আবল-তাবল বকা।"

মাড়োয়াড়ীরা বলছে "আহা, বাঙ্গালীরা একটা ব্যাঙ্ক দাঁড় করিয়েছিল, নষ্ট হয়ে গেল, দুঃখের কথা।" তারা সমবেদনা দেখাচ্ছে। ইংরেজ বলছে—"যুবক বাঙ্গলা ইংরেজের সঙ্গে পার্শীর সঙ্গে টক্কর দিবে, যুবক বাংলা আপন পায়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সঙ্গে সমানে সমানে চলবে—সেজন্য একটা ব্যাঙ্ক খাড়া করেছিল। হায়, গেল। বড়ই আপশোসের কথা" ইত্যাদি। এই যে ইংরেজের ও মাড়োয়াড়ীর সমবেদনা—এতে যদি কোন বাঙালী বিচলিত হন তাহলে বুঝব তিনি পুরোণো ন্যায়-শাস্ত্রের উপাসক। নব্য-ন্যায়ের উপাসক যে হবে সে বলবে "বয়ে গেছে, যেটা গড়েছিলাম সেটা ভেঙ্গে ফেলেছি—তার কবরের উপর দাঁড়িয়ে নতুন কিছু করে দেখাব। এখন আমাদের যা কিছু আছে তারই জোরে বলতে পারি বাঙ্গালী জাতের ইজ্জত যায় নি, বরং ১৯০৫ সনের তুলনায় ১৯২৭ সন স্বর্গের জিনিষ। ফরাসী জার্ম্মান ইংরেজ জাপানীর তুলনায় ১৯২৭ সনের বাংলা অতি সামান্য বটে তবু ১৯০৫।১৯১৫ সনের বাংলায় যে কর্ম্মদক্ষতা, শক্তিযোগ বা শিল্পনিষ্ঠা ছিল তার তুলনায় ১৯২৭ সনের বাংলা অনেক উঁচু।" ১৯১৪ সনের গোড়ায় আমি যে বাঙ্‌লা দেশ ছেড়ে গিয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় ও উঁচু বাঙ্‌লা দেখ্‌ছি আজ বিদেশ থেকে ফিরে এসে,—সকল কর্ম্মক্ষেত্রে আজ চিন্তাক্ষেত্রে। কাজেই বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে গেল বলে' চীৎকার করা আর মাড়োয়াড়ী ও ইংরেজদের "হায় বাঙ্গালী জাতি, তোদের কি হবে?"—ইত্যাদি কথা শুনে ভীমরতি খাওয়া নব্যন্যায়ের দস্তুর নয়।

দেখতে পাচ্ছেন—আগে আমি দুনিয়া-নিষ্ঠার কথা, বিদেশ-দক্ষতার কথা বলেছি। এখন বলছি মফঃস্বলের ব্যাঙ্ক-কৃতিত্ব, পল্লীর কীর্ত্তি। আমার নব্য-ন্যায়ের এক হাতে দুনিয়া,—আমেরিকা, জার্ম্মানি, জাপান, আর এক হাতে পাড়াগাঁ, মফঃস্বল, পল্লী। আমি চাই রামপুর-হাটের সঙ্গে প্যারিসের যোগাযোগ, বজবজের সঙ্গে নিউইয়র্কের আত্মীয়তা, বার্লিনের সঙ্গে নবাবগঞ্জের দহরম মহরম। বাংলার পল্লীগ্রামের সঙ্গে দুনিয়ার, আর দুনিয়ার সঙ্গে পল্লীগ্রামের নিবিড়তম সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কায়েম করতে পারলে বুঝতে পারব দস্তুর মতন নব্য-ন্যায়ের কাজ চলছে।

স্বাস্থ্য-নিষ্ঠা বনাম আর্থিক অবস্থা

এখন দফায় দফায় নব্য-ন্যায়ের প্রয়োগ দেখাচ্ছি। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিংবা সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সম্বন্ধে যখন আমাদের কোন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন কথায় কথায় আমরা আমাদের আর্থিক দুরবস্থার কথা তুলে থাকি। "এত ম্যালেরিয়া কেন?" "খেতে পাচ্ছিনা বলে।" "এত পেটের অসুখ কেন?" "আমি গরীব মানুষ বলে।" "তুই বিকাল বেলা ফুটবল খেলা দেখতে যাস্‌না কেন?" "আমার অবস্থা খারাপ।" এ সব জবাব আমাদের ঠোঁটস্থ। যা কিছু আমাদের দূষণীয় কিংবা অন্য লোকের চক্ষে খারাপ তার সম্বন্ধেই একমাত্র বুলি আওড়াতে থাকি। সোজা ওজর হচ্ছে, "দরিদ্র দেশ।" নব্য-ন্যায় বলছে—"হয়ত এই ওজরে কিছু সত্য থাকতে পারে—কিন্তু আর্থিক অবস্থার শোচনীয়তা সকল ক্ষেত্রে আমার স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য-কৌন্দর্য্যের একমাত্র কারণ নয়।" আব্দুল খেতে পায় না, হরিহর পোদ্দারও খেতে পায়না। দুজনেই এক অফিসে চাকুরী করে, দুয়েরই মাহিনা এক। কিন্তু দেখতে পাই—আব্দুল তার ঘরটা যেমন সাজিয়া রাখে হরিহর পোদ্দার তেমন সাজায় না। আব্দুল রোজ জল গরম করে ফুটিয়ে খায়, কারণ বেণ্টলী

সাহেব বা ডাক্তার অমূল্য উকিল বলেছে জল ফুটিয়ে না খেলে অসুখ হবেই হবে। স্বাস্থ্যজ্ঞদের কথা শুনছে আব্দুল, কিন্তু শুনছে না হরিহর পোদ্দার। দুজনেরই সমান আর্থিক অবস্থা। আর্থিক অবস্থা যদি ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েডের একমাত্র বা প্রধান কারণ হয় তবে দুজনেরই এক সময়ে একদিনে পেটের অসুখ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

অথবা হয়ত দেখছি দুই বন্ধু এক হোষ্টেলে বসবাস করে। একজন বিকালে খাবার খেয়ে চলে গেল শিস্ দিতে দিতে বেড়াতে আড়াই মাইল, আর একজন চিৎ হয়ে শুয়ে রইল খাটীয়ার উপর। দুজনের টাকা পয়সা এক রকম, এক ইস্কুলে পড়ে, এক মাষ্টারের কাছে লেখা পড়া করে। কিন্তু প্রভেদ বিস্তর। একজন লাঠি ঘুরাতে ঘুরাতে আড়াই মাইল ঘুরে এল আর একজন সে সময় হাত পা ছড়িয়ে দুয়ার-বন্ধ-করা ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। আর্থিক সু-কু যদি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রধান শক্তি হয় তা হ'লে এই দুটী লোক সমান অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও একজন চৌকিতে পড়ে চিৎ হয়ে থাকে কেন, আর একজন বা বেড়াতে যায় কেন? দুজনের এক সঙ্গে ফুটবল দেখতে যাওয়া উচিত ছিল। অথবা একসঙ্গে বিছানায় পড়ে থাকা উচিত ছিল।

আর এক কথা। আমাদের দেশে গরীব লোক আছে বটে, কিন্তু ধনী লোকও আছে। হাজার হাজার অটোমোবিল বাঙ্গালীরা খরিদ করছে। লাখ লাখ টাকার সম্পত্তিওয়ালা বাড়ীঘরের মালিক বাঙালী আছে অনেক। কিন্তু তাদের আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যজ্ঞান সৌন্দর্য্য-জ্ঞান মালুম হয় কি? কলিকাতায় যতগুলি বাড়ী আছে সে সব বাড়ীর উঠানে গিয়ে কোন্ লোক বলবে যে এখানে স্বাস্থ্য রক্ষা হতে পারে? উঠানের সম্মুখে সিঁড়ি, সিঁড়ির গায়ে, ঘরের কোণে ছাদে দেয়ালে সর্ব্বত্র থুথু, পানের পিক, ঝুল আর যুগযুগান্তরের ধূলাময়লা জড় হয়েছে। কিন্তু বাড়ীর মালিকেরা বা ভাড়াটিয়ারা সকলেই গরীব কি? অনেকেই ধনী। কিন্তু যাদের ধন আছে তাদের ভিতরও সাধারণতঃ না আছে স্বাস্থ্যনিষ্ঠা, না আছে সৌন্দর্য্য-নিষ্ঠা। আমি গরীব, আমার বাড়ী যেমন নোংরা, লক্ষপতি যে, বড়লোক যে, তার বাড়ীর ফরাস, দেওয়াল ইত্যাদিও ঠিক সেই সুরে গাঁথা, আমারই নোংরামির জুড়িদার! অর্থাৎ বড়লোক হলেই যে মানুষ স্বাস্থ্য-নিষ্ঠ বা সৌন্দর্য্যজ্ঞানশীল হবে একথা স্বতঃসিদ্ধ রূপে স্বীকার করা চলে না।

আমি এখানে কাজের কথা বলছিনা, শুধু আলোচনা-প্রণালীর কথা বলছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে,—আর্থিক অবস্থা উন্নত হলে পর যদি আমরা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা সুরু করি তা হলে, বাঙালী জাত কোনদিন স্বাস্থ্যশীল বা সৌন্দর্য্যজ্ঞানশীল হতে পারবে না। এই যে ২০।২২ বৎসর চলে গেল এর ভিতর আমাদের আর্থিক অবস্থা আকাশপাতাল বদলে' গেছে বলে' আমি স্বীকার করিনা। আগেও ঠিক আমরা মোটের উপর এই রকম দরিদ্রই ছিলাম। তা সত্ত্বেও যুবক বাংলা কোন কোন বিষয়ে অসাধ্য সাধন করেছে। কিসের জোরে করেছে? যদি দৈন্য-দারিদ্র্য ব্যক্তিত্ব-বিকাশের একমাত্র বা প্রধান বাধা হয়—তা হ'লে ১৯০৫ সনের আগে যুবক বাংলা যা ছিল ১৯২৭ সনে তার ঠিক সে রকমই থাকা উচিত ছিল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আর্থিক অবস্থা প্রায় একরকমই রয়েছে। অথচ যুবক বাংলার কার্য্যশক্তি নানা দিকে হু হু করে ছুটে চলেছে। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থার উপর মানুষের ব্যক্তিত্বটা আগাগোড়া নির্ভর করেনা। অতএব আজ যদি মনে করেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষা করা উচিত, টাইফয়েড যক্ষ্মা ইত্যাদি ব্যারাম থেকে কলিকাতাকে আর বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে, তাহলে ১৯০৫ সনে যুবক বাংলা দরিদ্র থাকা স্বত্ত্বেও যেমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল "আমরা বাংলায় নতুন জীবন এনে ছাড়বই ছাড়ব" তেমনি ১৯২৭ সনে, অন্য দিককার

কথা সম্প্রতি বলছিনা,—স্বাস্থ্যজ্ঞান সৌন্দর্য্যজ্ঞান সম্বন্ধে সেইরূপই এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা উচিত। যুবক বাঙ্‌লা জোরের সহিত স্বাস্থ্য-ধর্ম্ম জারি করুক আর বলুক,—"নিজের চৌকিটা নিজে ঝাড়ব, ধূলা সমেত জুতা নিয়ে ঘরে ঢুকবনা, পায়খানার গামলা নর্দ্দমা নিজে সাফ করব, ঘর দুয়ার নিজে পরিষ্কার করব, যেখানে-সেখানে থুথু ফেলব না, কুলকুচো করব না, দেখি টাইফয়েড্ কেমন করে আসে।" এসব সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া গরীব বা বড়লোক হওয়ার উপর নির্ভর করেনা। আমাদের পয়সাওয়ালা লোকেরা এ সব বিষয়ে উন্নত নয়। যে কোন বাঙ্গালী বড় লোকের বাড়ীতে গিয়ে তার রান্নাঘর, পায়খানা, বসবার ঘর, লেখাপড়া করার ঘর, শোবার ঘর দেখলেই বেশ বুঝা যাবে যে, স্বাস্থ্যের জন্য সৌন্দর্য্যের জন্য বাঙ্গালী সমাজের অলিতে গলিতে স্বতন্ত্র নতুন আন্দোলন চালানো আবশ্যক। দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটলেই বাঙ্গালীরা আপনা-আপনি স্বাস্থ্যনিষ্ঠ সৌন্দর্য্যনিষ্ঠ হতে শিখবে, একথা নব্য-ন্যায় স্বীকার করতে অসমর্থ। ধনী-নির্দ্ধন সকল মহলেই এখন চাই সমানভাবে কতকগুলা স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের আন্দোলন, সঙ্ঘ, প্রচারক, পত্রিকা।

[আগামীবারে সমাপ্য]

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কার্ত্তিকে

ভারতের ভবিষ্যৎ—অতীতের ঘটনা ধরিয়া ও বর্ত্তমানের অবস্থা দেখিয়া মানুষে অনেক সময়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা অনুমান করিয়া বলে, কিন্তু আমরা না পারি প্রাচীন সময়ের ও আধুনিক যুগের ঘটনাগুলিকে সূক্ষ্ম বিচারে বিশ্লেষণ করিতে, আর না পারি ঘটনায় ঘটনায় জুড়িয়া একটা অবশ্যম্ভাবী ফলের বিচার করিতে ; তাই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই সফল হইতে দেখা যায় না। ১৮৯১ অথবা ১৮৯২ অব্দে মেরিডিথ্ টাউন্‌সেণ্ড্ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে তাঁহার সেই বাণী প্রচারের দিন হইতে ৫০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২ অব্দের মধ্যে ভারতে ইংরেজের শাসন উঠিয়া যাইবার মত হইবে, আর ভারতবাসীরা আবার সেই দুর্গতির পাঁকে ডুবিবে যাহা হইতে ইংরেজেরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কথা কয়েকটি ষ্টেটস্‌মেন্ পত্রিকায় এইরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলঃ—Within fifty years from the date British rule in India will be virtually ended and India would have relapsed into the Asiatic welter from which it had been temporarily redeemed. এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কাজের কথাটুকু এই যে যখনই ইংরেজের শাসন উঠিবে অর্থাৎ ইউরোপের আওতা চলিয়া যাইবে তখনই ভারতবাসীকে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। যাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন না যে ভারতবাসীই হউক অথবা অন্য যে কোন দেশের লোকই হউক সকলেরই উন্নতির পথ অবাধ হওয়া উচিত ও সকলের পক্ষেই স্বাধীনতা পাইয়া মনুষ্যত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার দাবি আছে, তাঁহারাও বলিয়া থাকেন যে আমরা আপনাদের হাতে শাসনের দায়িত্ব নিবার উপযোগী হই নাই। তাঁহারা বলিতেছেন যে রাষ্ট্রপরিচালনে দক্ষ ইউরোপীয়েরা

সরিয়া দাঁড়াইলে আমরা এমন একটি শাসনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব না যাহাতে হিন্দু-মুসলমানে গলা কাটাকাটি করিতে বসিলে তাহা দমাইয়া রাখা সম্ভব হয়। টাউন্‌সেণ্ডের উক্তির মধ্যে ইহাই ধ্বনিত হইতেছে যে সারা এসিয়ার লোক সুবিহিত রাষ্ট্রপরিচালনের কাজে অক্ষম। উদাহৃত উক্তিটি প্রচারিত হইবার কয়েক বৎসর পরে জাপানীরা তাহাদের প্রভাব ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। জাপানের ইতিহাস ও আমাদের ইতিহাস এক নয় বটে, তবে ক্ষমতার দায়িত্ব হাতে আসিলে মুসলমানে ও অ-মুসলমানে এখনকার মত বিবাদ ঘটাইয়া আপনাদের স্থিতির বল ধ্বংস করিতে বসিবে কি-না ও মুসলমানেরা পরলোকের মুক্তিতত্ত্বের প্ররোচনায় ইহলোকের সুখ-সুবিধা নষ্ট করিতে বসিবে কি-না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। দায়িত্ব হাতে আসিলে মানুষের যে শিক্ষা হয় আমরা সে শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত আছি। যতদিন দায়িত্ব আসে নাই, কেবল রাষ্ট্র শাসনের সম্পর্কে পদমর্য্যাদার প্রলোভন আসিয়াছে ততদিন ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়া মারামারি চলিবেই। ইংরেজের শাসনে নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া কেবল উপার্জ্জনের কিছু সুবিধা করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে বৃহত্তর স্বার্থ বা দেশের স্বার্থ মানুষের লক্ষ্য হওয়া কঠিন হয়। দুইজন মিনিষ্টরের স্থলে বাঙ্গলায় চার জন মিনিষ্টার্ করা চলে কি-না তাহা বিচারিত হইতেছে; দুইচারজন লোক পদ-গৌরবে উন্নীত হইলে দেশের লোকসাধারণের পক্ষে ভবিষ্যতের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না। মিনিষ্টর্‌দের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা যখন নির্দ্দিষ্ট সীমায় বদ্ধ,—অর্থাৎ মিনিষ্টরেরা যখন নিজের দায়িত্ববুদ্ধিতে কোন অনুষ্ঠান করিতে পারেন না, কেবল আপিসের কর্ম্মচারীর মত বাঁধা সীমার মধ্যে কাজ করিতে বাধ্য হন্, তখন না হয় দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়া দেশ-শাসনের শিক্ষা, আর না জাগে সেই আশা ও উৎসাহ যাহা অবলম্বন করিয়া মানুষে স্বাধীনতার মুক্তপথে চলিতে পারে। এই অতি সহজ সত্য প্রত্যক্ষ হইলেও কেবলই কথা উঠিতেছে যে আমাদের হাতে কতটুকু কাজ দেওয়া চলে। ইহাতে বুদ্ধিমানেরা মনে করিবেনই করিবেন যে এদেশবাসীদিগকে অবাধ মনুষ্যত্ব লাভের পথ হইতে দূরে রাখাই এখনকার রাষ্ট্রনীতি।

* * * * *

প্রাইমারি শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি—দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্ম্মচারীদের হাতে যখন প্রাইমারি শিক্ষার পূর্ণ প্রসারের একটি পদ্ধতি রচিত হইয়া গিয়াছে ও সরকারি সূক্ষ্মগণনায় ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হইয়াছে ও কিরূপভাবে ব্যয় সঙ্কুলনের টাকা তুলিতে হইবে তাহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে তখন নিঃসন্দেহে মনে হয় যে প্রায় গ্রামে গ্রামে সাধারণ লোকেদের প্রাইমারি শিক্ষার পাঠশালা বসিবে। আমরা বুঝিলাম যে পাঠশালা বসিবে আর সেই পাঠশালায় সাধারণ শ্রেণীর বালক-বালিকারা লিখিতে পড়িতে শিখিবে, কিন্তু কিভাবে কিরূপ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইবে ও কিরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা শিক্ষক নিযুক্ত হইবে তাহা বিচারিত হয় নাই, অথবা বিচারিত হইয়া থাকিলেও প্রচারিত হয় নাই। কলিকাতার মত উন্নত সহরে কর্পোরেশনের শিক্ষিত সভ্যদের আসরে যখন বিচারিত হইতেছে যে ধর্ম্মভেদ ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতির জন্য আলাদা আলাদা পাঠশালা হইবে কিনা ও মুসলমানদের পাঠশালায় ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করা হইবে কি-না তখন আতঙ্ক জন্মে যে মফঃস্বলের পাঠশালাগুলিতে ঐরূপ অহিতকর ভেদ-বিচার করিয়া

পাঠশালা বসান হইবে কি-না। যদি হয়, তবে শিক্ষার নামে এমন একটা প্রভেদ ও ভবিষ্যৎ দুর্গতির আয়োজন করা হইবে, যাহার স্থলে বর্ত্তমানের অশিক্ষা অনেক ভাল। কিরূপ শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দ্দিষ্ট হইবে আর সেই পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা কিরূপভাবে বিচারিত হইবে তাহা না জানিলে কিছুতেই শিক্ষা শব্দটির নামে আমরা আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া প্রস্তাবিত টেক্স্ বা শুল্ক দিতে পারি না। শিক্ষা শব্দটির নামে একটা মোহ আছে; আমরা সেই মোহে পড়িয়া যদি প্রথমে টাকা তুলিবার বন্দোবস্তে স্বীকৃত হই তবে পাঠশালা বসিবার সময়ে কিছুতেই দেশে কুশিক্ষা বিস্তার নিবারণ করিতে পারিব না। যে-কথার বিচার আগে হওয়া উচিত তাহা যখন হয় নাই ও সেই বিচার যে আগে হওয়া উচিত তাহা যখন লোকের মনে জাগে নাই তখন সুস্পষ্ট বুঝিতেছি যে উপযুক্তভাবে প্রাইমারি শিক্ষাবিস্তারের চিন্তা অনেকের মনেই স্থান পায় নাই। বালক-বালিকারা প্রথম জীবনে ছাপা বইয়ে যাহা শিখিবে তাহাতে যে-সংস্কার দৃঢ়মূল হইবে তাহা পরে পরিবর্ত্তন করা কঠিন হইবে। এই অতি গুরুতর কথাটির দিকে বিশেষভাবে দেশের নেতাদের ও ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

এসম্পর্কের অনেক আলোচনায় ইহাও মনে হইয়াছে যে অনেকে কেবল প্রাইমারি শিক্ষার নামেই আনন্দে মাতিয়াছেন; এমন কথাও অনেকবার পড়িয়াছি যে সাধারণ লোকের শিক্ষার প্রসারের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে উচ্চ কলেজী শিক্ষা খানিকটা কম পড়িলে ক্ষতি হয় না। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রসার কমিলে যে প্রাইমারি শিক্ষার প্রসার করা যায় না এই অতি সহজ কথাটাও অনেকে ভাবেন নাই। কলেজের অতি উচ্চশিক্ষিতদের হাতে যদি প্রাইমারি শিক্ষার জন্য শিক্ষক তৈরি না হয়, যদি প্রাইমারি শিক্ষার ব্যবস্থার পূর্ব্বে অনেকগুলি ট্রেনিঙ্ স্কুল স্থাপিত হইয়া শিক্ষক সৃষ্টি না করা যায়, তবে প্রাইমারি শিক্ষার ব্যবস্থা করা চলে না ও সেজন্য বহু অর্থ ব্যয় করা চলে না। দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অশান্তি চলিয়াছে তাহাতে সরকারি কর্ম্মচারীদের পক্ষে এরূপ একটি ধারণা থাকা অসম্ভব নয় যে তাঁহাদের মনের মত কোন এক শ্রেণীর শিক্ষা-পদ্ধতি চালাইলে ভবিষ্যতে অশান্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। শিক্ষার সেরূপ পদ্ধতি প্রচলিত হইলে ছাত্রদের মনে জড়তা জন্মিয়া এরূপ ভাবের নিশ্চেষ্টতা জন্মিতে পারে কি-না যাহাকে কেহ কেহ শান্তিময় অবস্থা বলিয়া ভ্রম করিতে পারে, তাহা বিশেষভাবে এই সময়ে বিচারিত হওয়া উচিত; নহিলে শিক্ষার নামে এমন দুর্গতির পথ প্রস্তুত করা হইবে যাহাকে কল্পনা করিতে গেলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। শিক্ষা-পদ্ধতির ও শিক্ষণীয় বিষয়ের বিচার না করিয়া কেহ যেন প্রাইমারি শিক্ষার নামের মোহে বিল্ পাস্ করিতে অগ্রসর না হন্।

* * * * *

দেশের স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেরূপ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, পানীয় জলের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন তাহা যে জনসাধারণে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বুঝিয়া ফেলিবে, এটা অসম্ভব কল্পনা। শিক্ষিতদের দৃষ্টান্তে ও আইনের বিধানের বাধ্যতায় সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিতে করিতে সেই সকল কাজে অভ্যস্ত হয় ও তাহার পর অভ্যাসের বশে বিনা তাড়নায়

কাজ করে। সকল দেশেই এই পদ্ধতিতে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালনের অভ্যাস জন্মিয়াছে। এ দেশের দুর্ভাগ্য যে যাঁহারা এ বিষয়ে শিক্ষিত তাঁহারা গ্রামে বাস করেন না ও তাঁহাদের দৃষ্টান্তে গ্রামের লোকে সুশিক্ষায় অভ্যস্ত হইতে পারে না। আমাদের দেশ-হিতৈষীরা যদি একটু নীচু নজর রাখিয়া সহরের আন্দোলন ভুলিয়া দেশের ২৬০০ ইউনিয়ন বোর্ডের লোকের মধ্যে কাজ করিতেন ও দশ জনকে কাজ শিখাইতেন তবে অনেক উপকার সাধিত হইত। গবর্ণমেণ্ট এখন দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যে নূতন ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে বঙ্গদেশের প্রায় ছয় শত থানায় স্বাস্থ্য বিধানের কেন্দ্র স্থাপিত হইবে ও ছয় শত ডাক্তারকে ঐ সকল কেন্দ্রে নিযুক্ত করা হইবে। এ ব্যবস্থায় টাকা খরচ হইবে অতি অধিক; কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত অধিক টাকা ব্যয় হইলেও ক্ষতি নাই। এই সরকারি ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইউনিয়ন বোর্ডের মধ্যে আমাদের কাজ করার প্রয়োজন রহিয়াছে, কেননা কেবল সরকারি বিধানে কাজ চলিলে দেশের লোকের মধ্যে স্বাবলম্বন জন্মে না—কেবল আইনের তাড়নায় কাজ করিলে পূর্ণ দায়িত্ববোধ জন্মে না ও সৎকাজে অভ্যস্ত হইবার শিক্ষা হয় না। দেশের লোকের উপকারের কাজে আমরা যদি না লাগিয়া থাকি, তবে জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের প্রীতি স্থাপিত হইবে না ও আমাদের আহ্বানে দেশের লোকেরা দেশহিতকর কোন কাজে জুটিবে না। বরং সরকারের মুখাপেক্ষা হইয়া আমাদের আহ্বান অগ্রাহ্য করিবে।

বিবাহের বয়সের আইন—শ্রীযুক্ত হরবিলাস সর্দ্দা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এই বিল উপস্থাপিত করিয়াছেন যে বার বৎসর বয়স না হইলে মেয়েদের বিবাহ হইতে পারিবে না। ব্যবস্থাপক সভায় এই বিলের দুই চারিজন বিরোধী আছেন বটে কিন্তু যাহাকে তীব্র বিরোধ বলে, তাহা নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। ১৮৯০ অব্দে যখন নারীদের কোন একটি বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত স্বীকৃতিদানের বয়স নির্ণীত হয় তখন কিরূপ বহুবিস্তৃত তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা ভুলি নাই। এই ৩৭ বৎসরের মধ্যে কিন্তু এদেশে সমাজসংস্কার সম্বন্ধে লোকের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেক; যাহারা কথায় কথায় 'জাতি গেল' 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া হিতকর অনুষ্ঠানের বিরোধী হইতেন তাঁহাদের প্রভাব কমিয়া গিয়াছে। জাতিভেদের কঠোরতার সম্বন্ধে ও বিধবার বিবাহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত গান্ধিজী যাহা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন তাহা দেশের লোক মাথা পাতিয়া না নিলেও শান্তভাবে কান পাতিয়া শুনিতেছে ও কোন বিরোধ উপস্থিত করিতেছে না। বিধাতার কৃপায় ধীরে ধীরে আমাদের শুভদিন আসিতেছে। বিজয়ার পর এই কার্ত্তিক মাসে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভারতের সুসংস্কৃত পবিত্র নবজীবনের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিশ্বনিয়ন্তার কাছে প্রার্থনা করিতেছি।

Editor: Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal

'কালমেঘের [illegible]'

নিয়ম পূর্ব্বক সেবন করিলে যকৃত দোষ জন্য রক্তহীনতা, নেবা, জ্বর, শোথ, অগ্নিমান্দ্য আদি আশু নিবৃত্ত হয়। লিভার খারাপ হইলে শিশুর চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ এবং শরীরের বর্ণ পীত হয়। শিশুর সজীবতা চলিয়া গিয়া সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে। শিশুর যকৃত দোষ দূর করিতে

'কালমেঘের [illegible]'

অদ্বিতীয়

মাঝে মাঝে সেবন করাইলে লিভার খারাপ হইবার আশঙ্কা দূর হয়। শিশু সুস্থ, সবল এবং সুন্দর থাকে।

= বেঙ্গল কেমিক্যাল, কলিকাতা =

মৃত্যুমুখে
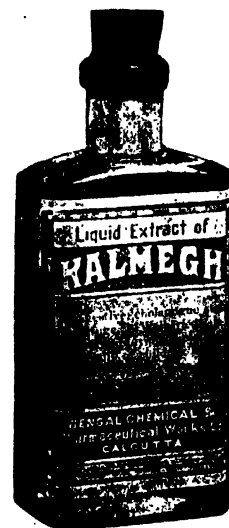
শিল্পী—Sir E. J. Poynter, Bart., P. R. A.

পরিচয়—রোমদেশীয় সৈনিকগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতা অতিশয় বিখ্যাত। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের সময় জনৈক প্রহরা-কার্য্যে নিযুক্ত সৈনিক স্থান-ত্যাগের অনুমতি অভাবে যথা-স্থানে দাঁড়াইয়াই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে পম্পিয়াই খননের সময় এই

হিরণ্ময়ী বিধবাশ্রমে

নারী শিল্প প্রদর্শনী।

৺হিরণ্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ৫৫নং গড়িয়া হাট রোড্ স্থিত বিধবা শিল্পাশ্রম ও তাহার সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে আজ নূতন করিয়া বেশী কিছু বলা বাহুল্য। পরলোকগতা প্রতিষ্ঠাত্রীর পুণ্যস্মৃতি রক্ষা উদ্দেশ্যে এবং বঙ্গনারীগণের শিল্পচর্চ্চার উন্নতিকল্পে আগামী ডিসেম্বর মাসে আশ্রমক্ষেত্রে পূর্ব্ববৎ শিল্পমেলার অনুষ্ঠান হইবে। সহর ও মফঃস্বলবাসী শিল্পকুশল বঙ্গনারীমাত্রই স্ব স্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক শিল্প প্রেরণ এবং মেলা-ক্ষেত্রে যোগদান করিয়া শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন করাইবেন,—এই আমাদের অনুরোধ।

নিয়মাবলী।

১। ডিসেম্বর ৬ই হইতে ৯ পর্য্যন্ত বেলা ২টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী কেবল মহিলাদিগের জন্য খোলা থাকিবে এবং ১০ ডিসেম্বর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য খোলা থাকিবে। প্রবেশিকা ⁄০ এক আনা মাত্র।

২। প্রেরিত দ্রব্য ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছান আবশ্যক এবং তাহার রসিদ লওয়া চাই।

৩। কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী যে কোন মহিলা স্বহস্তরচিত বা অপর কোন মহিলা রচিত কারু-কার্য্য পাঠাইতে পারেন।

৪। প্রত্যেক দ্রব্যে টিকেটের উপর স্পষ্টাক্ষরে রচয়িত্রির নাম, প্রেরকের নাম ও ঠিকানা এবং বিক্রয়ার্থ হইলে দ্রব্যের মূল্য লিখিতে হইবে।

৫। বিক্রীত দ্রব্যের উপর টাকায় ⁄৹ দুই আনা শিল্পাশ্রমের দাম বলিয়া কাটা যাইবে।

৬। ক্রেতাগণ কিনিবার সময় দ্রব্যের মূল্য নগদ দিবেন। পরে ১৫ই হইতে ২০ ডিসেম্বর মধ্যে সেই টাকার রসিদ দেখাইয়া ক্রীতদ্রব্য লোক পাঠাইয়া ও রসিদ দিয়া লইয়া যাইবেন।

৭। উপযোগী ব্যক্তি দ্বারা বিচার করাইয়া নিম্নলিখিত বিভাগের পদকাদি পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

(ক) সেলাই (সাদা ও সৌখীন)

(খ) আটার ছাঁচ বা অন্য গঠন কার্য্য।

(গ) চিত্র শিল্প।

(ঘ) খাদ্য দ্রব্য (পরীক্ষার সুবিধার্থে অল্প পরিমাণ স্বতন্ত্র নমুনা সঙ্গে দেওয়া চাই।)

(ঙ) বয়ন কার্য্য।

(চ) অন্যান্য কারু কার্য্য।

৫৫নং গড়িয়া হাট রোড্,
বালীগঞ্জ।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী
সম্পাদিকা
হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রম।

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৪র্থ সংখ্যা

ভারত তবু কই

হেমচন্দ্রের ভেরীতে যেদিন বাজিয়াছিল—

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়,

সেদিন ব্রহ্মদেশ ছিল স্বাধীন, জাপান ছিল অসভ্য নামে পরিচিত। সেদিনের পর পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল কাটিয়া গেল, নানা বিপ্লবে ও প্রলয়ে পৃথিবীতে বহু জাতির ভাগ্য নূতনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল, কিন্তু ভারতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল না। এ কালের জগদ্বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের মধুর বংশীধ্বনিতে আবার সেই করুণ গীতি বাজিয়াছে। জাগ্রত ভগবানের আহ্বানে পৃথিবীর সকল জাতির লোক জয়ের উল্লাসে ও উৎসাহে ভগবানের আসন ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বিশ্বের সেই দরবারে ভারত নাই। কেন নাই, তাহা বুঝিতে পারিব ভারতের একটুখানি পরিচয় নিবার পর,—কবিরা ভারত নামে ঠিক কি বুঝিয়াছেন বা বুঝাইয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট ধরিয়া নিবার পর।

সারা ভারতবর্ষের অধিবাসীকে একটা জাতিসঙ্ঘরূপে আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবার চেতনা পাইয়াছি কি না—কবিদের গীতিধ্বনির আহ্বান সেই বিপুল জাতিসঙ্ঘের কানে পৌঁছাইবার মত মন্ত্রে উচ্চারিত কিনা,—তাহার বিচারের প্রয়োজন আছে। দেশ সম্বন্ধে ও দেশের জাতিসঙ্ঘ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কিরূপ, দেশের জাগরণ বা উন্নতি সাধনের নামে আমাদের চেষ্টা কতদূর প্রসারিত, কবিদের গানে তাহার কতক আভাস পাইব। কবি হেমচন্দ্র সারা ভারতের বিশ কোটী লোকের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভেরী বাজাইয়াছিলেন তাঁহাদেরই উদ্দেশে,—যাঁহাদের উদ্ভব আর্য্যের বংশে, অথবা যাঁহারা আর্য্যসভ্যতা-শাসিত সমাজে বাস করেন; যাহারা একদিন 'আর্য্যাবর্ত্ত ভূমে' "দিক অন্ধকার করি তেজোধূমে" আসিয়াছিল, তাহাদের নিশ্চেষ্ট বংশধরদিগকেই চেতনা দিবার জন্য পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়াছিলেন,—"আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা, সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা" ? তখনকার বিশকোটী ও এখনকার গণনার ত্রিশ কোটী যে সকলেই আর্য্যবংশোদ্ভব নয়, আর্য্যসভ্যতায় শাসিত নয়, আর্য্যের ঐতিহ্যের পূজক নয়—আর্য্যগৌরবের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত নয়, তাহা এই দেশ সম্বন্ধে গভীর অনভিজ্ঞতায় কবি ভাবিতে পারেন নাই। এ দেশে সাত কোটী মুসলমান আছে যাহারা উৎপত্তিতে যাহাই হউক তিল মাত্রেও ভারতের প্রাচীন গৌরবের ঐতিহ্য পোষণ করে না, তাহাদের কথা আমরা ভুলিয়া যাই; আমরা ভুলিয়া যাই সেই ছয় কোটী অধিবাসীকে,—যাহারা অনার্য্য সমাজ হইতে স্থানচ্যুত হইয়া নীচ অস্পৃশ্য জাতিরূপে কোন প্রকারে আর্য্যসভ্যতায় শাসিত সমাজের তলায় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছে,—ভুলিয়া যাই প্রায় চার কোটী অনার্য্য অধিবাসীদিগকে,—যাহারা প্রায় দূর সম্পর্কেও ব্রাহ্মণ্য-শাসিত সমাজের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট নয়। মুসলমান বাদ দিয়া ও বিদেশের অধিবাসী বাদ দিয়া এখন যে বিশ কোটী অধিবাসী পাই তাহাদের মধ্যে দশ কোটী লোক যে আর্য্যকীর্ত্তির গৌরবের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইতে পারে না তাহা অতি সুস্পষ্ট; বাকি দশ কোটীর মধ্যে আর্য্যগৌরবের দাবি করিতে অনধিকারীর সংখ্যা যে কত তাহার সংখ্যা নির্ণয় না করিয়াই বলিতে পারি যে যাহারা মাথা তুলিয়া বুক ফুলাইয়া ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরবের কথা বলিতে পারে তাহারা সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যায় অতি অল্প। প্রাচীন স্মৃতির উদ্দীপনা দিয়া কবি হেমচন্দ্র যাহাদিগকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের বিশ্ববিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ "ভারত তবু কই" বলিয়া কেবল তাহাদিগকেই খুঁজিয়াছেন; কারণ তিনি ভারতবাসীর নামে তাহাদের দিকেই তাকাইয়াছেন যাহারা "গত-গৌরব হৃত-আসন নত-মস্তক লাজে।"

আমি জানি যে পূরা মাত্রায় কবি রবীন্দ্রনাথের মনে ও প্রাণে দেশ-বোধ আছে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষ বিচরণ-ভূমির সীমা, পূর্ণ আয়তনের ভারতকে আড়ালে ফেলিয়া দিয়াছে; আমরা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই ভুলিয়া যাই যে আমাদের আর্য্যগৌরবে পরিপুষ্ট দেহের সঙ্গে

আর্য্যেতর শরীর কিরূপ অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা,—আমরা ভুলিয়া যাই যে বিপুল আর্য্যেতর সঙ্ঘ না জাগিলে আমাদের ক্ষুদ্র শরীর চেতনা লাভ করিতে পারিবে না ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারিবে না। তাই আমাদের অনেক জাতীয় সঙ্গীত সারা ভারতের জাগরণের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইতে পারে না।

সারা ভারতের জাতিসঙ্ঘের কথা ছাড়িয়া যদি বঙ্গদেশের কাছে কেবল বঙ্গের অধিবাসীদের বিচিত্রতার পরিচয় দেওয়া যায় তাহা হইলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে আমরা কতখানি সীমাবদ্ধ দেশটিতে ও সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জাতীয় জাগরণের জন্য চেষ্টা করি ও মন্ত্র রচনা করিয়া থাকি। বঙ্গের প্রায় পাঁচ কোটী অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা আড়াই কোটী, আর বাকি আড়াই কোটী অ-মুসলমানদের মধ্যে আর্য্যদের প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরবের ইতিহাসে যাহারা উদ্দীপনা পাইতে পারেন তাঁহাদের সংখ্যা অনেক টানিয়া বুনিয়াও এক কোটী করা সম্ভব হয় না, অথচ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয় সারা বঙ্গের উন্নতি ও জাগরণের জন্য। যে-সকল জাতির লোকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা আছে তাহারা আর্য্যবংশের কেহ নয়,—ব্রাহ্মণ-প্রমুখেরা যাহাদের উৎপত্তি অতি নীচ বংশে বলিয়া প্রচার করেন, সেই সকল হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতির গণনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল যদি জলচল জাতির লোকেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়, তবে দেখিতে পাই যে, খাঁটি হিন্দু নামে পরিচিতদের সংখ্যা আশী লক্ষের অধিক হয় না। ব্রাহ্মণদের সমাজে জলচল না হইলেও এই গণনায় সুবর্ণবণিক প্রভৃতিকে ধরা হইয়াছে, কেননা তাহারা আর্য্যসভ্যতায় পুষ্ট ও শিক্ষায় ও সামাজিক অবস্থায় উন্নত। যদি তর্কের খাতিরে ধরা যায় যে যাহারাই এদেশে হিন্দু নামে পরিচিত আছে তাহাদের সকল শ্রেণীর লোককেই প্রাচীন আর্য্যবংশ প্রবর্ত্তকদের গৌরবের ইতিহাস শুনাইয়া জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারিব তবুও স্বীকার করিতে হইবে যে পাঁচ কোটীর মধ্যে তিন কোটী লোকের প্রাণ আমাদের জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইবে না।

আর্য্যবংশের গৌরব স্মরণ করিবার পথে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে আর একটি বড় বাধা আছে। ব্রাহ্মণ-প্রমুখ দুই-তিনটি জাতির লোক হয়ত এই ধারণা পোষণ করিয়া গৌরব করিতে পারেন যে, তাঁহাদের উৎপত্তি হয় বেদকর্ত্তা ঋষিদের বংশে, না-হয় রামচন্দ্র-কৃষ্ণ-বুদ্ধ প্রভৃতিদের বংশে ; কিন্তু বাদবাকি যাহারা রহিল সংখ্যায় অধিক পুরু, তাহাদের বংশকর্ত্তা নামে কাহাকে খাড়া করিলে তাহারা তুষ্ট হইবে ? আমরা আত্মদম্ভে যাহাদিগকে নীচ বলিয়া গণনা করি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের নামে যদি পৌরাণিক কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত হনুমান, বিভীষণ বা গুহক চণ্ডালকে খাড়া করি, তবে সেই লোকেরা সেই সেই মহাপুরুষদের রক্তের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া দাঁড়াইবে কি ? উদ্ভবের ইতিহাসের মাটি খুঁড়িতে গেলে কাহার কপালে যে কোন্ জীব বাহির হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সেকথা ছাড়িয়া দিয়াও বলিতে পারি যে কর্ত্তব্যের

উপাসনায় ও মনুষ্যত্বের বিকাশের চেষ্টায় প্রাচীন বংশগৌরব মানুষের পক্ষে বড় বিশেষ সহায় হয় না। হনুমানের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করিলেই কেহ গন্ধমাদন তুলিতে পারিবে না,— এক মণ ওজনের একখানা পাথরও তুলিতে পারিবে না।

কুলজীর ইতিহাস সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে যে অমুক ব্যক্তি প্রাচীন-কালের অমুকের বংশধর; কিন্তু কাহারও উৎপত্তির এই ইতিহাসে বিন্দুমাত্র ভুল থাকিতে পারে না যে তাহার উৎপত্তি সেই অনাদির নির্দ্দিষ্ট বিধানে, যাহার ফলে সমাজের উচ্চতম হইতে নীচতমের উৎপত্তি। জন্মগত কৌলীন্য যে সকলের পক্ষেই এক, জীবন-ধারণের অধিকার যে সকলের পক্ষেই সমান, আত্মক্ষমতায় অবাধ উন্নতিলাভের পথে যে সকলের দাবি সমান, কেহ যে কোন প্রকার আভিজাত্যের ওজুহাতে অন্যকে তাহার গোলাম করিতে অধিকারী নয়, অথবা ঘৃণ্য জীব মনে করিয়া অন্যকে উপেক্ষা করিবার অধিকারী নয়, এই অতি সরল সহজ সত্য জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের মনে জাগাইয়া তোলা অতি সোজা; অথচ আমরা এই সোজা পথ ছাড়িয়া কল্পিত ইতিহাসের প্রশ্রয় দিয়া মিথ্যা গৌরবের নামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাই। মানুষ যদি অসার ও অননুভূত "হিং-টিং-ছট্"-এর কুয়াশা কাটাইয়া দাঁড়ায়, আর যাহা প্রাণে প্রাণে অনায়াসে অনুভূত হইতে পারে সেই সত্য অনুভব করিয়া আপনার মনুষ্যত্ব বাড়াইবার জন্য মাথা তোলে, তবে কর্ম্মের পথ—স্বাধীনতার পথ—উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইতে পারে।

বড় দুঃখ হয় যে এদেশে অনেক জাতির লোকেরা বা সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদের জাতির বা সম্প্রদায়ের উন্নতির নামে এইরূপ উদ্যোগ করিয়া থাকে যে অমুক-অমুক জাতির লোকের পক্ষে উচিত যে তাহাদের জল বা অন্ন গ্রহণ করুক অথবা তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিক। এ উদ্যোগে যে গোলামি বুদ্ধির পরিহার দেখা যায় না, বরং হীন দাসত্বকে আঁকড়াইয়া ধরাই সূচিত হয়, ইহা বহুদিনের দাসত্বের ফলে লোকে বুঝিতে পারে না। অমুক আমার হাতের জল যদি না ছুঁইতে চায়, নাই-ই ছুঁইল; আমি তাহার কাছে মাথা নীচু করিয়া গোলাম নামে স্বীকৃত হইবার জন্য উদ্যোগ করিব কেন? Man's a man for a' that—আমি মানুষ, আমি আপনার অধিকারে অধিকারী, এই কথা বলিয়া সে মাথা উঁচু করে না কেন? যে-সম্প্রদায়কে নীচ বলিয়া তুচ্ছ করিয়া ও দূরে রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের লোকেরা আপনাদের দেব-মন্দির গড়িয়াছেন, সে-মন্দিরে ঢুকিবার জন্য নীচ বলিয়া চিহ্নিত সম্প্রদায়ের মরণ কামড় ও গোলামি পণ কেন? গুজরাটী ভাষার আমদানী সত্যাগ্রহ অবলম্বনে কোলাহল না বাধাইয়া আত্মমর্য্যাদার বুদ্ধিতে কি লোকেরা আপনাদের মন্দির আপনারা গড়িতে পারে না? বলিতে পারেন না কি যে, তুচ্ছ করি তাহার আভিজাত্যের গৌরবকে যে তাহাকে নীচ বলিয়া গণনা করে? মনুষ্যত্বের বুদ্ধি না জাগাইয়া উল্টা পথে চলাতেই সমাজ-ক্ষয়কর কোলাহলের সৃষ্টি হইতেছে। নিপীড়িত নামে

অভিহিত কোন কোন জাতির লোকেরা এতই উল্টা বুদ্ধিতে আত্মসম্মান হারাইয়া আপনাদের উন্নতি চাহিতেছে যে, তাহার একদিকে ত পরের গোলামিতে ধন্য হইতে চায়, আবার অপর দিকে শ্রমের মাহাত্ম্য ও গৌরব ভুলিয়া ভদ্র জাতি সাজিবার নামে আত্মক্ষয়কর আলস্য লাভকেই উন্নতি মনে করিতেছে।

সমাজতত্ত্ববিদের কাছে প্রাচীনকালের সকল ইতিহাসের প্রয়োজন আছে। কিরূপ অবস্থায় প্রাচীনকালে কি জ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছিল, প্রাচীনের কি নীতিতে সমাজ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, আবার অন্যদিকে প্রাচীনকালের কি দোষে ভারতের প্রাচীন গৌরবের সৌধ অটুট রহিতে পারিল না, তাহা সমাজতত্ত্বজ্ঞেরা যত্ন করিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন ও দেশের লোককে শিখাইবেন। কিন্তু প্রাচীনকালের গৌরবের নামে খানিকটা রক্ত গরম করিলে অথবা আলস্যের শয্যায় শুইয়া উৎফুল্ল হইলে কর্ত্তব্য সাধনের ক্ষমতা বাড়ে না। পূর্ব্বপুরুষেরা মহৎ ছিলেন কিম্বা ছিলেন না, ইহার কোন কথাতেই নিজের অক্ষমতা বা ক্ষমতা বাড়িতে পারে না বা কমিতে পারে না। যদিও প্রাচীনকালে কিছু ছিল না তবুও আমি তাহা চাই, কেন-না আমি তাহা চাই মনুষ্যত্বের দাবিতে,—প্রাচীনকালের নজিরে নয়। ধ্রুবের মত বলিতে হইবে—ইচ্ছামি তদহং স্থানং যন্ন প্রাপ পিতা মম। এই বুদ্ধি জাগাইবার জন্য জাতীয় সঙ্গীত রচিত হউক।

অন্য আর একটি দিক্ দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব—ভারত তবু কই। ভারতসমাজে যে-শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে জ্ঞানের অধিকার লুপ্ত হয় নাই—সামাজিক সুবিধায় যাঁহারা শিক্ষা-লাভে ও পদ-গৌরব লাভে বঞ্চিত ন'ন্, সেই শ্রেণীর লোকেরা একালের জগতের স্বাধীন-জাতির সঙ্গে অচিহ্নিত ও অপরিচিত নন্। কাব্যরচনার প্রতিভায়, জ্ঞানের আলোচনার মহিমায়, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকুশলতায় ও অন্যবিধ দক্ষতায় এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি পৃথিবীতে যশস্বী হইতেছেন, আর ইউরোপে, আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অষ্ট্রেলিয়ায় সসম্মানে আদৃত হইতেছেন ও আমাদের এই দেশে সরকারি চাকুরিতে ও নানা অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ইঁহাদের কৃতিত্ব উজ্জ্বল হইতেছে; তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছি যে হেমচন্দ্র মুখ্যভাবে যাহাদিগকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন ও যাহাদের কথা বিশেষভাবে মনে রাখিয়া কবিসম্রাট ভারতকে খুঁজিয়াছেন, তাহারা সম্পূর্ণরূপে "জনগণ-পশ্চাতে" নাই। তবে ইহা স্বীকৃত যে ইঁহারা পরাধীন ও বহু বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী, আর সেই কারণে যথার্থ ই ইঁহারা "নত-মস্তক লাজে।" এই অবস্থার কারণ অতি সহজেই ধরা যায়। যাহাদের কাছে উন্নতি লাভ করা সহজসাধ্য, ক্ষমতার দণ্ড হাতে নেওয়া দুরূহ নয়, তাহাদের সর্ব্বশরীরকে টানিয়া ধরিয়া নীচু করিয়া রাখিয়াছে একটা বিস্তৃত জাতিসঙ্ঘ, যাহাদের কথা আমরা আমাদের উন্নতির বিচারের বেলা স্মরণ করি না। যে-জনসঙ্ঘের অটল বোঝা আমাদের গলায় ঝুলিতেছে আর যে-বোঝার ফলে আমরা মাথা

নীচু করিয়া থাকিতে বাধ্য হইতেছি, সে-বোঝার দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই। কোল-সাঁওতাল, কন্দ-গণ্ড, পঞ্চম নামে চিহ্নিত দক্ষিণ প্রদেশের লোকেরা আমাদের রাষ্ট্রীয় শরীরের অচ্ছেদ্য অংশ। ইহাদের মধ্যে আর্য্যের ঐতিহ্যের মহিমা বা হিন্দু-পুরাণের ভক্তিউদ্রেককারী চিত্র কিছুতেই প্রাণস্পর্শী হইতে পারে না; আমরা একেবারে তাহাদের কথা ভুলিয়া,—দেশের অধিকাংশ লোকের কথা ভুলিয়া,—প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধিতে জাতীয় সঙ্গীত বা জাগরণের মন্ত্র রচনা করিতেছি—মানুষের মনে মনুষ্যত্ব-বোধের চেতনা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছি না। এখানে একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। কবি রবীন্দ্রনাথের গানটির একটি ক্ষুদ্র ছত্র তুলিয়া তাঁহার মুখ্য দৃষ্টির দিক্‌টি আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আমি বলিতে বাধ্য যে তাঁহার ঐ গানটি অন্য হিসাবে মনুষ্যত্ব জাগাইবার মন্ত্র।

সমাজের নিম্ন স্তরে যে জন সাধারণের কথা বলিয়াছি—যাহাদিগকে আমাদের গলায় বাঁধা বোঝা বলিয়া উপমার খাতিরে বলিয়াছি, তাহারা যে সুযোগ ও সুবিধা পাইলে পূর্ণ উন্নতিলাভ করিয়া আমাদের বোঝা না হইয়া সহায় হইতে পারে, এ প্রবন্ধে তাহার বিচার উত্থাপিত করিব না। যাঁহারা মনে করেন যে ঐ শ্রেণীর লোকসমূহ যদি যেখানেই আছে সেখানেই থাকে, তবুও স্বরাজ্যলাভে বাধা হয় না, তাঁহাদের মনের ভাবকে অতি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিব। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এই ভারতবর্ষ বিদেশীয়দের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে যখন উচ্চ শ্রেণীর রাজা প্রভৃতিদের পক্ষে বিনা বিঘ্নে স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা করা সম্ভব হইয়াছিল, তখন এই সময়ে উন্নতরা নিজেদের হাতে স্বরাজ্য পাইলে নির্ব্বিঘ্নে দেশ শাসন করিতে পারিবেন না কেন। ইহার একটি উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত। বিদেশীয়েরা যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অধিকার বিস্তার করে তখন ঐ সংখ্যায় বহুল জাতিসঙ্ঘ দেশরক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে নাই ও দেশরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে নাই বলিয়াই বিদেশীয়দের পক্ষে এদেশ অধিকার করা কঠিন হয় নাই। স্বদেশ বলিয়া সারা দেশকে ভাবিবার বুদ্ধি তখনও ছিল না, এখনও নাই।

দ্বিতীয় উত্তরটি অধিকতর প্রয়োজনের। আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষেরা বিরোধী অনার্য্যদের বিরুদ্ধে অল্পবিস্তর যুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে উচ্ছন্ন করিয়া সমগ্র দেশকে আর্য্যজাতির দেশ করিবার বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। বহুবিস্তৃত ভারতে আর্য্যেতরেরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের রাজ্যের সীমায় বাস করিয়া আপনাদের মত উন্নতি লাভ করিতে বাধা পায় নাই। তাই এখন তাঁহারা অত্যধিক জনসংখ্যায় ভারতে রহিয়াছে। যে-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রভাবে ইউরোপীয়েরা আমেরিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় ইউরোপীয়দের দেশ করিয়াছেন ও টাস্মেনিয়া প্রভৃতি স্থানের আদিম লোকেরা যে-প্রভাবে একেবারে ঝাড়ে বংশে নির্ম্মূল হইয়াছে, ভারতের উচ্চজাতীয়দের মধ্যে সে বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির প্রভাব কখনও জাগে নাই। এই

জন্য এখন ইংরেজের একচ্ছত্র রাজত্বের দিনে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের গলার বোঝা হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষেরা যে এই বোঝা ধ্বংস করেন নাই তাহার জন্য আমরা লজ্জিত বা দুঃখিত নই, বরং অসীম গৌরব অনুভব করি। এখন এই পরিবর্ত্তিত সময়ে আমাদের অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য জাগিয়াছে যে, এই বোঝাকে আমরা আমাদের সহায় করিয়া তুলিব—সম্পদ করিয়া তুলিব।

আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর নিজেদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। আর সেই গণ্ডীর ভিতরকার লোকেদের মনের ভাবের সহিত পরিচিত, তাই স্বাভাবিকভাবে আমাদের চিন্তায় ও কাব্যের কল্পনায় সম্প্রদায়-বিশেষের মনের ভাবই স্ফূর্ত্তি পায়। আমরা অনভিজ্ঞতায় ও আত্মম্ভরিতায় মনে করি যে আমাদের সুমধুর ভাবের উচ্ছ্বাসে সারা জাতির লোকের প্রাণে ভাবের বন্যা বহিবে। বিশ্বপ্রেমের বাণী আমাদের প্রাণের ভাষা নয়,—উহা আমাদের মুখে তোতাপাখীর পড়া বুলি। প্রাণে প্রাণে অনুভব করি না যে সারা ভারতের জনসঙ্ঘ আমাদের শরীরে ও প্রাণে অচ্ছেদ্যভাবে গাঁথা আছে; তাই কষ্ট-কল্পনা করিয়া সারা জাতির কল্যাণের নামে কিছু বলিতে বা রচনা করিতে গেলে আমাদের উক্তি সতেজ ও সরস হয় না,—প্রাণস্পর্শী উদান বাণী হয় না। আমরা যে বহুবিধ ধর্ম্মমতের প্রভেদে ও সামাজিক রীতি ও ঐতিহ্যের প্রভেদে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আর সেই সকল সম্প্রদায়ের সকল মতবাদ ও সস্নেহে পোষিত মনের ভাব যে আমাদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আমরা যদি আত্মশরীরের প্রকৃতি বুঝিতে ভুল না করিতাম, তবে আমাদের কল্পনা ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে পড়িয়া সঙ্কীর্ণ হইত না, আমাদের দশ-প্রহরণ-ধারিণী দুর্গার মনোহর কল্পনা সারা জাতি-সঙ্ঘের কাছে মনোহর বলিয়া আদৃত হইবে মনে করিতাম না; আমাদের জাতীয় সঙ্গীত অন্যরূপ ধারণ করিত।

হিতৈষী কবিরা বলিতে পারেন যে তাঁহারা সারা দেশকে মাতৃরূপে পূজা করিবার জন্য জনসঙ্ঘের কল্পনাকে জাগাইতেছেন, আর সেরূপ কল্পনা করিবার পক্ষে কোন সম্প্রদায়ের দেশ-ভক্তের আপত্তি থাকিতে পারে না। এই উক্তির বিস্তৃত সমালোচনা না করিয়া এইটুকু দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঐরূপ কল্পনাকে আশ্রয় করিলেই মনে সেইরূপ স্থায়ী উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মে না যাহার প্ররোচনায় মানুষে আপনার উন্নতির জন্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইতে পারে, অথবা দেশের অন্য দশজনকে যথার্থই আপনার উন্নতির সহায় মনে করিয়া তাহার সঙ্গে মিলিতে পারে। এই মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন নাই যে, খানিকটা মনের উত্তেজনা বাড়াইয়া আস্ত মাটির দেশটাকে মা বলিয়া ডাকিলেই দেশের প্রতি মাতৃস্নেহ জন্মিবে। এই সারা দেশ কেন প্রত্যেক মানুষের আপনার, সে জ্ঞান না জন্মিলে সারা দেশের দিকে কিছুতেই দৃষ্টি পড়িতে পারে না; আর যদি যথার্থ স্বার্থজ্ঞানের সুবুদ্ধিতে সে আকর্ষণ জাগে তবে মা বলিয়া ডাকিয়া সে

আকর্ষণকে গভীর করার প্রয়োজন হয় না। খাঁটি স্বার্থবোধ না জন্মিলে কল্পনার কৃত্রিমতায় ও ভাবের ক্ষণিক উত্তেজনায় মনে-প্রাণে স্থায়ী সঙ্কল্প জাগাইতে পারা যায় না।

তাহা ছাড়া আর একটি কথা আছে, যাহা খুব বড়। লোকের মনে স্বদেশপ্রেম জন্মাইবার জন্য আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের লেখকেরা এই দেশকে অন্য সকল দেশ অপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ভারতের শিয়রের দিকে তাহার মাথার উপরে হিমালয়ের চূড়ার মুকুট আছে ও সেই মুকুট মণি-মুক্তার ঝলক দিয়া ঝলমল করিতেছে, দেশের পাদুখানি দক্ষিণের সাগর চুম্বন করিতেছে, অথবা এদেশটি সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা, অথবা আমাদের ধানের ক্ষেতের উপর দিয়া বাতাসে যে ঢেউ খেলিয়া যায় তাহা অতি অপূর্ব্ব, ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রথম কথা এই পৃথিবীতে কি অন্য সুন্দর বা সুন্দরতর দেশ নাই? উর্ব্বরা ভূমি কি ভারতের একচেটিয়া? আর অন্য কোন দেশের শস্যের ক্ষেতের উপরে কি বাতাসে ঢেউ খেলে না? কতকগুলি কোমল-কান্ত পদাবলীর আবরণে কি সত্যকে ঢাকা যায়? প্রীতি ও স্নেহ বাড়াইবার উপায় কি এই যে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র শরীরের সৌন্দর্য্যে অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবায়? যে কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্যের খাতিরে স্ত্রীকে ভালবাসে তাহার মনে কি প্রীতির আকর্ষণ আছে? অন্য দশটি নারী নিজের স্ত্রী অপেক্ষা সুন্দরী দেখিলে বা সুন্দরী বলিয়া স্বীকৃত হইলে যদি নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা উপিয়া যায় তবে দাম্পত্য প্রেম মিথ্যা কথায় দাঁড়ায়। তুমি যে তোমার ছেলে মেয়েকে ভালবাস সে কি এই মনে করিয়া যে, তাহারা অপরের ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশী সুন্দর? পরের সুন্দর ছেলে দেখিয়া তোমার চোখ জুড়ায়, কিন্তু তবুও তুমি নিজের অপেক্ষাকৃত অসুন্দর অথবা কুৎসিৎ সন্তানকেই সর্ব্বাধিক স্নেহে পালন কর। সৌন্দর্য্যের খাতিরে ভালবাসিতে হয়, এই শিক্ষাই কুশিক্ষা ও পাপ সৃষ্টির শিক্ষা। সুন্দর হউক অসুন্দর হউক, উর্ব্বরা হউক বা মরুভূমি হউক, যে-দেশ আমার, সে আমার—সে-দেশের প্রতি মায়া আমার সর্ব্বাধিক। তোমার আমার জন্মমাত্রেই অধিকার যে আমরা অবাধে সকল অত্যাচারীর অত্যাচারকে পরাভূত করিয়া নিজের মনুষ্যত্বকে বাড়াইব, নিজের অধিকারকে রক্ষা করিব, নিজের দেশকে নিজের করায়ত্ত রাখিব। যেদিক দিয়া জাগাইলেই মনের ভাবকে জাগাইতে পারা যায়, সেইদিক দিয়া এই ভাবকে জাগ্রত করিতে হইবে: মিথ্যা কথা রচিলে কোন ফল হইবে না। আমরা অবিশ্রান্ত আধ্যাত্মিকতার কথার বড়াই করি আর এই প্রাণ জাগাইবার মন্ত্রের বেলায় যাহা আত্মার আকর্ষণের বস্তু, যাহা স্থায়ী প্রেমের ভিত্তি তাহাকে উপেক্ষা করিতেছি। জাতীয় সঙ্গীতের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইংলণ্ডের একটি গানের উদাহরণ দিব। ইংলণ্ড দ্বীপের লোককে ইউরোপ মহাদেশের একজন বিজয়ী বীর এই বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলেন যে, তিনি অনায়াসে উহাকে পরাভূত করিতে পারেন অথবা সাগরের প্রাচীর বা পরিখার মধ্যে উহাকে শুকাইয়া বা ভিজাইয়া মারিতে পারেন। ইংরেজ কবিরা তখন দ্বীপটির শোভার বর্ণনায়

হিতৈষণা জাগান নাই,—তাঁহারা ক্ষমতা ও মনুষ্যত্বের দিক দিয়া প্রেরণা পাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহারা সাগরকে শাসন করিতে পারেন ও আপনার মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া গোলামিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কবিতায় আছে—Rule Britania rule the waves, Britons never shall be slaves. একবার ইংলণ্ডের প্রভাবশালী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা একদল লোকের ধর্ম্মবুদ্ধিকে দাবাইতে চাহিয়াছিলেন; তখন সেই ক্ষুদ্র দলের লোকেরা নিজেদের ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রেরণায় আপনাদের মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য দেশের মাটিকে তুচ্ছ করিয়া নূতন আমেরিকা দেশ সৃষ্টি করিয়াছিল। মনুষ্যত্ব আগে ও দেশের মাটি তাহার পরে: ঘরের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ঘরের সৃষ্টি। আমরা এদেশে পরাধীন; অন্য কোন দেশে গিয়া নিজেদের নূতন দেশ গড়িবার ক্ষমতা ও সুবিধা আমাদের নাই। এই দেশে থাকিয়াই,—এই পূর্ব্বপুরুষের ভিটায় আমাদের অধিকার বজায় রাখিয়া মনুষ্যত্বকে বাড়াইয়া ধন্য হইতে হইবে। ভারতের সকল জাতি না জাগিলে ও প্রাণে প্রাণে গাঁথা না পড়িলে আমাদের আত্মরক্ষা অসম্ভব। এই খাঁটি স্বার্থের কথা যে-শিক্ষায় সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারে, যে-শিক্ষায় মনুষ্যত্বের আদর বাড়িতে পারে,—যে-শিক্ষায় লোকে শিখিতে পারে যে অত্যাচারী স্বদেশী হউক বা বিদেশী হউক কাহারও অধিকার নাই যে কাহারও মনুষ্যত্বকে চাপিয়া রাখিবে বা রাষ্ট্রের নামে বা ধর্ম্মের নামে কাহাকেও কোন প্রভাবশালী ধনীর বা পুরোহিতশ্রেণীর গোলাম করিতে পারিবে, সেই শিক্ষার উদ্যোগ না করিলে সকল স্বরাজলাভের উদ্যোগ ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন মনুষ্য, প্রত্যেক ব্যক্তির ভগবদ্দত্ত এই অধিকার আছে যে, সে তাহার মনুষ্যত্বকে অক্ষুণ্ণভাবে বাড়াইতে পারিবে। যদি এই মন্ত্র অতি অল্প পরিমাণেও মানুষের প্রাণকে অধিকার করে তবে ধীরে ধীরে মানুষের নিজের উন্নতি, দেশের উন্নতি ও স্বরাজলাভ সুলভ হইতে পারে। এই মনুষ্যত্বের বোধ জাগাইবার জন্য আমাদের তপস্যা হউক—আমাদের কবিরা এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্য জাতীয় সঙ্গীত রচনা করুন, ও সারাদেশের লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে তাহা গীত হউক।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

মেঘদূতের কবি

মানস-হ্রদ-বিহারী কিগো হরি' মরাল-পুচ্ছ
গড়িলে কবি ! লেখনী নিরমল,
তাইতে সমতলেরি সুখ, দুঃখ করি তুচ্ছ
আঁকিলে ছবি অলকা ঝলমল ?

২

ছন্দে মেঘ-মন্দ্র বাজে মুখরি' গিরি-শৃঙ্গ,
চমকে তাহে চপলা রহি রহি ;
কোথা বা শ্লোক-কমল ঘিরি গুঞ্জে কোটী ভৃঙ্গ,
বিগলে মধু শিথিল দল বহি।

৩

ধবল-তনু বলাকাসম ঘিরিয়া ভাব-ঘন
উড়িছে কোথা আকুল কল্পনা,
কোথা বা ধারা-ভবন রচে স্বপন-পরীগণ
জলদে—জল-ধনুর রঞ্জনা।

৪

পবনারূঢ় মেঘের রথে তোমার কবি-হিয়া
চলেছে ধেয়ে শূন্য নভ ভেদি'
সে কোন লোকে— স্বপ্নময়ী মানসী তব প্রিয়া
কাঁদিছে যথা সিঞ্চি মণি-বেদী।

৫

তোমার মেঘ-বিমান তলে চলেছে ভাসি ভাসি
আমরি! কত উজল ছায়া-চিত্র—
জম্বু-বনে নর্ম্মদারি উছল-ছল হাসি,
নাচিছে তটে ময়ূর মেঘ-মিত্র !

৬

গন্ধরব-নগরী সম সৌধময়ী পুরী
ভুলাতে চাহে চকিত ভুরুপাতে,
কিন্তু তোমা হে কবি মম ! প্রেমের মায়া-ডুরী
টানিছে দূর—সুদূর অলকাতে।

নগরী মাঝে নেহারি মহা-কালের মন্দিরে
　　নারীশ্বর জড়িত বুকে বুকে
উঠিল কাঁদি বিরহী হিয়া স্মরি বিরহিণীরে,
　　উড়িল দূর-মানস-সর-মুখে।

উধাও তুমি চলেছ কবি! মুখরি মেঘ-চক্র,
　　গগনে উড়ে গলিত বারি-চূর্ণ;
তোমার নীলরথের গতি উচ্চাবচ বক্র,
　　কুমার-বন বীণার সুর-পূর্ণ।

গন্ধরব-অপ্সরস-পরীর ধাম ছাড়ি
　　চলেছ তুমি সে কোন্ মায়া-পুরে,
গঙ্গা-মূল গোমুখ হ'তে তুহিন-হিম বারি
　　ঝরিছে গদ-গদদ্গদ সুরে।

চলেছে তব চিত্ররথ; বামনরূপ ধরি'
　　ভেদিল ওই মানস-হ্রদ-দ্বার;
কৈলাসেরি শুভ্র চূড়া হইতে অবতরি'
　　হেরিলে সর,—সিত মুকুরাকার।

কনকময় কমলালয় মানস-সরোবর,
　　মৃণাল দুলে, মরাল খেলে তায়;
হৈমতারি বালুকা-তটে ধরিয়া তব ঘর
　　স্বপনে-দেখা অলকাপুরী ভায়।

১২

হে কবি! কত জনম ধরি' মানসে অবগাহি'
　　ধেয়ানে সেই মানসী অনুপমা
কত না রূপে ছন্দে সুরে গোপন গানে গাহি
　　রতি দিলে বিশ্ব-মনোরমা,

১৩

আঁকিলে যার ছবিটি, ধরি আনন্দেরি তুলি,
মিলন-মধু-প্রেমের রস-সিক্ত,
হে কবি! বুঝি হারায়েছিলে মরত-মোহে ভুলি'
অমর সেই মাধুরী হ'তে চিত্ত ?

১৪

জনম পরে জনম নিয়ে কত না যুগে যুগে
খুঁজিলে তারে আত্মহারা কবি !
একদা বুঝি জলদ হেরি সুনীল নভ-বুকে
সহসা তারি জাগিল স্মৃতি-ছবি ?

১৫

স্বপন যেন খুলিয়া দিল অলকা লোকাতীত
মানস-তটে অমর মায়াপুরী !
হেরিল তব নিগূঢ় দিঠি নির্মাল পুলকিত
মানসী তব কাঁদিছে ঝুরি ঝুরি !

১৬

অমনি কবি ! ভুলিলে তুমি নিম্ন দুনিয়ার
তুচ্ছ রূপ, তুচ্ছ সুখদুখ,
মরাল-ডানা মেলিয়া তব উর্দ্ধে নীলিমার
উড়িলে তুমি স্বপন-ভরা বুক।

১৭

মিলন যত না দিল সুখ, লভিলে ততোধিক
প্রিয়ার তব বিরহ-ছবি আঁকি,
বিশ্ব-রস-পিপাসা আজো মিটায় অ-নিমিখ
বিরহ-স্মৃতি অশ্রুজলে মাখি।

১৮

রাম-সীতারি করুণ গাথা রচিল আদি কবি
বিশ্বে দিতে বিরহ-রস-স্বাদ ;
ভুঞ্জি নিজে, ছন্দে তব সেই রসেরি ছবি
আঁকিলে কবি ! বাঁটিতে পরসাদ।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

ছন্দের কথা

(৪র্থ পর্ব্ব)

বাংলায় গীত্যার্য্যা শ্রেণীর ২৮ মাত্রার বা তদধিক মাত্রার পংক্তিতে শব্দ নির্ব্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করিলে আবৃত্তি কালে অস্বাভাবিক ঠেকে না। সাধারণতঃ, খাঁটী সংস্কৃত শব্দগুলির দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ কর্ণ-কটু হয় না,—খাঁটী বাংলা শব্দগুলিতে দীর্ঘ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ আমাদের কর্ণের পক্ষে অভ্যস্ত নয়—সেজন্য দীর্ঘস্বরযুক্ত বাংলা শব্দ যথাসম্ভব পরিহার অথবা দীর্ঘস্বরযুক্ত বাংলা শব্দের দীর্ঘস্বরকে উপেক্ষা করিয়া চলিলে ছন্দের কৃত্রিমতা অনেক কমিয়া যাইবে। যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের দীর্ঘতা সংস্কৃত ও বাংলা দুইয়েতেই অকৃত্রিম। সেজন্য যুক্তাক্ষরময় শব্দ প্রয়োগে বিশেষ কোন সতর্কতার প্রয়োজন নাই।

কবিবর গোবিন্দচন্দ্র রায়ের—'যমুনা লহরী' নামক কবিতাটি ৩০ মাত্রার গীত্যার্য্যা শ্রেণীর জয়দেবী ছন্দে একটি প্রসিদ্ধ রচনা। এযুগে স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের তারতম্য-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এ ছন্দে রচিত কবিতা ইহাই বোধ হয় ১ম। এই কবিতাটির সাহায্যেই এ ছন্দের শব্দবিন্যাস আলোচনা করা যাইতে পারে।

১। নির্ম্মল সলিলে | বহিছ সদা তট- | শালিনী সুন্দর | যমুনে ও।
২। কতশত সুন্দর | নগরী তীরে | রাজিছে তটযুগ | ভূমি ও॥
৩। পড়ি জল নীলে | ধবল সৌধ ছবি | অনুকারিছে নভ | অঙ্গন ও।
৪। যুগযুগবাহী | প্রবাহ তোমারি | দেখিল কতশত | ঘটনা ও॥
৫। তব জল-বুদ্বুদ | সহ কত রাজা | পরকাশিল লয় | পাইল ও।
৬। কলকল ভাষে | বহিয়ে কাহিনী | কহিছ সবে কি পু- | রাতন ও॥
৭। স্মরণে আসি ম- | রমে পরশে কথা | ভূত সে ভারত | গাথা ও।
৮। তব জলকল্লোল | সহ কত সেনা | গরজিল কোনদিন | সমরে ও॥
৯। তব জলতীরে | পৌরব যাদব | পাতিল রাজ সিং | হাসন ও।
১০। শাসিল দেশ | অরিকুল নাশি | ভারত স্বাধীন | যেদিন ও॥
১১। দেখিলে কি তুমি | বৌদ্ধ পতাকা | উড়িতে দেশ বি- | দেশে ও।
১২। তিব্বত চীনে | ব্রহ্ম তাতারে | ভারত স্বাধীন | সে দিন ও॥
১৩। কভু শত ধারে | এ উভ পারে | পাঠান আফগান | মোগল ও।
১৪। ঢালিল সেনা | ত্রাসি নিবাসী | বাঁধিল ভারতে | বন্ধনে ও॥
১৫। সে দিন হইতে | ভারত নারী | অবরোধে অব- | রোধিত ও
১৬। সেদিন হইতে | অন্ধ মনোগৃহ | পরবল অর্গল | পাতে ও॥
১৭। ঐ তব তীরে | শুভ্র শরীরে | দণ্ডারিত গৃহ | রাজ ও।

১৮।	যার স্বরূপে	দিকদিক হইতে	কর্ষে মনুজ স-	মাজে ও ॥
১৯।	কত নর পঞ্জরে	নির্ম্মিল ইহারে	শোষি শোণিত	কোষে ও।
২০।	দর্শাইতে সব	দর্শক লোকে	প্রমদা গৌরব	শেষে ও ॥
২১।	অহো কতকাল	রবে এ জীবিত	তটিনি তট তব	শোভি ও।
২২।	ভূষণ হইয়ে	তব জল নীলে	ব্যঞ্জিতে মন অভি	লাষে ও ॥

১ম পংক্তিতে ‘সলিলে’ ‘সদা’ ও ‘যমুনে’ এই তিনটি শব্দের দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ বেশ স্বাভাবিক। ‘শালিনী’ শব্দে ২টী দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ স্বাভাবিক নহে,—‘আকার’টিরই স্বাভাবিক। সম্বোধনে ‘শালিনী’কে ‘শালিনি’ করিলে আর কোন’ গোল নাই।—নতুবা একটি মাত্রা বাড়িয়া যায়—অথবা ‘নী’ এর ঈকারকে উপেক্ষা করিতে হয়।

২য় পংক্তির দীর্ঘ উচ্চারণগুলি সবই স্বাভাবিক। উপরি-উপরি—‘রী—তী—রে—রা’ এই চারিটি অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণে পংক্তিটি ক্লিষ্ট হইয়াছে। ‘রাজিছে’ ক্রিয়াটির ১মাংশ সংস্কৃত, ২য়াংশ বাংলা। ‘রা’এর দীর্ঘ উচ্চারণই স্বাভাবিক—‘ছে’ এর পক্ষে নহে। কবি, ‘ছে’এর দীর্ঘতাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। চতুর্থ পর্ব্বে ১টি মাত্রা কম পড়িয়াছে।

৩য় পংক্তিতে ‘সৌধ’ এর ঔকার বাংলামতেও দীর্ঘ। ‘অনুকারিছে’ শব্দের দুইটি দীর্ঘ স্বরের জন্য ব্যবস্থা ‘রাজিছে’র মতই।

৪র্থ পংক্তিতে—দেখিল ও তোমারি দুইই বাংলা শব্দ—দুইয়েই দীর্ঘ উচ্চারণ কর্ণকটু। ‘তোমারি’ শব্দে দুইটির একটি কতকটা চলিয়াছে।

৫ম। পরকাশিল—মৈথিলীর নিকটবর্ত্তী এবং পঞ্চাক্ষরী শব্দ—আ’ এ দীর্ঘতা বেশ মানাইয়াছে—‘পাইল’ শব্দে তেমন মানায় নাই।

৬ষ্ঠ। বহিয়ে ও সবে—দুইই বাংলা—দীর্ঘত্ব অস্বাভাবিক। ‘কাহিনী’র পক্ষে বাংলায় একটি স্বরের দীর্ঘত্ব সম্ভব হইয়াছে।

৭ম—৮ম। বাংলা শব্দগুলির একটিতেও দীর্ঘ উচ্চারণ স্বাভাবিক ও শ্রুতিরঞ্জন হয় নাই। কবি ‘সে’—ও ‘কোন’—শব্দ দুটীতে দীর্ঘ উচ্চারণের চেষ্টাও করেন নাই।

৯ম—১০ম। বাংলা ‘পাতিল’ শব্দের দীর্ঘ স্বরকে কবি উপেক্ষা করিয়াছেন—কিন্তু ‘শাসিল’ এর দীর্ঘ স্বর মর্য্যাদা পাইয়াছে—তবু ‘শাসিল’ যে পংক্তিকে শাসন করিতেছে—তাহাতে দুই পর্ব্বে মাত্রা কম পড়িয়াছে।

১১শ-১২শ—বাংলা ক্রিয়া ‘দেখিলে’ ও ‘উড়িতে’—শব্দ দুটীতে দীর্ঘত্ব অচল। ‘দেখিলে’ শব্দটি—‘একটি’ দীর্ঘ উচ্চারণই দিতে চায় না—তাহার কাছে জোর করিয়া ‘দুইটী’ আদায় করা হইয়াছে। ‘তাতারে’ শব্দ বাংলাও নয় সংস্কৃতও নয়—তিনটি দীর্ঘ স্বরের দুটীর দীর্ঘ উচ্চারণ দিয়াছে—তাহাতেও অস্বাভাবিক শুনাইতেছে না।

১৩শ—১৪শ। 'পাঠান আফগান মোগল' এ তিনটি বিজাতীয় শব্দে কবি দীর্ঘ উচ্চারণ আদায় করিয়াছেন—কিন্তু ২টী দীর্ঘস্বরকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

১৫শ—১৬শ। বাংলা 'হইতে' ও 'সে' শব্দ দুইটীতে দীর্ঘ উচ্চারণ স্বাভাবিক নয়। 'অবরোধে অবরোধিত'—সংস্কৃত—সেজন্য বেশ স্বাভাবিক।

১৭শ—১৮শ। সংস্কৃত শব্দগুলির দীর্ঘোচ্চারণ সবই স্বাভাবিক। বাংলা 'যার' ও 'হইতে' শব্দদ্বয়ে বিপরীত। 'কর্ষে' সংস্কৃতাত্মক বাংলা শব্দ সেজন্য—অস্বাভাবিক নহে।

১৯ম—২০ম। 'ইহারে' এর আকারকে জোর করিয়া দীর্ঘ করা হইয়াছে। 'দর্শাইতে' এর শেষে 'এ' দীর্ঘস্বরকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।

২১ম—২২ম। অধিকাংশ বাংলা শব্দেরই দীর্ঘস্বরের দীর্ঘোচ্চারণ শ্রুতিকে পীড়িত করিতেছে। এত অস্বাভাবিক চেষ্টাতেও কবি ছন্দঃপতন ও মাত্রাল্পতা নিবারণ করিতে পারেন নাই। ভাষারও প্রাঞ্জলতা নাই।

দেখা যাইতেছে—বাংলা ক্রিয়ায় ১ম অক্ষরের দীর্ঘস্বরের দীর্ঘোচ্চারণে তেমন অস্বাভাবিক লাগে না—মাঝে ও শেষে হইলেই বিপরীত হয়। যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাংলায় সচরাচর চলে অর্থাৎ 'তৎসম' শ্রেণীর—সেগুলির মধ্যে যাহাতে একাধিক দীর্ঘস্বর থাকে—তাহাতে একটি দীর্ঘ স্বরেব উচ্চারণই কতকটা স্বভাবানুগ হয়—বাকীগুলিকে দীর্ঘ করিতে হইলে কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 'কাহিনী' 'স্বাধীন' ইত্যাদি শব্দের একটি করিয়া দীর্ঘস্বরকে দীর্ঘ উচ্চারণে ধরা হইয়াছে।

দুই অক্ষরের ২টী দীর্ঘস্বরযুক্ত সংস্কৃত শব্দের ২টী দীর্ঘ উচ্চারণ অস্বাভাবিক শোনায় না। উপরের কবিতায় ঐরূপ বহু দ্ব্যক্ষর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এক অক্ষরের দীর্ঘস্বরযুক্ত শব্দ যাহা সংস্কৃতে চলে তাহার দীর্ঘ উচ্চারণ ভালই শোনায় যেমন,—রে—হে। বাংলা শব্দের মধ্যে 'গো' ও 'মা' ছাড়া অন্যগুলি কর্ণপীড়ক। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ এইগুলি লক্ষ্য করিয়া আলোচ্যমান ছন্দে শব্দ চয়ন করিয়াছেন।

এ ছন্দের একটি বিশেষত্ব পংক্তিতে পংক্তিতে মিল। কিন্তু উপরের কবিতাটিতে যে মিলের চেষ্টা হইয়াছে—তাহা প্রকৃত পক্ষে মিল নহে—মিলের অনুকল্প মাত্র। প্রত্যেক পংক্তির শেষে 'ও' আছে—কিন্তু একই শব্দ বা একই পৃথগবস্থিত অক্ষরকে পংক্তি শেষে বসাইলেই মিল হয় না। একই শব্দ বা ঐরূপ একটি অক্ষরকে প্রতি পংক্তি শেষে বসাইলে ছন্দের মাধুর্য্য বাড়ে কিন্তু তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র মিল চাই। পার্শী কবিতার মিল প্রায় সবই এই প্রকার—হিন্দী ও বর্ত্তমান বাংলা কবিতায় এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর মিলের উদাহরণ যথেষ্ট। যে শব্দটি বার বার পংক্তি শেষে পুনরাবৃত্ত হয় তাহাকে আরবী পার্শীতে বলে, 'রদিফ', আর তাহার পূর্ব্বের সম্পূর্ণাঙ্গ মিলকে বলে, 'কাফিয়া'। উপরের কবিতায়—'ও' শব্দটি হইল 'রদিফ'—আর

'যমুনে'—'ভূষি' ইত্যাদি হইল 'কাফিয়া'। এই কাফিয়াগুলির দুটী দুটীতে মিল থাকা উচিত ছিল।

উপরি উপরি—'কাফিয়ার' একাধিক মিলের উদাহরণ হিন্দী হইতে দেওয়া যায়—

৮+৮+৮+৮ যে ব্রজচন্দ্র চ- | লো কিন বা ব্রজ | লুক বসন্ত কী | উকন লাগী।
ত্যোং পদমাকর | পেখো পলাসন | পাবক সী মনো | ফূঁকন লাগী॥
বৈ ব্রজনারী বি- | চারী বধূ বন- | বাবরী লোং হিয়ে | হূকন লাগী।
কারী কুরূপ | কসাঈন পৈ সু | কুহু কুহু কৈলিয়া | কূকন লাগী॥

৪ অক্ষরের ২টী শব্দের রদিফ রাখিয়াও একাধিক কাফিয়ার মিলের উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন—

(১) নৈন নহীং কি | ঘনাঘন কে ঘন | ঘাবন সো কছু | তেল নহীং ফির।
প্রীতি পয়োনিধি | মেং ধঁসিকৈ হঁসি | কৈ কঢ়িবো হঁসী | খেল নহীং ফির॥

'কাফিয়া' ও 'রদিফ' দুইএরই মিল থাকিতে পারে।

(২) তোরি তনী টক | টৌরি কপোলনি | জোরি রহে কর | ত্যোং ন রহোংগী
পান খবাঈ সু- | ধাধর পান কৈ | পাঈ গহে তস | হোং ন গহোংগী।

ঠিক এই ছন্দে বর্ত্তমান বাংলায় উদাহরণ মনে পড়িতেছে না—তবে অন্যান্য ছন্দে যথেষ্টই আছে। স্থূলকর্ণ পাঠকেরা ইহাকে মিলের দোষ মনে করেন কিন্তু কবিরা জানেন ইহা উচ্চ শ্রেণীর মিল।

'যমুনালহরী' কবিতায় মিলের এই চাতুর্য্য ও মাধুর্য্যের অভাব আছে।

যমুনালহরীর পর বর্দ্ধিতমাত্র জয়দেবীতে বহুদিন পর্য্যন্ত কেবল সংস্কৃতাত্মক ভাষায় স্তবস্তুতি রচিত হইয়াছিল—তাহার উদাহরণ আগেকার পর্ব্বে দিয়াছি। হেমচন্দ্রের লেখনীতে এ ছন্দের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে এ ছন্দের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার অন্তরার সহিত এ ছন্দের পংক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—

২—৮+৮+৮+৬

অয়ি—সুনির্ম্মলা সুখ | সমুজ্জ্বলা শুভ | সুবর্ণ আসনে | অচঞ্চলা।
পূর্ণ সিতাংশু বি | ভাস বিকাশিনী | নন্দন-লক্ষ্মী | সুমঙ্গলা॥

২য় পর্ব্বে মাত্রা কম অর্থাৎ প্রাকৃত দোহার অনুরূপ পংক্তিও পাওয়া যায়—

৮+৫+৮+৩ মুখে নাহি নিঃসরে | ভাষ......দহে | অন্তরে নির্ব্বাক | বহ্নি,
ওষ্ঠে কি নিষ্ঠুর | হাস......তব | মর্ম্মে যে ক্রন্দন | তন্বি॥

হসন্তবহুল হ্রস্ব পংক্তির উদাহরণ :—

৮+৮+০+৩ দুঃখের বরষায় | চক্ষের জল যেই | নাম্‌ল।
বক্ষের দরজায় | বন্ধুর রথ সেই | থাম্‌ল॥

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নানা মাত্রার ধ্রুবপদ ও অন্তরা সংযোগে আলোচ্যমান ছন্দে কত প্রকারের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সমস্ত মাত্রা গুলিকে লঘুস্বরান্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে সকল পংক্তি রচনা করিয়াছেন তাহা চুলিকার গীত্যার্য্যার অনুরূপ।

* ৮+৮+৭+৬

রতিকর মলয় ম- | রুতি শুচি শশভৃতি | হৃতহিম মহসি * | মধু সময়ে।

অথবা

৭+৮+৮+৬

জনয়তি মনসি * | শশিমুখি মুদমতি- | শয়মিহ মম মধু- | রয় মধুনা।

(চুলিকা, গীত্যার্য্যা)

কোন' কোন' পর্ব্বে ১ মাত্রা কমে কিছু আসে যায় না।

বসে বসে দিবারাতি | বিজনে সে কথা গাঁথি | কত যে পূরবী রাগে | কত ললিতে,
সে কথা লইয়া খেলি | হৃদয়ে বাহিরে মেলি | মনে মনে গাহি কার | মন ছলিতে।

(রবীন্দ্রনাথ)

যুক্তাক্ষর থাকিলেই সংস্কৃতের মতো বাংলাতেও দীর্ঘ মাত্রা হইত। এই দুইপংক্তিতে একেবারেই যুক্তাক্ষর—এমন কি ঔকার ঐকারও নাই। সমস্তগুলিই লঘু মাত্রা। 'হৃদয় যমুনা' নামক কবিতায় যুক্তাক্ষরময় শব্দ আছে এবং সে শব্দগুলির দীর্ঘ মাত্রাকে কবি এক একটি লঘুমাত্রা ধরিয়াছেন—কাজেই উহা এছন্দের মর্য্যাদা লাভ করে নাই—দীর্ঘায়ত ত্রিপদী বা চৌপদীর রূপ ধরিয়াছে—যে যে পংক্তিতে যুক্তাক্ষর নাই সে সে পংক্তি চুলিকার অনুরূপই হইয়াছে—যেমন

তলতল ছলছল | কাঁপিছে গভীর জল | অই দুটি সুকোমল | চরণ ঘিরে।

আবার—

আজি বর্ষা গাঢ়তম | নিবিড় কুন্তল সম | মেঘ নামিয়াছে মম | দুইটী তীরে।

ইত্যাদি পংক্তিতে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ না মানায় চুলিকার অনুরূপ হইতে পায় নাই।

একেবারে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন করিয়া আগাগোড়া সমস্ত লঘু মাত্রায় রচিত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে তাহার নাম 'ঘুমচোরা' (শিশু) যাহা গীত্যার্য্যার চুলিকা রূপের সম্পূর্ণ অনুরূপ—কেবল শেষ পর্ব্বে ২।৩টি মাত্রা কম আছে।

তখন রোদের বেলা | সবাই ছেড়েছে খেলা | ওপারে নীরব চখা | চখীরা
শালিখ থেমেছে ঝোপে | শুধু পায়রার খোপে | বকাবকি করে সখা | সখীরা।
তখন রাখাল ছেলে | পাঁচনী ধূলায় ফেলে | ঘুমিয়ে পড়েছে বট | তলাতে
বাঁশ বাগানের ছায়ে | একমনে এক পায়ে | খাড়া হয়ে আছে বক | জলাতে।

রবীন্দ্রনাথের "অনাদৃত" "সোনার তরী" ইত্যাদি কবিতায় বিশুদ্ধ চুলিকা পংক্তি, হ্রস্ব পংক্তির সহিত মিশ্রভাবে আছে। আগেকার লেখা গানেও অনেক উদাহরণ মিলে।

আজি মধু সমীরণে | নিশীথে কুসুম বনে | তাহারে পড়েছে মনে | বকুল তলে।
সেদিনও ত মধু নিশি | প্রাণে গিয়েছিল মিশি | মুকুলিত দশ দিশি | কুসুম দলে।
ছুটী সোহাগের বাণী | যদি হতো কানাকানি | যদি ঐ মালাখানি | পরা'তে গলে।
মধুরাতি পূর্ণিমার | ফিরে আসে বার বার | সেজন ফেরে না আর | যে গেছে চলে।
ছিল তিথি অনুকূল | শুধু নিমেষের ভুল | চিরদিন তৃষাকুল | পরাণ জ্বলে।

এই পংক্তিগুলির মধ্যে এক 'পূর্ণিমার' ছাড়া অন্য কোন শব্দে যুক্তাক্ষর নাই। এটিকে উপেক্ষা করিলে ইহা বাংলায় জয়দেবীর চুলিকারূপের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর একটি উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ হইতে দিই—

কাছে তার যাই যদি | কত যেন পায় নিধি | তবু হরষের হাসি | ফুটে ফুটে ফুটে না
কখন' বা মৃদু হেসে | আদর করিতে এসে | সহসা সরমে বাধে | মন উঠে উঠে না।
রোষের ছলনা করি | দূরে যাই, যাই ফিরি | চরণ বারণ করে | উঠে উঠে উঠে না।
কাতর নিঃশ্বাস ফেলি | আকুল নয়ন মেলি | চাহি থাকি, লাজ বাঁধ | তবু টুটে টুটে না।
যখন ঘুমায়ে থাকি | মুখপানে মেলি আঁখি | চাহি থাকি দেখি দেখি | সাধ যেন মিটে না।
সহসা উঠিলে জাগি | তখন কিসের লাগি | সরমেতে মরে গিয়ে | কথা যেন জুটে না,
লাজময়ী তোর চেয়ে | দেখিনি লাজুক মেয়ে | প্রেম বরিষার স্রোতে | লাজ তবু টুটে না।

শেষ পর্ব্বে ৭ মাত্রা আছে। 'নিশ্বাস' ছাড়া কোন শব্দে যুক্তাক্ষর নাই—তাহাকে অনায়াসে উপেক্ষা করা যায়। আগেকার উদাহরণটিতে ১৩ মাত্রার হ্রস্ব পংক্তির মিশ্রণ আছে। ইহা একেবারে অবিমিশ্র।

হেমচন্দ্রের—

ছিন্ন তুষারের প্রায় | বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায় | তাপদগ্ধ জীবনের | ঝঞ্ঝাবায়ু প্রহারে,
পড়ে থাকে দূরাগত | জীর্ণ অভিলাষ যত | ছিন্ন পতাকার মত | ভগ্নদুর্গ প্রাকারে।

এই পংক্তি আর রবীন্দ্রনাথের "চুলিকা" এক জিনিস নয়। হেমচন্দ্রের রচনা যুক্তাক্ষর-সঙ্কুল। কবি যুক্তাক্ষরের জন্য দুই মাত্রাও ধরেন নাই। অক্ষর-গণনায় সমান হইলেও ছন্দঃস্পন্দে যথেষ্ট তফাৎ আছে। হেমচন্দ্রের কবিতার ছন্দকে চৌপদী বলা যাইতে পারে।

দীর্ঘায়ত ত্রিপদী ও চুলিকায় তফাৎ, শুধু ত্রিপদীতে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরকে লঘু ধরার জন্য অথবা অক্ষর গণনায় মাত্রানিষ্পত্তির জন্য নহে—মৌলিক প্রভেদ রহিয়াছে ছন্দঃস্পন্দে। দীর্ঘায়ত ত্রিপদীর তুলনায় এ-ছন্দে ছন্দোহিল্লোল ত্বরিত—যুক্তাক্ষরগুলি দুই মাত্রা দান করিয়া গতিকে সাহায্য করেনা—একমাত্রায় অটল হইয়া গতিকে ব্যাহত করে। যুক্তাক্ষরগুলি পার হইতে দেরী লাগে। দীর্ঘায়ত ত্রিপদীতে পদের পথ দীর্ঘ, সেজন্য গতি মন্থর—এছন্দে পথ হ্রস্ব

সেজন্য গতি দ্রুত। বাংলায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ স্বাভাবিক নয় বটে—কিন্তু যুক্তাক্ষরের দুই মাত্রাকে অস্বীকার করা যায়না—উচ্চারণ প্রলক্ষে দুই মাত্রাকে খুব জোর ১½ মাত্রায় পরিণত করা যায়—তাহাতেও অষ্টাক্ষরী পর্ব্বের পথ দীর্ঘই থাকিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের—'পত্রে'—

যারা আছে কাছাকাছি | তাহাদের নিয়ে আছি | শুধু ভালবেসে বাঁচি | বাঁচি যতকাল,
আশ কভু নাহি মেটে | ভূতের বেগার খেটে | কাগজে আঁচড় কেটে | সকাল বিকাল।

আলোচ্যমান ছন্দের স্পন্দেই পড়া যায়।

কিছু নাহি করি দাওয়া | ছাতে ব'সে খাই হাওয়া | যতটুকু প'ড়ে পাওয়া | ততটুকু ভাল,
যারা মোরে ভালবাসে | ঘুরে ফিরে কাছে আসে | হাসিখুসি আসে পাশে | নয়নের আলো।

এই দুই পংক্তির ১মটি-ও ঐ স্পন্দিত তালেই চলে—শেষাক্ষরে গিয়া চমক ভাঙিয়া যায়। কারণ আলোচ্যমান ছন্দে আগাগোড়া লঘু মাত্রা থাকিলেও শেষে দীর্ঘমাত্রার বিশেষ প্রয়োজন 'যতকাল্ ও বিকাল্'—এই শব্দ দুটীর শেষে হসন্ত 'ল' এর জন্য—যে দীর্ঘমাত্রা পাইতেছি—'আলো ও ভালতে' তাহা পাইতেছি না। আলো ও ভালো শব্দদ্বয়ের 'আ' ও 'ভা'কে দীর্ঘ করিয়া পড়িলে ছন্দের ওজন ঠিক থাকে কিন্তু ৭ মাত্রা হয়—অথচ ১ম দুই পংক্তিতে ৬মাত্রা, তাহাতেও বাধিবে।

তারপর যখন আরম্ভ হইল—

পরের মুখের বুলি | ভরুক ভিক্ষার ঝুলি | নাই চাল নাই চুলী | ধূলির পর্ব্বতে,

অথবা—

বেড়ে যায় দীর্ঘছন্দ | লেখনী হয় না বন্ধ | বক্তৃতার নামগন্ধ | পেলে রক্ষে নেই।

তখন যুক্তাক্ষরগুলির একমাত্রা গণনা ও মন্থর গতিতে জানাইয়া দিল ছন্দটি গীত্যার্য্যা শ্রেণীর নহে,—ইহা দীর্ঘ চৌপদী। তখন আবার গোড়া হইতে ত্রিপদীর গতির শাসনে পুনরায় পাঠের প্রয়োজন হয়। (রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথম হইতেই দীর্ঘ ত্রিপদীর সুর ধরিয়াছেন—যেখান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি—সেইখানে কবিতার সুরু হইলে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ খাটিত।)।

জয়দেবীতে দীর্ঘহ্রস্বস্বরের উচ্চারণ-তারতম্যে যে ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি হয় লঘুস্বর-সর্ব্বস্ব চুলিকায় তাহা নাই—তবু চুলিকার একটা নিজস্ব ছন্দঃস্পন্দ আছে। সে ছন্দঃস্পন্দ আবার দীর্ঘায়ত ত্রিপদীতে বা চৌপদীতে নাই। দীর্ঘায়ত ত্রিপদীর যুক্তাক্ষরগুলিকে একমাত্রা না ধরিয়া দুই মাত্রা ধরিলে এবং ৮টি অক্ষরের বদলে ৮টি মাত্রায় পর্ব্ববিন্যাস করিলে ইহা কতকটা জয়দেবীর ছন্দঃস্পন্দ লাভ করে। দীর্ঘ স্বরেরও মাত্রামর্য্যাদা না মানিলে সে ছন্দোহিল্লোল সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথ 'শীতে ও বসন্তে' নামক কবিতায় শেষ পর্ব্বে ৯ মাত্রা বসাইয়া এবং পংক্তিগুলিকে যুক্তাক্ষরে শেষ করিয়া বর্দ্ধিতমাত্র চুলিকার একটি নূতন রূপ দিয়াছেন। ইহাতে ছন্দঃস্পন্দের একটু পার্থক্য ঘটিয়াছে—শেষের যুক্তাক্ষরটির শাসনে অথবা তাহার মর্য্যাদারক্ষার জন্য চতুর্থ পর্ব্বের গোড়া হইতেই ছন্দোবেগ ক্রমে মন্থর হইয়া আসিয়া যুক্তাক্ষরটির গায়ে উছলিয়া উঠিয়াছে—

৮+৮+৮+৯—

প্রথম শীতের মাসে | শিশির লাগিল ঘাসে | হুহু করে হাওয়া আসে | হিহি করে কাঁপে গাত্র।
আমি ভাবিলাম মনে | এবার মাতিব রণে | বৃথা কাজে অকারণে | কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে | গরমে বাদলে শীতে | কবিতা নাটকে গীতে | করিব না অনাসৃষ্টি—
লেখা হবে সারবান | অতিশয় ধারবান | খাড়া র'ব দ্বাররান | দশ দিকে রাখি দৃষ্টি।

কবিগুরু শেষ পর্য্যন্ত এই ছন্দোহিল্লোল রক্ষা করেন নাই। একমাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষর ক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়া ছন্দঃস্পন্দের অভিনবত্ব হরণ করিয়া চৌপদীতে পরিণত করিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালে ও বিজয়চন্দ্রে বর্দ্ধিতমাত্র জয়দেবীর যাহা দুই একটি উদাহরণ পাওয়া যায়—তাহাতে হ্রস্বদীর্ঘের উচ্চারণ বৈষম্য সম্যক রক্ষিত হইয়াছে—যথা

৮+৮+৮+৬

চির অভিরামা | তরুণী শ্যামা | সুহাসিনী পিক | কলস্বরা
তটিনী হার বি- | লম্বিত হৃদয়া | তুষার হীরক | মুকুট পরা।

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

৮+৮+৮+৮

শীতল পবনে | কানন গহনে | বিরত বিহগকুল | সুখময় নটনে
বিষণ্ণ অম্বর | জীর্ণ সরোবর | মুদিত কমলদল | অতি হিম পতনে।

(বিজয়চন্দ্র)

উপরের ৪ লাইনে 'পরা' ছাড়া একটি শব্দও খাঁটী বাংলা নাই—সবই সংস্কৃত শব্দ, অথচ বাংলায় সচরাচর প্রচলিত। সেজন্য পংক্তিগুলি বাংলা কবিতারই পংক্তি, সহজবোধ্য এবং দীর্ঘস্বরের উচ্চারণমর্য্যাদারক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিক শুনাইতেছেনা। এরূপ সতর্ক হইয়া শব্দচয়ন করিয়া দীর্ঘ কবিতা রচনা দুরূহ। কবিরা সে চেষ্টাও করেন নাই—দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতের অল্প পরিসরের মধ্যেই ছন্দের চাতুর্য্য দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, বিজয়চন্দ্র উদাহরণমাত্র দিয়াছেন।

রজনীকান্ত সর্ব্বত্র দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন নাই—

৮+৮+৮+৮

কেরে হৃদয়ে জাগে | শান্ত শীতল রাগে | মোহ তিমির নাশে | প্রেম মলয় বয়,
সে মাধুরী অনুপম | কান্ত মধুর কম' | মুগ্ধ মানসে মম | নাশে পাপ তাপ ভয়।

উপরের পংক্তি দুটীতে যুক্তাক্ষর ছাড়া 'কে' 'মো' 'প্রে' এই তিনটি মাত্র অক্ষরের দীর্ঘস্বরের দীর্ঘোচ্চারণ-মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে, অন্যগুলি উপেক্ষিত হইয়াছে। মাত্র ঐ তিনটি স্বরের ও যুক্তাক্ষরের দীর্ঘোচ্চারণের জন্য ছন্দঃস্পন্দে উহা জয়দেবীর কাছাকাছি হইয়াছে। পংক্তি দুটী দ্বিজেন্দ্রলাল বা বিজয়চন্দ্রের পংক্তিগুলির মত সংস্কৃতাত্মক নহে, একেবারে খাঁটী বাংলা—ইহাতে এর বেশী দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ গুরুতা স্বাভাবিক ও শোভন হইবে না ভাবিয়াই, বোধ হয় কবি কেবল ছন্দঃস্পন্দ লাভের জন্য মাত্র তিনটী দীর্ঘস্বরের দীর্ঘত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরের সাহায্যে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি করিয়াছেন।

৮+৮+৮+৮

কুন্তল দল মল | চুম্বে চরণতল | মধুকর চঞ্চল | ঝঙ্কারে পায় পায়
হুঙ্কারে ঘনঘন | কম্পিত ত্রিভুবন | শঙ্কিত দেবগণ | শঙ্কর লোটে তায়
লাসা সমুল্লাসে | চন্দ্র সূর্য্য খসে | কক্ষ ভ্রষ্টাকাশে | গ্রহতারা নিভে যায়।
কে ও রণ-রঙ্গিণী | প্রেমতরঙ্গিণী | নাচিছে উলঙ্গিনী | আসব আবেশে হায়।

কবিবর ভুজঙ্গধর বর্দ্ধিতমাত্র জয়দেবীতে দীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছেন। অধিকাংশ দীর্ঘ-স্বরের উচ্চারণ দীর্ঘতা রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাহাতে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের পদাবলীর মত ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্ট হইয়াছে। খাঁটী বাংলায় উহা অস্বাভাবিক শুনাইবে, সংস্কৃতাত্মক ভাষাও প্রসাদ-গুণবর্জ্জিত হইবে এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় কবি মৈথিলী বা ব্রজবুলীতে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছেন। মৈথিলী ভাষা দীর্ঘস্বরের গুরুউচ্চারণে অভ্যস্ত।

৮+৮+৮+৭

ইতি উতি চাওয়ি | ভুজযুগ বাঢ়য়ি | বোলত 'হের মঝু | আওল নাহ
জলধর ঝামর | তমাল তরুবর | চুম্বই বান্ধই | পয়োধর মাহ।

৮+৮+৮+৮

পরশি কঠিন তরু | চেতন ফিরইতে | ভূতলে লুঠতহি | বিগলিতলজ্জা,
তুঁহার বিলম্বনে | ভুজঙ্গধর ভনে | মরত কি জীয়ত | বাসকসজ্জা।

তিন অক্ষরের শব্দে দুইটি দীর্ঘস্বর থাকিলে একটিকে উচ্চারণ মর্য্যাদা দিয়াছেন—যেমন—

ঘন পরিরম্ভণে | রস পরিপূরণে | দামিনী-যৌবন | করত অধীর।

খাঁটী বাংলায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘোচ্চারণ যখন স্বাভাবিক নহে—তখন কেবলমাত্র যুক্তাক্ষরের জন্য দুইমাত্রা ধরিলেও এই ছন্দ রচনা চলিতে পারে—জয়দেবীর ছন্দঃস্পন্দ সম্পূর্ণ পাওয়া না গেলেও দীর্ঘায়ত ত্রিপদীর তুলনায় উহা যথেষ্ট হিল্লোলিত। এ জন্য ঘনঘন যুক্তাক্ষর দেওয়ারও প্রয়োজন নাই। প্রথম পংক্তিতে ২।৪টী যুক্তাক্ষর থাকিলেই ছন্দহিল্লোল আরম্ভ হইয়া যাইবে—তারপর সকল পংক্তিতে যুক্তাক্ষর না থাকিলেও আরব্ধ নৃত্য-হিল্লোল আর থামিবে না—যুক্তাক্ষরকে দুইমাত্রায় না ধরিলেই আঘাত পাইবে এবং ছন্দঃপতন হইবে। এই প্রথায় এ ছন্দে খাঁটী বাংলাতেই দীর্ঘ কবিতা রচনা সম্ভব হইতে পারে—

৮+৮+৮+৭

সিত মর্ম্মরে খচি | বিরাট দেউল রচি | আর্ত্ত ভিখারী তরে | মেলি দান সত্র,
খুলিয়া ধরমশালা | সার ক'রে ঝোলা মালা | ভক্তগণের নামে | লিখি দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী | গুরু সন্ধান লাগি | ঘুরে ঘুরে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে | সারা ব্রজ কুঞ্জ,
এলেন কৃষ্ণদাস | যথায় করেন বাস ; | ভারে ভারে চলে সাথে | উপহার-পুঞ্জ।

ইত্যাদি—ইত্যাদি—

এইভাবে মস্ত একটি কাহিনী রচনা চলিতে পারে—দীর্ঘস্বর বর্জ্জনের বা শব্দচয়নের জন্য কোন ক্লেশ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। তবে জয়দেবীর হিল্লোল মাধুর্য্য—ইহাতে প্রত্যাশা করা চলেনা। উপরে ২৮ মাত্রার উপর ৩ মাত্রা বেশী অর্থাৎ ৩১ মাত্রার পংক্তির উদাহরণ দেওয়া হইল। ১মাত্রা কম অর্থাৎ ২৭মাত্রার পংক্তিতে রচিত দীর্ঘ কবিতাও বর্ত্তমান বাংলা কাব্যে পাওয়া যায়।

৮+৭+৮+৪

এলো হিমঋতু লয়ে | গিরি শিরে সিতিমা * | পাণ্ডুতা লয়ে বনে | লোধ্রে,
পক্ক শালির শীষে | লয়ে নব পীতিমা * | পিঙ্গল করি হেম | রৌদ্রে।
প্রান্তর শোভে মোতি | মরকত বিত্তে * | বাপী আর শোভেনাক | পদ্মে,
আশা-শতদল ফুটে | কৃষীবল চিত্তে * | এলো রমা হিমবতী | ছদ্মে।
মক্ষীরা জুটে আজি | তালীবন-কলসে * | পক্ষীরা জুটে শালি- | ক্ষেত্রে,
দিগ্বধূদের দিঘি | পীতরূপে ঝলসে * | অঞ্জন আঁকে তাই | নেত্রে॥

২য় পর্ব্বে একমাত্রা কম থাকায় প্রচলিত জয়দেবীতেও ঈষৎ বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে—গতি চঞ্চল দ্রুত ও স্পন্দমান। পংক্তিতে পংক্তিতে ২য় পর্ব্বান্তে মিল আছে। নূতন ছন্দের মত শুনাইলেও ইহা ২৭মাত্রার জয়দেবী। শেষ পর্ব্বে একমাত্রা কম এরূপ ২৭ মাত্রার জয়দেবীরও উদাহরণ পাওয়া যায়—

৮+৮+৮+৪

শুনি হরি-গুণগান | নারদের বীণা-তান | কোন্ ভাণ্ডীর বনে | উলসি
ভক্তের প্রাঙ্গণে | এলে তুমি শুভখনে | পূত পুলকাঞ্চনে | তুলসি!
যথা নাই অহরহ | অর্চ্চনা সমারোহ | রাশি রাশি ভোগোর | বিপণি,
নাহি ঢাক ঢোলে ঘটা | নাহি ধূপ দীপ ছটা | বলি সোম হোমে সন্- | দীপনী।
সেথা তুমি আছ সতি—

ইত্যাদি। ১ম দুই পর্ব্বে মিল ছন্দোহিল্লোল বাড়াইয়া দিয়াছে। জয়দেবীর উপর ২ মাত্রা বাড়াইয়া ৩০ মাত্রাতেও বাংলায় এ ছন্দ চলে—তবে শেষ মাত্রাটিতে হসন্ত না থাকিলে তালভঙ্গ ও স্পন্দোরোধ হইয়া যাইবে। এই হসন্ত, শেষের দীর্ঘস্বরের অনুকল্প। দীর্ঘস্বর থাকিলে এবং তাহাকে উচ্চারণ মর্য্যাদা দিলে আর হসন্তের প্রয়োজন নাই।

৮+৮+৮+৬

নব অঞ্জন তার | অঙ্কিলে আঁখি পাতে | চিনিল সে স্বর্গীয় | ভোগ্য বিশাল,
চিনিল সে তুষ্টিরে | কান্তি ও পুষ্টিরে | নব জীবনের যাহা | যোগ্য রসাল।
শস্তে ভরিলে তার | মরুময় কান্তার | পুষ্পে ভরিলে তার | কুঞ্জ-বিপিন,
সুতরা করিলে নদী | দিলে ফল ঔষধি, | হবিতে ভরিলে ধেনু | দুগ্ধ-আপীন।

এক মাত্রা বাড়াইলে অর্থাৎ ২৯ মাত্রায় পংক্তি রচনা করিলে শেষ পর্ব্বের শেষ মাত্রাটিতে হসন্ত না থাকে সে দিকে সতর্ক হইতে হইবে। যুক্তাক্ষর থাকিলে হিল্লোল উচ্ছলিত হয়—অযুক্তাক্ষর থাকিলে হিল্লোল নব হিল্লোলকে পরপংক্তিতে জাগাইয়া নিজে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

৮+৮+৮+৫

যুগে যুগে পুঞ্জিত | জীব বলি-শোণিমায় | রঞ্জিত বেদনায় | পরিফুল্ল,
বঙ্গের অঙ্গনে | গঙ্গার তীর বনে | রুদ্রের রোষ রাগ | সমতুল্য।
যজ্ঞদেবের পায় | শঙ্কিত সমিধের | করুণ নয়নে যেন | প্রাণ-ভিক্ষা,
অশ্বমেধের হোতা | বিশ্ববিজয়ী শূর | নৃপতির শিরে যেন | রণ-দীক্ষা।

শেষে যুক্তাক্ষর না থাকিলে—

৮+৮+৮+৫

তীর্থঙ্কররঞ্জিন | পদরেণু করিল না | ও বুকে সুরভি রেণু | সৃষ্টি, জবা!
রজো-রাগ হরিল না | হেরে গেল প্রেম-সুধা | বুদ্ধদেবের প্রেম- | দৃষ্টি-ভবা।
নিমায়ের আঁখি জল | নিষ্ঠুর বুকে তপ | সৃজিতে নারিল মধু | গন্ধে প্রীতি,
বৃথা গেল গুঞ্জরি | ভক্তের মাধুকরী | কবিদের প্রেমরস | ছন্দোগীতি।

ঊনমাত্রিক হ্রস্ব পংক্তিরও উদাহরণ দেওয়া যায়,—

৮+৮+৬ বরিষা বাজায় বেণু | বাজে তায় বনে বনে | মেঘমল্লার,
কামিনী কুটজ ফুটে | উটজাঙ্গনে, হ্রদে | ফুটে কহ্লার।

৮+৮+৫ কি দিব উপমা তব | তুমি কি নীরদাবৃত | শশীর কলা?
বিদারিতে বিরহীর | হৃদি খানি, কোষে ঢাকা | অসির ফলা?
তুমি কিগো শবরীর | কবরী যেথায় শোভে | নব মালিকা?
তুমি কিগো পুষ্পিত | কস্তুরী হরিণীর | নাভি-কলিকা? (কেতকী)

সত্যেন্দ্রনাথ দীর্ঘস্বরের উচ্চারণ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। যথা—

৮+৮+৮+৬ আজি নিরন্ন | দেশ বিপন্ন | ক্লেশনিমগ্ন | লক্ষ হিয়া,
নিষ্ঠুর মৃত্যুর | নীরব ছায়া | ছাইল অম্বর | পক্ষ দিয়া।
আজি ভিখারী | বালক নারী | প্রাণ ধরে শিশু | অশ্রু পিয়া,
কে দিবি অন্ন | কে হবি ধন্য | পুণ্য পথে ফি | রিছে পুছিয়া।

(৫টী পর্ব্বে এক মাত্রা করিয়া কম আছে)

কিন্তু ঠিক এ প্রথায় তিনি কোন' কবিতা রচনা করেন নাই। তিনি সংস্কৃতাত্মক ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না— চল্‌তি ভাষারই কবি ছিলেন। চল্‌তি ভাষায় এই ছন্দকে চালাইবার জন্য তিনি দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণ-দীর্ঘতা ত্যাগ করেন—যুক্তাক্ষরকেও বেশী প্রশ্রয় দেন নাই—চল্‌তি ভাষায় যুক্তাক্ষরের বাহুল্যও নাই, হসন্ত অক্ষরই খুব বেশী। হসন্ত-বহুল শব্দে গঠিত পংক্তিতে জয়দেবীর ছন্দঃস্পন্দ ঠিক পাওয়া গেল না, কিন্তু হসন্ত ও স্বরান্ত অক্ষরের সমবায়ে এক প্রকার দ্রুত চঞ্চল ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি হইল উহা চল্‌তি ভাষার পক্ষে বেশ উপযোগী। সত্যেন্দ্রনাথের এ ছন্দের হিল্লোল সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এখন কতকগুলি বর্দ্ধিতমাত্র পংক্তির উদাহরণ দিই।

৮+৮+৮+৭

পদে পদে বাড়ে শুধু | হৃদয়ের লঙ্ঘন | ময়দানে কাঁদে কচি | গোপনের পয়দা,
শহরের বিষ ঢোকে | পল্লীর ঘর ঘর | লালসার লোল শিখা | বাড়ে রে বে-ফয়দা।

৮+৭+৮+৭

তোমারে নিধান করে | তিন বোন নিয়তি | রচে নিতি দুনিয়ার | ভাগ্যের সূত্র,
অধনের ধন তুমি | চির যুগে ধন্য | অনাথার স্বামী তুমি | অবীরার পুত্র।

৮+৮+৮+৬

প্রাণে প্রাণে হিল্লোল | বনে বনে হিন্দোল | মেঘে মৃদঙের বোল | মৃদু মন্থর,
শ্রাবণেরি ছন্দে | কদমেরি গন্ধে | আয় তুই চঞ্চল | চির সুন্দর।
আরো কাছে আয় তুই | কালো চোখে চোখ থুই | ভুলে থাকি দিন দুই | দুনিয়ার সব,
শুধু হাসি আর গান | শুধু সারঙের তান | ভালবাসাময় প্রাণ | শুধু উৎসব।

৮+৮+৮+৫

আমি দেখি তন্ময় | চেয়ে চেয়ে মনময় | শত তারা থাক হেসে | নাথ ইন্দু
যদিও এ বাদলায় | ঝিঁ ঝিঁ ডাকা কাজলায় | নেই চাঁদ জোছনার | নেই বিন্দু।

কবি যতীন্দ্রমোহনের হাতেও এই ছন্দ সত্যেন্দ্রনাথের মতই হিল্লোলিত হইয়াছে—

৮+৮+৮+৬

তারা | সভ্যতা শিক্ষার | নাহি জানে ধিক্কার | শিক্ষার নাহি ধার | ধারে কোন' দিন,
শুধু | চাষ করে জাল বোনে | খায় দায় আনমনে | সাগরের ডাক শোনে | স্বভাব স্বাধীন।
সে যে | শক্তির ভাণ্ডারী | সাহসের গাণ্ডার-ই | তুফানের কাণ্ডারী | জোড়া নেই তার,
ভারি | সাঁতারের সর্দ্দার | পাথারে খবরদার | নৌকাই ঘরদ্বার | এমনি ব্যাপার।

কবির আবদারে এ ছন্দকে এই ভাবে একটি দীর্ঘ কাহিনী শুনাইতে হইয়াছে। বর্ত্তমান কবিগণের অনেকেই এ ছন্দ অনুসরণ করিতেছেন।

কিরণধন, বেতালভট্ট ও হেমেন্দ্রকুমারের রচনা হইতে ২।৪ লাইন উদ্ধৃত করিয়া দেখাই।

৮+৮+৮+৫

বেমালুম বুক ঠুকে | মিছে কথা কয় রুখে | জবাবটি মুখে মুখে | গাঁথা তৈরী,
অবুঝ সে নিঠুর | নেই বোধ কিচ্ছুর | ঘুমের সে দস্তুর- | মত বৈরী।
এ রকম দস্যিকে | সামলাবো কোন্‌দিকে | লুটে নিলে মনটিকে | জোরসে এসে,
তবু সেই মনচোরে | ভালবাসি অন্তরে | জানিনে কি মন্তরে | ভোলালো যে সে।

৭+৭+৮+৭

(কিরণধন)

ঠাকুরের রান্না | কর্ত্তা যে খান্‌না | বুড়ো হ'লে বায়নার | থাকে না কো অন্ত,
জ্বলে যায় পিত্তি | শুনে শুনে নিত্যি | রকমারি ফরমাস | তবু নেই দন্ত।

(ঐ)

৮+৮+৮+৭

ন্যাড়া মাথা পাকা দাড়ী | কারে ধরি কারে ছাড়ি | মাপিয়া দেখিব কার | জটা কত লম্ব ?
হাঁচিতে, তুলিতে হাই | কিবা জপি ভাবি তাই | জয় রাধে বলিব কি | জয় জগদম্ব।।
গুরু চাই গুরু চাই | চাই বড় গুরু ভাই | ডেপুটী দেওয়ান জজ | বড় বড় চাক্‌রে',
ছেলেদের চাকরীর | কিছুই হয়নি স্থির | যোগাড় করিতে হবে | তাহাদের পাক্‌ড়ে'।

(বেতালভট্ট)

চল্‌তি ভাষার মজলিসে এসে জয়দেবীকে রীতিমত রসিকতায় যোগ দিতে হইয়াছে। আবার রুদ্রতালে উদ্দাম নৃত্যে বর্ষাবরণ করিতেও হইয়াছে।—

৮+৮+৮+৭

ডম্বরু পাখোয়াজে | অম্বরে ধ্বনি বাজে | কজ্জল তুলি দিয়ে | মেঘে আঁকে চিত্র,
চঞ্চল আসে আজি | বিদ্রোহী হয়ে সাজি | বজ্রকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে | মেঘ করে ছিদ্র।
উৎসবে ধরা ভরে | সূর্য্যকে কাণা করে | অগ্নিতে মুহুমুহু | রচে শত সর্প,
উচ্ছলি ঝরণাতে | উচ্ছ্বাসে সুখে মাতে | উল্লাসে ভেঙে দিল | নিদাঘেরি দর্প।

(হেমেন্দ্রকুমার)

৭।৬।৫ মাত্রার পর্ব্বে গঠিত ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে, জয়দেবী ও বর্দ্ধিতমাত্র জয়দেবী পংক্তির সহিত যত ভিন্নভিন্নসংখ্যক মাত্রায় গঠিত হ্রস্বতর পংক্তির মিলন আজ পর্য্যন্ত সম্ভব হইয়াছে, তাহার বিবরণ ইতিবৃত্ত ও উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করিব।

শ্রীকালিদাস রায়

তরীর মায়া

১

মাঝিরে দাওগো বিদায়
দাওগো বিদায় সোনার তরী
ধীরে ওই সন্ধ্যা আসে
অদূরে ওই বিভাবরী।
ত্যজিতে হবেই আহা
আজি এ ঘাটের মায়া
বটের এ নিবিড় ছায়ার
আপন করা আদর মরি।

২

মনে যে পড়ছে আজি
সেই প্রভাতে প্রথম বাওয়া,
যখন এ তরুণ বুকে
লাগলো প্রথম নদীর হাওয়া।
আহা কি উজল দিবা
নীলিমা গভীর কিবা
দুধারে শ্যামল পারের
আকুল করা কি মাধুরী।

৩

আনন্দ নিতুই নূতন
আগিয়ে যাওয়ার আবেশ প্রাণে
ভরা এ মুক্ত আকাশ
মুক্ত বাতাস আলোয় গানে।
অকূলের বাঁশীর সাড়া
করিত আপন হারা,
কূলেতে টানত ধরা
শানাই সুরে আদর করি।

৪

সুদূরের পারের ঘাটের
হঠাৎ পেলাম ডাকের সাড়া,
ডুবন্ত সাঁজের রবির
কনক করে সেই ইসারা।
আবার হায় কোন্ প্রভাতে,
মিলিব তোমার সাথে
আজি এ লতার বাঁধন
শিথিল হয়ে পড়ল ঝরি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গান

ফুল্লমুখে তুলে সুখের তান,
গেয়ে যাই ব্যথায় গড়া সুধায় ভরা জীবন-জয়ের গান।
ভাঙ্গা রথের চূড়ায় চূড়ায় রক্তে রাঙ্গা নিশান উড়াই,
বাজাই ভেরী, লাজা ছড়াই, যুদ্ধ অবসান।
সীমার তীরে ঐ যে তোরণ, পুরীর দুয়ার—নয়রে মরণ;
আপনি এসে করবে বরণ প্রাণের রাজা প্রাণ।
গেয়ে যাই জীবন-জয়ের গান।

মায়া-মৃগ

গোড়ার ব্যাপারটা মনে আছে, ও বর্ত্তমান অবস্থাটা চক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু মধ্যের কিছুই জানি না।

বড় রাস্তাটার মোড়ে পা' দিয়াছি, একটা বিশালকায় মোটরগাড়ী যেন হাঁ করিয়া গিলিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাণের ভয়,—পাশের ফুটপাতের দিকে ছুটিলাম। কিন্তু অতদূর পৌঁছিতে হইল না। কি করিয়া কি ঘটিল, সব মনে নাই,—কিন্তু এটুকু বেশ স্মরণ হয়, চকিতে একটা বস্ত কোলাহল ভাসিয়া আসিল, এবং সেটা কি, ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই আর দুটো চাকা একেবারে গা'য়ের উপর আসিয়া পড়িল। একটা আঘাত,—সেটা যেমনই প্রচণ্ড, তেমনই অভাবনীয়। ঠিক সে কোথায় লাগিল বুঝিলাম না, কিন্তু ইহার সুতীব্র বেদনা প্রতি শিরা-উপ-শিরার রক্তপ্রবাহের মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একমুহূর্ত্তে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আঘাতের যন্ত্রণা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল, ইন্দ্রিয় পার হইয়া ক্রমে অনুভূতির বাহিরে চলিয়া গেল। মস্তিষ্কের সূক্ষ্মতম কেন্দ্রমুখ হইতে এক বিচিত্র আর্ত্তনাদ শতধা' হইয়া ফাটিয়া পড়িল।

সবই এক মুহূর্ত্তে। তারপর দৃষ্টির সম্মুখে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার নামিয়া আসিল, এবং তাহাতে সমস্ত ডুবিয়া গেল।

দেখিলাম হাসপাতালে পড়িয়া আছি। সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা;—মাথা, পা,—কোথাও বাকী নাই। কখনই বা আসিলাম, এবং কিই বা ঘটিল, কিছুই বুঝিলাম না।

তবে শুনিলাম, একটা মোটর-অ্যাক্সিডেণ্ট্। দোষ নাকি আমারই।

একটানা আর ভাল লাগে না। ডাক্তারদের ক্ষত-অক্ষত সব কিছু লইয়া টানাটানি, চারিপাশে রোগীদের অস্ফুট-আর্ত্ত কোলাহল, এবং দর্শক ও অদর্শকের অকরুণ যাতায়াত—কোনটারই শেষ নাই। সব চেয়ে খারাপ লাগে নার্শদের নিষ্কাম সেবা। ইহাদের প্রাণটা যেমনই নিষ্ক্রিয়, মুখের ভাবটা ঠিক্ তেমনই নিঃস্পৃহ। কিন্তু অনেক দিন থাকিতে হইবে।

এর চেয়ে বরং কেরাণীগিরি বেশ ছিল;—যেন কলের পুতুল,—সাড়ে দশটায় চেয়ারে বসা, পাঁচটা পর্য্যন্ত একান্ত আত্মবিস্মৃতি, আবার পাঁচটার পর ক্ষীণ জীবন-স্রোত। বেশ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু পথে আসিতে কতবার ভাবিয়াছি, হঠাৎ যদি এমনি একটা চকচকে মোটরের তলায় পড়িয়া যাই, ভিতর হইতে করুণা-ক্লান্ত স্বরে কেহ বলিয়া উঠে, আহা,—তারপর তেমনই একটি

শুভ্র-সুন্দর হস্তের নিঃসঙ্কোচ সেবা-স্পর্শ, এবং কয়েকদিনের একটুখানি আলাপ,—তাহা হইলে বোধ হয় কেরাণী-জীবনে একটা প্রকাণ্ড রোমান্স হয়!

কিন্তু এ যে হাসপাতাল!

একদিন পুলিশ আসিল। রিপোর্ট লইবে। যাহা বলিবার বলিলাম, এবং যাহা না বলিবার, তাহাও বলিলাম। অর্থাৎ একটু বেশী করিয়া দোষ চাপাইলাম।

কিছুই হইল না। দোষ আমারই। আমি অন্ধের মত কোনদিকে না চাহিয়া ছুটিয়াছিলাম। মিঃ দত্ত খুব ভাল ড্রাইভ্ করেন, নচেৎ—

তবে তাই। আমার জীবন-বাঁচানর জন্য মিঃ দত্তর নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

একটু ভাল হইয়াছি। সুতরাং নার্শদের অত্যাচার হইতেও একটু বাঁচিয়াছি। ডাক্তারও অত নজর দেন না।

এই একটানার মধ্যেও কোথায় যেন একটু টান ধরিয়াছে। নিশীথের নীরবতার অন্তরে রোগীর অকস্মাৎ কাতরোক্তি,—মন্দ লাগে না। মনে হয় বিশ্বের অশ্রান্ত ক্রন্দনের একটা ভাঙ্গা সুর। সকলে শুনিতে পায় না।

একটা নার্শ আসিয়া মধ্যে মধ্যে গল্প করে। এ'কে সহ্য হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় নূতন আসিয়াছে, তাই যেন একটু ছন্দ-ছাড়া।

ভাবে আমি কৃপার পাত্র। ভাবুক,—কা'র কি?

একদিন বলিল, মিঃ দত্ত খুব সদাশয় লোক,—এমন প্রায়ই দেখা যায় না। কতদিন আসিয়া খোঁজ লইয়া গিয়াছেন। এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্য্যন্ত কাল আসিয়া খোঁজ-খবর লইয়াছেন।

তাঁর স্ত্রী?

হাঁ, মিসেস্ দত্ত। বেশ লোক।

ভাবিলাম, এ'ও ভাল। রোমান্স ত'! নয়ই বা কিসে? লোককে চাপা দিয়া, আইনের হাত এড়াইয়া, বদান্যদৃষ্টি দিয়া দূর হইতে খোঁজ লওয়া,—এ'ও কি কম কথা!

নার্শটি আসিয়া বলিল, আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন, মিসেস্ দত্ত এসে আপনাকে দেখে শুনে গেলেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আপনাকে ডাক্‌তে চাইলাম, কিন্তু তিনি নিষেধ কর্‌লেন।

কেরাণী-জীবনে এ'র চেয়ে বেশী কি থাকিতে পারে ?

মহিলাটিকে কোথায় যেন দেখিয়াছি। কাছে আসিলে হয়'ত চিনিতে পারিতাম। নার্শটিও কাল হইতে কোথায় গিয়াছে। থাকিলে খোঁজ লইতাম।

কিন্তু মুখটা যেন ছেলেবেলায় কোথায় দেখিয়াছি।

পরদিনও তিনি আসিলেন। বোধ হয় কোন আত্মীয় বা পরিচিত এখানে আছে, দেখিতে আসিয়াছেন।

বুড়ী নার্শটার সহিত কথা কহিতে কহিতে একেবারে আমার খাটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল,—কিন্তু সাহস হইল না।

বুড়িটার জন্যই কিছু হইল না। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পর্য্যন্ত পারিলাম না।

কিন্তু ফুল-বসানো সাদা সাড়ীটা দেখিয়াছি। বেশ মানায়।

ভদ্র মহিলাটি তিনদিন ধরিয়া রোজই আসিতেছেন। আলাপ হইয়াছে। বুড়ীটাই আলাপ করাইয়া দিয়াছে।

আমার সব কথাই তিনি জানিলেন। আমি কিছুই জানিলাম না। জানিতে ভয় করে,—সামান্য মানুষ !

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কেউ আত্মীয় এখানে আছেন বুঝি ?

বলিলেন হ্যাঁ,—ঠিক আত্মীয় নয়, একজন পরিচিত বন্ধু। আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু যতই দেখি মনে হয় যেন চেনা মুখ।

সাহস বাড়িয়া যায়। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি ব'লে মনে হয়।

তাঁর মুখটা যেন কেমন হইয়া গেল। শুধু বলিলেন, হবে'।

অত্যন্ত অপদস্থ হইলাম। কথাটা হয় ভদ্রোচিত নয়, নয় ভাল করিয়া বলিতে পারি নাই। কিন্তু ক্ষমা চাওয়াটা কি ভাল হইবে ? চুপ করিয়া রহিলাম।

আরও কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আর যে এ-দিকে আসিবেন না, নিশ্চয়ই। আর চার দিন মাত্র মেয়াদ। নার্শটার ছুটি ফুরাইয়াছে, কাল আসিবে। চার্‌টে দিন বৈ ত' নয়,—কাটিয়া যাইবে।

মানুষ কত ভুলই ভাবে। মহিলাটি ঠিকই আসিলেন। বরং একটু আগেই।

বসিয়াই বলিলেন, আমায় চেনেন ব'লেছিলেন না।

সেই কথারই পুনরুত্থানে কুণ্ঠিত হইয়া বলিলাম, হয় ত' ভুল হ'য়েছিল। যাক্,—আপনার আত্মীয়টি কেমন আছেন ?

ভাল। আচ্ছা, ভাল ক'রে ভেবে দেখুন ত', আমায় মনে করতে পারেন কি না!

স্মৃতির অতল গর্ভের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তাহার উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ আলোকে চক্ষু, মন, বুদ্ধি,—সব আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বলিয়া উঠিলাম, কমলা না ?

আজ আর কোন ভুল হইল না। জীবনের সহস্র ভুল-ভ্রান্তি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, স্মৃতি-বিস্মৃতির সকল তরঙ্গ নিষ্কম্প হইয়া পড়িল, কালের সর্ব্বব্যাপী ব্যবধান নিঃশেষে মুছিয়া গেল,—জগৎ ভুলিলাম, নিজেকে ভুলিলাম, ভূত-ভবিষ্যৎ সব ভুলিলাম,—চেতনার কেন্দ্রীভূত দৃষ্টিতে শুধু এইটুকুই দেখিতে লাগিলাম,—আমার সম্মুখে কমলা বসিয়া আছে। ইহা আজ-কাল কি অনন্ত-কাল, তাহাও মনে রহিল না।

কত লোকের সহিত কত কথা কহিয়াছি, কিন্তু কথা কহিবার ও শুনিবার ঠিক্ এমনিধারা একটি দিন জীবনে একটিবারও আসে নাই,—বোধ হয় আসিবেও না।

কথার প্রতি অক্ষরটি হয় ত' মনে থাকিবে না, কিন্তু ইহার পুঞ্জীভূত মাধুর্য্য চিরকালের জন্য অন্তরে সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। দিন কাটিবে, মাস কাটিবে, বৎসর কাটিবে, জীবনের আয়ু কাটিবে,—তখনও ঠিক্ এই সম্পদটিই হাতে করিয়া পরপারের ভেলায় চড়িয়া বসিব। চেতনার এই শেষ কিনারায় আসিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিব, ভগবান, একটি দিনের জন্যও তুমি যে করুণা অজস্রস্রোতে আমার উপর বর্ষণ করিয়াছিলে, সেজন্য তোমায় প্রণাম করি,—তাহা হইতেই আমি যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি, দৈন্যের আর কোন স্থান নাই।

'তুমি' ব'লেই ডাক্‌বো ? আচ্ছা, বেশ।

মুখে বলিলাম বটে, কিন্তু মনে ভয় হইতে লাগিল। কোথায় আমি কেরাণী,—হাসপাতালের অতিথি,—আর কমলা রাজ-রাণী। কমলার স্বামীর নাম এবং ধামটা জানিয়া লইলে হয় না ? থাক্—কি হইবে জানিয়া ?

কমলা বলিল, আপনার আর কোন আত্মীয় এখানে নেই, সত্যি ?

ইচ্ছা হইল বলি, আর কে থাকিবে ? তুমি আছ, আমি আছি, মধ্যে অনন্ত অপার রহস্য আছে—এখানে আর কা'র স্থান থাকিতে পারে ?

কিন্তু যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কাজে করা যায় না।

কমলা বলিল, বিয়ে করেন নি ?

বলিলাম, না।

কমলা একটু বিস্মিত হইল, বলিল, কেন ?

কুণ্ঠিতভাবে বলিলাম, কেরাণী মানুষ,—অল্প আয়—

সাহস আরও বাড়িয়া গেল।

বলিলাম, মনে আছে, কমলা, সেই চিঠির কথা ? কিন্তু তার আগে তুমিই আমাকে লিখেছিলে। নয় ?

কমলা বলিল, কি লিখেছিলাম ?

কমলার মুখ ঠিক লাল সাড়ীটার মতনই টকটকে।

কিন্তু সাদা সাড়ীটা আরও ভাল মানাইত।

বলিলাম, কি লিখেছিলে ? আচ্ছা দাঁড়াও, মনে ক'রে দেখছি। ও-কথা থাকবে ?—আচ্ছা থাক্।

কথা সেই পথেই ফিরিল।

বলিলাম, মনে আছে, তুমি আমার হাত দুটো ধ'রে ব'লেছিলে, আমরা আজীবন বন্ধু থাক্‌বো ? হ্যাঁ, তোমার মনে আছে বৈকি ! বন্ধু ছাড়া আর কে এখানে আসবে ? কিন্তু আমার কিচ্ছু মনে নেই।

কি মনে নেই ?

বলিলাম, কিছুই না। তোমারও কথা মনে ছিল না। কি ক'রে থাকবে বল ? সাহেবের কথা খুব মনে থাকে। ভাল কথা,—তোমার একটা বই আমার কাছে আছে।

কমলা বলিল, কি বই ?

একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, ঠিক বই নয়, তোমার গল্পের খাতাটা। সেই যখন কলেজে পড়তাম—তুমি লিখ্‌তে, আমিও লিখ্‌তাম। তারপর তুমি হঠাৎ কোথায় চ'লে গেলে,—তার কিছুদিন পরে বাবা মারা গেলেন,—আর দেখা-শুনো নেই কিনা !

আর দু'দিন মাত্র।

মাথাটা, কি পেটটা আর একটু ফাটিয়া যায়, ত' বেশ হয়। মিঃ দত্তর গাড়ীখানা আর একবার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়না কি ?

নার্শটি আসিয়া বলিল, মিসেস্ দত্ত সম্বন্ধে আপনার ধারণা বদলেছে, আশা করি ?

শুধু বলিলাম, হ্যাঁ বদলেছে।

একটু হাসিয়া নার্শ বলিল, সে জানি। এরকম খোঁজ-খবর কে নেয় বলুন ত ? কত লোক চাপা পড়ে, কিন্তু চাপা দিয়ে এতটা কাউকে অনুতপ্ত হ'তে দেখি নি। সত্যি—

ভাল !

হঠাৎ কি মনে হইল, বলিলাম, একটা কাজ করবেন ?

নার্শ বলিল, কি ?

বলিলাম, মিসেস্ দত্ত এবারে এলে বলবেন, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই। সুতরাং তাঁকে অনুতপ্ত হ'তে হবে না।

নার্শ বলিল, আপনিই না হয় বলবেন—

বাধা দিয়া বলিলাম, না না আমি বলতে চাই না। আমার সঙ্গে দেখা করার তাঁর কোন আবশ্যকতা নেই। বুঝলেন ?

নার্শ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, তার মানে,—আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান না ?

বলিলাম, না, মোটেই না। তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন, দোষ আমারই। অনুতাপেরও কারণ নেই, দেখা করারও আবশ্যকতা নেই। বলবেন, কেমন ?

আচ্ছা।

নার্শ আরও বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল।

আমার অঙ্গের আষ্টে-পৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মূর্ত্তিটা দেখিয়া মিসেস্ দত্ত বোধ হয় ভয় পাইতেন, তাই এতদিন অন্তরাল হইতেই কর্ত্তব্য সাধন করিতেছিলেন! আজ ভাল হইয়াছি, সুতরাং একটা মৌখিক দুঃখপ্রকাশ—কি দরকার ?

আর আমারও ত' কোন অভিযোগ নাই,—বরং ভালই হইয়াছে। এর চেয়ে আর কি ভাল হইবে ?

কমলা আসিল না

কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করিতে পারিলাম না, দেহ, মন, চিন্তা—সব একীভূত করিয়া ঠিক ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

অভিমান করিবার কোন অধিকার আমার নাই।

কিন্তু আমার হৃদ্‌পিণ্ডের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি পর্য্যন্ত পিষিয়া যাইতেছে, সে-কথা কে বুঝিবে ?

আমার অন্তর নিরন্তর আহত হইয়া বার বার বলিতে লাগিল, আর একটি মাত্র দিন বাকী আছে, এই একটি দিনের শেষ সঞ্চয় হইতে বঞ্চিত হইলে আর হয় ত' বাঁচিব না,—হয় ত' এইখানেই শেষবার একজনকে খুঁজিতে খুঁজিতে খোঁজার পালা শেষ করিব।

কখন নার্শ পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, টের পাই নাই।

বলিল, মিসেস্ দত্ত এসেছিলেন, আপনার কথা তাঁকে ব'লেছি। যাই বলুন, আপনি বড় নির্দ্দয়। শুনে তাঁর মুখটা' যা হল'—না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আর কথাটি না ব'লে তিনি চ'লে গেলেন।

চুপ্ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু নার্শ চুপ্ করিল না। বলিল, কাল তাঁর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করলেন, আজ তাঁর মুখ দেখতে চাইলেন না,—কারণ কি ?

সবিস্ময়ে বলিলাম, কাল তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রেছি ? কৈ—

কাল কেন, রোজই তিনি আপনার সঙ্গে গল্প ক'রে যান।

রোজই ?—সে ত'—

হ্যাঁ, তিনিই ত' মিসেস্ দত্ত। একি, উঠ্‌ছেন কেন ?—

বাঁচিয়া অন্ধকারে ডুবিতেছি, না জীবন নিবিয়া দৃষ্টি অন্ধকার করিয়া দিতেছে, বুঝিলাম না। বুকের ভিতরে যে তীব্র আলোড়ন সুরু হইয়াছে, তাহা মৃত্যুর রুদ্র নৃত্য, না জীবনের সঙ্গীত-ধ্বনি,—তাহাও বুঝিলাম না।

কমলার মধ্যে আমি ডুবিয়া যাইতেছি,—আমার স্বতন্ত্র সত্ত্বা বিলুপ্ত হইতেছে,—ইহা তাহারই হৃদয়ের স্পন্দন,—তাই কি ? না, অন্য কিছু ?—

হয় ত' তাই!

এইখানেই কোন একটা মোটরে বসিয়া কমলা কোথায় যাইতেছিল, ভাগ্যচক্রে সে-গতির পথে কি করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম। এই রকমই দু'টো চাকা'—কিন্তু আরোহী?

একটার পর একটা গাড়ী পার হইয়া যায়, কতলোক আসে, কতলোক যায়, কত ঘটনা ঘটিতে থাকে,—কেবল চাহিয়াই থাকি।

চাওয়ার আর বিরাম নাই।

সন্ধ্যার ম্লানিমা নামিয়া আসে, একটার পর একটা আলো জ্বলিয়া উঠে, দিনের উজ্জ্বলতা মুছিয়া যায়, রাত্রের তীব্রতা ছড়াইয়া পড়ে,—কয়েক পা' গিয়া একটু থামি। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা জাগিয়া উঠে, হয় ত' এইবার কমলার গাড়ী আসিবে।

দিনের কোলে দিন মিলাইয়া যায়।

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

তাজমহলের শিল্পী

হে অজ্ঞাত শিল্পিরাজ, তোমারে কে করেছে স্মরণ?
সম্রাট রহিল বাঁচি, তুমি দীন লভিলে মরণ
ভুলের তমসাতীরে নিস্তব্ধ শ্মশানে,—কোনখানে
চিহ্নমাত্র নাই! নাহি ভাবে কেহ, কভু নাহি জানে
বিস্মিত কল্পনা-ঘেরা এ তাজমহল, এ মহান্
স্বপ্নচ্ছবি কে রচিল,—কেবা তার করেছে সন্ধান?
সিংহাসনে মাল্যদান করে শুধু কীর্ত্তি স্বয়ম্বরা!
দিনে দিনে পলে পলে ধীরে নিপুণ কৌশলে গড়া
অচেতন শিলাস্তূপে যে আনিল অপূর্ব্ব পরাণ,
কাব্যগান নহে তার তরে;—তার নাম তার দান
ইতিহাস ভুলে যায় অতি যত্নভরে—চিরকাল।
রাজকার্য্য—শাসনের রীতিনীতি প্রকাণ্ড বিশাল,

জয়-পরাজয়-সন্ধি, বন্ধনের হর্ষ-আশা-ভীতি,
তার মাঝে প্রেয়সীর একখানি সুকরুণ স্মৃতি
সম্রাটেরে অকস্মাৎ করিত উন্মনা,—হয়ত বা
তাও করিত না! হারেমের সহস্র-সুন্দরী-সভা
শতধা ভাঙিয়া নিল তাঁরে। পূর্ণ রাজকোষ হ'তে
অর্থ শুধু নেমে আসে আদেশের খরচের স্রোতে;
অস্পষ্ট বিরহখানি মূর্ত্তি লয় মর্ম্মর-উচ্ছ্বাসে
বাদসাহী ইচ্ছা-দৃঢ় প্রস্তরের বিপুল বিলাসে।
হে কুশলি, শিল্পকবি, অস্ফুট প্রণয়-স্বপ্নখানি
তুমি সত্যে করিলে প্রকাশ আপনার প্রেম ছানি
পরিপূর্ণ অন্তরের চিরশুভ্র বস্তুর বিকাশে।
তব শিল্পে জন্ম নিল সাজাহান প্রেম-ইতিহাসে।

শুধু কি অর্থের লাগি,—উদরের অন্নমুষ্টি মাগি,
হে স্রষ্টা; করিলে এই অপূর্ব্ব সৃজন? নাহি জাগি
ছিল কি হে প্রাণে তব অরূপের চির-রূপকামী
অন্তর-ক্রন্দন? উদ্ভাসিয়া অতীতের অন্ধযামী
তুমি যে রচিলে চির আলোকের শিলালিপিখানি
কঠোর সংযমভরে—গূঢ়-সূক্ষ্ম রসশ্রম দানি।
সম্রাটের অশ্রু চেয়ে ঘর্ম্ম তব অমৃত-মধুর!
আপন আনন্দ-সুর দিলে ঢালি সৌন্দর্য্যে প্রচুর
প্রণয়ের বিরহ-বেদনে।
　　　　　　　　এ আনন্দ, নাহি জানি,
কার প্রেমে ভরা,—কার স্নিগ্ধ মুখপদ্মখানি
গভীর চুম্বন করি লভেছিলে পরিপূর্ণ প্রাণ
দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ উটজে? তাহারে করিলে দান
রাজদ্বারে শুল্কসম—সমাধির সারাগাত্র ভরি।
মাধুর্য্য-সৌরভ তার শ্বেতপর্ণে উঠিছে শিহরি!

কোন গ্রাম্য বালিকার শুচিস্নিগ্ধ শান্ত তনিমার
সম্বৃত অঞ্চলখানি লীলাভঙ্গে করিলে বিস্তার
মহাশিল্পে তব?—অভিনব রত্নকারুকার্য্য মাঝে
কাহার গভীর দৃষ্টি স্বভাবের চিরন্তন লাজে
আছে নত হ'য়ে? সংযত উদ্যত দৃঢ় বাসনার
বাহুর উন্নতি কার মর্ম্মর বক্ষের চারিধার

আকাশেরে করিছে মিনতি ? মিনারের আবরণে
নিটোল যৌবন কার প্রতীক্ষায় বহে সঙ্গোপনে
অসম্পূর্ণ মিলনের লাগি ?
ধ্যান-মগ্ন এই মায়া—
হে শিল্পি, তোমারই না সম্রাটের—কার স্বপ্নচ্ছায়া ?

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

স্বদেশ-সেবার নব্য-ন্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সাম্য বনাম ধর্ম্ম

তারপর আমাদের দেশে এবং অনেক দেশেই সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আন্দোলন চলছে এবং আছে। মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের চিন্তা হচ্ছে—"নীতি, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মের উপর সামাজিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। মানুষের নৈতিক উন্নতি হ'ক, সাম্য আপনা-আপনিই আসবে।" নব্য-ন্যায় সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি চিজ ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবনের উপর কতটা নির্ভর করে কিনা জানি না। হয়ত কিছু কিছু করে। কিন্তু নীতিকথা ধর্ম্মকথা একদম জলাঞ্জলি দিয়েও এই পৃথিবীতে সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি এনে হাজির করা অসম্ভব নয়।" একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পৃথিবীতে ধর্ম্ম জন্মেছে অনেক। মান্ধাতার আমলের গ্রীস রোমের ধর্ম্ম—যেটাকে খৃষ্টানরা ধর্ম্মই বলে না, তারপর ইয়োরোপের খৃষ্টান ধর্ম্ম। অপর দিকে মুসলমান ধর্ম্ম আর আমাদের দেশে হিন্দুধর্ম্ম। পাঁচসাতটা নামজাদা ধর্ম্ম রয়েছে। এতগুলি সভ্যতা পৃথিবীতে এসেছে, কিন্তু এতে যদি কেহ দেখাতে পারেন যে, ভ্রাতৃত্ব সাম্য কোনদিন কোন জায়গায় ছিল সামাজিক "বস্তু" হিসাবে, তা হ'লে বলব যে একটা সত্যিকার নতুন কথা শুনা হল। ধর্ম্ম কোথাও আভিজাত্য ভাঙ্‌তে পারেনি।

আসুন গ্রীসে, লম্বা চওড়া বোলচালওয়ালা গ্রীক সমাজের আসল ভিত্তি হচ্ছে কেনা গোলামের মেহনৎ আর মজুরে-অভিজাতে প্রভেদ। ওদের যে মস্ত মস্ত মুড়ো,—জেনোফোন আর প্লেটো—তারা আগাগোড়া বল্‌ছে "গোলামী হচ্ছে সমাজের ভিত হাত-পার আর ভদ্রলোক কাজে যায় না।" এই রকম জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত ক'রে গ্রীসের সমাজ চলেছে। রোম যখন খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নি, তখন কারখানায় ছুতারগিরি তাঁতিগিরি করলে জাত যেত, ইজ্জত যেত। বাদশা আউগুস্তস একজন সেনেটরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন, কেননা এই ব্যক্তি জাতির ইজ্জত নষ্ট

করে' একটা কারখানার মালিক হয়েছিল, কারখানায় নিজের হাতে কাজ করে নি,—মাত্র একটা কারখানা কায়েম করেছিল এই অপরাধ। গোলামী হাত-পার কাজের বিরুদ্ধে ঘৃণা জিনিষটা কতবড় নিবিড়। ষ্টোইকদের নাম শুনেছেন। ঋষি সন্ন্যাসী বল্‌তে যা বুঝা যায় তারা সেই ধরণের লোক। তাদের সাহিত্যে সাম্য ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদির বোলচাল আছে, যেমন আছে অশোকের অনুশাসনে। তারপর গির্জ্জার বাবারা, "চার্চ্চ-ফাদারেরা" আমাদের দেশের ঋষি সন্ন্যাসী ইত্যাদিরই জুড়িদার। তারা দুই হাজার বৎসর ধরে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম প্রচার করেছে। বলেছে, "গোলামী বাঞ্ছনীয় নয়, চাই ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য।" কিন্তু যে সময় এই গির্জ্জার ধর্ম্ম জাহির ছিল, সেই সময় ইয়োরোপে চলেছে রোমান আইন। আপনাদের অনেকেরই হয়ত রোমান আইন জানা আছে। তার ভিতটা হচ্ছে গোলামী আর চাষা-নির্য্যাতন, জমিদারের প্রভুত্ব ও ধনী-নির্দ্ধনের অনৈক্য। অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক-রোমান ধর্ম্ম ও মধ্যযুগের আধুনিক খৃষ্টান ধর্ম্ম এই দুই ধর্ম্মের কোনটাই সমাজে ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য আনতে পারে নি।

আসুন মুসলমান ধর্ম্মে। আমরা মনে করি ভ্রাতৃত্ব আর প্রেমে মুসলমান একেবারে গলাগলি, মুসলমানে মুসলমানে কোন তফাৎ নাই। কেন না মুসলমানের বয়ান হচ্ছে—কোরাণে লেখা আছে "যে-কোন মুসলমান আমার ভাই।" ভিতরকার কথা হচ্ছে, স্বতন্ত্র। কোনদিন দুটি মুসলমান সমাজ, দুটি মুসলমান রাষ্ট্র একত্রে তিন দিনের বেশী কাজ করতে পারে নি। মহম্মদের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত মুসলমান দুনিয়ায় দেখছি—অনৈক্য, অসাম্য, অ-ভ্রাতৃত্ব, মারামারি, কাটাকাটি। আর মুসলমান আইনে ত বড়লোক গরীবলোক ওমরাহ বাদসাহ ইত্যাদি সব ভেদই আছে,—যেমন আছে খৃষ্টান আইনে ও সমাজে। তা হলেই দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম্মের ডাকে সমাজ ভ্রাতৃত্ব কায়েম কর্‌তে পারে নি। খৃষ্টান-মুসলমানদের দৌড় এই। এখন আসুন, ভারতবর্ষে। আমাদের বিষ্ণুপুরাণে আছে—

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত সমত্ব মারাধনমচ্যুতস্য।

"সকলকে সমানভাবে দেখবি, এই সাম্য ভাবই হচ্ছে ভগবানের আরাধনা।" খৃষ্টান সমাজে সেন্টপল, রোমান সাম্রাজ্যের সেনেকা ও সিসেরো যা বলে এসেছেন, "গির্জ্জার বাবারা" যা বলে থাকেন, আমাদের হিন্দু "হিতোপদেশে"ও তাই আছে। অথচ মানব জীবনটা আর নরনারীর সমাজটা মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে আর দুনিয়ার সর্ব্বত্র প্রতিমুহূর্ত্ত আভিজাত্যের আর অভ্রাতৃত্বের লীলাভূমি হয়ে রয়েছে। কাজেই ধর্ম্মের সঙ্গে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে, ভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের যোগাযোগ আছে কিনা নব্য-ন্যায় সে সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয়বাদ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী।

নব্য-ন্যায় বলছে—"ভ্রাতৃত্ব আর সাম্য বস্তু হিসাবে সংসারে যদি কিছু থাকে তবে সে সব এসেছে প্রধানতঃ বা একমাত্র মজুর আন্দোলনের দৌলতে। যেদিন ইয়োরোপে প্রথম যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত ফ্যাক্টরী ও লোক-বহুল নগর প্রতিষ্ঠিত হল, সেই দিন তার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার

লম্বা লম্বা কুলীর বাথান কায়েম হল। সেদিন নতুন ধরণের এক গোলামী প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তার সঙ্গেই সঙ্গে আবার গোলামীর যে দাওয়াই, মনিবের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলা, আমি আমার জীবন শাসন করব—এই নীতিটাও প্রতিষ্ঠিত হল।" আজ মজুরেরা সংঘবদ্ধ হয়ে মনিবের সঙ্গে সমানে সমানে কারবার চালিয়ে বল্‌ছে "আমিও মানুষ, আমাকেও সেলাম ঠুকে চল।" আজ দুনিয়ায় এসেছে যথার্থ সাম্যের যুগ, যথার্থ ভ্রাতৃত্বের যুগ। যে সাম্য, যে ভ্রাতৃত্ব খৃষ্টান ধর্ম্ম পূর্ব্বে কখনও স্থাপন করে নি, কল্পনাও করে নি, গ্রীস কখনো চাখে নি, হিন্দু-মুসলমানের কায়দায় কখনও আসে নি, সেই ভ্রাতৃত্ব সেই সাম্য আজ এসেছে, বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলবে। এমনি করে এই ভারতেও সে-সব এসে হাজির হবে। যে শক্তির জোরে এই সাম্য আসছে সে শক্তিটা মামুলি ন্যায়শাস্ত্রের কল্পনায় আসে নি। সেই শক্তি হচ্ছে মজুরের সংঘশক্তি। অতএব যদি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য বাঞ্ছনীয় জিনিষ হয়, যেমন স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য জ্ঞান বাঞ্ছনীয় জিনিষ তাহলে তাকে ধর্ম্ম গীর্জ্জা বা নীতির ঘাড়ে ফেলে রাখবার প্রয়োজন নাই। যেমন স্বাধীনভাবে স্বাস্থ্যের আন্দোলন, স্বাস্থ্যের কার্য্য চাই, স্বাধীনভাবে সৌন্দর্য্যের আন্দোলন সৌন্দর্য্যের কার্য্য চাই, তেমনি স্বাধীনভাবে একনিষ্ঠ মজুর আন্দোলন চাই, মজুরসংঘ কায়েম করা আবশ্যক। আভিজাত্যের প্রবল দুস্‌মন হচ্ছে মজুর।

চাই মজুর নিষ্ঠা

একশ' বছরের মজুর-আন্দোলন দুনিয়ায় কিছু কিছু সাম্য এনেছে, ভ্রাতৃত্ব এনেছে, ডেমোক্রেসী এনেছে। কিন্তু আপনারা প্রশ্ন কর্‌ছেন, "তাতে মানুষের সুখ বেড়েছে কি?" বেড়েছে,—চরম বেড়েছে।

পৃথিবীতে যে সকল সুখ কখনো কোনদিন কেহ কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে নি, মানুষের শাস্ত্রে, মানুষের জ্ঞানে, মানুষের আধ্যাত্মিকতায় যে-সব আনন্দের নাম পর্য্যন্ত ছিল না তা আজ ১৯২৭ সনে এক সঙ্গে দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক ভোগ করছে। গ্রীস লাখ লাখ লোককে গোলাম করে রেখেছিল, ভারতে এবং ভারতের বাহিরে এক এক জন জমীদার এক এক জন রাজা লক্ষ লক্ষ নরনারীকে নির্য্যাতন করে' এক একটা পল্লী, সহর বা জেলার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করেছে। এক একটা অট্টালিকা খাড়া করেছে তার পাশে রয়েছে শত শত কুঁড়ে ঘর! কত লোক যে মহামারীতে মরেছে তার পাত্তা পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আজ একশ দেড়শ বৎসর ধরে শিল্প বিপ্লবের দৌলতে সুখের প্রতিদিন সজ্ঞানে সুখের সীমানা বাড়ানো হচ্ছে; আনন্দের চৌহদ্দি বাড়ানো হচ্ছে। সজ্ঞানে আলোক বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের সীমানা কমে কমে আস্‌ছে। মজুরের সংঘ-শক্তি দুনিয়াকে ধীরে ধীরে অমৃতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। সমাজব্যাপী এই অন্ধকার-নিবারণের সজ্ঞান চেষ্টা, অমৃত-সন্ধানের সজ্ঞান চেষ্টা বড় লোকেরা

করেনি। তাদের হাড়ে-মাসে সে চেষ্টা আসে নি। কখন কখন কোন শিক্ষিত লোকের মাথায় এসেছে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ সেই অমৃতের সন্ধান এসেছে অশিক্ষিত পদদলিত নির্য্যাতিত মজুর শ্রেণীর চেষ্টায়। এখনও যথেষ্ট গলদ রয়েছে। সাম্য-লড়াইয়ের ফৌজেরা কেহ কোন দিন ধারণা করে না যে দুনিয়া স্বর্গে উঠে গেছে অথবা এইখানেই স্বর্গের শেষ ধাপ। পৃথিবীর সভ্যতা ছুটে চলেছে। কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেহ জানে না। সুখ-বিজয়ের সিপাহীরা সর্ব্বদাই অন্ধকার খর্ব্ব করবার জন্য এখনও প্রস্তুত। মজুর-আন্দোলন বলছে "যখন যেখানে ধনী-নির্দ্ধনে কোনো প্রকার বিরোধ আর সামাজিক দুঃখ ও অবিচার দেখতে পাই তখন সেখানে সেই সমস্যা সমাধান করবার জন্যই আমার আবির্ভাব।" তাই নব্য-ন্যায়ের বাণী হচ্ছে এই যে, ধর্ম্ম থাক বা না থাক, সাম্য ভ্রাতৃত্বের জন্য দেশশুদ্ধ লোকের মঙ্গলের জন্য, সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, মজুর-নিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।

চরিত্রবত্তা বনাম স্বাধীনতা

নব্য-ন্যায়ের আর এক প্রয়োগ-ক্ষেত্র খুলে ধরছি। আমরা সব সময় বলে থাকি যে আমরা অনেক কিছু ভাল কাজ করতে পারতাম, আমাদের নরনারীরা চরিত্রে উন্নত হতে পারত দেশটা যদি স্বাধীন হত। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের আর ব্যক্তিত্বের নিবিড় যোগ একটা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ স্বীকার করা আমাদের রেওয়াজ। আমি বলতে চাইনা যে স্বাধীনতার সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের সম্বন্ধ নাই। সহজেই স্বীকার করা যেতে পারে যে স্বরাজ থাকলে, জাতিগত আত্ম-কর্ত্তৃত্ব থাকলে বড় বড় কাজ করা সহজ হয়, অনেক সদ্‌গুণেরও বিকাশ সম্ভবপর হয়। কাজেই স্বাধীনতার আন্দোলন চাইই চাই। কিন্তু দেখা গিয়েছে, যে চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি যা কিছু দুনিয়াতে ঘটে সবই একমাত্র গোলামির ফলে ঘটে না। তা যদি হত তাহলে বিলাতে, আমেরিকায়, জাপানে জুয়াচুরি থাকত না, জার্ম্মানি-ফ্রান্সের লোক বাটপাড়ি করত না, আমেরিকার যুবক টাকা আত্মসাৎ করত না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা গোলাম হয়ে যে সব কুকর্ম্ম করছি ওরা স্বাধীন হয়েও তাই করছে। চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি বদমায়েসির যতগুলি তথ্যতালিকা আছে তাতে ইংরেজ ফরাসী জার্ম্মান কেহ আমাদের চাইতে ছোট নয়। "ক্রিমিনলজি"তে, অপরাধবিজ্ঞানে হাতেখড়ি হবা মাত্রই যে-কোনো লোক এইরূপ রায় দিতে সমর্থ। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে কোনো লোকের ব্যক্তিত্বে একমাত্র খুঁটা বিবেচনা করা নব্য-ন্যায়ের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

উল্টো দিকে বলছি—পরাধীনতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে ২।৪।১০।২০ জন এমন লোক আছে, এমন চরিত্রবান নরনারী আছে যার সমকক্ষ ফ্রান্স ইংলণ্ড জার্ম্মানি আমেরিকা জাপান ইত্যাদি ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ারে হয়ত নাই। আগে বলেছি দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও যুবক বাংলা

২০।২২ বৎসরে যা করেছে তার কিম্মৎ খুব বেশী। অতটা কাজ জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী যুবারা কখনো করেছে কিনা সন্দেহ। এখন ঠিক সেই রকম বলছি যে, পরাধীন থাকা সত্ত্বেও ভারতে অনেক লোক আছে, যুবক বাংলায় অনেক লোক আছে যারা এমন কিছু কাজ করেছে যা বিভিন্ন স্বাধীন দেশের যুবারা নিজ প্রয়াসে করতে পারে নি। তাদেরকে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করছে, আমরা গভর্ণমেণ্টের কোনো সাহায্য পাই নি। না পাওয়া সত্ত্বেও বিশ বাইশ বৎসরের ভিতর বাঙ্গালী আর অন্যান্য ভারতবাসী অনেক কিছু খাড়া করেছে। তা যদি হয়ে থাকে তাহলে কেমন করে বলব যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই জাতীয় উন্নতির, ব্যক্তিত্বের ও চরিত্রবত্তার একমাত্র কারণ ?

মনে রাখবেন, পরাধীনতা বাঞ্ছনীয়, এমন কিছু আমি বল্‌ছি না। আমার বক্তব্য অতি সহজ সরল। যতই আর্থিক উন্নতির আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন চালাই না কেন, এখনও বহুকাল আমরা দরিদ্র থাকতে বাধ্য, ১৯২৭ সনের পরেও অনেকদিন আমরা পরাধীন থাকতে বাধ্য। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এই অবস্থায়ও মানুষের মতন, বাপকা বেটার মতন নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করতে রাজি আছি কিনা। পরাধীনতা আজ কাল বা পরশু যাবে না, স্বরাজ সাত মাসে আসবে না, পাঁচ সাত বৎসরের ভিতর আমরা প্রত্যেকে মস্ত মস্ত পয়সাওয়ালা লোক হব না। তবু আমার তোমার কর্ত্তব্য কিছু আছে কিনা, মানুষের মতন বেঁচে থাকাও চাই কিনা তাই আমার ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান সমস্যা। আমি বলছি ২০।২২ বৎসর ধরে' যুবক বাংলা, দারিদ্র্য পরাধীনতা পদদলিত করে' নিজ জীবনের প্রতিষ্ঠা করে চলছে। আজ আবার মোরীয়া ভাবে একাগ্রতার সঙ্গে এই চিন্তাই করতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না থাকা সত্ত্বেও যুবক বাংলাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে ১৯০৫ থেকে ১৯২৭ সনের সকল প্রকার কর্ম্মরাশিকে ডুবিয়ে দিতে পারা যায়। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন কি ভাবে চালাতে হবে তার আলোচনা আলাদা। অধিকন্তু চিন্তাপ্রণালীর কথা মাত্র বলছি, কর্ম্মপ্রণালীর কথা কিছু বলছি না।

অদ্বৈতবাদের মুগুর

আপনারা বলতে পারেন,—তুমি ধন-বিজ্ঞানেরও তোয়াক্কা রাখ না, ধর্ম্ম-তত্ত্বকেও কলা দেখাচ্ছ, আর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ধার ত তুমি ধারই না। তাহ'লে তোমার ন্যায়শাস্ত্রের ভিত কোথায়, বাবা ?" আমি এই সকল শাস্ত্রকে কলা দেখাচ্ছি এরূপ বলা ঠিক নয়। আসল কথা, আমার নব্য-ন্যায় কোনো এক গর্ত্তে গিয়ে ধরা দিতে চায় না। কোন এক মিঞার দাড়ির ভিতর অথবা টিকির আগায় গোটা দুনিয়াটাকে আমি দেখতে অভ্যস্ত নই। কোন একটা শক্তিকে মানব জীবনের দেবতা বিবেচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার তর্কশাস্ত্র অদ্বৈতবাদের মুগুর। এক সঙ্গে এক হাজার শক্তির উপাসনা হচ্ছে আমার স্বধর্ম্ম। আমি একেশ্বরবাদী একেবারে নই। কোন

এক ব্যক্তিকে ঋষি মহর্ষি পীর ইত্যাদি ঠাওরানো আমার হাড় মাসে কুলাবে না। অদ্বৈতবাদ আমার চিন্তায় চরম মারাত্মক বিষ বিশেষ। এক সঙ্গে হাজার ঋষির, হাজার দেবতার, হাজার ধর্ম্মের, হাজার বিজ্ঞানের উপাসক আমি। সোজা কথায় বলে দিচ্ছি আমার ঋষি কারা।

ডন-কছরত কর্‌বার সময় ভাবছ ভাঙ্‌বে বাড়ী-ঘর গাছ-পাহাড়,
অমনি তোমায় ভাবি রামের গুরু বিশ্বামিত্রের অবতার।
কোদ্‌লিয়ে একবার বীজ ছড়িয়ে কড়া মাটিকে কর্‌লে উর্ব্বর,
তখনি তুমি বিন্ধ্যগিরির মুগুর, বীর অগস্ত্য মুনিবর।
কুয়া খুঁড়ে খাল কেটে জল ডেকে আনলে যেই মরুমাঠে,
তপস্বী সগরের বাচ্চা তুমি তৎক্ষণাৎ লোকের বাজার হাটে।
গানে বক্তৃতায় বা কথার জোরে সাহস আশা বাড়ালে আমার,
অগ্নিহোতা মধুচ্ছন্দার আগুন-মূর্ত্তি দেখি তোমার।
হরদম তুমি হঠাচ্ছ দুস্‌মন আর চাখ্‌ছ মুক্তি স্বাধীনতা,
তোমার কুড়ালে শির দিচ্ছে হাজার আঁধার দুর্ব্বলতা।
মাথার জোরে হাতের জোরে অমৃতস্য পুত্রাঃ সব মানুষ,—
ব্রহ্মচারী, অকথ্য মাতাল, বিলাসী, গৃহস্থ, স্ত্রীপুরুষ।
হৃদয় তোমার পাগল করে যে আর তাতিয়ে তোলে তোমার মাথা,
ঋষি-ভগবান তারে না বললে কেউ লাগিয়ে দিও পাঁচ জুতা।

সূত্রটায় নৃতত্ত্ব বা অ্যান্থ্রপলজি গুলে রাখা হয়েছে মনে হবে। কিন্তু নব্য-ন্যায়ের একটা বড় আধ্যাত্মিক বনিয়াদ এইখানে।

চাই অনৈক্যের রাষ্ট্রনীতি

অবশেষে নব্য-ন্যায়ের রাষ্ট্রনীতি যৎকিঞ্চিৎ চর্চ্চা করা যাক্। আপনারা জানেন ভারতে বুলি চল্‌ছে মাত্র এক। "চাই ঐক্য, চাই ঐক্য;—চাই ঐক্য, রাষ্ট্রীয় ঐক্য আর হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য।" ১৮৮৬ সনে কংগ্রেস হল, ৪১ বৎসর ধরে কংগ্রেস চল্‌ছে। হামেসা আমরা তোতা পাখীর মত আওড়াচ্ছি গোটা ভারতকে এক কর্‌তে হবে আর ভারতের হিন্দু মুসলমানকে এক কর্‌তে হবে। নব্য-ন্যায়ের রাষ্ট্রনীতি কিছু কুচুটে রকমের। প্রথমতঃ এ বল্‌ছে, "ভারতের ঐক্য হয়ত চাই না, গোটা ভারতের ঐক্য সাধিত না হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে কি না সন্দেহ।" দ্বিতীয়তঃ বল্‌ছে "হিন্দু মুসলমানের ঐক্য হয়ত চাই না। ঐক্য ঘটে ঘটুক, না ঘটে বয়ে গেল।" তৃতীয়তঃ বল্‌ছে "হিন্দুতে হিন্দুতেও ঐক্য হয়ত চাই না। অনৈক্যে ক্ষতি বেশী কি লাভ বেশী খতিয়ে দেখা আবশ্যক।" এক কথায় নব্য-ন্যায় অনৈক্যবাদী। যদি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আর সমাজের

আভ্যন্তরিক ডেমোক্রেসী বা স্বরাজ এই দুই বস্তু ভারতসন্তানের আকাঙ্ক্ষিত চিজ হয় তা হলে অনৈক্যে লাভ ছাড়া হয়ত লোকসান নাই।

আপনি অ্যাসেম্বলি-কাউন্সিলের মেম্বর হবেন, মিউনিসিপ্যালিটির ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কর্ত্তা হবেন, কর্পোরেশনের কেহ হবেন। ভাল কথা, চাচ্ছেন আমার ভোট। ভোট দিতে আমি অরাজি নই। কিন্তু ভোট দিব কেন? এ পর্য্যন্ত দিয়েছি ইস্‌মাইলকে অথবা রাম পোদ্দারকে। সে নিজেকে বড় করছে, সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেকে, ভাগ্নেকে, মাস্‌তুতো ভায়ের খুড়তুতো ভাইকে বড় করছে। ব্যস্‌। তাতে আমার কোনো আপত্তি নাই,—দেশের কতকগুলা লোক নামজাদা হয়েছে, পয়সা করেছে। তাতে সুখী আছি। সুখের কথা তাদের নাম যশ গাড়ী ঘোড়া হল, খবরের কাগজে তাদের লেখা বেরুচ্ছে, যখন যেখানে যায় খবরের কাগজে বেরোয়। আমার ভোটে তাদেরকে আমি বড় ক'রে দিয়েছি। বেশ। আজ কিন্তু যদু মল্লিক বা আবদুল গনি এসে বল্‌ছে "ভাই আমাকে ভোট দে। এবার দাঁড়াচ্ছি আমি।" ভেবে চিন্তে দেখ্‌ছি কেন ভোট দেব? রাম পোদ্দার বা ইস্‌মাইলকে ভোট দিয়েছিলাম। দেশকে সে বড় করেছে কিনা জানি না। তবে সে তার চাচাকে মাস্‌তুতো ভাইকে পেয়াদাগিরি দারোগা-গিরি চাকরী দিয়েছে। কেউ রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি হয়েছে। আজ আবদুল গনি আর যদু মল্লিকও তাই করতে চাচ্ছে। তাই বা মন্দ কি? এদেরকেই বা কেন ভোট দেব না? কেন তাদেরকে আমার ভোট দিয়ে দেশের ভিতর নামজাদা করে তুল্‌ব না? কোনো সম্প্রদায়ের লোক যদি বিবেচনা করে যে তাদের ভাইয়েরা, পাড়ার লোকেরা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ভোগ কর্‌তে পার্‌ছে না, তাহলে অন্য লোক যারা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ভোগ করছে তাদের বিরুদ্ধে এই লোকগুলা যদি ক্ষেপে উঠে তাতে দুঃখ কিসের? রামা শ্যামা আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ভোগ করে' যদি উন্নত হয়ে যায় তাহলে হরিহর পোদ্দার, অমুক চন্দ্র অমুক ইত্যাদি যাদের কোন দিন কোন জায়গায় নাম শোনা যায় নি তাদেরকে সুযোগ সুবিধা হ'তে বঞ্চিত রাখ্‌ব কেন? তারা নামজাদা হলে দেশের ক্ষতি হবে কে বল্‌ল?

বাংলাদেশে আজ আমি এক সঙ্গে পাঁচ হাজার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকেন্দ্র দেখতে চাই, পাঁচ হাজার দল, পাঁচ হাজার কাগজ, পাঁচহাজার আত্ম-কর্ত্তৃত্বশীল নরনারী, পাঁচহাজার পরস্পর টক্করশীল প্রতিষ্ঠান দেখতে চাই। নব্য-ন্যায় চায় ব্যক্তিমাত্রের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিত্ব,—কাজেই লক্ষ লক্ষ দলাদলি আর সঙ্ঘ-গঠন। নতুন কোনো জাত, ব্যক্তি, কাগজ বা দল খাড়া হলে পুরোণো কোনো কোনো জাত, ব্যক্তি, কাগজ বা দলের কিছু কিছু ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু পুরোণো জাত, ব্যক্তি, কাগজ আর দলগুলাকে সর্ব্বদা বিনা বাক্যব্যয়ে বড় থাক্‌তে দেওয়া বা মাথায় করে রাখা কোনো দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হতে পারে না। নতুন নতুন লোক বড় হতে চায়, নতুন নতুন জাত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। পুরোণো দল বা জাত

বা ব্যক্তিগুলার পা চাটতে গেলে "ঐক্য" রক্ষা হতে পারে বটে। কিন্তু তাতে নতুন নতুন উন্নতি-প্রয়াসী জাতের বা সম্প্রদায়ের জীবনবত্তা নষ্ট হবে মাত্র।

নমঃশূদ্রেরা তাই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হচ্ছে। পোদ হাড়ি চামার ইত্যাদি লোকেরা স্বাধীন হচ্ছে, ইস্কুল পাঠশালা করছে, রাজ-দরবারে খ্যাতি চাচ্ছে। এই সব বিদ্রোহ ও স্বাধীন জীবনের আন্দোলন আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রধান সহায়। চলুক এ সব স্বতন্ত্রতার আন্দোলন। আমিই এক মাত্র বা তুমিই এক মাত্র স্বাধীনতা আর আত্ম-কর্ত্তৃত্ব ভোগ করবে কেন? একজন লোক এসে বল্ল, "আমি দেশের বাণীমূর্ত্তি, দেশের আত্মা।" নব্য-ন্যায় বল্‌বে, "বাণীমূর্ত্তি বা প্রতিনিধি তুই কার? তোর নিজের? তোর জাতের? তোর পাড়ার? কজন লোকের? ইস্কুলমাষ্টার, উকিল ডাক্তার ইত্যাদি শ্রেণীর দু চার শ' বা দু চার হাজার লোকের বাণীমূর্ত্তি হয়ত তুই হতে পারিস।" আমি ডাক্তার হওয়াতে বড় জোর হাজার-খানেক ডাক্তারের মতামত প্রচার করছি। তার ফলে হয়ত ডাক্তারদেরকে নামজাদা কর্‌লাম, তাদের কথা প্রচার কর্‌লাম, তাদের উপকার করলাম। এ বেশ স্বাভাবিক কথা। অপর পক্ষে হয়ত আমি খেতে পাচ্ছি না, লেখাপড়া শিখ্‌তে পাচ্ছি না, দুনিয়ায় আমার কেহ নাই। আমি যদি বলতে চাই যে আমাদেরকে নামজাদা করে দাও, আমাদের জন্য খবরের কাগজ চালাবার ব্যবস্থা করে দাও আমাদেরকে টাকা পয়সায় বড় লোক হবার সুযোগ তৈরি করে দ'াও, আমরাও একটা দল গড়ে তুলি। তাহলে একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটবে কি?

নব্য-ন্যায় তাই প্রশ্ন করছে, "মজুরের সঙ্গে মনিবের হৃদয়ের যোগাযোগ কোথায়? উকিলের সঙ্গে হাটুয়ার হৃদয়ের যোগাযোগ কোথায়? পয়সাওয়ালা মুসলমানের সঙ্গে গরীব মুসলমানের হামদর্দ্দি কোথায়? যে মাঝি নৌকা চালাচ্ছে সে যে কথা বলছে তার সঙ্গে ডাক্তারের স্বার্থের যোগাযোগ কোথায়?" ইত্যাদি। এই যোগাযোগ আর হামদর্দ্দি যখন নব্য-ন্যায় দেখতে পাচ্ছে না তখন উকিল ইস্কুলমাষ্টার ডাক্তার আর তথাকথিত ভদ্রলোক এবং পয়সাওয়ালা লোকের ধাপ্পাবাজিতে কেন অন্যেরা ভুলে থাকবে? অতএব বাংলাদেশের যে ব্যক্তি যেখানে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের অভাব দেখ্‌তে পাচ্ছে,—বিদ্যার অভাবে, স্বাধীনতার অভাবে, পদমর্য্যাদার অভাবে, টাকা-কড়ির অভাবে ফুটে উঠতে পারছে না সেই ব্যক্তি সেখানে নতুন দেশ, নতুন সমাজ, নতুন বাংলা গড়ে তুল্‌তে সম্পূর্ণ অধিকারী। তাতে যদি পুরোণো "বাবু-ভায়া" "ভদ্রলোক" "জন-নায়ক", "মিঞা ছাহেব" ইত্যাদির সঙ্গে নতুনের ঝগড়া বাঁধে, বাঁধুক। এই ঝগড়ায় দেশ বড় ছাড়া ছোট হতে পারে না। আমি ভারতীয় ঐক্য, হিন্দু মুসলমানের ঐক্য, মুসলমানে মুসলমানে ঐক্য, অথবা হিন্দুতে হিন্দুতে ঐক্য ইত্যাদির বুখ্‌নি বুঝি না। আমি চিনি মাত্র হাজার হাজার বাংলাদেশ আর হাজার হাজার ভারত, অর্থাৎ হাজার হাজার আত্মকর্ত্তৃত্বশীল, আত্মসম্মানশীল, ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট, ভবিষ্যতের পথ-পরিষ্কারকারী হাজার হাজার

ব্যক্তি, হাজার হাজার দল, হাজার হাজার সম্প্রদায়। তার নাম বহুত্ববিশিষ্ট ভারতবর্ষ,—বহুত্বময় বাঙলা দেশ।

বর্ত্তমান-নিষ্ঠার বয়েৎ

নব্য-ন্যায়ে আর পুরোণো ন্যায়ে আর একটা গভীর প্রভেদ আছে। মামুলি ন্যায় সাধারণতঃ সুদূর অতীতের স্মৃতিতে আর মহা ভবিষ্যতের স্বপ্নে মসগুল হয়ে থাকে। নব্য-ন্যায় প্রাচীন ভারত প্রাচীন দুনিয়া অথবা সুদূর ভবিষ্যতের বোলচালে নিশ্চিন্ত থাকে না। এর প্রধান বা একমাত্র কথা,—বর্ত্তমান-নিষ্ঠা। বর্ত্তমান জগতের জন্য হরেক মুহূর্ত্তের কর্ত্তব্য পালন তার একমাত্র সত্য।

মহা অতীতে কি ছিল, মৌর্য্য-মারাঠা-মোগল আমলে কি ছিল তার কথায় আমি মাতি না। মাঝে মাঝে একটু আধটু ঐতিহাসিক চর্চ্চা চালিয়ে থাকি বটে। তাতে কিছু লাভও হয়ত আছে। কিন্তু এমন কি ১৯০৫, ১৯১৫, ১৯২৫ সনকেই আমি "সেকেলে" যুগ বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। প্রত্নতত্ত্বের বাসি মালে মসগুল থাকা এই নব্যন্যায়ের স্বধর্ম্মোচিত নয়। অপরদিকে নব্য-ন্যায় কল্পনার আকাশ-কুসুম দেখে অথবা মহাভবিষ্যের বিপুল ভারত সম্বন্ধে স্বপ্নদেখে চাঙ্গা হয়ে উঠতে চায় না। বর্ত্তমান যুগের সকল প্রকার বৃহত্তর ভারতই তার আরাধ্য দেবতা। জীবন-বেদের বেপারীরা কট্টর বর্ত্তমান-নিষ্ঠ। তাদের বয়েৎ শুনাচ্ছি ঃ—

কৃপণের মতন ভবিষ্যের ব্যাঙ্কে জমা রাখ্‌তে পারিনা (আমার) জীবন,
লক্ষগুণ মূল্যবান বেশী (আমার) বর্ত্তমানের ছোটখাটো দিনক্ষণ।
ভবিষ্যৎ কি আছে পৃথিবীতে? অতীত ত ভূত হয়েছে মরে,
দুনিয়া লুটতে চাই আমি এখনি এই মুহূর্ত্তে প্রাণ ভরে।
নিশীথের আশা স্বপ্ন সুখ হতে না হতে সকাল যায় মুস্‌ড়ে,
কালকে মিঠাই খেয়ে থাক্‌লেও আজকে কুইনিন (ফেলে) দিই ছুঁড়ে।
বর্ত্তমানই আমি,—আমার জীবন; এইক্ষণের কর্ত্তৃত্ব, শোক, হর্ষ,
তার কাছে দাঁড়াতে পারেনা আমার আগামী শতবর্ষ।
ধরা স্বর্গের সকল ভোগ চাই আমি প্রতি নিমেষের রক্তে,
অর্ব্বুদ বিদ্যুৎ বিন্দু পর পর ভাসুক আমার জীবন স্রোতে।
এখনি ঢালব সকল শক্তি, হব সার্থক, বেঁচে নিব গোটা জীবন,
সেরা লগ্ন, মাহেন্দ্র যোগ জীবনে আর আসবে না কখন।
আজকের দিন, এই বেলা, এই মুহূর্ত্ত, এই ধরাতল,—
এই সবই আমার শরীর-মন-প্রাণের শ্রেষ্ঠ সম্বল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী

কথা উঠিয়াছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী একজনের লেখা নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা খুব পুরাণো, আর পদাবলীর ভাষা হালি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাতত্ত্ব লইয়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট্ (লণ্ডন) মহাশয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বই সাহিত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর কিনা আমাদের সন্দেহ আছে। ব্রজাঙ্গনা ও মেঘনাদবধের ভাষায় আস্‌মান্ জমীন্ ফারাক, এমন কি তিলোত্তমার সহিত মেঘনাদবধের ভাষা মিলে না। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর আর রামপ্রসাদের গান কে বলিবে যে একজন কবির রচনা? তথাপি আমরা ভাষাতত্ত্বকে যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া সসম্ভ্রমে কয়েকটা কথা বলিতে চাই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের সব জায়গার ভাষা জটিল নহে, এমন কি এক আধটু চন্দ্রবিন্দু আদির ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় পদাবলীর সঙ্গে তাহার বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। উদাহরণ দেখুন—

কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দূর
সজল জলদে যেন উয়িল নব সূর ॥
কনক কমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চাঁদ দুই লাখ যোজনে ॥
মুনি মন মোহিনীর মণি অনুপামা।
পদুমিনী আমার নাতিনী রাধা নামা ॥
ললিত অলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে।
তমাল কলিকা কুল রহে বনমাঝে ॥
অলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে বসি তপ করে নীল উতপল ॥

অন্যত্র

মলয় পবন বহে বসন্ত সময়ে।
বিকশিত ফুল গন্ধ বহু দূর যায়ে।

পুনশ্চ

দধি দুধে পসার সাজায়া।
নেত বাম ওহাড়ন দিয়া ॥
সব সখীজন মেলি রঙ্গে।
এক চিত্তে বড়াইর সঙ্গে ॥

নিতি যায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী।
বন পথে মথুরা নগরী॥
একদিন মনের উল্লাসে।
সখী সনে রস পরিহাসে॥

আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য পদাবলীর ভাষা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যাকরণ যে পুরাণো তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনকার পদাবলী রচনা করেন নাই একথা যাঁহারা সম্পাদক বিদ্বদ্বল্লভ ও অধ্যাপক সুনীতিকুমারের দোহাই পাড়িয়া বলিতে আসেন, তাঁহাদের কথা স্বীকার করিতে যথেষ্ট বাধা আছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, পুথিখানি খণ্ডিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনকার যে অন্য পদও রচনা করিয়াছিলেন নিম্নলিখিত পদটী তাহার প্রমাণ। বটতলা সংস্করণ পদকল্পতরুতে একটী পদ পাওয়া যায়, সংখ্যা ১৪১৬, পদে ভণিতা নাই। পদটী এই—

হেম ঘট দেখিয়া পাথারে।
চোরার মন সাত পাঁচ করে॥
তুমি ইহায় পুছহ বড়াই।
কিবা ধন মাগয়ে কানাই॥
তুমি কি না জান বনমালী।
রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী॥

বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের রতন লাইব্রেরীর সংগ্রহের মধ্যে এই পদ নিম্নলিখিত আকারে পাওয়া গিয়াছে।

নিসেদ নিলজ বনমালী।
বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী॥
হেম ঘট দেখিয়া পাথারে।
সে রাধার মন সাত পাঁচ করে॥
মাকড়ের হাতে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥
সাপের মাথায় মণি জ্বলে।
বড়ু কহে বাসলীর বলে॥

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম, এ মহাশয়ের সংগ্রহের মধ্যেও এই পদটী ভণিতাহীন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। পদটীর রচনা যে অতুলনীয় কবিত্বপূর্ণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পদকল্পতরুর সঙ্গে শিবরতন বাবুর সংগ্রহের দুই জায়গায় পাঠান্তর

দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে "হেম ঘট দেখিয়া পাথারে, চোরার মন সাত পাঁচ করে" পাঠ যেমন সঙ্গতিপূর্ণ তেমনি কবিত্বে ভোরপুর। অপর পাঠে আমরা 'বাথানে কি ভেটে চন্দ্রাবলী' পাঠই সঙ্গত মনে করি। এই ধরণের কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে,—

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যায়ে।
তাহাকে বারিয়া বোল বলিতে জুয়ায়ে ॥

*　　　*　　　*

পথত বারহ মন নন্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ সব খণ ॥

*　　　*　　　*

পুরুবে যে কৈল তত জানিয়া আপুনি।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥

পাঠের গোলমাল থাকিলেও পদটী যে চণ্ডীদাসের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায় না। সুতরাং এক বলিতে হয় কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ পাওয়া গেলে পদটী তাহাতে পাওয়া যাইত, নয়তো বলিতে হয় কৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়াও কবি বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটী পদাংশ আছে, এই পদটী চণ্ডীদাসের ভণিতায় সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। চরিতামৃতে আছে—

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যাঁহা গেলে কানু পাই তাঁহা উড়ি যাই ॥

সম্পূর্ণ পদে ইহার পরের ছত্র কয়েকটী এইরূপ—

হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনম দুখিনী ॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা ॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস বলে ধনি এমতি না বল ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের-

দেখিলোঁ প্রথমনিশি সপন শুনতোঁ বসী

সব কথা কহিআরেঁা তোহ্মারে হে।

বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে

চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥

ইত্যাদি পদটী পদাবলীর মধ্যে—

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি

সব কথা কহিয়ে তোমারে।

বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে

চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥

ইত্যাদি আকারে পাওয়া গিয়াছে।

কতকগুলি পদাংশও পাওয়া যায়—

হাথ দিয়া দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।

জত বড় উপজিল জ্বরে॥ (কৃঃ কীঃ)

হাত দিয়া দেখ বড়াই মোর কলেবর।

ধান দিলে খই হয় বিরহ অনল॥ (পদাবলী)

মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।

শুন বড়াইল সাদ লাগে কাহ্নাঞী দেখিবারে॥ (কৃঃ কীঃ)

মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।

সাধ লাগে বড়াই গো কানু দেখিবারে॥ (পদাঃ)

সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল

রাধিকা কাহ্নাঞীর সঙ্গে আছে। (কৃঃ কীঃ)

লোক মুখে শুনি ইহা বলে লোকে

কানু সনে রাধা আছে। (পদাবলী)

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরী গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থে স্তব্ধার উদাহরণে নীচের লিখিত ভণিতাহীন পদাংশ পাওয়া যায়—

কানু নাহি আইল মোর ঘরে।

কাহার লাগিয়া মুঞী সাজ সাজিলাম গো

পরাণ কেমন কেমন করে॥

চাঁদ হেরিতে মোর   তাপ বাঢ়য়ে গো
বিষ লাগে মলয়েরি বাত।
সরস চন্দন ঘন   আগুন লাগয়ে গো
ফুল হেরি ফুল শরাঘাত ॥

ইহার পরের কয়েকটী কলি চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে—

বক্ষের পঞ্জরে মোর   বাজ বাজিছে গো
দারুণ কুহু কুহু রা।
কুঞ্জ যেন বন্দীজালে   ঘেরিয়া রেখেছে গো
পথ নাহি মিলে এক পা ॥
আপনা আপনি মুঞী   বৈরী বাসিয়ে গো
বাঁচি যদি ছাড়িয়ে পরাণে।
নয়নের জল মোর   করিবে কি উপায় গো
বড়ু কহে বাসুলী চরণে ॥

রসমঞ্জরীর উৎকণ্ঠিতা মধ্যার উদাহরণে—

সজনী আর না বল কিছু মোরে।
মোরে পরিহরি পিয়া গেল কার ঘরে ॥
রমণী পাইয়া পিয়া মোরে পাসরিল।
তাহার সঙ্গেতে বিলাস করিতে লাগিল ॥
সেহ ধনি গুণবতী জানয়ে সকল।
অদভূত রতি রণে নাগর ভুলল ॥

এই পদাংশ পাওয়া যায়। ইহার পরের কলি কয়েকটী চণ্ডীদাসের ভণিতায় এইরূপ পাওয়া গিয়াছে—

না জানি কোন্ তীর্থে সে তপিল তপ!
তাহার ফলে নাগর করিল গৌরব ॥
আর না দেখিব মুখ না আসিবে পিয়া।
বাসুলীর বরে চণ্ডীদাস কহে গাইয়া ॥

এই সমস্ত পদের ভাষাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই পদগুলি কোনো পদকর্ত্তার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না, অতি পুরাতন পাতড়ায় পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং কোনো জয় গোপালেরও হাত পড়ে নাই। যদি বলা যায় ইহা পরবর্ত্তী কালের রচনা, তাহাতে আপত্তির হেতু আছে। কারণ পদ দুইটী পুরাতন না হইলে পীতাম্বর দাস ভণিতা সহ উদ্ধার করিতেন।

চণ্ডীদাসের অনেক গানে এইরূপ ভণিতা লোপ পাওয়ায় অনেকে সেই সেই পদের পাদপূরণ করিয়া নিজের ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন। এরূপ অনুমানেরও সঙ্গত যুক্তি আছে, উদাহরণও আছে। রসমঞ্জরীর ভাবোল্লাসের উদাহরণে গোপালদাসের নামে "চিকুর পড়িছে বসন খসিছে পুলক যৌবন ভার" এই যে পদ উদ্ধৃত হইয়াছে ইহা চণ্ডীদাসের পদ। পদাবলীতে "সই জানি কুদিন সুদিন ভেল" এইরূপ ধরতায় এই পদ পাওয়া যায়। কানুদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির নামেও চলিয়া গিয়াছে, বহু পুরাতন পুঁথিতে এমন সব পদ চণ্ডীদাসের নামে পাওয়া যায়।

পদাবলীর ভাষার নমুনা স্বরূপ আর একটী পদ তুলিতেছি। এই পদটী সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কবি বিপ্র পরশুরামের মাধবসঙ্গীত হইতে উদ্ধৃত। মাধবসঙ্গীত পুঁথিখানির সাত নকল হয় নাই, গায়কের মুখে মুখে বদলাইয়াও যায় নাই। যদিও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয় বঙ্গবাণীতে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে কৃষ্ণমঙ্গল ও মাধব-সঙ্গীত এক পরশুরামের লেখা নয়, কিন্তু তাঁহার আপত্তির হেতু অতি অল্প। আমি ইতিপূর্ব্বে বিপ্র পরশুরামের পরিচয় দিতে গিয়া এই বঙ্গবাণীতেই কবির কথা তুলিয়া দেখাইয়াছি যে তিনি 'ব্রাহ্মণ কুলশীল পাইয়াও প্রকারে তাহা পরিহার করিয়াছিলেন'। সুতরাং প্রথমে ভণিতায় কৃষ্ণ-সখা থাকিলেও পরে বৈষ্ণব কবি যদি গুরুপদে আশা করিয়া থাকেন, তাহাতে বিশেষ কোনো দোষ হয় না। আর কৃষ্ণমঙ্গল ও মাধবসঙ্গীত একই বিষয়ের পুথি নয়। নলিনীবাবু আমার প্রবন্ধটী ভাল করিয়া পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিতেন। কৃষ্ণমঙ্গল ভাগবতের অনুবাদ হইলেও তাহাতে স্বাধীন রচনাও আছে, এবং তাহা নিছক মধুর রসের পুঁথিও নহে। আর মাধবসঙ্গীত মাত্র মধুর রসের ভিয়ানেই লেখা, এই পুঁথিতে কবি স্বাধীন রচনায় রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। আমি পরশুরামকে পশ্চিমবঙ্গের কবি বলায় নলিনীবাবু সে কথারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি কবির বাসগ্রাম, বংশ-পরিচয় ও আশ্রয়দাতা রাজার নাম ও রাজধানীর কথা কবির লেখা হইতেই তুলিয়া দিয়াছিলাম। নলিনীবাবু প্রত্নতত্ত্বে প্রবীণ এবং পণ্ডিত ব্যক্তি, রাজা-রাজড়া লইয়াই তাঁর কারবার। তিনি যদি দয়া করিয়া একটু খোঁজ লইয়া বলিয়া দিতেন দ্বাদশ কল্য গ্রাম কোথায় এবং কুমার শ্যামশিখর কে, তাহা হইলে একজন প্রাচীন কবির পরিচয়-রহস্যে কিছু পরিমাণও আলোক-সম্পাত হইত। কবির বাসগ্রামের নাম চম্পক নগরী। তিনি মনোহর দাসের শিষ্য, মনোহরের অনুজ কিশোর দাসেরও তিনি নাম করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের জন্মভূমি কাঁদরায় মনোহর দাস থাকিতেন, মনোহরের ছোট ভাই কিশোরদাস জ্ঞানদাসের মঠের আদি মোহান্ত, এই সব হেতুতেই আমি কবিকে এই অঞ্চলের লোক বলিয়াছিলাম। এখন নলিনীবাবুর চেষ্টায় পূর্ব্ববঙ্গে কবি পরশুরামের বাসভূমি ও বংশপরিচয়াদির সন্ধান মিলিলে আমরা আনন্দিত হইব। কবি যে স্থানেরই হউন তাঁহার সত্য পরিচয় আবিষ্কৃত হইলেই সাহিত্যের প্রয়োজন সাধিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন গোঁড়ামি নাই। তবে

যতক্ষণ সেরূপ প্রমাণ-সহ নূতন কিছু তথ্য না পাওয়া যায় ততক্ষণ আমরা বিশ্বাস করিব মাধব-সঙ্গীত ও কৃষ্ণমঙ্গল একজনেরই লেখা। এই বিশ্বাসেই সাড়ে তিনশত বৎসরের পুরাণো বলিয়া নীচের পদটী মাধবসঙ্গীত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

কালিন্দী কিনারে গো নাগর কালিয়া।
জলেরে যাইতে একা　　সে অঙ্গে লাগিল ঠেকা
মনে ছিল তমাল বলিয়া॥
কানাঞী করিয়া আগে　　আবেশ আছিল গো
ধাধসে বাধিল দুই পায়।
রূপের বাতাসে তনু　　কে জানে কি হইল গো
কথা কহিতে পুলকে পড়ে গায়॥
নব কুবলয় দল　　তনু নিরমল গো
রতন মুকুর বর হিয়া।
কেমন বিধাতা তায়　　রসাল করিল গো
শুধুই সুধার সার দিয়া॥
রূপের মাধুরী কত　　ভুবন ভুলায় গো
পরশে অমিয়া সুখরাশি।
পরশুরামের মনে　　স্মওরি স্মওরি রূপ
বসিয়ে কান্দিয়ে দিবানিশি॥

ঐ ধরণের পদ কোনো হালের কবি লিখিলেও তিনি বোধ হয় আরও হালি ভাষা ব্যবহার করিতেন না।

অনেকে ভণিতা দেখিয়া পদাবলী নির্ব্বাচন করিতে বলেন। কিন্তু এ পদ্ধতিও সর্ব্বথা নিরাপদ নহে। পরশুরামের প্রসঙ্গে উপরে ভণিতার রকমফেরের উদাহরণ দিয়াছি। নানা কারণে এইরূপ রদবদল ঘটিতে পারে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা বড়ু ভণিতা পাই। পদাবলীর মধ্যেও বড়ু ভণিতার পদ আছে। বড়ু ও দ্বিজ প্রায় একার্থবাচক শব্দ, কোনো কারণে কোনো লিপিকর বা কীর্ত্তনীয় বড়ুর জায়গায় দ্বিজকে আনিয়া যে বসান্ নাই তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারেন না। বরং বড়ু ও দ্বিজ ভণিতার পদে যদি ভাবের দিক্ হইতে সঙ্গতি পাই, অথবা রসের ধারা-বাহিকতা পাই, সেক্ষেত্রে হয়তো হলপ লওয়া চলে যে এখানে দ্বিজ আসিয়া বড়ুর আসন দখল করিয়াছেন। পদাবলীর দ্বিজ ভণিতাযুক্ত 'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' পদটীর সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তনের "কে না বাঁশী বায়ে বড়াই কালিনী নই কুলে" পদটীর ভাবের দিক্ হইতে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। পদাবলীর মধ্যে বড়ু ভণিতার এমনও পদ আছে যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে মোটেই বেমানান্

হয় না। "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" পদটীর কথা বলিয়াছি, এই ধরণের আর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। রসজ্ঞ পাঠক ঐ কবি-স্বপ্নের সঙ্গে এই পদটী একবার মিলাইয়া লইবেন। খেলার ছলে স্বপ্ন কথা বলিতে বলিতে মুগ্ধা-নায়িকা কবি-হৃদয়ের কোন্ অতল হইতে দীর্ঘনিঃশ্বাসে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন,—স্বপ্নেরই মত সেই ছবি, —আবেশময়, ছন্দ-বিলম্বিত, বিহ্বল!

চলহ সই জল ভরিতে যাই
যে ঘাটে চন্দন চুয়া ভাসে।
কলসী ভাঙ্গিয়া ঝিকটী খেলিব
যাবত কৃষ্ণ না আইসে॥
এসহ সকল সখি বৈসহ আমার কাছে
স্বপন কহিয়ে তোমার আগে।
নিশি দুপহরে স্বপন দেখিনু
শিয়রে বঁধুয়া জাগে॥
শিয়রে বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া
গায়েতে বুলায় হাত।
সুতার সঞ্চার দ্বার নাহি নড়ে
কোন্ পথে গেলা প্রাণনাথ॥
ডাহুকী ডাকয়ে কোকিল কুহরে
চকোর ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
বাসুলী চরণ শিরেতে বন্দিয়া
কহে বড়ু চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়ু- ও বাসলী-শূন্য কেবল চণ্ডীদাস ভণিতারও কয়েকটী পদ আছে। "তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাত্র", "জীআঅ রাধাকে গাইল চণ্ডীদাসে", "তথা কানাঞী গাইল চণ্ডীদাসে", "আনি দেহ এবে কানাঞী গাইল চণ্ডীদাসে"। অতএব পদাবলীর মধ্যে বড়ু ও বাসলীকে না পাইলেই চণ্ডীদাসের পদ ফেলিয়া দেওয়া চলিবে না। তাহা হইলেই ব্যাপার খুব ঘোরালো হইয়া দাঁড়াইল। শুধু ভণিতার আলোচনায় ইহার ঘোর কাটিবে না, একটু খাটিতে হইবে, বেশ তলাইয়া বুঝিয়া ভাবের দিক্ হইতেও ইহাকে বাজাইয়া লইতে হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ধারা পদাবলী সাহিত্য হইতে লুপ্ত হয় নাই। একটা উদাহরণ দেই,—কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডে রাধা বলিতেছেন—

'আরে ভৈরব পতনে গাঅ গড়াহলি গিয়া।
গঙ্গা জলে পৈস গলে কলসী বান্ধিয়া॥

হেন যদি কর কানাই আমার বচনে।
তবে তোর হয়ে পাপ সাগরে মোচনে।

*   *   *
*   *   *

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন—

তোর দুই উরু রাধা ভৈরব পতনে।
নিকটে থাকিতে দূর যাইব কি কারণে ॥
তোর দুই কুচ কুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈস গো লাবণ্য গঙ্গাজলে ॥

পদাবলী সাহিত্যে দানখণ্ডে গোবিন্দদাসের রাধিকা বলিতেছেন-

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ
পান কর কনক ধূমে।
কামনা সাগরে কামনা করহ
বেণী বদরিকাশ্রমে।
সূর্য্য উপরাগে সহস্র সুন্দরী
ব্রাহ্মণে করাহ সাথ।
তবু হয় নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥

শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিতেছেন—

তোহারি হৃদয়   বেণী বদরিকাশ্রম
উন্নত কুচ গিরি জোর।
তোহারি বদন ছবি   কনক ধূম পিবি
ততহি তপত জীউ মোর ॥
সুন্দরী তোহারি চরণ যুগ ছোড়ি।
গৌরী আরাধনে   কাঁহা চলি যাওব
তুঁহু সে তীরথময় গোরী ॥
সুন্দর সিন্দুর   মৃগমদ পরশল
এহি সুরয গ্রহ জানি।
তুয়া পদ নখ.   দ্বিজ রাজহি সোঁপুলু
সুন্দরী সহস্র পরাণী ॥

বাঁকুড়া হইতে একখানি পুথি পাইয়াছি, নাম গোকুল বিলাস। পুঁথিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মত কৃষ্ণরাধার বিশিষ্ট রকমের ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। এমন কি ননীচুরী করিতে গিয়া একটু হাত কাড়াকাড়িরও ব্যাপার ঘটিয়াছে।

রাধিকা বলেন উকে উকে কৃষ্ণ বলেন আমি।
এমনি করে দধি খেয়্যা যাও নিত্ পত্যুই তুমি ॥
মা য়াস্থক ত কয়্যা দিব এমন তোমার কাজ।
কৃষ্ণ বলেন এই রাধিকা হৈল দাগাবাজ ॥
কে খেয়্যাছে দধি তোর কারে বলিস্ চোর।
চড়ের চোটে প্রাণ টানিব এমনি কথা তোর ॥
রাধিকা বলেন মা য়াস্থক কেমন বুকের পাটা।
একলা পেয়ে গরব করিস্ গর্‌বা খাকির বেটা ॥
হাতাহাতি কাড়াকাড়ি লাগিল হুড়াহুড়ি।
হাত মুছুড়্যা পালিয়া গেল সেই রাধিকা ছুঁড়ি ॥ ইত্যাদি।

কৃষ্ণকীর্ত্তন অনেকটা বরাতি লেখার মত। ঝুমুর গানের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে তাহার উদাহরণ দিয়াছি যে, সর্ব্বদাই যেন শ্রোতাদের সম্মুখে রাখিয়া কবিকে উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে হইয়াছে। প্রচলিত প্রবাদেও ইহার সমর্থন পাই—"বাস্থলী চণ্ডীদাসকে কৃষ্ণ ধামালী অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের ঝুমুরগান লিখিতে আদেশ দিয়াছিলেন"। ইহার পর চণ্ডীদাসের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এই কবিত্ব-সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন।

মাধবেন্দ্র পূরীর কথা অকথ্য কথন।
মেঘ দেখিলেই তিঁহ হয় অচেতন ॥ (চৈতন্য ভাগবত)

প্রেমের এই জীবন্ত আলেখ্য চণ্ডীদাস স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বহু প্রবীণ বৈষ্ণবের মুখে এ কাহিনী শুনিয়াছি। এ কাহিনী অবিশ্বাস করিলেও কবির কোনো ক্ষতি হইবে না। কারণ কৃষ্ণকীর্ত্তনে তিনি যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পদাবলী রচনার পক্ষে তাঁহার উপর এতটুকু অবিশ্বাসেরও অবকাশ পাওয়া যায় না। বংশীখণ্ডে এবং রাধাবিরহে পদাবলী সাহিত্যের পূর্ব্বাভাস ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক পদের স্থর একেবারে পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে হুবহু মিলিয়া যায়। একটী তুলিয়া দিলাম—

যে কানু লাগিয়া মো আন না চাহিলুঁ বড়াই
না মানিলুঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পরিহাসে আমা উপেখিয়া রোষে
আন লইয়া বঞ্চে বৃন্দাবনে।

বড়াই গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বলি ঝাঁপ দিল সে মোর শুখাইল লো
মুঁই নারী বড় অভাগিনী ॥
নন্দের নন্দন কান্থ যশোদার পো আলো
তার সনে নেহা বাড়াইলুঁ।
গোপত রাখিতে কাজ তাহা মুঁই বিকাশিলুঁ
তাহার উচিত ফল পাইলুঁ ॥
স্বামী মোর দুরুবার গোয়াল বিশাল
প্রতি বোল ননদিনী বাছে।
সব গোপীগণ মোরে কলঙ্ক তুলিয়া দিল
রাধিকা কাহ্নাঞীর সঙ্গে আছে।
এত সব সহিলুঁ মো কান্থর নেহার লাগি বড়াই
মোরে লেহ কাহ্নাইর পাশ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিয়া
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।

আর একটী উদাহরণ দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বৃন্দাবন খণ্ডে রাধিকা মান করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরিলেন, বড়াইকেও কত বলিলেন, কোনো ফল হইল না। তখন ফুল চুরি ও বৃন্দাবন ভাঙ্গিবার অপবাদ দিয়া বলিলেন—'যদি স্ত্রীবধের ভয় না থাকিত তোমায় মারিয়া যমঘর পাঠাইতাম'। রাধিকা কিন্তু ভীতা হইলেন না, মানও ত্যাগ করিলেন না। হাতের গুটী-চারি ফুল দেখাইয়া বলিলেন -"আমি বড়র বধু, বড়র ঝি, মিথ্যা আমার ফুল চুরির অপবাদ দিতেছ, এইতো আমার হাতে কয়টা মাত্র ফুল রহিয়াছে। কেন মিথ্যা বলিতেছ? তোমার ফুল সব গোপ-নারীরা তুলিয়া লইয়াছে"। শ্রীকৃষ্ণ তখন ফুলের সঙ্গে মিলাইয়া পদনখ হইতে চুল পর্য্যন্ত রাধার কুসুমিত তনুর এমন বর্ণনা করিলেন যে শ্রীমতী প্রীতা হইয়া উঠিলেন, তবে একেবারে মানত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিলেন -"সকল পুরুষ মাঝে তুমি বর নাগর, তোমায় কথায় কে আঁটিবে? কিন্তু পদ্মপত্রের জলের মত তোমার প্রীতি,—দুই-ই পরিহাসের বস্তু! একপাশে দাঁড়াও, আমি গৃহে যাইব"। শ্রীকৃষ্ণ পথ ছাড়িলেন না, বলিতে লাগিলেন— 'তোমাকেই সংসারের সার করিয়াছি, তোমার কথাতেই গোপীদিগকে তুষিয়া প্রকারে পরিত্যাগ করিলাম। আমার মন তোমাতে অবিচলিতই আছে"। রাধিকা আর মান করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন "প্রাণ কানাই, স্ত্রী-স্বভাব,—এমনি মনে করে, তাহাতে রোষ করিও না, আর আমার ক্রোধ নাই। দেখ, তোমার পায় এই জানাইতেছি,—আমার সমান আর কাহাকেও

করিও না। মদন তোমার আমার মন এক করিয়া গাঁথিয়াছে, তার অনুরূপ বৃন্দাবনে তোমার কথার অবাধ্য হইব না" ।—

"বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে ॥
সে নেহ তিয়জ নাহি সহে।
সে পুনি আমার দোষ নহে" ॥

"যে ভালবাসা দিয়া বিধি তোমায় আমায় এক প্রাণ এক দেহ করিয়া গড়িয়াছেন, সে ভালবাসা যে তৃতীয় সহে না (তোমার আমার মধ্যে আর একজনের ব্যবধান সহিতে পারে না) সে তো আমার দোষ নহে"। দোষ ভালবাসার ! এই ভালবাসাই পদাবলী সাহিত্যের প্রাণ। এই মানে অক্ষমা নিরুপায় আপন-হারা জীবন,—এই প্রেম-সর্ব্বস্ব ব্রজকিশোরীই চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কোজাগরী

জ্যো'স্না জ্বালায় ফুলঝুরি আজ
পাতায় ফুলে ঝল্‌মলিয়ে !
আকাশ পোড়ায় আতস-বাজী
উল্কা-তারার দল জ্বলিয়ে !
আজ দেয়ালীর উৎসবে, ও
কোন্ খেয়ালী সাজায় বাতি !
রতন মণির মতন আভায়
খল্‌খলিয়ে হাস্‌লো রাতি !
নিখিল ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে
ছড়ালো তা'র রূপের রাশি
লক্ষ্মীমায়ের বোধন ওরে !
কোজাগরের পৌর্ণ-মাসী !

* * *

শুভ্র মেঘের রথ বুঝি ঐ
আন্‌লো তাঁরে দ্যুলোক হ'তে
ভূলোক পানে নয়ন মেলেই
ভাসিয়ে দিলেন পুলক-স্রোতে !
নয়ানজুলির মঞ্জুলতা
রইলো চেয়ে নয়ান তুলি' !
মায়ের পানে অবাক হয়ে
রইলো চেয়ে কুসুম গুলি !
অ-জাগর-ও আজ জেগেছে !
সাগর জাগে হিল্লোলিয়া !
গিরীশ জাগে শৃঙ্গ মেলি'
সরিৎ জাগে কল্লোলিয়া !

আকাশ জাগে, বাতাস জাগে,
ভূলোক, দ্যুলোক, ত্রিলোক গো!
কোজাগরের জাগরণে
জাগ্‌লো বিপুল পুলক গো!
আজ জননী কখন নামেন
এই ধরণীর ধূলার 'পর,
ওরে তোরা রাত জেগে, আজ
সেই লগনের মানৎ কর!
ধান্য ধনের আশীষ লভি'
ধন্য হ'বি আয়রে আয়!
লক্ষ্মী মায়ের আগমনীর
পূর্ণিমা রাত ঐ পোহায়!
চোখের পাতা রাখ খুলে আজ
দূর করে' দে ঘুমের লেশ
চোখ্ ভরে' আর বুক ভরে' আজ
দেখ্‌রে মায়ের স্নিগ্ধ বেশ!

অযুত পথে আলোক রথে
ঝর্‌ছে তাঁরি আশীর্ব্বাদ!
ঘুমাস্‌নে আজ! এক কণাতেই
পূর্‌বে অযুত যুগের সাধ!
ঘুমাস্‌নে আজ, আসেন মাতা
ধূসর ধূলির এই ধরায়
তাই ধরণীর ঊষর বুকে
সুধার ধারা অই গড়ায়!
ঘুমাস্‌নে আর ঘুমাস্‌নে আজ
তন্দ্রাহত হোস্ না রে!
তোদের সবায় জাগতে বলে
কোজাগরের জ্যো'স্না যে!
অখিল আজি তন্দ্রাহারা লক্ষ্মীমায়ের প্রতীক্ষায়,
নিদ্রাহারা ভূলোক পানে নিদ্রাহারা দ্যুলোক চায়!

শ্রীরামেন্দু দত্ত

পদ্মার ঢেউ

পাগ্‌লী পদ্মা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আঘাতে রাতদিন পাড় ভাঙে। কলসী কাঁখে করিয়া একটী কিশোরী মেয়ে ঢালু পাড় বহিয়া প্রতিদিন জল লইতে আসে। পাড় হইতে কতকটা দূরে তাহাদের ঘর। কে জানে কে মেয়েটীর নাম রেখেছিল—বিদ্যুৎ। চোখ দুটী তার সব সময়েই বিদ্যুৎবালার মত উজ্জ্বল ও চঞ্চল।

এক একদিন যখন ওপার থেকে বাঁধভাঙা ঝড় নদীর বুক বাহিয়া এপারের দিকে ছুটিয়া আসে, বিদ্যুৎ তখন সব কাজ ফেলিয়া নদীর তীরে ছুটিয়া আসে। বাহিরের উদ্দাম প্রকৃতি তাহার অন্তরের সহিত সুরে সুরে মিলিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। এক একদিন সে এমনি অবস্থায় জলে ঝাঁপ দিতে যায়। "কি কর্‌চিস্ পাগ্‌লী" বলিয়া পিছন হইতে একজন তাহার হাত টানিয়া ধরে।

তাহাদের ঘর থেকে একটু দূরে গাঁয়ের কামারশালার বুড়া কামার চিরজীবন হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে এই সেদিন চিরবিশ্রাম লইয়াছে। তাহার একমাত্র ছেলে পিতার পরিত্যক্ত গদি জম্‌কাইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে পারে না। বাপ যখন হাতুড়ি পিটিত, তখন সে মাঠে মাঠে পদ্মার ধারে ধারে লাফাইয়া সময় কাটাইয়া ফিরিয়াছে। আজ কামারশালার অল্প-পরিসর স্থানটীর মধ্যে সে আপনাকে পোষ মানাইয়া রাখিতে পারে না। হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে কেবলই তা'র উদাস চক্ষু দুটী দিগন্তহারা মাঠের দিকে ছুটিয়া যাইতে চায়।

ফাগুনের বাতাসে-দোলা মটর ফুলটীর মত কখন সেই কিশোরী মেয়েটী আসিয়া ছোট মাটির ঘরখানির জানালাটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কামারের ছেলে বিশু মুখ তুলিতেই সে খিল খিল করিয়া একরাশ হাসির ফুল ছড়াইয়া ছুটিয়া পালায়। দুয়ারের কাছে আসিয়া বিশু ডাকিয়া বলে "বিদ্যুৎ শোন্—" একটু দূরে দাঁড়াইয়া বিদ্যুৎ বলে "কি বলনা—" "আজ পদ্মায় যাসনি—" "চলনা সাঁতার কেটে আসি"—উভয়ে নদীতে সাঁতার কাটিতে যায়। হাপরের আগুন গুমরিয়া গুমরিয়া নিবিয়া যায়।

ওপারের একটা জেলে,—সেদিন মেঘলা ঝড়ের বেলায় সকলে ডিঙি লইয়া পাড়ের দিকে চলিয়া গেল, সেই একা ফিরিল না। চঞ্চল ঢেউয়ের উপর ক্ষুদ্র ডিঙিটি নাচাইয়া সে আপন মনে বাহিয়া চলিল—লগিতে ঠেকিল যেন কি একটা শক্ত জিনিষ। একটু দূরে কি একটা কালো জিনিষ একবার উঠিল একবার নামিল। জেলে শিহরিয়া দেখিল বর্ষার মেঘের মত চুলভরা একটা মাথা। সে সেইদিকে লাফাইয়া পড়িল। অনেক কষ্টে একটী মেয়েকে ডিঙির উপর তুলিল। তাহার ভিজা কপালের চুলগুলি সরাইয়া সে করুণ সুরে বলিয়া উঠিল "আহা বাঁচ্‌বে কি!" দূরে ওপার হইতে বৃষ্টি নামিল। গাঁয়ের দিকে জেলে ডিঙি বাহিয়া চলিল।

বিশু সমস্ত পদ্মার পাড়টায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। একবার কুঁড়ে ঘরখানা, একবার মাঠ আর একবার নদীর ধার। এমনি সময় জেলের ডিঙি কূলে আসিয়া লাগিল। উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া বিশু জেলের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল "কোথায় পেলি একে!" "ভেসে যাচ্ছিল দূর গাঙে" "মিছে কথা—নিয়ে পালিয়েছিলি তুই ওকে এপার থেকে—" অতি সন্তর্পণে সে বিদ্যুৎকে নৌকার পাটাতন হইতে বুকের উপর তুলিয়া ধরিল। ধারার আর বিরাম নাই। জেলে অতি করুণকণ্ঠে বলিল "আমায় বিশ্বাস কর ভাই—আহা বাঁচ্‌বে কি!" বিশু তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিল "বিদ্যুৎ—"; কোন সাড়া নাই।

সকাল বেলা চেতনা ফিরিলে ভোরের প্রথম পদ্ম কলিটীর মত ধীরে ধীরে চোখ খুলিয়া বিদ্যুৎ দেখিল চারিটী উৎকণ্ঠা-ভরা চোখ তাহার মুখের দিকে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার ঠোঁটের কোণে ধীরে ধীরে ভোরের আকাশের মত হাসি ফুটিয়া উঠিল। দুইটা মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

নৌকাটী জলে ঠেলিয়া দিয়া জেলে লগিটী হাতে লইয়াছে এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া বিদ্যুৎ পিছন হইতে বলিল "ও ভাই—শোনো —"। জেলে পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিদ্যুৎ বলিল "তোমার ঘর কোথা" "ওই ওপারের গাঁয়ে—" জেলে হাত তুলিয়া দেখাইল। বিদ্যুৎ চোখ তুলিয়া সেদিকে চাহিয়া বলিল "উঃ, অনেক দূর! কি ক'রে যাবে ভাই।" হাসিয়া জেলে তাহার ডিঙিটী গভীর জলে ঠেলিয়া দিল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, বিদ্যুৎ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ঝাপসা বৃষ্টির মধ্যে ডিঙি আবছা হইয়া গেলে সে মুখ ফিরাইতেই পিছনে দেখিল বিশু। বিশুর মুখখানা ফ্যাকাসে আকাশের মতই অন্ধকার। বিদ্যুৎ হাসিয়া উঠিল। বিশু তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "তোকে না আস্‌তে ওর সঙ্গে মানা করেছিলাম বিদ্যুৎ—"। বিদ্যুৎ কিছু না বলিয়া বিশুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ বিশু তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে সে তাহার কম্পিত বাহু দ্বারা বিশুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আর ক'রব না ভাই।"

* * * *

জেলে বিদ্যুতের একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে নৌকা হইতে নামাইল। নদীর পাড় হইতে আঁকা-বাঁকা পথ গাঁয়ের ভিতর গিয়াছে। জেলের পাশে পাশে বিদ্যুৎ সেই পথ ধরিয়া চলিল। একটা পুকুরের পাড়ে জেলের ঘর। দরজায় আসিয়া জেলে বলিল, "রত্না দোর খোল—"। দরজা খোলা হইলে বিদ্যুৎ দেখিল তাহার অপেক্ষা দুই তিন বছরের বড় একটী মেয়ে জাল সেলাই করিতেছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিতে বিদ্যুৎ দেখিল তাহার চোখের দুটী পাতা বন্ধ। জেলে চুপি চুপি বলিল, "জানো বিদ্যুৎ এ আমার বউ। ও অন্ধ হয়ে গেছে!—" বিদ্যুৎ আস্তে আস্তে মেয়েটীর কাছে গিয়া বসিল। তাহার শণের মত জটা-ভরা চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "অন্ধ বলে' বুঝি তুমি এর কোন যত্ন করো না"? জেলে বলিল, "দিনরাত ত কাটে নদীর জলে,—"। অন্ধ মেয়েটীর মুখের উপর দিয়া একটা বিচিত্র রঙের প্রবাহ ভাসিয়া গেল। বিদ্যুৎ বলিল, "তোমার নাম কি ভাই?" মেয়েটী একখানি হাত বাড়াইয়া বিদ্যুতের হাত ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ম্লানকণ্ঠে জেলে বলিল, "কথা ত বল্‌তে পারে না—বোবা হয়ে গেছে যে অনেকদিন—"। বিদ্যুতের চোখের কোণে জল ভরিয়া আসিল। বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সে কহিল, "আহা এমন পোড়াকপাল তোমার!—"

দিন শেষ হইয়া আসিল। বিদ্যুৎ বলিল, "আমায় এবার ওপারে রেখে আস্‌বে চল—"। জেলে বলিল, "বেলা ত আর নেই, আজ নাই গেলে বিদ্যুৎ—কাল ভোরের আলো ফুট্‌তে না ফুট্‌তে তোমায় পার করে' দেব।" বিদ্যুৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না ভাই না—বিশু ভারি রাগ করবে—বকবে আমাকে, এতক্ষণ হয়ত মাঠে মাঠে আমায় খুঁজে সে পাগল হয়ে' গেছে" বলিতে বলিতে সে ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দরজার বাহিরে আসিল। রত্না তাহার হাতখানি কিছুতেই

ছাড়িতে চাহে নাই। তাহার ঠোঁটের উপর একটা চুমু খাইয়া বিদ্যুৎ বলিল, "আজকের মত ছেড়ে দে ভাই—আবার আস্‌ব।"

ঘাটে মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়াছে। হন হন করিয়া বিদ্যুৎ পথ চলিতেছিল এই সময় বিশু কোথা হইতে ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল! অন্ধকারে বিদ্যুৎ তাহার মুখখানা দেখিতে পাইল না। ভরা গলায় বিশু বলিল, "ওপারে জেলের ঘরে গিয়েছিলি নয় বিদ্যুৎ?" বিদ্যুৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ—" তাহার কথা আটকাইয়া গেল। বিশুর হাতে একটা বাব্‌লার ডাল ছিল। কোনো কথা না বলিয়া সে নির্দ্দয়ভাবে বিদ্যুৎকে প্রহার করিতে সুরু করিল!—বিদ্যুৎ কোন বাধা দিল না—কোন কথা বলিল না!—আঘাতে আঘাতে ডালটা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেলে বিশু পদ্মার পাড়ের দিকে নামিয়া গেল। অন্ধকারে বিদ্যুৎ মাটীর উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

একমাস নিরুদ্দেশ হইবার পর হঠাৎ একদিন দারুণ জ্বর লইয়া বিশু ঘরে ফিরিল। বিদ্যুৎ তখন কামারশালার একটা কোণে বসিয়াছিল। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বিশু তাহার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল। এই একটা মাসে বিদ্যুতের অনেকখানি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বিশু নিরুদ্দেশ হইবার পরদিন সে ঘাটে মাঠে তাহার অনেক নিস্ফল অনুসন্ধান করিয়া আঙ্গিনার ঘরে আসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল। সেই দিন বৃষ্টিঝরা বিষণ্ণ সন্ধ্যায়—কুটীরের দরজায় বসিয়া সে যেন সহসা আপনাকে চিনিতে পারিল। অন্তরের সে কি ব্যাকুলতা! প্রাণের সে কি আকুল ক্রন্দন!—বিদ্যুৎ অন্ধকারের দিকে দুই হাত প্রসারিত করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "ওগো—তুমি ফিরে এস—ফিরে এস—"। তাহার সমস্ত চাপল্য সমস্ত তারল্য—সেইদিন ভোজবাজীর মত উড়িয়া গেল। ওপারের জেলে ডিঙি লইয়া এপারে আসিত। কতদিন বিদ্যুৎ ভাবিয়াছে, না আজ আর গিয়া কাজ নাই, ওকে ফিরাইয়া দিই। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহার মনে পড়ে—কতদূরের পার হইতে—জেলে ডিঙা বাহিয়া আসিয়াছে কত না আশায় একটীবার তাহাকে লইয়া যাইতে—চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে রত্নার মুদিত চক্ষু দুটী ও করুণ মুখখানি—তখন পাড় বাহিয়া নামিয়া আসিয়া সে নৌকায় উঠিয়া বসে। ক্রমে তাহার কাজ হইয়া দাঁড়াইল বনে বনে বিশুর খোঁজ করা আর ঘাটের কাছে বসিয়া ওপারের ডিঙির অপেক্ষা করা। এমনি সময় একদিন বিশু ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিদ্যুতের সেবায় ও স্নেহে—বিশু মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইল। কুড়িদিন পরে সে বিদ্যুতের কাঁধে ভর দিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিল। বলিল, "বিদ্যুৎ, অনেকদূর থেকে তোমার প্রাণের ডাক শুন্‌তে পেয়েছিলুম।" বিদ্যুৎ কিছু বলিল না, ম্লান হাসি হাসিয়া তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

* * * *

সেদিন সন্ধ্যায় কাল মেঘ যেন রুদ্ধ কপাট খুলিয়া ঝড়কে ডাকিয়া লইয়া আসিল। পদ্মার জল ধ্বংসের আনন্দে উলঙ্গিনী মূর্ত্তিতে ছুটিয়া চলিল। ধপ্ ধপ্ করিয়া উঁচু পাড় ভাঙিয়া জলে পড়িতে লাগিল। ঘরের কোণে ছোট একটা মাটীর প্রদীপ জ্বলিতেছিল। ময়লা একখানা কাঁথার উপর বিশু ঘুমাইয়া আছে! ছোট জানালাটা খুলিয়া বিদ্যুৎ পলকহারা চোখে পদ্মার দিকে চাহিয়াছিল। গোঁ গোঁ করিয়া বাতাস ছোট ঘরখানিকে উড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। স্রোতের গর্জ্জন ক্রমে যেন কাছে আসিতেছে!—বিদ্যুতের মনটা হঠাৎ কেমন একটা অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। অন্ধকার পদ্মার সুদূর পরপারের দিকে চাহিয়া সে মনে মনে বলিল, ওরা আজ না জানি কেমন আছে!—অনেক দিন ওদের কোন খবর নাই। জেলে আর নৌকা বাহিয়া আসে না এপারে।

হঠাৎ একটা শব্দ হইল। কে যেন অতি ব্যস্তভাবে দুয়ারে ধাক্কা দিতে লাগিল। বিশু তখনও ঘুমাইতেছে। অতি সন্তর্পণে দরজাটা একটুখানি মুক্ত করিয়া বিদ্যুৎ দেখিল কে একজন লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—আকাশের চকিত আলোকে বিদ্যুৎ তাহাকে চিনিল। সে জেলে।—জেলে দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে আসিতে চাহিল!—তাহাকে বাধা দিয়া বিদ্যুৎ বলিল "না—চল আমি বাইরে যাচ্ছি।" দরজাটা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া সে জেলের হাত ধরিয়া একটু দূরে গেল। তাহার কেবলই ভয় হইতেছিল জেলে ঘরে ঢুকিলে বিশুর ঘুম ভাঙিয়া যাইবে। হয়ত কিছু একটা অনর্থ ঘটিয়া যাইবে তাহাতে। পাড়ের কাছাকাছি আসিয়া জেলে বলিল "ওপারের কাছে আজ বিদেয় নিয়ে এসেছি বিদ্যুৎ"। বিদ্যুৎ অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। হঠাৎ বলিল—"হুঁ"। জেলে বলিল "রত্নাকে চিতায় শুইয়ে এসেছি ওপারে,—এত জলেও সে চিতার আগুন হয়ত এখনো নিভে যায়নি।" চমকিয়া উঠিয়া বিদ্যুৎ বলিল "কি হয়েছিল রত্নার?" জেলে কথা বলিতে পারিল না। কি যেন একটা অব্যক্ত-ব্যথায়—তাহার গলা ধরিয়া আসিল। অনেক ক্ষণ পরে সে বলিল "জলে ডুবে গিয়েছিল।" তাহার চোখের কোণ বহিয়া অবিশ্রান্ত ধারা ঝরিতেছিল। অন্ধকারে বিদ্যুৎ তাহা দেখিতে পাইল না। তাহা না হইলে জেলে তাহার নিকট হইতে সত্য কথাটা গোপন করিতে পারিত না।

পিছনে একটা কালো ছায়া পড়িল। ফিরিয়া বিদ্যুৎ দেখিল বিশু টলিতে টলিতে স্খলিত চরণে সেই দিকে আসিতেছে। ছুটিয়া গিয়া সে তাহার হাত ধরিল। ভীতকণ্ঠে বলিল "ঘর ছেড়ে তুমি বাহিরে এসেছ এই দুর্য্যোগে?" বিশু কিছু না বলিয়া অদূরবর্ত্তী জেলের দিকে চাহিল। তাহার কোটর-গ্রস্ত চোখ দুইটী হিংসায় জ্বল জ্বল করিয়া উঠিল। বিদ্যুতের হাত ছাড়াইয়া সে তাহার দিকে আগাইয়া চলিল। হঠাৎ যেন তাহার দেহে দানবের শক্তি জাগিল, বিদ্যুৎ প্রাণপণ

শক্তিতেও তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। সেখান হইতে নদীর জল বেশি দূর নহে। অন্ধকারে তাহারা কেহই দেখিতে পায় নাই স্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে অনেকখানি স্থান লইয়া কখন ফাট ধরিয়াছিল। বিশু ছুটিয়া আসিয়া উন্মাদের মত জেলের গলা টিপিয়া ধরিল। সহসা পাশে একটা অস্ফুট শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে অনেকখানি পাড় ভীষণ শব্দে পদ্মার বুকে ভাঙিয়া পড়িল। শিহরিয়া তাহারা উভয়ে দেখিল বিদ্যুৎ নাই। ভাঙা গলায়—বিশু চীৎকার করিয়া উঠিল—"বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ—", জেলে জলে লাফাইয়া পড়িল।

তাহার পর অনেক দিন গিয়াছে। কচি রাঙা ঠোঁটের হাসির আলো ছড়াইয়া বিদ্যুৎ আর পদ্মায় কলসী ভরিতে আসে না। পদ্মার উচ্ছল ছল-ছল-ছলের সহিত তাহার কল কল ধ্বনি আর অমৃত রচনা করে না। বিশু আর পদ্মার পাড়ে পাড়ে ছুটিয়া ছুটিয়া ফেরে না। জেলে আর ওপারে ফিরিয়া যায় নাই। তাহার প্রতি যে হিংসা একদিন বিশুকে হিংস্র পশুর মত ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল আজ তাহা নিবিড় স্নেহে ঘনীভূত হইয়া গিয়াছে। উভয়ে তাহারা পদ্মার পাড়ে বসিয়া কাঁদে—সে আমাদের দুজনকে সমান ভালবাসত। দূরে সরিয়া গিয়া আজ সে এই মানুষ দুইটীর প্রাণের বন্ধন নিবিড় করিয়া দিয়া গিয়াছে। ভালবাসার পরশ-মণিতে তাহাদের মন সোনা হইয়া গিয়াছে। পাড়ের কাছে আসিয়া পদ্মা যখন মৃদু গুঞ্জন করিতে থাকে বিশু তখন "বিদ্যুৎ—বিদ্যুৎ"—বলিয়া জলে ঝাপাইয়া পড়িতে চায়। জেলে তাহাকে পিছন হইতে টানিয়া বলে "কোথায় যাচ্ছিস ভাই—সে ত ঘরেই আছে—" উভয়ে গলা জড়াজড়ি করিয়া কাঁদে!—

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণের টান।

উষার আলোক ভিজায় পালক, উথ্‌লে জাগে প্রাণ;
পাখীরা গায় গান।
বাতাস ভরা সুবাস লাগে মৌমাছিদের চাকে;
মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে।
পাখার টানে ফুলের পানে ছুটে গিয়ে জোটে;
টাট্‌কা মধু লোটে।
গানের নেশায় মধুর তৃষায় দোলে আমার পাখা—
বিশ্ব মধুমাখা।

মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জীবন ও দুঃখ

একদল সুখবাদীর কথা কানে আসে যাঁহারা অনবরতই বলিয়া থাকেন যে সবই সুখ, দুঃখও সুখেরই নামান্তর মাত্র অথবা সুখেরই সোপান। সুতরাং সর্ব্বত্রই সুখ, দুঃখ বাস্তবিক নাই-ই। এই ভাবের তরল ভাবুক সম্প্রদায়ের সুখবাদের সঙ্গে মেটারলিঙ্কের আনন্দবাদের কোনও সম্পর্ক বা সাদৃশ্য নাই। অদৃষ্টপ্রেরিত সকল দুঃখকে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াই আনন্দবাণী প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই বাণী প্রচার করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "......আবার আমি এই কথাই বলিতেছি যে, দুঃখকে আমরা ছাড়িতে পারি না, কারণ দুঃখ চিরকালই থাকিবে; তবু দুঃখ আমাদের অন্তরে যে কি লইয়া আসিবে (আশীর্ব্বাদ, না অভিশাপ) সেইটা আমাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে।" এই দুঃখ হইতে কোনো মানবেরই পরিত্রাণ নাই। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন, সত্য বলিতে গেলে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও অবশ্যই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। তিনি দুঃখ পাইয়া থাকেন, এই দুঃখ পাওয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিরই একটা অংশ। বোধ হয় তাঁহাকে অনেকের চেয়ে বেশী কষ্টই পাইতে হইবে, কেন না তাঁহার প্রকৃতি অনেকের চেয়ে অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তিনি মানবজাতির নিকটতর (আত্মায়) বলিয়াই তাঁহার বেদনা অধিক ও তীব্র হইবে, কারণ বিশ্বজগতের দুঃখ তখন তাঁহার দুঃখ হইয়া উঠিবে। তাঁহাকে দেহে মনে নানা দুঃখভোগ করিতে হইবে* কিন্তু অজ্ঞানে দুঃখভোগ ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া দুঃখ ভোগ করার মধ্যে বিশাল অর্থগত ব্যবধান রহিয়াছে। প্রমিথিউস (Prometheus) খৃষ্ট ও বোধিসত্ত্বের আর সাধারণ মানবের দুঃখগত বিভেদ ও স্বাতন্ত্র্য কতখানি তাহা একটু ভাবিলেই বোঝা যায়।

যিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, এই দুঃখভোগের মাঝ দিয়াই তিনি আপন অন্তরের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন। দুঃখের যে মহতী বাণী, তাহার যে কল্যাণরূপ তাহাকে তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া বরণ করিয়া লইতে ভুলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্তর্দৃষ্টি জীবনের তৃতীয় স্তরেই বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, যিনি এই অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী তিনি সকল সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া একমাত্র কল্যাণকেই বরণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয় স্তরের এই অন্তর্জ্জীবন তখনই আরম্ভ হয় যখন মানবাত্মা কল্যাণকে বরণ করিয়া লয়।† একমাত্র

---

* Wisdom & Destiny Sec. 39.

† Wisdom & Destiny Sec. 36.

দৈহিক যন্ত্রণার কথা ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোনও দুঃখ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকে স্পর্শ করিয়া চঞ্চল করিতে পারে না। যত প্রকারের মানস দুঃখ আছে সেগুলি আমাদের মনে নানা চিন্তা, নানা কল্পনা, নানা ভয় ও উদ্বেগকে জাগাইয়া তুলে বলিয়াই মানব চঞ্চল হইয়া পড়ে; কিন্তু যিনি প্রকৃত কল্যাণদর্শী হইয়াছেন তিনি দুঃখকে কখনও এমনভাবে গ্রহণই করেন না যাহাতে কোনও অনুতাপ বা আক্ষেপ আসিতে পারে। তাঁহার দুঃখভোগও কল্যাণকেই ধরিয়া থাকিবার জন্য বলিয়া, তাঁহার সকল দুঃখ অন্তরের পবিত্র আলোকে নবীন সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয় এবং কল্যাণ-বোধকেই আরও তীব্র করিয়া দিয়া যায় মাত্র। সেই জন্য দুঃখ-বেদনার মাঝেও পরম গৌরব-বোধ তাঁহার অন্তরচেতনাকে আনন্দলোকের দিকেই সম্প্রসারিত করিয়া দিতে থাকে।

দুঃখের মূল্য ও অর্থ

জীবনে দুঃখ আসে কি না, দুঃখ অপরিহার্য্য কি না, এগুলি জীবন সম্বন্ধে বড় বেশী প্রয়োজনীয় প্রশ্ন নয়; কথা হইতেছে দুঃখের মূল্য ও অর্থ লইয়া। দুঃখ সত্য সত্যই আমাদের উপর একটা নিষ্ঠুর অত্যাচার মাত্র, অথবা সত্য আদর্শের প্রাপ্তির সহিত ইহার কোনও যোগ আছে ইহাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। কিন্তু যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় দুঃখের মূল্য-নির্দ্দেশ সম্ভব নয়; যদি দুঃখের বাস্তবিক কোনও নৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও প্রভাব থাকে, তবে তাহার সত্যাসত্য বিচার অন্তরের অনুভব দিয়াই করিতে হইবে। যুক্তি বা প্রজ্ঞার বিচারকে মেটারলিঙ্ক সম্রাটের আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি বলেন, যে যাহাই বলুক না কেন, ক্ষুদ্রতম ঘটনাটি আসিয়া তাহাকে (মানবকে) এই কথাটি সত্বরই বুঝাইয়া দেয় যে যুক্তি তাহাকে আশ্রয় দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ তত্ত্বতঃ মানুষটি যুক্তির জীব নয়—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু।*

দেখিতে হইবে দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? মেটারলিঙ্কের মুখে শুনিতে পাই যে দুঃখ-দুর্দ্দশার সর্ব্বপ্রথম কর্ম্ম হইতেছে মানবজীবনের প্রকৃত গভীরতার পরখ করা। উহাই আমাদের জীবনকে যাচাই করিয়া লওয়ার কষ্টিপাথর। প্রেম ও কল্যাণবোধ কতখানি বিকাশ-লাভ করিয়াছে, কল্যাণকে বরণ করিয়া লইবার জন্য শক্তি-সংগ্রহ কতখানি হইয়াছে, দুঃখই আসিয়া তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। দুঃখ বস্তুটি তাঁহার মতে পাপের পরিণামও নহে, পুণ্যের পুরস্কারও নহে। দুঃখ কেবল দর্পণের মত আসিয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপটিকে দেখাইয়া দেয়। যিনি মহৎ তিনি মহৎ বলিয়াই কত বিরাট দুঃখকে আলিঙ্গন করেন, আবার অন্য আর একজন অন্তরে প্রচুর শক্তি সংগ্রহ করিতে না পারিয়াই দুঃখকে কত প্রকারে এড়াইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে থাকেন। এই দুঃখ কখনও দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে একই ভাবে স্পর্শ করিতে পারে

* Wisdom & Destiny sec. 43.

না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আপনাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে দুঃখকে বিভিন্ন মূল্যে ও অর্থে গ্রহণ করিয়া আপন পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। খৃষ্ট ও চোর উভয়েই নাকি পাশাপাশি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিল শোনা যায়; মহাত্মা গান্ধীও উপবাস-ক্লেশকে বরণ করিয়াছিলেন আর এই হতভাগ্য দেশের বহু অধিবাসীও অনশনক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। কাপুরুষও দুঃখভোগ করে, আবার যিনি বীর তিনিও দুঃখ প্রাপ্ত হন, কিন্তু এই উভয়ের দুঃখের মূল্য ও মর্য্যাদায় কত পার্থক্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই জন্যই যাহার জীবনে মহৎ চিন্তা ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই তাহার দুঃখও কখনও মহৎ হইতে পারে না।

আনন্দ কিসে?

দুঃখের থাকা না থাকা লইয়া বিচার নয়; সন্ধান হইতেছে সেই বস্তুটীর যাহার জন্য মানব দুঃখকেও হেলায় স্বীকার করিয়া লইতে পারে। অন্তরের সে কোন্ সম্পদ্ যাহার জন্য মানব তীব্রতম দুঃখের মূল্য দিতেও পশ্চাৎপদ হয় না! মেটারলিঙ্ক বলেন উহা আর কিছুই নয়, অন্তরের মর্য্যাদাবোধ। যেখানে যাহার মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত, সেইখানেই তাহার সমস্ত আনন্দ নিহিত। বীরের আনন্দ বীরত্বের মর্য্যাদাটুকু রক্ষা করিয়া চলার মধ্যে হেলায় সে বৃহত্তম বিপদ্‌কে বরণ করিয়া লইতে পারে কিন্তু আপনার বীরমর্য্যাদায় কলঙ্কের রেখাপাত হইতে দিতে পারে না। প্রেমিকের মর্য্যাদা আপনার প্রেমের দেবতার আসনটি অটল রাখার মধ্যে; প্রেমের অপমান তাহার নিকট অসহনীয়। এই সব মর্য্যাদাবোধের মূলে হইতেছে মানুষের মনুষ্যত্ববোধের মর্য্যাদা; সেই মর্য্যাদাটুকুর মধ্যে মানবের অপরিসীম আনন্দ; সেই আনন্দের নিকট কোন দুঃখই দুঃখ নয়। এই আনন্দের দিকেই মেটারলিঙ্ক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই আনন্দের জন্যই সামান্য সুখ হইতেও দুঃখ যে উচ্চতর মূল্যে বিকাইয়া যায়, প্রেমিকের দৃষ্টান্ত লইয়া মেটারলিঙ্ক তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রেমিক যখন প্রেমাস্পদকে হারাইয়া গূঢ় বেদনা-দহনে দগ্ধ হইতে থাকেন, তখনকার সেই দাহ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য প্রেমিক কখনও তুচ্ছ তরল সুখস্রোতে ভাসিতে চাহেন না; তাঁহার অন্তরে প্রেমের গভীরতা ও মহত্ত্ব দুঃখকে এমনই মহিমাময় করিয়া তোলে যে সামান্য সুখ সে গৌরব কল্পনাও করিতে পারে না। টেনিসন একদিন বন্ধুবিয়োগের সুতীব্র বেদনার মধ্যে এই আনন্দেরই আভাস পাইয়া বলিয়াছিলেন যে কখনও না-ভালবাসার চেয়ে ভালবাসিয়া হারানও ভাল। এইজন্য মেটারলিঙ্ক বার বার করিয়া বলিয়াছেন যদি আনন্দ চাও, যদি অদৃষ্টকে জয় করিতে চাও, অন্তরে গভীর হও, প্রেম ও কল্যাণের সাধনা কর, ন্যায়বোধকে প্রেমের দ্বারা উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা ক

অদৃষ্ট-জয়

অনেকে কিন্তু মনে করেন, যতই বলা হোক দুঃখ যখন ভোগ করিতেই হইতেছে, মৃত্যুকে যখন ফাঁকি দেওয়ার কোনই কৌশল আজও কেহ আবিষ্কার করিতে পারিল না, তখন অদৃষ্টেরই জয় জয়কার বলিতে হইবে। মেটারলিঙ্ক এই মত সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। মনে করা যাক্, বেত্র ব্যবহারে সুদক্ষ পণ্ডিত মহাশয়ের হাতে একটি দুষ্ট ছেলে আসিয়া পড়িয়াছে। একদা এই পণ্ডিত মহাশয় আপনার অসীম ক্ষমতা সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্রকে নিজের কান ধরিয়া নাকে খত দিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র দুষ্টই হোক্ আর যাই হোক্ অপমানবোধ তাহার অতি তীব্র, সে তাই পণ্ডিত মহাশয়ের এই সস্নেহ প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া এমনই বাঁকিয়া দাঁড়াইল যে বেত্রদণ্ড তাহার উপর ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহার হাতটাও যেমন নির্দ্দিষ্ট কর্ণের দিকে এক ইঞ্চি অগ্রসর হইল না, নাকটাও তেমনি একটুও ধরণী-সংস্পর্শের আগ্রহ দেখাইল না। এমত অবস্থায় সেই দুষ্ট ছাত্রের প্রবল অসম্মতিই কি নীরবে মহামান্য পণ্ডিত মহাশয়কে পরাজিত করিল না? অথচ পণ্ডিত মহাশয় কি-ই না করিলেন! সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাহিরের জয়টাই জয় নয়, বাহিরের শক্তিটাও শক্তি নয়। যাঁহারা দুঃখকে, এমন কি মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিয়া অন্তরের প্রেম ও কল্যাণবোধটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করেন তাঁহারাই জয়ী। অনেক সময় অদৃষ্টের তাড়নে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সফোক্লিসের য়্যান্টিগোনের (Antigone) মত মৃত্যু স্বীকার করিতে হয় সত্য, কিন্তু ইহার মধ্যে আপনাকে খর্ব্ব করিবার হীনতা যে নাই, ইহা যে কল্যাণকে অনাহত রাখিবার জন্য, এই চিন্তার মধ্যেই পরম সান্ত্বনা ও আনন্দ নিহিত রহিয়াছে। বাহ্যত অদৃষ্টের পদানত হইয়াও বলিষ্ঠ আত্মা এইভাবেই অদৃষ্টের উপর স্বীয় প্রভুত্ব প্রচার করিয়া যায়। বড় বড় আত্মোৎসর্গকারী মহাপুরুষ (martyr) এই আনন্দের সন্ধান পাইয়াই, মৃত্যুসমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। তাঁহাদের অচঞ্চল অন্তর্দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখ দেখিয়া পলক ফেলে নাই। গেটের মার্গারেট, সেক্সপীয়রের ওফিলিয়া এই অন্তর্দৃষ্টির অভাবে যথার্থ কল্যাণকে বরণ করিতে পারিল না, কিন্তু সফোক্লিসের য়্যান্টিগোন অপূর্ব্ব মহত্ত্ব ও অন্তর্দৃষ্টির ফলে মৃত্যুস্বীকার করিয়াও অদৃষ্টকে জয় করিতে সমর্থ হইল।

কর্ম্ম ও নৈতিক জীবন

দুঃখের মধ্যে যেমন মানবহৃদয়ের গভীরতার পরীক্ষা, আনন্দে তেমনি আবার মানব-মহত্ত্বের পূর্ণ অভিষেক ও পুরস্কার। অন্তর্দৃষ্টির সুস্পষ্টতার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দলোকের উজ্জ্বলতর প্রদেশগুলি মানব অনুভবের মধ্যে আসিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু মেটারলিঙ্ক বলেন যে কেবল ভাবনা ও নানা রকমের চিন্তার দ্বারা কখনও অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয় না। প্রকৃত কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানই শুধু

মানবাত্মাকে আনন্দলোকের দিকে অগ্রসর করিতে পারে। এই জন্যই চিন্তাশীলতা হইতে কর্ম্মশীলতাই হইতেছে সাধনার প্রধান অঙ্গ, অর্থাৎ চিন্তা ও কল্পনার জীবন অপেক্ষা সত্যকার নৈতিক জীবন বা কর্ম্ম জীবনই আনন্দ লাভের উপায় ইহাই মেটারলিঙ্কের বক্তব্য।* এই জন্য তিনি একস্থলে বলিতেছেন, নৈতিক উন্নতির বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠাই জীবনের প্রকৃত চেতনালাভের বা জাগরণের লক্ষণ।† চিন্তা ও সঙ্কল্প জীবনে স্থায়িভাবের কোন চিহ্নই রাখিতে পারে না, প্রকৃত কর্ম্মের দ্বারাই জীবন তাহার সত্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অনেক সময় গভীর চিন্তা ও কল্পনা আমাদিগকে একটা কৃত্রিম চেতনা দান করে; মিথ্যাই মনে হয় যেন আমরা জীবনের কোন উচ্চস্তরে বিচরণ করিতেছি কিন্তু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্ম্মের সুকঠোর বিচার একদিন আমাদিগকে আমাদের সত্যকার স্থিতিভূমি কোথায় সেই সম্বন্ধে সকরুণ সংবাদ দিয়া যায়। কল্পনায় আমরা সহজেই বীর সাজিয়া কথায় হাতী মারিতে ও রাজ্য গড়িতে পারি কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা আপনার ব্যক্তিত্ব ও মহত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে প্রকৃত শক্তির প্রয়োজন হয়, তখন আর তলোয়ারে পাঁঠার রক্ত মাখিয়া বীরত্বের অভিনয় চলে না। কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলেই শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় এবং শক্তি-প্রয়োগ করিতে গেলেই কিছু না কিছু নৈতিক চেতনার বিকাশ আরম্ভ হয় এবং সত্যকার জীবনটি গঠিত হইয়া উঠিতে থাকে। এখন দেখিতে হইবে যে এই নৈতিক জীবন বা কর্ত্তব্য-প্রতিষ্ঠা বলিতে কি বুঝি।

কর্ত্তব্যের কথা মনে হইলেই অনেকের চোখে মুখে এমন একটা ভাব আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে যে সেটাকে আর যাহাই বলা যাক্ আনন্দ বলা চলে না। হাসি উৎসবের মাঝে আনন্দ আছে কিন্তু কর্ত্তব্যের মাঝে যেন কোনও আনন্দ নাই, উহা যেন নীরস শুষ্ক। আনন্দে চোক মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, আর কর্ত্তব্যের কথা মনে হইতে না হইতেই সে ঔজ্জ্বল্য মিলাইয়া গিয়া তাহা শ্রাবণ দিবসের ঘনাচ্ছন্ন গাম্ভীর্য্যে পরিণত হয়। তাই কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কর্ত্তব্যকে বরণ করিতে গিয়া Stern Daughter of God বলিয়া আবাহন করিয়াছেন। বস্তুতঃ কর্ত্তব্য বস্তুটা বাধ্যতামূলক এবং সেই জন্যই কর্ত্তব্যপ্রতিষ্ঠা বলিতেই আমরা উহাকে অনেক সময়ই সুখ-বিসর্জ্জন বলিয়া মনে করিয়া থাকি।

ত্যাগ ও জীবনের প্রকৃত আদর্শ

মেটারলিঙ্কের মতে প্রকৃত সুখবিসর্জ্জন জীবনের আদর্শ হইতেই পারে না। কারণ প্রকৃত সুখ বা আনন্দেই যখন জীবনের সার্থকতা, তখন সেই আনন্দকে বলি দেওয়া আদর্শের বিরোধী হইয়া

* "Happiness is a plant that thrives far more readily in moral than in intellectual life."—Wisdom and Destiny Sec. 53.

† Wisdom and Destiny · Sec. 53 cf. Life and Flowers (Our Anxious Morality. Sec. 16) p. 111,

দাঁড়ায়। তবে ইহা সত্য যে অন্তরের গভীরতা ও চেতনার প্রসাদ লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুদ্র সুখের আকর্ষণ কমিয়া যায় এবং তখন মানব কতকটা সুখ ত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু এই ত্যাগ হইল বাহ্য দৃষ্টির কথা; বাস্তবিক স্বেচ্ছাকৃত ত্যাগ গভীরতর আনন্দময় সত্তারই সন্ধানে। এই জন্য এই সুখত্যাগের মধ্যে কোন বিষাদ-বেদনা নাই। ইহা আনন্দশ্রী মণ্ডিত। শিশু যেমন আপনার অজ্ঞাতে এক খেলা ছাড়িয়া অন্য খেলায় মগ্ন হইয়া যায়, তেমনি মানবও ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ করিয়া মহত্তর আনন্দ-বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। সুখত্যাগ বস্তুটা অভাবাত্মক; অভাবাত্মক সাধনার দ্বারা কখনও অগ্রসর হওয়াই যায় না যদি সেই অভাব কোন ভাবাত্মক বস্তুরই ইঙ্গিতে ও আকর্ষণে সার্থক না হয়। যদি কেবলই পথ ছাড়িতে থাকি তবে পথ ছাড়াই সার হইবে, কিন্তু কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর না হওয়া পর্য্যন্ত লক্ষ্য একটুও নিকট হইতে পারে না। তাই 'অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী'র মুখে 'ধ্রুবটাকে মানিনে' যখন শুনিতে পাই তখন আমরা 'ছাড়তে ছাড়তে পাই' যে কি তাহা বুঝিতে পারি না, একটা কথা লইয়া কবি হেঁয়ালী সৃষ্টি করিতেছেন ইহাই মনে হয়। * মেটারলিঙ্ক এই জন্যই বলেন, 'অন্তর্দৃষ্টির পরম প্রচেষ্টা এই জীবনের মাঝে স্থির আনন্দবিন্দুটিকে আবিষ্কার করা; সুখ বিসর্জ্জন ও দুঃখ বরণের মধ্যে এই স্থিরবিন্দুটির অন্বেষণ করা আর মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা একই কথা'।†

জীবনে দুঃখের স্থান

কেহ কেহ যেমন সুখবিসর্জ্জনকেই নৈতিক জীবনের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে করেন, তেমনি আবার কেহ কেহ দুঃখবরণের ভ্রান্ত আদর্শকেই জীবনের সত্য সার্থকতার উপায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেইজন্য নানাভাবে অর্থহীন দুঃখকে ডাকিয়া আনা এবং যত প্রকারে পারা যায় সুখকে বিদায় দেওয়াকেই তাঁহারা আদর্শ-জীবনের লক্ষণ মনে করিয়াছেন এবং ইহাকে তপস্যা মনে করিয়া চিত্তকে স্বর্গসুখের বাধাহীন কল্পনায় মুগ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু চেতনাকে সম্প্রসারিত ও চিত্তকে জাগ্রত করিতে হইলেই যে দুঃখের আঘাত প্রয়োজন ইহা একটা ভ্রান্তিমাত্র। মেটারলিঙ্ক বলেন জ্ঞানের স্ফুরণেই চেতনার গভীরতা ও ব্যাপ্তিলাভ হয়, দুঃখের আঘাত ইহার সত্য কারণ নয়। তবে ইহা সত্য যে জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন দুঃখকে স্বীকার করিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য সাধনের একমাত্র পথ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তা-বলিয়া দুঃখ ভোগ করাই যে একটা পুরুষার্থ তাহা স্বীকার করা যায় না। অনেক সময়ই আমাদের অক্ষমতা ও অলসতা আমাদিগকে দুঃখ স্বীকার করিতে বাধ্য করে। সফোক্লিসের য়্যান্টিগোন, চন্দ্রশেখরে প্রতাপ, চরিত্রহীনে সাবিত্রী, ইহারা সকলেই আপন অন্তরের বিশাল মহত্ত্ব, মর্য্যাদা ও শক্তিবোধের ফলেই দুঃখদেবতার নিকট আত্মোৎসর্গ করিল সত্য, কিন্তু সাধারণ মানব

* দ্রঃ ফাল্গুনী (রবীন্দ্রনাথ)

† Wisdom & Destiny Sec. 55.

অক্ষম বলিয়াই, ব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ড কঠিন নয় বলিয়াই, দুঃখের নিকট নত হইতে বাধ্য হয়। এই নত হওয়া উৎসর্গ নয়, দাসত্ব; এবং দাসত্বের মতই ইহা মানবাত্মাকে ম্লান করে, তাহার মহত্ত্বকে নষ্ট করিয়া নৈতিক অবনতির দিকে, শক্তিহীনতার দিকে ধাপে ধাপে নামাইয়া দিতে থাকে। কেবল উদ্দেশ্যহীন দুঃখবরণ জীবনের সুন্দরতম শক্তিগুলিকে উপবাসে রাখিয়া ক্ষীণ করিয়া ফেলিতে থাকে, এবং এই ত্যাগের ফলে হৃদয় ও জীবন বিফল হইয়া যায়। যে তপস্যা কেবল তপস্যারই গৌরববৃদ্ধির জন্য সেই তপস্যা ও ত্যাগ জীবনকে আনন্দহীন ও খর্ব্ব করিতে থাকে মাত্র।

মেটারলিঙ্কীয় আনন্দ

আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়াই জীবনের প্রকৃত ধর্ম্ম। তাহা হইলে দুঃখ স্বীকারের মধ্যেও আনন্দ আছে বলিতে হয়। এই আনন্দবস্তুটি যে সাধারণ সুখ নয় তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক আমরা যাহাকে সুখ বলি তাহা চঞ্চল ও ক্ষণিক, বিদ্যুৎ ঝলকের মত 'বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে'। কিন্তু যে সুখ চেতনাকে তীব্র ও গভীর অনুভবে মগ্ন করিয়া দেয়, যে সুখের মধ্যে একটি পরমপ্রশান্ত গাম্ভীর্য্য রহিয়াছে, যাহার মধ্যে মানবাত্মা আপনাকে পরিপূর্ণ বলিয়া অনুভব করে, তাহাকেই মেটারলিঙ্ক আনন্দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে সাধারণ সুখেরই নামান্তর বা পরিমাণগত একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র বলা যাইতে পারে না। কল্যাণ সাধনে যে তৃপ্তি, প্রেমের আত্মোৎসর্গে যে বেদনাগভীর সান্ত্বনা ও শান্তি তাহাকেই মেটারলিঙ্ক আনন্দবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং ইহার মূলে যে মানব-অন্তরের মর্য্যাদা-বোধ রহিয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

জীবনাদর্শ ও মৃত্যুরহস্য

অত্যন্ত জোরের সহিত মেটারলিঙ্ক বারবার এই কথাটিই বলিতে চাহিয়াছেন যে, আনন্দ একমাত্র কল্যাণ সাধনেই সম্ভব হইতে পারে; এইজন্য নৈতিকবোধের সুস্পষ্টতা, নৈতিকজীবন প্রতিষ্ঠা এগুলিই হইতেছে মনোযোগ দিয়া বুঝিবার বিষয়। দেখিতে হইবে বাস্তবিক কল্যাণই বা কি এবং নৈতিক বোধই বা কি? যিনি যতই বলুন না কেন, জীবন আদ্যন্ত ত কাহারও নিকটই প্রত্যক্ষ নয়। যাহার অগ্রপশ্চাৎ চিরান্ধকার-সমাচ্ছন্ন, যে জীবনের কোনও ভিত্তিই নাই বা অন্ততঃ পাওয়া যায় না, তাহাতে কল্যাণপ্রতিষ্ঠার ত কোনই অর্থ নাই, এই বলিয়া কেহ কেহ যে একটা প্রশ্ন তুলিতে পারেন ইহা সত্য; আবার কেহ কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে কল্যাণ বলিয়া নৈতিক জীবন বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, সুতরাং উহা একটা অসম্ভব কথা, কোনরূপ মঙ্গলের অভিমুখে এই বিশ্ব চলিতেছে না।

প্রশ্ন কয়টি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। কারণ যে নৈতিক চেতনাকে মেটারলিঙ্ক জাগ্রত মানব জীবনের বিশেষ লক্ষণ বলিয়াছেন তাহার যদি কোনও ভিত্তি, কোন অর্থই না থাকে তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত মতবাদই অর্থহীন হইয়া পড়ে; এইজন্য মেটারলিঙ্ক বিশেষভাবে জীবনের নৈতিকমূল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনিও জীবনের আদ্যন্ত যে অজ্ঞেয় রহস্য-সমাচ্ছন্ন তাহা অস্বীকার করেন নাই। একদিকে জন্ম অপর দিকে মৃত্যু! এই দুই মহারহস্যের মাঝখানে জীবন তাহার চঞ্চল লীলাভঙ্গী লইয়া এই যে আকাশ বাতাসে হিল্লোলিত হইয়া চলিয়াছে ইহা একটি অপরূপ বিস্ময়ের সামগ্রী বটে। যুগযুগান্তর ধরিয়া মানব এই জীবন রহস্যকে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে নচিকেতার মতই যম ভবনে অতিথি হইতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু দুঃখ ও আশঙ্কার বিষয় এই যে উত্তর লইয়া আজও পর্য্যন্ত কেহই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন না। সকলেই যে এই জগদ্ব্যাপী পরমাত্মীয়দের বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন সেটা সম্ভব নয়; তাই অনুমান হইতেছে যে খবর বোধ করি ভাল নয়, তাই আর কেহই দুর্ম্মুখ হইয়া ফিরিতে চাহেন না। কেহ কেহ ইহাও বলেন যে বোধ হয় সেখানকার আতিথ্য-সৎকারে ফলারের বাহারটা খুবই বেশী, ইহাই এই সুদীর্ঘকালব্যাপী বিস্মৃতির কারণ। ফলে কারণ যাহাই হোক, উত্তর যে পাওয়া যাইতেছে না ইহাই ভাবিবার কথা।

বাস্তবিক মৃত্যুরহস্যের কূল না পাইয়া এই কথাই ভাবিতে ইচ্ছা হয় যে জীবনের একমাত্র অর্থ ও পরিণতি মৃত্যু।* মনে হয় বিনাশই অস্তিত্বের পরিণাম। কিন্তু যতই মনে হোক্ ইহা মনে করিয়া চিত্তের বিরাম নাই; কারণ এই মনে হওয়াটা একটা আশঙ্কাজনক কল্পনা মাত্র, ইহার মধ্যে নিশ্চয়তা কোথায়? প্রথমতঃ এই মৃত্যুই জীবনের শেষ, হাসি-কান্না চাওয়া-পাওয়া দরশ-পরশ সবই একটা ছায়াবাজি, অন্তে সবই অন্ধকার ফক্কিকার, এই ধারণা লইয়া জীবনে স্বস্তি থাকে না, ইহা লইয়া বাঁচিয়া থাকা চলে না। দ্বিতীয়তঃ মানববুদ্ধি, মানব অনুভব আজও পর্য্যন্ত মৃত্যু সম্বন্ধে কোন নিশ্চিন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং মৃত্যুর নাম করিয়া একটা বৃথা অন্ধ ধারণায় জীবনকে নৈরাশ্যময় করিয়া তোলা হৃদয়ানুমতও নয়, যুক্তিবিচারসঙ্গতও নয়। ব্যক্তির অমরতা সম্বন্ধে মেটারলিঙ্ক বলেন, 'হইতে পারে যে আমাদের স্নায়বিক শক্তির কতকটা হয়ত বিনাশের হাত এড়াইয়া যাইবে'।† যাহা অজ্ঞাত তৎসম্বন্ধে একটা ভীতিমাখা কল্পনা না করিয়া আশাপ্রদ ধারণা করাই বরং স্বস্থ জীবনের লক্ষণ।‡

---

* Buried Temple (Evolution of Mystery Sec. 6).

† Buried Temple (Evolution of Mystery sec. 21).

‡ **Life and Flowers (Immortality.)** মাসিক 'সাহিত্য' ২৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর অনুবাদিত 'অমরতা' প্রবন্ধে আমরা মেটারলিঙ্কের মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা পদ্ধতির ধারাটি পাই। পরবর্ত্তী রচনায়—'আমাদের অমরতা,' 'ঝড়ের মাতন' 'পার্ব্বত্যপথ' 'অজানা অতিথি' এবং 'পরম রহস্য' এই কয়খানি গ্রন্থে—মানবব্যক্তিত্ব ও মৃত্যু, পরলোক ও জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে মেটারলিঙ্ককে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা

জীবনবিচারের দুইটি দিক

তথাপি মেটারলিঙ্কের ইহাও অগোচর নাই যে একদিক হইতে বিচার করিতে গেলে এই জীবন নিতান্ত অর্থহীন বলিয়াই মনে হইতে পারে। জীবনকে দুইটি বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করা চলে—এক, বিশ্বশক্তির দিক হইতে, আর দুই, ব্যক্তিগত অনুভবের দিক হইতে। বিশ্বশক্তির বিপুলতার দিক হইতে বিচার করিলে এই ক্ষুদ্র মানবজীবনকে অর্থহীন না বলিয়া উপায় কি ? সমগ্র বিশ্বস্থষ্টির অসীম বিস্তারের দিকে চাহিলে এই ক্ষুদ্র মানবজীবন কত ক্ষণিক, কত তুচ্ছ ! মেটারলিঙ্ক বলেন 'ইহা সত্য, ইচ্ছা করিলে ইহাকে সব চেয়ে নিশ্চিত সত্য বলা যাইতে পারে যে, আমাদের জীবনটা কিছু নয়; আমাদের প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ; আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের এই ধরণীর অস্তিত্ব এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র —বিশাল মরু-বক্ষে একটা বালুকণার নড়া চড়ার চেয়েও ইহার গতি তুচ্ছ! কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দিক হইতে দেখিলে বলা যাইতে পারে যে আমাদের নিকট আমাদের জীবন, আমাদের ধরণী সব চেয়ে গুরুতর, এমন কি বিশ্বজগতে ইহাই আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ঘটনা। এখন এই দুইটি সত্যের মাঝে কোন্‌টা বেশী সত্য ? একটি সত্য হইলেই কি অন্যটির সত্য হওয়া অসম্ভব! * এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই মূল কথার মীমাংসা নির্ভর করিতেছে।

মেটারলিঙ্ক বলেন, ইহার উত্তর আমরা ঠিক জানি না। বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য; একথা জোর করিয়া বলিতে পারি না, বিশ্বপ্রকৃতি আমাদের জাতি ও জীবনের প্রতি কোনও লক্ষ্য রাখে কি না। সুতরাং ঠিক কিছুই না জানিয়া জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া অসঙ্গত। জীবনের প্রতি আমাদের এই যে মর্ম্মান্তিক আকর্ষণ হয়ত ইহাই আমাদের বাঁচিয়া থাকার স্বপক্ষে সব চেয়ে বড় যুক্তি। এই জন্য তাঁহার মতে যতদিন জীবন সম্বন্ধে আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতেছি, ততদিন জীবনকে সত্যভাবে উপভোগ করিবার চেষ্টা করাই উচিত। জীবনের অন্তিম অর্থ না জানিয়া তাহার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।

ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

করিতে দেখিয়াছি। মৃত্যুর পরও ব্যক্তিত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যদিও তিনি নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, তথাপি মানব যে আনন্দলোকের যাত্রী এবং তাহার ব্যক্তিত্ব যে অসীমেরই একটি অংশমাত্র এই কথাটি বিশেষ করিয়াই বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফলতঃ মেটারলিঙ্ক অজ্ঞেয়বাদের উপর ভিত্তি করিয়াই একটি অপূর্ব্ব আশাময় আনন্দবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং হিন্দুসাধনার দিকে তাঁহার বিশ্বাসটি ব্যক্ত করিয়াছেন।

* Buried Temple (Evolution of Mystery sec. 7.)

প্রায়শ্চিত্ত

এক

শ্রাবণের সন্ধ্যা।—টিপ্ টিপ্ করিয়া অবিশ্রান্ত ধারাপাত হইতেছে।—পল্লীগ্রামের পথগুলি কর্দ্দমাকীর্ণ। কর্দ্দমবহুল অনতিপ্রশস্ত এক কুটির-প্রাঙ্গণে, পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি শিশু, সশব্দে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। রন্ধনগৃহে শিশুটির মা, নির্ম্মলা, রাঁধিতেছিল। পুত্রের চীৎকার শুনিয়া শশব্যস্তে সে বাহির হইয়া আসিল। "ষাট্—ষাট্" বলিয়া—নির্ম্মলা শিশুর কর্দ্দমানুলিপ্ত অঙ্গ বক্ষে চাপিয়া ধরিল।—"কি করে প'ড়ে গেলিরে গোপাল ?"

বালক কাঁদিয়া বলিল—"সেই কখন্ কোন সকালে দুটি মুড়ি খেয়ে আছি, প'ড়ে যাব না ? আমার বুঝি ক্ষিধে পায় না ?"

নিদারুণ বেদনায় নির্ম্মলার বক্ষঃস্থল যেন ধ্বসিয়া যাইতে লাগিল। একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস, তাহার পঞ্জর ভেদ করিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।—"আর একটু সবুর কর্ গোপাল। তোর রঘু-দাদা এখুনি আসবেন। দেখিস্ কত চাল আন্বে। দেখ্‌ব আজ, তুই কতটা ভাত খেতে পারিস।"

বালক বলিল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, রঘুদাদা চাল যা আন্বে, তা আমি জানি। সমস্ত দিনের মধ্যে—আন্তে পারলে না, আর এই ভর সন্ধ্যার সময় চাল আন্বে !"

যদি তাই হয়! আজ সমস্ত দিন চাউলের অভাবে তাহাদের উদরে অন্ন প্রবেশ করে নাই। তিনবার হাঁটাহাঁটি করিয়াও বৃদ্ধ রঘুনাথ বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, একবেলার মত অন্নেরও সংস্থান করিতে পারে নাই। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। এবারেও যদি তাহার প্রয়াস ব্যর্থ হয়! কিসলয়-কোমল এই ক্ষুধার্ত্ত বালক, সমস্ত দিনে এক মুষ্টি মুড়ি মাত্র খাইয়া আছে যে! রঘুনাথ এবারেও শুধু হাতে ফিরিয়া আসিলে এই ক্ষুধাতুর শিশুকে কী বলিয়া প্রবোধ দিবে সে!—দুর্দ্দমনীয় এই তাহার ক্ষুধার যাতনা, মা হইয়া আর কতক্ষণ সে প্রত্যক্ষ করিবে!

বাহিরে কাহার পদশব্দে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে বালককে বক্ষে লইয়া শয়নকক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক একটি যুবকও সেই কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

আগন্তুকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নির্ম্মলা বলিল—"এমন অসময়ে যে ?"

যুবক বলিল—"আস্তে কি নেই নির্ম্মল ?"

"না।"

যুবক আহতভাবে বলিল—"আমি এলে পর এত বিরক্ত তুমি কেন হও নিরু ? গত কথা কি এ জীবনেও ভুলবে না ? আমি ত তোমার কাছে আর কিছুই চাই না, কেবল যে ভুল ক'রেছি, তারই কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে চাই।—"

নির্ম্মলা বলিল—"আমারও ঠিক্ তাই।"

"তার মানে?"

"তার মানে এই চারুদা, আমিও যে ভুল ক'রেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে চাই।"

"অর্থাৎ?"

"আর কিছু জান্‌তে চেয়ো না, আমার কায আছে।"

চারু গাঢ়স্বরে বলিল—"কায ত তোমার সমস্ত-ক্ষণই আছে নিরু! আমার এতটুকু সঙ্গ তোমার কাছে কি এতই দুঃসহ হ'য়ে উঠ্‌চে? বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু এই টাকা কয়টি রাখো। এম্‌নি না নাও, ধার ব'লে গ্রহণ করো।"—

নির্ম্মলা দৃঢ়ভাবে বলিল—"কিছু মাত্র দরকার নেই চারুদা, এ টাকা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

চারু পাংশু মুখে বলিল—"আমাকে তোমার একজন বন্ধু ব'লে মনে ক'রতেও কি তোমার এত দ্বিধা?" তারপর একটু থামিয়া ভাবিয়া সে বলিল,—"আজকাল যে তোমাদের দিন চলাই ভার হয়ে উঠেচে, সে খবর আমি শুনেছি, নির্ম্মলা। রঘুকাকা এইমাত্র আমার মায়ের কাছে চাল চাইতে গিয়েছিল। তাইতে ত আমি ছুটে এলাম। এই নাও, ধার ব'লেই নাও, এতে তুমি আপত্তি ক'র না।" এই বলিয়া চারু হস্ত প্রসারিত করিয়া পঞ্চাশ টাকার পাঁচখানি নোট নির্ম্মলার হাতে দিতে উদ্যত হইলে তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া নির্ম্মলা আরো খানিকটা পশ্চাতে হটিয়া গেল।

চারু সবিস্ময়ে বলিল—"ওকি নিরু, অমন ভাবে চমকে উঠ্‌লে যে? টাকা কয়টা তবে নেবে না?" ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ করিতে করিতে নির্ম্মলা বলিল—"না—না—না। কক্ষণো নেবনা আমি। আজ আমার এই দুরবস্থার জন্যই ত তোমার এত সাহস হ'য়েছে? তাই আমাকে, আমার বাড়ীতেই এসে, অপমান কর্ত্তে সাহসী হ'য়েছ। কিন্তু, জেনে রেখো, এ দারিদ্র্যও আমার পক্ষে ভাল। তুমি এ বাড়ী থেকে এক্ষুণি চলে যাও চারুদা। আর কক্ষণো এস না, স্পষ্ট কথা ব'লে রাখ্‌লেম।"

চারুও উত্তেজিত হইয়া বলিল—"এ সংসারে কারুরই ভালো কর্ত্তে নেই দেখ্‌চি। না খেতে পেয়ে ছেলেটাকে নিয়ে শুকিয়ে ম'রবে, তবুও কারুর সাহায্য গ্রহণ ক'রবে না? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব, এই তেজ তোমার কতদিন থাকে!" এই বলিয়া চারু হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

চারুর চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই রঘুনাথ আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। এই রঘুনাথ নির্ম্মলার শ্বশুরের ভৃত্য। নির্ম্মলার স্বামীকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ

করিয়াছিল। আজ কোথায় নির্ম্মলার স্বামীই তাহার এই বৃদ্ধ বয়সে, তাহাকে বসিয়া খাওয়াইবে, —না সেই তাহার এই অক্ষম অবস্থায়, তাহারই স্ত্রী পুত্রের এবং আপন উদরান্নের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিংবা লোকের বাড়ীতে খাটিয়া উপার্জ্জন করিতেছে।

নির্ম্মলা রঘুনাথকে দেখিয়া গাঢ়স্বরে প্রশ্ন করিল—"চাল কি পেয়েছ রঘুকাকা ?

শ্রান্তভাবে দাওয়ার এক প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া রঘুনাথ বলিল—"হ্যাঁ মা পেয়েছি। গোপাল কি ঘুমিয়ে প'ড়েছে ?"

—"না, জেগে আছে।" তারপর একটু আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকা, চাল তুমি কোত্থেকে আন্‌লে ? ঘোষেদের বাড়ীর থেকে আনো নি ত ? তা যদি এনে থাক, তবে ও-চাল এক্ষুণি ফিরিয়ে দিয়ে এসো।"

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল—"না মা, ঘোষেদের বাড়ী থেকে আনতে যাব কেন ? উত্তরপাড়া থেকে এনেচি।"

নির্ম্মলা বলিল—"তুমি কিন্তু মিছে কথা ব'লছ কাকা। এইমাত্র আমি শুন্‌লেম, ঘোষেদের বাড়ীতে তুমি গিয়েছিলে চাল চাইতে। অথচ, তোমায় আমি বার বার নিষেধ ক'রে দিয়েছি যে প্রাণান্তেও ও-বাড়ীতে তুমি কখনো কোন জিনিষ চাইতে যেতে পারবে না।"

রঘুনাথ বলিল—"না বৌমা, আমি সে বাড়ীর চাল আনিনি। কাছাকাছি হবে—দূরে যেতে হবে না ব'লে—সে বাড়ীতে আমি চাল চাইতে একবার গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু গিন্নির দেখা পাই নি। তিনি তখন কাপড় কাচতে ঘাটে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস না হয় চাঁপাকে পাঠিয়ো জানবার জন্যে।"

"ওমা—ভাত রাঁধ না মা।" বলিয়া গোপাল আর একবার তার মাকে তাড়না করিল।

রঘুনাথ বলিল—"আয় দাদা আয়। তুই সারাদিন না খেয়ে আছিস তাই তাড়াতাড়ি হবে ব'লেই আমি ঘোষেদের বাড়ী চাইতে গিয়েছিলাম রে। নইলে কি যাই! যে রায়বাঘিনী তোর মা। ওঁকে আমি খুব ভয় করি। তোর জন্যে চারটে নারকোল নাড়ু উত্তর বাড়ীর গিন্নি দিয়েছেন, আয় খাবি আয় ততক্ষণ।"

নির্ম্মলা ত্বরিতপদে রন্ধনগৃহে পুনঃ প্রবেশ করিল। গোপাল তখন হৃষ্টচিত্তে রঘুদাদার ক্রোড় অধিকার করিয়া নারিকেল নাড়ুর সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

দুই

ভাত চাপাইয়া দিয়া নির্ম্মলা তাহার চিন্তার তরঙ্গসঙ্কুল মহাম্বুধির মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিল। একে একে তাহার অতীতের রেখাচিত্রগুলি তাহার মনঃপটে নূতন হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

এই এক পল্লীর মধ্যেই তাহার পিতা এবং চারুর পিতা উভয়েরই বাস ছিল। উভয়ের মধ্যেই আবাল্য প্রীতির বন্ধন ছিল। আশৈশবই মাতৃহারা সে। পিতারই বক্ষঃপুটে সে অতি যত্নে প্রতিপালিতা হয়। চারুর পিতা তাহার নিকট বাক্যবদ্ধ ছিলেন, তাহাকে বধূরূপে, বরণ করিয়া লইবেন। তাহার জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে শুনিয়া আসিতেছিল—চারুই তাহার ভাবী স্বামী। শুনিয়া শুনিয়া তাহার চিত্তটীও ক্রমে ক্রমে চারুর উপরেই আকৃষ্ট হইতেছিল। চারুও তাহাকে ভালবাসিত। আশার সুমোহন মধুচ্ছবি সর্ব্বদাই চারু তাহার চোখের সামনে ধরিত। সেও তাহার কুমারী হৃদয়ের অম্লান প্রেমপুষ্পগুলি একে একে উজাড় করিয়া চারুর পায়ে ঢালিয়া দিয়াছিল।

যখন তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময়ে চারু কলিকাতায় থাকিয়া শেষ ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়াছিল। কথা ছিল পরীক্ষা শেষ হইয়া গেলে সে নির্ম্মলার পাণিগ্রহণ করিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর বিধাতার অমোঘ বিধানে ঘটিয়া যায় অন্যরূপ। তাই হঠাৎ একদিন তাহারা যখন শুনিতে পাইল, চারু নির্ম্মলাকে বিবাহ করিবে না, তাহারই এক সতীর্থের ভগ্নীর রূপে বিমোহিত হইয়া সে তাহাকেই বিবাহের জন্য মনোনীত করিয়াছে—দিনস্থির পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার আর তাহার পিতার—যুগপৎ উভয়েরই—আর বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

চারুর পিতা প্রথমটায় ঐ বিবাহে খুবই আপত্তি উঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন—সেই নব পাত্রীটীর পিতা বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক, এবং এই বিবাহে 'বরপণ' স্বরূপ নগদ পাঁচ হাজার টাকা গণিয়া দিবেন—তখন তাঁহার দৃঢ়তার বন্ধন যেন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়া আসিল। বিশেষতঃ চারুর মায়ের একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার আর কোন আপত্তি করিবার ক্ষমতা রহিল না। এতদ্ব্যতীত চারুর স্বয়ং-নির্ব্বাচিত পাত্রীকে তাচ্ছিল্য করা যায় কি করিয়া?

তাহার পর চারুর বিবাহ—এবং সেই বিবাহেই আহূত চারুর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহপাঠীর শুভদৃষ্টিতে পড়িয়া নির্ম্মলার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়া—একে একে সবই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

নির্ম্মলা যেন চ'খের সমুখে দেখিতে লাগিল, চারুর বউভাতের ও পাকস্পর্শের উৎসব-রজনীতে সে বেদনাহত হইয়া বরবধূর একপাশে ম্লানমুখে বসিয়া আছে—এমন সময় চারুর বন্ধু বিজয় সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নির্ম্মলার সহিত তাহার চারি চক্ষের মিলন হইতেই বিজয় তাহার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর বিজয়ের ঘন ঘন অন্তঃপুরে যাতায়াত—চারুর ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, রহস্য—সমস্তই আজ নির্ম্মলার সম্মুখে নূতন করিয়া প্রতিভাত হইল।

ইহার পর কোন এক অশুভ লগনে, তাঁহার ভাগ্যসূত্রের সহিত নির্ম্মলারও ভাগ্যসূত্র জড়িত হইয়া গেল।

এম-এ পাশ করা জামাই পাইয়া তাহার পিতার আর আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

বিশেষতঃ বিনাপণে, বিনাব্যয়ে তিনি যে এমন জামাতৃরত্ন লাভ করিলেন তাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত আনন্দে একেবারেই অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নির্ম্মলা? সে কি সুখী হইয়াছিল?

না,—সে তাহা পারে নাই। নির্ম্মলা ভাবিতে লাগিল তাহার দেবতার মত স্বামীকেও যে সুখী করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই? ওই প্রতারক চারুর জন্যেই না? তিনি কোন বিষয়ে—নির্ম্মলার অনুপযুক্ত ছিলেন?—কন্দর্প কান্তি, বীরোচিত বপু,—দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ,—বরাবরই সমস্ত পরীক্ষায় তিনি যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।—হায়! তবুও তিনি মনোমত ছিলেন না।

নির্ম্মলার মনে পড়িল, বিবাহের পর বৎসরেই পশ্চিমে একটা বড় চাকুরী পাইয়া তিনি কার্য্যস্থলে গমন করেন। তখন গোপাল তাহার গর্ভে—সেইজন্য তাহার যাওয়া হইল না—কিন্তু সেই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা!

কলিকাতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোটা মাহিনার চাকুরী করিতেন। আশৈশব মাতা-পিতৃহীন বলিয়া—জ্যেষ্ঠের নিকটেই প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পশ্চিমে তাঁহার কার্য্যস্থলে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, নির্ম্মলা হতভাগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই পল্লীগ্রামেও আর একবার আসিয়াছিলেন।—কত প্রেম,—কত ভালবাসার তরঙ্গ—সেই বিশাল হৃদয় সাগরে লহরে লহরে খেলিয়া যাইত। তিনি ত জানিতেন না, পুষ্পমাল্য ভ্রমে কি কালনাগিনীকে স্বেচ্ছায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন। যাহার হস্তে—প্রাণ, মন নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া, তিনি রিক্ত হইয়াছিলেন, সেই হতভাগী নির্ম্মলার অন্তর কোণে সেই তাহার দেবতার জন্য এক বিন্দু স্থানও ছিল কি? তাই কি তিনি কালনাগিনীর বিষ গলাধঃকৃত করিতে পারিলেন না? মাত্র দুইদিন ভুগিয়া, দারুণ প্লেগ রোগের আক্রমণে, সেই সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের নিভৃত কোণে, নিঃসহায় আর নির্ব্বান্ধব দেবতা তাহার, তাঁহার অমূল্য জীবন ত্যাগ করিলেন! হায়রে হতভাগিনী নির্ম্মলার কঠোর প্রাক্তনলিপি!

নিদারুণ বেদনায় তাহার সকল অন্তস্তলটা মথিত হইয়া উঠিল। যেন সমস্ত বাধা সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া এখনই দুর্দ্দান্ত মহোদধির মত হৃদয় তাহার, আছাড় খাইয়া পড়িতে চাহিতেছিল—তাহার ঈপ্সিতধনের পদপ্রান্তে!

আজ তাহার কেবলই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, তাহারই স্ব-রচিত একটি কবিতার অংশ—

ছিল পাত্রেতে যখন আমার
স্নিগ্ধ মধুর পেয়,
জাগেনি তিয়াস হৃদয়ে, তখন
তাই ক’রেছিনু হেয়।

তিন

চারু আপন নির্ব্বাচিতা পত্নীকে লইয়া বেশিদিন সুখী হইতে পারে নাই। তাহাদের বিবাহের প্রায় বৎসর তিনেক পরেই তাহার সেই স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করে।

তাহার পরও প্রায় দীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিক্ষিপ্ত-হৃদয় চারুকে কেহই পুনর্ব্বিবাহে সম্মত করাইতে পারে নাই। ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া সে প্রথম কলিকাতাতেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করে। তাহার স্ত্রীকেও নিজের কাছেই রাখে। কিন্তু সেখানে বৎসর তিন প্র্যাক্‌টিস্ করিবার পর, তাহার স্ত্রী অকালে বিগত হইলে পর, সমস্তই সে ছাড়িয়া দিয়া এই গ্রামে আসিয়া বসে, এবং প্রয়োজনমত এইখানেই ডাক্তারী করিতে আরম্ভ করে। নির্ম্মলাও তাহার শ্বশুরের কুলের কাহারও দ্বারা আহূতা না হইয়া, আপন পুত্র এবং তাহার শ্বশুরের আমলের পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথকে লইয়া, তাহার পিতৃ-ভিটাতে সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, চারু পল্লীগ্রামের সমৃদ্ধিশালী গৃহস্থ, তাই বিনা দর্শনীতে গ্রামবাসিগণের চিকিৎসা করিয়া, তাহার উপচিকীর্ষার ক্ষুধা মিটাইয়া লইতেছিল।

চারু মধ্যে মধ্যে নির্ম্মলার সহিত দেখা করিতে আসিত,—কিন্তু নির্ম্মলা তাহাকে দেখিলে নিদারুণ বিরক্তিভরে মুখ ফিরাইয়া লইত। কিন্তু চারু তথাপি মাঝে মাঝে আসিত।

একদিন চারু আসিয়া নির্ম্মলার সম্মুখে দাঁড়াইতেই ঘৃণাভরে সে সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, চারু বলিল—"জানো নির্ম্মলা, গোপাল আজ সুদাম জেলের ছেলেকে মার লাগিয়ে তার কোঁচড় থেকে মুড়কি কেড়ে নিয়ে খেয়েচে?"

নির্ম্মলা একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, ক্ষণকাল অন্যদিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া কি যেন ভাবিল,—তাহার পর পুনরায় গমনোদ্যতা হইল।

চারু উদ্দীপ্ত ভাবে পুনর্ব্বার বলিল—"ভদ্রলোকের ছেলে—ক্ষিধের তাড়নাতেই এমন ক'রে অন্য ছেলের খাবার কেড়ে খেতে পারে। কেন নির্ম্মল, তুমি এতটা দারিদ্র্যের যন্ত্রণা ভোগ করছ? তোমার যে জীবিকার সংস্থান করা কতদূর কষ্টকর হ'য়ে প'ড়েছে, তাকি আমি জানিনে? গহনা, বাসন ইত্যাদি কি আজও শেষ হয়নি? ছেলেটার মুখে একটু জলখাবার তুলে দিতে পারো না! এমন কি, দু'সন্ধ্যা ভোর পেট তাকে ভাত খাওয়াতেও পারেনা! এত ভোগ তুমি কেন ভুগ্‌চ নিরু?"

চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি—চারুর উপরে স্থাপিত করিয়া নির্ম্মলা বলিল—"কী যে তোমার মনে আছে, স্পষ্ট ক'রে তাই-ই আমাকে খুলে বলত চারুদা? ওসব হেঁয়ালির কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। দুঃখ কষ্ট যা আমার আছে, তা আমারই শুধু আছে, তার প্রতিকার তুমি কি কর্ত্তে চাও তাই শুনি?"

নির্ম্মলার সেই প্রদীপ্ত চোখের দৃষ্টির সাম্‌নে পড়িয়া, সঙ্কোচে চারু যেন এতটুকু হইয়া গেল। অপেক্ষাকৃত জড়িত কণ্ঠে সে বলিল—"আমি কি ব'ল্‌তে চাই? কি ব'ল্‌তে চাই শুন্‌বে নিরু? আজ তবে আমার এতদিনকার গোপন-সঞ্চিত কথা বলেই ফেল্‌তে চাই! স্পষ্ট ব'ল্‌ছি, তুমি স্বামিহারা, আমিও বিপত্নীক। এ রকম বিবাহে আজকাল বাধেনা। বিধবার বিবাহ সমাজে আজকাল প্রায় চ'ল্‌তি হ'য়েই এসেচে। কিন্তু তোমাদেরি মত কুসংস্কারে আবদ্ধ মেয়েদের জন্যেই ভাল ক'রে চ'ল্‌তে পাচ্ছেনা। কিসের বাধা—কিসের সঙ্কোচ আমাদের? তুমিও স্বাধীন, আমিও স্বাধীন, তবে আর ভয় কিসের? চলো, ক'লকাতায় গিয়ে আমরা বিবাহিত হই গিয়ে। তুমি রাজি হও নিরু,—তোমাকে আমি আশৈশব ভালবেসে আস্‌চি।

"কিন্তু, আমি যে বাসি না।" আহত ফণিনীর ন্যায় ঊর্দ্ধ-ফণ হইয়া নির্ম্মলা বলিল—"কিন্তু, আমি যে বাসিনা,—তার কি?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে নির্ম্মলার পানে চাহিয়া চারু বলিল—"বাসনা? তুমি আমায় ভালোবাস না?—সত্যি আমায় তুমি ভালোবাসনা? এও কি সম্ভব?"

জলদগম্ভীরকণ্ঠে নির্ম্মলা বলিল—"না।"

—"কিন্তু, এমন একদিনও ত ছিল, এই একমাত্র আমাকেই ত তুমি ভালো বেসেছিলে?"

—"ভুল কোরেছিলেম। স্বপ্ন দেখেছিলেম। ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেম! তারি প্রায়শ্চিত্ত এখন আমাকে সারা জীবন ধ'রে কর্ত্তে হ'চ্চে। হ্যাঁ, তারি প্রায়শ্চিত্ত—এখন যথেষ্ট হয়েচে,—আর না,—এক্ষুণি তুমি পথ দেখ।" এই বলিয়া নির্ম্মলা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাদের বহির্গমনের দ্বার দেখাইয়া দিল।

নির্ম্মলার তখনকার সেই অনলবর্ষী দৃষ্টির সম্মুখে থাকিবার সাধ্য চারুর আর রহিল না। বিষহীন ভুজঙ্গের মত অবনমিত শিরে, যন্ত্রচালিতবৎ চারু, ধীরে ধীরে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেল।

চার

আজ সাত দিন হইতে গোপালের খুব জ্বর হইয়াছে। গ্রামে চারু ব্যতীত আর এক জন হাতুড়ে ডাক্তার ছিল! তাহাকে ডাকাইয়া—তাহার দর্শনী একটি মুদ্রা, তাহাও ধারে রাখিয়া,—তাহারই চিকিৎসাধীনে গোপালকে রাখিল।

কিন্তু গোপালের পীড়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল। রঘুনাথ চিন্তিতভাবে বলিল—"এই হাতুড়ে ডাক্তারের কর্ম্ম নয় মা, রোগটা শক্ত ব'লেই মনে হ'চ্চে। বিকারের ভাব এসে প'ড়েছে,—গলা ঘড়্ ঘড়্ কচ্ছে, সর্দ্দিও খুব আছে। চারুকে একবার ডাকা উচিত।"

রুগ্ন পুত্রের মুখপানে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নির্ম্মলা উত্তর দিল—"না।"

রঘুনাথ আর কিছু বলিতে সাহসী হইল না। একগুঁয়ে এই মেয়েটিকে, সকলের চাইতে সেই-ই যে ভালো করিয়া চিনিত। সেই দিন অপরাহ্ণে, চারু নিজেই একেবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। নির্ম্মলা তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কুণ্ঠিতভাবে চারু বলিল—"গোপালের নাকি বড় ব্যায়রাম ? তা, আমায় একটিবার খবরটা দিতেও কী দোষ ছিল নিরু ?—"

নিরু বলিল—"প্রয়োজন বোধ করিনি।"

পুনরায় কুণ্ঠাবিজড়িত-কণ্ঠে চারু বলিল—"তা, এখন একবার আমি দেখ্‌তে পারি কি ?"

"না।"

রঘুনাথ নেহাৎ বিরক্ত হইয়া বলিল—"সে কি মা জীবন নিয়ে খেলা কর্ত্তে চাও নাকি ? ছেলে যে দিনকে দিন নেতিয়ে পড়্‌চে, দেখ্‌তে পাচ্ছনা তুমি ? তুমি কি মা—না রাক্ষসী ? দাও, চারুবাবুকে একবার দেখ্‌তে দাও। উনি যে ভাল ডাক্তার। এ গ্রাম শুদ্ধ লোক ওঁর জন্যেই বেঁচে আছে।"

তথাপি নির্ম্মলা নড়িল না।

ক্রোধে আত্মহারা হইয়া রঘুনাথ বলিল—"ওঠ তুমি ওখান থেকে, শীগ্‌গির ওঠ। কিছু না ব'ল্‌তে বল্‌তে বড্ডই বেড়ে গিয়েছ তুমি। ওঠ ব'ল্‌চি, জোর ক'রে তুলে দেব, এবারে আর তোমার কথা শুন্‌ছিনে আমি।"

বৃদ্ধের মেঘমন্দ্রমথিত গম্ভীর নিনাদে—ভীত ও চমকিত হইয়া, নির্ম্মলা তাহার পুত্রের শয্যা ত্যাগ করিয়া সম্মোহিতার ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

চারু তখন ধীরে ধীরে গোপালের নাড়ী, বুক, পিঠ, সমস্তই পরীক্ষা করিয়া, বিকৃতমুখে বলিল—"এঃ, এযে সিরিয়াস্ কেস্।" তাহার পর রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"ভালো করোনি তোমরা এতদিন ওই ডাক্তারকে দেখিয়ে। বড্ডই দেরি হ'য়ে গেছে। একেবারে ডবল্ নিউমোনিয়া !—আচ্ছা, দেখি কি কর্ত্তে পারি।" তারপর সে নির্ম্মলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"করেছ কি নির্ম্মলা, এই রোগীকে তুমি ওই হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে ফেলে রেখেছিলে ?—মস্‌নের পুল্‌টিস্ দু-ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে। আর ওষুধ লিখে দিচ্ছি, রঘু আমার ডিস্‌পেন্সারি থেকে নিয়ে আসুক। পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়াই যে মুস্কিল। আচ্ছা, আমি লোক পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি। আর একটা আইস্‌ব্যাগও পাঠিয়ে দেব—ক্রমাগত সেই ব্যাগ করে মাথায় বরফ দাও। আর, একটা শিশিতে ব্র্যাণ্ডি থাক্‌বে, তিন ঘণ্টা অন্তর পাঁচ ফোঁটা ক'রে খাইয়ে যেও। রাত্রে আমি নিজে থাক্‌লেই ভালো হয়। খুব সন্তর্পণে চিকিৎসা আর

দ্বারা নার্সিং ঠিকমত হবে না বোধ হচ্ছে। কি বলো নিরু, তুমি রাজি আছ?—রাত্রে আমি এখানে থাক্‌ব?"

উদাসভাবে নির্ম্মলা বলিল—"কিছু দরকার নেই চারুদা, ভগবানের ইচ্ছে থাক্‌লে নিশ্চয়ই বাঁচ্‌বে। তোমার দয়ায় অশেষ ধন্যবাদ। ওষুধ দিচ্ছ, এই যথেষ্ট, আর কিছু চাই না।"

চারু কাতরভাবে বলিল—"তুমি যদি একবার অনুমতি দাও নিরু, নিজে আমি সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থেকে, নিজেই নার্শ ক'রে, তোমার ছেলেকে নীরোগ কর্ত্তে চেষ্টা করি। কি বলো,—তুমি এতে সম্মত আছ?—"

"না—না—না। দোহাই তোমার, আর আমার যন্ত্রণা বাড়িয়োনা।" বলিয়া নির্ম্মলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

আহত হইয়া চারু চলিয়া গেল। রঘুনাথ তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে, ঔষধ পত্র আনিয়া বিপুল উৎসাহে গোপালের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করিল।

পাঁচ

এইরূপ ভাবে মরণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আরো সাত দিন কাটাইয়া চৌদ্দ দিনের দিন গোপাল যেন কিঞ্চিৎ সুস্থতাবোধ করিল। তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিল। রাত্রি আটটার সময় ক্ষীণ কণ্ঠে সে ডাকিল—"মা!"

নির্ম্মলা, নির্নিমেষ নয়নে পুত্রের অবস্থার পরিবর্ত্তনগুলি লক্ষ্য করিতেছিল।—পুত্রের আহ্বানে ত্রস্তভাবে সে তাহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "কি ব'ল্‌ছ বাবা আমার? গোপাল আমার!—"

"কই তুমি মা?"

"এই যে আমি বাপ্‌।"

—"আরো কাছে স'রে এস মা, ভালো ক'রে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে যে! হ্যাঁ, এইবারে দেখ্‌তে পাচ্ছি।......মা, ঐ দেখ, বাবা—হাঁ বাবা, যাব......"

ক্লান্ত বালক আবার চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিল। নির্ম্মলা তাহার ললাট চুম্বন করিয়া বলিল—"ওসব কথা বলে না মাণিক আমার।—আজ্‌ত তুমি ভালো আছ, তোমার জ্বর ছেড়েচে।—বেশি কথা ক'য়ো না, ঘুমোও।"

বালক আবার বলিল—"হ্যাঁ—মা, ঘুমুই।"

বলিয়া আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে রঘুনাথ সমভিব্যাহারে চারু সেই স্থলে আসিয়া বলিল—"গোপাল নাকি

নির্ম্মলা পুলকে বিহ্বলা হইয়া খাট হইতে নামিয়া পড়িয়া—একেবারে চারুর উভয় হস্ত ধরিয়া বলিল—"তোমারি দয়ায় চারুদা, তোমার একান্ত যত্নের ফলেই, গোপাল আমার আজ ভাল আছে। তোমার এ ঋণ আমি কেমন ক'রে শোধ ক'রব চারু দা ?—"

চারু স্মিতমুখে বলিল—"কই দেখি আগে গোপাল কেমন আছে।"

এই বলিয়া চারু শয্যার উপর বসিয়া গোপালের দেহে হস্তার্পণ করিবা মাত্রই শিহরিয়া উঠিল। এ কি ?—এ যে ঘর্ম্ম-বাহুল্যে বালকের সারাদেহ আর্দ্র এবং আপ্লুত হইয়া গিয়াছে !—সর্ব্বনাশ ! না বুঝিয়া ইহারা জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতেছে !—

তাহার পর সে গোপালের পাল্‌স্ পরীক্ষা করিয়াই তৎক্ষণাৎ তীব্র একটি ঔষধ পান করাইয়া দিল। নাড়ীর অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় !

এই সময় গোপাল একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা—বাবা—ওই বাবা আমাকে ডাক্‌ছে।" আবার সংজ্ঞা হারাইয়া সে পড়িয়া রহিল।

চারু ভীতভাবে নির্ম্মলার পানে চাহিল। দেখিল তাহার চক্ষুর্দ্বয় ঘূর্ণ্যমান ! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তাহার জ্ঞান তিরোহিত হইবার আর বিলম্ব নাই !—একটা অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে তাহার চোখ দুইটা জ্বল্ জ্বল্ করিয়া যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে !

চারু আবার গোপালকে উত্তেজক ঔষধ পান করাইতে গেল, কিন্তু এবারে সে-ঔষধ তাহার গলাধঃকৃত হইল না, কস বাহিয়া তাহা বাহিরেই গড়াইয়া পড়িল !

তখন চারু ক্ষিপ্রহস্তে তাহার আনীত ব্যাগ্ হইতে ইন্‌জেক্‌সনের ঔষধ বাহির করিয়া ইন্‌জেকট্ করিতে উদ্যত হইল।

"ওরে,—ওই রাক্ষসটা এইমাত্র আমার বাছাকে দু দুবার বিষ খাওয়ালে। বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌লে, নইলে ও আস্‌বার আগে ত বাছা আমার ভালই ছিল। আবার বিষ ফুটিয়ে দিতে যাচ্ছে যে, ও রঘুদাদা বাছাকে আমার মেরে ফেল্‌লে যে !" বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় ধাবমানা হইয়া, নির্ম্মলা চারুর হস্ত হইতে ইন্‌জেক্‌সনের ঔষধ কাড়িয়া লইতে গেল ! তৎক্ষণাৎ রঘুনাথ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

চারু বালকের হস্তে ইন্‌জেকট্ করিলে ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নির্ম্মলা চারুর কার্য্যকলাপ সন্দর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু হায় কোন ফলই আর হইল না। ইন্‌জেক্টের পর আর একবার "বাবা, বাবা, মা, মা," বলিয়া চীৎকার করিয়াই বালক মরণের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল ! নির্ম্মলা হাহাকার করিয়া সম্বিৎহারা হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল !

* * * * * * * *

যখন নির্ম্মলা অপহৃত জ্ঞান ফিরিয়া পাইল তখন রজনী গভীরা। বাহিরে প্রলয়ের

গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছে। জীমূত আরাবে মেদিনী কম্পমানা, এবং ঝঞ্ঝা, বাত্যা-সহ মুষলধারে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে!

চকিতে, নির্ম্মলা তাহার অর্থহীন দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল তাহার শয্যা শূন্য! যে তাহার জীবনাধার, শয্যাতল তাহার আলোকিত করিয়া ছিল সে আর নাই। সাধের পিঞ্জর তাহার শূন্য পড়িয়া আছে, প্রাণের পাখিটি উড়িয়া পলাইয়াছে! নাইরে সে নাই। আকাশ, বাতাস প্রলয় তাহার কর্ণ কুহরে গর্জ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল "নাই—নাই, নাইরে সে নাই।"

উন্মাদিনীর চক্ষু অশ্রুশূন্য। সে উন্মাদিনীর মত একবার টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল পরক্ষণেই…"বাপরে বাবা আমার, বুকছেঁড়া মাণিক আমার" বলিয়া প্রচণ্ড বেগে আপন বক্ষে করাঘাত করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীবীণাপাণি রায়

চ্যাটার্‌টন্ *

অষ্টাদশ শতাব্দীর হে কিশোর কবি,—
পত্রিকার পৃষ্ঠ-শায়ী মৃত্যু-ম্লান এই তব ছবি
আজিকে দেখিয়া,
গভীর ব্যথায় মোর ভরে' উঠে হিয়া।
কি দারুণ কীট হায় হিয়া তব দিয়াছিল কুরি',
বোঁটা টুটি', না ফুটিতে তুমি ছোট কুঁড়ি—
মাঘ-শেষ বসন্তের প্রথম সম্ভবে
আপন বেদনা ল'য়ে গোপনে নীরবে
এই ধরণীর পথ-ধূলির উপরে
গিয়াছিলে ঝরে'।…

যে দেবীর সেবকের ভালে,
যুগে-যুগে কালে-কালে
অদৃষ্ট আপন হাতে এ কে দেয় বেদনার টীকা
দৈন্য-লিখা,—
সে দেবীর কমল-কাননে
হে তরুণ ভাব-চারী
মানস-পূজারি,
গিয়াছিলে অর্ঘ্য-আহরণে;
কিন্তু তুমি জানিতেনা
সবে কি সবেনা

* ভাদ্র ১৩৩৪ এর "বঙ্গবাণী"তে "হেনরী ওয়ালিস্" অঙ্কিত "কবি চ্যাটার্‌টনের মৃত্যু" ছবিখানি দেখিয়া লিখিত।

"১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কবি চ্যাটার্‌টনের ব্রিষ্টলে জন্ম হয়। তাঁহার যখন মাত্র দশ বৎসর বয়স তখন তিনি প্রথম কবিতা লেখেন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি স্কুল ছাড়িয়া এক এটর্ণির এপ্রেন্টিস্ হন। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই এই সময়ে অবসরকালে রচিত। দুইবৎসর পরে তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া লণ্ডনে চলিয়া আসেন। সাহিত্যিক জীবনের সকল দুঃখকষ্টই তাঁহাকে এখানে ভোগ করিতে হয়। নয় সপ্তাহকাল লণ্ডনে স্বপ্নজালের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেলে তাঁহার সম্বল প্রায় ফুরাইয়া আসিল এবং প্রকাশকবর্গের বদান্যতার প্রকৃতমূর্ত্তি তাঁহার কাছে প্রকট হইয়া উঠিল। বন্ধুহীন, সহায়হীন, দুঃখময় অবস্থার মধ্যেও তিনি দান-লব্ধ অর্থের সাহায্যে নিজের জীবনের ভার বহিয়া বেড়ানোকে মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে পারিলেন না। তাই সতেরো বৎসর নয়মাস বয়সে, ২৪শে আগষ্ট, ১৭৭০ সালে তিনি তাঁহার দুঃখময় জীবনের বিকাশোন্মুখ প্রদীপটিকে নিজ হাতে নিবাইয়া দেন। পরদিন তাঁহার ঘরের দরজা ভাঙিয়া দেখা গেল—তাঁহার প্রাণহীন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং ঘরের চতুর্দ্দিকে কাগজের টুকরোর মধ্যে তাঁহার অসমাপ্ত সকল রচনার ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।"

কাঁটার কাটার জ্বালা ছোট কচি প্রাণে ;—
পূজা তব শেষ হ'ল তাই প্রাণ-দানে।
সভ্যতার ক্রম দিয়ে গড়া,
সৌধ-ভরা
বিত্তময়ী বৃহতী নগরী—
জানিতেনা, দেখিতে সুন্দরী
কিন্তু তার চিত্ত নাই।
সৌন্দর্য্যের উপাসক—বিলাসের মরীচিকা দেখি'
ভুল করে' ভেবেছিলে সৌন্দর্য্যের সুধানিধি সে কি !
হা' অভাগ্য, মিলে নাই এক বিন্দু সুধা,
প্রাণ গেল—পূরিল না ক্ষুধা...
হারাইয়া শেষ কড়ি, অবশেষে হা'রে অর্থ-হীন,
দ্বারে দ্বারে ফিরে'ছিলে দীন,
শত সাহিত্যের সভা,—সাহিত্য-মন্দিরে,
নিরাশ্রয় নির্ব্বান্ধব বারে বারে গেলে—এলে ফিরে' ;
জানিতেনা, অপদার্থ হীন চাটুকার,
অর্থের শোষণ শুধু একমাত্র উদ্দেশ্য যাহার,
তারো মূল্য আছে—
প্রয়োজন-অতিরিক্ত
প্রাপ্তি নিত্য—
সে-ও সুখে বাঁচে ;
কিন্তু কবি,—তোরি শুধু মূল্য নেই
সখের সৌধ-জ কাব্য-সাহিত্য-বিলাসী সেই
চিত্ত-হীন ধনিকের কাছে...
ধন-বাদী স্বার্থপর গ্রন্থ-প্রকাশক—
পত্রিকা-স্বত্বাধিকারী শত সম্পাদক।
অর্দ্ধাহারে অনাহারে দীর্ঘ রাত্রি অ-নিদ্র রহিয়া,
ধূপ সম আপনারে তপস্যার তাপেতে দহিয়া,
তিলে তিলে প্রাণ-পাত করি',
যারা তোলে গড়ি'
সারস্বত সাধনায়
শতেক সম্ভার,
বিনামূল্যে অল্পমূল্যে তাচ্ছিল্যের মুষ্টি-ভিক্ষা দিয়া,
ক্রয় নহে—হরণ করিয়া
হয় এরা স্ফীত হ'তে স্ফীত-তর—ক্রম-
স্ফীততম ;
কিন্তু যাহাদের শ্রমে এরা ধন-পতি,
ভ্রমে কভু নাহি চাহে তাহাদের প্রতি ;
ওরা যেন দুর্ভাগ্য শ্রমিক,
আর এরা কার্‌খানা-কলের মালিক
দয়াহীন ধনিক বণিক।
হে কিশোর,—যে বেদনা গেছ তুমি লভি'
ক্ষুদ্র-পরিসর তব জীবনের মাঝে,
বিংশ শতাব্দীর এক দুঃখী দীন কবি—
সে বেদনা আমারও বুকে আজি বাজে !
আমি দেখিয়াছি,—আমি জানি,
দারিদ্র্যের কত ব্যথা, দরিদ্রের অন্তরের গ্লানি
কি অসহনীয় !...
আত্মীয়-স্বজন-হীন বিদেশীর মাঝে যে আমিও
পথে পথে ফিরিয়াছি ম্লান—
"কোথা পাব কর্ম্মের সন্ধান" ;
ঘুরিয়াছি রৌদ্র-জলে বৃথা মিথ্যা আশ্বাসে কথার
আসিয়াছি ফিরে' বারবার,
পাইয়াছি কোথা অপমান,
বক্ষে বিঁধিয়াছে শ্লেষ-বাণ,—
ভাবিয়াছি, ধিক্ ! ছার প্রাণ !...
বেশ্যা তারো মূল্য আছে, মজুরেরো মূল্য আছে কিছু,
কিন্তু কবি—
তোরি শুধু মূল্য নেই,—তুই-ই হ'লি সব চেয়ে নীচু !
যোগ্যতার পরিমাপে হেয়.করি' মূল্য আপনার,
ধনীর দুয়ারে গিয়ে দেখিয়াছি নিয়ে কর্ম্ম-ভার
সাহিত্যের কারখানা-ঘরে,
দ্বারী শাস্ত্রী যারা, হায়, তাহারাও উপহাস অপমানকরে
ক্রূর হাসি হাসি' বারম্বার ;
কিন্তু হায়,—উপায় কি আর !

তবু তুমি—তুমি কবি, হায়,
আবিষ্কার ক'রে গেছ ইহার উপায় ;
বিসর্জ্জিয়া সম্মান আত্মার,
বেঁচে' মরে'-থেকে,' বারম্বার
আত্ম-অপমান চেয়ে আত্ম-হত্যা শ্রেয় বলি' নিলে তুমি বরি'—
পাপ-পুণ্য বিচার না করি' ! ..

বেঁচে' থাকিবার সাধ হয়ত বা ছিল তব মনে ;—
এমন সুন্দর ফুল ধরণীর বনে,
এমন বিচিত্র সুর বিহগের কণ্ঠে,
নদী ধায় নৃত্য-ছন্দে,
ঝরে নির্ঝরিণী,
আকাশে সুন্দর আলো,—বর্ণে গন্ধে
অপূর্ব্ব ধরণী...
আলো-ছায়া সুখ-দুঃখ মেঘ-রৌদ্রময়
এই ধরা প্রিয়-তরা নয় ?

কিন্তু হায়,—সে দারিদ্র্য কি যে রুদ্র বেশে
অকস্মাৎ দেখা দিল এসে
প্রত্যুষেই দুয়ারে তোমার ;
সে ত' নহে যোগী-বেশ—ত্যাগ-তৃপ্ত মূরতি তাহার,
বক্ষে বড় বুভুক্ষার জ্বালা, চক্ষে গাঢ় বিরক্তির রাগ,
অসন্তোষ,—বিদ্রোহ, বিরাগ,
হস্তে শূন্য ভগ্ন খাদ্য-থালি,
ললাটে চিন্তার কালি...
রৌদ্র-দিগ্ধ বৈশাখের আকাশ সে যেন
এল কাল-বৈশাখীর হেন !

একজন স্তূপাকার স্বর্ণ নিয়ে বিলাসের ছিনিমিনি
খেলে দিনমান,—
অন্নহীন খাদ্যহীন অন্য শত জন দ্বারে দ্বারে কুড়াইয়া
ফিরে অপমান।
ঐ স্বর্ণ স্তূপ ভাঙি' দিকে দিকে ছড়াইয়া দেয় ভাগ করে'—
হেন শক্তি ভগবান, এ জগতে কেহ কি না ধরে !...

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য ও রস

সাহিত্য একদিকে যেমন জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব অন্যদিকে তেমনি এই জীবন গড়িয়া তুলিবার একটি প্রধান উপকরণ। মানুষের চরিত্র দেশের সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য আবার উচ্চ আদর্শের সৃষ্টি করিয়া এই চরিত্রকে উচ্চতর স্তরে টানিয়া তোলে। যাহা সমাক্ উন্নতি সাধন করে তাহাই সাহিত্য—ইহাই শব্দটীর যৌগিক অর্থ! সাহিত্যের সহিত দেশের উন্নতি ও অবনতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই ইহার গতি কোন্ দিকে এবং ইহা দেশের ভাবী উন্নতির কতটা অনুকূল তাহা নিশ্চয়ই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের প্রকৃতিও চিরকাল ইহার দেশীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতের গৌরব ইহার আধ্যাত্মিক চিন্তায়—ইহার সাহিত্য বেদান্ত, উপনিষদ ও দর্শন। জগতের আদি গ্রন্থ বেদ আর্য্যজাতির শৈশবকালীন ধর্ম্মচিন্তার সাহিত্য। রামায়ণ ও মহাভারত ঐতিহাসিক মহাকাব্য হইলেও ধর্ম্ম ভাব হইতেই জীবনীরস সংগ্রহ করিয়াছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ সেকালকার ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জড়িত। কালিদাসের ন্যায় কবি পৃথিবীর যে কোন

দেশের গৌরব, কিন্তু ভারতের বেদবেদান্তের নিকট, উপনিষদ ও গীতার নিকট, তাঁহার প্রতিভাও মলিন। আবার তিনিও তাঁহার কাব্যগ্রন্থে দেবতাদিগের স্তবস্তুতি বাদ দেন নাই। ভারতীয় লিপির পুষ্টি অশোকের ধর্ম্মানুশাসন হইতে!

বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য দেশের ধর্ম্মের নিকট যতদূর ঋণী এত আর কিছুর নিকটই নহে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের গান গাহিয়া আপনাদিগকে ও সমকালীন সাহিত্যকে অমর করিয়া গিয়াছেন তাহার প্রেরণা আসিয়াছে ভগবদ্ভক্তি হইতে। ভারতীয় বিধবার চিরবৈধব্য, দ্বিজাতির পক্ষে বিহিত প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ আশ্রম দেশের প্রকৃতিরই পরিচায়ক। সে প্রকৃতি ত্যাগকেই চিরকাল উচ্চ আসন দিয়াছে, ভোগকে নহে। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা লইয়া মাতোয়ারা হইলেও চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্শ্বচরগণ আপন জীবনে কঠোর সংযমী ছিলেন। ভগবল্লীলা ইঁহারা যে ভাবেই অনুভব করিয়া থাকুন ইঁহাদের নিজ জীবনের আদর্শ ছিল সন্ন্যাস। চৈতন্যদেবের সংযমী ভক্তগণের লেখনী বাঙ্গলাভাষার পুষ্টিসাধনে যতটা সহায়তা করিয়াছে এতটা বোধ হয় আর কিছুতেই করে নাই—সেকালে ত' নয়ই।

প্রাচীন সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যে আসলের সহিত মেকী যে চলিত না একথা বলিতেছি না। সকলেই যে ধর্ম্মের কথা লিখিতেন তাহাও নহে। নানা বিষয়ের নানা শ্রেণীর লেখকই ছিলেন—আদিরসের কবিও ছিলেন যথেষ্ট; কিন্তু তাঁহাদের লেখায় নানা প্রকার নগ্নতার মধ্যেও সাধারণতঃ একটা নৈতিক বাঁধাবাঁধি ছিল। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের ও গোপীগণের লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন, প্রাকৃত প্রেমের বর্ণনা করিতে গেলে অতটা খোলাখুলি ভাবে লিখিতেন না। ভারতচন্দ্রও যে ঢলাঢলি করিয়াছেন তাহা "কালিকার কিঙ্কর" ও কিঙ্করীর প্রেমের বর্ণনায়।

ধর্ম্মবিশ্বাস এখন দেশে শিথিল—আচার-ব্যবহার অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধাক্কা দোষে গুণে জড়িত দেশীয় সভ্যতাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতির গুণ আমরা কমই গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। দোষগ্রহণ সহজ, উচ্ছৃঙ্খলতাও বেশ রোচক; আমরা—বাঙ্গালীরা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি। চিঠিপত্র লিখিবার প্রারম্ভে ভগবানের নাম এখন নিতান্ত সেকেলে হইয়া পড়িয়াছে। ভাল কি মন্দ কোন পুস্তকের প্রারম্ভেই আর "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" প্রণিপাত কেহ আবশ্যক মনে করে না। আহার-বিহার, চলাফেরা, বসন-ভূষণে যেমন একটা স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়াছে সাহিত্যেও দেখা দিয়াছে তাহাই। সমাজ ত মুমূর্ষু, স্থলবিশেষে অন্যায় উৎপীড়ন ভিন্ন তাহার যে কোন কর্ত্তব্য আছে এরূপ লক্ষ্য করাই কঠিন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একটা জাগরণের সাড়া আসিয়াছে কিন্তু সেখানে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নৈতিক বল ভিন্ন এই জাগরণ কতটা সুফল প্রসব করিতে পারে? সাহিত্যকে সেই নৈতিক বলের বাহন হইতে হইবে কিন্তু তাহা হইতেছে কোথায়? বিশৃঙ্খলার ফল বিশৃঙ্খলাই।

[illegible] ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা ভাণও ভাল—'মরা' 'মরা' বলিতে

বলিতে একদিন রাম নাম মুখে আসিতে পারে। কিন্তু এখন পশ্চিম হইতে যে তরল জিনিষের আমদানী হইতেছে এবং আমাদের অনেক নকলনবীশ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বিনা ওজরে গলাধঃকরণ করিয়া সাহিত্যের বাজারে উদ্গিরণ করিতেছেন তাহাতে না আছে ধর্ম্ম, না আছে তাহার ভাণ। আছে স্বাধীনতার নামে খানিকটা হলাহল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে স্বাধীন ভাবের আহ্বান দেশের যুবকগণের প্রাণে সাড়া দিয়াছে এবং অনেক স্থলে মস্তকে একটা গোলযোগ বাধাইয়া দিতেছে সেই স্বাধীন ভাবেরই বিকৃতি নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে চিরকালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা প্লাবন আনিতেছে। ইহার প্রধান বাহন হইয়াছে সাহিত্য। ধর্ম্মে যে জীবনীশক্তির অভাব, সমাজে যে বিশৃঙ্খলা, সাহিত্য তাহারই আশ্রয়ে একটা হট্টগোল বাধাইতেছে। পাশ্চাত্য আদর্শের আঘাতে বিপর্য্যস্ত সমাজের দুরবস্থাকে সাহিত্য আরও কঠোর করিয়া তুলিতেছে। ভারতের গৌরবময় নৈতিক আদর্শের আর আদর নাই। গভীর চিন্তা বা আলোচনা এখন সুদূরপরাহত। বাজে গল্প বা উপন্যাস অধিকাংশ স্থলেই মাসিক সাহিত্যের সম্বল, বাজারে কাটতির প্রধান সহায়। গৃহলক্ষ্মীরা সাধারণতঃ ইহাই বোঝেন এবং ইহাই পড়েন। কোন সাধারণ পুস্তকাগারের কর্ম্মাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যায় লোকের রুচি কোন্ শ্রেণীর পুস্তকের দিকে। অধিকাংশ লেখক সেই রুচিরই খাদ্য যোগাইতে ব্যস্ত।

সমাজ ওলট পালট হইয়া গেলেও কিন্তু এখন পর্য্যস্ত ইউরোপীয় সমাজ হইতে পারে নাই। বিদেশী নভেলে যে সকল স্ত্রীপুরুষের উদ্দাম ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা দেশেরই প্রকৃতি হইতে গৃহীত। এখানে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশৃঙ্খল সমাজে বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণ, হয়ত পরে এই সাহিত্যের প্রভাবে দেশেও উহার বাস্তব মুর্ত্তি দেখা দিবে। সাহিত্যের এই প্রকৃতি লইয়া কিছুদিন হইতে আলোচনা চলিতেছে এবং এবার স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অস্ত্রধারণ করায় কথাটা একটু বেশী রকম মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন "হাট ত্রিসীমানায় নেই বটে, কিন্তু হট্টগোল যথেষ্ট আছে। আধুনিক সাহিত্যের ঐটেই বাহাদুরী"।*

রবীন্দ্রনাথের শেল, শূল, গদা ধরার অভ্যাস নাই কিন্তু তাঁহার ছুরিকাঘাতেই অনেকের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। ডাঃ নরেশচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিবাদ ক্ষেত্রে নামিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংও যে এই অবস্থার জন্য একেবারে দায়ী নহেন এমন বলা যায় না, কিন্তু নরেশচন্দ্র প্রভৃতি যাহাই বলুন তাঁহার এই আক্ষেপও ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার নহে। সকলের কথা বলিতেছি না কিন্তু বর্ত্তমান তরল সাহিত্যের অনেক লেখককেই অল্পাধিক পরিমাণে এই রোগে ধরিয়াছে। কেহ এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে আর্টের ভিতর সাজাইয়া মোহন বেশে উপস্থিত করিতেছেন, কেহ বা আর্টের অভাবে যাহা উপস্থিত করিতেছেন তাহা নিতান্তই নোংরা।

* বিচিত্রা, শ্রাবণ, ১৩৩৪

কবিসম্রাট্ বা উপন্যাসসম্রাট্—ছোট খাট'ই হউন আর বড়ই হউন—কাহারও কথাই মাথা নোয়াইয়া নেওয়া এখনকার যুগধর্ম্ম নহে। রবীন্দ্রনাথও এ ক্ষেত্রে যতগুলি কথা বলিয়াছেন তাহার সবগুলি মাথা নোয়াইয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানে একটা মস্ত পার্থক্য দেখাইতে চাহেন—বিজ্ঞান যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সাহিত্য পক্ষপাতধর্ম্মবিশিষ্ট। এই পার্থক্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে বোধ হয় একটু রসিক ও ভাবুক হইতে হয়, "স্বয়ম্বরা" "বাণীর" অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সাহিত্যকে যে বিজ্ঞান ছাড়িয়া বিপথগামী হইতে হইবে তাহা বেরসিক লোকের পক্ষে বোঝা বাস্তবিক একটু কঠিন। রবীন্দ্রনাথ রসাত্মক সাহিত্যের স্রষ্টা। নরেশচন্দ্রও রসিক লেখক, তিনি রসবোধের মাহাত্ম্য বজায় রাখিয়া সাহিত্য-সম্রাটের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারেন কিন্তু অরসিকের পক্ষে সেরূপ স্পর্দ্ধা মোটেই শোভনীয় নহে। তবে কথাটা কেবল রসেরই নহে, একটা জাতীয় সমস্যার কথা। তাই এ ক্ষেত্রে অরসিকেরও কিছু নিবেদন অপ্রাসঙ্গিক নহে।

বাস্তবিক সাহিত্য কেবল রসসৃষ্টির—রস অর্থে বোধ হয় ইঁহারা সুকুমার রসই ধরেন—উপাদান নহে। রসসৃষ্টি নিশ্চয়ই সাহিত্যের কর্ত্তব্যের মধ্যে কিন্তু তাহাকেই আমরা সাহিত্যের একমাত্র বা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। বিলাতে Restoration যুগে রসসৃষ্টির অভাব ছিল না। উচ্ছৃঙ্খল সমাজ যে কদর্য্য রসে ভরপুর হইয়া গিয়াছিল সাহিত্যে সেই রস ভালরূপেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এখনও ইউরোপের নানা দেশের সাহিত্যে রসের রকমারি দেখিতে পাওয়া যায়। সে রস 'নিত্য' না হইতে পারে কিন্তু সমসাময়িক সমাজ তাহাকে সুরস বলিয়াই গ্রহণ করে। আমাদের মনে হয় সাহিত্যের স্থান কেবল রসসৃষ্টির—'পক্ষপাতধর্ম্মেরও'—অনেক উপরে। আজকাল যে বিকৃত মনোবৃত্তির খাদ্য সংগ্রহের জন্য ইউরোপ হইতে সস্তা মাল আমদানি করিয়া দেশময় ছড়ান হইতেছে তাহাতে সাহিত্যের যে অবমাননা ঘটিতেছে রসসৃষ্টিমাত্র প্রধানতঃ লক্ষ্য থাকিলে সাহিত্য সে অবমাননা হইতে কোন কালেই মুক্ত হইতে পারিবে না। সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে পশুকে মানুষ করা, মানুষকে দেবতা করা। ধর্ম্মের মধ্যে, বিজ্ঞানের মধ্যে (সে মনোবিজ্ঞানই হউক আর জড়বিজ্ঞানই হউক), ইতিহাসের মধ্যে যে সত্য, তাহাকে সুন্দর ও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ, সকল প্রকার মানসিক ক্লীবত্বের দূরীকরণ, সকল প্রকার জ্ঞানের বিস্তার নিশ্চয়ই সাহিত্যের কার্য্যক্ষেত্রের বহির্ভূত নহে। সাহিত্য মানব-জীবনকে কেবল সরস করিবে না, দৃঢ়ও করিবে, কেবল গোলাপ মল্লিকার সৃষ্টি করিবে না, শাল সেগুণও জন্মাইবে। সাহিত্যের ক্রিয়া কেবল হৃদয়ে নহে; মস্তিষ্ক ও মনেও আবশ্যক, আসল কেবল রসের উপর নহে, জ্ঞানেরও উপর। যাহা বাস্তব তাহাকে সুন্দর করিয়া দেখান সাহিত্যের কার্য্য। তাহাকে ঠেলিয়া দূরে রাখিলে 'বাণী' দেবী স্বয়ম্বরে কাহাকে বরণ করিবেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অনেক সময়ে আকাশ-পথে উড্ডীন হইলেও বাস্তব জগতের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের সহিত সাহিত্যের বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। বিজ্ঞান বা ইতিহাসও নীরস জিনিষ নহে। রসসৃষ্টি সাহিত্যের একাংশ মাত্র—; নীতি ও জ্ঞানের সহিত রস মিশ্রিত করিয়া মানুষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া যাওয়াতেই সাহিত্যের সার্থকতা। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে বিজ্ঞান সাহিত্যের সহায়, বিরোধী নহে।

সাহিত্যের শক্তি সর্ব্ববাদিসম্মত। সে শক্তির অপব্যবহার মার্জ্জনীয় নহে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে কত পরাধীন জাতি সাহিত্যের কৃপায় স্বাধীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে, কত শ্লেষাত্মক লেখনী সমাজকে দুর্নীতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে, কত গুরু-গম্ভীর সাহিত্যিক প্রতিভা দেশকে বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া সাম্যের সুবর্ণ সিংহাসনের দিকে টানিয়া তুলিয়াছে, কত পুরুষপরম্পরাগত কুসংস্কার সুকোমল সাহিত্যের তীব্র কশাঘাতে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ্যহীন রসসৃষ্টিতে এ সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই।

আজ যে যৌনসম্বন্ধের শিথিলতা বাঙ্গলা দেশের কথা-সাহিত্যে এতটা প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছে তাহাতে রসসৃষ্টি যতটাই হউক, চরিত্রসৃষ্টি মোটেই হইতেছে না। রসসৃষ্টি উপেক্ষণীয় নহে কিন্তু আমাদের মনে হয় অনেক উচ্চ অঙ্গের প্রতিভা দেশের প্রকৃত কার্য্যে লাগিতেছে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে মেয়েলী সাহিত্যের উপর দেশবিদেশে বাঙ্গালীর গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, শরৎচন্দ্রের প্রতিভা যে সাহিত্যে এখন প্রধান হোত্রী, বহু লেখকের হস্তে সেই সাহিত্যের বহুল প্রচার দেশটাকে কতদূর বড় করিতেছে তাহা ভাবিবার বিষয়। পুরুষোচিত দৃঢ়তা ও ওজস্বিতা এখনকার সাহিত্যে কতটুকু আছে? মাইকেল, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আসন ত এখন শূন্য।

যে দেশ সাড়ে সাত শত বৎসর মস্তক অবনত রাখিয়া, কুসংস্কার ও ধর্ম্মের নির্ম্মোককে জীবনের সম্বল করিয়া আবার বিদেশী সভ্যতার সাহায্যে মস্তক উত্তোলন করিতে চায় তাহার উত্থানের ভিত্তিতে কোমল রসের স্থান খুব বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু মেয়েলী সাহিত্য তাহাকে বড় করিতে পারিবেনা, বিদেশী ক্ষমতাবান্ জাতির উপর গালিবর্ষণও নহে। তাহার সাহিত্যকে কতকটা ধর্ম্মের দৃঢ়তা, কতকটা নৈতিক কঠোরতা প্রচার করিতেই হইবে। ধর্ম্মের বাহ্য আবরণ থাকুক বা নাই থাকুক সমাজে নীতি, চরিত্রে দৃঢ়তা ব্যতীত কোন জাতি বড় হইতে পারেনা। রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, সমাজনীতি সকল নীতির সহিতই ধর্ম্মনীতি গ্রথিত না থাকিলে পদে পদে বিড়ম্বনা ভোগ অনিবার্য্য। সাহিত্যের কর্ম্মক্ষেত্র এখানেও আছে। যদি এ কার্য্য কোমল রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে হয় ভালই, না হইলে সাহিত্যকে কঠোর রসের সৃষ্টি করিতে হইবে, রস মরিয়া যে পদার্থ জন্মে আবশ্যক হইলে তাহারও সৃষ্টি চাই। চরিত্রগঠন সাহিত্যের একটী প্রধান কার্য্য—চরিত্রনাশ একটী অকার্য্য। যৌথ কারবারে দশ জনের ধন নষ্ট হইতেছে—সাহিত্য, উন্নত নীতিজ্ঞান দাও। সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে—সাহিত্য, সশস্ত্র অগ্রসর

হও; কিছু কোমল রস ঢালিতে পার ভালই, না পারিলেও অগ্রসর হও, লক্ষ্য যেন স্থির থাকে। জাতির জড়তা দূর করিতে হইবে—সাহিত্য, লাগিয়া পড়। কেবল গালিবর্ষণ ইতরের কার্য্য, গৃহ সংস্কারই বিজ্ঞের কাজ।

যে দেশে এত বিষয় ভাঙ্গিবার ও গড়িবার আছে, সে দেশে সাহিত্যের কার্য্যক্ষেত্র যে কত বিস্তীর্ণ ও কত পবিত্র তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বিকৃত মনোবৃত্তিকে ইন্ধন যোগান ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র। যে দেশের চিরন্তন ধর্ম্মচিন্তার স্থান প্রবল অন্নচিন্তা অধিকার করিয়া বসিয়াছে সে দেশের সাহিত্য বেশী তরল না হইয়া একটু কঠিন হইলে দোষ আসিতে পারে না। যে দেশ জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, ব্যবহারভেদ ও কর্ম্মভেদের জ্বালায় অস্থিমজ্জায় জর্জ্জরিত সে দেশের চৌদ্দ আনা লেখাপড়া জানা লোক কি কেবল যৌন সম্বন্ধের কল্পিত গল্পে স্বাধীনতার মত্ততা উপভোগ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে? দেশের কৃষি, দেশের শিল্প, দেশের শিক্ষা, দেশের ব্যবস্থা প্রণালী, দেশের বাণিজ্য সকলই সাহিত্যের নিকট উদ্বোধন আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু সাহিত্য এই গুরু কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া বিকৃত রসের সৃষ্টির জন্য লালায়িত!

ইউরোপে বহুকাল হইতে স্বাধীনতার তরঙ্গ খেলা করিতেছে। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ খুঁজিয়া পাতিয়া ভারতের কোন কোণে কোন কালে কোনরকমের গণতন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের পীঠস্থান ইউরোপ। কত সামাজিক, কত রাজনৈতিক, কত যাজনিক অত্যাচারের সহিত সংগ্রাম করিয়া ইউরোপ বড় হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা ইউরোপেরই সন্ততি। তবে পাশ্চাত্য জগতে আধ্যাত্মিক চিন্তা অপেক্ষাকৃত কম, বাস্তব জগতের চিন্তাই বেশী। এই চিন্তা নানা আকারে মানুষের ভোগের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। যে দিকে লোকের মতিগতি সে দিকে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইলে সহজে তাহার গতিরোধ হয় না, স্রোত নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইউরোপেও হইয়াছে তাহাই। কলকারখানা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে—মানুষের ভোগের জন্য। পৃথিবীর নানাস্থানে বাণিজ্যতরী ক্রীড়া করিতেছে—মানুষের ভোগের জন্য। স্ত্রী পুরুষের অবাধ ভ্রমণ—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিস্তার—জন্মিয়াছে মানুষের ভোগের জন্য। স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা একটী খুব সংক্রামক জিনিষ। পুরুষেরা ইহার উদ্বোধনে প্রধান পৌরোহিত্য করিয়া থাকিলেও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও ইহা বিলক্ষণ সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে। বিগত মহাসমরে পুরুষক্ষয় ইত্যাদি কারণে স্ত্রীলোকের কর্ম্মক্ষেত্র ও অধিকার ইউরোপে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অধিকার স্ত্রীলোক কোন্দল করিয়া আদায় করিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা পুরুষের একচেটিয়া ছিল এমন অনেক ব্যাপারে এখন স্ত্রীলোকের রাজত্ব। গণতন্ত্র প্রণালী কেবল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সমাজেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। স্ত্রীলোক পুরুষের চিরন্তন শাসন আর মানিতেছে না, পুরুষের প্রতিষ্ঠিত নৈতিক বন্ধন নিতান্ত

সেকেলে মনে করিতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে—এই পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভে—অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতা, অনেকটা উচ্ছৃঙ্খলতা আসিবেই। মানুষের পারিবারিক জীবনে যত প্রকার সম্বন্ধ ও বিধিব্যবস্থা আছে, যৌনসম্বন্ধ ও তাহার বিধিব্যবস্থাই তাহার মধ্যে প্রধান। পাশ্চাত্য জগতের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এই সম্বন্ধ ও বিধিব্যবস্থার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, এগুলি নূতন করিয়া গড়িবার চেষ্টায় আছে। এই পরিবর্ত্তিত মনোভাব, এই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা ও উচ্ছৃঙ্খলতা আজ পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিফলিত।

আমাদের দেশের অবস্থা ঠিক তেমন দাঁড়ায় নাই। যুদ্ধে তেমন লোকক্ষয় হয় নাই। সমাজে যে পরিবর্ত্তন তাহা শিক্ষার ও অনুকরণের প্রভাবে। বিশ্বাসে যে শিথিলতা তাহাও ঐ কারণে। কিন্তু বহুকালের ধর্ম্মবিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা উপেক্ষার বস্তু নহে। যাঁহারা গল্প ও উপন্যাসে অসংযমের ধারা প্রবাহিত করিতেছেন তাঁহারা যে নিজেরা অসংযমী বা আমাদের সমাজে যে অসংযম দেখা দিয়াছে তাহারই সত্যরূপ প্রতিফলিত করিতেছেন এমন কথা বলা যায় না। তাঁহারা সময়ের ভাব দেখিয়া যাহা মুখরোচক মনে করিতেছেন তাহারই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি চলিতেছে। উপার্জ্জনের জন্য সাহিত্যে কদর্য্যতা অমার্জ্জনীয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হয়ত আমাদের দেশে কোন কোন স্থলে অসংযম আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার তরঙ্গ সমাজের বক্ষে কিছু আঘাতও হয়ত করিতেছে কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা অনেক স্থলেই প্রাণহীন বলিয়া তাহাতে সমাজের উপর বিশেষ কিছু রেখাপাত হয় নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেতিহাসের বিশ্লেষণরীতি প্রাচীন সমাজের অনেক বিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিলেও হিন্দুর বৈবাহিক বন্ধন বা যৌন সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যে এ পর্য্যন্ত বহুবিবাহাদি দুই একটী কুপ্রথার বিরুদ্ধতা ভিন্ন বিশেষ কোন পরিবর্ত্তিত মত আনিতে পারিয়াছে এমন মনে হয় না। পাশ্চাত্য দেশের জঞ্জাল কুড়াইয়া লইয়াই অনেক নব্য লেখক তাহা খাপছাড়াভাবে দেশে পরিবেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কথাসাহিত্য ছাড়া আরও অনেক প্রকার সাহিত্য পাশ্চাত্য ভূমিতে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। আমরা সেদিকে তেমন অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, ধরিতেছি জঞ্জাল গুলিকে। পাপের প্রতিকৃতি যে গল্প উপন্যাসে স্থান পাইবে না একথা আমরা বলি না। জীবনের ঘটনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, লইয়াই গল্প ও উপন্যাস। তাহা বাদ দিলে ভাল উপন্যাসই বা জমিবে কেন? কিন্তু পাপের চিত্র অঙ্কিত করিতে গেলেই যে পাপের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। চিত্রটী ফুটিয়া উঠিবে অথচ এমন ভাবে ফুটিবে যে পাঠকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সহানুভূতি স্থান না পায়। বর্ত্তমান লেখকগণের অনেকের দোষ তরল সাহিত্যে চিত্রগুলি এমন করিয়া ফুটাইয়া তোলেন যে সামাজিক জঞ্জালের সহিত—সে জঞ্জাল হয়ত বিদেশ হইতে আমদানি—পাঠকের সহানুভূতি জন্মিয়া যায়। ইহাতে নৈতিক ব্যাধির প্রতীকারের চেষ্টা থাকেনা—আশঙ্কা থাকে উহার সংক্রমণের।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটা সীমা আছে। নৈতিক আদর্শেরও একটা মূল্য আছে। যে দেশে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে শয়নকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য স্মৃতির কঠোর শাসনে এক সময়ে নিয়মিত করার চেষ্টা হইয়াছিল, সে দেশে পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে কতকটা বিশৃঙ্খলা হয়ত একটী স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কিন্তু সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা আনিতে গেলে অতীতকে একেবারে পদাঘাত করিলে চলিবে না। বিশৃঙ্খলা সমাজে যথেষ্টই আসিয়াছে এবং অনেক বিষয় ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবারও সময় হইয়াছে। এই গঠন কার্য্যে সাহিত্য ঠিক ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগুক।

কথা এই যে তরল সাহিত্য সে পথে অগ্রসর না হইয়া বৈদেশিক অনুকরণে আরও বিশৃঙ্খলা আনিতেছে। সংযম ও নৈতিক কঠোরতার যে একটী মূল্য আছে বর্ত্তমান যুগের অনেক গল্প ও উপন্যাস তাহা উড়াইয়া দিতে চায়। বেশ্যা বা ব্যভিচারিণীর মধ্যেও মহত্ত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সে মহত্ত্ব তাহার ইন্দ্রিয় লালসার জন্য নহে, সেই লালসার দমনে অথবা তাহার অন্যান্য মনোবৃত্তির জন্য। নবীন লেখকগণ অনেক স্থলে সে কথা ভুলিয়া যান। যাঁহারা পাকা ওস্তাদ তাঁহারা কতক পরিমাণে লেখনীকে সংযত রাখেন, ব্যভিচারকে অনেক সময়ে দেহের মধ্যে স্থান না দিয়া মনের মধ্যে জাগাইয়া রাখেন। অনেক লেখকই যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অঙ্কিত করিয়া আসল চিত্রে রং ফলাইতে চান তাহা যে বাস্তব জগতে অস্বাভাবিক ইহা বুঝিয়াও বোঝেন না এবং সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাদের মাথায় নানা প্রকার অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ভাব ফুটাইয়া তোলেন। যাঁহারা পাকা নহেন, এই সংযমটুকুও রাখিতে জানেন না, তাঁহাদের লেখার ফল আরও বিষময়।

যাহা কুৎসিৎ তাহাকে সুন্দর করিয়া লোকের সম্মুখে ধরা, যাহা বিষময় তাহাকে অমৃতময় ভাবে তরুণ-তরুণীগণের নিকট উপস্থিত করা—ইহাতে ভগ্নস্বাস্থ্য সমাজের যে কি অপকার হইতেছে তাহা বলা যায় না। গণিকার মহত্ত্ব বা দ্বিচারিণীর সতীত্ব প্রচারে এতটা ব্যস্ত না হইলেও বোধ হয় প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকগণের লেখনী ব্যর্থ হইত না। দেশের অভাব অনেক, অভিযোগ অসংখ্য। যেখানে লাইকার্গাসের প্রয়োজন সেখানে এপিকিউরাস্‌কে সম্মুখে দাঁড় করাইলে সে অভাব-অভিযোগের মীমাংসা হইবে কেমন করিয়া?

বাঙ্গালী জাতি যে বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছে—নৈতিক, দৈহিক, আর্থিক যে-সকল ঘোর অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহাতে তাহার কঠোর নিয়মের অধীনে স্বাস্থ্যলাভ আবশ্যক। রোগীকে আরও রুগ্ন করার যে চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে কি বস্তুতঃ প্রত্যবায় নাই?

একথা বলা যাইতে পারে যে দুই এক জন পাকা ওস্তাদের লেখার অদৃষ্টে যাহাই হউক, এই শ্রেণীর অধিকাংশ লেখাই দীর্ঘজীবী হইবে না। বৈদেশিক আক্রমণে তরল

সাহিত্য বিপর্য্যস্ত এবং বিপথগামী হইয়া পড়িলেও প্রতিক্রিয়া একদিন আসিবেই। দেশের প্রকৃতি—হয়ত বর্ত্তমানযুগের উপযোগী রূপান্তরিত ভাবে--আবার দেখা দিবে। অশন বসনে যথেচ্ছাচারী অনেক বাঙ্গালীকে হঠাৎ কঠোর সংযমী হইতে দেখা যায়, ধর্ম্মজগতে উপহাসকারী অনেককে পরিণত বয়সে বারাণসী ও বেদান্তের বিষম ভক্ত হইতে দেখা যায়—তাঁতিকুল ছাড়িয়া অনেকে শেষ বয়সে বৈষ্ণবকুলে একেবারে গা ঢালিয়া দেন। এই যে দেশের প্রকৃতি সাহিত্যও তাহা এড়াইতে পারিবে না। তবে এই প্রতিক্রিয়া কবে আসিবে কে বলিতে পারে?

যখনই দেশে প্রকৃত উন্নতির স্রোত দেখা দিবে, সাহিত্যেরও ধারা বদ্‌লাইয়া যাইবে। যাহাতে সে দিন শীঘ্র আসে সে দিকে দেশের কৃতবিদ্য, নীতিপরায়ণ, স্বদেশহিতৈষী লেখকগণের আন্তরিক চেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

দশচক্র

(১০)

একটা আয়ার সহিত শশীর হৃদ্যতার কতটা কদর্থ করা যাইতে পারে তাহাই করসাহেব ইঙ্গিতে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শশী ত আয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিতে যায় নাই। সে আলাপ করিয়াছিল তাহার গৌরীদির সহিত।

গৌরী কোথায় কি চাকুরী করিতেছে সে শুনিয়াছিল। কিন্তু সে কোথায় আছে, তাহার ছেলের কি হইল এ সব প্রশ্নের কেহ সদুত্তর দিতে পারে নাই। এতদিন পরে এই প্রবাসে হঠাৎ যখন দেখিল গৌরী আয়ার কাজ করিতেছে—পরের ছেলেকে লইয়া ঘুরিতেছে, নিজের ছেলেকে দেখিবার সময় পায় না, তখন লজ্জা ও করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়া গেল। অত্যন্ত কষা জুতা পায়ে দিয়া পথে চলিতে চলিতে সাহেবীয়ানার smartness বজায় রাখা যায় না। শশীও তাহার ঠাট বজায় রাখিতে পারিল না। সে যে সাহেব, সে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের বন্ধু, এসব কথা ভুলিয়া সে গৌরীর উদ্ধারে তন্ময় হইয়া উঠিল। নিজে গিয়া ডেপুটী বাবুর সহিত দেখা করিয়া গৌরীকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থ দিতে চাহিয়া তাঁহাকে এত অপমানিত করিল যে অন্য কেহ হইলে তিনি তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিতেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিথিকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার সাহসে কুলাইল না। নিজের অনেক অসুবিধা ঘটাইয়াও তিনি গৌরীকে ছুটি দিলেন, এবং চাকুরী বজায় করিতে হইলে

এত দীনতাও স্বীকার করিতে হয় ভাবিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর মনে মনে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্ল্যাটফরমশুদ্ধ লোক সবিস্ময়ে দেখিল যে-সাহেবটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী বাবুর আয়াকে সঙ্গে করিয়া সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিয়াছেন; এবং আয়ার চার পাঁচ বছরের ছেলেটাকে কোলের উপর বসাইয়াছেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শশী একটু মুস্কিলে পড়িল। সে এক ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে paying guest রূপে বাস করিতেছিল। গৌরীকে সেখানে লইয়া যাওয়া চলে না। আর একটী বাসা ঠিক করিতেও দু'এক দিন সময় লাগিবে। সে ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে তাহার খুড়িমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৌরীর উপর প্রতিভার যথেষ্ট অভিমান ছিল। তিনি তাহাকে কাছে রাখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। তাঁহার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইয়াছিল এবং কোন সংবাদ না দিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি কখনও গৌরীর সহিত দেখা হয় ত তিনি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না। কিন্তু ঐ যে নধর কালো ছেলেটী গৌরীর কোল আলো করিয়া আছে, উহাকে সারথি করিয়া সে যে আসিয়াছে তাঁহার হৃদয়ব্যূহ ভেদ করিতে, এখন তিনি তাহাকে ঠেকাইবেন কিরূপে ?

গৌরীকে উদ্ধার করিতে গিয়া শশী নিজের কতটা ক্ষতি করিয়াছে তাহার বিবরণ শুনিয়া ভূপতি বলিলেন "এতটা করবার কিছু দরকার ছিল ?"

শশী উত্তর করিল শ্যামবাবুর স্ত্রী দাসী হ'য়ে থাক্‌বে, তাঁর ছেলে দাসীর পুত্র হ'য়ে মানুষ হবে, এ আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। এই দুটী আত্মার জন্য আমি অনেক কিছু ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছি। "আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।"

ভূপতি। বেশ কথা! পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার Lucy-কে বাদ দেওয়া যায়, ত বাদ দেওয়াই ভাল। আমাদের সেকেলে সংস্কার হচ্চে ঐ লুসীরা পৃথিবীর চেয়ে বড়।

শশীর নিজের মনও কয়েক দিন ধরিয়া এই কথাই বলিতেছিল। তাই প্রতিভা যখন লুসীকে পত্র লিখিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন, তখন সে মুখে আপত্তি করিল বটে, কিন্তু মনের প্রবণতা দমন করিতে পারিল না। তেঁতুলের আচার স্পর্শ করিবে না বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখ রসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

শেষে একদিন নিজের কাছে শশীকে হার মানিতে হইল। সে লুসীকে পত্র লিখিল। তবে খুব লুকাইয়া লিখিল, এবং পুরাণ ঔদ্ধত্যকে একেবারে বাদ দিতে সাহস করিল না। খুব সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য পেশ করিল;—"তোমরা আমার প্রতি সদ্ব্যবহার কর নি। স্ত্রী ও

পুরুষের সকল মিলনের মধ্যে কেবল একটী উদ্দেশ্য আছে এমন কথা মনে করা তোমাদের অন্যায়। আয়া মহলে আমার যে বন্ধুকে দেখেছিলে তিনি সত্যই আমার আত্মীয়। আমরা দু'জনে ভাইবোনের মত একসঙ্গে কিছুকাল মানুষ হ'য়েছি। আমি এখনও তাঁকে দিদি বলি। এ সব কথা বুঝিয়ে বল্‌বার সময় দাওনি তোমরা। You kicked me out. একটা kiss-এর বদলে I got a parting kick."

শশী সকাল বিকাল letter box হাতড়াইতে লাগিল। কিন্তু এ পত্রের কোন উত্তর আসিল না।

(১১)

শ্যামাচরণের ধনসম্পদ কোন কালেই বেশী ছিল না। মাষ্টারী হইতে তাঁহার আয় হইত যৎসামান্য, খরচও হইত যৎসামান্য। কিন্তু হিসাবের খাতায় U-tube-এ দুই দিকের অঙ্ক এক level-এই থাকিত। বৃদ্ধ বয়সে গৌরীকে বিবাহ করিয়া তিনি কিছু সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হৃদ্‌রোগগ্রস্তের শ্বাসপ্রচেষ্টার ন্যায় এ বিষয়ে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় যথেষ্টই দেখা গেল, ফল সে পরিমাণে হইল না। U-tube-এর আয়ের দিক ভারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের দিক ভারি হইয়া গেল।

দেড় বৎসরের শিশু লইয়া গৌরী যে দিন বিধবা হইল, সে দিন তাহার আর্থিক অবস্থা প্রথম বৈধব্যের সময়ে যেমন ছিল তার চেয়ে বেশী আশাপ্রদ নয়। কিন্তু সেদিনকার গৌরী আর এখন নাই। তখন সে জলের মত গড়াইয়া চলিত, এবং একটা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে তলায় গিয়া জমিত। শ্যামের শ্রদ্ধার ধবলাচলে সেই জল এখন বরফের মত কঠিন হইয়াছে। এখন তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, আকার আছে। এখন আর যে কোন আধারে সে পূর্ব্বের মত খাপ খায় না। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকার নীচতা ও নিষ্ঠুরতাকে সে পূর্ব্বের মত সহজে বরণ করিতে পারিলনা। নিজে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং নীলিমার শরণাপন্ন হইল। এ চেষ্টার কথা প্রতিভা ও নিশির কাছে গোপন রাখিবার জন্য সে নীলিমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল। কারণ, প্রতিভাকে সে ভয় করিত। নিশির উপরেও তাহার বিশেষ ভরসা ছিল না। সে কোথাও দাসী হইয়া থাকিবে জানিতে পারিলে ইঁহারা নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে আসিবেন। কিন্তু এমন করিয়া বাঁচিতে তাঁহার ইচ্ছা নাই।

নীলিমা বুঝাইলেন যে কোন হিন্দুর বাড়ীতে গৌরীর স্থান হইবে না। কোন অহিন্দুর বাড়ীতে সে পাচিকা না হইয়া যদি আয়া হইয়া থাকে তবে তাহার উপার্জ্জন বেশী হইবে, সম্মানও বেশী হইবে। গৌরী দেখিল এতদিন nursing করিয়া সে যে যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে আয়া হইতে তাহার বাধা নাই।

যে ডেপুটীর বাড়ীতে গৌরীর কাজ করিতেছিল, তিনি তখন কলিকাতায় ছিলেন। নীলিমার সাহায্যে গৌরী এখানে প্রবেশ করে। ডেপুটী বাবুটী সাহেবী কায়দায় থাকিবার চেষ্টা করিতেন, অথচ সেরূপ অর্থসঙ্গতি ছিল না। গৌরীর মত আয়াকে তিনি লুফিয়া লইলেন। কারণ ছেলে সঙ্গে থাকাতে তাহার বাজার-দর খুব কম। অথচ, ছেলেটী এত ছোট নয় যে মাতাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিবে।

গৌরী আয়া হইয়াই জীবন কাটাইত কিন্তু শশী কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ যেন তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। সে বাধা দিবার চেষ্টা করিল না। কারণ, শশী বাধা মানিবার পাত্র নয়। সে কথা বলিতেই জানে, শুনিতে জানে না।

কেন জানি না, শশীর সাহায্য লইতে গৌরীর কিছু মাত্র সঙ্কোচ ছিল না। তাহার সকল দানকে সে প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিত। তা' ছাড়া, তাহার দ্বারা শশীর কোন ক্ষতি হইবে সে মনে করে নাই। কিন্তু প্রতিভার কথার মধ্য হইতে সে দেখিতে পাইল যে সে শশীর যতটা সর্ব্বনাশ করিয়াছে এমন আর কাহারও হয়ত করে নাই।

শশী নূতন বাসা করিল। আয়ার সেবার জন্য আয়া নিযুক্ত করিল। কিন্তু গৌরীকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে পলাইয়াছে। যাইবার সময় একখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে: "আমাকে ক্ষমা করো, ভাই। আমি বড় অপয়া। যাকে ছুঁয়েছি তারই কপাল পুড়েছে। অনেক দুঃখ দিয়েছি। আর পারি না। আমাকে ফিরিয়ে এনে আবার আমার পাপের বোঝা বাড়িও না। ছেলেটাকে দেখো।"

শশীর মনে হইল যে পালকে আশ্রয় করিয়া সে তীরের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়াছে, আজ ঝড়-ঝাপটের মাঝখানে সেই পালের রসিটা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

(১২)

চিন্তা করিতে করিতে শশী Easy chair-এ ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যেন জাহাজের bunkএ শুইয়া ঘুমাইতেছে। এমন সময়ে Captain তাহার Cabinএ ঢুকিয়াই বলিলেন "Hallo! Mr. Banerji is dead". অমনি দশ বারোজন খালাসী আসিয়া শশীকে একটা ছালায় পুরিয়া সেলাই করিতে লাগিল। এখনি তাহাকে উন্মত্ত কাল জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। শশী জানাইতে চাহিল যে সে মরে নাই। কি তাহাকে এত কসিয়া বাঁধা হইয়াছে যে সে হাত পা নাড়িতে পারে না, কথা কহিতেও পারে না। এমন সময় লুসী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল, এবং তাহার কানে কানে বলিল, "ওঠ, ওঠ, ঘুমচ্চে দেখ!" শশী চ'খ চাহিল। দেখিল লুসী তখনও তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আছে। লুসীর নরম নরম চুলগুলি তাহার গালে আসিয়া ঠেকিয়াছে। শশীকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া লুসী খিল

খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণে শশীর চমক ভাঙিল। সে একলাফে দাঁড়াইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা থেকে এলে ?"

লুসী। "পালিয়ে এসেছি।"

শশী। পালিয়ে এসেছ, কি বল ?

লুসী। তা কি কর্‌বো ? বাবা আস্‌তে দেন না যে।

শশী। এ একটা কী করে বসেছ,' এ রকম কাজ কল্লে কেন ?

লুসী। বাবা ! ঝগ্‌ড়া কর্‌চে দেখ। আমি—

শশী আর ঝগড়া করিল না। হাসিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিল। লুসী বসিল না। হাত ধরিবামাত্র সে আরও শক্ত হইয়া দাঁড়াইল, এবং মুখ বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "Kiss me, Kiss me."

শশীর মাথার মধ্যে তখন তোলপাড় হইতেছিল। সে Kiss করিতে ভুলিয়া গেল। কেবল, যে কাজটা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কলের মত সেইটাই করিয়া গেল,—লুসীকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল। লজ্জা ও অভিমানে লুসীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে দাঁত দিয়া প্রাণপণে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে লাগিল।

শশী দেখিল সে একটা কি অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কি যে করিয়াছে মনে করিতে পারিল না। একটা অশুভ আশঙ্কায় সে তখন উদ্‌ভ্রান্ত। ঠিক প্রেমালাপ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। তবু কর্ত্তব্যবোধে সে লুসীর পাশে বসিল, এবং তাহার পিঠে হাত দিয়া মিষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিল, "আমি জান্‌তুম, তুমি আস্‌বে।"

একটা অবলম্বনের স্পর্শমাত্রে লতার ডগা যেমন বাঁকিয়া যায়, তেমনি করিয়া লুসী তাহার বুকের উপর ভাঙিয়া পড়িল। এবার শশী সত্য দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া একটী চুম্বন করিল।

একটী ছোট চুম্বন batteryর poleএর মত লুসীর অসাড় দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং শশীর গালে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিন তোমার খুব লেগেছিল ?"

সেদিনকার বেদনা সে আজ হাত বুলাইয়া দূর করিতে চায় !

আনন্দে শশীর চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। সমস্ত নারী-জাতির প্রতি করুণায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "কি দুর্ব্বল ইহারা ! একটা পরিস্ফুট প্রতারণাকে চিনিতে পারে না ; আপনার একাগ্রতার রঙে অতি কদর্য্যতাকেও রাঙাইয়া তোলে। আজ দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া ইহাকে নরকে লইয়া যাইতে চাহিলে সে 'না' বলিতে পারিবে না।

অথচ এই শিশুধর্ম্মী মানুষগুলা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে সমাজের. আণ্ডাবাচ্ছা পর্য্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে ! তাহাদের প্রতি পদস্খলনে একেবারে ফাঁসির হুকুম দেয় !"

চ'খ খুলিয়া শশী বলিল "তোমার বাবা কি মনে কর্‌বেন ভাবচি।"

লুসীর নিজের মনেও ভয় হইয়াছে। সে বলিল "অত ভাব্‌তে পারি না, বাপু।"

এমন সময়ে গৌরীর ছেলেটী ঘরে ঢুকিয়া নূতন লোক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। লুসী জিজ্ঞাসা করিল "এ কে ?"

শশী। তোমার সেই আয়ার ছেলে।

লুসী। ওর মা' টা এখানে আছে ত ?

শশী। না। আপাততঃ পালিয়েছে। তবে তাকে খুঁজে বার কর্‌তে হবে।

লুসী আর কোন কথা না বলিয়া খট্‌ খট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শশী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল "হ'ল কি ?"

লুসী। ছাড় !

শশী। তুমি আমার চিঠি পাওনি ?

লুসী কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে ত সব জানিয়া শুনিয়াই এখানে আসিয়াছে।

শশী বলিল "ভেতরে এসো আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্চি।"

লুসী আসিতে চাহিল না। শশী জোর করিয়াই তাহাকে ধরিয়া আনিল। তারপর গৌরীর ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া যাইতে লাগিল :—

"প্রথম যখন ইনি আমাদের বাড়ীতে আসেন, তখন ইনি লেখাপড়া জান্‌তেন না,

লুসী। And still—

শশী। তখন এঁর বয়স আঠার বৎসর মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই এমন ভাল গৃহিণী ছিলেন, আমাদের এত ভাল বাসতেন, এমন সেবা কর্‌তেন,—

লুসী। Poor boy !

শশী। ঐ পর্য্যন্ত। আমি তখনও তাঁকে দিদি বলতুম, এখনও তাঁকে দিদির মত দেখি।

লুসী। Fancy !

শশী। কিছুদিন বাদে আমাদের বাড়ী থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। নিজের বাড়ীতেও খেতে পেলেন না। শেষে পালিয়ে গিয়ে একটা মুসলমানের সঙ্গে—

লুসী। Horrid woman !

শশী। তুমি অত রাগ কর্‌চো কেন ?

লুসী। তুমি বল্‌তে চাও ঐ রকম একটা লোকের সংসর্গে—

শশী। কিন্তু তুমিও যে ঠিক ঐ রকম কাজ করে ফেলেছ।

লুসী একেবারে লাফাইয়া উঠিল।

শশী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'আমি তোমার নিন্দা কর্‌চি না। তোমার মনে কোন পাপ নেই। লোকে বাইরে থেকে যা মনে কর্‌বে আমি তাই বলেছি।'

এক মুহূর্ত্তে অস্পৃশ্য horriod woman শ্রদ্ধেয় হইয়া দেখা দিল। লুসী কিন্তু হারিতে চাহিল না। আয়ার প্রতি তাহার বিদ্রোহ ভাবটাকে ঠেকোঠাকা দিয়া জাগাইয়া রাখিল।

(১৩)

শশীর ব্রাহ্ম হওয়া হইল না। দীক্ষা লওয়া ইত্যাদিতে নষ্ট কবার মত সময় তাহার ছিল না। বিবাহ কার্য্যটা তাহাকে তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতে হইল। কাজেই কৃশ্চান মতে তাহা সুসম্পন্ন হইল। ঘটনাচক্রে শশী কৃশ্চানই রহিয়া গেল। ঘটনাচক্রে শশীর যে সব সন্তানাদি হইবে তাহারা যে যে ঘরে বিবাহ করিবে, এই সকলের যে সব সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহাদের সহিত যাহারা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবে, এবং তাহাদের সকলের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে সকলে অতি সহজে বুঝিতে পারিবে যে তাহারা যে সব পাপকার্য্য করিবে, যীশু নামক ঈশ্বরপুত্র কোন পূর্ব্বাকালে সেগুলার প্রায়শ্চিত্ত সারিয়া রাখিয়াছেন। আর কেহ তাঁহাদের উদ্ধার করিতে পারিবে না এটুকু বিশ্বাস থাকিলেই তাঁহারা স্বর্গে গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সকাল হইতে সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যা হইতে সকাল, মজা করিয়া ঈশ্বরের স্তবগান শুনিতে পাইবে, এবং স্বর্গের গাড়ীবারাণ্ডা হইতে দেখিবে—পৃথিবীর বাকী লোকগুলা নরকের তপ্ত খোলায় খৈ ফুটিতেছে।

(১৪)

নিশি জিজ্ঞাসা করিল 'গৌরীর ছেলেকে নিয়ে তোমার অসুবিধা হয় নি ?'

শশী বলিল " প্রথম দিন দুই লুসী খুব রাগ করেছিল। এখন দেখি সমস্তদিন সেটাকে নিয়েই পড়ে আছে। আমিই বরং তার নাগাল পাই না।"

নিশি। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে সত্যই কোন জাতিভেদ নেই।

শশী। একটা কথা ভুলে যেয়োনা,—ছেলেটা একেবারে ঘুট্‌ঘুটে কাল।

নিশি। গৌরীর কি হল ?

শশী। আমি দেখ্‌লুম আমার কাছে তিনি থাক্‌তে চান না। তাই চিরকাল আয়াগিরী না করিয়ে আমি তাঁকে Eden Hospital এ ভর্ত্তি করে দিয়েছি।

নিশি। Eden Hospital এ !

শশী। Nursing শিখ্‌তে।

নিশি। আমাকে বল্‌লে না কেন ? তা,—তুমি নিজেই সব কর্‌তে পার। কারুর সাহায্যের অপেক্ষা রাখ না।

ভূপতির কাছে বসিয়া দুই জনের আলাপ হইতেছিল। নিশি হঠাৎ ভূপতির দিকে ফিরিয়া বলিল "আমরা কি জন্তু হয়েই গেলুম, কাকাবাবু! শশী যা মনে করে তাই কর্‌তে পারে। তার life আছে।"

ভূপতি। ও life জিনিষটা বুঝিনা ভাল। যে বটগাছ ডালের পরে ডাল, পাতার পরে পাতা, গজিয়ে বেড়ে চলেছে তার life আছে বোঝা যাচ্ছে। আবার যার শুধু রূপ আছে, কোন ক্রিয়া নেই, মাসের পার মাস, জড় পাথরকুঁচির মত নিশ্চেষ্ট হয়ে হাঁড়ির ভেতরে পড়ে আছে, সেই শুক্‌নো ছোলার মধ্যেও life আছে, শুন্‌তে পাই। রূপও নেই, ক্রিয়াও নেই, এমন কোন অবস্থায় life আছে কি না তাই বা কে জানে ?

সমাপ্ত

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য বীথি

ভাল বই—গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বঙ্গের রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও বোম্বাই অঞ্চলের কয়েকজন শিক্ষিত পুরুষ ভারতের প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন; সেইদিন হইতে এপর্য্যন্ত ধীরে ধীরে অনেক ভারতবাসী ইউরোপীয়দের আদর্শে ও দৃষ্টান্তে এই কাজে ব্রতী হইয়াছেন। উপস্থিত শতাব্দীতে কয়েকজন শিক্ষিত ভারতবাসী এদিকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ও ইঁহাদের কয়েকজনের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান বিজ্ঞ ইউরোপীয়দের কাছে আদৃত হইয়াছে। এখন কেহ কেহ স্বদেশপ্রেমের মোহে প্রাচীনকালের রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি একালের প্রতিষ্ঠানের বর্ণে বিচিত্র করিয়া ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করিয়া থাকেন, কিন্তু ধীরে ধীরে সত্যনিষ্ঠ সমালোচকদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এবৎসর যে কয়েকজন পণ্ডিত সমালোচক প্রাচীনকালের জ্ঞানের ও সামাজিক অবস্থার সুবিচারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাইপ্রদেশের আর, ডি, রাণাডে একজন প্রধান ব্যক্তি। ইঁহার নূতন প্রকাশিত গ্রন্থে উপনিষদগুলির মতবাদ ও উৎপত্তির ইতিহাস অতি যোগ্যতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ প্রণীত হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগও এই বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে, আর সেখানিও রাণাডের গ্রন্থের মত একখানি শিক্ষণীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য; অধ্যাপক নারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৌটিল্যের নামে প্রচারিত অর্থশাস্ত্রখানির যেরূপ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। এই সকল গ্রন্থই রচিত হইয়াছে ইংরেজিতে। বঙ্গভাষায় রচিত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত "ধর্ম্মের তত্ত্ব ও সাধন" গ্রন্থখানিও এই সঙ্গে উল্লেখ করিতে পারি; এইগ্রন্থে হিন্দুজাতির সকল যুগের ধর্ম্মমতের ও আনুষঙ্গিক দার্শনিক তত্ত্বের দক্ষ সমালোচনা আছে। গ্রন্থখানি ৫০০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ হইলেও একই গ্রন্থে নানা যুগের নানাতত্ত্ব

বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া বিবৃত বিষয়গুলি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় লিখিত হইতে পারে নাই ; তাহা ছাড়া সাধনার একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতের প্রাধান্য প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের লক্ষ্য বলিয়া, বিচারিত অনেক ধর্ম্মমতের খাঁটি স্বরূপ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পারে নাই। তবুও বলিতে পারি, সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের এই গ্রন্থখানি শিক্ষণীয় সাহিত্য হইয়াছে।

* * * *

নূতন ঐতিহাসিক তথ্য—হরপ্পায় ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইবার কথা এখন অনেকেই অল্পবিস্তর শুনিয়াছেন। ঐসকল স্থানে প্রাচীন কালের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা। এইমাত্র আমাদের ঐতিহাসিক সমালোচনার দক্ষতার কথা বলিয়াছি; কিন্তু প্রাচীন লিপি প্রভৃতির ব্যাখ্যার ক্ষমতার কথায় স্বীকার করিতে হইবে যে এখনও সে বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা এদেশে জন্মে নাই। এদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরা এরূপ স্থলে প্রায়ই চিনির বলদ হইয়া কাজ করেন। আসিরিয়া, বেবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশের লিপির সঙ্গে পূর্ণ পরিচয় না হইলেও মধ্যএসিয়ার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না জন্মিলে একাজ করা যায় না। যে আঠারখানি প্রাচীন লিপিসম্বলিত পদার্থ পাওয়া গিয়াছে L. A. Waddell তাহার পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। পশ্চিম এসিয়ার সুমেরদের লিপির সঙ্গে এই প্রাচীন লিপির তুলনা করিয়া ইনি লিপিগুলির আংশিক পাঠ উদ্ধার করিয়া কয়েকটি বৈদিক নাম ও সুমের-বেবিলনের নাম পাইয়াছেন। কশ্ব, দক্ষ, ভৃগু, পরশুরাম প্রভৃতি ভারতীয় নামের সঙ্গে সারগন্, বুর সিন্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাম পাইয়াছেন। আশ্চর্য্য মনে হয় যে এই লিপির পরবর্ত্তী সময়ের বৈদিক সাহিত্যে যে-সকল জাতির নাম পাওয়া যায় না কিন্তু অনেক পরবর্ত্তী যুগে পাওয়া যায় সেইরূপ কয়েকটি নাম (যথা, শক, গথ প্রভৃতি) এই লিপিতে আছে। ওয়াডেলের অনুমান খৃঃ পূঃ একত্রিশ শ অব্দে পঞ্জাবে ও আফ্‌গানিস্তানে এই লিপির কর্ত্তাদের প্রথম উপনিবেশ হয় আর তাঁহাদের আদি স্থান ছিল সুমের-বেবিলন প্রদেশে। এ অনুমান সত্য কি-না তাহা বিশেষজ্ঞেরা বিচার করিবেন ; অতি অল্প কয়েকটী কথার নিদর্শনে বা প্রমাণে তাড়াতাড়ি অনেকখানি ইতিহাস রচনা করা চলে না। আমাদের দেশের জনকতক যোগ্য যুবককে যদি পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ার প্রত্নতত্ত্ব শিক্ষার জন্য পাঠান যায় তবে এদেশে ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হইতে পারে। ইউরোপীয় আর্য্যদের সম্বন্ধে Childe-এর সংগ্রহ গ্রন্থে যাহা আছে তাহার সঙ্গে ভারতসীমান্তের আবিষ্কার মিলাইয়া অনেক অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন আছে। ভারতের ও পারস্যের আর্য্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখন নৃতত্ত্ববিভাগে যে-সকল আনুমানিক কথা জোর করিয়া খাঁটি সিদ্ধান্তের নামে প্রচার করা হয় তাহা অধিকদিন টিকিতে পারিবে মনে হয় না।

পুস্তক-পরিচয়

সাধনা—স্তোত্র ও সঙ্গীত সংগ্রহ পুস্তক। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম হইতে শ্রীঅমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত—মূল্য সাধারণ সংস্করণ ১৲ বোর্ডবাঁধাই ১।০

এই পুস্তকের সমস্ত আয় স্ত্রীশিক্ষা ও অনাথা মায়েদের সাহায্যে ব্যয়িত হইবে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় একটী মূল্যবান অবতরণিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

পুস্তকখানির প্রচ্ছদপটে শিল্পিবন্ধু চারুচন্দ্র রায়ের একটি সুন্দর পরিকল্পনা মুদ্রিত হইয়াছে। ঊর্দ্ধে উদীয়মান সূর্য্য,—নিম্নে তড়াগ-তরঙ্গে দোলায়মান পদ্মকোরক। এখানে সূর্য্যোদয় বোধ হয় ব্রহ্মজ্ঞানোন্মেষ বা পরাভক্তির উদ্বোধনের প্রতীক—পদ্মকোরক বোধ হয় মোহমুগ্ধ নিমীলিত হৃদয়। সাধনার সঙ্গে এই 'বোধনার' রূপচিত্রের সামঞ্জস্য আছে।

পুস্তকখানিকে সঙ্কলয়িত্রী দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। ১ম ভাগে আছে দেবদেবীর স্তব ও ঋগ্বেদ উপনিষৎ, ভাগবত গীতা ও চণ্ডী হইতে নির্বাচিত সূক্তশ্লোকাদি। এ গুলি সমস্তই আবৃত্তির উপযোগী। দেবদেবীর স্তব নির্ব্বাচনে হিন্দুর সকল ধর্ম্মশাখার প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে সকল ছন্দে আবৃত্তি মর্ম্মস্পর্শী ও শ্রুতিরঞ্জন হয় সেই সকল ছন্দে রচিত স্তব-স্তোত্রই এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। উপনিষদের অংশগুলির নিম্নে বঙ্গানুবাদ আছে। ঋগ্বেদাদি হইতে নির্ব্বাচিত অংশগুলি এমনই সতর্কতার সহিত সংগৃহীত যে সমস্তগুলি মিলাইলে হিন্দু উপাসনা ও সাধনার যাহা মূলসূত্র, সারমর্ম্ম ও বীজমন্ত্র তাহা একত্র উপনিবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক হিন্দুর এই কয়েক পৃষ্ঠা কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ১ম ভাগের রচনাবলীর মধ্যে একটি বাংলায় (রবীন্দ্রনাথ রচিত বীণাপাণি বন্দনা) একটি পালিতে (বুদ্ধবন্দনা—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহোদয় কৃত বঙ্গানুবাদ সহ)—আর একটি বাংলায় পশুপতি স্তব। বাকী সমস্তই সংস্কৃতে রচিত।

২য় ভাগে সুবিখ্যাত বাংলা ও হিন্দী গান সংগৃহীত হইয়াছে। এই গানগুলিকে সঙ্কলয়িত্রী ১৬ ভাগে ভাগ করিয়াছেন—শ্যামাসঙ্গীত, শ্যামসঙ্গীত, রামকৃষ্ণসঙ্গীত, গৌরাঙ্গসঙ্গীত, জাতীয়সঙ্গীত ইত্যাদি।

এইভাগে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কমলাকান্ত, রামপ্রসাদ, সুরদাস, মীরাবাই, নানক, কবীর, নরোত্তম, লোচনদাস কেশব বিবেকানন্দ ইত্যাদি সাধকগণের ভজনসঙ্গীত আছে আবার বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক নব্য কবিগণের রচিত ধর্ম্ম-সঙ্গীতও আছে। এই গ্রন্থে জাতীয়সঙ্গীত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঙ্কলয়িত্রী যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত ও সমীচীন—

"দেশমাতৃকার উদ্দেশে রচিত সঙ্গীতগুলিকে ধর্ম্মসঙ্গীত বলিয়াই গণ্য করা হইল। বাঙ্গলার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যাঁহাকে "ত্বং হি দুর্গাদশপ্রহরণধারিণী," বলিয়াছেন তিনিও মহামায়ার মতনই উপাস্যা—অথবা চিন্ময়ী মহামায়ার মতনই মৃন্ময়ী প্রতিমা সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?"

জাতীয়সঙ্গীত পর্য্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ও দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি সভা-জীবনোন্মাদক সঙ্গীতকে সন্নিবিষ্ট দেখিয়া সুখী হইলাম। পুণ্যব্রতা মহিলাদের রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। কবি বলিয়া সুরচয়িতা বলিয়া অনেকের খ্যাতি নাই—কিন্তু তাঁহাদের রচিত গানের খ্যাতি গায়কগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘোষিত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের রচিত সাধনসঙ্গীতগুলি তথাকথিত কবিত্বে না হউক—ভক্তির গভীরতায়—আন্তরিকতায় ও আকৃত্রিমতায় ভাবসারল্যে ও ভাষাতারল্যে—অপূর্ব্ব অনবদ্য ও মর্ম্মস্পর্শী—অন্ততঃ গায়নগণের মনঃপূত ও প্রীতিস্নিগ্ধ হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠের মাধুর্য্যে ও হৃদয়ের আকুলতায় অমৃতায়মান। এইরূপ বহুসঙ্গীত আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই গ্রন্থে এই শ্রেণীর গানও আছে। সেগুলি হয়ত পড়িতে তত ভাল লাগিবে না—কিন্তু উদ্গীত হইলে চিত্ত বিগলিত করিবে।

এক কথায় 'সাধনা' ক্ষেত্রে বহু কবি, ভক্ত, সাধক ও মহাপুরুষের মেলা বসিয়া গিয়াছে—অতি অল্পব্যয়ে এই মেলায় যোগ দেওয়াও সম্ভব। একাধারে গান ও আবৃত্তির উপযোগী রচনার এইরূপ সুনির্ব্বাচিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংকলন পূর্ব্বে আমাদের চোখে পড়ে নাই। আশা করি গ্রন্থখানি গৃহপঞ্জিকার ন্যায় গৃহে গৃহে সমাদৃত হইবে।

শ্রীকালিদাস রায়।

দ্রৌপদী—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। চারিখানি চিত্র সম্বলিত।

ভারতের আদর্শ সতী-নারীদিগের মধ্যে দ্রৌপদী অন্যতমা। অন্যান্য সতী-নারীদিগের চরিত্র ঠিক যে ছাঁচে ঢালা, দ্রৌপদীর চরিত্র ঠিক সে ছাঁচে ঢালা নহে। সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা প্রভৃতি পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতি সম্পন্না, লজ্জাশীলা, আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এ রকম নারী চরিত্রের দৃষ্টান্ত ভারতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দ্রৌপদীর ন্যায় তেজস্বিনী নারীর উদাহরণ খুবই বিরল। শ্রীযুক্ত রাজকুমার বাবু তাঁহার "দ্রৌপদী" পুস্তকে দ্রৌপদী চরিত্রের এই অংশের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী চালনা করিয়াছেন। সিন্ধুদেশের রাজা জয়দ্রথ যখন কাম্যবনে দ্রৌপদীকে দেখিয়া অসৎপ্রস্তাব করিলেন তখন জয়দ্রথের ভীতি-প্রদর্শনে দ্রৌপদী একটুমাত্র ভীতা না হইয়া সদর্পে কহিলেন,—"জয়দ্রথ! তুমি মনে করিও না আমি অন্য নারীর ন্যায় দুর্ব্বলা...তুমি শত অত্যাচার করিলেও আমি কখনও তোমার মত পাপিষ্ঠের কাছে দয়া ভিক্ষা করিব না। মানুষ ত দূরের কথা, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে হরণ করিতে পারেন না।" অবলা হইলেও দ্রৌপদী অন্য রমণীর ন্যায় বলহীনা কিংবা ভীরু নহেন। নিদারুণ কর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া তিনি উপযুক্ত প্রতীকারের জন্য চেষ্টা করেন। ইহাই, দ্রৌপদী চরিত্রের বিশেষত্ব এবং ইহাই রাজকুমার বাবুর পাকা হাতের মারফতে নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে, কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।... সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনের সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই—কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীকে হরণ করিতে আসিতেন, তবে বোধ হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায় দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।"

আজিকার এই নারী-নির্য্যাতনের দিনে বঙ্গললনারা এই বই পড়িলে তাঁহাদের মনে দ্রৌপদীর ন্যায় বিপদে সাহস ও শক্তি আসিবে, এই আমাদের ধারণা।

হনুমান—শ্রীরামকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। বহুচিত্রে সুশোভিত।

হনুমান আমাদের শক্তির দেবতা। তাঁহারই বীর্য্যপ্রদ নাম স্মরণ করিয়া এখনও এদেশীয় শক্তিসাধকেরা শক্তি সাধনায় অগ্রসর হইয়া থাকেন। তাঁহার একটা লেজ আছে একথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে একটা জংলী অপদার্থ জীব ছিলেন একথা কেহই স্বীকার করেন না। সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত লেখক মহাশয় গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন,—"মহর্ষি বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণে—হনুমানের লেজের কথা আছে, কিন্তু সে যে একেবারেই গাছের বানর একথা নাই। বরং তাহাতে হনুমান অতিশয় বুদ্ধিমান, উত্তম পরামর্শদাতা, অসাধারণ বীর, অত্যন্ত উদ্যমী ও কার্য্যপটু, সংস্কৃত ভাষায়—বেদ বেদান্ত প্রভৃতিতে সুপণ্ডিত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে।"

বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য সুললিত ভাষায় তাঁহার পরিচয়ের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

বার্ষিক শিশু-সাথী—দ্বিতীয় বর্ষ (আশ্বিন ১৩৩৪)—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। দাম দেড় টাকা। বাঁধাই ও গঠন চমৎকার।

প্রতি বৎসর পূজার সময় ছেলেমেয়েদের উপহার দিবার রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু উপহারের উপযুক্ত সামগ্রী খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই মুস্কিলের বিষয়। কাপড় জামা প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের বিরাট আয়োজন থাকিলেও

নূতন নূতন চিত্র শোভিত গল্পের বই পাইলে তাহারা যেমন আনন্দ উপভোগ করে, এমন আর কিছুতেই নহে। পূর্ব্বে 'পার্ব্বণী' 'রংমশাল' প্রভৃতি বার্ষিক উপহারের বই থাকিলেও এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে, এখন একমাত্র আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত "বার্ষিক শিশুসাথী"ই বাহির হইয়া থাকে এবং সেই শিশুসাথী একখানি পাইবার জন্য শিশুরাজ্যে যেন একটা বিরাট হুড়োহুড়ি পড়িয়া যায়। আশুতোষ লাইব্রেরী শিশুদের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য অর্থের দিকে না তাকাইয়া শিশুসাথীর এই যে সুন্দর এবং শোভন সংস্করণ বাহির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গ্রন্থখানি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সুন্দর কবিতা দিয়া উদ্বোধিত করা হইয়াছে। বয়সে রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্তরখানি তাঁহার আজও যে বাংলার শিশুরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহা তাঁহার কবিতায় ধরা পড়িয়াছে।—

লিখ্‌তে যখন বলো আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি কাঁচা কলম
নাচ্‌বে আজো আমার হাতে।

*

খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলার ঘরে,
সেই কলমে পথ এঁকে দেয়
পথহারা কোন্ তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথ পাতা
সেই কলমে আপনি নাচে,
সেই কলমে বাঁধা পড়ে
তোমার বয়স আমার আছে।

কবিতা, গল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নাটক, ব্রতকথা, উপকথা, সত্যঘটনা প্রভৃতি লইয়া পুস্তকখানিতে চুয়াল্লিসটি পড়িবার মত জিনিস আছে। প্রত্যেক লেখাটি সুন্দর এবং সুরুচিসঙ্গত। যে সমস্ত সুসাহিত্যিক ও কবি ইহার সফলতার জন্য কলম ধরিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম নীচে দেওয়া হইল—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিগুরত্ন মজুমদার শ্রীসুনির্ম্মল বসু, রায় সাহেব জগদানন্দ রায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, শ্রীনরেন্দ্র দেব ইত্যাদি। আশা করি আশুতোষ লাইব্রেরী প্রতি বৎসর এইরূপ চেষ্টা ও উদ্যম দ্বারা ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া বাংলার শিশুমহল হইতে ভালবাসা কুড়াইবেন।

দৈব-বাণী—প্রণেতা ও প্রকাশক শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা মুখোপাধ্যায়। দর্শনী চারি আনা।

শ্রীশ্রীহরিতত্ত্ব জ্ঞান, শ্রীশ্রীহরিসাধন শিক্ষা, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিধি ও নিষেধ জ্ঞান এই পুস্তকে সুললিত কবিতা দ্বারা বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তদের নিকট ইহা আদরণীয় হইবে।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ—শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজী লিখিত ও শ্রীসিতাংশু সেনগুপ্ত কর্তৃক ৭৮, নারিন্দা, ঢাকা, হইতে প্রকাশিত। ২য় সংস্করণ—দাম পাঁচ পয়সা।

পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহের কথা অবগত নহেন এমন লোক বোধ হয় আজ ভারতের কোন স্থানেই নাই। একটা সমাজের জিদের প্রতিবাদ কল্পে আর একটা সমাজ যে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে এই লক্ষ্য করিবার আছে যে হিন্দুর বোধশক্তি ও কর্ম্মশক্তি এই দুইটি একেবারেই পৃথক জিনিস। আজ চোখের সম্মুখে হিন্দু তাদের দেশের নারীদিগকে ধর্ষিতা হইতে দেখিতেছে, কিন্তু তাহারা এমনি অলস যে তাহা দেখিয়াও প্রতিকার করিবার সাহস রাখে না, কিন্তু ভারত সীমান্তে একটি ইংরাজ নারীর উপর হাত পড়িয়াছিল বলিয়া সমস্ত ইংরাজ সমাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে আমাদের বোধশক্তি আছে, কিন্তু কর্ম্মশক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ইংরাজের উভয় শক্তি সজাগ। লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই:—"আজ পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের ন্যায় হিন্দুজাতি একবারমাত্র পাশ ফিরিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে ২২ কোটির অধিক হিন্দুর সংখ্যা হইলেও তাহাদের মধ্যে শতকরা ৮৩ জনই উপেক্ষিত, অস্পৃশ্য। সমগ্র বাংলার হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ৮ লক্ষ। তন্মধ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ অস্পৃশ্য। কিন্তু এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যাহারা সমাজে চিরকাল অস্পৃশ্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহারা আজ ব্রাহ্মণের সহিত কোলাকুলি করিয়া কারাবরণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এ সত্যাগ্রহের অভিযান প্রকৃত পক্ষে মুসলমানের বিরুদ্ধে নহে, এ সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের সাধনা।"

ইহা ছাড়া পুস্তকখানিতে প্রারম্ভিক ইতিহাসও একটু আছে। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কল্পতরু—শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় বি,এ, জি,আই,এ,সি, কর্ত্তৃক লিখিত ও পোঃ কালিয়া গ্রাম হাচলা, যশোহর হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা।

এখানি একাঙ্ক প্রহসন। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলে ইহাতে বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক, সামাজিক অনেক সমস্যার উল্লেখ করা হইয়াছে। বাঙ্গালীর সমষ্টিগত চরিত্রের উপরও সঙ্কেত করা হইয়াছে। এখানি কোন সখের দলে অভিনীত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

নচিকেতা—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রণীত। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, সোণার গাঁ (ঢাকা) হইতে ব্রহ্মচারী সারদাচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

পুস্তিকাখানি কঠোপনিষদ হইতে নাটকাকারে গ্রথিত হইয়াছে। স্বামী শর্ব্বানন্দ পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন, নাটক "রচনায় আজ পর্য্যন্ত কেহই বেদ-ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপ করেন নাই।...সেই জন্য আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টাকে সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি।" এ কথা একেবারেই ভুল, কেননা আমরা জানি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের "ঋষির মেয়ে" নাটকখানি ঐ বেদ-ভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে খুব সমারোহের সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আলোচ্য পুস্তকখানি ক্ষুদ্রাকার হইলেও লেখা বেশ মনোরম হইয়াছে। স্কুল কলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত হইবে বলিয়া ইহকে স্ত্রী ভূমিকা শূন্য করা হইয়াছে।

অবসান—শ্রীভারতবন্ধু লাহা এম-এ বিরচিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৩নং মাহুৎটুলী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। দামের কোন উল্লেখ নাই।

বৈজ্ঞানিক কাব্য। ব্যর্থ রচনা। উপসংহারে ইংরাজীতে বৈজ্ঞানিক তথ্যের অবগুণ্ঠন মোচন করিবার কি উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিলাম না।

সুখমণী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত, বি-এল, বিদ্যাবিনোদ ভারতী কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য ১৲ টাকা।

শিখ গ্রন্থ সাহেবের অন্তর্গত পঞ্চম শিখগুরু অর্জ্জুনদাস কৃত অপূর্ব্ব ভক্তি গ্রন্থ। অর্জ্জুনদাস এক জন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও ভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত সুখমণী নামক গ্রন্থ তাঁহার নির্ম্মল ধর্ম্মজীবন ও উচ্চ সাধনার পরিচয় প্রদান করেন। সুখমণী মানে হইতেছে যাহা পাঠ করিলে সুষুম্না নাড়ীতে অর্থাৎ সত্ত্বগুণে মন অবস্থান করে। দরিদ্র ব্যক্তি মণি পাইলে যেমন অগাধ আনন্দ-সাগরে আপ্লুত হয়, সুখমণী পাঠেও হৃদয়ে তদ্রূপ দেবভাবের উদয় হয়। অনুবাদক মহাশয় এই অমূল্য ধর্ম্ম-গ্রন্থখানির সরল বাংলা তর্জ্জমা করিয়া বাংলা ভাষার যে মহোপকার করিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নীতিগর্ভ ভারত-কাহিনী-গাথা—(প্রথম খণ্ড)—মেদিনীপুর কলেজিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক শ্রীনিবারণচন্দ্র পাল কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

পুস্তকখানি ভারত ইতিহাসের সমস্ত কাহিনী লইয়া পদ্যাকারে গ্রথিত। গ্রন্থকার নিবেদন করিয়াছেন, "ইহা বালক বালিকাদিগকে নীতি মার্গে পরিচালিত করিবে এই উদ্দেশ্যে ইহার প্রত্যেক উপাখ্যানে নিহিত নীতিগুলি পরিস্ফুট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। দুই একটি নীতির উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল,—

আমাদের রাজা জাতিতে ইংরাজ
এ জাতির হাতে আসি'
ভারতের এবে হয়েছে সুদশা
লভিছে উন্নতি রাশি।

* *

পেতেছে অনেকে জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্
কমিশনরের পদ
হতেছে কেহ বা গভর্ণর আর
সম্রাটেরো সভাসদ্।

* *

ম্যুনিসিপালিটী য়ুনিয়ান্ বোর্ড
ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ডের কায
ভারতবাসীর স্বায়ত্ত্ব শাসন
আসিয়া পড়েছে আজ।

* *

ভারত রঞ্জনে জর্জ্জ নৃপমণি
বৃটন হইতে আসি'
দিল্লী সিংহাসন করিলা শোভিত
কত দয়া পরকাশি।"

অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত !!!

ছেলেদের পূজার কথা—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা। অসংখ্য চিত্রে বিভূষিত।

এই পুস্তিকাখানি মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে মা দুর্গার লীলার কথা—হিন্দুর গৃহে নিত্য পঠিত চণ্ডীর মাহাত্ম্য সুন্দর ও সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। চণ্ডী নিত্য পাঠ করিলে মানুষের সকল বিপদ আপদ্ দূর হয় ও ধন ধান্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু চণ্ডী যাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন, অধিকাংশ স্থলে কেহই উহার মানে বুঝেন না বলিয়া কোনরূপ ফল লাভ হয় এমন মনে হয় না। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তিকাখানি যে ভাবে সহজ ও সরল ভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন, আশা হয় এবার চণ্ডী বুঝিতে আর কাহারও কষ্ট পাইতে হইবে না।

সন্ধ্যায়—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা। বাঁধাই খুব সুন্দর।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুযোগ্য পৌত্র এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় একজন সুলেখক, চিন্তাশীল, ভাবুক ও কবি বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার "হিতৈষণা গ্রন্থাবলী"র ষড়্‌বিংশ গ্রন্থ। জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা কথা জীবনের এই সন্ধ্যাকালে বালুকাময় সংসার-সাগর তীরে বসিয়া লেখক যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন তাহাই সুন্দর ও সংহতভাবে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ভাষা গদ্য হইলেও ভক্ত ও ভাবুকজনের নিকট ইহা পদ্যের ন্যায় সুললিত বোধ হইবে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে হৃদয়ে একটা নবীন অনুভূতি ও ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠে।

হালুম বুড়ো—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত দ্বারা লিখিত ও প্রকাশিত। দাম দশ আনা।

এখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত কবিতার বই। সব শুদ্ধ ১৪টি কবিতা আছে। প্রত্যেক কবিতাটি চিত্র সম্বলিত। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি মনোরম হইয়াছে। কবিতাগুলিও বেশ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্য দেব—(প্রথম খণ্ড)—শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম-এ প্রণীত। মূল্য দুই টাকা।

এই পুস্তকখানিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্ম ও বিকাশ এবং গৌড়ীয় সাধু শ্রীচৈতন্য দেবের দ্বারা তাহার পূর্ণ পরিণতির কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য দেব নবদ্বীপে যে প্রেম ভক্তির বন্যা আনিয়াছিলেন, তাহার প্লবনে দক্ষিণে উৎকল, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় ও উত্তরে মথুরা, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছিল। সে অপূর্ব্ব মধুর ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস আজও বিশেষভাবে লিখিত হয় নাই এবং সেই সাধুপুরুষের জীবন ও শিক্ষার প্রকৃত সমাদর হয় নাই। গৌড় বৈষ্ণবধর্ম্মের আদি জন্মস্থান না হইলেও এই গৌড়েই যে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ লাভ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে তাহাই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যের জীবন ও সাধনার মধ্যে দিয়া দেখাইতে লেখক বিশেষভাবে চেষ্টা পাইয়াছেন। লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

বঙ্গ গৌরব—রায় বাহাদুর শ্রীজলধর সেন প্রণীত ও ২৯৪ নং বহু বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ম্যাক্‌মিলান্ এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

রায় বাহাদুর জলধর বাবু বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু তিনি "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতেও যে সিদ্ধহস্ত এ কথা সকলকে মানিয়া লইতেই হইবে। আলোচ্য

পুস্তকখানি বাংলার হিন্দু মুসলমান কৃতি সন্তানদের সংক্ষিপ্ত জীবনী আকারে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক মহাশয় গোড়াই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.

সুতরাং ইহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের সম্মুখে বিদেশী মহাপুরুষদের আদর্শ না ধরিয়া এই সব স্বদেশী বরেণ্য পুরুষদের আদর্শ ধরিলে অনেক স্থলে সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয়। রায় বাহাদুরের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীবি—.

কহলার—কবিতার বই। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৸৹—বেশী ধরা হইয়াছে।

নানা মাসিক পত্রে জ্যোতি বাবুর কবিতা পড়িয়াছিলাম কিন্তু তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে নাই। এই পুস্তকে কবিতাগুলিকে শৃঙ্খলার সহিত সুন্যস্ত দেখিয়া বুঝিতেছি—জ্যোতিবাবুর ভবিষ্যৎ বেশ আশাপ্রদ। কবির ছন্দ, ভাষা, ভাব, রস ও পদবিন্যাসের মধ্যে বেশ একটা শৃঙ্খলাময় সামঞ্জস্য আছে। কবি রসসাহিত্যের মূল সূত্রটিই ধরিয়াছেন—কাজেই ভরসা হয় কবির কবিযশ আসন্ন।

ভাষা-সম্পদ্ এখনো কবির রসবোধের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠে নাই—সে জন্য যেখানে যেখানে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি প্রকাশ করিতে গিয়াছেন—সেখানে সেখানেই ভাষার দৈন্য ঘটিয়াছে। কোন কোন কবিতায় কুমুদরঞ্জন কালিদাস রায় ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের ভঙ্গির অনুকৃতি দৃষ্ট হয়। নিজস্ব ভঙ্গি অধিগত হইলেই এ সকল ত্রুটী থাকিবেনা। 'ধোয়া' গাথাটি সুন্দর। 'পথের গান' ও 'অবগুণ্ঠন' চমৎকার।

আগুনের ফুল—শ্রীঅমূল্যকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস—ভবানীপুর শাখা হইতে প্রকাশিত—মূল্য ১।৹

এখানি প্রকৃতপক্ষে একখানি ছবির বই। দেশের জীবিত ও মৃত বরপুত্রগণের এক রঙা (সবুজ কালীতে ছাপা) ছবি দ্বারাই পুস্তকখানি গ্রথিত। ব্লকগুলির কতক নূতন—কতক পুরাতন। পুরাতন গুলি বেশ স্পষ্ট উঠে নাই, নূতন গুলি বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে। ছবিগুলির পরিচয় হিসাবে অমূল্যবাবু ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া দিয়াছেন। কবিতাগুলির কোন কোনটি বেশ সুমিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি সহজ সরল ভাষায় লেখা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যই বইখানি মুদ্রিত হইয়াছে—তাহারা এই বই খানি হইতে দেশের গৌরবময় ইতিহাস অনেকটা বুঝিতে ও শিখিতে পারিবে। উপহার প্রদানে ও পুরস্কার বিতরণে পুস্তকখানি আদৃত হইবে, ভরসা করি। পুস্তকের ছাপা কাগজ ইত্যাদি অনিন্দ্য। বিন্যাসে শৃঙ্খলার অভাব আছে,—পুস্তকের নামেরও বিশেষ সার্থকতা বুঝিলাম না।

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

'হিমালয়ে অনুসন্ধান'

লেফটানেণ্ট-কর্ণেল স্তর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ংহাস্‌বেণ্ড-এর নাম সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। হিমালয়ের মধ্য-এসিয়া ও তিব্বত অঞ্চলে পর্য্যটন করিয়া অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব তথ্য তিনি জন-সমাজের গোচর করিয়াছেন। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন'-এ তিনি 'হিমালয়ে অনুসন্ধান' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন;—সমিতির মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিভিয়ু'র জুলাই সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্তর ফ্রান্সিস্ হিমালয় পর্য্যটনের ও হিমালয় আরোহণের একটি ছোট-খাট ইতিহাস দিয়া প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছেন। বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ভিগ্‌নে, মুরক্রেফ্‌ট, জেরার্ড, শ্লাগিণ্টেইট্‌স প্রভৃতি মনস্বীরা এই কাজের সূচনা করেন। ভারত সরকারে জরিপ বিভাগ হইতেও এই দিকে কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়। সেই-সব বিভাগে অনেক দেশী লোক রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া গোপনে ও প্রকাশ্যে যে অনেক সাহায্য করিয়াছে, এই কথাটি উল্লেখযোগ্য। তারপর বিভিন্ন অঞ্চলের জরিপে কাপ্তেন মণ্টগোমেরি, কর্ণেল গড্‌উইন-অষ্টেন, কর্ণেল টেনার, কর্ণেল রাইডার, কর্ণেল উড্, মেজর মোরশেড্ ও মেজর কেনেথ মেসন, প্রমুখ পরলোকগত ও জীবিত পর্য্যটকগণ হিমালয়ের মানচিত্রের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ভাবী কালেও তাহার মূল্য হ্রাস হইবে না। এই সব সরকারী প্রচেষ্টা ছাড়া বেসরকারী প্রচেষ্টায়ও হিমালয়ের কথা আমরা অনেক জানিতে পারিয়াছি। উত্তর পশ্চিমের 'কারাকোরাম হিমালয় অঞ্চল' চিরদিনই এই সব অনুসন্ধিৎসুদের বেশী আকর্ষণ করিয়াছে—সেখানেই পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গিরিশৃঙ্গ (গড্‌উইন অষ্টেন ২৮২৫০ ফিঃ) এবং তার চারিদিকেই উত্তুঙ্গ শির তুলিয়া আরও এরূপ অনেক শৈল শ্রেণী। শীর্ষ ও তাহার চারিদিকে 'কারাকোরাম হিমালয়ে' ২৪০০০ ফুটের বেশী উঁচু গিরিশৃঙ্গের সংখ্যা অন্যূন তেত্রিশটি।

পৃথিবীর বহুদেশের এই সব সত্যান্বেষীদের মধ্যে ডিউক অব্ দি আব্রুজ্জি'র (১৯০৯) ও ডাক্তার ডি ফিলিপ্পি'র (১৯১৩-'১৪) অভিযানই ভূতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, ও জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে সমধিক প্রসিদ্ধ। ডাক্তার লঙ্গষ্টাফ্ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাল্‌টিস্তান ও তুর্কিস্তানের মধ্যকার সাল্‌টোরো গিরিসঙ্কট খুঁজিতে খুঁজিতে এক বিশাল ও অপূর্ব্ব গ্লেসিয়ার (তুষার-নদী) দেখিতে পান। উত্তরে ইয়ারখণ্ডে নদীতে না পড়িয়া ইহার তুষার-ধারা দক্ষিণে সিন্ধুনদের দিকে নামিয়া চলিতেছে। ইহাই 'সিয়াচেন তুষার-নদী';—হিমালয়ের শ্রেষ্ঠ তুষার-প্রপাত—ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৬ মাইল!

এভারেষ্ট অঞ্চলেরও আকর্ষণ কম নয় কিন্তু নেপাল সরকার দক্ষিণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছেন; অবশ্য তিব্বত সরকার উত্তর দ্বার তিনবার তিন দল এভারেষ্ট আরোহীকেই খুলিয়া দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য ও তাহার সুগম গিরিপথ বহু পর্য্যটককেই টানিয়াছে। স্তর জন হুকার সিকিম উপত্যকায় যেন এক দিগন্ত-বিস্তৃত নন্দনের পুষ্প-শোভা দেখিয়াছিলেন। উদ্ভিজ্জ জীবনের এমন বৈচিত্র্য আর কোথাও নাই। স্তর জন এই আবিষ্কারকে সার্থকও করিয়াছেন। তাঁহার পর আরও অনেক আরোহী চারিদিককার নানা গিরিশৃঙ্গে ঘুরিয়াছেন, গ্রেহাম (১৮৮৩), নরওয়েজীয় রুবেন্‌সন্ মোন্‌রাড্ আস্, ফ্রেসফিল্ড (১৮৯৯), গ্রীক টোম্বাজি, প্রভৃতি; কিন্তু, ডাঃ কেল্লাসই ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি তিনটি গিরিশীর্ষ আরোহণ করেন; এবং অবশেষে প্রথম এভারেষ্ট অভিযানে প্রাণ সমর্পণ করিয়া হিমালয়েই শান্তিলাভ করিয়াছেন। মেজর

বেইলি ও মেজর মোরশেড্ তিব্বতের 'সাঙ্গপো' ও আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদের যোগাযোগের প্রশ্ন সমাধান করিয়াছেন। কুমাওন ও গাড়োয়াল অঞ্চলেও 'নন্দাদেবী' ও 'কামেট পর্ব্বতকে' অতিক্রম করিবার চেষ্টা হইয়াছে;—ডাঃ লঙ্গষ্টাফ ২৩৪০০ ফিঃ উচ্চ 'ত্রিশূলের' শীর্ষারোহণ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে আসে এই 'এভারেষ্ট অভিযানের' তিন প্রচেষ্টার কথা;—শেষ দুইটির নেতৃত্ব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, মাননীয় সি, জি ব্রুস মহোদয় সুচারুরূপেই করিয়াছিলেন। এই অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াই মেলরি ও আইর্ভিন্ ২৮০০০ হাজার ফিটের উপরে হিমালয়ের কোলে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত। এই প্রচেষ্টায়ই ডাঃ সামারভিল প্রায় ২৮০০০ ফিঃ আরোহণ করিয়াছিলেন, এবং কর্ণেল নর্টন ২৮১০০ ফিট্ উত্তীর্ণ হইয়া ফিরিয়াছিলেন।

হিমালয়ের অভিযানের ক্ষুদ্র ইতিহাস এখানেই শেষ হয়, কিন্তু নব নব অভিযানের যে কত প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। কত গিরি শিখর অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে কে বলিবে? স্যর ফ্রান্সিস নেপালের দিকে এভারেষ্টের দৃশ্য অপরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন (নেপাল সরকার হালে হিমালয় জরিপে মনোযোগ দিয়াছেন), প্রচুর বৃষ্টিতে, গভীর নদীতে ও সহজজাত তরুলতায় এভারেষ্টর মাইল বারো নীচে নেপালের ১৪০০০ হাজার ফিট্ উচ্চস্থান হইতে একবার চারিদিকে দেখিলে অনন্ত বনানী, এভারেষ্টশৃঙ্গ, ও আরো অনেক সুউচ্চ শিখর—মকালু, (২৭৭৯০ ফিঃ) চো উয়ু (২৬৮৬৭ ফিঃ), গ্যাচুংকাং (২৫৯৯০ ফিঃ) ইত্যাদি পর্য্যটকের বিস্মিত চক্ষুকে অফুরন্ত আনন্দ দিবে। হয়ত নেপালেই পর্ব্বত এমন খাড়া নামিয়াছে এবং খাড়া উঠিয়াছে যে হিমালয়ে আর কোথাও সেরূপ গভীর খাদের (gorge) খাড়া পাহাড়ের (rise) তুলনা মিলিবে না।

আরো পশ্চিমে 'হুন্জা' অঞ্চল এখনো প্রায় অনাবিষ্কৃত, 'কুরাকোরাম হিমালয়ের' পশ্চিমাংশ-ও মধ্য-এশিয়ার বণিক-পথের নিকটে হইলেও প্রায় অজ্ঞাত।

এরূপ অজ্ঞাত অঞ্চলগুলিকে আবিষ্কার যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা যেন সে-সব অঞ্চলকে জীবন্ত করিয়া জগতের সামনে ধরিতে পারেন,—শুধু প্রতিলিপিতে নয়, আলোক-চিত্রে নয়, নিজেদের নীরস আখ্যায়িকার খুঁটিনাটিতে নয়,—সেই সব নব-নব দৃশ্যের, অপূর্ব্ব গৌরব ও বৈচিত্র্যকে তাঁহারা যেন সত্য শ্রী দিতে পারেন, ও প্রকৃত রসে সঞ্জীবিত করিতে পারেন যাহাতে অপর সকলের চোখে সেই সুমহান দৃশ্য চয়ের চিত্র সত্যরূপে ফুটে, চিত্তে সেই স্তব্ধ, সৌম্য, সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয়,—স্যর ফ্রান্সিস এই উপদেশ দিয়াছেন।

হিমালয়ের ভৌগোলিক পর্য্যবেক্ষণ শেষ হইলেও, পর্য্যটন শেষ হইবে না। ভূতাত্ত্বিককে তাহার বুকের 'ফসিল'-গুলি খুঁজিতে হইবে। উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞানের দিক হইতে অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অসীম ও অশেষ,—বনের অন্ত নাই, বৃক্ষ লতার শেষ নাই;—নীচের শালবনের উপর ওক-চেষ্টনাটের সারি, আরো উপরে মুহুঃ কম্পিত দেবদারু, আবার তাহার উপরে বিচ্ প্রভৃতির শ্রেণী।

বৃক্ষ জীবন যাহাদের আদরের তাঁহারা তরু-গুল্ম, ফুল-পাতার তথ্য লইয়াই শেষ করিলে চলিবেনা, ইহাদের চিত্র লইবেন, ইহাদের বীজ সংগ্রহ করিবেন, ইহাদের জন্ম-বৃদ্ধি-মৃত্যুর সন্ধান লইবেন। হিমালয়ের জীব-জগৎ শীকারীদের লোভকেই শুধু উদ্রেক করিয়া যেন শেষ না হয়, ইহাও দেখিতে হইবে। হিংস্র জীবদের কথা ছাড়িয়া দিলেও 'মানস-যাত্রী' হংস-বলাকা এবং যাত্রী পাখী মধ্য এশিয়ায় যায় ও ফিরিয়া আসে; ছাগ ও মেষ আদি, আরো কত জীব তুষার-দেশে আছে,—তাহাদের জীবন, স্বভাব, আহার্য্য ও অবস্থান অশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপকরণ রহিয়াছে জাতিতত্ত্বের ও নৃতত্ত্বের ছাত্রদের। লেপ্‌চা, গুর্খা, কাশ্মীরী,

হুন্‌জা, কাংড়াই রাজপুত, ভুটানি, গাড়োয়ালি, লাড্‌কি, বালটি আদি ছোট বড় কত বিভিন্ন প্রকৃতির মানব-সমাজে হিমালয় অঞ্চল অধ্যুষিত। ইহাদের জীবন, ইহাদের প্রথা, সংস্কার ভাবনা শিক্ষার ও আনন্দের।

স্তর ফ্র্যান্সিসের মতে পর্য্যটকদল অপেক্ষা একক পর্য্যটকদের সুবিধা বেশী। যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তিনি তাহাই অনুসন্ধান করিবার জন্ম হিমালয় খুঁজিয়া দেখিতে পারেন—বড় দল বাঁধিয়া অগ্রসর হইবার আশায় ও দুরাশায় বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।

বাঙালীর ছেলেরা আজ পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন,—পৃথিবীর প্রতি জনপদের ধুলা মাথায় করিয়া তাঁহারা ঘরে ফিরিয়া আসুন! কিন্তু কবে বিদেশী দুঃসাহসীদের সঙ্গে পাল্লা জুড়িয়া আমরা আমাদের শিয়রের সদাজাগ্রত হিমালয়কে—আমাদের সমস্ত ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহার যোগ, সমস্ত সাধনা যাঁহার কোলে সার্থক, সমস্ত কাব্য-কল্পনা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সংযত সৌন্দর্য্যে বিকশিত,—কবে সেই 'দেবতাত্মা' গিরিরাজকে প্রদক্ষিণ করিতে শিখিবে, তাঁহার সুমহান্ ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব?

'বাঙালা সাহিত্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য'

যে এডওয়ার্ড টমসন সাহেব রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়া লণ্ডনের ডি-লিট্ উপাধি লাভ করেন, আমরা সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যের কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। সম্প্রতি টম্‌সন সাহেব বিলাতের ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে বাঙালা সাহিত্যের কয়েকটি স্বভাবজ বৈশিষ্ট্য (Some Vernacular Characteristics of the Bengali Literature) নামীয় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সমিতির নব প্রকাশিত মুখপত্র 'ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটার্স'-এ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। টমসেন্ সাহেব রামায়ণ ও মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের স্মৃতি ও প্রেরণায় বাঙালায় যত কিছু রচনা হইয়াছে সব কিছুকেই—এমন কি রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী'কে পর্য্যন্ত—বাঙালার non-Vernacular 'অপ্রাকৃত' রচনা বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃতের দাসত্ব-মোহে ও বৈষ্ণব কবিতার মারাত্মক একঘেয়েমি ও অর্থহীন মাথা-মুণ্ড ছাড়া কথার প্যাঁচে (Dreadful monotony and brainlessness) বাঙালার যে দুইটি অপরূপ বৈশিষ্ট্য চাপা পড়িয়া যাইতেছিল, টমসেন সাহেব বলেন তাহার প্রথমটি বাঙালীর অসাধারণ, সবল, সরল ও সুকল্পিত বর্ণনা-শক্তি (an Extaordinarily powerful, direct and imaginative gift of expression) ও দ্বিতীয়টি—যেটি বিশেষ করিয়া ইংরাজদিগের-ও নাকি একটি বৈশিষ্ট্য—বাঙালা সাহিত্যের বক্রোক্তি বা ব্যঙ্গোক্তির (Irony) প্রসার। বর্ণনশক্তির দৃষ্টান্ত 'উঠ, উঠ, সর্য্যি ঠাকুর ঝিকি মিকি দিয়া' (?) প্রভৃতি প্রাচীন ছড়াতে, রামপ্রসাদের সবল সঙ্গীতগুলির মধ্যে এবং শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের যেখানে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ নদীবক্ষে নৌকায় বসিয়া আছেন সেখানকার অন্ধকার রাত্রি ও শুভ্র নদী জলের বর্ণনায় টমসেন সাহেব দেখিয়াছেন। ব্যঙ্গোক্তির প্রভাব-নাকি বাঙালার গল্পে, সাহিত্যে, কবিতায়, এমনকি বাঙালীর দৈনন্দিন কথাবার্ত্তায় এত পরিব্যাপ্ত এবং তাহা নাকি এত সূক্ষ্ম, যে সাহেব-লোকেরা অনেক সময়ে তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারেন না !!

টমসন সাহেবের বিশ্লেষণ মানিতে আপত্তি নাই; কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটির মধ্যে তিনি বাঙালা বৈষ্ণব সাহিত্যকে যেরূপ হেয় ও নীরস বলিয়া সবলে মত জাহির করিয়াছেন এবং সংস্কৃতকে বাঙলার পক্ষে যেরূপ অস্পৃশ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাহাতে বিশেষরূপে একটা সন্দেহ আমাদের মনে আসিতেছে—বাঙালার উপর সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও বাঙলার বৈষ্ণব-সাহিত্যের সহিত তাঁহার পরিচয়, তাঁহার রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের চেয়ে কিছু অগভীর রহিয়াছে !!

ছিটে-ফোঁটা

(১)

‘আল্লা-হরি করেন কোলাকুলি’

(১)

খাঞ্জাপুরের পাঞ্জু সেখের আঞ্জু মেজো ছেলে,
আর্‌বী কেতাব সাঙ্গ ক’রে উর্দ্দু খেতাব পেলে।
শহর থেকে তখন মিঞা ফির্‌ল নিজের গাঁয়,
মাথায় ঘেরা তুর্কী-টুপী, নাগ্‌রা জুতা পায়।
আউলী ঘিরে’ হারেম্ হলো, বাইরে নমাজখানা ;
আঞ্জু ঘুচে’ নামটী হ’লো আন্‌সারী মৌলানা।
লুঙ্গি ছেড়ে জোব্বা-জামা জুম্মাবারে পরে ;—
পাড়ার লোকে ‘মোল্লা সাহেব’ ব’লে সেলাম করে।

(২)

চণ্ডী ঠাকুর আঞ্জু মিঞার নিকট-প্রতিবেশী,
চাক্‌রী ছেড়ে গেরুয়া-গর্‌দ ধর্‌ল শেষাশেষি।
‘ভক্তি-নদী’ উপাধি তার মিল্‌ল নবদ্বীপে ;
শিষ্য দু’জন শোবার আগে পা-দু’টী দেয় টিপে’।
মন্দিরে তার কৃষ্ণরাধার নিত্য-সেবার ধূম—
কীর্ত্তনে আর বাদ্যে জমে তাক্-ডুমাডুম্-ডুম্।
আঞ্জু মিঞার আজান্ শুনে’ চণ্ডী ভোরে জাগে ;
ভজন শুনে’ মিঞার প্রাণে ফূর্ত্তি-নাচন্ লাগে।

(৩)

কিং-সাহেবের খাস্-আর্দ্দালী আঞ্জু মিঞার মিতা,
চাচার কাছে শুনেচে যে কোরাণে কয় কি তা।
মফঃস্বলে যখন এল, গেল মিতার ঘরে ;
ভজন শুনে’ সুধায়—‘মিঞা, হল্লা কে ঐ করে ?’
আঞ্জু বলে—‘হিন্দু-ঠাকুর-পূজার অমন রীতি,—
গানের সাথে বাজ্‌না বাজে সন্ধ্যাকালে নিতি।’
কিং-সাহেবের আর্দ্দালী কয়—‘একি ভূতের মেলা !
কাফের করে জুম্মাঘরের পাশে পুতুল-খেলা !’

(৪)

সবাই বলে—‘সত্যি এ তো ! জেহাদ করো তবে,—
নইলে যাবে জাহান্নামে, ধর্ম্মে গুণা হবে।’
লগুড়-লাঠি ইট-পাঁকাটী সবাই নিল হাতে ;—
দীন্ দীন্ দীন্’-শব্দে চ্যাঁচায়, যুদ্ধে সেনা মাতে।

খবর পেয়ে চণ্ডী সাজে, চিতেন গাহে জোরে ;
রামশিঙ্গা বাজায়, পাড়ায় মিছিল নিয়ে ঘোরে।
কোর্ব্বানি আর হরির লুটের পাল্লাবাড়ে জিদে,—
লড়াইখানা আখ্ড়া হ'লো মন্দিরে-মস্জিদে !

(৫)

কাণ্ড দেখে' আল্লা কহেন—'দোস্ত-হরি, এ কি ?'
বলেন হরি -'তাই তো, ভায়া, রগড় বটে দেখি !'
যুক্তি করেন আল্লা হরি ; রাত্রে ঘুমের ঘোরে
চণ্ডীদাসের মুণ্ড কেটে লাগান মিঞার ধড়ে ;
মিঞার মুণ্ড দিলেন ঘাড়ে চণ্ডীদাসের জোড়া।—
নীচের গড়ন রইল ঠিক্ই, উপর বর্ণচোরা !

(৬)

আঞ্জু ভোরে কর্‌তে উজু মাথায় টিকি ঠেকে ;
তিলক-সেবার কালে গালে চণ্ডী দাড়ি দেখে !
কল্‌মা পড়ার সময় করে ' হরিধ্বনি ' মিঞা ;
' আল্লা' বলে চণ্ডী মুখে ঠাকুর-ঘরে গিয়া !
বাজ্‌না-বাজার তালে তালে আঞ্জু মাথা নাড়ে ;
নমাজ করার ওক্ত যখন চণ্ডী হাঁটু গাড়ে !
আঞ্জুরে কয় চণ্ডীঠাকুর—খোস্ তবিয়ৎ চাচা ? '
আঞ্জু বলে--' মহাপ্রভুর দয়ার বলে বাঁচা ! '

(৭)

আল্লা হরি আহ্লাদেতে করেন কোলাকুলি,—
শুভক্ষণে দিয়েছিলেন বদ্‌লে মাথার খুলি !

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

(২)

চিন্তাশীলের খেলা

দেশের কি হবে শেষে, সদা তাই চিন্তি !
তিন কুড়ি সাত কেন ? ছিল নাকি বিন্তি ?
চিন্তায় মাথা ভোঁ ভোঁ—বহে যেন ঝঞ্ঝা !
ধুত্তোরি ! খেলা থাক্—হোক্ গিয়ে পঞ্জা।
লজ্জা নাই ! হি হি ক'রে হাস কেন মিত্‌থে ?
আগুন লেগেছে ঘরে, ভাব না তা' চিত্তে !

(৩)

অভিসার

রাধা—ফুটিল কি পায় সই যায় না যে হাঁটা গো
সখি—কবিতার বঞ্জুল, খাঁটি বেত-কাঁটা গো।
রাধা—গুন্‌গুন্ গান গায়, এল বুঝি শ্যামরায়।
সখি—গুঞ্জরে এযে মশা, বাপ্‌রে কি কামড়ায়
রাধা—অবিচারে অভিসারে ঘুরি কিবা বাতিকে
সখি—কালার বদলে পাবে কালা-জ্বর রাধিকে।

অগ্রহায়ণে

জাতীয়ত্বের চেতনা—আমি নিজে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইব ও সকল বাধা দূর করিয়া মনুষ্যত্বলাভে উদ্যোগী হইব, আর দেশের সকলকে সেই বুদ্ধিতে ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিব—এইরূপ আগ্রহ গোড়ায় অতি অল্পসংখ্যক লোকের মনে জাগে ; কাজেই কর্ম্মীদের নেতাদের সংখ্যা অধিক নাই বলিয়া নিরাশ হইবার কিছু নাই। তাহার পর এই কথা অতি সত্য যে জাতীয় উন্নতি সাধনের জন্য যাঁহারা প্রথমে উদ্যোগী হন, তাঁহারা পৃথিবীর সকল দেশেই মধ্যশ্রেণীর লোক। আমাদের দেশের ধনীরা যে কেবল বিলাসে ডুবিয়া উদাসীন তাহা নয় ; সকল যুগেই সকল দেশেই ঐ অবস্থা দেখিতে পাই। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আপনারা জাগিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে উৎসাহিত করিয়া তোলেন, আর সেই অবস্থা যখন ঘটে তখনই সামাজিক শক্তির প্রভাবে - জনসাধারণের রুচির ও মতের প্রভাবে ধনীরা বাধ্য হইয়া দেশের সঙ্গে মেলেন। শিক্ষিতদের আদর্শে ও শিক্ষা বিধানে দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাগরণ আসিলে কিছুতেই গর্ব্বে স্ফীত ধনীরা প্রকাশ্যে বুক ফুলাইয়া কুপথে চলিতে পারেন না। আমাদের দেশের প্রভুতা-সম্পন্ন উচ্চপদস্থের মধ্যে এরূপ খামখেয়ালী কিছুতেই দেখা দিত না যে একজন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অধিপতির তরুণী জননী রাজ্যের টাকা একটি বিদেশে গিয়া উড়াইয়া সেদেশে নটীর পূজা পাইবার জন্য সময়ক্ষেপ করিতে পারিতেন। প্রজার টাকা হাতের মুঠায় তুলিয়া পঞ্জাবের কর্পূরতলার মহারাজ ফরাসীদের দৈন্য ঘুচাইবার জন্য দান করিতেছেন আর রাজ্যের লোকে দৈন্যে মরিতেছে। বঙ্গের একজন বড় জমিদার কর্ম্মচারীদের হাতে জমিদারির দায়িত্ব সঁপিয়া বিদেশের ঠাণ্ডা বাতাসে আনন্দভোগ করিতেছেন। দেশে Public opinion বা জনমতের জোর নাই বলিয়াই এতটা অনাচারের নির্লজ্জতা দেখা গিয়াছে। দেশের নেতাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য নিম্নসমাজের লোকেদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার করা ও সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা। যাঁহারা বলেন সেইদিকের কাজ পরে হইবে আর আগে স্বাধীনতা করতলস্থ করিতে হইবে তাঁহাদের ভ্রান্তি অতি অধিক ও গভীর। এই জন্য আমরা বারে বারে দেশের ইউনিয়ন্‌বোর্ডের সভ্যদের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের কথা বলিয়া আসিতেছি। আমরা যতই আপনাদের অধিকারের দাবি গবর্ণমেণ্টের কাছে খাড়া করি না কেন, ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা কিছুতেই তাঁহাদের স্বার্থরক্ষা না করিয়া মুক্তহস্তে আমাদিগকে অনেক বিষয়ের অধিকার দিবেন না। দেশের নিম্নশ্রণীর লোক যতদিন এই অধিকারের মর্য্যাদা বুঝিবে না ততদিন আমাদের দাবি সতেজ ও সজীব ভাষায় উচ্চারিত হইতে পারিবে না। এক শ্রেণীর ধনীরা সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন ; আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে বশে আনিতে পারিব না যদি তাঁহাদের প্রজাসাধারণ তাঁহাদের উদাসীনতাকে নিন্দিত ও উপহসিত না করেন। পার্লামেণ্টের সঙ্গে ও পার্লামেণ্টের নিয়োজিত কমিশনারদের সঙ্গে আমরা যখন কোলাহলের লড়াই তুলিয়া কাজ হাসিল করিতে পারিব না তখন কয়েকজন সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভারতের দাবি প্রভৃতির কথা ভাল করিয়া লিখিবার ভার দিলে উত্তেজনার কোলাহল ও আন্দোলন তুলিবার কাজ কমিয়া যায় ও নেতারা দলে দলে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সেই কাজ করিবার জন্য অবসর পাইতে পারেন যাহা না করিলে কিছুতেই অধিকার হাতে আসিবে না। অশিক্ষিতেরা কিছু চায় না ও বোঝে না, এই অজুহাতে আমাদিগকে যে অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তাহা আমরা জানি।

দেশের অবস্থার যথার্থ মর্ম্ম না বুঝিয়া যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ দেখাইয়া আমাদের অনধিকারের কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আত্মস্বার্থে আমাদের স্বার্থের বিরোধী। উল্লিখিত বিবাদে যে সূচিত হইতেছে যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মধ্যশ্রেণার শিক্ষার ফলে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অবস্থা দেখিয়া আমরা হতাশ নই, বরং উন্নতির আশায় আশ্বস্ত। যতদিন লোকেরা যাহা পাইত সেই দুমুঠা খাইয়া আপনাদের উন্নতির দিকে উদাসীন ছিল ততদিন হাঙ্গামা· তুলিয়া আপনাদের স্বার্থনাশ ও অসুবিধা ঘটায় নাই। উন্নতির ইচ্ছা আসিয়াছে কিন্তু কি যে কাহার উন্নতির বাধা তাহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে নাই; তাই কাছে কাছে যে কোন দলের লোককে একটি সম্প্রদায় আপনাদের মতের ও কার্য্যের বিরোধী দেখিতেছে তাহাকেই উচ্ছেদ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। বিবাদকারীরা বুঝিতেছে না অথবা বিবাদকারীদের মধ্যে বুঝিবার শিক্ষা হয় নাই যে যাহাকে তাহারা আপনাদের উন্নতির বাধা ভাবিতেছে তাহা ঠিক উন্নতির বাধা নয়। উন্নতির সাড়া আসিয়াছে; কিন্তু কোন্ পথে চলিলে সেই উন্নতি পাওয়া যাইবে সেদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই। কেবল যে সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি পড়ে নাই, তাহাই নয়,—বহুসংখ্যক নেতাদেরও সেদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। নেতাদের মধ্যে সুবুদ্ধি আসিলে কখনও সাম্প্রদায়িক কথা ধরিয়া —ধর্ম্মের প্রভেদের কথা ধরিয়া তর্ক ও বক্তৃতা হইত না। নেতারা নিরাশ না হইয়া ভাবিতে শিখুন যে, দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে আর যাহারা জাগিয়াছে তাহাদিগকে কি করিয়া সুপথে চালাইতে হইবে তাহাই ভাবিয়া স্থির করিবার সময় আসিয়াছে।

* * * *

পাঁচশ' টাকার পুরস্কার—ইণ্ডিয়ান্ চেম্বার অব্ কমার্সের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত এম্, পি, গান্ধি এই বিজ্ঞাপনটী আমাদিগকে মুদ্রিত করিতে দিয়াছেন যে নিম্নলিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি ভাল প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তিনি পাঁচশত টাকা পুরস্কার পাইবেন। বিষয়টির ইংরেজি নাম—Village Local Self-Government in British India. কি ভাবে ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যকারিতা ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির অধিকার ও সম্ভাবিত উন্নতির বিষয় প্রবন্ধে লিখিতে হইবে তাহা পুরস্কারপ্রার্থী লেখকেরা উক্ত সেক্রেটারির নিকট (১৩৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা) পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

* * * *

শাসন-সংস্কারের সপ্তরথী—ভারতের লোকেরা ন্যায্য অধিকার না পাইয়া ক্ষুণ্ণ; দেশময় জাগিয়াছে পূর্ণ উন্নতির জন্য ব্যগ্রতা আর ব্যগ্রতায় অনুষ্ঠিত কাজগুলি বাধা পাইয়া জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে গভীর দুঃখ ও অল্পাধিক ক্রোধ। এই তরুণ দুঃখ ও ক্রোধ বা "মন্যু" পরাভূত করিবার দিকে (অভি) পার্লামেন্টের নিযুক্ত সপ্তরথী অগ্রসর হইতেছেন। বিলাতী জয়দ্রথ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ প্রভৃতিরা কেবল বাঁধা বিলাতী নীতিরই জয় ঘোষণা করিবেন ও হয়ত বা কৃপা করিয়া কিছু দিবার ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু আমাদের দেশের লোককে কমিশনে জুড়িয়া দেশের কথা ভাল করিয়া কর্ণে শুনিয়া কিছু করিবেন না, এইরূপই ব্যবস্থা হইয়াছে। আমাদের বড়লাট এই বিলাতী উদ্যোগের প্রসঙ্গে ভারতের যে সপ্তরথীকে বিশেষভাবে প্রথমে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যথার্থই এদেশের গণ্য-মান্য ব্যক্তি; ইঁহারা হইতেছেন শ্রীযুক্ত গান্ধিজি, ডাক্তার আন্‌সারি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জিন্নাসাহেব, দেওয়ান বাহাদুর রঙ্গাচারিয়ার,

শ্রীযুক্ত জয়াকার ও স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু। ইহাতে মনে হইয়াছিল হয়ত বা যথার্থ কাজের দিকেই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমাদিগকে কথায় ভুলাইয়া কাজ হাসিল করাই ছিল লক্ষ্য। কর্ত্তারা যখন বুঝিয়াছেন যে ভাগ্যের ব্যবস্থা করিবার বুদ্ধি আমাদের মধ্যে কাহারও নাই তখন আমরাও যেন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া দূরে থাকি ; কেহ যেন খয়েরখাঁ হইয়া এ কমিশনে সাক্ষী দিতে না ছোটেন। আমাদের ভাগ্য যদি আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারি, তবে যাহা কপালে থাকে তাহা হইবে।

হিন্দুর বিবাহের বয়স—পূর্ব্বে জানাইয়াছি যে বার বৎসরের নীচে মেয়েদের বিবাহ না হওয়ার জন্য আইন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার মধ্যেই বরোদা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা গাইকোয়াড় তাঁহার মন্ত্রীসভার পরামর্শে আইন জারী করিয়াছেন যে বিবাহের পাত্রীর বয়স ১৪ ও পাত্রের বয়স ১৮ না হইলে বিবাহ হইতে পারিবে না। আমাদের দেশে প্রাচীন আর্য্যনীতি বদ্‌লাইবার পর হিন্দুদের মধ্যে শিশুবিবাহ অত্যন্ত বাড়িয়াছে। শুধু বোম্বাই অঞ্চলের যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই যে সে প্রদেশে পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে বিবাহিত শিশুদের সংখ্যা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ; আবার যাহাদের বয়স পাঁচ বৎসরের নীচে এমন বিবাহিতদের সংখ্যা চুয়াত্তর হাজার। শেষোক্ত চুয়াত্তর হাজারের মধ্যে বিধবা হইয়াছে তিন হাজার সাত শত চুয়ান্ন জন, যাহাদের নাকি আবার বিবাহ হওয়া পাপ। আরও পাওয়া গিয়াছে যে এক বছর বয়স না হইতেই দু-হাজার শিশুর বিবাহ হইয়াছে। এই সঙ্গে উল্লেখ করিতেছি যে সমগ্র ভারতবর্ষে যে বিধবাদের বয়স পনের বৎসরের নীচে তাহাদের সংখ্যা তিন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ; ইহারা এ জীবনে সুখী হইবার স্বপ্ন দেখিলেও নাকি পাপিষ্ঠা হইবে। এ সকল অবস্থার দিকে তাকাইলে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়! এই সকল দুরবস্থাকে গৌরবময় বলিবার লোকও যে এদেশে আছে, ইহাই আমাদের পরম দুর্ভাগ্য।

সমাজের যখন এই অবস্থা আসে যে লোকে যেমন করিয়া হউক চাষ করিয়া দু'মুঠা খাইতে পায়,—অভাবের উত্তেজনায় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নানা দেশে ছুটিতে বাধ্য হয় না, অথবা যে সময়ে মানুষকে যুদ্ধ-বিগ্রহে আত্মরক্ষা করিতে হয় না ও নিরন্তর মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য দশ দিকের উদ্যোগ করিতে হয় না, তখন চাষ-বাসে নিযুক্ত ও উচ্চ আশাশূন্য লোকেরা জীবনের আনন্দ সম্ভোগের দিকে উৎসাহজনক কিছু পায় না। ছেলেমেয়ের বিবাহ দিয়া কোন মতে আমোদ আহ্লাদ করিয়া জীবনের সুখ বাড়াইতে চায়। বিবাহ করিলে তখন সে সমাজে স্ত্রী বা সন্তান পুষিবার দায়িত্ব আসে না, বিবাহিতেরা বয়স্ক হইয়া কর্ত্তা হইলেও কোনরূপে দশ জনকে দুমুঠা খাওয়াইতে পারে। যেখানে উন্নতির জন্য যুদ্ধ আছে ও ব্যবসা-বাণিজ্য আছে সেখানে দায়িত্ববোধ জন্মিবার পর স্বেচ্ছায় বিবাহ করিবার সময় হয়। অথচ অভাবের তাড়না মানুষে পাইয়াছে কিন্তু দেশ-বিদেশে ছুটিবার অবস্থা সাধারণ লোকের মধ্যে আসে নাই। এখনও উন্নতির স্বপ্ন মনে স্থান না দিয়া কোনও প্রকারে দুমুঠা খাইয়া অনেকে পড়িয়া থাকিতে চায়, তাই কৃষিপ্রধান সমাজে যেরূপ শিশুবিবাহ স্বাভাবিক হয় তাহা এখনও পূর্ণ মাত্রায় এদেশে রহিয়াছে। শিক্ষায় ও ব্যবহারে সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত না হইলে ও অনেক বিষয়ে কুসংস্কার না ঘুচিলে শৈশবে বিবাহ উঠিবে না ও বিধবার দুঃখ দেখিয়া নিষ্ঠুরদের মনে করুণার

উদ্রেক হইবে না। অনেকে এই সত্যের সহিত পরিচিত ন'ন যে যেখানেই মানুষেরা শান্তির কোলে ঘুমায় সেখানেই জড়তা বাড়ে, পাপ বাড়ে ও দায়িত্ববোধ কমিয়া যায়।

* * * * *

যাও সিন্ধুনীরে—সমগ্র ভারতবর্ষ যে আমাদের দেশ, এ বুদ্ধি কিছুতেই কেবল বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া জাগিতে পারে না। শিক্ষিতেরাই হউন বা অশিক্ষিতেরাই হউন, সকলের পক্ষেই যে খানিকটা ঠাঁই-নাড়া হইবার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ও নানা স্থানে বাস করিয়া বিভিন্ন ভাবের সংঘর্ষণে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা দূর করা চাই, তাহা অতি নিশ্চিত কথা; ভিটা কামড়াইয়া যাঁহারা পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি দূর হয় না ও উন্নতির দিকে ঝোঁক বাড়ে না। আমাদের দেশের চাষারা কেবল গ্রামে থাকিয়া চাষ করে আর কখনও কখনও মামলা-মোকদ্দমার জ্বালায় সহরে যায়; কিন্তু ইউরোপীয় চাষাদের মত আমাদের চাষারা বণিকদের ব্যবহারের সঙ্গে পরিচিত হইয়া আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিতে শেখে না। এই চাষা-শ্রেণীর লোকেরা কখনও দেশের কাজের উত্তেজনায় জোট বাঁধিয়া দাঁড়ায় না। যাহাদের চালচুলা নাই সেই শ্রেণীর শ্রমজীবীরা নানা স্থানে যাইতে বাধ্য হয়, আর তাহারাই এদেশে কোথাও বা ধর্ম্মঘট করিতেছে আর কোথাও বা রাজনৈতিক আন্দোলনে মাতিতেছে। শিক্ষিতেরা প্রাদেশিক বুদ্ধিতে এত সঙ্কীর্ণ যে কংগ্রেসে একতার নামে বড় বড় বক্তৃতা করিবার পর সেইরূপ আন্দোলনে মাতেন যাহার ফলে বেহারে বা ওড়িশার বা অন্য স্থানে ভারতের অন্য প্রদেশের লোক না যাইতে পারে। প্রস্তাব হইয়াছে যে আমাদের শিক্ষিত যুবকরা ইচ্ছা করিলে নৌ-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবেন। যেরূপ শিক্ষার পর ও শিক্ষানবিসির পর নৌবিভাগের চাকুরী মিলিতে পারে শীঘ্রই তাহার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইবে। এই নূতন পন্থার উদ্যোগকারীদের অনেকের মনের বিশ্বাস যে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া নৌবিভাগের চাকুরী নিয়া সমুদ্রের পথে বহু দেশে যাইবার দিকে এদেশের যুবকেরা বেশীর ভাগ অনিচ্ছুক। কর্ম্মক্ষম হইলেও এদেশের নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লোকেরা জাহাজে খালাসী হইতে যায় না, কিন্তু স্থান বিশেষের মুসলমানেরা এই কাজ করিয়া থাকে। আমি নিজে অনেক খালাসীর সঙ্গে কথা কহিয়া দেখিয়াছি ও তাহাদের ব্যবহারে বুঝিয়াছি যে তাহাদের মধ্যে বহুদেশ দেখিবার ফলে বিনা লেখাপড়া শিক্ষায় এমন উদারভাব ও শিষ্টাচার জন্মিয়াছে, যাহা ঘর-পোষা শান্ত প্রকৃতির লোকদের মধ্যে দেখা অসম্ভব। যাঁহারা এই খালাসীদিগকে স্থল বিশেষে আহার-পানের দোষ দেখিয়া দূর হইতে উদ্ধত গুণ্ডা মনে করেন তাঁহারা অনেক সময় বুঝিতে ভুল করেন। আমাদের যুবকেরা একবার যদি দলে দলে চাকুরির খাতিরে নানা দেশে ঘোরেন তাহা হইলে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের সাহস বাড়িবে, আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিবার বুদ্ধি জাগিবে ও দূষিত ভেদ-বুদ্ধি দূর হইবে। সমাজে এই শ্রেণীর লোক বাড়িলে তাহাদের সংস্পর্শে অন্য লোকের চেতনা জন্মিবে। সত্যকার ব্যবহারেই যে শিক্ষা জন্মে বই পড়িয়া তাহা হয় না। সেই জন্য যুবকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—যাও সিন্ধুনীরে।

* * * * *

হিন্দুর প্রসার বৃদ্ধি—আর্য্যসমাজের লোকেরা অনেক দিন ধরিয়া অনাচরণীয় জাতির লোকদিগকে ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে শুদ্ধি দিয়া সমাজে নিতেছেন; কিন্তু বঙ্গদেশে

এই শুদ্ধিদানের কাজ এতদিন প্রসার লাভ করে নাই। ইংরেজিতে প্রকাশিত হিন্দু মিশন নামে পত্রিকার অক্টোবরের সংখ্যায় দেখিলাম যে বাঙ্গলা ও আসামের নানাস্থানে এখন এই শুদ্ধি দেওয়ার কাজ চলিতেছে আর ঐ পত্রিকায় জানা গেল যে গত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে আসামে ১০ জন মুসলমান, ১৮ জন খাসিয়া ও একজন দেশী খৃষ্টিয়ানকে হিন্দু করা হইয়াছে আর ঐ সময়ের মধ্যে বাঙ্গলার নানা স্থানের ৬ জন মুসলমানকে, দশ জন দেশী খৃষ্টিয়ানকে, একটি খৃষ্টিয়ান পরিবারকে ও একজন জর্ম্মন নারীকে হিন্দু করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ৫৫টি মুসলমান পরিবারকে হিন্দু করা হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে পড়িলাম যে মুণ্ডা প্রভৃতি কোল জাতির লোককেও হিন্দুর পূজার বিধি ও আচার-ব্যবহার দিয়া হিন্দু করার কাজ চলিতেছে। এই শেষোক্ত বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আছে। মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির লোকেদের কোন ধর্ম্ম নাই বলিলে ভুল কথা বলা হয়, আর তাহারা যে দেবতার কাছে অনুরোধ উপরোধ করিয়া অর্থাৎ প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্ম যাজন করে না তাহার মধ্যে কোন জাতির মৌলিক স্বাধীন প্রকৃতি সূচিত হয়; তাহারা যে কখনও রাজার বা ধনীর দাসত্ব না করার ফলে মাথা খুঁড়িয়া ও হাত জোড় করিয়া কিছু ভিক্ষা করিতে শেখে নাই, সেটা তাহাদের ধর্ম্মহীনতা নয়। কোন জাতির লোকদিগকে বিদেশীদের আর্ত্ততা হইতে উদ্ধার করার প্রয়োজন আছে কিন্তু উহাদিগকে নূতন ধরণের পূজার বিধি দিলে জাতিকে উন্নত করা হইবে না। কোন জাতির যে সকল লোক দলভ্রষ্ট হইয়াছে ও প্রায় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে সেখানে তাহাদিগকে হিন্দুর বিধি-বিধান দিলে হয়ত ক্ষতি হইতে পারে না। কথাটি বলিলাম লোকের মনে মনুষ্যত্ব বাড়াইবার হিসাবে। হিন্দুদের মধ্যে যে নূতন জাগরণ আসিয়াছে ও যথার্থ উন্নতির কামনা জাগিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ইঁহারা যেন মনে রাখেন যে আর্য্যেতর জাতির লোকেরা অসভ্য নামে পরিচিত হইলেও তাহাদের মধ্যে এমন অনেক সামাজিক ভাব ও মানসিক সদ্‌গুণ আছে যাহা অনেক শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে নাই। অনেক স্থলে হিন্দুর সকল প্রকৃতি দিয়া অনার্য্যদিগকে শুদ্ধ করিতে গেলে তাহাদিগকে অশুদ্ধই করা হইবে। আর একটি কথা এই যে মানুষকে অশুদ্ধ মনে করা অত্যন্ত গর্হিত; সকলকে আপনার করিয়া টানিয়া তোলা উচিত কিন্তু অশুদ্ধকে শুদ্ধ করা হইতেছে, এই কথাটি না বলিলেই ভাল হয়।

ভ্রান্তি ঘোচে না কেন? —স্যর্ তেজ বাহাদুর সপ্রু অনেক টাকা খরচ করিয়া বিলাতে ঘুরিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন যে শাসনকর্ত্তাদের দেশের লোকেদের দৃঢ় পণ, যে তাহারা ভারতীয়দের "অধিক রাষ্ট্রীয় অধিকার" দিবে না। এত বড় আবিষ্কারের পরেও তাঁহার এই ধারণা আছে যে "লেবর" দলের লোকেরা শাসনের ক্ষমতা পাইলে ভারতবাসীকে হাতে তুলিয়া স্বর্গ দিবে। মানুষের ভ্রান্তি কাটিয়াও কাটে না। আমরা বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত যে ইংরেজেরা কিছুতেই ভারতের স্বার্থ এক তিল পরিমাণে নষ্ট করিয়াও—ভারতের লোকের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি করিবে না। শাসন-সংস্কারের বড় কমিশনে ভারতের লোককে কেন স্থান দেওয়া হইল না, একথাটি বোকা বুঝাইবার মত ভাষায় অনেক ইংরেজ অনেক কথা বলিয়াছেন। সরকারি ভাবেও বলা হইয়াছে, যদি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে কমিশনার নির্ব্বাচন করা হইত তবে গভর্ণ-

মেণ্টের পক্ষ হইতেও লোক নিতে হইত, আর তাহাতে ভারতবাসীরা সন্দিগ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইতেন। কিন্তু বড়লাট সাহেবের শান্তি-বাচনে এ কথাত স্পষ্ট আছে, যে যখন কমিশনের রিপোর্ট্ তৈরি হইবে তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট আগে তাহা সমালোচনার জন্য পাইবেন ও সেই সমালোচনা সহ ভারতসচিবের হাতে কমিশনের প্রস্তাব দাখিল হইবে। তাহা হইলে ত গভর্ণমেণ্ট কোন প্রতিভূ না রাখিয়াই নিজেদের মতের অনুযায়ী কাজ পূর্ণমাত্রায় করিবার সুবিধা পাইবেন। ওজর-ওজুহাত খাড়া না করিয়া স্পষ্ট কথাই বলা ভাল ছিল, ইংরেজকে নিরুদ্বেগে এদেশে শাসন করিতে হইবে; তাই দেশের আন্দোলন ও কোলাহল বা অশান্তি থামাইয়া শাসন কার্য্য চালাইবার উপায় ধরিবার জন্য কমিশন বসিতেছে; ভারতবাসীকে পূর্ণ অধিকার দিবার আগ্রহে নয়। এই অতি সোজা কথাগুলি বুঝিতে নেতাদের এত গোল ঘটে কেন? শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব যদি তুলিতে হয় তবে সে প্রস্তাব ধার্য্য করিবার মত জনকতক বিবেচক শান্তভাবে একটি পদ্ধতি রচনা করিতে পারেন ও তাঁহাদের প্রস্তাব সারা দেশের লোকের সম্মতিতে দাখিল করিতে পারেন। এরূপ সুবিবেচিত প্রস্তাব যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট্ ও পার্লামেণ্ট্ পায়ে ঠেলেন তবে জনকতক লোক কমিশনারদের দলে বসিয়া বিশেষ কিছু করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা ভ্রান্তি; বরং ভারতবাসীকে কমিশনার করিতে গেলে ঘরের ঢেঁকি বা বিভীষণের আতঙ্ক আছে। অন্য দিকে বুদ্ধিমানেরা দু-তিন জন যদি শেষকালে কমিশনাররূপে "মাইনরিটির" রিপোর্ট্ লেখেন তবে পার্লামেণ্ট বলিতে পারিবেন যে অধিকাংশের মত গ্রহণ করাই যখন আইন-সঙ্গত রীতি, তবে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষার কথা ষোল আনা শুনিয়াই অধিকাংশের মত গ্রহণ করা হইল। এই ফাঁকির মধ্যে না পড়িয়া অনুত্তেজিত মাথায় দেশের হিতকর শাসন-পদ্ধতি নিজেরা রচনা করিলে একদিকে দেশের লোকের সুশিক্ষা হইবে আর অন্যদিকে ভ্রান্তেরা বুঝিতে পারিবেন যে, সারা দেশের সুবিবেচিত প্রস্তাব পার্লামেণ্টে কি ভাবে গৃহীত বা পরিত্যক্ত হয়।

Editor: Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal.

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মাতৃশিক্ষা

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের জন্য

ইহাতে গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের

স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ৩২৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী উপদেশ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী অফিস।

৭৭ নং আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর।

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ
১৩৩৩-'৩৪

পৌষ

দ্বিতীয়ার্দ্ধ
৫ম সংখ্যা

বাঙ্গালীর অতীত

বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাস যে খুব গৌরবময় এমন কথা বোধ হয় জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। রাজপুত, মারহাট্টা প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের হীনতা স্বতঃই উপলব্ধ হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অনেক গবেষণা করিয়া বাঙ্গালার একটা মহিমান্বিত প্রাঙ্‌মুসলমান যুগের কাহিনী আমাদিগকে জানাইতেছেন, যখন পাল ও সেনরাজগণ বাঙ্গলার সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন। তাহারও পূর্ব্বে শশাঙ্ক প্রভৃতি দুএকজন প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও এই সকল রাজাদের স্মৃতি এতই ক্ষীণ যে জাতির মনোরাজ্যে তাহাদের কোন প্রভাব প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে যে প্রবাদের কলঙ্ক আমাদের জাতীয় চরিত্রকে মসীমাখা করিয়া রাখিয়াছে তাহা হইতেছে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কাহিনী। অন্ধকূপ হত্যার ন্যায় ইহা একেবারে ভিত্তিহীন কি না তাহা ঐতিহাসিকগণ বিচার করিবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ইহা এমনই সত্যের মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে যে, বাঙ্গালী চিত্রকর এই লজ্জাকর প্রবাদকে রেখাবর্ণসমাবেশে

জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই এবং হাস্যরসিক কবি বাঙ্গালী-চরিত্র ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন

পরে যবে সেই সতর তুরস্ক প্রবেশ করিল গৌড়েতে,
লক্ষ্মণসেন ত দিলেন চম্পট কচুবনে এক দৌড়েতে !

কিন্তু অতীতের গৌরবস্মৃতির অভাব হইলে বর্ত্তমানে জাতীয়ভাব উদ্বুদ্ধ হয় না। তাই আমাদের মনে স্বদেশপ্রেম জাগাইবার জন্য কবি বুদ্ধ ও অশোককে বাঙ্গালী সাজাইয়া এক অপূর্ব্ব জাতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিজয়সিংহের লঙ্কাজয় একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা এমনই সুদূর অতীতের ও প্রবাদগল্পের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে আমাদের একমাত্র গর্ব্বের বিষয় এই যে, 'যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য'। কিন্তু কই, প্রতাপাদিত্য ত আমাদের জাতীয় বীররূপে পরিগণিত হন নাই! দিল্লীর পৃথ্বিরাজ, চিতোরের রাণা প্রতাপ, মহারাষ্ট্রের শিবাজী, সমগ্র ভারতে স্বদেশপ্রেমিক বীররূপে পূজিত হইতেছেন, কত কাব্য, নাটক, গাথা, গান ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া আজ এই কয় শত বৎসর ধরিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গের প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব শুধু আধুনিক দু' একজন লেখকের নাটক উপন্যাসের উপাদান স্বরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বতন সাহিত্যে তাঁহার সম্বন্ধে যে কিছুমাত্র উল্লেখ নাই তাহা নহে। ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্যে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, পরাজয় ও শোচনীয় মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, এবং তিনি যে একজন খুব বড় বীর ছিলেন তাহাও কবি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 'নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ।' কিন্তু কবির সহানুভূতি তাঁহার প্রতি নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী ভবানন্দ মজুমদারের স্তুতিবাদ করা। এই ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের অশেষবিধ সাহায্য করিয়া প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন; তাহারই পুরস্কারস্বরূপ জাহাঙ্গিরের নিকট হইতে 'মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান'। অন্নদামঙ্গল কাব্যে এই দেশের শত্রু শাপগ্রস্ত কুবেরপুত্র ও অন্নদার প্রিয়পাত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং ধরাতলে তিনি অশেষ সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া মৃত্যুর পর শাপমুক্ত হইয়া কিরূপ সমারোহে স্বর্গে গমন করিলেন তাহার চিত্র দিতেও কবি ভুলেন নাই। আর হতভাগ্য প্রতাপাদিত্য, যিনি মানসিংহের অগণিত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনাকে ও স্বদেশকে অসামান্য মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছেন তাঁহার জন্য কবির একবিন্দু অশ্রু কিংবা একটি প্রশংসার কথা নাই। কিরূপ ঘৃণাভরা ঔদাস্যের সহিত তিনি এই মহাবীরের মৃত্যু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ নরশার্দ্দূল দিল্লীর পথে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কবি লিখিতেছেন—

প্রতাপাদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥

*		*		*

পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ-আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥

কবির এই মনোভাবের হয়ত একটা কারণ এই যে তিনি ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দোষক্ষালন হয় না। আর আমাদিগকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও আগেকার বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের খুব ছড়াছড়ি দেখিতে পাই বটে—কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মমত প্রচারের জন্যই তখন সাহিত্য রচিত হইত, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ,—ত্যাগে প্রেমে, শৌর্য্যে মহনীয় বাঙ্গালী চরিত্রের চিত্র বড় একটা নয়নগোচর হয় না। একমাত্র প্রেমাবতার চৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণ বাঙ্গালী জাতির মানরক্ষা করিয়াছেন এবং স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ এই জাতিটাকে একটা নূতন প্রবল ভাবের বন্যায় ডুবাইয়া কিছুদিনের জন্য তাহাকে তাহার সমস্ত কলঙ্ক হইতে মুক্ত ও ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুদূর অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন বৌদ্ধ যুগে অতীশ, দীপঙ্কর প্রভৃতি বাঙ্গালী ধর্ম্মবীরের কথা শুনিতে পাই বটে। তাঁহারা নাকি বাঙ্গালীর গৌরব পতাকা দেশবিদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহাদের স্মৃতি এতই ক্ষীণ এবং তাঁহাদের প্রজ্জ্বলিত মহিমালোক একবার জ্বলিয়া উঠিয়া এমনই নিঃশেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে যে, এখন তাঁহাদের লইয়া গর্ব্বপ্রকাশে আমাদের দীনতাটাই বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। কিন্তু চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। তাঁহার প্রভাব শুধু ধর্ম্মে নয়, সাহিত্যে ও সমাজেও বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রেমপূত অপরূপ চরিতকথা বঙ্গসাহিত্যের যে বিভাগ উজ্জ্বল করিয়াছে তাহা বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইলেও সমগ্র জাতির গৌরবের বস্তু। গীতিকাব্যে যেমন আমাদের অতুলনীয় পদাবলী সাহিত্য আছে, চরিত শাখায় তেমনই চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থগুলি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের পঙ্কিল সরোবরে প্রস্ফুট পদ্মরূপে চিরদিন বিরাজ করিবে। সমাজেও যে তিনি কি বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে জাতিভেদের সুদৃঢ় প্রাচীর পর্য্যন্ত ধূলিসাৎ হইয়া ব্রাহ্মণ চণ্ডালে এক করিয়া দিয়াছিল, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাবপুষ্ট সাহিত্য ও সমাজ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যখন অন্যত্র দৃষ্টিপাত করি তখন বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্গতি দেখিয়া মাথা হেঁট করিতে হয়। একদিকে দেখি

যেমন ভারতচন্দ্র স্বার্থপর, দেশদ্রোহী ভবানন্দকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠের আসন দিয়াছেন, এমন কি স্বয়ং গঙ্গাদেবী তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—'ধন্য তুমি মজুন্দার, ব্রতদাস অন্নদার, আমি ধন্যা তোমার পরশে', অপরদিকে সেইরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীকাব্যে নায়কস্থানীয় যে তিনটি পুরুষ চরিত্র পাই তাহাদেরও ললাটে মহত্ত্বের দীপ্তি নাই, তাহারা আমাদিগকে মুগ্ধ করে না। কালকেতুর কথাই প্রথমে ধরা যাক। যতদিন সে ব্যাধমাত্র ছিল ততদিন তাহার অতুলনীয় বল, বিক্রম ও সাহস তাহাকে প্রকৃত বীরের উচ্চ পদবীতে সমারূঢ় করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু চণ্ডীর বরে রাজা হইবার পর তাহার চরিত্রে সে দৃঢ়তা আর দেখিতে পাই না; আর, দেবী স্বীয় মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য তাহার বীরত্ব পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়া তাহাকে একটা ভীরু কাপুরুষে পরিণত করিয়াছেন। কলিঙ্গাধিপতির সহিত যুদ্ধে হারিয়া স্ত্রীর অনুরোধে সে শয়ন প্রকোষ্ঠে লুকাইয়া রহিল; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন সে ধরা পড়িল তখন চণ্ডী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করতঃ স্বীয় শক্তির পরিচয় দিলেন। কালকেতু সসম্মানে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল বটে, কিন্তু রাজমুকুট আর তাহার চরিত্রের হীনতা ঢাকিতে পারিল না। আর যে দেবী এইরূপ হেয় উপায়ে নিজের মহিমা প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত তাঁহার সে উদ্দেশ্য কতটা সফল হইল তাহা আমাদের ক্ষুদ্র মানববুদ্ধির অগোচর।

চণ্ডীকাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্তের উপাখ্যান। ধনপতি সদাগর শৈব, তিনি চণ্ডীদেবীকে মানেন না। ফলে সিংহল যাত্রার কালে তাঁহার পণ্যভরা ছয় ডিঙ্গা ডুবিয়া গেল; কোনরূপে প্রাণটি লইয়া তিনি সিংহলে পৌঁছিলেন; কিন্তু রাজাকে কমলে কামিনী দেখাইতে না পারায় তিনি কারারুদ্ধ হইয়া রহিলেন। বহু বৎসর পরে যখন তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত তাঁহার অন্বেষণে আসিয়া কমলে কামিনী রূপিনী চণ্ডীর মায়ায় বধ্যভূমে নীত হইল তখন চণ্ডীর স্তব করায় দেবী সদলবলে আসিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন; ধনপতিও কারামুক্ত হইলেন। এক্ষেত্রে যদিও পিতাপুত্র বিনাদোষে শুধু দেবতার চক্রান্তে দুঃখ ভোগ করিয়াছে, তথাপি দেখি দৈবী শক্তিতে একান্ত নির্ভরশীল কবি পুরুষকারকে খর্ব্ব করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুন্দরও চোরের মত আচরণ করিয়া রাজাদেশে মশানে যখন ঘাতক হস্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে তখন তার এক স্তবেই সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মা কালীর আবির্ভাব ও সুন্দরের উদ্ধার। 'মানসিংহ' কাব্যে দিল্লীতে ভবানন্দ মজুমদারকেও একবার এই অবস্থায় পড়িয়া এই একই উপায়ে উদ্ধার লাভ করিতে দেখি।

এই সর্ব্বব্যাপী অপৌরুষের মধ্যে একটিমাত্র প্রচণ্ড মানসিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষের চিত্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের নিরানন্দ অন্ধকারে দীপ্ত আলোক রেখার ন্যায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। তাহা হইতেছে মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের অপূর্ব্ব চরিত্র। তেজ ও পুরুষকার এই চরিত্রটিতে যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে।

মনসাদেবীর স্বীয় পূজা প্রচারের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া শিবোপাসক চন্দ্রধরকে যখন সহস্র দুঃখ-দুর্গতি মাথায় তুলিয়া লইতে দেখি তখন এই দেবতাটির চেয়ে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ মানুষটির পায়েই আমাদের সমস্ত হৃদয় মন শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে নুইয়া পড়ে। কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের দেবতাকে বড় করিতেই হইবে। মনসামঙ্গলের কবিগণ শেষ পর্য্যন্ত চাঁদ সদাগরকে দিয়া মনসাদেবীর পূজা করাইয়া (যদিও শিবের আদেশে) তবে ছাড়িয়াছেন। শুধু তাহাই নহে। চাঁদ সদাগরের অসামান্য তেজ, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তাঁহার অমার্জ্জনীয় অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা, রূপে দর্শিত হইয়াছে। দীনেশবাবু তাঁহার 'বেহুলা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—'দুঃখের বিষয়, চাঁদ সদাগরের চরিত্রের বল প্রাচীন কবিগণ ততটা প্রশংসার ভাবে লক্ষ্য করেন নাই, অনেক স্থলেই তাঁহাকে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। আমি বিষয়টি অন্যভাবে দেখিয়াছি।'

প্রাগ্‌বৃটিশ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের ইহাই হইল একটা সাধারণ বৈশিষ্টা। ইহা হইতে আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা খুব প্রশংসনীয় নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট এই সাহিত্যই আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ ছিল, কিন্তু আমাদের মন আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদ ও নৈরাশ্যে ভরিয়া যায়। একা চাঁদবেণেকে ছাড়িয়া দিলে দৃঢ়তা, আত্মনির্ভরতা, পরার্থপ্রিয়তা, স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যের নায়কের চরিত্রে বড় খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথের সন্দীপের একটা উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সে বলিতেছে যে, বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান, তাই সে নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া দেবতাকে দিয়া সমস্ত কাজ হাসিল করিয়া লইবার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমানের অত্যাচারে যখন বঙ্গের হিন্দু জাতি জর্জ্জরিত ও অতিষ্ঠ, তখনও সে দেবতারই উপর দানব দলনের ভার দিয়া নিজে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছে। তাই তাহার জাতীয় উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দশপ্রহরণধারিণী, অসুরমর্দ্দিনী, বরাভয়দায়িনী। সন্দীপের এই উক্তি হয়ত বিচারসহ নহে, কিন্তু ইহা যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা দূষণীয় দিক নির্দ্দেশ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙ্গালী হিন্দু পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া নানা অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে। সময়ে সময়ে সে অত্যাচার যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিত তাহাও প্রাচীন সাহিত্য হইতে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আছে—

ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে॥

*　　*　　*

যাহার মস্তকে দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলায় বাঁধি লয় কাজির সাক্ষাৎ॥

কক্ষতলে মাথা লইয়া বজ্র মারে কিল।
পাথর প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল ॥ ইত্যাদি

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও এইরূপ বর্ণনা পাই—

পিরুল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ ॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘরদ্বার লোটে আর লৌহপাশে বাঁধে ॥

তথাপি মনুষ্যত্বহীন হিন্দু এই অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার কোন চেষ্টাই কখনও করে নাই। শুধু তাহাই নয়। এই অত্যাচারের ফলে যাহাদের একবার জাতিনাশ হইত তাহাদিগকে হিন্দু সমাজ চিরদিনের জন্য নিজ অঙ্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আপনাদের পবিত্রতা ও সনাতনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। নহিলে আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা কেন ?

এ পর্য্যন্ত আমি এই কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য হইতে যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রে প্রকৃত মনুষ্যত্বের অত্যন্ত অভাব লক্ষিত হয়,—বিশেষতঃ মনুষ্যত্বের সেই মহান্ সুপ্রকাশের, যাহা বীরত্বে ও স্বদেশপ্রেমে, ত্যাগে ও দুঃখে নিজেকে সার্থক ও জগদ্‌বরেণ্য করিয়া তোলে। পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে নিজের চিত্ত ও স্বার্থকে প্রসারিত করিয়া আপনাকে বৃহত্তর সমাজের বা দেশের সঙ্গে একীভূত করিবার উদারতা বা স্বদেশপ্রেম ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগে নাই। তাহার একটি কারণ আমরা অনুমান করিতে পারি। রাজা হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, বাঙ্গালীর গ্রাম্যজীবন উপদ্রবহীন শান্তিতে একটানা বহিয়া চলিয়াছে, কোনদিন কোনরূপে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। বাঙ্গলার গ্রামগুলি

শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্ম্মল
শ্যামল উত্তরী,
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী বালকের দল
ছিল বক্ষে ধরি।

শত রাষ্ট্রীয় বিপ্লবেও গ্রাম্যজীবনের এই নিস্তরঙ্গ ধারা অব্যাহত থাকিয়াছে। কাজেই স্বদেশপ্রেম বিকসিত হইবার অবসরই ছিল না। তবে কি ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ এই কথাটার বাঙ্গালীর কাছে কোন মূল্য ছিল না ? আমার মনে হয় জন্মভূমি বলিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের আবাসভূমি গ্রামটিকেই বুঝিতেন, এবং হৃদয়ের সমস্ত আসক্তি দিয়া তাঁহাদের এই জন্মভূমির সুখময় ক্রোড়টি আঁকড়িয়া থাকিতেন।

বাঙ্গালীর জীবনের এই ধারা ও এই বৈশিষ্ট্য অতীত যুগের শেষ কবি ঈশ্বরগুপ্তের রচনাবলীতেও দেখিতে পাই। একদিকে তিনি খৃষ্টান পাদ্‌রিদিগের উপর গালিবর্ষণ করিতেছেন এবং দুইচারিজনের আহারবিহারে স্বাধীনতার জন্য হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল বলিয়া শিরে করাঘাত করিতেছেন, অপরদিকে ইংরেজ রাজ্যে আমরা পরম সুখে আছি এবং ইংরেজের সঙ্গে যাহারা শত্রুতা করে তাহারা আমাদেরও শত্রু এইভাব তিনি বহু কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়ে তাঁহার কি আনন্দ!

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়,
শতদ্রু পার হ'ল শীক সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়!

ইহার সঙ্গে শিখদের উপর অজস্র গালিবর্ষণ ও ইংরেজের নির্লজ্জ স্তুতিবাদও আছে। সিপাহীযুদ্ধেও তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরেজের জয় কামনা করিয়াছেন।

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়।

তারপরে যুদ্ধশেষে ইংরেজ যখন জয়ী হইল এবং নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহীদিগকে হত্যা করিয়া রক্তের নদী বহাইতে লাগিল তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া কবি লিখিতেছেন—

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার॥

* * *

ব্রিটিশের জয় জয় বল সবে ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাইরে॥

বৈদেশিক বিজেতার হাতে স্বাধীনতা-প্রয়াসী স্বদেশবাসীর পরাজয়ে ও দুর্গতিতে এত বেশী আনন্দপ্রকাশ ও বিভুগুণ-কীর্ত্তন জগতের আর কোন সাহিত্যে মিলিবে কি? বুঝিতে হইবে যে, ইহাই ছিল তখনকার সাধারণ বাঙ্গালীর মনোভাব। ভগবানের অভিসম্পাত এই জাতির উপর পড়িবে না ত পড়িবে কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই আত্মদ্রোহী, সঙ্কীর্ণমনা জাতিটা চিরকাল নিজের ধর্ম্মের গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই ধর্ম্ম যে কিরূপ অন্তঃসারশূন্য ছিল, প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সহায়তা না করিয়া সাম্প্রদায়িক দেবদেবী বিশেষের মাহাত্ম্যপ্রচারেই কিরূপে ইহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ও ব্যয়িত হইত তাহা আমরা উপরের কয়েকটী উদাহরণ হইতে দেখিয়াছি।

এই ধর্ম্মভীরু (অর্থাৎ ধর্ম্ম যাহাকে ভীরু করিয়াছে), কর্ম্মবিমুখ জাতির মেরুদণ্ডহীন চরিত্র দেখিয়া আধুনিক কবি যে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

সাতকোটি বাঙ্গালীরে হে বঙ্গজননি
বাঙ্গালী করেছ কিন্তু মানুষ করনি।

তাহা ত মিথ্যা বলিতে পারি না। কেন এমন হইল তাহা বিচার করিবার ধৃষ্টতা আমার নাই ; কিন্তু ধর্ম্ম যে আমাদিগকে মানুষ হইতে সাহায্য করে নাই তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে হয়,—"মনে রাখা দরকার, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিষ নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্ম্ম বলে মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো তবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে পালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্ম-দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, শুধু নিজের নয় চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটা দেখিয়া লও, তাইতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খৎ দিতে হইবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরে জন্মাক পূজনীয়। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজন হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।"

আমরা চিরকাল ধর্ম্মের নামে এই ধর্ম্মতন্ত্রের উপাসনা করিয়া আসিয়াছি। দেশাচার, লোকাচার, সাম্প্রদায়িকতা ও গতানুগতিকতাই আমাদের ধর্ম্মজীবন নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলে, মুক্তির স্বাদ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি ; দাস মনোভাব লইয়া দাসত্বেই আমরা গর্ব্ব ও আনন্দ বোধ করিয়াছি। তাই, আমরা যাহাদের জড়বাদী নাস্তিক, আধ্যাত্মিকতাহীন বলিয়া ঘৃণা করি সেই ইংরেজ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম-পাদে যখন ধর্ম্মে স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য দলে দলে দেশত্যাগ করিয়া সুদূর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতেছিল আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল এবং যখন মিল্‌টনের সাহিত্যে স্বাধীনতার তূর্য্যনিনাদ ঘোষিত হইতেছিল, তখন "স্বীয় পূজা প্রচারের জন্য চণ্ডী ও বিষহরির দিনে শান্তি ও রাত্রে নিদ্রা ছিল না। সুন্দর দেবীর প্রসাদে চৌর্য্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা কখনও সাশ্রুনেত্র, কখনও খড়্গহস্ত। কিন্তু প্রায়শঃ ইঁহারা সামান্য মানবীর ন্যায় রাগ, হিংসা ও দুঃখের পরিচয়

দিয়াছেন।” (শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, ১০০ পৃষ্ঠা)। এই সব দেব-দেবীকে লইয়াই আমাদের যাহা কিছু সাহিত্য—সে সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের গন্ধমাত্র কেহ পাইবেন না। আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ না করাই ভাল। সুতরাং আজ যে আমরা সেই ইংরাজ জাতির পদানত তাহা ত কিছুই বিচিত্র নহে। আর বিধর্ম্মীর হাতে আমাদের ধর্ম্মের অবমাননা অতীতকালের ন্যায় এখনও আমরা নিরুপায়ভাবে সহিয়া যাইতেছি।

এই ইংরেজের সঙ্গে আসিয়াছে তাহার সাহিত্য ও তাহার ইতিহাস। ফলে, যদিও আমাদের পরাধীনতার নিগড় আরও দৃঢ়তর হইয়াছে, তথাপি আমাদের মনোরাজ্যে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। দাসত্বের গ্লানি ও হীনতা আমরা উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছি, এবং তাহা দূর করিতে প্রাণপণে যত্নবান হইয়াছি। ধর্ম্মেও আমাদের যাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের মন সেই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। পুরাতন তাহার জীর্ণতার খোলস ছাড়িয়া নূতনের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইয়াছে। সাহিত্যে ও সমাজেও নূতন ভাবের প্লাবন আসিয়াছে। এই ভাববন্যা ও ত্যাগবীর মুক্তিকামীদের হৃদয়রক্ত আমাদের পুঞ্জীভূত পাপরাশি ও বহুযুগসঞ্চিত জাতীয় কলঙ্ক ধৌত করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে কি না জানি না, কিন্তু আজ যে আদর্শের বাণী আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া মানুষকে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছে তাহাই কবির ভাষায় উচ্চারণ করিয়া আমার এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উপসংহার করি—

ঘুচে যাক্ শত জাতিবিচ্ছেদ,
শাস্ত্রাশাস্ত্র বিদ্রোহ-ক্লেদ,
মানব সেবার সুপরম বেদ
মাথায় তুলিয়া নে রে,
উজল সজাগ বিশ্বের সাথে
বিস্তারি’ হৃদয়েরে!

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

বজ্র-সাধন *

মর নাই, মর নাই, অমরেরই মত মৃত্যুহীন
হে বৃত্র প্রতাপ তব, আছ গুপ্ত, আছ অন্তর্লীন
এ বিশ্বের অণুতে অণুতে, স্বর্গে, মর্ত্তে, ত্রিভুবনে
দেবতার, দানবের, মানবের দেহ-আত্মা-মনে
অমর তোমার রাজ্য ; তুমি চির বিঘ্ন মূর্ত্তিমান,
সঙ্কল্প ও সিদ্ধি মাঝে রচিতেছ লক্ষ ব্যবধান
যুগে যুগে, তুমি যজ্ঞ-সাধনার, তপস্যার অরি
সত্ত্বে, রজে রাখ নিত্য মুহ্যমান মৃতকল্প করি
দুর্ভেদ্য তামসচ্ছদে, জানি, জানি পুরাণ-বারতা,
পরাভূত, স্বর্গচ্যুত দেবতার অন্তর্গূঢ় ব্যথা
দধীচি অন্তরে মানি' আত্ম-প্রাণ দিলা বলিদান,
সে পবিত্র অস্থি দিয়া বিশ্ব-কর্ম্মা করিল নির্ম্মাণ
অমোঘ, অজেয় বজ্র। আত্ম-লোপ এই দধীচির,
অমরার এই চিত্র স্মৃতি-পটে সারা পৃথিবীর
অমর হইয়া আছে। কুণ্ঠাহীন কুলিশ নির্ম্মম,
তপঃসিদ্ধ বাসবের মূর্ত্ত, ধ্রুব, অব্যর্থ বিক্রম
বিন্ধিল তোমারে যবে, মৃত্যু নয়, এল পরাজয়,
সে বারের মত, বৃত্র, সাঙ্গ রণ-রঙ্গ অভিনয়
বিধাতার ; লুকাইলে তমঃ যবনিকা-অন্তরালে
মদমত্ত ইন্দ্রে, দৈত্য, ভুলাইলে মায়া-ইন্দ্রজালে
বিজয়ের অনিত্য গৌরবে। হায়, কে জানে তখন
সে মুহূর্ত্ত হ'তে তুমি সঙ্গোপনে কর অন্বেষণ
নব নব রঙ্গ-ভূমি! সত্ত্ব, রজঃ যবে ক্ষীণ-প্রাণ,
মিথ্যার পীড়নে যবে সত্য-ধর্ম্ম হ'য়ে আসে ম্লান,
দেহে-গেহে, মনে-বনে, প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রে বা সমাজে
সত্য-বীণা স্তব্ধ করি' মিথ্যার দামামা যবে বাজে,

* (কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "বজ্রের কথা" প্রবন্ধ পাঠে)

অত্যাচার উচ্চ-শির, উৎপীড়িত ছাড়ে আর্ত্তনাদ,
ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা আর রিরংসার বাদ-বিসম্বাদ
কোলাহল করে যবে আর্ত্ত করি দীন মর্ত্ত্য-ভূমি,
তখনি বুঝিনু ইন্দ্র পরাজিত, বৃত্র, জয়ী তুমি।
স্বর্গে, মর্ত্তে, অন্তরীক্ষে, জলে, স্থলে, কিম্বা রসাতলে
দেবে ও দানব-সঙ্ঘে নিত্যকাল এই দ্বন্দ্ব চলে,
বিচিত্র বিধির লীলা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লাগি'
এ রণের আয়োজন। সুপ্ত বৃত্র ওঠে যবে জাগি'
মানবের গুপ্ত মনে, অসহায়, দীন, নিরুপায়
সর্ব্বেন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করে' ইন্দ্র তীব্র তপস্যায়
অভীষ্ট সাধন তরে। দধীচির হয় অভ্যুত্থান ;
গম্ভীর নির্ঘোষে গর্জ্জে সত্য-ধর্ম্ম-বজ্রের বিষাণ,
অন্তরাত্মা পূর্ণ করি' ছুটে যায় সম্মুখে নির্ভীক
চূর্ণ করি' বাধা-বন্ধ। ইন্দ্র, বৃত্র শুধু যে প্রতীক
ভাল-মন্দ, আলো-অন্ধ অনন্ত সমরে ; অনুক্ষণ
ভিতরে-বাহিরে, দেহে-মনে চলে এই রণ চিরন্তন।
জয়ী যদি হ'তে চাও মুক্তি-স্নান কর তুমি আগে
ইন্দ্র-দধীচির পুণ্য তপস্ত্যাগ সঙ্গম-প্রয়াসে।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজাপতির দৌত্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

(১৩)

নবীনকিশোর চৌধুরীর পুত্র এবং কন্যাকে পড়াইবার ভার তাহারা দুই বন্ধুতে স্বীকার করিল। রাম সেই সঙ্গে আরো স্বীকার করিল যে স্ত্রীজাতির উপর কর্ত্তৃত্বের ভার পড়িলেই সর্ব্বত্র ব্যাপারটা দুঃসহ হয় না।

যাদুমণির শরীর রুগ্ন-অপটু বটে, তাহার পরিচয়ও তাঁহার ব্যবহারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত সত্য ; তথাপি শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে তাঁহার অন্তঃকরণটি যে প্রসারতা লাভ করিয়াছিল তাহার স্পর্শ-পরিচয়ে, যাহারা তাঁহার কাছাকাছি আসিত তাহাদের মন প্রসন্ন না হইয়া পারিত না।

রামের স্ত্রীজাতি সম্পর্কে যে সকল কঠিন এবং বদ্ধমূল ধারণা ছিল তাহা কয়েকদিনের মধ্যে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পঞ্চাননের মার নিষ্ঠুর সন্দেহে তাহার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে সে তখনি যাদুমণির কথা মনে করিয়া ভাবিত, রক্ষা যে সকল স্ত্রীলোক পঞ্চাননের মার মত নহে।

পরের মাসের বেতনের হিসাব করিবার সময় পঞ্চাননের মা চারদিনের বেতন কাটিয়া বলিলেন, একদিন তাহার একটি বন্ধু আসিয়াছিল বটে কিন্তু পঞ্চানন তাহার কাছে পড়ে নাই; অতএব সে দিনের বেতনও তিনি দিবেন না।

রাম মনে মনে হাসিল, সেই চারদিনের বেতন যাদুমণি দিয়াছেন, তখন রাম তাঁহাদের বাড়ি যায় নাই পর্য্যন্ত! সে কথা তাহারা বলিয়াছিল, উত্তরে যাদুমণি বলিয়াছিলেন, সেকি? যে দিন কথা হয় সেইদিন থেকেই আমরা মাইনে দিয়ে থাকি।

দারিদ্র্য মানুষকে সঙ্কীর্ণ করে সত্য, পরন্তু সমস্তটার জন্য কেবলমাত্র দারিদ্র্যকেই দায়ী করা চলে কি?

শরৎ এবং অরুণা সকালে পড়িত রামের কাছে। বৈকালে তাহাদের ভার লইয়াছিল নন্দ।

পঞ্চাননকে ত্যাগ করিবার জন্য নন্দ তাহাকে বহু অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু রাম ছাড়িতে চাহেনা, বলিত, যতদিন চলে চলুক্ না কেন। সংকীর্ণ ছোট মানুষদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে শেখাও ত জীবনের একটা মস্ত শিক্ষা।

নন্দ মুখ ভার করিয়া বলিত, ও কোন কাজের শিক্ষা নয়, যাতে ভিতরের মানুষটি ক্ষুব্ধ-অশান্ত হ'য়ে উঠে তা থেকে দূরে থাকাই ভালো; তা ছাড়া, নীচতার ছোঁয়াচ্ আছে—আর সেটা, তলে তলে এসে কখন যে মনকে অধিকার ক'রে বসে, তা' আমরা বুঝতে পারিনে।

রাম কথার উত্তর দিতনা, কিন্তু মনে মনে ভাবিত, মন্দটা ছুঁলেই যদি মন্দ হ'য়ে যাই তো বুঝব যে মন্দই আমার প্রকৃতি, ভাল আমার মধ্যে নেই!

অরুণাকে লইয়া কিন্তু দুই বন্ধুর কিছু বিপদ উপস্থিত হইল। যাদুমণি এবং নবীন-কিশোর কন্যাকে ঘেরাটোপ মোড়া আস্‌বাবের মত একটি অচল পদার্থ করিতে চাহেন নাই। তাই অরুণার ভিতর যৌবনের চাঞ্চল্য কতকটা অবাধেই স্ফুরিত হইত। তাহার হাসির উচ্ছ্বাস, তাহার কথার অনর্গল স্রোত পিতামাতার নিকট মোটেই পীড়াদায়ক ছিল না, অপিচ তাঁহারা খুশী হইতেন।

নন্দ যুক্তি-তর্ক দিয়া তাহার ব্যবহারটা সহজ করিয়া ধরিবার এবং বুঝিবার চেষ্টাই করিত; কিন্তু রাম বাহিরে যতই স্তব্ধ গম্ভীর হইত, ভিতরে সমস্তটাকে অমার্জ্জনীয় নির্লজ্জতা বলিয়া রাগে জ্বলিতে থাকিত! সে মনে মনে বলিত, কৈ শরৎ তো অমন চপল নয়!

অরুণা বোধকরি, রামের অসহিষ্ণুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহার সহিত একটু বাড়াবাড়ি করিয়া আমোদ পাইত।

সকালে নবীনকিশোর মক্কেল লইয়া নীচে থাকিতেন, এবং যাদুমণি যাইতেন গাড়ী করিয়া হাওয়া খাইতে। রাম যাইত আন্দাজমত চায়ের সময়ের পর। কিন্তু অরুণার তাহা মনঃপূত হইত না।

রাম জাতি-রক্ষার জন্য যে চায়ের সময় উত্তীর্ণ করিয়া যাইত, তাহা অরুণা কি যাদুমণির বুদ্ধিতে আসে নাই।

তাই একদিন মাঠ হইতে বেড়াইয়া ফিরিয়া যাদুমণি পড়ার ঘরে ঢুকিলেন। রাম দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া অরুণা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যাদুমণি এবং রাম উভয়ে অপ্রস্তুত হইলেন।

যাদুমণি বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, ওমা! মেয়েটা এমন ক'রে হাসে কেন?......

অরুণা কোন প্রকারে হাসি সম্বরণ করিলে যাদুমণি রামকে বলিলেন, আমরা রোজই আশা করি যে আপনাকে চায়ের সময় পাব, আর একটু আগে এসে এইখেনেই চা টা খাবেন, কাল থেকে।

রাম কথার উত্তর দিতে পারিল না। যাদুমণি আর অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

অরুণা এইবার রামকে পাইয়া বসিল। সে প্রশ্ন করিল, আপনি মাকে দেখে উঠে দাঁড়ান কেন? বলুন না? কেন?

রাম বলিল, তিনি গুরুজন ব'লে, তোমাদের মা ব'লে।

কৈ আমরাতো দাঁড়াইনে?

রাম গম্ভীর হইয়া বলিল, তা হ'লে অন্যায় কর। এর পর থেকে দাঁড়িও।

অরুণা হাসিতে হাসিতে বলিল, আর মা যদি দাঁড়াতে মানা করেন?

তবে তাঁর কথামতই কাজ করবে।

আপনিও করবেন?

রাম বলিল, নিশ্চয়।

এবার সোৎসাহে অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, তবে কাল থেকে সকাল সকাল এসে চা খাবেন, নিশ্চয়।

রাম চুপ করিয়া রহিল।

না, মাষ্টার মশাই, চুপ ক'রে থাকলে চ'লবে না, আপনাকে সময়ে আস্‌তেই হবে।

রামের কাণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। রাম বলিল, সকালে আমার একটু কাজ থাকে......

অরুণা ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে বলিল, তা হবে না, কি কাজ, আপনাকে বল্‌তে হবে…

রাম বিপদে পড়িয়া কথার উত্তর দিতে পারিল না।

রামের মন একটুও নিরুদ্বেগ হইতে পারিল না। হয় তাহাকে সকাল-সকাল আসিয়া চা খাইতে হয়, নয়ত' একটা যুক্তি-পূর্ণ কারণ দেখিয়া বলিতে হয় যে, সে অক্ষম।

যেখানে সত্য-কারণটি প্রকাশ করিবার উপায় থাকে না, সেইখানে বিপদ সব চেয়ে বেশী। সত্য এতখানি জোরের সহিত সাড়া দিতে থাকে যে মিথ্যার ছলা-কলা-কৌশল যেন পঙ্গু হইয়া পড়ে!

রামের মনের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল; কিছুতেই আর কোন কথার উপর সে নির্ভর করিতে পারে না; মনে হয় মিথ্যার স্বরূপটি এত স্বচ্ছ যে তাহা ভেদ করিয়া সত্যটিকে বাহির করিয়া ফেলা যাদুমণির পক্ষে একটুও শক্ত হইবে না।

অবশেষে রামের ঘটে একটি বুদ্ধি যোগাইল। সে স্থির করিল যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাইলে সে হয়ত' একটা বিশেষ-কোন ওজর বাহির করিয়া জাতিনাশের সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

বাড়ি ফিরিতে পথে মনে হইল যে নন্দকে একথা বলিবে; নন্দ কোন একটা উপায় বলিয়া দিতেও পারে। কিন্তু নন্দকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে না—নন্দ এমন ঠাট্টা-তামাসা করিবে যাহা তাহার পক্ষে অসহ্য।

এতদিন রাম জাতি-তত্ত্বের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে নাই। আজ বিপদে পড়িয়া তাহার মন অমিত শক্তি সঞ্চয় করিয়া একটি একটি প্রশ্নের সম্যক্ সমাধান করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল।

রাম নিজেকে প্রশ্ন করিল, জাত জিনিষটা কি? তাহাকে রক্ষা করিবার যে-ইচ্ছাটি তাহার মধ্যে এতখানি প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহার মুল কোথায়, হেতুই বা কি? পূর্ব্ব-পুরুষ জাতি-সম্বন্ধে এতখানি সতর্কতা রক্ষা করিবার আদেশই বা কেন দিয়া গিয়াছেন?

মনের ভিতর দিয়া চিন্তার একটা খর-স্রোত সমস্ত দিন প্রবাহিত হইয়া চলিল; কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে রাম কিছুতেই আর উপনীত হইতে পারে না!

এমনি করিয়া দিন কাটিল। স্কুলের কাজের মধ্যে, কাজ এবং ব্যাপৃতির পিছনে পিছনে এই চিন্তা ছায়ার মত নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

চারিটার পর রাম বাসায় ফিরিয়া অন্যমনস্ক হইয়া বোধকরি এই কথাই ভাবিতেছিল নন্দ তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, সমস্তদিন এমন আন্‌মনা হ'য়ে কি ভাবিস্ বলতো রাম?

রাম রাগ করিয়া বলিল, মাথা আর মুণ্ডু; তুমি দেখ্‌ছি ক্রমে আমার অন্তর্য্যামী হ'য়ে

উঠ্‌বে। পরক্ষণে একটু লজ্জা-বোধ করিয়া রাম বলিল, মানুষের মনের এই চিন্তার দায় থেকে কোন মুহূর্ত্তে নিষ্কৃতি আছে ব'লে ত আমার মনে হয় না, ভাই!

নন্দ তাহাকে চায়ের পেয়ালাটা আগাইয়া দিয়া বলিল, তোর আবার একটু বেশী-বেশী— যাকে বলে অতিরিক্ত……কিসের যে তোর এত ভাবনা তাই ভেবেই আমি অবাক হ'য়ে থাকি।

রাম অবসর বুঝিয়া নন্দকে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, জাত সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা, নন্দ?

নন্দ এমনি একটা কথা যেন তাহার মুখ হইতে আশা করিতেছিল, তাই মুখ টিপিয়া হাসিয়া রহস্যের সঙ্গে বলিল, তোকে যে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোক দান করতে পারবো ব'লে তো মনে হয় না, রাম!…তুই যেন দিনকের দিন আরো গোঁড়া, আরো সংকীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌চিস্, তোর বাবার মৃত্যুর পর থেকে ওই জাত-বিচারের ভূতটা যেন তোদের সকলের কাঁধেই চেপে ব'সেছে……

নন্দ আর বলিল না, সে যেন বুঝিল যে অমন করিয়া বলিলে, মানুষকে অযথা আঘাত করা ছাড়া আর বিশেষ কোন ফল হয় না।

রাম খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি বোধ হয় ঠিক ব'লছো নন্দ; কিন্তু এটা কি খুব স্বাভাবিক নয়? নিজের কথা ঠিক জানিনে, কিন্তু মার সম্বন্ধে এটা আমি খুবই লক্ষ্য করে এসেছি; মা যেন আজকাল বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চ'লতে চান্; তাঁর স্বাধীন মতবাদ,—বাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিদায় নিয়ে চ'লে গেছে।

নন্দ বলিল, ওকে বলে রি-এক্‌শন; ওটা মানুষের জীবনে যেমন নিত্যকার ঘটনা, তেমনি মারাত্মক!

রাম চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল, নন্দ বলিতে লাগিল, যেন হাউই বাজি! হৈ হৈ শব্দ করে মাটি থেকে উঠে প'ড়ে পুঁজি ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাটিতেই প্রত্যাগমন …আমাদের কথা ছেড়েদি, আমাদের না আছে শিক্ষা, না আছে কাল্‌চার; ওদের দেশেও ঠিক এমনিই নিত্য ঘটচে!

রাম জিজ্ঞাসু চোখে নন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নন্দ আবার বলিল, দেখ তুই মিলিয়ে মিলিয়ে, যত রক্ষণ-শীল, যাকে ওরা বলে কন্‌-সারভেটিভ—তাদের জীবনের আরম্ভটা কিন্তু স্বাধীন মতবাদের ভেতর দিয়ে—কিন্তু সে-সব খুব দীর্ঘকালের জন্যে নয়, দিনকতক পরেই, তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে! বলিয়া নন্দ হাসিতে লাগিল।

জাত? নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, জাতের কথা বল্‌চিস্? রাম মাথা নাড়িল, হুঁ।

ওটাকে…নন্দ উৎসাহ ভরে বলিল, বুঝেচিস্? ওটাকে ভাই, আমি মনে মনে কোন দিনই একটা বড় কিছু ব'লে মনে করিনে।…ওটা, মনে আছে, লজিকে প'ড়েছিলি?

ক্লাসিফিকেশন্ ? সমাজকে ঠিক অর্ডারে আন্‌তে গেলে, একটা ক্লাসিফিকেশনের দরকার হয়, সেটাই আমাদের দেশে বর্ণাশ্রম নাম ধ'রে আজ পর্য্যন্ত চ'লে আস্‌চে।...শুনেছি গীতায় নাকি ওর উৎপত্তির একটা সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আছে ..তাইতো বলি, আয়, দু'জনে মিলে রোজ একটু একটু ক'রে গীতাখানা পড়া যাক্...

রাম বলিল, আচ্ছা সে তো হবে, এখন কি ব'লছো তাই বল।

নন্দ বলিল, জাত-বিচার সব দেশেই আছে; কারণ সমাজ একটা শৃঙ্খলা চায়; আর শৃঙ্খলা করতে গেলেই বিভাগ আপ্‌নি এসে পড়ে।...আসল প্রশ্ন হচ্চে, এই বিভাগের কি নিয়ম হবে ? আমাদের নিবৃত্তির দেশ আমরা চাইলাম গুণের উপর, মানুষের ত্যাগের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করবে ;—তাই ব্রাহ্মণ, যে সর্ব্ব-বিষয়ে ত্যাগী, সেই হ'লো বর্ণের শ্রেষ্ঠ ! তারপর ক্ষত্রিয়, তারপর বৈশ্য,—আর শূদ্র হ'লো শেষ-কুড়োনো...

নন্দ জিজ্ঞাসা করিল, হাস্‌চিস্ যে রাম ?

তোমার অশেষ পাণ্ডিত্য দেখে।

আমার ? এ সব কি আমার কথা নাকি ? এ-সব আমি লেকচার শুনে শুনে শিখেছি—দেখিস্‌নে লেকচার হ'লেই ছুটি ?

তারপর কি বল।

আর ওদের দেশটা প্রবৃত্তির উপাসক, গুণ-মুন ওরা কিছুই বোঝে না, ওরা কাঞ্চনটাই বোঝে—তাই ওদের দেশে যার যত টাকা সে ততই বড়—গরীবের কোন প্রতিষ্ঠা নেই ওদের দেশে......

দূর, রাম বলিল, তোর যত সব বাজে গল্প, ওদের দেশে গুণের আদর নেই ?

তা কি আর একেবারে নেই—তাই কেউ বল্‌চে ? গুণের হিসেবে ওদের জাতের বিভাগ হয়নিরে, জান্‌লি ? এ আমার একেবারে অকাট্য কথা।

রাম বলিল, কিন্তু আমি এটা সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিতে পার্ব্বো না, ভাই......

নন্দ উত্তেজিত হ'য়ে বলিল, কেন পারবে না শুনি ? এদের সংস্রবে এসে—এখন আমাদের মধ্যেও কাঞ্চন-কৌলিন্য চলার উপক্রম হয়েছে......কিন্তু বল্লালসেনের সময় কি তাই ছিল ? আজকাল হ'লে কি বল্লালসেন সোনারবেণেদের এ দুর্গতি ক'রতে পারতো ? সোনারবেণেরা বিদ্যাতে বুদ্ধিতে—কিসে ছোট ছিল ? কিন্তু ঈর্ষায় বল্লাল তাদের জল অচল ক'রে দিয়ে গেল !......

রাম মনে মনে একটু অধীর হইয়া বলিল, যাক্ ও সব ইতিহাসের কথা, কি যে সত্যি ছিল, আর হ'য়েছিল, তা কেউ বল্‌তে পারে না......সব অনুমান......

নন্দ বলিল, বেশ, থাক ইতিহাস, তবে তুই কি জান্‌তে চাস্—তাই বল পরিষ্কার ক'রে ?

রাম বলিল, আমি জান্‌তে চাই জাত মানায় দোষটা কি ?—সেইটে বুঝিয়ে দেও, দেখি।

দোষ ?—নন্দ বলিল, কেন, সেতো সহজ কথা, ধরে নেও আমি তোমার চেয়ে সব বিষয়ে ছোট, তাই ব'লে আমি তোমার ঘৃণা কিম্বা অবহেলার পাত্র কি ক'রে হই ?......এখেনে এসে আমাদের ধর্ম্ম বোকা, উজবুক্ হ'য়ে গেছে !

রাম স্থিরনেত্রে নন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

নন্দ দ্বিগুণ উৎসাহে বলিয়া চলিল, ঘৃণা, বিদ্বেষ, কি হিংসার উপর কোন বড় জিনিষ দাঁড়াতে পারে না। তবে সমাজে এক সঙ্গে থাকার দরকার কি ছিল, যদি পরস্পরকে ভালই না বাস্‌তে পারি ? এর চাইতে বনে গিয়ে একা-একা বাস করা সহস্রগুণে ভাল ছিল।

রামের পঞ্চাননকে পড়াইতে যাইবার সময় হইতেছিল তাই সে ধীরে ধীরে উঠিয়া জামা পরিতে লাগিল।

নন্দ বলিল, চল্লি কোথায় ?

ধান ভান্‌তে,—ঢেঁকি কিনা !

রামের মুখে ব্যথার হাসি।

পথে একটা মোড়ে বহু লোকের জমায়েৎ হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে সন্ধ্যার সময়ে এরূপ প্রায়ই হয়।

ভিড়ের মধ্যে একখানি চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া একজন মিশানারি সাহেব উচ্চ-কণ্ঠে প্রভু-যীশুর জয়-গান করিতেছেন।

আমরা যীশুর ছোট-মেষ।
নাইকো মোদের কোন ক্লেশ ॥

বৃটিশ-সিংহশাবককে কে না চেনে ? অতএব তাঁহার মেষ-শিশু বলিয়া পরিচয় দেওয়াটিকে শ্রোতারা বিনয়ের সুপ্রচলিত কপটতা ছাড়া আর কিছুই মনে না করিয়া অতি সন্তর্পণে দাঁড়াইয়া আছে,—পাছে তাঁহার বক্তৃতার বন্যায় ভাসিয়া চলিয়া যায় !

রাম যাইতে যাইতে শুনিতে পাইল যে তাহার মন জুড়িয়া যে প্রশ্নটি চাপিয়া বসিয়া তাহাকে আজ ব্যথা দিতেছে তাহার একটি সহজ সরল উত্তর সাহেবের ভাঙ্গা-চোরা বাঙ্গলার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে :—

সদা-প্রভুর পুত্র-কন্যা আমরা ;—সকলেই ভ্রাতা ভগ্নী, এস সকলে মিলিয়া মিলিত কণ্ঠে তাঁহার সদনে প্রার্থনা জানাই......আমাদের মধ্যে ভেদ নাই, জাতি নাই ! সদা-প্রভুর একমাত্র পুত্র প্রভু-যীশু......আমাদের মত পাপীকে ত্রাণ করিবেন।

এই অসম্বদ্ধ কথা-গ্রন্থির মধ্যে দুইটি কথা রামের মনকে স্পর্শ করিয়া গেল; আমাদের মধ্যে ভেদ নাই, জাতি নাই......

সময় ছিল না রাম ধীরে ধীরে ভিড় কাটাইয়া অগ্রসর হইয়া গেল।

পঞ্চাননকে পড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে রামের মনে জাতি-তর্কের ঘূর্ণাবায়ু প্রবল ভাবেই ঘুরিতেছিল; এ সমস্যার কোন দিক দিয়াই একটা সমাধান আর আসে না; এদিকে আর সময় নাই—কাল সকালে একটা কিছু করিতেই হইবে!

সে আহার করিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল—যেন ঐ চিন্তাটা অসহ্য! কিন্তু ঘুম আসে না! যাদুমণির অনুরোধ সে কেমন করিয়া ঠেলিবে? সে যে বড়দিদির ভাই-এর বন্ধু!

বড়দিদি! রাম যেন একটা নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইল। বড়দিদির হাতে সে তো খাইয়াছে—তবে,—তবে?

রাম হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

(১৪)

যাদুমণির চায়ের টেবিলে রাম বহুতর তর্ক-যুক্তির মাল মশলায় মন দৃঢ় করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সেগুলি নিমেষে ভাঙ্গিয়া ধসিয়া খসিয়া পড়িল।

খোদাবক্সের বিপুল দাড়ি এবং মুখের তীব্র পেঁয়াজ রশুনের যাবনিক গন্ধ তাহার দেহমনকে যেন আন্তস্থ ঘোলাইয়া তুলিল।

চায়ের আনুষঙ্গিক যাহা কিছু সরাইয়া দিয়া রাম চা-টুকুই অতি ধীরে পান করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই যাদুমণি তাহা ধরিয়া ফেলিলেন, ওকি! আপনি শুধু চা খাচ্চেন?

রাম সবিনয়ে উত্তর দিল, সকালে চা ছাড়া আমার আর কিছু খাওয়ার অভ্যাস নেই,...সহ্য হবে না।

যাদুমণি বলিলেন, খেতে দোষ কি?

অরুণা পাশে খাইতেছিল, টিপ্পুনি ঝাড়িল, খাবার ত নয় ক্ষুধার অধীন!

যাদুমণি অরুণার দিকে একটা কটাক্ষ করিলেন; কিন্তু নবীনকিশোরের ঐ লাইনটি হঠাৎ কেমন ভাল লাগিয়া গেল, তিনি বলিলেন, বাঃ ভারি চমৎকার তো! কার লেখা অরু?

তাও জান না? যাদুমণি হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন।—তুমি বাংলার বৃহস্পতি!

নবীনকিশোর বলিলেন, বাঃ আমাদের সময় কি ও-সব ছাই ছিল?

তবে কি ছিল বাবা? অরুণা প্রশ্ন করিল।

নবীনকিশোর টাক মাথা নাড়িয়া বলিলেন ;

ভো নভোমণ্ডল বল স্বরূপ,
কে দিলে তোমারে এরূপ-রূপ ?

অরুণা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, ভো ভো কি বাবা ? একি সংস্কৃত ?

শরৎ কথা কহিল না বটে কিন্তু তাহার বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।

চায়ের টেবিলের কথা-বার্ত্তা সহজ গতিতে গঙ্গার জলের মতই বহিয়া চলিতেছিল। স্রোতের মুখে একটা বাঁশ পুতিয়া দিলে যেমন সমস্ত আবর্জ্জনা তাহারই গায়ে জমিয়া যায়—রামের ঠিক তেমনি অবস্থা ঘটিল। গা-ঝাড়া দিয়া নিজেকে নির্ম্মল রাখিবার কৌশল তাহার তখনো যেন শেখা হয় নাই।

পড়িবার ঘরে আসিয়া অরুণা বলিল, মাস্টার মশাই,—আপনাকে সুপুরি-মশলা এনে দি ? আপনার নিশ্চয় খুব গা-ঘিন্-ঘিন্ ক'রছে, না ?

রাম লজ্জা পাইল এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বে মুখ-শুদ্ধি মসলা আনিয়া অরুণা হাজির।

দু-একটা এলাচ-লবঙ্গ মুখে দেওয়ার পর, অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, এখন ভাল বোধ করছেন ? ঠিক বলিনি ?

রাম অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, তোমার এত বুদ্ধি তা' আগে জান্‌তুম না।

আগে আমিও জান্‌তুম না,—অরুণার গল্প করিবার উৎসাহ সকল সময়ে উৎকট ;—সেদিন আমার একজন বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রে,—তাকে—আমরা তো আর ও-সব জানিনে !—পেঁজ খেতে দিয়েছি, শেষকালে বেচারি বমি ক'রে মাৎ! জিজ্ঞেস্ ক'রে সব বুঝি···আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনাদের পেঁজ খেতে নেই কেন ?

রাম এইবার বিপদে পড়িল। সে অনেক এদিক ওদিক ভাবিয়া বলিল—তাতো ঠিক জানিনে অরুণা, আমাদের কখনো পেঁজ রান্না হয় না, বোধ হয় দুর্গন্ধ ব'লে...

ওমা! আপনি বলেন কি মাষ্টার মশাই, পেঁজ দুর্গন্ধ—তরকারিতে না দিলে তরকারির কি সোয়াদ হয় ?

রাম এইবার তাহাকে থামাইল ; আচ্ছা সে তর্ক পরে হবে, এবার কাজ সুরু কর, অরুণা।

অরুণার সমস্ত উৎসাহ নিমেষে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—সে প্রায় চুপি-চুপি বলিল, ওই তো আপনাদের দোষ!

কথা শুনিয়া রাম হাসিল, সে অরুণাকে চিনিয়াছিল, কাহাকে কি বলিতে হয়--অরুণা একটুও জানিত না।

অশান্ত মন লইয়া রাম শ্যামপুকুর হইতে ফিরিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এমনি করিয়া ধীরে ধীরেই মানুষ অধঃপতনের দিকে চলিতে থাকে। জাতি-বিচার না হয় মন্দ; কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের বিচার ত করিতেই হইবে। সে বিচার মানিনা বলিলে কাহারো চলিতে পারে না;—বিষ খাইলে মানুষ মরে—তাই বিষের বিচার সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালেই চলিয়া আসিতেছে! বিষ আর কে সাধ করিয়া খায়?

স্কুলে অবসর মত পণ্ডিত মহাশয়কে রাম ধরিল, পেঁয়াজ খাইতে কেন নিষেধ, পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত মহাশয়টি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বড় ভাল বাসিতেন, উৎসাহে তাঁহার টিকির-গুচ্ছটি প্রায় দাঁড়াইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, কেন? ওরতো সোজা উত্তর প'ড়ে র'য়েছে হে, শাস্ত্রে মানা আছে, পূর্ব্ব-পুরুষেরা মানা ক'রে গেছেন। এর চেয়ে বড় যুক্তি আর কি থাক্‌তে পারে?

রামের মন কিন্তু ইহাতেও তৃপ্ত হইল না, পণ্ডিত মহাশয় তাহা বুঝিলেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, বেশী দূর যেতে হবে না হে, রামচন্দ্র, ওর গন্ধর কথাটাই স্মরণ করনা; ওর যে একটা দুর্ব্বিষহ দুর্গন্ধ আছে সে তো আর কেউ অস্বীকার করবে না?

রাম উত্তরে বলিল, আমি কিন্তু অন্ততঃ একজনকে জানি যার সত্য বিশ্বাস যে পেঁয়াজের কোন দুর্গন্ধ নেই .....

পণ্ডিত মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, আঃ ওটা অতি অশুদ্ধ জিনিষ, বামুনের ছেলে হ'য়ে বারবার ওর নামটা মুখে নাই বা আন্‌লে।

রাম পণ্ডিত মহাশয়ের গোঁড়ামি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে বুঝিল, যে পণ্ডিত মহাশয় ঠিক কি কারণে যে হিন্দুর পেঁয়াজ খাইতে মানা, তাহা জানেন না।

বৃথা তর্ক করিবার তাহার কোন ইচ্ছা ছিল না; সেইখানেই প্রসঙ্গ বন্ধ করিল।

কিন্তু তাহা বন্ধ হইল না; পণ্ডিত মহাশয় নিজের বিদ্যা-প্রকাশ এবং তাঁহার শুদ্ধ-সাত্ত্বিক জীবনের পরিচয় দিবার এই স্বর্ণ সুযোগটি ছাড়িলেন না।

ঘণ্টা বাজিবার পর, হেড মাষ্টার আসিলেই, পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার নিকট প্রশ্নটী উত্থাপন করিলেন, বলুন তো, আপনার কি মনে হয়?

যুগ-ধর্ম্মের অনুকম্পায় শিক্ষিত বাঙ্গালী এবিষয়ে কোন একটা কথা বলিতেই পারে। হেড মাষ্টার বলিলেন, পেঁয়াজ তো একটা ছোট জিনিষ, ও নিয়ে তর্ক চলে না; আমি অনেক হিন্দুর বাড়িতে, অবাধে চ'লতে দেখেছি......

পণ্ডিত মহাশয় দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিলেন, বলেন কি ? আপনি ব'লচেন, কেমন ক'রে অবিশ্বাস করি ; কিন্তু আর কেউ হ'লে ? একি একটা বিশ্বাস-যোগ্য কথা !

উপস্থিত সকলে হাসিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয়ের দুই কর্ণ রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

হেড মাষ্টার হাসিতে হাসিতে বলিলেন, পৃথিবীর সকল জাত এক বাক্যে স্বীকার করে মুর্গির তুল্য আর মাংস হয় না। আমাদের পাঁঠা, ভেড়া, হাঁস, সব কিছু চলে; কিন্তু বেধে যায় গিয়ে ঐ মনু-নিষিদ্ধ পাখীটিতে, কেন ব'লতে পারেন ?

দুই কর্ণে হাত দিয়া পণ্ডিত মহাশয় সকল কথাই শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

হেড মাষ্টার বলিলেন, এদিকে আবার বন্য কুক্কুটে নেই দোষ—তাই আমাদের বামাচরণ, একবার বন-জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতো ...

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুঝেছেন পণ্ডিত মশাই ? একটা বৈজ্ঞানিক কারণ না দেখাতে পারলে আর আজ-কালকার ছেলেদের ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারা যাবে না... ...ভেবে চিন্তে আমি দুদিক দিয়ে এ নিষেধটা মেনে চলি ; কিন্তু সেটা আমার নিজের ব্যক্তিগত মতবাদ, আমি কারুর উপর চালাতে চাইনে——

রাম বলিল, সেটা কি আমরা শুন্‌তে পাইনে ?

হেড মাষ্টার মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন; পেঁয়াজ জিনিষটা গন্ধে এবং কাজে বড় উগ্র—তাই আমি ওটা ব্যবহার করিনে, আমি সহ্য করতে পারিনে তাই ; আর মুর্গি ? প্রথম, অতি নোংরা, ঘরে পুষলে বড় একটি বিশ্রী কাণ্ড হয় ; আর দ্বিতীয়, বোধকরি বড় গরম, আমাদের দেশের খাদ্য নয়।......

তবে আমার মনে হয় জীব হত্যা ক'রে খাবার মানুষের কোনই প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে প্রাণীবধ না ক'রেও মানুষ বেশ বেঁচে থাক্‌তে পারে। এই মতেই আমি......

ছুটির ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

রাম পথে চলিতে চলিতে সকল কথা আলোচনা করিয়া দেখিল ; কিন্তু কাহারো কোন কথায় তাহার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হয় না !

বাসায় ফিরিয়া নন্দর কাণ্ড দেখিয়া রাম অতিমাত্র বিস্মিত হইল, এবং ভয়ও পাইল। সে বিছানা বাক্স বাঁধিয়া বাড়িতে তার করিবার জন্য বাহির হইয়া গেছে।

চাকরকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাম এইটুকু উদ্ধার করিতে পারিল যে কর্ত্তাবাবুর অসুখ।

নিজের মন ভাল নাই, তাহার উপর এই সংবাদে সে ব্যাকুল হইয়া পথে বাহির

হইয়া পড়িল; কিন্তু আবার ফিরিয়া আসিল; যদি অন্যপথ দিয়া নন্দ পোষ্টাপিস হইতে ফিরিয়া আসে ?

রাম বাসার ফটকের উপর বসিয়া নন্দর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। সম্মুখে ময়রার দোকানে রস ফুটিতেছে, তাহার পাশে সরু গলিটার মধ্যে বিরাট ছাপাখানায় হুহু শব্দে কাজ চলিয়াছে।

এই শব্দ-কোলাহলের মধ্য হইতে তাহার মনটি কখন কোন্ পথ দিয়া তাহাদের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে! নন্দর সহিত তাহার বাড়ী যাইবার সহজ ইচ্ছাটিকে সে দুই হাত দিয়া নিবারণ করিতেছিল।

তাহার উপর আর এক দুশ্চিন্তা, নন্দ চলিয়া গেলে সন্ধ্যায় কাহাকে পড়াইবে ? পঞ্চাননকে বুঝি বা ছাড়িয়া দিতেই হয়!

কোথা হইতে নন্দ কখন আসিয়া রামের চোখ টিপিয়া ধরিল।

রাম অনেকখানি স্বস্তি বোধ করিল, নন্দর পিতার কোন গুরুতর অসুখ হইলে সে কিছুতেই তার চোখ চাপিয়া ধরিত না।

নন্দ কমলিনীর চিঠিখানি রামের হাতে দিয়া বলিল, দেখ্ না প'ড়ে, তেমন কিছু ভয়ের নয়।

রাম চিঠি শেষ করিয়া বলিল, তবে এত তাড়াহুড়ো ?

বাবা খুসী হবেন না ? আর আমায় তো চিনিস্ ? যেতেই যখন হবে তো দেরী ক'রে কি লাভ ? তাই মনে ক'রলাম—আজই চ'লে যাই,······একটা তার ক'রে দিলাম; ইষ্টিশানে গাড়ী পাঠিয়ে দিতে।

নন্দর কথাগুলি রাম গম্ভীর হইয়া শুনিল বটে, কিন্তু আগাগোড়া বিশ্বাস করিল না। তাহার মনে হইল এইরূপ অধীরতার অন্য কোন কারণ আছে।

রামকে নির্ব্বাক দেখিয়া নন্দ বলিল, তোর নিশ্চয় যাবার ইচ্ছে হচ্চে, না রাম ?

রাম কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতে বসিয়া গেল।

দুই বন্ধুতে ইষ্টিশান যাইবার পথে কথা হইল, নন্দ বলিল, বাবাকে আমি একবার চিকিৎসার জন্যে কলকাতা নিয়ে আসার চেষ্টা ক'রবো; কিন্তু জানিনে তিনি আস্‌বেন কিনা। এলে এ বাড়িতে কুলিয়ে যাবে না? ওঁদের উপরটা ছেড়ে দিয়ে আমরা দুজনে নীচের ঘরে দিন কতকের জন্যে চ'লে যাব, কি বলিস্ ?

রাম বলিল, না হয় আমি একটা মেস দেখে নেব, বড়দিদিও তো আস্‌বেন ?

নন্দ বলিল, তা যদি হয় তো একটা বড় বাড়ি নিতে হবে, সে তো পরের কথা; কিন্তু আর এক কথা তুই কি করবি বল্‌তো ? পঞ্চাননকে ছেড়ে দে;—এখন বিকেলে তোকে শ্যামপুকুরেই যেতে হবে।

রাম ভাবিতে লাগিল, বলিল, তাইতো, তাই ভাবচি, ওদের একটা লোক জোগাড় করে দেব এখন......

কাদের ? নন্দ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল।

রাম নন্দর অধৈর্য্য দেখিয়া হাসিল, পঞ্চাননদের ; তারপর তুমি ফিরে এলে যেমন চ'লছিল তেমনই চ'লবে।

মাথা নাড়িয়া নন্দ বলিল, না, না, তা চ'লবে না। বাবার সাম্‌নে তা চ'লবে না রাম, তোকেই এখন ওটা চালাতে হবে—দে তুই ছেড়ে তোর গজাননকে......

দুই জনেই হাসিল।

নন্দ বলিল, তোকে আর একটা কথা বলি, সন্ধ্যের সময় ওখেনে আমি তো রোজই চা-জলখাবার খেতুম ; কিন্তু তুই কি ক'রবি ?

রামের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

নন্দ বলিল, উনি, ঐ অরুণার মা, কিছু না খেলে মনে মনে ভারি আহত হন ; তাই ভাবচি ; তোকে নিয়ে আবার ভারি মুস্কিল কিনা !

রাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ সকালে উপরোধ এড়াতে না পেরে —আমি এক কাপ্ চা খেয়েছি।

নন্দ রামের পিঠ ঠুকিয়া দিয়া বলিল, এইতো চাই, জাত জিনিষটা মানুষের তৈরি একটা ক্ষণিকের, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জিনিষ ভাই, তা তুমি যাই বল ; ওতে মানুষের আত্মা ক্ষুব্ধ হয়, অন্যের আত্মাকে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে।

রাম স্তব্ধ হইয়া রহিল।

গাড়ি ছাড়িবার শেষ ঘণ্টা পড়িতে নন্দ রামের হাতখানা টানিয়া লইয়া বলিল, একলা রইলি, খুব সাবধানে থাকিস্......

রাম বলিল, গিয়েই চিঠি দিও......

দুই জনের চোখই অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

হাসি

তোমার মুখের হাসিগুলি—মূল্য তাহার কী যে
প্রিয়ে, তুমিই জানো না যে নিজে।
ওরা যে মোর প্রেম-সাগরের তরঙ্গিত ফেনা,
রূপের তটে খেলে বেড়ায়—চিরকালের চেনা।
জন্ম পারের দিগন্তে যে ওদের ছিল বাসা,
দুঃখ-সুখের জোয়ার-ভাঁটায় করছে যাওয়া-আসা।
তাই এ জীবন ছেয়ে
কোন্ সুদূরের স্বর্গখানি হঠাৎ আসে ধেয়ে।

ওই যে হাসি—ওরা যে মোর স্বপ্ন লোকের খুসি,
অন্ধরাতে যায় আমারে তুষি'।
শেষ-না-করা কোন্ সে মালার ছিন্ন বকুলগুলি—
গন্ধে ওরা ভরেছে মোর এই জীবনের ধূলি।
আর জনমের বলাকা কোন্ এই জনমের মেঘে
মানস-সরের পথ পেয়েছে মুক্তি-চপল বেগে।
তাই এ জীবন ছেয়ে
কোন্ বিরহের মিলন-বাণী হঠাৎ আসে ধেয়ে।

তোমার হাসি, আমার হাসি—একটি রূপের ছায়া,—
দুইটি কূলে একটি স্রোতের মায়া!
যে গান আমি ধরেছিলাম বেদন-ভরা সাঁঝে
সমে এসে লেগেছে আজ তোমার হাসি মাঝে।
আমার চোখে ভেসেছিল যে সুন্দরের ছবি
তোমার রূপের বিভাতে আজ প্রকাশ হলো সবি।
তাই এ জীবন ছেয়ে
কোন্ অরূপের আভাস-খানি হঠাৎ আসে ধেয়ে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নৈতিক নিয়ম ও সুখদুঃখ

অনেকেই কিন্তু জীবনের শেষ লক্ষ্যের কোনও সন্ধান না পাইয়া বলিয়া থাকেন যে, তাহা হইলে আর উচিত অনুচিতের নিয়ম মানিয়া নৈতিক মঙ্গল অমঙ্গলের কথা ভাবিয়া কোনও লাভও নাই, প্রয়োজনও নাই। যখন জানাই নাই, এই জীবনের অন্ত কোথায় ও কিসে, তখন বৃথা কাজ কি ওই নীতিশাস্ত্রের অনুশাসনে নানা দুঃখের বোঝা কাঁধে বহিয়া! নীতিশাস্ত্রের নিয়মগুলি মানিয়া চলা প্রয়োজন কি না এবং কেন প্রয়োজন, ইহা লইয়া বহু আলোচনা, বহু বাদবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে ও হইতেছে; বিশেষতঃ এই কেন লইয়া। আমাদের ভারতীয় সংস্কারাপন্ন চিত্তে এই কেন প্রশ্নটি তেমন গুরুতর সমস্যার বেশে দাঁড়ায় না। তাহার কারণ আমাদের মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এই একটি বিশ্বাস প্রবলভাবে জাগিয়া আছে যে ধর্ম্মই চিরজয়ী, সর্ব্বত্রই তাহার জয় অব্যাহত এবং সেইজন্য এই নৈতিক নিয়ম পালনেই সুখ এবং লঙ্ঘনেই দুঃখ অনিবার্য্য। আমাদের বিশ্বাসটি এত প্রবল যে যদি কোন হতভাগ্য নির্দ্দোষ হইয়াও কষ্ট পাইতে থাকে, তবে ধর্ম্মের জয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা তাহার পূর্ব্বজন্মের কোন না কোন পাপ বাহির করিতে সক্ষম হই এবং এই জন্মের দুঃখকে ওই জন্মের সমুচিত প্রতিফল বলিয়া বুঝিতে পারি ও নৈতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয় নিত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। মেটারলিঙ্ক কিন্তু দুঃখমাত্রকেই পাপের মূল্য বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। আমরাও যদি মনের ওই বদ্ধমূল বিশ্বাসটাকে একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে যাই, হয়ত ধর্ম্মের এই অব্যাহত জয় দেখিয়া প্রফুল্ল নাও হইতে পারি। সত্য কথাটা এই যে যিনি বিশ্বনিয়ন্তা তিনি কোনও ভালমন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণের নিয়ম বাঁধিয়া এই বিশ্বচালনা করিতেছেন কি না এবং কখনও করিবেন কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায়টা কি তাহা অবগত হওয়া যায় নাই বলিয়া মানবচিত্তে যথেষ্ট সংশয় রহিয়াছে। নৈতিক উন্নতি মানেই সুখ আর অবনতি মানেই দুঃখ—এই যে ভাগাভাগি ব্যবস্থা, ইহাকে বহুকাল হইতে সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া আসা হইয়াছে কিন্তু আর যেন ওই বিশ্বাসটি লইয়া চলিতেছে না। অন্ততঃ পূর্ব্বজন্মে অবিশ্বাসী ইউরোপ, ভাল করিলেই সুখ আর মন্দ করিলেই দুঃখ একথা আর নিঃসংশয়ে মানিতে পারিতেছে না।

বিশ্বনিয়ন্তাকে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া অর্থাৎ তিনি আমাদের নীতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা সতর্কতার সহিত বাঁচাইয়া চলেন বলিয়া তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা করি সন্দেহ নাই; যমকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হওয়ার কোনও কারণ নাই সত্য, তবে আজ হঠাৎ মনে পড়িতেছে যে যম তাঁহার ন্যায়ের দণ্ড লইয়া মৃত্যুতমসার পরপারে পরলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন

আছে-কি-নাই পুরীতেই বাস করিতেছেন। এই জগতের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসার ভার যমরাজের আদালতের জন্য মুলতুবি না রাখিয়া তাই মানব বিশ্ববিধানের মধ্যেই নিয়মের সন্ধান করিতেছে। যত কিছু অত্যাচার ও অবিচারের সূক্ষ্ম ও সুসঙ্গত মীমাংসা ভবিষ্যতের কোনও প্রচ্ছন্ন দিবসে করিবেনই বলিয়া আপাততঃ কেহই চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

মানবীয় নীতিবোধ ও বিশ্বপ্রকৃতি

মেটারলিঙ্ক বলিতেছেন যে, যতদূর দেখা যায়, বাহিরের এই সুবিশাল জগদ্ব্যাপারের মধ্য দিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অন্তরের ভালমন্দ বোধ বা নৈতিক বোধ (Conscience) প্রকাশ পাইতেছে এই কথা বলিবার সুসঙ্গত কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ন্যায় অন্যায়ের আইন মানিয়া মহাপাতকীর মাথায় যেমন বজ্র নামিয়া আসে না, তেমনি আবার সাধুমহাত্মার পবিত্র দেহমন্দিরও বাঁচাইয়া চলে না। এই বিশ্বজগতে যে নিয়ম অব্যাহত তাহা হইতেছে প্রকৃতিরাণীর অনুশাসন বা ন্যায় (Logic of nature), এই বিশ্ববিধান আমাদের নীতিশাস্ত্রকে কণামাত্রও গ্রাহ্য করিয়া চলে না। কাহাকেও রক্ষা করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িলে অগ্নিদেব যে আশীর্ব্বাদ করেন তাহাতে ভব-বন্ধন মোচন হইলেও চিত্তে কোন ভক্তি-বিহ্বল আনন্দের সঞ্চার হয় না। আমাদের বিচারপ্রণালী ও বিশ্বশক্তির বিচারপ্রণালী—এই দুয়ের মাঝে কোন মিল, কোন সামঞ্জস্যের খাতির নাই, বরং যথেষ্ট বিভিন্নতাই দেখা যায়। আমাদের অন্তরে এমন একটি ভাব বা বোধ আছে যাহা দিয়া মানুষের উদ্দেশ্য ও আশয়ের বিচার করিয়া থাকি। কোনও একটা কাজ করিতে গিয়া কোন ক্ষতি হইলেই আমরা সরাসরি শাস্তির বিধান করিতে পারি না। তাহার মূলগত অভিপ্রায়টি দেখিয়া তবে আমরা তাহার মূল্য নির্দ্দেশ করি; কিন্তু বিশ্ব-শক্তির এত খতাইয়া দেখিবার অবসর ও ইচ্ছা কিছুই বোধহয় নাই; সে মোটামুটি বাহিরের কর্ম্মটার বিচার করে মাত্র। আমরা অবশ্য মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে বিশ্বশক্তি ও অন্তর্নিহিত নৈতিক বোধ এই দুইটি পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিয়াছে, একটি অপরটির পরামর্শ লইয়াই অগ্রসর হইয়া থাকে। আমরা ক্রমাগতই বাহিরের নীতিবোধ-হীন প্রকৃতির (amoral world) নিয়মের অন্তরালে ন্যায়বোধ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছি। জার্ম্মাণ দার্শনিক নীট্শের (Nietzsche) ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে নৈতিক বস্তু বলিয়া বিশ্বে বাস্তবিক কিছুই নাই; বিশ্ববস্তুর একটা মনগড়া নৈতিক মূল্য মাত্র আমরা স্থির করিয়া লই; এইখানেই আমাদের বেশীর ভাগ ভুলের মূল নিহিত রহিয়াছে।*

* 'There are no moral phenomena, there is merely a moral interpretation of phenomena'—**Nietzsche.**

Cf. Buried Temple (Mystic Justice. Sec. 9).

কথা কয়টিকে দৃষ্টান্ত লইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। মনে করা যাক্ হঠাৎ বাড়ি চাপা পড়িয়া হিতৈষিণী সভার কার্য্য চিরতরেই মুলতুবি রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই ঘটনাকে যদি নৈতিক বিচারের কাঠগড়ায় আনিয়া দাঁড় করান যায়, তবে প্রথম প্রশ্ন হইবে, কি জন্য এই হিতৈষী সভ্যেরা এই ভাবে অপমৃত্যুর পথে পতিত হইলেন? বিশ্ববিধানের মূলে কোনও নৈতিক শৃঙ্খলাকে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে ইহার উত্তর হইবে এই যে, এই হিতৈষিণী সভার সভ্যগণ যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতেছিলেন তাহা হইতেছে সভার টাকার ফণ্ডটিকে নিজেদের ক্যাসবন্ধ করা, নতুবা বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বজন্মে কোন প্রকাণ্ড ডাকাত দলের ইঁহারা ছিলেন সর্দ্দার; এই জন্মে ইঁহারা হিতৈষিণী সভার নামের খোলস পরিয়া তাহার অন্তরালে আপনাদের প্রচ্ছন্ন রাখার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বিশ্বশক্তি বা অদৃষ্টের অব্যর্থ দৃষ্টি বাড়ী চাপা দিয়া এই সাতজন ফেরারকে গ্রেপ্তার করিয়া বসিল; পাপের ফল ফলিবেই, এই জন্মে না হোক্, জন্মান্তরে! মেটারলিঙ্ক বলেন এই ভাবের নৈতিক বিচার ভুল। বিশ্বশক্তি তোমার পাপপুণ্যের, ন্যায়অন্যায়ের কোন হিসাব রাখে না। কতকগুলি নৈতিক নিয়ম নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের ফলে বাড়ী পড়িল লোকগুলিও চাপা পড়িয়া মরিল, এই মাত্র। এই সব নিয়মনিয়ন্ত্রিত ঘটনার সহিত ন্যায়-বোধের যোগাযোগ বা সহানুভূতি নাই। প্রাকৃতিক নিয়ম পাপীর প্রাসাদে যে অক্লান্ত গতিতে কাজ করিতেছে, পুণ্যবানের পর্ণকুটীরেও সেই ভাবেই কাজ করিতেছে। প্রাকৃতিক নিয়ম নীতির গণ্ডীর বাহিরে। অবশ্য মেটারলিঙ্ক ইহাও দেখাইতে ভুলেন নাই যে, এমন অনেকগুলি ব্যাপার আছে যা প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভুলভ্রান্তিরই প্রত্যক্ষ ফল, যাহা বাস্তবিক নৈতিক বিচারালয়ের বিচার্য্য বিষয়, অথচ যাহাকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের অনিবার্য্য অভ্রান্ত পরিণাম বলিয়াই ধরিয়া লই। এই যে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবস্থাগত দুঃখদুর্দ্দশারাশি জগতের ত্রি-চতুর্থাংশ মানবকে আজ নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত করিয়া ধ্বংস করিতে চাহিতেছে, ইহা কি অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল মাত্র? ইহা সত্য হইতে পারে যে, অন্ধপুত্রের জন্য ভগবান্ই দায়ী, কিন্তু দরিদ্র পুত্রের জন্যও কি ভগবান্কে দায়ী করিতে হইবে?

মানবীয় নীতিবোধের প্রয়োজন

সে যাই হোক, এখন বিশ্বপ্রকৃতি যদি প্রাকৃতিক নিয়মকেই অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকে, তাহার সহিত নীতিবোধের যদি কোনও যোগাযোগই না থাকে, তবে আমাদেরই বা এত ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া চলার প্রয়োজন কি, এই বলিয়া কেহ কেহ নীতিশাস্ত্রকে চাপিয়া ধরিতে পারেন। কিন্তু মেটারলিঙ্ক বলেন, বিশ্বশক্তি ন্যায়বোধ ও নীতিবোধহীন হইলই বা! তা বলিয়া ন্যায় অন্যায় নাই বা থাকিবে না, একথা কেমন করিয়া মানা যায়? প্রকৃতি আপনার জগতে আপনার নিয়ম শাসন অব্যাহত রাখিয়া চলে সত্য, কিন্তু মানুষ যে জগৎটায় বাস করিতেছে উহাতে

কেবল প্রকৃতির জগৎ নয়, তাহার অনেকটাই মানুষের নিজস্ব ধারণার সৃষ্টি! 'আমার জগৎ'টার স্রষ্টা যে প্রকৃতি নয়, 'আমি'। মানুষ তাহার জগৎকে এইজন্যই প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী করিয়া চালনা করিতে বাধ্য নয়, সে তাহার অন্তরের নিয়ম দিয়া কেনই বা তাহাকে নিয়ন্ত্রিত না করিবে? বিশ্বের আর কোথাও নীতিবোধ থাক বা না থাক, মানব অন্তরের গুপ্তকক্ষে থাকিয়া যুগ যুগ ধরিয়া যে রহস্যনিগূঢ় নীতিবোধ আপনার আলোকে মানবকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে তাহাকেই বা অস্বীকার করা যায় কেমন করিয়া?

এইজন্য অদৃষ্ট প্রাকৃতিক শক্তি কোনও নৈতিক নিয়ম মানিয়া না চলিলেও মানবজীবন তাহাতে নৈতিক ভিত্তিহীন হইয়া যায় না। কারণ নীতিধর্ম্মের ভিত্তি বাহিরে কোথাও নয়, অন্তরের সহজ নীতিবোধে। মেটারলিঙ্ক বলেন, অদৃষ্টশক্তিকে তাহার সত্যকার নীতিনিরপেক্ষ-রূপে দেখাই ভাল; তাহাতে লাভ এই যে মানুষ যে সৎকর্ম্ম করিবে তাহাতে সুখাসক্তির গন্ধ থাকিবে না, কারণ সৎকর্ম্ম বা নৈতিক কর্ম্ম করিলেই যে তাহা সাংসারিক সুখের কারণ হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং বহু সময় তাহার বিপরীত সম্ভাবনাই দেখা যায়। 'ন্যায়ের পুরস্কার আপনার অন্তরেই পাইতে হইবে, কারণ (বাহিরের) মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি একটুও বিচলিত হইবে না।' অদৃষ্টশক্তি তাহার খেয়ালমত যা-খুসী করিয়া যাইতে পারে কিন্তু সৎকর্ম্মের যে গৌরব ও আনন্দ তাহাই হইতেছে নীতিধর্ম্ম পালনের একমাত্র পুরস্কার। 'যাহারা ভাল কাহাকে বলে জানে না, তাহারাই কেবল 'ভাল'র মজুরীর জন্য চেঁচাইয়া মরে।' মোট কথা, মানব অন্তরের ন্যায়বোধ অদৃষ্টকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আপনার আলোকে পথ দেখিয়া চলে। বাহ্যজগতের পুরস্কারের প্রেরণা তাহার প্রয়োজন হয় না।

অদৃষ্টজয়

বাহ্যিক সুখদুঃখ দিয়া মাপিয়া দেখিতে গেলে মানবীয় নীতিবোধের প্রকৃত অর্থ পাওয়া যাইবে না, এমন কি ইহাই মনে হইবে যে, পদে পদেই এই নীতিবোধেরই পরাজয় হইতেছে। কিন্তু বাহ্যিক পরাজয়ে মানবচিত্তের সত্যকার পরাজয় হয় না। যখন বাহ্যিক একটা মস্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কোন মানব অন্তরের ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন ন্যায়পথের পথিক অন্তরে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, বাহিরের শত অবসাদ এবং বিঘ্নও আনন্দের সেই ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করিতে পারে না। এইখানেই মানব বাস্তবিক অদৃষ্টজয়ী।

নীতিবিবর্ত্তনবাদীর কথা

নীতিবিবর্ত্তনবাদীরা (Evolutionary Moralists) কিন্তু আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত অন্তরের এই সহজ নীতিবোধকে অসম্মান করিয়া তাহাকে একটা ভ্রান্ত সংস্কারের ফল মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। তাঁহারা বলেন, এই যে মানবের মধ্যে নৈতিক বোধ দেখা যায়, ইহা

ভ্রান্ত, অর্থাৎ নৈতিক বুদ্ধি মানুষকে যে পথ দেখায় সে পথে চলিলে প্রকৃত লাভ কিছুই নাই। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী চলিতে গেলে অনেক স্থলেই সহজ নৈতিক বোধের বিরোধী হইতে হইবে তবু ইঁহাদের মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্ত্তী জীবনই নৈতিক জীবন। যেমন মনে করুন, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনই প্রকৃতির নিয়ম দেখা যাইতেছে। এতটুকু অক্ষমতা ও অশক্তি লইয়াও এই জীবনসংগ্রামে টিঁকিয়া থাকার সম্ভাবনা নাই ; হিংস্রা প্রকৃতির (Nature red in tooth and claw) নিয়ম এমনই কঠোর। এই নিয়মকে পালন করিতে হইলে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার চেষ্টা, শক্তির একটা অপব্যয় ও অধর্ম্ম বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে; কারণ প্রকৃতি স্বয়ং যে দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিতে একটুও দ্বিধা করেন না, সেখানে আমাদের দ্বিধা করা ত একটা দৌর্ব্বল্য মাত্র। প্রকৃতির রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখিলে কোথাও দেখা যায় না যে কোনওরূপে অশক্ত জীব অন্যের সহায়তায় রক্ষা পাইতেছে। কিন্তু মানবীয় নীতিবোধ ক্রমাগতই দুর্ব্বলকে দুই বাহু দিয়া ঘিরিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা করে! রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, অনাথ ভাণ্ডার, সেবা সমিতি, Social Service League এই সমস্তই হইতেছে নীতিবিবর্ত্তনবাদিগণের মতে একেবারে জলজ্যান্ত পাপ। তাঁহারা বলিবেন, এই পাপের ফলে মানবের শক্তির একটা মূল্যবান্ অংশ ব্যর্থ ব্যয়িত হইতেছে এবং তাহাতে মানবসমাজের যেদিকে প্রকৃতি শক্তিপ্রয়োগ প্রয়োজন সেই দিকটা ততটা শক্তি না পাইয়া ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং মানবজাতির উন্নতি সেই পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে; অর্থাৎ দুর্ব্বল ভুখীরামকে যে দুমুষ্টি তণ্ডুল দেওয়া গেল, তাহা হইতে অপর দিক দিয়া কোন না কোন রামমূর্ত্তি বা স্যাণ্ডো বঞ্চিত হইয়া কিছু না কিছু দুর্ব্বল নিশ্চয়ই হইল; সুতরাং এই ভাবে দুর্ব্বলের—তথাকথিত নরনারায়ণের সেবা দুইমুখো পাপ হইয়া দাঁড়ায়; এক, দুর্ব্বলের মত অনাবশ্যক জীবকে রাখিবার চেষ্টা; দুই, সবলকে বঞ্চিত করা। প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতেছে, যেমন করিয়াই হোক প্রাণপ্রবাহকে গতি দিয়া বাড়াইয়া তোলাই ধর্ম্ম, আর মানবের ক্ষুদ্র অন্তর বলিতেছে প্রাণকে রক্ষা করার চেয়ে উচ্চতর লক্ষ্য আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, তাহা হইলে প্রাকৃতিক ন্যায়ই কি শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়? নীট্‌শের চেলা হইলেই কি বিশ্বমানবের কল্যাণ আর তদভাবে কি নান্যঃ পন্থা?

মেটারলিঙ্কের উত্তর

মেটারলিঙ্ক বলেন যে, প্রকৃতির কার্য্যাবলীর বিচার করিয়া হয়ত তাহা হইতে আমাদের অন্তরের অনুযায়ী নৈতিক লক্ষ্য আবিষ্কার না-ও করিতে পারি, কিন্তু তা-বলিয়া একথা কেমন করিয়া বলিব যে প্রকৃতির মূলে কোন নৈতিক আকাঙ্ক্ষা, কোন কল্যাণস্পৃহাই নাই। কেহ নৈতিক কিম্বা তদ্বিপরীত তাহার বিচার সেই ব্যক্তির লক্ষ্য দিয়াই করিতে হয়। লক্ষ্যের পার্থক্য বশতঃ একই কর্ম্ম ভাল কিম্বা মন্দ হইতে পারে। বিষ খাওয়াটা যে পাপ তাহা

নহে, ঘটনাক্রমে উহা পাপ হইয়া দাঁড়ায়। অহিফেন বলিয়া যে একটি অপূর্ব্ব বস্তু আছে, সেটির গুণ ডাক্তার জানেন একরকম করিয়া, আর অহিফেনসেবী জানেন আর একরকম করিয়া আর আত্মঘাতী জানে আর একরকম সাঙ্ঘাতিকভাবের মধ্য দিয়া। তাই বলিতেছিলাম যে উদ্দেশ্য না জানিয়া কোন কর্ম্ম, কোন নিয়মের বিচারই চলিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য অজ্ঞাত; সে যে কোন্ উদ্দেশ্যে কোথায় চলিয়াছে তাহা কে জানে! যতক্ষণ তাহার চরম লক্ষ্য আমাদের নিকট ধরা না পড়িয়াছে ততক্ষণ প্রকৃতির বিচার করাই অসম্ভব এবং তাহার কোন নিয়মের অনুকরণ করাও অসঙ্গত। ইহা সত্য যে প্রকৃতির কর্ম্মপ্রণালী মানবীয় কর্ম্মপ্রণালী হইতে ভিন্ন। তাহার কর্ম্মক্ষেত্র অনন্ত দেশব্যাপ্ত, তাহার কর্ম্মপ্রবাহ অনন্তকালের বিস্তীর্ণতার মধ্য দিয়া কোন্ অজ্ঞাত নিগূঢ় পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার কর্ম্মের ভালমন্দ বিচার আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের স্বল্পপরিসর মাপকাঠি দিয়া করিতে যাওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ প্রকৃতির কর্ম্মপ্রণালীর আলোচনা করিলে এই কথাটিই সত্য বলিয়া মনে হইতে থাকে যে মানুষ যেমন অসম্পূর্ণ জ্ঞান লইয়া এই বিশ্বের পথ দিয়া ভুলভ্রান্তির মাঝ দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে চলিতেছে, প্রকৃতিও তেমনি তাহার অসীম পথে তেমনি নানা ভুলভ্রান্তির মাঝ দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে করিতে চলিয়াছে। বরং দেখা যাইতেছে প্রকৃতির চিন্তা করিবার শক্তির চেয়ে মানুষের মাঝে সেই শক্তির প্রকাশ বেশী রহিয়াছে। প্রকৃতি তাহার এক একটি ভ্রান্ত পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে শত শত বৎসরের সময় লাগাইয়া দেয়। এই সব কারণে প্রকৃতির ধারা দেখিয়া মানবীয় নীতিশাস্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে যাওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।*

কর্ম্মের উদ্দিষ্ট ফল দিয়াই কর্ম্মের বিচার করিতে হয়। প্রকৃতির কোনও একটি কর্ম্ম শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপ্ত হইতে পারে; সুতরাং শত বৎসর যাহাকে দেখিয়া অন্যায় বলিতেছি, শতবর্ষ পরে তাহা যে কোন সুবৃহৎ কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবে না তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না। এইজন্য প্রকৃতির মাপকাঠি দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের বিচার চলে না। প্রকৃতির মাপকাঠি বৃহৎ। আমাদের জীবনের অনুপাতে বিচারের মাপকাঠিও ক্ষুদ্র হইবেই।† মেটারলিঙ্ক বলেন প্রকৃতির লক্ষ্য জাতির উপর, ব্যক্তির দিকে চাহিবার ও তাহাকে লইয়া খুঁটিনাটি করিবার মত অবসর প্রকৃতির নাই। টেনিসনও বলিয়াছেন 'জাতির জন্য প্রকৃতি এত সতর্ক, কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের দিকে প্রকৃতি এমনই দৃষ্টিহীন।'‡ সুতরাং প্রকৃতির অনিশ্চিত

* *Cf.* Wrack of the storm (Will of the Earth).
Life & Flowers (The Intelligence of Flowers) p 290. sec. 27.

† Buried Temple (Mystery of Justice, Sec. 22).

‡ 'So careful of the type she seems
So careless of the single life !

নিয়ম দিয়া আমাদের ব্যক্তিজীবনকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। ব্যক্তি-জীবনের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে হইলে অন্তরের নৈতিক বোধেরই আশ্রয় লইতে হইবে ; অতএব যাহাতে এই নীতিবোধ প্রেম ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরিস্ফুট ও পরিশুদ্ধ করা যায় তাহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। যাঁহার অন্তর প্রেমে বলীয়ান, জ্ঞানে গম্ভীর, তিনিই বাহ্যজগতের শত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াও জীবনের গৌরব ও আনন্দকে প্রচার করিতে সক্ষম হন।

এই মানবীয় নীতিবোধকেই কেন মানিতে হইবে যুক্তির দ্বারা তাহার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে অন্তরে ইহার প্রবল প্রেরণা অনুভূত হয় এবং ইহাকে অস্বীকার করিতে গেলে দিগ্‌ভ্রান্ত হইতে হয় ; চিত্তের ধৈর্য্য ও শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। আর মেটারলিঙ্ক এই কথাটি খুব ভাল করিয়াই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে বিশ্বশক্তির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ এই মানবজীবনেই হইয়াছে ; বিশ্বসৃষ্টির মাঝে প্রাণধারার উচ্চতম প্রকাশ হইয়াছে এই মানুষের মাঝে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলেও মানবীয় নীতিবোধকেই বিশ্বপ্রাণের শ্রেষ্ঠতম নীতিবোধ বলিয়া মনে করিতে হয়। ইহা ছাড়া মানবীয় নীতিবোধের স্বপক্ষে মেটারলিঙ্ক আর কোনও যৌক্তিকতা দেখাইতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে মেটারলিঙ্কের শেষ কথা এই যে, ইহা রহস্যসমাচ্ছন্ন ; এই রহস্যকে অপসারিত করা অসম্ভব।

রহস্যের অশেষ নবীনতা

এই রহস্য বস্তুটিকে সকলের শেষে স্বীকার করিতেই হইবে ; কিন্তু তাহাতে এমন বলা চলে না যে আজ যাহা মানবজ্ঞানে রহস্যময়, কালও তাহা তেমনি গোপন থাকিয়া যাইবে। রহস্যলোকের সীমারেখাটি সতত পরিবর্ত্তনশীল। মানুষ আপনার ভাবনা ও অনুভব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রহস্যকেও নব নব ভাবে ও রূপে অনুভব করিয়া থাকে। এই যুগের মানব যাহাকে জীবনের চরম ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেছে, পর-যুগের মানব তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে না একথা বলা যায় না। নব নব আবিষ্কারই মানবজীবনের সজীবতা প্রমাণ করে ; কিন্তু যত দূরই আমরা অগ্রসর হই না, অনন্ত রহস্য-লোক চিরকালই মানবজ্ঞানের দিক্‌চক্রবাল ঘিরিয়া মানবকে নিরুদ্দেশযাত্রার পথে আহ্বান করিতে থাকিবে।

মেটারলিঙ্ক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে এই রহস্যবোধকে নষ্ট করিয়া ফেলা মানব-চিন্তার সাধ্যাতীত। যাঁহারা তেমন ভাবেন না, তাঁহারা বলিবেন যে বিস্ময়ের যুগ আদিম মানবের অপরিণত জীবন-মনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এই অনন্ত জগতের অপার রহস্যকে এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি কেমন করিয়া নিঃশেষ করিবে ? কয়টা গণিত ও বিজ্ঞানের সূত্রে কি জগতের অপার রহস্য সমাধান করা সম্ভব ? এই দৃষ্টি যতই দুরাভিসারী হোক,

ইহাকে ঘিরিয়া নিত্যকাল অজানার বিস্ময়কর অস্তিত্ব আপনাকে প্রচার করিতে থাকিবে। মাঝে মাঝে মানব আপনার অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে উৎফুল্ল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে বটে যে তাহার অজানা আর কিছুই রহিল না, বিশ্বজগৎ তাহার জ্ঞানের নিকট পরাস্ত ও অবনত হইয়াছে, কিন্তু সেটা তাহার মুহূর্ত্তের গৌরব; অচিরেই তাহাকে বলিতে হয় যে এই সোনার মৃগ ধরা দিয়াও দেয় না, 'সে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, যায় না তারে বাঁধা'। যুগে যুগে যতই মানবজ্ঞান পরিণতির পথে অগ্রসর হোক, সে যে আপনাকে কখনও শেষ মুহূর্ত্তের চরম ঔজ্জ্বল্যে আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিবে এমন মনে হয় না; তাহার এক চোখে হাসি, অপর চোখে অশ্রু লাগিয়াই থাকিবে। যতই দেখা যাইবে, বলিতে হইবে, গভীর, গভীর, আরো গভীর!

এক সময় যে পরমাশ্চর্য্যকে বহির্জ্জগতের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্বত্র সঞ্চরমান বলিয়া জানা গিয়াছিল আজ মনে হইতেছে সেই অপরূপ নীলাকাশে নক্ষত্রলোকেও নাই, কোন অদৃশ্য দেবলোকের মধ্যেও না, যেন সেই পরম অদ্ভুত রহস্য মানবহৃদয়ের গহন গোপনেই থাকিয়া চিরকাল এই কৌতুক করিয়া আসিয়াছে! এই যে বিশ্বের সর্ব্বত্র এক অপরূপ লীলা দেখিতেছি ইহার সত্য অর্থ আমরা পাই নাই। কেহ বলিতেছি বিশ্বশক্তি নীতিমূলা, বিশ্ববিধান তাই ন্যায়ের সিংহাসন অটল রাখিতে সচেষ্ট; কেহ বলিতেছি দেবতারা ন্যায়-পরায়ণ; তাঁহারা তাঁহাদের অদৃশ্য প্রভাবের দ্বারা ন্যায়কেই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে লইয়া চলিয়াছেন, আবার কেহ বলিতেছি—এবং সেই সঙ্গে মেটারলিঙ্কও বলিতেছেন—এই ন্যায়বোধ ও নীতিবোধের আসন আর কোথাও নয়, ইহার আবাসভূমি এই মানবহৃদয়। অন্তরে আছে বলিয়াই মানব কেবলই এই জগৎটাকে নৈতিক জগতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছে। মানব আপনার জ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা জগৎকে যতই সহজ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, ততই কিন্তু এই রহস্যবোধ সব দিক দিয়াই আরও তীব্র গভীর হইয়া চলিয়াছে; রহস্যবিলয় একটা অসম্ভব ব্যাপার। প্রত্যেক যুগের ভাবুক ও চিন্তাবীরগণ আপনাদের গভীর চিন্তা ও অনুভবের দ্বারা যে রহস্যকে জগৎ হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা করেন তাহা নয়, তাঁহারা শুধু রহস্যকে এমন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখেন ও দেখান যেখান হইতে মানবযুক্তিকে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

এই রহস্যবোধ মানবজীবন বিকাশের সহায়তাই করিয়া থাকে। মেটারলিঙ্কের মতে অনন্তবোধই মানবকে নৈতিকজীবনের পথে চালিত করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে যদিও আমরা চলিত ধর্ম্মবিশ্বাস বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি তবু আমাদের নৈতিক জীবন তাহাতে অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই। কারণ বর্ত্তমানের মধ্যেও চিরন্তন রহস্যবোধ মানবকে অসাড় হইয়া থাকিতে দিতেছে না। চলিত ধর্ম্ম মানবকে যে অনাস্বাদিত রহস্যের আভাস দিতেছিল, আজিকার বিশ্ব-

প্রকৃতিও আমাদের চেতনার সম্মুখে সেই রহস্যকেই তাহার সত্যকার রহস্যময়রূপে বাস্তব আলোকের অসম্ভব গৌরবে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। এক সময় যে রহস্যকে আমরা আধ্যাত্মিক বলিয়া কল্পনা করিয়াছিলাম, যদিও আজ আমরা তাহাকে ভৌতিক শক্তি বলিয়া ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছি তবু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে শক্তিকে জড়ই বলি আর আধ্যাত্মিকই বলি রহস্য বস্তুটি আমাদের নিকট তেমনই রহিয়াছে। বিশ্বরহস্য চিরকালই তাহার সত্যস্বরূপটিকে মানবের জ্ঞানাতীত লোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে ইহাই মেটারলিঙ্কের বিশ্বাস।

জানিতে না পারিলেও, রহস্য সম্বন্ধীয় ধারণাটি যে মানব-জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে তাহা আমরা প্রারম্ভেই বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্যই রহস্যকে যখন মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি বলিয়া তাহাকে আপনার ধর্ম্মবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তখন মানুষ নৈতিক জীবনেরই জয় হইয়া থাকে এই কথাটি অতি স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু রহস্যের বর্ত্তমান ভৌতিক (materialistic) ধারণা যে মানবীয় ধর্ম্মনীতিকে নষ্ট করিতে চায় তাহা নীট্‌শেপন্থী নীতিবিবর্ত্তনবাদীদের আলোচনায় কতকটা দেখিয়াছি।

কিন্তু মেটারলিঙ্ক বলেন যে বর্ত্তমান যুগের বিশ্বধারণা আমাদের নীতিবোধকে নষ্ট করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান যুগের বিশ্বধারণা অস্পষ্ট হইলেও ইহার মধ্য দিয়া একটি অভিনব বিশ্বমানবের আত্মা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধান বিশ্বজগতে ব্যক্তির সত্তাকে যতই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলিয়া প্রমাণ করিতেছে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জাতি সত্তাকে আবার তেমনি বিপুল করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যক্তিত্ববোধের বিলয় ধীরে ধীরে মানুষের মধ্যে—মক্ষিকাদের মত—বিশ্বমানব বোধ, জাতিগত লক্ষ্যের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করিতেছে। সত্যের সাধনায় আমাদের ক্ষুদ্রতাকে আমরা জানিতেছি কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানবত্বের বিকাশও হইতেছে, মানবজ্ঞানের প্রসার ও শক্তি বিশালতা লাভ করিতেছে। মোট কথা অনন্তবোধ মানবকে ভয়াতুর না করিয়া আরও অগ্রগতির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহার কারণ মানব আজ আপনাকে বিশ্বের নিগূঢ়তম রহস্যের সম-গোত্রীয় বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি এবং সেই জন্যই তাহার আশা আছে যে সে বিশ্ব-শক্তিকে একদিন আপনার জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিবে।*

মেটারলিঙ্কীয় চিন্তার সর্ব্বত্রই এই রহস্যবোধের সুস্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে দেখা যায়। তাঁহার লেখার অনুসরণ করিতে করিতে প্রায়ই মনে হয় যেন কি একটা অতীন্দ্রিয় সত্যের অনুভূতি তাঁহার চিত্তকে বিভোর করিয়া তুলিয়াছে, অথচ কি যে তাহার স্বরূপ, কেমন যে তাহার অনুভূতি তাহা যেন তিনি আমাদিগকে বলিয়াও বলিতে পারিতেছেন না; তাহার

* Double Garden (Leaf of Olive) p. 293.

অনুভবের মৃদুমধুর প্রাণমাতান সৌরভে অন্তর ভরিয়া আসে, বিস্মিত পুলকে চেতনা মগ্ন হইয়া যায়। মেটারলিঙ্ক এক জায়গায় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন 'যেই আমরা কোন বস্তুকে কথা দিয়া প্রকাশ করি অমনি তাহাকে কি অদ্ভুতভাবেই না খাটো করিয়া ফেলি! আমাদের বিশ্বাস যে আমরা অতল গভীরতার মাঝে মগ্ন হইয়াছি, অথচ যখন আমরা ভাসিয়া উঠি, তখন আমাদের অঙ্গুলিশীর্ষে সেখানকার যে জলবিন্দুটি ঝিকিমিকি করিতে থাকে তাহা সমুদ্রের সাদৃশ্যকে একটুও প্রকাশ করে না।* কিন্তু কথাটা ঠিক তা নয়; অনুভবের এমন একটা শক্তি আছে যে যত অস্পষ্ট হইয়াই সে প্রকাশ পাক্ না কেন, তাহার প্রকাশের মধ্যে অনুভবের জীবন্ত স্পন্দন না আসিয়া যায় না, এই জন্যই বহুস্থলে অস্পষ্টতা সত্বেও মেটারলিঙ্কের লেখা সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

অতীন্দ্রিয় নীতিবোধ

বলিতেছিলাম নীতিবোধের কথা। মানবমাত্রেরই মধ্যে এই নৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়, বিকাশ লাভ করে এবং একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। কোনো দেশের মানুষ প্রতিশোধ লওয়াকেই একটা নৈতিক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে পারে এবং হত্যাকারীকে যদি হনন করিতে না পারে নিজকে সেইজন্য অপরাধী ও ধর্ম্মের নিকট প্রত্যবায়-গ্রস্ত বলিয়া মনে করিতে পারে; কিন্তু আবার এমন দেশও থাকিতে পারে যেখানে প্রতিশোধ বস্তুটাই নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহা নীতিবোধেরই পরিণতির লক্ষণ।

মেটারলিঙ্ক নৈতিক জীবনের বিকাশটি তিনটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন এবং শেষস্তরের জীবনকেই আদর্শ নৈতিক জীবন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানুষের মধ্যে যতক্ষণ ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক স্বার্থবুদ্ধি জাগ্রত থাকিবে ততক্ষণ মানুষ কখনই সত্যকার নৈতিক জীবন প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। মানবের নৈতিক জীবনের উচ্চতম বিকাশটি পরার্থ নৈতিক (altruistic) ইহাই মেটারলিঙ্কের বক্তব্য। এই তৃতীয়স্তরের নীতিবোধকে মেটারলিঙ্ক মিষ্টিক নীতিবোধ নাম দিয়াছেন। মিষ্টিক নীতিবোধের মধ্যে মেটারলিঙ্ক বিচার বুদ্ধির (intellect) প্রাধান্যটিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চাহেন নাই; এই নীতিবোধ মানবের উচ্চতর স্বভাব-বৃত্তিরই অথবা মানবজাতির জীবনের নিগূঢ় মর্ম্মেরই মধ্য হইতে উৎসারিত হইতেছে বলিয়া মেটারলিঙ্ক বিশ্বাস করেন। বিচার বুদ্ধি অতীত জীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু মিষ্টিক নীতিবোধ মানব জীবনের সমগ্রতা হইতে, তাহার অনুভব ও কল্পনা হইতে, চেতনা ও

* Treasure of the Humble (Mystic Morality)

মগ্নচেতনার সমগ্রতা হইতে উদ্ভূত; এইজন্য বিচার বুদ্ধি যে নীতিকে সমর্থন করে তাহার চেয়ে এই মিষ্টিক নীতিবোধই উচ্চতর এবং সত্যতর বলিয়া মেটারলিঙ্ক মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।*

নব-নৈতিক বিচার

ভালমন্দ বিচার করিবার সময় আমরা সাধারণতঃ মানুষের কর্ম্মের বিচার করিয়া থাকি, আর খুব সূক্ষ্মবিচার করিতে হইলে তাহার চিন্তা ও অনুভবের হিসাব লইয়া থাকি, কারণ উদ্দেশ্য ও আশয় বুঝিতে হইলে চিন্তা ও অনুভবের সন্ধান লইতে হয়। কিন্তু সচেতন চিন্তা ও অনুভবের প্রেরণাই যে মানব জীবনের সবখানি নয়, এমন কি মানুষের সত্যকার স্বরূপটি যে তাহার চিন্তা এবং অনুভবের পশ্চাতেই রহিয়াছে তাহা মেটারলিঙ্ক যে সময় প্রচার করিয়াছিলেন তখনও দার্শনিক জগতে উহা তেমন করিয়া স্বীকৃত হয় নাই। নব মনস্তত্ত্ববাদিগণ তখনও মানুষের মগ্ন-জীবনের বার্ত্তাটিকে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সহ প্রচার করেন নাই। মেটারলিঙ্ক তখনই বলিয়াছিলেন যে মিষ্টিক নীতিবোধ মানুষকে বিচার করিতে গিয়া তাহার কর্ম্ম ও ভাবনাকেও উপেক্ষা করিবে।† এবং এই মিষ্টিক নীতিবোধের আবির্ভাব মেটারলিঙ্কের নিকট একটি নবযুগের সূচনা বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে মানবজাতি সমগ্রভাবে মিষ্টিক নীতিবোধ প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে, মানুষ এতকাল পরে এক গভীরতর জীবনের দ্বারে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। কার্পেন্টারের সাম্যবাদের মূলে, অরবিন্দের দৈবজীবন প্রচারের মূলে, ডক্টর বাকের বিশ্বচৈতন্য-বাদের গোড়ায়ও এই আসন্ন নবযুগের কথাটিই রহিয়াছে।‡

ক্রমশঃ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

* *Cf* Life & Flowers (Our Anxious Morality)
† Treasure of the Humble (Awakening of the Soul)
‡ *Cf.* Edward Carpenter's Towards Democracy
Dr. Bucke's Cosmic Consciousness
শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ

গিরীশ-স্মৃতি

(৯)

ইংরাজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ,—ফেব্রুয়ারী মাস। সে দিন রবিবার। Convention of religions in Indiaর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে পরামর্শ কর্‌বার জন্য কন্‌ভেনসন কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের জজ সারদাবাবুর বাড়ীতে গেলাম। সেখানে নানা কথাবার্ত্তার পর যখন ফির্‌ব' ফির্‌ব' মনে কর্‌ছি এমন সময়ে ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসে হাজির হ'লেন। তাঁর ছোট পাল্‌কী গাড়ী ক'রে বরাবর বাগবাজারে গিরীশ বাবুর বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। ডাক্তার বাবু রাস্তায় দুই এক জায়গায় রোগী দেখে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিরীশ বাবুর বাড়ীতে গেলেন।

গিরীশ বাবুর নিকটে সে সময় কয়েকজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে গিরীশ বাবুর কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল। আমাদের দেখে তিনি হেসে বিশেষ ক'রে আমাকে বল্‌লেন "কনভেনসন্ ফেলে এখানে আস্‌তে পার্‌লে?"

আমি। আপনার কাছে আসা আমাদের একটা মৌতাতের মতন দাঁড়িয়েছে। হাজার কাজ থাকুক আপনার কাছে একবার না এলে কেমন একটা অশান্তি বোধ করা যায়।

গিরীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন "বটে!" তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কন্‌ভেনসন কতদূর?"

আমি বল্‌লাম "হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, শিখ প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রবল উৎসাহ। সকলেই যোগদান কর্‌তে অগ্রসর হ'য়েছেন।"

গিরীশবাবু। মুসলমান সম্প্রদায় যোগদান কর্‌তে অগ্রসর হয়েছেন—বল কি? আমি তো এটা অসম্ভব ব'লে মনে ক'রেছিলাম।

আমি। অসম্ভব কেন হ'তে যাবে? বল্‌তে কি সর্ব্বপ্রথমে আমি এই কাজে একটী ধর্ম্মপ্রাণ সুপণ্ডিত মুসলমান ভদ্রলোকের উৎসাহ, সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছি।

গিরীশ বাবু। তাঁর নাম কি?

আমি। মৌলভী মির্জ্জা আবুল ফজল। তাঁর নিজের একটা প্রেস আছে। ইংরাজিতে কোরাণের একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ কর্‌বার জন্য তিনি এই প্রেস প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। খুব উদার ধীর ও শান্ত। গোঁড়ামী তাঁর আদৌ নেই। তাঁর সঙ্গে আমার একরকম ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বেই দাঁড়িয়েছে।

গিরীশ বাবু। বটে! এটা বড় সুখের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মনে

হ'য়ে ছিল যে মুসলমান সম্প্রদায় বোধ হয় এতে যোগদান করবেন না। কেন মনে ক'রেছিলাম জান ?

আমি। কেন মনে ক'রেছিলেন ?

গিরীশ বাবু। আমি জানি মুসলমান জাত্ আচার ব্যবহারে আদব কায়দায় অত্যন্ত উদার আর অমায়িক। নিজের ধর্ম্মের প্রতি তাঁদের অগাধ বিশ্বাস। তাঁরা দৃঢ়চেতা তেজস্বী কর্ম্মঠ আর আদর্শ সংঘবদ্ধ। প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের ভাব মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব জেনে শুনেও আমি কেন সন্দেহ ক'রেছিলাম তা জান কি ?

আমি। না—কেন ?

গিরীশ বাবু। কারণ মুসলমান মনে করেন হিন্দু পৌত্তলিক—কাফের। সেই প্রেরিত মহাপুরুষ মহম্মদ যে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম একেশ্বরবাদ প্রচার ক'রেছিলেন —তা ছাড়া অন্য ধর্ম্মের উপাসক ভ্রান্ত। বিশেষ পৌত্তলিকবাদীর সঙ্গে একেশ্বরবাদী কখনও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন না।

আমি। কিন্তু হিন্দু তো পৌত্তলিকবাদী নয়—হিন্দুও একেশ্বরবাদী—ব্রহ্মবাদী। হিন্দু ব্রহ্মের উপাসনা করেন—প্রতীককে পুতুল বলা তো এক কথা নয়। কেহ তো প্রতিমা পূজায় বলে না হে প্রতিমা হে পুতুল—তোমাকে আমি পূজা করছি।—বরং ব্রহ্মধ্যানে মনকে নিমগ্ন রেখে অরূপের রূপের ধ্যান ক'রে—তাঁকে আবাহন করা হয়।

গিরীশবাবু। ও ফিলজফি তোমার কে শুন্‌তে যাচ্ছে। আরবদেশে প্রাচীন অধিবাসীরা পৌত্তলিকবাদী ছিলেন—তাদের দমন কর্‌বার জন্য—সেই প্রেরিত মহাপুরুষ যে সব উক্তি ও ব্যবহার প্রয়োগ ক'রেছিলেন মুসলমানও ঠিক তদনুযায়ী কার্য্য করতে প্রস্তুত। যাঁরা গোঁড়া তাঁরা পরের মত শুন্‌তে চান না। মুসলমানের মধ্যে অনেক লোক দেখ্‌তে পাবে—যাঁরা গোঁড়া —অন্য মত শুন্‌তে পর্য্যন্ত তাঁরা চান না।

আমি। এই গোঁড়ামি আসে কোত্থেকে ?

গিরীশবাবু! তাঁদের নিজের ধর্ম্মের প্রতি—ইস্‌লামের প্রতি এত প্রগাঢ় বিশ্বাস, আস্থা ও ভক্তি যে তাঁরা মনে কর্‌তে পারেন না কি মনে করেন না যে জগতে অন্য কোনও ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে কিম্বা অন্য কেউ ঠিক তাঁদেরই মত ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে পারে! একেশ্বরবাদী হ'য়ে তাঁরা মূর্ত্তিপূজার বিশেষ বিরোধী।—শুধু তাই নয় এই বিরুদ্ধ ভাব তাঁদের এত প্রবল যে তাঁরা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বরাবর অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণই ক'রে এসেছেন —বড় বড় মন্দির ভূমিসাৎ ক'রেছেন, বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর শত শত দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দিয়েছেন, রত্নালঙ্কার লুণ্ঠন ক'রেছেন। এই বিরুদ্ধ ভাবটাই তাঁরা ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান

অঙ্গ ব'লে জানেন। ধর্ম্মের আবেগে তাঁরা এই বিদ্বেষকে পরম ধর্ম্মসোপান মনে ক'রে আস্‌চেন। তাই দুঃখের বিষয় প্রায় হাজার বছর বাংলা দেশে বসবাস ক'রেও তারা মনে ক'রতে পারে না যে তাঁরা ভারতবাসী, ভারতবাসী হ'য়েও তাঁরা মনে করতে পারেন না যে ভারতের সভ্যতা বা Culture এর সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ আছে। বিরুদ্ধভাব পোষণ করলেই মন উত্তেজিত আর সঙ্কুচিত হয়। কিছুতেই হৃদয়ের প্রসারতা হয় না। এরই নাম গোঁড়ামী—পরমত-অসহিষ্ণুতা।

আমি। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তো অনেক উদারহৃদয় সরল ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি আছেন।

গিরীশ বাবু। নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি কোনও ব্যক্তিগত বা কোনও ব্যক্তি বিশেষ নবাব বাদসাহের কথা বল্‌ছি না। আর সাধারণ মুসলমান জাতের কথাও বল্‌ছি না। আমি এদেশের একটা জীবন্ত ঐতিহাসিক ছবি দেখাচ্চি। খাস্ ইস্‌লাম জাত—প্রকাণ্ড জাত—ক্ষত্রতেজ-সম্পন্ন সেমিটিক জাত—রণনৈপুণ্যে, সাহসে বীর্য্যে তারা একদিন পৃথিবী কম্পিত ক'রেছিল। এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে ইস্‌লাম রাজদণ্ড ধারণ ক'রে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তবে ভারতবর্ষের মুসলমান বেশীর ভাগই একসময়ে খাঁটী হিন্দু ছিল—যে কয়জন বিদেশী খাঁটী তুর্কী এসেছিল তারা এদেশের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়েছে। কিন্তু বাংলার মুসলমানই বল আর ভারতবাসী মুসলমানই বল তারা ভারতবর্ষে বরাবর নিজেদের একটা পার্থক্য বজায় রেখে চলেছে। সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয় কি জান, আজ প্রায় হাজার বছর হ'তে চল্‌লো তবু প্রায় প্রতি বৎসর দাঙ্গা বাঁধে বক্‌রিদের সময়। সেদিনও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বাংলার মুসলমানরা জামালপুরে হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতে, হিন্দুমূর্ত্তি ভগ্ন ও কলুষিত করতে—নিরীহ নিরাশ্রয় হিন্দু প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার করতে একটুও ইতস্ততঃ করেনি বা কুণ্ঠিত হয় নি। এটাই আশ্চর্য্যের কথা!

আমি। উত্তেজনার সময়তো কাহারও সহজ জ্ঞান থাকেনা তাই কুণ্ঠাও থাকেনা।

গিরীশ বাবু। অথচ দেখ হিন্দু মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী। একদিনের নয় প্রায় হাজার বছর ধ'রে। পরস্পর পাশাপাশি লাঙ্গল ধ'রে জমি চাষ কর্‌চে, পাশাপাশি ঘর তুলে বাস কর্‌চে। কত হিন্দু, মুসলমানের জমি চাষ ক'রে মুসলমানের চাকরি ক'রে পরিবার পরিপোষণ কর্‌চে আবার কত মুসলমান হিন্দুর জমি চাষ কর্‌চে—চাকুরী ক'রে পেটে দুমুটো ভাত দিচ্ছে। ছেলেবেলায় যৌবনে বৃদ্ধ বয়সে কত হিন্দু কত মুসলমান নিবিড় বন্ধুত্ব প্রেমে বদ্ধ। তারা এক সঙ্গে খেলেছে আর খেল্‌চে। এক সঙ্গে তারা আমোদ কর্‌চে—একই ভাবে তারা বাংলাদেশের সামাজিক জীবন গ'ড়ে তুল্‌চে কিন্তু যদি তাদের কোনও স্বধর্ম্মাবলম্বী নিজের স্বার্থের জন্যই হোক্ বা পরের জন্যই হোক্—হিন্দুর বিরুদ্ধে

তাদের উত্তেজিত ক'রে দেয়—তবে অম্লানবদনে সেই খেলাধুলোর কথা স্নেহ-প্রীতির কথা সব বিস্মৃত হয়ে আপনার দেশ-ভায়ের হিন্দুত্ব মর্ম্মে আঘাত করতে একটুও পশ্চাৎপদ হবে না।—এটা রহস্য।

আমি। সেটা কি শুধু মুসলমানের দোষ?

গিরীশ বাবু। আমি কারু দোষ দিচ্ছি না। শুধু এত বড় জাতের এই রহস্যময় বৈচিত্র্য দেখাচ্চি। হিন্দুও মুসলমানের আনন্দে, উৎসবে, বিবাহে, পরবে যোগদান দিয়ে থাকে, আর মুসলমানও হিন্দুর আনন্দে, উৎসবে, সুখে দুঃখে, বিবাহে, পূজায়—সমুদয় ব্যাপারে যোগদান করে। এমন কি পরস্পর পরস্পরকে বিশেষ সম্বন্ধ পাতিয়ে "দাদা" "কাকা" "চাচা" ব'লে ডাকে।

আমি। মশায় পূর্ব্ববঙ্গের অনেক গ্রামে নিরীহ মুসলমানেরা ঘরদুয়ার পাহারা দেয়,—বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাজ করে।

গিরীশ বাবু। তাইতো বল্‌চি - আজ যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে আপনার মনে ক'রে একতাসূত্রে বদ্ধ হ'ত —তবে ভারতের দুর্দ্দিন প্রায় বার আনা কেটে যেত।

আমি। আচ্ছা মশায় এই একতা কেন হয় না?

গিরীশ বাবু। প্রাণের যোগ নেই। আমরা মুসলমানকে যবন অস্পৃশ্য বলি—তারাও আমাদের বিধর্ম্মী কাফের বলে। ধর্ম্ম যে একই সত্যের প্রকাশ, তা হিন্দু মুসলমান ভুলে গেছে।

আমি। কেন হাজার বছর বাস ক'রেও দুই জাতের ভিতর এই ভুল যায় নি? হিন্দু তো এই সার তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রেছে।

গিরীশ বাবু। মুসলমানও তা ক'রেছে। যদি ব্যক্তিবিশেষের উপলব্ধি সমগ্র জাতের উপলব্ধি হয় তবে হিন্দুরও যেমন হয়েছে মুসলমানের খৃষ্টানেরও তেমনি হয়েছে। বড় বড় মুসলমান ফকীর কি আজও ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে নেই? কিন্তু কথাটা কি জান, বড় বড় মহাপুরুষেরা যে সত্য উপলব্ধি করেন, সে সত্য শাস্ত্রে প্রকাশ পায় সত্য কিন্তু যতক্ষণ না সমস্ত জাতের মধ্যে সেই সত্য ছড়িয়ে যায় শুধু ভাবে নয়—কার্য্যে; জীবনে,—ততদিন 'তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরে'। এই হাজার বছর শুধু উপর উপর হিন্দু-মুসলমানে মেলামেশা ক'রেছে—বাইরে বাইরে সুখ-দুঃখের খবর নিয়েছে—সহানুভূতি ক'রেছে পরকে যেমন পর করে! ঠিক মনে মনে ভেবে দেখ আমরা নেড়ে ব'লে মুসলমানকে ঘৃণা করি। তারাও কাফের বিধর্ম্মী হিন্দু বলে ঘৃণা ক'রে। এই ঘৃণা—শুধু প্রেমে, ভালবাসায় দূর হ'তে পারে—যা শুধু ভাবের আদানে-প্রদানে সুখ-দুঃখের সহযোগিতায় জন্মে।

আমি। তা কিসে হয়?

গিরীশ বাবু। হিন্দু যদি খাঁটি হিন্দু হয়, আচারে-বিচারে নয়—শাস্ত্রানুযায়ী মহাপুরুষদের নির্দ্দিষ্ট পথে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে যাতে সমস্তই ব্রহ্মের বিকাশ এই ধারণা দৃঢ় করে, তবে।

মুসলমানও তেমনি খাঁটি মুসলমান হওয়া চাই। সেই প্রেরিত্ মহাপুরুষের প্রকৃত ভক্ত অনুচর হওয়া চাই। যাঁর আদর্শে এই দুনিয়াদারী তুচ্ছ হয়—ভগবৎ প্রেমে মন অনুরঞ্জিত হয়—সকলেই তাঁর গোলাম এই বোধ হয়—তবে। যিনি পরমাত্মা পরমপুরুষ তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, খৃষ্টানও নন—তিনি বিভু সর্ব্বব্যাপী! মহাসমুদ্রে যেমনি সমুদয় নদনদী সম্মিলিত হ'য়েছে, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলেরই সেই বিভুতে পরিসমাপ্তি হচ্চে। প্রকৃত সরল প্রাণে যে তাঁকে ডাকে, সরল প্রাণে যে সেই প্রেমময়ের শরণ লয়—তার দেহে, প্রাণে সর্ব্বাঙ্গে প্রীতির ধারা বয়ে যায়—সে যে মানুষকে না ভালবেসে থাক্‌তে পারে না! দেখ জগতের অধিকাংশ লোকে সব জড়বৎ জড়বস্তুর উপাসনা কর্‌চে—আত্মার সন্ধানে কে চলেছে? যতদিন জড়বস্তু প্রবল থাক্‌বে ততদিন বিরোধ, কলহ, ঈর্ষা প্রবল থাক্‌বে, হাজার চেষ্টায় তা দূর হবে না।

আমি। কিন্তু ইউরোপে যে এই বিরাট বিশাল সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে—তা তো ধর্ম্মকে আদর্শ ক'রে হয় নি—বরং ধর্ম্মকে অস্বীকার ক'রে হয়েছে। বাস্তবতার উপর তার ভিত্তি। যতই জ্ঞানের উন্মেষ হ'বে, ততই বিজ্ঞানের তীব্রালোকে কুসংস্কার আবর্জ্জনা ধরা পড়্‌বে। আমরা বাস্তবতাকে ছেড়ে দিয়ে কেবল আদর্শবাদের বালুকাস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছি—তাই ভয় হয় কখন্ তা বিজ্ঞানের প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা ধর্ম্ম সম্প্রদায় জাত মারামারি কাটাকাটি নিয়ে আছি—তার ফল হাতে হাতে দেখা যাচ্চে। আর ইউরোপ এই সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বীর্য্যশালী হয়েছে—আজ তার হুঙ্কারে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে। ফলেন পরিচীয়তে।

গিরীশ বাবু। ইউরোপের এই পরাক্রম কত দিনের? আঙ্গুল দিয়ে বছর গুণ্‌তে পার্‌বে। মনে জেন এক এক জাতের এক একটা বিশিষ্ট সাধনা থাকে। ভারতের শক্তি, ভারতের বিদ্যা-বুদ্ধি, ভারতের ধর্ম্ম একবার সমগ্র জগৎকে স্তম্ভিত ক'রেছিল—সমস্ত জগৎ এক সময়ে ভারতের নিকট ঋণ গ্রহণ করেছে। তখন ভারতের সাধনা ছিল—সে সাধনলব্ধ শক্তি ও সত্য জগৎকে দান ক'রেছে, জগৎ অবনত হ'য়ে তা মাথা পেতে নিয়েছে। এখন ইউরোপ তার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে—সে তার বিজ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি প্রভাবে প্রবল শক্তিসম্পন্ন হয়েছে—সমগ্র জগৎ মাথা নীচু ক'রে এখন তার ভাব নিতে বাধ্য হ'বে। অস্বীকার কর্‌লে চলবে না। ভারত এখন তার সাধনা হারিয়েছে! কিন্তু ভারতই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে বিজ্ঞানের সমন্বয় কর্‌বে—সেই সমন্বয় সত্য সমগ্র জগৎকে নবজীবন দান কর্‌বে! ইউরোপ এই আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করেনি ব'লে—এরই ভিতর তার মৃত্যুর চিহ্ন দেখা দিয়েছে। তার দেয়ালের গায়ে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই হিংসা, দ্বেষ, কলহ, রক্তপাত, দারিদ্র্যপীড়ন, দারিদ্র্যের উত্থান, আভিজাত্যের গর্ব্ব—সব অশান্তির আগ্নেয়গিরির সৃজন করেছে। কবে তা ইউরোপীয় শক্তিকে বিদীর্ণ কর্‌বে তার নিশ্চয়তা নেই। এইটুকু দেবার জিনিষ আছে ব'লেই ভারত এখনও মরেও বেঁচে আছে।

আমি। বেঁচে আর কি আছে বলুন ?

গিরীশ বাবু। কি বল্‌ছো, বেঁচে নাই ? ভারতের বেদ, উপনিষদ্, ষড়দর্শন, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ—ভারতের কাব্য নাটক কথা-সাহিত্য—ভারতের সাধক-সঙ্গীত মহাপুরুষের চরিত্র-গাথা—ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিভাবান ব্যক্তি ভারতের বুদ্ধ শঙ্কর রামানুজ মধ্বাচার্য্য—ভারতের শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ—এই সব তবে কি ?

আমি। ও তো পুরাতনের বুদ্‌বুদ্।—এখন তো সংস্কৃত মৃত ভাষার মধ্যেই দাঁড়িয়েছে।

গিরীশ বাবু। কে বলে মৃতভাষা ? এ তো অমর ভাষায় অমর বাণীর প্রকাশ !—মৃত না জীবন্ত শক্তির আধার ? বর্ত্তমানে এই শ্রদ্ধাহীনত্ব জাতীয় জীবনের বিষম ব্যাধি ! জেন—যা শাশ্বত তা অমৃত—তা অমর। যে পুরুষ শাশ্বত সত্যের জীবন্ত মূর্ত্তি তিনি অমর। কোন্ যুগে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন—কোন্ যুগে যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন—আজও তোমার জীবন্ত জাত—জীবন্ত মানুষরা তাঁদের নামে মস্তক নত করে। আজও কোটি কোটী প্রাণী তাঁদের অমৃতবাণী শুনে পরম শান্তি লাভ কর্‌ছে—আজও কোটী কোটী নরনারী তাঁদের জীবন্ত বিগ্রহ বলে অন্তরে বাহিরে পূজা কর্‌চে। যা সনাতন শাশ্বত সত্য—তার বিনাশ কেউ কর্‌তে পারে না। ঠাকুর নিরক্ষর পূজারী, নগরের প্রান্ত সীমা ছাড়িয়ে একটা গণ্ডগ্রামের দেবালয়ে বাস কর্‌ছিলেন—আজ দেখ সমগ্র পৃথিবীময় তাঁর নাম ছড়িয়ে গেছে। বড় বড় পণ্ডিত সাধক তাঁর চিন্তা কর্‌চে তার জীবনলীলা আলোচনা কর্‌ছে। সত্য যেখানে প্রকাশিত হন—সেখানে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলো—সবাই দেখ্‌তে পায়। এতো পুরাতন হয় না। পুরাতন নূতন হ'য়ে দেখা দেয় এই মাত্র। বর্ত্তমান যুগ সমন্বয়ের যুগ—যা ঠাকুর তাঁর নিজের সাধনায় দেখিয়ে গেছেন।

আমি। তাইতো আমরা এই কন্‌ভেনসনের আয়োজন করেছি।

গিরীশবাবু। যদি যথার্থই এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘ সফল হয় তবে ভবিষ্যতের জাতীয় একতা সত্বর আস্‌বে। হিন্দু মুসলমান সরলভাবে মিশ্‌লে—পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মভাব ও আদর্শকে শ্রদ্ধা কর্‌তে শিখ্‌বে। ধর্ম্মালোচনায় ভাবের আদান-প্রদানে সংকীর্ণতা দূর হবে। পরস্পর ভারতবাসী বলে গর্ব্ব অনুভব কর্ব্বে—তবে তো ভারতীয় মহাজাতি সংগঠিত হ'বে।—কি জান, দেখ্‌বে জগতের যে যে ধর্ম্ম যে যে সংস্কার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বা প্রচলিত অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠানকে আঘাত দেবার জন্য বিদ্রোহ কর্‌বার জন্য অগ্রসর হয়—সেই সেই ধর্ম্ম বা সংস্কার—কিছুকাল প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করে বটে, কিন্তু পরিণামে একটা সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হ'য়ে জীবনহীন হ'য়ে পড়ে ! বিস্তারই জীবন। এই যে বায়ু প্রবাহিত হ'চ্চে—এই যে দক্ষিণ পবন ব'য়ে যাচ্চে—মানুষ একে বসন্তের দূত বলে প্রিয় মনে কর্‌চে—তার স্পর্শে শরীর স্নিগ্ধ মনে কর্‌চে। কিন্তু এই বাতাসই যখন প্রবল ঝড়ের রূপে আসে—তখন মানুষ নয় এমন কি পশুপাখী জীবজন্তু ভীত সন্ত্রস্ত হয়, নিখিল বিশ্বে একটা প্রবল আলোড়ন

হয়—কিন্তু সে মূর্ত্তি বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারে না। ঝড়ের বেগেই আসে আবার ঝড়ের বেগেই মিশিয়ে যায়। তার প্রয়োজন থাক্‌তে পারে কিন্তু সে ঝড়কে, সে প্রলয়মূর্ত্তিকে, দেখে কে না ভীত হয়—ক্ষণিকের তরেও কি কেউ চায়?—স্থায়ী রূপের কথা ছেড়ে দাও।—ধর্ম্মের মূল—হিংসা নয়, প্রেম।

আমি।—আমার বোধ হয় মুসলমানের এই যে প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি এটা তার স্বাভাবিক বীরত্বের একটা স্ফূর্ত্তি।

গিরীশবাবু। এটা বীরত্ব না কাপুরুষতা? হিন্দু হোক্ মুসলমান হোক্ খৃষ্টান হোক্—যেই হোক্ যারা নিরীহের উপর অত্যাচার করে—অসহায়া স্ত্রীলোককে নির্য্যাতন করে—উপাসনা-স্থান কলুষিত করে তারা পরম কাপুরুষ।—যথার্থ যে বীর সে বীরের সঙ্গে লড়াই করে। অস্ত্রহীনকে অস্ত্র দিয়ে তারা যুদ্ধ করে। নিরস্ত্রকে যারা আঘাত করে—তারা বীরত্বকে খর্ব্ব করে,—বীর নামকে মসীলিপ্ত কলঙ্কিত করে। জেন আঘাত করা বীরত্ব নয় সহ্য করাই প্রকৃত বীরত্ব। যে দুর্ব্বল কাপুরুষ সে সহজে উত্তেজিত হয় আবার সহজেই মাটীর সঙ্গে মিশে যায়। বীর যারা তারা হিমাচলের মত অটল স্থির ও গম্ভীর।—ছোট বিষয়ে তাদের নজর পড়বে না। যে যথার্থ বীর সে সহজে আঘাত দেবার চেষ্টা করে না। আমি দেখ্‌চি—আজ ভারতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ্‌চি—বর্ত্তমান ভারতে, কি হিন্দু কি মুসলমান—কারুর ভিতর একটীও যথার্থ বীর নেই।—ভারতের রাজনীতি আন্দোলন এক সখের অভিনয়।—কারুর প্রাণ নেই—যদি একটা প্রাণও থাক্‌তো—তবে তার স্পর্শে ভারতীয় জাতির ভিতর একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে যেত।

আমি। আপনি যা বল্‌ছেন তাতে স্বীকার ক'র্‌তে হয়—যে আপনার আদর্শানুযায়ী কাজ হচ্চে না। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির কত বিঘ্ন! হিন্দু মুসলমানের বিবাদ—জাতিভেদ প্রথা—নারীজাতির অনুন্নত অবস্থা—আরও কত বাধা রয়েছে।

গিরীশবাবু। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সেইদিন মিট্‌বে—যে দিন তারা প্রেমে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কর্‌বে। সেই প্রেমের মূল—ধর্ম্ম। যখন হিন্দু ও মুসলমান উপলব্ধি কর্‌বে—ধারণা কর্‌বে একই খোদা কাহারও হরি—কাহারও গড্—শুধু নামের ফের—যেমন ঠাকুর জগতের সমুদয় ধর্ম্ম নিজ জীবনে সাধনা ক'রে—প্রত্যক্ষ সত্য—তাঁর জ্বলন্ত বাণী রেখে গেছেন—এক জলকে কেহ ওয়াটার কেহ পানি কেহ একোয়া কেহ বারি বলে তেমনিই একই ভগবান্‌কে কেহ আল্লা কেহ হরি কেহ গড্ কেহ ব্রহ্ম বলে। ভারতের হিন্দু মুসলমানের খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ভিতর—সকল মণ্ডলীর মধ্যে যতদিন না এই মহাবাণী স্বতঃস্ফূর্ত্ত হবে—ততদিন এই বিবাদ মিট্‌বে না। এমন দিন আস্‌বে যেদিন হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব অতীত-কালের শাক্ত বৈষ্ণব প্রটেষ্টান্ট রোমান ক্যাথলিকদের মত একটা প্রবাদ থাক্‌বে মাত্র।

তুমি যে জাতিভেদের কথা বল্‌চো—ওটা কিছু নয়। বৈষম্য শ্রেণী বিভাগ সব যুগে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। সমুদায় স্বাধীন জাতের ভিতর এই পার্থক্য বা বিভাগ দেখ্‌তে পার্‌বে। কিন্তু আভিজাত্যের কোনও গর্ব্ব থাক্‌বে না। প্রেমে কি ভেদাভেদ থাকে? মঠের মচ্ছোব দেখ নি? সবাই প্রসাদ পাচ্চে—অতি সন্তুষ্ট চিত্তে—সেখানে তখন যেন জাতের গর্ব্ব—আভিজাত্যের অভিমান সব মুছে গেছে। ওতো আপনা আপনি চ'লে যায়।

আমি। মশায় আমি জানি একজন শিক্ষিত গ্রাজুয়েট জেতে নাপিত—নেমন্তন্ন খেতে অপমানিত বোধ ক'রে শেষে খৃষ্টান হ'ল। মুর্খ চরিত্রহীন লোভী ব্রাহ্মণকে কি কোনও শিক্ষিত কায়স্থ কখনও আন্তরিক সম্মান দান কর্‌তে পারে?

গিরীশবাবু। তা কি কখনও পারে? কিন্তু এতে জাতীয় উন্নতির কোন বিঘ্ন হয় না। রাজা অযোগ্য হ'লেও তার রাজদণ্ড অমনি খ'সে পড়ে যায়—এতো সামান্য কথা! আমি তো তাই বল্‌ছি—তোমাকে চেষ্টা ক'রে জোর ক'রে তুল্‌তে হ'বে না—যার যার মৃত্যু তা তার আপনি ঘটে থাকে। যদি একালে এর কোনও দরকার না থাকে—তবে তার সমাধি সে আপনি খনন কর্‌বে—অন্যকে কর্‌তে হবে না। কিন্তু কোটী কোটী ব্রাহ্মণজাতির ভিতর যদি একজনও প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করে—তবে তার আধিপত্য বজায় থাক্‌বেই থাক্‌বে—হাজার চেষ্টা কর্‌লেও তা তুমি লোপ কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু এই জাতিভেদের ভিতর তোমরা যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধানের স্থষ্টি কর্‌চ—যার কাছে জাতিভেদও ম্লান হয়—তার উপায় কি?

আমি। মশায়—বুঝ্‌তে পার্‌চি না আপনি কোন্ ব্যবধানের কথা বল্‌ছেন?

গিরীশবাবু। কোন্ ব্যবধান? সহুরে শিক্ষা আর সভ্যতা। শিক্ষিত সহুরে ভারতবাসী—তথা কথিত ভদ্রলোকেরা বিদ্যার আভিজাত্যের গর্ব্বে সমাজের কোনও স্তরের সঙ্গে মিল্‌তে পারে না—তার কি হচ্চে?—আগে গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে তোমার যে একটা যোগ ছিল—জাতিভেদ বল, ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব বল, ধনী পণ্ডিত বল—সকলেরই একটা গ্রাম্যজীবন ছিল—যাতে অধ্যাপকের চণ্ডীমণ্ডপেও মুসলমানকে সাদরে আহ্বান ক'রে বসাত—পরস্পরের সুখদুঃখের কথা যেখানে আলোচিত হ'ত—সে প্রাণের টান আর নেই! জাতিভেদ ব'লেও নয় আর হিন্দু মুসলমান ব'লেও নয়—তার কারণ—ইংরাজী শিক্ষা, ব্যক্তিগত সভ্যতার গর্ব্ব। আমার ভিতরে অভিমান আছে যে আমি সহরবাসী এরা পাড়াগেঁয়ে—এদের চেয়ে আমি অনেক বেশী জানি আর বুঝি। "শিক্ষিত" ব'লে সহুরে ব'লে মূর্খ পাড়াগেঁয়ের মাঝখানে বর্ত্তমানকালে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান তৈয়ারী হচ্চে। এর ফল পাড়াগাঁ—দিন দিন মলিন শ্রীহীন হ'য়ে শুকিয়ে যাচ্চে। কেননা তোমাদের দৃষ্টান্তে—তারা বুঝেছে সহর স্বর্গ, পাড়াগাঁ নরক, গ্রাম্য লোকে বোঝে মনুষ্যত্ব লাভ কর্‌তে হ'লে সহর প্রয়োজন।

আমি। হাঁ—তা কতকটা হচ্চে বটে। তবে শিক্ষিতেরা তাদের সঙ্গে কি তাদের হাতে খেতে দ্বিধা বোধ করবে না।

গিরীশবাবু। কে বল্লে—করবে না? Dirty rogues ব'লে কাছে ঘেঁস্তে দেবে না —আবার তার হাতে খাবে? শিক্ষিতেরা পাড়াগেঁয়েকে নিম্নস্তরের লোক বলে মনে ক'রে থাকে—ইংরাজেরা ভারতবাসীকে যেমন করে।

আমি। যাই বলুন সামাজিক জীবনে জাতিভেদ উন্নতির বিষম অন্তরায়। এটা কি আপনি বলেন না?

গিরীশবাবু। সামাজিক জীবনে শ্রেণীবিভাগ থাক্‌বেই থাক্‌বে। সব দেশেই আছে। এই বিভাগ কেহ টাকা বা শিক্ষার তারতম্যে করে, আবার কেউ গুণ কর্ম্মের অনুসারে করে।—হিন্দু সমাজে গুণ কর্ম্ম ভেদে এই বৈষম্য শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে। যে মুহূর্ত্তে হিন্দুজাত গুণ কর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আভিজাত্যের অহঙ্কারে স্ফীত হবে—সেই মুহূর্ত্তে সে আপনি ঘণ্টা বাজিয়ে তার মৃত্যু ঘোষণা করবে! এর জন্য সমগ্র জাতির উত্থান আটকায় না। কাল ঠিক মত আপনা আপনি তার adjustment ক'রে চলে থাকে।

আমি। কিন্তু এই কালই বিদ্রোহ বিপ্লবের সুর তোলে—ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য ক'রে কত জাত কত দেশ কত কীর্ত্তি পৃথিবীর কোল থেকে একেবারে মুছে দিয়ে যায়।

গিরীশবাবু। যদি তাই হয়—তবে তুমিই কি তা রোধ করতে পার? যার ভেতর প্রাণশক্তি সঞ্চিত থাকে তা সুপ্তই হোক্ আর জাগ্রতই হোক্—তাকে লুপ্ত করতে কেউ পারে না। যা প্রাণহীন—তা আপনিই লোপ পায়—হাজার উদ্যম কর—হাজার জাঁকজমক ক'রে চেষ্টা পাও—তাতে কিছুতেই প্রাণশক্তি উদ্ভব করতে পারবে না—তাকে রক্ষে করতে পারবে না—এই প্রকৃতির নিয়ম।

আমি। কিন্তু নারীজাতির নির্য্যাতন?

গিরীশবাবু। কিসের নির্য্যাতন?

আমি। আমরা হিন্দুজাতি—সৃষ্টির আদিম কাল থেকে নারীজাতিকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ক'রে,—অশিক্ষিতা ক'রে—দাসীরূপে শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রস্বরূপ ক'রে—দিন দিন শত লাঞ্ছনা ক'রে—শাস্ত্রের আর নিয়মের নিগড় দিয়ে যে তাদের শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছি তাও কি জাতীয় উন্নতির অন্তরায় নয়?

গিরীশবাবু। তুমি যা বল্‌ছো তা যদি সত্য হয়—তবে নিশ্চয়ই অন্তরায়। তবে তুমি যা বল্‌ছো—তা সত্য ব'লে আমি ঠিক মেনে নিতে পাচ্ছিনি।—স্ত্রীজাতিকে হিন্দু ঋষিরা যত সম্মান দিয়েছেন, বোধ হয় আজও পাশ্চাত্য জাত তা দিতে পারে নি। তুমি বল্‌ছো নারীজাতি, ইংরেজী অনুকরণে আজকাল তোমরা মুখে না বল লেখায় সম্বোধন কর নারী—আর

খাঁটি হিন্দু—সেখানে ডাকে "মা"। জগদম্বার অংশ-স্বরূপিনী ব'লে নারীজাতিকে পুরুষ চিন্তা করবে—এর ব্যবস্থা দিচ্ছেন হিঁদুর শাস্ত্র—হিন্দুর ঋষি। দেখাও দেখি—জগতের সমগ্র জাতের ইতিহাসে আর কে এইভাবে স্ত্রীজাতিকে লক্ষ্য করতে বলেছে। বাইবেল শাস্ত্রে বলছে মানুষের পাঁজরার হাড় নিয়ে বিধাতা নারী মূর্ত্তি সৃজন ক'রেছে। আর আদি নারী সর্পরূপিণী সয়তানের প্রলোভনে প্রথমে মুগ্ধ হ'লেন এবং তার ফলে আদি মানবকে স্বর্গচ্যুত ক'রে এই পাপপঙ্কিল ধরণীতে পাতিত ক'রেছেন।—সেই পাপের ফলে মানবজাতির সৃষ্টি। গ্রীক ও রোমকেরা নারীজাতিকে নরের ভোগ বিলাসের সামগ্রী—গবাদি পশুর মত সম্পত্তি স্বরূপেই গণ্য করতো।—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ একটা চুক্তির মত দাঁড়াল।—স্বামী কিম্বা স্ত্রী যদি কেউ সর্ত্ত ভঙ্গ করে—তবে সঙ্গে সঙ্গে চিরজীবনের মত তার বিচ্ছেদ। Life of Bishop Wolstan পড়্‌লে দেখ্‌তে পাবে—যা থেকে টেন লিখেছেন যে "At Bristol at the time of conquest as we are told by an historian of the time, it was custom to buy men and women in all parts of England and to carry them to Ireland for sale."

আমি। এতো এদেশেও ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর স্ত্রী পুত্রকে বিক্রি ক'রেছিলেন।

গিরীশবাবু। দেনা পরিশোধ করবার জন্য—তিনি শুধু স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রেননি—নিজেকেও বিক্রি করেছেন। তখন Insolvency নিতে শিখে নি ? আর এদেশে এরকম বীভৎস প্রথা ছিল না যে "The buyers usually made the women pregnant and took them to market in that condition in order to ensure a better price—শুধু তাই নয়—"You might have seen with sorrow long files of young people of both sexes and of the greatest beauty bound with ropes and daily exposed for sale. They sold in this manner as slaves their nearest relatives and even their own children."

আমি। ও তো হাজার বারশো বছরের পুরাণো কাহিনী।

গিরীশবাবু। বটে। হাজার বারশো বছরের কথা! কিন্তু এটা কি ? "The only upright man was George III, a poor half-witted dullard, who went mad, and whom his mother had kept in his youth, as though in a cloister. She gave as reason the universal corruption of men of quality. "The Youngmen, she said, were all rakes ; the young women made love, instead of waiting till it was made to them". ফরাসী লেখক Motesquiera ইংলণ্ডের কথা বলছেন "Money is here esteemed above everything, honour and virtue not much. An Englishman must have a good dinner, a woman and money". ইংলণ্ডের তিনশ' বছর আগেও এমন অবস্থা গিয়েছে যে "The most celebrated called themselves

Mohawks and tyrranised over London by night. Sometimes they would put a woman in a tub and set her rolling down a hill; others would place her on her head, with her feet in the hair; Some would flatten the nose of the wretch whom they had caught and press his eyes out of their sockets". টেন বল্‌ছেন "Swift, the comic writers the novelists have painted the baseness of this gross debauchery—এমন কি Voltaire's Journey character of Briton সম্বন্ধে বলেছেন "Living in drunkenness, revelling in obscurity, issuing in cruelty ending by irreligion and attention. Gay তাঁর Beggar's opera-তে একটী মেয়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"A woman knows how to be mercenary though she has never been in a court or at an assembly".

বাপ মেয়ের কথা বল্‌ছে—

"My daughter to me should be like a court lady to a minister of state a key to the whole gang."

আমি। কিন্তু অবরোধপ্রথাও কি আপনি সমর্থন করেন ?

গিরীশবাবু। অবরোধপ্রথা ক' দিনের ? যখন হিন্দুর বাহুবল দুর্ব্বল হ'য়ে তার মা বোন স্ত্রী মেয়ের সম্মান রক্ষে কর্‌তে পারেনি—সেদিন থেকে এই অবরোধপ্রথার চলন! মান্দ্রাজ বোম্বে এই অবরোধপ্রথা নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণে কোথাও অবরোধপ্রথার উল্লেখ নেই।—আজও কি তোমাদের বাহুতে বল আছে—মায়ের জাতের সম্মান রাখ্‌বার, তবে পথে ঘাটে ট্রেণে লাঞ্ছনা পাও কেন ? স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতিকে দেখে—মিশনারীদের নিন্দা শুনে অবরোধপ্রথাকে নিন্দা কর্‌চো। এই তো ? কিন্তু পাশ্চাত্য জাত স্বাধীন—একটা মেমের পেছনে আছে বিরাট স্বাধীন রাজশক্তি—যদি কেউ তার সামান্য অসম্মান করে তবে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত সে জ্বলন্ত রোষানলে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হবে। আর তোমাদের কি আছে ? ভীরু কাপুরুষ যারা—যাদের বাহুতে শক্তি নেই, হৃদয়ে তেজ নেই—প্রাণে বল নেই, দাসত্ব যাদের উপজীবিকা —গোলামের গোলাম হয়ে আছে যারা—যারা নিজেরা বোঝে না স্বাধীনতা কি—তারা আবার অপরকে স্বাধীনতা দেবে! আমাদের দুর্ব্বলতার দুর্গ—পরাধীনতার কলঙ্ক চিহ্ন—এই অবরোধ-প্রথা। যে দিন তা দূর করতে পার্‌বে—সেদিন আপনি অবরোধপ্রথা যাবে। অন্তঃপুর মেয়েদের মন্দির যেখানে মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে স্বাধীনভাবে চলা ফেরা করে। যেখানে পুরুষ সসম্মানে মাথা হেঁট ক'রে প্রবেশ করে। যে-স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর নেই তার আত্মসম্মান নেই!

আমি। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির প্রতি দৃষ্টি করলে বোঝা যায় তাদের নারীরা আমাদের দেশের অপেক্ষা কত উন্নত, কত অগ্রগামিনী—কত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী।

গিরীশ বাবু। এক এক দেশেব আব্‌হাওয়ায় এক এক দেশের নারীশক্তি প্রকাশ পেয়েছে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন আচার-ব্যবহারে ভিন্নরূপে নারীশক্তির বিকাশ। এখানে এদেশ ওদেশ নেই—উন্নতির তুলনা হ'তে পারে না। অবশ্য বর্ত্তমান পরাধীন ভারতের অধঃপতনের যুগে স্বাধীন পাশ্চাত্য জাতির তুলনা সঙ্গত নয়। কিন্তু আমাদের ভারতে সনাতন সত্যের ভিত্তির উপর সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। মানুষ পৌরুষে, বীর্য্যে, ত্যাগে, বৈরাগ্যে, সংযমে, কঠোরে অমৃতত্ব লাভ ক'রে শাশ্বত ধর্ম্ম সত্যের জয় ঘোষণা ক'রেছেন আর মানবী স্নেহ মমতায় একনিষ্ঠ প্রেমে, সতীত্বে, ত্যাগে, ব্রহ্মচর্য্যে, সংযমে মাতৃত্বের বিকাশে বিশ্বে প্রেম ও শান্তির বারতা প্রদান করেছে। ভারতে আর্য্য ঋষিরা যেমন আদর্শ দেখিয়েছেন—তেমনি সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী গার্গী, মৈত্রেয়ী নারীশক্তির এক একটী বিশিষ্টরূপ দেখিয়েছেন। যতই বল এই দেশের আব্‌-হাওয়ায় এই জাতীয় চরিত্রের বিকাশ সম্ভব—অন্য দেশে দুর্লভ। এদেশে খনা, লীলাবতী, সুলভা, মৈত্রেয়ী কোনও দেশের মেয়েদের তুলনায় হীন হবে না।

আমি। মশায় এ কথা স্বীকার করতে রাজী নই যে তাই বলে ভারতের যত মেয়ে সব সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী—সব গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী সুলভা!

গিরীশ বাবু। সে কথা কে বল্‌ছে? তাও কি কখনও হয় বা কোনও দেশে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জেন এই traditions-গুলি রমণীর শক্তিকে জাগিয়ে রেখেছে। সহস্র সহস্র প্রলোভন লালসা পৈশাচিক তাণ্ডবের মধ্যে এই আদর্শগুলি এই traditions বা সংস্কার তাদের অধঃপতনের পথে যেতে পায় পায় বাধা দেয়! কি জান, শ্রীচৈতন্য বাংলা দেশে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন—তা ব'লে কি সমুদায় বৈষ্ণব জাত সেই শ্রীচৈতন্য হবে—না হওয়া সম্ভব? কিন্তু যে যত দুর্ব্বল হোক, যত পণ্ডিত হোক্‌—নেহাত নেড়ানেড়ীও একবার শ্রীচৈতন্যের আদর্শের দিকে মুখ তুলে তাকাবে—মহান্‌ বিরাটের একটা আভাসও তাদের মনে খেলে যায়। তাতে কোটী কোটী জীবন উপকৃত হ'য়ে থাকে। তেমনি সীতা সাবিত্রীর পুণ্য নাম উচ্চারণে পুরুষ স্ত্রীজাতিকে অন্তরে পূজা ও ভক্তি করে—পাপিষ্ঠেরও মাথা নত হয় দুশ্চারিণী কুলটাও সে নাম শুনে চমকে ওঠে!

আমি। কিন্তু মশায় তাই বলে একটা rational reasoning থাকা চাই। সতীধর্ম্মটা কি? পুরুষ ম'লে স্বর্গে যাবেন—তার স্ত্রী মরে তার সেবাদাসী হ'তে যাবেন—এত বড় absurd কথা এই scientific age-এ শুনবে কে? যে মানুষ মরে গেলে কোনও অস্তিত্ব থাকে না—তার মিলন হবে মরে গিয়ে। আর এই একটা মিছে ভাবকে রাখবার জন্য কত মিছে শাস্ত্র মিছে tradition তৈয়ারী হয়েছে—পুরুষের কত অত্যাচার নারীজাতি অবাধে সয়ে যাচ্চে। কিন্তু

শিক্ষার আলোকে যখন এই কুসংস্কার দূর হবে—যখন নারী দেখ্‌তে শিখ্‌বে যে সভ্যতার বিশ্বমানবাত্মার প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণে তারও নরের মতই সমান অধিকার আর প্রয়োজন, তখন সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে স্বামীত্বের এই আবরণ আর আব্দার। পুরুষও যেমনি স্বাধীন থাক্‌বে, নারীও তেমনি স্বাধীনা থাক্‌বে। স্বাধীনতাই ভাবী মানবসভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য। আমার কোন কোনও বন্ধুরা এই সব যুক্তি দিয়ে থাকেন।

গিরীশ বাবু। তোমার সেই বন্ধুদের বলো স্বাধীনতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক জিনিষ নয়। সংযত স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, আর অসংযত স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতা। ম'লে পরে মানুষ কি হয় তা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত কিছু বল্‌তে পারে নি। যখন সে সম্বন্ধে কোনও scientific truth পাওয়া যায় নি, তখন জোর ক'রে কি ক'রে বল্‌তে পার যে মৃত্যুর পর পতিপত্নীর মিলন অসম্ভব। জেন, তুমি যেমন যুক্তির কথা বল্‌বে—অপর পক্ষেও তেমনি যুক্তি আছে। কত স্বামী স্বপ্নে বা মৃত্যুকালে তার মৃতা পত্নীকে দেখ্‌তে পায়, তার কথা শোনে—আর কত পতিপ্রাণগতা পত্নী স্বপ্নে জাগ্রতে তার মৃত স্বামীকে দেখ্‌তে পায়, কথা শোনে। জন্মমৃত্যু-রহস্য বর্ত্তমান বিজ্ঞান নির্ণয় কর্‌তে পারে নি। কিন্তু আমাদের আর্য্য ঋষিরা যোগদৃষ্টি সহায়ে যে উচ্চ সত্যলাভ ক'রেছেন—তাতে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন—স্বামী, স্ত্রী, ভাই বন্ধুর মৃত্যুর পরে মিলন হ'তে পারে। বল্‌তে পার এই সব কুসংস্কার। কিন্তু প্রেতাত্মা ভূতের বিশ্বাস সব জাতের ভিতর, সব জাতের সাহিত্যের ভিতর দেখ্‌তে পাওয়া যায় এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা তা প্রত্যক্ষ ক'রেছেন।

আমি। সে প্রত্যক্ষ দেখা তো একটা hallucination.

গিরীশবাবু। (হাসিয়া) তোমার সব অনুমান গুলি—সব অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থিওরী গুলি সত্য হ'তে পারে আর লোকের প্রত্যক্ষ দেখা ভ্রম হবে! তোমাদের যুক্তি বড় সুন্দর।—স্বামীত্বের আবরণের কথা বল্‌ছো। এই সব আবরণ যিনি দিয়েছেন—তিনি এটাকে মিছে ব'লে দেন নি! যিনি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর পরম মহেশ্বর—যিনি পতিরও পতি—সেই জগৎপতি—সর্ব্বজীবের ভিতর ওতপ্রোত রয়েছেন।—এই জগৎটা তাঁর প্রেমমাধুর্য্যের খেলা। নারী—প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি—সে ত প্রাণ দিয়ে—আপনাকে প্রেমাস্পদের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছে—এও যে মস্ত ব্যাপার। যারা কখনও পরকে আপনার করতে পারেনি আপনার প্রাণকে পরের কাছে বিলিয়ে দিতে শিখেনি যারা স্বার্থপর নিজ সুখসম্ভোগে তৎপর—তারা এই সতীধর্ম্মকে হেসে উড়িয়ে দিবে। একটা কথা কি জান—রবির চেয়ে বালুর তাপ প্রখর, আসল জিনিষের চেয়ে নকল বেশী চাকচিক্যময়—তাই আসল বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে নকল বৈজ্ঞানিক জ্যাঠাদের তর্কের তোড় বেশী! নারীর নারীত্ব কি সতীত্ব বাদ দিয়ে? Ideal womanhood কখনও chastityকে পদদলিত ক'রে দাঁড়াতে পারে! পুরুষ যেমনি সিদ্ধপুরুষ হন—ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হন—তেমনিই নারীও আদর্শ নারী হন যখন তিনি সতী—যখন প্রেম ও ত্যাগের আদর্শে অনুরঞ্জিত হন যখন

নারী প্রেমের জ্বলন্ত বিগ্রহরূপে প্রকাশিত হন। সে প্রেম বহুনিষ্ঠ নহে—একনিষ্ঠ প্রেম—পবিত্র মধুর শান্তিপূর্ণ! যুগে যুগে কবি গায়ক শিল্পী সতীর বন্দনাগীতিতে দিক মুখরিত করেছে—শত শত মন্দির নির্ম্মাণ করেছে। কোটী কোটী নরনারী দিনরাত সতীর পবিত্র নাম স্মরণ ক'রে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হ'তে পূজার অর্ঘ্য দিয়ে এসেছে। আজ তুমি কোন কীটের কীট সেই বন্দনা গীতকে উপহাস কচ্ছ সে অর্ঘ্যকে অপমান করূচ! তোমরা বল্‌তে চাও লালসাই ধর্ম্ম—উচ্ছৃঙ্খলতাই স্বাধীনতা আর পবিত্রতা সাধুতা সংযমকে উপহাস করাই—শ্রেষ্ঠ শিল্পির কাজ! দুপাতা ইংরেজী পড়ে এই মনে ঠাউরেছ? নিজেদের ভোগসুখ-পরায়ণ চিত্তের মাপকাটিতে তার বিচার করূচ।

আমি। কিন্তু আমার এখানে একটা বিশেষ প্রশ্ন আছে, সতীত্বটা কি নারীত্বের চেয়ে বড়?

গিরীশবাবু। সতীত্ব ছাড়া পরিপূর্ণ নারীত্বের কোনও idea হ'তে পারে না। দেখ এমন কি St. Paulও ব'লেছেন যে

"Wives, submit yourselves unto your husbands, as unto the Lord.

"For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the Church and he is the Saviour of the body. Therefore as the Church is subject unto Christ so let the wives be to their husbands in everything"

নর ও নারী সম্বন্ধে সেণ্ট পল আরও বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন

"But I would have you know that the head of everyman is Christ and the head of the woman is man and the head of Christ is God.

"For the man is not of the woman but the woman of the man.

"Neither was the man created for the woman; but the woman for the man."

আমি। কিন্তু সেণ্ট পলের কথা, বাইবেলের কথা, বেদের কথা—এই সকলের এখন একটা ঐতিহাসিক দিকের মূল্য আছে বটে কিন্তু বর্ত্তমান সমাজতত্ত্বে বিশেষ কোনও স্থান নাই। হাজার হাজার বছর ধ'রে নর নারীর কত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়েছে। তার চারিপাশের আবেষ্টন জল বায়ু নানা গোত্রের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ—প্রতিদিন পৃথিবীর কত নব নব আবিষ্কার কত আবর্ত্তন বিবর্ত্তন, কত শিল্পে ব্যবসায়ে কত নব নব সংযোজন সংমিশ্রণে—নূতন মানুষের সৃষ্টি হচ্চে—তা কি একটা বাঁধাধরা নিয়মের ভিতর একটা সতীধর্ম্মের ভিতর সমগ্র নারীজাতি আবদ্ধ থাক্‌বে—সমাজ বিজ্ঞানও তা বলে না।

গিরীশবাবু। যদি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখ্‌তে চাও তবে যেমনটী দেখ্‌চো তেমনটী বলো। নর ও নারীর দেহের গঠনে, মানসিক ভাবে ও শ্রমশীলতায় কত প্রভেদ। একটী

পূর্ণাবয়ব নর ও নারী এক সঙ্গে দেখ্‌লে দেখতে পাবে দুটীর আকারে কত পার্থক্য। একজনের দৃঢ় পেশী সমন্বিত বলিষ্ঠ বাহু—গুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল—সুবিশাল বক্ষঃস্থল ; আর নারীমূর্ত্তি—সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের ঢল ঢল মূর্ত্তি, পীনোন্নত পয়োধরা কুসুমপেলব দেহ—লাজনত চঞ্চল দৃষ্টি একজন জীব জগতের জনক, অপরা জীবকুলের জননী। এই পার্থক্য ভুল্‌লে ত চল্‌বে না।

মনস্তত্ত্বে দেখ—নারী প্রেমের মূর্ত্তি। কিন্তু এই প্রেমশতদল বিকসিত হয় নরনারীর পরস্পরের সংস্পর্শে। প্রেমের স্বরূপ মূর্ত্তি পরম পবিত্রতা। প্রেম স্পর্শমণি, নরত্বকে দেবত্ব দান করে। এই প্রেমের ভিত্তির উপর পতিপত্নীর সম্বন্ধ স্থাপিত কর্‌তে প্রাচীন ঋষিরা প্রয়াস ক'রেছিলেন। তুমি যতই কেন এই প্রেমকে অবজ্ঞাত ক'রে স্বাধীনতার জয়গান কর কিন্তু মানবপ্রকৃতি তা শুন্‌বে না। প্রেমের মূর্ত্তিই একনিষ্ঠ। যখন নারীর মধ্যে প্রকাশ পায় তখন সে সতী, যখন জননীর মধ্যে প্রকাশ পায় তখন মাতা—যখন সন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় তখন দুহিতা। যখন দেশের ভিতর প্রকাশ পায় তখন স্বদেশ-প্রেম। আর যখন ভগবানের ধ্যানে জাগে তখন তাই ভগবদ্‌প্রেম। প্রেমই ভগবদ্‌বিগ্রহ। অসংযমী উচ্ছৃঙ্খল পতিত পতিতার মধ্যে যখন এই প্রেমের আর্বিভাব হয় তখন সে আর পতিত বা পতিতা থাকে না তখন সে উচ্ছৃঙ্খল বা অসংযমী থাকে না।

আমি। কিন্তু এই দেবত্ব বিকাশ হবার সুযোগ দেওয়া ত চাই।

গিরীশবাবু। নিশ্চয়ই জেন যে-কোনও বিধানই হউক যদি দেবত্বের পথে বাধা দেয় তবে তৎক্ষণাৎ তা দূর কর্‌তে হবে। আমি নিজে কোনও আইন কানুন মানিনা কি মেনে চলিনা। সুতরাং আইন কানুন রাখ্‌তে বা ভাঙ্‌তে বল্‌চি না। আমি বল্‌চি পবিত্রতা সংযম একনিষ্ঠ প্রেম—চিরকাল পূজা পাচ্ছে আর পরেও পাবে। কেননা এটাই শাশ্বত। ওথেলোর ডেসডেমনা চরিত্র কেন আমাদের মুগ্ধ করে? কারণ এই সতীধর্ম্ম। এই একনিষ্ঠ প্রেম—যে কোনও সাহিত্যে যে কোনও চরিত্রে এই একনিষ্ঠ প্রেমসাধনার ছাপ থাকে তাই লোককে আকর্ষণ করে, মুগ্ধ করে, নত করে। ভারত এই আদর্শের সাধক।

আমি। মশায় যদি আমাদের সবই ভাল তবে আজ আমাদের এত অধঃপতন কেন?

গিরীশ বাবু। অধঃপতন কেন? ধর্ম্মহীন হয়েছ ব'লে। উচ্চ আদর্শকে পদদলিত করেছ ব'লে—দৃঢ়তা অসংযমের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দিয়েছ ব'লে। অনুকরণ ক'রে কোনও জাত বড় হয় না। যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত লোভী শঠ, কপট হ'ল—ত্যাগীর পরিবর্ত্তে ভোগী হ'ল, তখন মুসলমান সিন্ধুনদ পার হ'তে সক্ষম হ'য়েছিল। রাজা যখন রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ভোগবিলাসী হ'ল, পররাজ্যলোলুপ হ'ল, পরস্বাপহরণ পরদ্রব্য লুণ্ঠন যখন তার রাজধর্ম্ম হ'ল—তখন সিন্ধুনদ পার হ'য়ে বিদেশী রাজশক্তি ভারতবিজয় করতে সক্ষম হ'ল। যখন জনসাধারণ সেই বিধর্ম্মী ব্রাহ্মণ পুরোহিত, রাজধর্ম্মভ্রষ্ট নৈতিক চরিত্রহীন রাজগণের বিলাসলীলা ও রুদ্রমূর্ত্তি

দেখ্‌লে—তখন তারাও সঙ্কুচিত ও ধর্ম্মচ্যুত হ'ল—তাই বিদেশী অধিকার এই ভারতে সম্ভব হ'য়েছিল। পরশ্রীকাতর ও অর্থলোলুপ হ'য়ে ভারতবাসী মোগল পাঠান ও ইংরাজকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। শুধু বাহুবলে ভারতবিজয় ও অধিকার করা কোনও বৈদেশিক রাজশক্তির সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি বল এ সব হ'ল কেন? কাল প্রভাবে!

আমি। কালপ্রভাবে কি রকম?

গিরীশ বাবু। এমনিই ক'রে পুরাতন ঝ'রে শুকিয়ে পড়ে—আবার নূতন পত্রের উদ্গম হয়। পুরাতন ও নবীনের এই খেলা অবিরত চ'লেছে। জগৎটাই অস্থির—তার কোনটা স্থির থাক্‌বে বল? আজ যা সুদৃঢ় অটল বিপুলায়তন দেখ্‌চ—কাল তাও ভেঙ্গে পড়্‌বে।

আমি। তবে কি কালধর্ম্মের দোহাই দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকবো—অধঃপতনের হেতুর কোনও সন্ধান কর্‌বো না।

গিরীশ বাবু। বিচার অবশ্যই কর্‌বে। আমার বল্‌বার উদ্দেশ্য যে আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি—সব হারিয়েছি, কিন্তু তাই ব'লে হতাশ হবার কিছু নেই। কালচক্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল।

আমি। আপনি নারীজাতিকে একটু conservative stand piont থেকে দেখ্‌ছেন।

গিরীশ বাবু। কেন? আজ যাকে আধুনিক বল্‌ছ, কাল তা পুরাতন হবে। কিন্তু সত্য-চিরন্তন।

আমি। কালের অপ্রতিহত গতি চলেছে—দিন দিন পৃথিবী কত দ্রুততর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে হচ্চে—আর আমাদের সেই মামুলী হাজার বছরের পুরাণো চাল বজায় রেখে চল্‌বো—এটা মনে লাগে না।

গিরীশ বাবু। কি মনে লাগে? স্ত্রীলোক ride কর্‌বে, বক্তৃতা কর্‌বে, পার্লেমেন্টের সভ্য হবে, স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা কর্‌বে আর মেম সাহেব সেজে নৃত্যগীত কর্‌বে তা হ'লেই নারীত্বের বিকাশ হ'ল? Free love কর্‌বে—তা হ'লে সে সীতা সাবিত্রীর চেয়ে বড় হ'ল—তা' হ'লেই জাত বড় হ'য়ে গেল।

আমি। না—তা নয় modern scientific training পাওয়া উচিত।

গিরীশবাবু। (হাসিয়া) এই!—তা কে বারণ কর্‌ছে—কন্যাকে সুশিক্ষা প্রদান কর স্ত্রী বিদুষী হোক্—ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিতা হোক্—তা কে বারণ কর্‌চে? পুরুষও পাশ্চত্য বিজ্ঞান শিখুক। আমি বুড়ো বয়সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সায়েন্স এসো-সিয়াসনে দৌড়েছি! বিদ্যালাভে কি জ্ঞানলাভে শক্তি সঞ্চয় হয়। কিন্তু জাতীয় আদর্শ ঠিক রেখ।

আমি। মশায় স্বামিজী বলেছেন এখন আন্তর্জাতিক যুগ। এখন সংকীর্ণ জাতীয়-ভাবকে বলি দিতে হবে।

গিরীশবাবু। স্বামিজী কখনও জাতীয় ভাবকে বলি দিতে বলেন নি। ওটা তুমি বল্‌চো।

আমি। আজ্ঞে হাঁ।

গিরীশবাবু। যা শাশ্বত সনাতন তাই আন্তর্জাতিক—বিশ্বজগতের সম্পত্তি।—ভারতের নারীর আদর্শ—ঋষির আদর্শ—শাশ্বত। এই আদর্শের বিস্তার ভাবী সভ্যতার বীজ। ভারত-বাসীর উপরই তার প্রচার তার বিকাশ নির্ভর করে।

আমি। তবে কি সংস্কারের কোনও প্রয়োজন নাই?

গিরীশবাবু। নেই—কে বল্লে?—এই যে হাজার বছরের আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হয়েছে তা পরিষ্কার করতে হবে না? বিদেশীর বিজাতীয় অনুকরণে যে সব দোষ ঘটেচে তা দূর করতে হবে না?—ভারতের প্রাচীন আদর্শ ও দার্শনিক তত্ত্বকে সাধারণ জীবনে পরিণত করতে হবে না? বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চভাব সংস্কার আর বিজ্ঞানকে আমাদের জাতীয় জীবনে সংযুক্ত করতে হবে না?—এই সব চাই—কিন্তু নিজের খুঁটি—জাতীয় মেরুদণ্ডকে হারিও না।

আমি। আচ্ছা মশায়—আপনি "শাস্তি কি শান্তি"তে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে লিখেছেন এরূপ অনেকে বলে।

গিরীশবাবু। কে বল্‌লে? তুমি পড়নি?—আমি দেশের সম্মুখে শুধু তিনটী আদর্শ স্থাপিত ক'রে problem solve করবার জন্য সাধরণের বিবেচনাধীনে রেখেছি।—আমি স্বপক্ষে বা বিপক্ষে লিখিনি।

আমি। কিন্তু আপনি বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

গিরীশবাবু। দেখ সংযম ব্রহ্মচর্য্যকে তো আমি হীন করে আঁকতে পারবো না। সে যে ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষত্ব।—স্বামী বিবেকানন্দ তাই দেশবাসীকে এই ব্রহ্মচর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে ব'লেছেন।—তবে যারা এই আদর্শ পালনে অক্ষম, সমাজ তার ব্যবস্থা শীঘ্র না করলে অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হবে—তাই বলেছি। নাট্যকার শিল্পি শুধু ছবি আঁকে—নিজের নিজত্ব উড়িয়ে দিয়ে।

আমি। আপনি এখন যা বল্‌লেন তা আমাদের সমাজের—গোঁড়া পণ্ডিতেরা মানবেন না।

গিরীশবাবু। তুমি "মায়াবসানে" রঙ্গিনীর চরিত্র পড়েছ? তাতে তো আমি চিরকুমারী সুশিক্ষিতা নারীর আদর্শ দেখিয়েছি। মনে রেখ সে একটা দাসীর মেয়ে। নীচ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ স্বামী থাকলে স্ত্রীর উন্নতির উপায় কি ক'রে হ'তে পারে তা হরমণির চরিত্রে দেখিয়েছি? জোবিকেও তো পড়েছ? সমাজে সংস্কারের প্রয়োজন তা আমিও বলেছি। সে সংস্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত বিশাল হৃদয়ের বিরাট সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই—শুধু ইংরেজি আদর্শে অনু-প্রাণিত হ'য়ে নয়—বিচার বুদ্ধির সহিত ভারতীয় আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আবর্জ্জনা দূর করতে হবে। আমাদের দেশে যুগে যুগে তাই মহাপুরুষদের আবির্ভাব হয়—তাঁরাই

পন্থা নির্দ্দেশ ক'রে যান। স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রীজাতির অধিকার শিক্ষা সম্বন্ধে যে সংস্কার প্রয়োজনের নির্দ্দেশ ক'রেছেন তাই আমাদের আদর্শ ক'রে সংস্কার কর্‌তে হবে। উল্‌টো পথে গেলে হবেনা!

আমি। কিন্তু বস্তির ভিতর পতিতাদের ভিতর যে নারীশক্তি আছে তাও তো উপেক্ষা কর্‌লে চল্‌বে না। আমাদের জাতীয়তার উদ্বোধন কর্‌তে হ'লে, তাদের নারীত্বকেও জাগানো দরকার।

গিরীশবাবু। দেখ—প্রকৃত সাধুচিন্তা যদি কর্‌তে পার তবে সে চিন্তারাশি বিশ্বের রেণুতে রেণুতে মিশিয়ে যায়। বস্তিতে বা গ্রামের পর্ণকুটীরে গরীব নরনারী বাস করে। তারা সবাই দুশ্চরিত্রা নয়। জাতির যথার্থ জীবন দরিদ্রের পর্ণ কুটীরে—অবজ্ঞাত বস্তীর ভিতরে দেখ্‌তে পাবে। প্রেম মানুষকে দেবতা করে—পিশাচীকে দেবী করে—এ তো পুরাণো কথা। কিন্তু আমার জীবনে একবার আমি এক পতিতা নারীর হাতে মার খেয়েছিলাম।

আমি। কেমন করে?

গিরীশ বাবু। একদিন দেখ্‌লাম এক জায়গায় মহাগোলমাল—একটা পুরুষ তার উপপত্নীকে ধ'রে বেদম প্রহার কর্‌চে। স্ত্রীলোক আর্ত্তনাদ ক'রে চীৎকার কর্‌চে। আমি তাই দেখে যাই পুরুষটাকে ধরে মার লাগিয়েছি—বেটীটা অমনি ছুটে এসে ঝাঁটাপেটা কর্‌তে এলো! দু এক ঘা ঝাঁটা বোধ হয় পিঠেও পড়েছিল। মানুষের চরিত্র এত বিচিত্র এত জটিল যে একটা কোনও বাঁধা-ধরা নিয়মের গণ্ডীর ভিতর তাকে আবদ্ধ করা যায় না। উচ্চ আদর্শ উচ্চ-চিন্তা সর্ব্বত্রে ছড়িয়ে দিতে হয়—তাতেই মানবের যথার্থ হিত সাধিত হয়।

এইসব আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়া গেল, আমরা বিদায় লইলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন।

শরৎচন্দ্রের প্রতি—

এ বঙ্গের রবি-রাজ্যে শরচ্চন্দ্র গাহি তব জয়,
রবির প্রখর দ্যুতি তব অঙ্গে স্নিগ্ধ সুধাময়,
বৃহস্পতি বঙ্কিমের শিষ্যোত্তম, চিত্ত-রাকা-নাথ,
কাব্যলক্ষ্মী-সহোদর,—চকোরের লহ প্রণিপাত।

যেই জনসিন্ধুগর্ভে পারিজাত-কল্পতরু-তলে
তপস্যা করিলে তুমি, আজি তাহা উল্লাসে উচ্ছলে,

উল্লোল,—উদ্বেল রঙ্গে তরঙ্গেরা জোয়ারী উৎসবে
তব 'মরীচির মাল্য শীর্ষে ধরি' সাফল্য-গৌরবে।
তোমার চন্দ্রিকাপাতে এ বঙ্গের প্রান্তর কান্তার
পথ ঘাট গোষ্ঠ কুঞ্জ হারাইয়া দৈন্যের আঁধার
কলধৌত-দ্রব-ধৌত। পীনোচ্ছলা শুভ্রা সালঙ্কারা
শীর্ণা ভাব-তরঙ্গিণী। রসলক্ষ্মী, যশশ্চন্দ্রহারা।
চন্দ্রমল্লী-কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জ-রত অতন্দ্র মধুপ,
বঙ্গের কুটীর গুলি ধরিয়াছে নৈবেদ্যের রূপ।
জীর্ণ তরী ধরিয়াছে লীলারত রাজহংস-বেশ,
নয়নে,—গগনে—আজি 'তারকায়' পড়েনা নিমেষ।

বিকচ কুমুদ লক্ষ বঙ্গপল্লী-তড়াগে তড়াগে,
তব যশোমরীচিরে বন্দে তারা সুরভি পরাগে।
বিগলিত প্রীতিরসে কবিচিত্ত-চন্দ্রকান্ত-মণি,
যাহা কিছু নিঃস্ব রিক্ত আজি তব 'কলা'-শ্রীতে ধনী,
যাহা কিছু অনাদৃত জীর্ণ হেয় মলিন পঙ্কিল,
তোমার মাধুরী রঙ্গে আজি সবি মোহন রঙ্গিল।

* * *

মাঝে মাঝে জাগে মেঘ লয়ে তার গর্জ্জন নিষ্ফল,
শরতেরই মেঘ সে ত লজ্জাপাণ্ডু নিঃসার নির্জ্জল।

* * *

কল্পতরুজাত হেম-চম্পাকলি তোমার অঙ্গুলি,
দক্ষিণ পাণিতে, তা'রা সুদক্ষিণা রসময়ী তুলী,
যে চিত্র এঁকেছে শিল্পি, প্রাণহীন মানচিত্র নয়,
সমগ্র এ বঙ্গ তাহে সঞ্জীবিত বর্ণরেখাময়।

বঙ্গ-সমাজের গিরিপঞ্জরের চিররুদ্ধ ব্যথা,
তোমারি লেখনী-উৎসে উৎসারিতা, তরঙ্গে বিততা,
মসীর তমসাধারা, যার তীরে 'গীত' রামায়ণ
যুগেযুগে, রত্নাকর লভে যথা নবীন জীবন।

গোময়ের দূর্ব্বাদল, ঝ'রে-পড়া সেফালি বকুল,
গোয়ালের চালভরা পুঁইলতা, ফাটলের ফুল,
প্রান্তরের চোরকাঁটা, অপামার্গ, আকন্দ, ধুতুরা
পেলব অলাবুলতা বিল্ববৃক্ষে কণ্টকবিধুরা,

সৌখীন টবের চারা, পরগাছা, স্রোতের শৈবাল
শ্মশানের কুকসিমা, পঙ্কমগ্ন অনিন্দ্য মৃণাল,
বিশাল পাষাণতলে চিরপাণ্ডু লাঞ্ছিত অঙ্কুর
বজ্রদীর্ণ ঝঞ্ঝাহত বনস্পতি, মরুর খর্জ্জুর,—
জানোনাক কার ব্যথা, মর্ম্মকথা, প্রাণের 'হদিস' ?
সাহিত্যের কল্পবনে বিজ্ঞানজ্ঞ তুমি 'জগদীশ'।

নারীত্বের গূঢ় ব্যথা—মূঢ় ব্যথা—মাতৃত্বের ব্যথা—
প্রফুল্ল সাফল্য লাগি মুকুলের মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
নারীর জীবনে রচে কি বিচিত্র রূপ রূপান্তর
জানো সবি, তাই তুমি মূকদেশে 'দরদে' মুখর।
মানবার আদিধর্ম্মে সত্য বলি' করি' অঙ্গীকার
মূঢ় যারা দেয় তারা মাতৃধর্ম্মে সহস্র ধিক্কার
গতানুগতিক স্রোতে, সত্যব্রত, থাকনিক' সহি'
গড্ডালিকা-ধারা, তাই বলে তোমা সমাজবিদ্রোহী।

ঘরে ঘরে দুঃশাসন, জয়দ্রথ, কীচক, রাবণ,
অবোলা অবলাগণে যুগে যুগে করে নির্য্যাতন।
স্বার্থলুব্ধ সমাজের সংস্কারের অন্ধ-কারাগারে
কাঁদে নারী, 'রক্ত-শোক'তরুতলে চেড়ীর প্রহারে
সীতাসম, 'রক্তাশোক' বলি' মোরা তাহারে রটাই,
সতীত্বের আত্মোৎসর্গ বলি' তারে করিয়া বড়াই।

নারীর নাড়ীর ব্যথা জানো তুমি মনোলোকচারী
অন্তঃপুর দ্বারে তোমা প্রতিরোধ করে কোন্ দ্বারী ?
'কঞ্চুকী' 'ভিষক'সম দেহে মনে নারীত্বের পীড়া
জানো তুমি, অবলার প্রতি অস্থি প্রতি স্নায়ুশিরা
জানায়েছে কত ব্যথা কত বার্ত্তা কানে কানে কহি',
ব্যথা তায় পাও কবি, তাই তুমি সমাজবিদ্রোহী।

অক্ষৌহিণী সহ নিত্য একা তুমি যুঝিতেছ বীর,
লভেছ পার্থের বর্ম্ম—ক্ষত্রধর্ম্ম—মর্ম্ম জাবালির।
অসত্য বরাহ সম ছুটে আগে, তুমি পাছে পাছে
ধাও নব 'ঋতধ্বজ',—খুঁজে ঠাঁই কোথা গিয়া বাঁচে,
রাষ্ট্রশাসনের কক্ষ—শস্ত্রাগার—বধ্যের মশান,
সমাজ, সংসার, ধর্ম্ম, মন্ত্রপড়া দাম্পত্যের ভান

শ্রমিকের কারাগার,—ধনিকের ঘৃণিত সম্পদ,
দেবালয়, তীর্থ, মঠ, ভূস্বামীর স্তাবকসংসদ্‌,
অন্ধ জাতিকুলগর্ব্ব,—সতীত্বের মিথ্যা অভিনয়,
তুলোট পুঁথির স্তূপ,—যেথা যেথা লভে সে আশ্রয়
সর্ব্বব্যূহ ভেদ করি' সেথা সেথা কর অভিযান
ত্রাণ পেয়ে সত্য গাহে প্রাণ ভরি' তব জয়গান।

আঙ্গিরস-চতুষ্পাঠী—কুবেরের স্বপ্ন অলকায়,
স্বরিন্দ্রের অন্তঃপুরে—অপ্সরার বিলাসসভায়
কতটা নরক আছে প্রবঞ্চিয়া স্বর্গে ছদ্মবেশে,
তুমি দেখায়েছ তাহা লেখনীর শাণিত বিশ্লেষে।

আবার নরকে বন্দী—রসাতলে দৈত্যের শাসনে,
মর্ত্ত্যতলে অবজ্ঞাত, চণ্ডালের কুটীরপ্রাঙ্গণে,
মূঢ়তার রূঢ়তায়—পতিতার পণ্যশালাতলে,
দারিদ্র্যের গূঢ়তায়, লক্ষ্মীছাড়া অভাগ্যের দলে
অখ্যাত অজ্ঞাতবাসে—অবজ্ঞায় গুপ্ত ম্রিয়মান
কতটা যে স্বর্গে আছে,—তুমি তার দিয়েছ সন্ধান।

সুদিনের প্রতীক্ষায় সত্য কোথা সহিছে লাঞ্ছনা,
জ্ঞান কোথা গুহা মাঝে করিতেছে তপস্যাসাধনা,
লোকাচার কারাগারে ধর্ম্ম কোথা বন্দী হয়ে আছে,
অত্যাচারে সত্যাচার কোথা ভয়ে লুকাইয়া বাঁচে,
দুর্নীতিপূতনা কোথা জননীর করে অভিনয়,
হেমমৃগ, ক্ষেমমৃগে প্রেমমৃগে করে কোথা জয়,
স্বার্থ-সূর্পণখা কোথা লালসার মরীচিকা প্রায়
ব্রহ্মচারী রামানুজে কামানুগ করিবারে চায়,
তুমি জানো ধ্যানবলে জ্ঞাননেত্রে সবার সন্ধান,
মুহুর্ম্মুহুঃ দেখায়েছ মায়াজালে কোথা পরিত্রাণ ?

ভাগ্যে তুমি আসো নাই—ঋষি সেজে—সেজে অবতার,
গুরু, বক্তা, প্রচারক, পঙ্গুদেশ করিতে সংস্কার
তাহা হলে দূর হ'তে দিয়ে তোমা দেবের মর্য্যাদা,
কৃতাঞ্জলি রহি নিত্য করিতাম কর্ত্তব্য সমাধা।
ভাগ্যে তুমি সখাবেশে—সাথীরূপে হইয়া 'কথক'
আসিয়াছ জনারণ্যে, ভাগ্যে তোমা চেনেনাক' লোক,

লোকগুরু বলি' তাই বক্ষে তোমা পাই বাহুপাশে,
কভু যাইনিক সরি' ভক্তি কিংবা বিস্ময়ে বা ত্রাসে,
অজ্ঞাতে তোমার ব্রত আমাদেরো হইয়াছে তাই,
তব সাধনার ফল সাথে রহি হাতে হাতে পাই।
আগায়েছি বহুদূর—লভি' আশা আশ্বাস ব্যথায়,—
দীর্ঘপথে টানো তুমি ভুলাইয়া কথায় কথায়।

শ্রীকালিদাস রায়

কাশীরাম দাসের সুভদ্রা-হরণ ও মূল মহাভারত

মহানুভব কাশীরাম দাসের সুভদ্রা-হরণ উপাখ্যান আধুনিক একখানি উপন্যাসের মত নায়ক নায়িকার প্রেমবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কিংবা প্রথম দর্শনেই নায়িকার এমন প্রেমবিহ্বলতা বুঝি বা উপন্যাসেও বিরল।

দ্রৌপদী সম্বন্ধে নারদনিয়ম ভঙ্গ জন্য অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসর বনচারী হন। সেই সময় তিনি বহু তীর্থপর্য্যটন করিয়া দ্বারকায় গমন করেন। তৎকালে রৈবতক পর্ব্বতে যাদবগণের এক মহোৎসব হইতেছিল। উৎসব দর্শনোৎসুক অর্জ্জুনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই বালা সুভদ্রা একেবারে মুগ্ধা, অভিভূতা ও আত্মহারা হইয়া গেলেন।

"অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত॥"

সহচারিণী মহিলাগণ অন্যত্র গমন করিতেছেন, সুভদ্রা একাকিনী একস্থানে উপবেশন করিয়া অর্জ্জুনের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। সত্যভামা দেবীর বড় আদরের এই সুভদ্রা, তিনি ভদ্রাকে অনুক্ষণ চোখে চোখে রাখিতেন। আজ সহসা তাহার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া তিনি সুভদ্রাকে অন্যত্র লইয়া যাইবার জন্য ডাকিতেছেন। তাহার উত্তরে

"সুভদ্রা বলিল, "দেবি, ধরি মোরে লহ।
কণ্টক ফুটিল পায়, বাহির করহ॥"

ঠিক যেন দুষ্মন্ত-দর্শনে শকুন্তলার চিত্র

দর্ভাঙ্কুরেণ চরণঃ ক্ষত ইত্যকাণ্ডে
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা।
আসিদ্বিবৃত্তবদনা চ বিমোচয়ন্তী
শাখাসু বল্কলমসক্তমপি দ্রুমাণাম্॥

কৃশাঙ্গী শকুন্তলা প্রকৃতপক্ষে না ঘটিলেও দুই এক পদ অগ্রসর হইয়া 'কুশাঙ্কুরে চরণতল ক্ষত হইয়াছে' এই বলিয়া অকারণে দণ্ডায়মান হইলেন এবং বৃক্ষশাখায় বল্কল আসক্ত না হইলেও মুখ ফিরাইয়া (রাজা দুষ্মন্তের দিকে তাকাইয়া) যেন তাহাই মোচন করিতে লাগিলেন।

সুভদ্রার পদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে

"শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে॥"

সত্যভামা তখন এরূপ ভাণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুভদ্রা জবাব দিতেছে

"অর্জ্জুনের নয়ন-চাহনি তীক্ষ্ণশর।
ভেদিলেক মর্ম্ম মোর কৈল জরজর॥
দেখ মোর অঙ্গতাপ ঘন কম্পমান।
ছটফট্ করে তনু বাহিরায় প্রাণ॥"

যেন একটু উৎকট রকমের প্রেমব্যক্তি। সত্যভামা দেবী ভদ্রার বাড়াবাড়ি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "তোমা অপেক্ষা নির্লজ্জ আমি দেখিতে পাই না। তোমার জন্য নির্ম্মল কুলে কালি পড়িবে, আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি।

"কি অন্য অনূঢ়া কন্যা নাহি রাজকুলে।
পরপুরুষ দেখিয়া কাহার মন ভুলে॥"

সত্যভামা গালিও দিলেন, আবার নানারূপে তাহাকে প্রবোধও দিতে লাগিলেন। 'এ সব কি ব্যাপার? অর্জ্জুন শুনিলেই বা কি মনে করিবে?' ভদ্রা কোন সৎপরামর্শে কান দিল না, বলিয়া ফেলিল

'আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥"

সত্যভামা ফাঁপড়ে পড়িলেন। তখন সব কথা কৃষ্ণকে বলিয়া তাঁর অনুমতি লইয়া অর্দ্ধরাত্রে সুভদ্রাকে সঙ্গে করিয়া অর্জ্জুনের বাসগৃহে উপস্থিত হইলেন। একদিকে সর্ব্বলোকললামভূতা কৃষ্ণপ্রেয়সী দেবী সত্যভামা, যাঁর কথায় কৃষ্ণ উঠেন বসেন, যাঁর মত আধিপত্য কৃষ্ণের উপর আর কোন মহিষীই করিতে পারেন নাই—অন্যদিকে মহাভারতের শ্রেষ্ঠচরিত্র অর্জ্জুন। ইহাঁদের কথাবার্ত্তা কিরূপ হইল দেখা যাক।

সত্যভামা বলিতে লাগিলেন, 'তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমার নিদ্রা হইল না।

"তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥"

পঞ্চভ্রাতার এক স্ত্রী, সেই স্ত্রীর জন্য দ্বাদশ বৎসর বনবাস। যেমনি দুঃখের কথা, তেমনি লজ্জার কথা। আমি তোমার জন্য চমৎকার এক কন্যা আনিয়াছি, তুমি এক্ষণেই ইহাকে বিবাহ কর।'

অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন, আপত্তি করিয়া বলিলেন, "দেবি, যদুকুলপতি কৃষ্ণ-বলভদ্রের অজ্ঞাতে যাদবকন্যা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা কি মনে করিবেন?"

সত্যভামা অপমানিত বোধ করিলেন, ক্রুদ্ধ হইলেন।

"দেবী বলিলেন ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি গাছ।
তিল এক পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ।
যে লোভে নারদ বাক্য করিলে হেলন—"

সব বুঝিয়াছি। অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "আপনার মুখে দ্রৌপদীর নিন্দা শোভা পায় না। কারণ

"ত্রিজগৎজনে খ্যাত তব মহৌষধি।
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান॥"

এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডার পর সত্যভামা ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় বহু চেষ্টা করিয়া, অনেক হাঙ্গামা করিয়া, কামপ্রিয়া রতিদেবীর মন্ত্রে অর্জ্জুনকে বশীভূত করিয়া তাঁহার সহিত সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব বিবাহ দিলেন।

অনন্তর সুভদ্রা-হরণ, তদুপলক্ষে যদুবীরগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও সুভদ্রার সারথ্য।

"বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর।
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব বীরগণ।
মূর্চ্ছা হইয়া রথেতে পড়িল সর্ব্বজন॥"

যাদবগণের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের জয়লাভ, এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণ ও বলরামের কথা এবং সাত্যকিকে প্রেরণ

"আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥"

পরিশেষে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার যথারীতি বিবাহ ও উভয়ের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন।

ইহার মধ্যে আর এক ঘটনা দুর্য্যোধনকে লইয়া। এক্ষেত্রে রুক্মিণী-হরণ ব্যাপারে শিশুপালের দশা দুর্য্যোধনেরও ঘটিল। হলধরের নিমন্ত্রণে সুভদ্রার পাণিগ্রহণার্থ মহারাজা দুর্য্যোধন একেবারে টোপর মাথায় দিয়া আসিতেছিলেন এবং কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনীপতি হইবেন ভাবিয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে পথিমধ্যে অর্জ্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া 'মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া'। পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপ ও বিদুর সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "অর্জ্জুনকে এবার আর ছাড়িব না

"এক্ষণে মারিব দেখ কে রাখে পাণ্ডবে।
কর্ণ বলে, 'মহারাজ, বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি॥"

দুর্য্যোধন তন্মুহূর্ত্তে আজ্ঞা দিলেন, অমনি কর্ণ ধাবিত হইলেন। কিন্তু পথে এক প্রতিবন্ধক। অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে ভীমসেন দ্বারাবতী আসিতেছিলেন। দুর্য্যোধনাদির আস্ফালন তাঁহার কর্ণগোচর হইল; তিনিও চক্ষু লোহিতবর্ণ করিয়া দম্ভভরে চীৎকার করিয়া কর্ণকে কহিলেন,

"মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থ সহ তুমি কর গিয়া রণ॥"

মহাগণ্ডগোল। ইহাঁদের কথায় কথায় জীবন মরণের খেলা। তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। একটু অগ্রসর হইলেই সাত্যকির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি কৃষ্ণ-বলদেব কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে মিষ্টকথায় সন্তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তাঁর মুখে সমস্ত ঘটনা ভাল করিয়া শুনিয়া

"দুর্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥"

মূল মহাভারতে এই পল্লবপুষ্পশোভিত সুচারু আখ্যানভাগের কিছুই আমরা দেখিতে পাই না।

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মূল মহাভারত লক্ষশ্লোকাত্মক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গণেশ ঠাকুরের লিখিত গ্রন্থ কোথায় আছে কে জানে। যে মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদের ন্যায় ভারতবাসীর নিকট আদৃত ও পূজিত, তাহার ভিতরে কাল সহকারে নানারূপ অবান্তর জিনিস প্রবেশ করায়, প্রকৃত পাঠোদ্ধারকল্পে বিবিধ প্রদেশেই পণ্ডিতমণ্ডলী অশেষবিধ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলে এক প্রদেশের গ্রন্থের সহিত অন্যপ্রদেশ-প্রকাশিত মহাভারতের অল্পবিস্তর অনৈক্য লক্ষিত হয়। বম্বে সংস্করণে আশীহাজার শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু মদ্রদেশীয় পণ্ডিতগণ আরও কুড়ি হাজার শ্লোক মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। এদেশে 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ ও মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশিত মূলানুবাদ বম্বে সংস্করণের অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। কাশীরাম দাস ঠিক কোন্ সংস্করণ অবলম্বন করিয়াছেন বলা দুরূহ। তিনি এই সুভদ্রা-পরিণয় প্রসঙ্গে পারিজাত হরণ (পরিজাত বৃক্ষের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের যুদ্ধ) ও দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষণার স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা মূলের অনুসারে নহে।

পণ্ডিতবর কৃষ্ণাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্য সম্পাদিত সংস্করণ দক্ষিণ ভারতীয় পুঁথি অনুসারে "অনেকেষাং বিদুষাং সাহায্যেন দাক্ষিণাত্য বহুকোশানুসারেণ সংশোধ্য" মুদ্রিত। এই

মহাভারতে সুভদ্রা-হরণ ব্যাপার একটু অভিনবরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা মূল হইতে আখ্যান ভাগ আহরণ পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রদেশ-সম্পাদিত গ্রন্থমধ্যে একতা ও বৈষম্য লক্ষ্য করিতে চেষ্টিত হইব।

দ্রৌপদী সম্বন্ধে নারদনিয়ম* লঙ্ঘন করিয়া অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য বনচারী হইলেন। তিনি সমগ্র ভারত পর্য্যটন করিয়া বহু দর্শনযোগ্য স্থান, বন, উপবন, নদ, নদী, কানন, প্রান্তর, গিরি, নির্ঝরিণী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পশ্চিম সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া প্রভাসে গমন করিলেন। অর্জ্জুনাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দেখিতে প্রভাসে আসিলেন। এই সময়ে রৈবতক পর্ব্বতে যাদবগণের এক মহোৎসব হইতেছিল, কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লইয়া রৈবতকে গমন করিলেন। তাঁহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া উৎসবমত্ত যাদবগণের সহর্ষ মুখশ্রী দেখিয়া প্রীতি অনুভব করিলেন। একস্থানে সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা সখীগণপরিবৃতা সুভদ্রা অর্জ্জুনের নেত্রপথে পতিত হইলেন। সুভদ্রার লাবণ্যজড়িত দেহে নবযৌবনসুষমা ক্রীড়া করিতেছিল। রঙ্গময়ী ভদ্রাকে অবলোকন করিয়া পার্থ চঞ্চল হইলেন। ব্যাপারটা কৃষ্ণের অগোচর রহিল না। তিনি পরিহাস করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন

বনেচরস্য কিমিদং কামেনালোড্যতে মনঃ।

বনচারীর আবার এ চিত্তচাঞ্চল্য কেন? তৎপর সুভদ্রার পরিচয় প্রদান করিলেন, বসুদেবের কন্যা, আমার ভগিনী। অর্জ্জুনের মন যে ভদ্রার প্রতি আসক্ত ইহা তিনি অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন; বলিলেন,

যদি তে বর্ত্ততে বুদ্ধির্বক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্।

'যদি তোমার মন নিতান্তই ভদ্রার প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, আমাকে বল, আমি স্বয়ং পিতাকে একথা বলিব।' কথাটা কি ভাবে বসুদেবের কানে উঠে, আর তিনিই বা কোন্ ভাবে গ্রহণ করিবেন, চিন্তা করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই পিতাকে সব বলিয়া তাঁহার মত করিবেন, স্থির করিলেন। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন,

দুহিতা বসুদেবস্য বাসুদেবস্য চ স্বসা।
রূপেণ চৈষা সম্পন্না কমিবৈষা ন মোহয়েৎ॥

সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা, তোমার ভগিনী, তদুপরি আবার অলোকসামান্য শ্রীশালিনী, সুতরাং ইনি কাহার না মনোমোহিনী হইবেন? সুভদ্রা আমার মহিষী হইলে নিশ্চিতই আমার সর্ব্বকল্যাণ সংসাধিত হয়। সখে, কি উপায়ে আমি ইহাঁকে লাভ করিতে পারি বলিয়া দেও,

* "দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনানন্যোন্যং যোঽভিদর্শয়েৎ।
স নো দ্বাদশবর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ॥"

'আমাদিগের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকট অবস্থান করিবে, সেই সময়ে অপর কোন ভ্রাতা তথায় গমন করিলে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।'

আশ্বাস্যামি তদা সর্ব্বং যদি শক্যং নরেণ তৎ।

যদি মনুষ্যসাধ্য হয়, আমি সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করিতে চেষ্টিত হইব।

কৃষ্ণ তখন বলিতে লাগিলেন, "এই সুভদ্রা আমাদের সকলেরই বড় আদরের। আমাদের ইচ্ছা ভদ্রা স্বয়ম্বরা হউক, কারণ উহাই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়। কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তাহাতে অসুবিধা হইতে পারে

স চ সংশয়িত পার্থ স্বভাবস্য নিমিত্ততঃ।

স্ত্রীলোকের স্বভাবের কথা কিছুই বলা যায় না, সেইজন্য আমার সংশয় জন্মিতেছে। সুভদ্রা যদি স্বয়ম্বর সভায় তোমার কণ্ঠে মাল্যার্পণ না করে? বলপূর্ব্বক হরণ করা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। বহু বীর্য্যবান্ রাজা ও রাজকুমার স্বয়ম্বর সভা হইতে বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন।

"স ত্বমর্জ্জুন, কল্যাণীং প্রসহ্য ভগিনীং মম।

হর স্বয়ম্বরে হ্যস্যাঃ কো বৈ বেদ চিকীর্ষিতম্॥

অর্জ্জুন, তুমিও স্বয়ম্বর হইতে আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, কারণ তখন সে কাহার প্রতি অনুরাগবতী হইবে কে বলিবে?

ইহাই কৃষ্ণার্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ সম্বন্ধে পরামর্শ।

অর্জ্জুন শীঘ্রগামী দূত দ্বারা এ সম্বন্ধে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ব দুই বিবাহে—গঙ্গাদ্বারে উলূপী ও মণিপুরে চিত্রাঙ্গদা-পরিণয় সময়ে—অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞার অপেক্ষা করেন নাই। বলপূর্ব্বক কন্যা অপহরণ করিলে যাদবগণের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি যুধিষ্ঠির অমত করিলেন না। ভরসা কৃষ্ণের বুদ্ধিবল ও সহায়তা।

এই স্থান হইতে সুভদ্রা-পরিণয় পর্য্যন্ত 'কুম্ভকোনম' সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত করিব। কারণ অন্যান্য সংস্করণে এই অংশ নানা কারণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে অতিমানব ব্যাপার আছে; এবং ইহার সংযোজনায় গল্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা ভাবিবার কথা। কিন্তু ঘটনার পারম্পর্য্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিচার করিলে, কাশীরাম এই দাক্ষিণাত্য প্রচলিত মহাভারত হইতে যে তাঁহার আখ্যানবস্তু প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা অনুমান করিবার কারণ বিদ্যমান। তিনি ইহাই একটু কাটছাট্ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের গ্রহণযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ পরামর্শের পর যতিবেশধারী অর্জ্জুন দ্বারকার এক উপবনে যাইয়া বসিলেন। ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে যাদবগণ কেহই চিনিতে পারিলেন না, তাঁহাকে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মনে করিয়া তাঁহারা যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সেকালে সন্ন্যাসীর মান ছিল, রাজা রাজমুকুট দণ্ডাজিনধারী সন্ন্যাসীর পাদমূলে স্পর্শ করাইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। যাদবগণ সন্ন্যাসীর সহিত আলাপে তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা ও রুচির পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহার নিকট ধর্ম্মসম্মত কথা ও তীর্থাদির বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তখন কৃষ্ণ, বলরাম ও অন্যান্য যদুবীরগণ

পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এই যতিলিঙ্গধর দ্বিজ দেশাতিথি, ইহাঁকে কোথায় সুখে অবস্থান করিতে দেওয়া যায়। বলরাম বলিলেন,

আরামে তু বসেদ্ধীমাংশ্চতুরো বর্ষমাসকান্।
কন্যাগৃহে সুভদ্রায়া ভুক্ত্বা ভোজনমিচ্ছয়া॥
(মহাভারত, আঃ পঃ, অধ্যায় ২৪০। ২৪ শ্লোঃ।)

সুভদ্রার কন্যাগৃহে ইনি ভক্ষ্যভোজ্যাদি গ্রহণপূর্ব্বক সুখে বাস করুণ। কৃষ্ণ প্রথমটা আপত্তি করিলেন, সুভদ্রা অবিবাহিতা,

বলবান্ দর্শনীয়শ্চ বাগ্মী শ্রীমান্ বহুশ্রুতঃ।
কন্যাপুর সমীপে তু ন যুক্তমিতি মে মতিঃ॥ (ঐ। শ্লোঃ ২৬।)

বলবান, শোভনদর্শন, বাক্‌পটু, শ্রীমান্ ও নানাবিদ্যাপারদর্শী এই ব্যক্তিকে কন্যাগৃহে স্থান দান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ক্ষণকাল পরেই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু আপনার ন্যায় বিচার কাহার আছে? আপনি ধর্ম্মবিৎগণের শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, নেতা, গুরু ও জ্ঞানবান। শুভাশুভের জ্ঞান আপনার মত এ জগতে আর কাহারও নাই, সুতরাং আপনার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ করিব না।

গুরুঃ জ্ঞাস্তা চ নেতা চ শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
তয়োক্তং ন বিরুদ্ধেহং করিষ্যামি বচস্তব। (ঐ। শ্লোঃ ২৭)

তখন সুভদ্রাকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া যতিবেশধারী পার্থকে সুভদ্রার লতাগৃহে স্থান প্রদান করা হইল। অর্জ্জুন ভদ্রাকে চিনিয়াছিলেন, কিন্তু ভদ্রা অর্জ্জুনকে চিনিতেন না। তিনি গদের নিকট পাণ্ডবগণের উৎপত্তি ও প্রভাবের কথা শুনিয়াছিলেন। বজ্রের শব্দ শ্রবণ করিলেই কৃষ্ণ তাঁহাকে অর্জ্জুনের জ্যানির্ঘোষের সঙ্গে তুলনা করিয়া কত কথাই বলিতেন। যাদববীরগণের মধ্যে কলহ বাধিলে তাঁহারা কথায় কথায় অর্জ্জুনের বীরত্বের তুলনা দিতেন,

অর্জ্জুনোপি ন মে তুল্যঃ কুতস্ত্বমিতি চাব্রুবন্। (অ ২৪১। ২৪)

বৃষ্ণিবংশীয়গণ নবজাত শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতেন

অর্জ্জুনস্তু সমো বীর্য্যে ভবতাৎ ধনুর্দ্ধরঃ।

এ সকল সুভদ্রা প্রতিদিন শুনিতেন। আবার কেহ কুরুজাঙ্গলের সম্বন্ধে গল্প করিতেছে বুঝিতে পারিলেই

তং তমেব তদা ভদ্রা বীভৎসুং স্মহি পৃচ্ছতি। (২৪১। ২৮)

ভদ্রা তখনই তাহাকে অর্জ্জুন সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপে জমি প্রস্তুত হইয়াই ছিল।

শুদ্ধাচারিণী কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা সেই যতিকে নানা দিগ্‌দেশের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তিনি অমৃতময়ী ভাষায় কত কথাই বলিতেন। যিনি বলিতেন তাঁর বলিয়াই কত সুখ, আর যিনি শ্রোত্রী তাঁর হৃদয়সাগর উদ্বেলিত করিয়া সেই মধুর কথার ঝঙ্কারে সুখের

তরঙ্গ উঠিত। অর্জ্জুন সুভদ্রার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে দ্রৌপদীর সহিত তাঁহার তুলনা করিতেন, আর মনে হইত দ্রৌপদী সুন্দরী বটে, কিন্তু সুভদ্রা অতি সুন্দরী—

স কৃষ্ণাং দ্রৌপদীং মেনে ন রূপে ভদ্রয়া সমাম্। (২৪১।১৭)

তাঁহার কেবলই মনে হইত বরুণাত্মজা কিংবা ইন্দ্রসেনা স্বর্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অর্জ্জুন আর সুভদ্রা—যেন পরস্পরের জন্য হৃদয় তুলিয়া রাখিয়াছেন।

সুভদ্রা লোকপরম্পরায় অর্জ্জুনের যেরূপ আকৃতির বিষয় শ্রুত হইয়াছিলেন এই যতিবেশধারী ব্যক্তির সেইরূপ আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মন সংশয়ে পূর্ণ হইতে লাগিল। একদিন সুভদ্রা বলিলেন, যতিবর, আপনি ত বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন, খাণ্ডবপ্রস্থবাসিনী

কচ্চিদ্‌ভগবতা দৃষ্টা পৃথাঽস্মাকং পিতৃস্বসা। (২৪১।৩১)

তখন যুধিষ্ঠির কেমন আছেন, ভীম কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন ও কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন

কচ্চিৎশ্রুতো বা দৃষ্টো বা পার্থো ভগবতাঽর্জ্জুনঃ। (২৪১।৪১)

'আপনি কি অর্জ্জুনের সম্বন্ধে কিছু শুনিয়াছেন বা তাঁকে কখনও দেখিয়াছেন ?' পার্থ অতিমাত্র প্রীত হইয়া সকল কথার উত্তর প্রদান করিলেন, পরিশেষে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিলেন,

অর্জ্জুনোঽহমিতি প্রীতাস্তামুবাচ ধনঞ্জয়ঃ। (২৪১।৪৬)

শুভে, আমার প্রতি তোমার যেরূপ মনোভাব, তোমার প্রতিও আমার চিত্তবৃত্তি ঠিক সেইরূপ।

সত্যবানিব সাবিত্র্যা ভবিষ্যামি পতিস্তব। (২৪১ ৪৮)

অর্জ্জুনের মুখে এই কথা শুনিয়া ললিতা সুভদ্রা লজ্জায় আবৃতা হইলেন। তিনি মুখখানি নীচু করিয়া নিশ্চলবৎ একস্থানে বসিয়া রহিলেন, যতিপূজা বা তাঁহার ভোজনাদির কোন ব্যবস্থাই করিলেন না। কৃষ্ণ ত পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন, এক্ষণে রুক্মিণী দেবীকে পাঠাইয়া অর্জ্জুনের আহারাদির বন্দোবস্ত করাইয়া দিলেন।

'কৃশা, বিবর্ণবদনা, চিন্তাশোকপরায়ণা,' "মানসেন মনস্বিনী" ভদ্রা, আর কাশীরাম দাসের ভদ্রা—দেশকাল ভেদে কি মুগ্ধস্বভাবা বালা প্রখরভাষিণী হইয়াছে ? কাশীরামের গল্পে সত্যভামা এক অঙ্কে প্রধানা পরিচালিকা, এই দক্ষিণভারতধৃত মূলে সত্যভামা কোন কিছুর মধ্যেই নাই।

কৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী দেবী ব্যাপারটা শ্বাশুড়ীকে জানাইলেন, "যতিরূপধারী অর্জ্জুন সুভদ্রার লতাগৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন

তং বিদিত্বা সুভদ্রাপি লজ্জয়া পরিমোহিতা।
দিবানিশং শয়ানা সা নাকরোদ্‌ভোজনাদিকম্॥ (২৪১।৫৮)

তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া জানিতে পারিয়া ভদ্রা লজ্জায় আবৃতা হইয়াছে, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি শয়ন করিয়াই আছে।" এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাদেবী দৈবকী কন্যাকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া, কথাটা বসুদেবকে বলিলেন। তিনি 'অর্জ্জুনের সহিত ভদ্রার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' এই বিষয়ে অক্রুর, আহুক, সাত্যকি, কৃষ্ণ, রুক্মিণী, সত্যভামা, দৈবকী ও রোহিণী প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলরামের অজ্ঞাতে এই কার্য্য করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

তৎপর মহাদেবের পূজা উপলক্ষে দ্বারকাবাসীরা যখন অন্তর্দ্বীপে প্রস্থান করিল, সেই সময়ে একদিন অর্জ্জুন রাত্রিকালে সুভদ্রাকে বলিতে লাগিলেন, 'পত্নী, ভার্য্যা, জায়া, এবং দারা, এই চারিজাতি স্ত্রী মানুষের হয়। এইগুলি অগ্নিসাক্ষী করিয়া ক্রিয়াযুক্ত বিবাহ। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ক্রিয়াহীন, তথাপি আজ অয়ন, মাস, দিন, লগ্ন সমস্তই অতি শুভসূচক। এই শুভমুহূর্ত্তে আমাদের বিবাহ হইলে নিশ্চিতই সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধিত হইবে।'

সুভদ্রা কোন উত্তর করিলেন না। অর্জ্জুনের আগ্রহ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন,

প্রতিবাক্যং চ মে দেবি কিং ন বক্ষ্যসি মাধবি। (২৪২।২০)

সুভদ্রাকে তথাপি নিরুত্তর দেখিয়া অর্জ্জুন একান্ত মনে পিতাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চিন্তয়ামাস পিতরং প্রবিশ্য চ লতাগৃহম্॥ (২৪২.২২)

অর্জ্জুনকে শঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ইন্দ্র, শচী, নারদ, অরুন্ধতী, বশিষ্ঠ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণের সহিত সেইস্থানে আগমন করিলেন। এদিকে সুভদ্রার কাতর প্রার্থনায় কৃষ্ণ সকলকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত। বসুদেব ইন্দ্রাদিকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তখন দেবরাজের অভিমতানুসারে দিকপাল ও দেবর্ষিগণের সমক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধান মতে যথারীতি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার শুভ উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

অরুন্ধতী শচী দেবী রুক্মিণী দেবকী তথা

এঁরা সব এয়োকাজ করিলেন। কিরীট কুণ্ডল হারে পার্থ দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় শোভমান হইলেন, আর চারুসর্ব্বাঙ্গী সুভদ্রাকে রত্নালঙ্কারে বড় সুন্দর দেখাইল।

পৌলমীব মন্যস্তে সুভদ্রাং তত্র যোষিতঃ।

দিব্যস্ত্রীগণ সালঙ্কারা ভদ্রাকে ইন্দ্রাণীর ন্যায় সৌন্দর্য্যময়ী মনে করিতে লাগিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। বরবধূকে বহু বহু আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল বলদেব এত বড় ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি সেই রাত্রে "নিদ্রয়াপহৃতজ্ঞানং" হইয়া রহিলেন।

গমনকালে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়া গেলেন, তিনি যাদবগণকে লইয়া পশ্চাৎ আসিতেছেন, অর্জ্জুন

যতিবেশেন নিয়তো বশ ত্বং রুক্মিণীগৃহে।

যতিবেশধারী হইয়া রুক্মিণীগৃহে বাস করিতে থাকুন।

কয়েকদিন পরে অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অভিলাষী হইয়া সুভদ্রাকে রাজার নিকট আয়ুধপূর্ণ কৃষ্ণরথ আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। সুভদ্রা বলিতেছেন,

রথেনানেন যাস্যামি মহাব্রত সমাপনম্। (২৪৩।৯)
শৈব্যসুগ্রীবযুক্তেন সায়ুধেনেব শার্ঙ্গিণঃ।
রথেন রমণীয়েন প্রযাস্যামি ব্রতার্থিনী॥ (২৪৩।১০)

শৈব্যসুগ্রীবাদি অশ্বযুক্ত, অস্ত্র ও ধনুরাদি সমন্বিত এই রমণীয় রথে আরোহণ করিয়া আমি মহাব্রত সমাপন করিতে গমন করিব।

রথ আসিল। অর্জ্জুন তখন যতিবেশ পরিত্যাগ করিয়া শুক্লবাস পরিধান করিলেন, মহেন্দ্র-প্রদত্ত কিরীটে শিরোশোভা সম্পাদন করিল, বাণ খড়্গ ও ধনুর্দ্ধারী হইয়া তিনি তখন দ্বিতীয় আখণ্ডলের ন্যায় রথে আরুঢ় হইলেন। সুভদ্রা অর্জ্জুনকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন

অভীষুগ্রহণে পার্থ ন মেঽস্তি সদৃশো ভুবি।

'রথাশ্বের রশ্মিগ্রহণে আমার ন্যায় দক্ষ আর পৃথিবীতে কেহ নাই।'

এক্ষণে সুভদ্রাই সারথী হইয়া বসিলেন। তখন সেই কন্যাপুরে বিষম কোলাহল উপস্থিত হইল। সকলেই সুভদ্রার ভাগ্যের বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কাঞ্চনাঙ্গ রথ মেঘমন্দ্রে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া রৈবতক-দ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র নগর-রক্ষক বিপৃথু তাঁহার প্রতিরোধ করিলেন। বিপৃথু সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য। অর্জ্জুন বিপন্ন হইলেন, যাদববীরগণের সহিত যুদ্ধ, অথচ তাঁহার রথরশ্মিধারিণী কুসুমকোমলদেহা সুভদ্রা। স্বামীকে চিন্তিত দেখিয়া

উবাচ পরমপ্রীতা সুভদ্রা ভদ্রভাষিণী। (২৪৪।৬)

এই "ভদ্রভাষিণী" শব্দটি যেখানেই সুভদ্রার নামোল্লেখ আছে. সেইস্থানেই সংযোযিত রহিয়াছে। কথায় বার্ত্তায় স্বভাবতঃ ভদ্র আর যেন বিরল হইয়া উঠিয়াছে।

সুভদ্রা অর্জ্জুনকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া এইবার নিজের হয়চালনানৈপুণ্য ও দুর্জ্জয় সাহস দেখাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত বলিলেন,

সংগ্রহীতুমভিপ্রায়ো দীর্ঘকালকৃতো মম।
যুদ্ধমানস্ত সংগ্রামে রথং তব নরর্ষভ॥ (২৪৪।৭)

কতদিন হইতে আমি আজিকার এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আপনি রথী হইয়া যুদ্ধ করিবেন, সেই রথে আমি অশ্ববল্গাধারণ পুর্ব্বক রথকে নিয়ন্ত্রিত করিব—ইহা আমার চিরপোষিত কামনা।

পার্থতে সারথিত্বেন ভবিষ্যা শিক্ষিতাস্ম্যহম্। (২৪৪।৮)

আপনার সারথী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। অর্জ্জুন অনন্যোপায়, বলিলেন,

পশ্য বাহুবলং ভদ্রে শরান্ বিক্ষিপতো মম। (২৪৪।১০)

আজি উভয়েরই পরীক্ষা, আমি তোমার হয়জ্ঞানকৌশল দেখিব, তুমি আমার শরবিক্ষেপ হইতে আমার বাহুবল প্রত্যক্ষ কর।

তৎকালে বিপক্ষ সেনাগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া

সবিদ্যুতমিবাম্ভোদং প্রেক্ষতাং তং ধনুর্ধরম্। (২৪৪।৫)

দেখিতে লাগিল যুদ্ধক্ষেত্রে ভদ্রার্জ্জুন যেন স্থিরসৌদামিনীযুক্ত নবজলধর। এ দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য কাহার ত হয় না—সকলে নির্নিমেষ লোচনে এই অপরূপ শোভা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতেই ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। বহুলোক হতাহত হইল, শেষে বিপৃথু পরাজয় স্বীকার করিলেন। অর্জ্জুন তখন পথমুক্ত পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে রথ চালাইতে আদেশ করিলেন।

এ দিকে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল দেখিয়া সৈনিকগণ দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া সভাপালের নিকট অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা-হরণ ব্যাপার নিবেদন করিল।

এই পর্য্যন্ত কুম্ভকোনম্ সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহার পরবর্ত্তী অংশ সকলেরই প্রায় একরূপ। তবে দুর্য্যোধনের বরবেশে আগমন ও পথিমধ্যে কর্ণ-ভীম সংবাদ কোন সংস্করণেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দক্ষিণ ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রামেই কার্ত্তিক মাসে (তুলা সংক্রমণে) 'তুলা-কাভেরী মাহাত্ম' পঠিত হয়। সেই সময়ে এই সুভদ্রা-পরিণয় আখ্যানটিও পঠিত হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী আমাকে একখানি তুলা-কাভেরী মাহাত্ম দিয়াছিলেন। এই বইখানি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত। পণ্ডিতজী বলেন শত শত বৎসর ধরিয়া এই মাহাত্ম কথা পঠিত হইয়া আসিতেছে। কত শোকে সান্ত্বনা, কত দুঃখ নৈরাশ্যে আশার আলোকরশ্মি শত শত বৎসর ধরিয়া এই সকল উপাখ্যান সেই প্রদেশবাসী স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকার হৃদয়ে পাতিত করিয়া তাঁহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাঁহাদের প্রাণে শান্তিধারা বর্ষণ করিয়া দুঃখোপনোদন করিয়া আসিতেছে। এই আখ্যান বস্তু তাঁহারা আগ্নেয়-পুরাণ, দ্বিতীয় ভাগ হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন। এ আবার আরও একটু বিচিত্র।

যতিবেশধারী অর্জ্জুন তীর্থস্নানার্থী হইয়া প্রভাসে আসিতেছেন, পথিমধ্যে ব্যাসদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত কি করিয়া কৃষ্ণভগিনী "শ্যামাং ত্রৈলোকসুন্দরীং" সুভদ্রাকে লাভ করিতে পারিবেন, সেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন

দুর্য্যোধনায় দাতব্যেত্যেবং ব্রূতেহগ্রজো হরেঃ।
সা কন্যেষা মমেবস্যাৎ তথোপায়ং বদস্ব মে॥ (অ ১৭। শ্লো ৮০)

এইস্থানে বলদেবের দুর্য্যোধন-প্রীতির ও সুভদ্রাকে দুর্য্যোধনের হস্তে সম্প্রদানের কথাটার আভাস পাওয়া যায়।

ব্যাসদেব কহিলেন 'কার্ত্তিক মাসে সমস্ত নদনদী কাবেরী নদীতে স্নান করিতে আগমন করেন। তুমি শ্রীরঙ্গের নিকট গমন করিয়া এই পুণ্যময়ী কাবেরীতে অবগাহন কর ও একান্তমনে "লক্ষ্মী হৃদয়" নামক স্তোত্র পাঠ কর—তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে।'

অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। তাঁহার মনে আর কোন চিন্তাই রহিল না, কেবল সুভদ্রা লাভ এক মাত্র কাম্যবস্তু হইয়া রহিল। এ জগতে কোন বিষয়েই এমন একাগ্রতা না হইলে বুঝিবা সুফল লাভ করা যায় না। অর্জ্জুন ক্রমে চিন্তা-জালে জড়িত হইয়া উপারান্তর না দেখিয়া কৃষ্ণের উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন,

নিবাসবৃক্ষঃ সাধূনাং আপন্নানাং পরাগতিঃ।
ভক্তার্ত্তিভঞ্জন শ্রীমান্ কৃষ্ণ এব গতির্ম্ম॥

'যিনি সাধুদিগের আশ্রয়স্থল, যিনি শরণাগতবৎসল, যিনি চিরকাল ভক্তদুঃখহারী, সেই কৃষ্ণই আমার একমাত্র গতি' এইরূপ ভাবিয়া পার্থ চিত্তস্থির করিলেন।

তৎপর সুভদ্রার যতিবেশধারী অর্জ্জুনের শুশ্রূষা "কুম্ভকোনম্" সংস্করণের অনুরূপ। সুভদ্রার প্রশ্নও প্রায় একরূপ।

যোগিন্ সর্ব্বত্রসঞ্চারী ত্বম্ সদা পুণ্যভূমিষু।
তীর্থস্নায়ী গতঃ পার্থঃ দৃষ্টো বা যত্র কুত্রচিৎ॥

যোগিবর, আপনি পুণ্যস্থান সমূহে সর্ব্বদাই বিচরণ করিয়া থাকেন, তীর্থস্নানাভিলাষী অর্জ্জুনকে কি কোথায়ও দেখেন নাই?

ইহার পরেই সুভদ্রা বলিতেছেন

অথবা যোগীবর্য্যস্ত্বং স এবার্জ্জুন সজ্জিতঃ।

যোগিবরের আকার প্রকার দেখিয়া সন্দেহ প্রযুক্ত বলিয়াই ফেলিলেন, আপনি অর্জ্জুন নন ত?

অনন্তর পরিচর্য্যাদির পর বিবাহ।

'বম্বে' সংস্করণ, 'বঙ্গবাসী' সংস্করণ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত সংস্করণ—ইহার কোনটিতে অর্জ্জুনের সহিত যদুবীরগণের যুদ্ধবর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং সুভদ্রা-সারথ্যও নাই। 'কুম্ভকোনম্' সংস্করণে যাহা আছে, আমরা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। পরবর্ত্তী অংশ প্রায় সকলেরই একরূপ, সেইজন্য 'বঙ্গবাসী' প্রকাশিত মূল অনুসারে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণার্জ্জুনের পরামর্শের পর অর্জ্জুন কৃষ্ণের সুসজ্জিত রথে আরোহন করিয়া সুভদ্রার নিমিত্ত রৈবতকের পথে যাত্রা করিলেন। সুভদ্রা পূর্ব্বেই রৈবতকে গিয়াছিলেন। তিনি মহাগিরি ও দেবতাদিগকে অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তৎপর শৈল প্রদক্ষিণ

করিয়া যখন দ্বারকাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এমনি সময়ে পার্থ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আপনার রথে আরোপিত করিলেন। অমনি সেই সুবর্ণময় কিঙ্কিনীজালজড়িত রথ ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থিত হইল।

সুভদ্রার রক্ষক সৈন্যগণ এই অচিন্তনীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া কোলাহল করিতে করিতে দ্বারকার পথে ধাবমান হইল। সভাপাল এই নিদারুণ অপমানজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া রণভেরী বাদন করিলেন এবং সেই ভেরীনির্ঘোষ কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র ভোজ,বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় মহাবীরবৃন্দ আপনাপন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বহির্গত হইলেন। মহতী সভা মিলিত হইল। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে সুভদ্রা-হরণ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া যদুবীরমণ্ডলী রোষে, ক্ষোভে ও অপমানে অধীর হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কেহ বা তখনই যুদ্ধে বহির্গত হইলেন। তখন বলদেব জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌন রহিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধপ্রকাশ করা বা গর্জ্জন করা বৃথা।" সকলে স্থির হইয়া বসিলেন। বলদেব কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যত অপাত্রে তোমার প্রীতি। কে আপনাকে কুলীন বিবেচনা করিয়া যে পাত্রে ভোজন করে সেইপাত্র চূর্ণ করিয়া থাকে?

সৎকৃতস্তৎকৃতে পার্থঃ সর্ব্বৈরস্মাভিরচ্যুত।
ন চ সোঽর্হতি তাং পূজাং দুর্ব্বুদ্ধিঃ কুলপাংসনঃ। (২৪৪।৫৩)

দুর্ব্বুদ্ধি কুলাঙ্গার অর্জ্জুন আমাদের সৎকারের এই প্রতিফল প্রদান করিল? অসূর্য্যম্পশ্যরূপা যদুরমণী হরণ করিতে পারে এমন সাহস তোমার প্রিয়সখা অর্জ্জুন ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কাহারও নাই। মস্তকে পদাঘাত করিলে অতি হীন সর্পও প্রহারককে দংশন করে।

অদ্য নিষ্কৌরবামেকঃ করিষ্যামি বসুন্ধরাম্।
ন হি মে মর্ষণীয়োঽয়মর্জ্জুনস্য ব্যতিক্রমঃ॥

আমি একাকীই অদ্য বসুন্ধরাকে নিষ্কৌরব করিব—অর্জ্জুনকৃত এত বড় অন্যায় আমি কখনই সহ্য করিব না।"

কৃষ্ণ তখন ধীর স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেব, ইহাতে আমি কোন অন্যায় দেখিতে পাই না।

নাবমানং কুলস্যাস্য গুড়াকেশঃ প্রযুক্তবান্।

অর্জ্জুন আমাদের বংশের কোন অবমাননা করেন নাই। বরঞ্চ অনেক বিবেচনা করিয়াই সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন তোমরা অর্থ গ্রহণ করিয়া কন্যা দান করিবে না, সুতরাং সেরূপ চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ম্বরে কন্যা লাভ দুরূহ, কারণ তখন সে কাহার কণ্ঠে মাল্যার্পণ করিবে কিছুই স্থিরতা নাই, সেইজন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই।

"ক্ষত্রিয়াণাং তু বীর্য্যেন প্রশস্তং হরণং বলাৎ।"

তেজস্বী ক্ষত্রিয় বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করিবেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত। অর্জ্জুন বীর, ধীর, শান্তস্বভাব, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণবিভূষিত, এই বিবাহে সুভদ্রা যশস্বিনী হইবে। এক শঙ্কর ভিন্ন

ন চ পশ্যামি যঃ পার্থং বিজয়েত রণে বলাৎ।

পার্থকে যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারে এমন ব্যক্তি ত দেখি না। তাহার সহিত সংগ্রামে যাদবগণ নিতান্ত অপারগ, যদুবল পরাজিত করিয়া সুভদ্রাকে লইয়া গেলে আমাদের বিষম অপমান হইবে।"

অতঃপর সকলে পরামর্শ করিয়া অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিলেন। অর্জ্জুনের হস্তে যথারীতি সুভদ্রা-সম্প্রদান হইল। অর্জ্জুন এক বৎসর দ্বারকায়, পর বৎসর পুষ্করতীর্থে ও শেষ বৎসর অন্যান্য তীর্থে অতিবাহিত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া গেলেন।

অর্জ্জুন সুভদ্রাকে গোপালিকাবেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। ভদ্রাকে কৃষ্ণমহিষীগণ বিবিধ রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন, বরাঙ্গ মণিমাণিক্যময় আভরণে স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছিল। ভদ্রা পিতৃষ্বসা কুন্তীর পাদবন্দনা করিলেন। কুন্তী অতি-মাত্র প্রীত হইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সুভদ্রা কৃষ্ণাসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন, "আমি আপনার অনুচরী হইলাম।"

পরিষ্বজ্যাবদৎ প্রীত্যা নিঃসপত্নোহস্তু তে পতিঃ।

দ্রৌপদী কৃষ্ণ-ভগিনীকে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন, বলিলেন, "তোমার পতি নিঃসপত্ন (নিঃশত্রু) হউন।" ভদ্রা স্মিতমুখে উত্তর করিলেন, 'তথাস্তু'।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক

'মৃত্যুরে কে মনে রাখে—?'

ধূলার দেশ।—কেঁচোর মাটি আর ব্যাঙের ছাতা শুধু কথার কথা।

পশ্চিমের বড় শহর। কাছেই নদী—গঙ্গা; গতযৌবনা।

বাঙালী পাড়াটি ছোট,—কোণঠেসা। মাঝখানে মানস-সরোবর।

ওর প্রথম 'স'টি নেই—জলমগ্ন। এখন শুধু মান্‌-সরোবর। পানা-পচা খানিকটা জল আর স্থবির দু' একটা কচ্ছপ—এই মূলধন।

বিশুদার আস্তানা পাশেই। একটা গলির বাঁকে। গঙ্গা হইতে মিনিট পাঁচেকের পথ।

বিশুদার কাজ শুধু পাথর-খোদাই,—দিনরাত। লোকটি বড় শান্ত। সংসারের বালাই নেই। বছর আষ্টেকের একটি রুগ্‌ণ ছেলে—এইটুকু যা উদ্বেগ। বউটি পটল তুলিয়াছে মাস কয়েক আগে। ও তখন আরঙ্গাবাদে।

ইতর ভদ্র সকলেরই বিশুদা। শিল্পাগারের মেয়েরাও ওই বলিয়া ডাকে—আবার বাজারের ব্যাপারিদের কাছেও ওই নামে পরিচয়।

জল খাওয়ার নামে তাহারই বাড়ীতে ইস্কুলের মেয়েদের আড্ডা। বিশুদার দিদি ওরা সকলেই।

সার্কাস দেখিবার পথে সেদিন বিশুদার ঘরে তাড়াতাড়ি আসিয়া রেবা কহিল, দেখ ত বিশুদা, আমি কিন্তু এবার সত্যিই রাগ করবো তা বলে দিচ্ছি।

অভিমানের সুর!—বিশুদা কহিল, কি হল দিদি?

তোমার কাছে পাথর-খোদাই শিখ্‌বো শুনে সবিতা-দি ঝগড়া কর্ত্তে এল।

এতে তার কি?

সেই জানে! অথচ তোমার সঙ্গে ত ওর একটুও বনে না। এসে ত কেবল তোমার জিনিসপত্তর ভেঙে চুরে কাজ ভণ্ডুল করে' দিয়ে যায়। দাদা বলে' একবার ডাকতেও শুনলুম না কোনদিন। একগুঁয়ে মেয়ে কোথাকার! বলে—আমরা কেউ তোমার কাছে আসতে পাব না। বিধবা বলে' ওর সব আব্‌দার বুঝি আমাদের রক্ষে কর্ত্তে হবে?

না না—তা নয়। কি জানো রেবা—?

জান্‌তে চাইনে বিশুদা। তুমি কারো একার নও।

বিশুদা এবার হাসিল—আমি সকলের বুঝি?

নিশ্চয়। কারো 'পেটেণ্ট্‌' করাও নয়। আমার কথা শুনে—বুঝলে বিশুদা?—সবিতা-দি ত গর গর কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেল। অম্বা ত ওকে যাচ্ছেতাই বলে' দিয়েছে।

বিশুদার হাতের কাজ পড়িয়া থাকে। মুখ তুলিয়া বলে, অম্বা কিন্তু ভারি দুষ্টু, ভাই। সবিতাকে ও যা-তা বলে।

বলবে না? নিশ্চয় বলবে। সেদিন পাথর-কাটা যন্তরটা ছুঁড়ে সবিতা-দি তোমার হাতে রক্ত বার করে' দিলে, তুমি ত কিচ্ছুটি বল্লে না।

বিশুদা হাত ঘুরাইয়া দেখিল। কহিল, দাগটা আছে বটে এখনও।—কিন্তু কিছু বলা কি উচিত ভাই? বিশেষত সবিতা—

বিধবা,—কেমন? তা আমরাও কুমারী সুতরাং বিশেষ তফাৎ নেই বিশুদা।—রেবা যেমন আসিয়াছিল, তেম্‌নি চলিয়া গেল।

ও যেমন আপনার মনে নদীর মত গান গাহিয়া চলে—বাধা পাইলে তেম্‌নি উত্তাল হইয়া ওঠে!

সবিতার কথা ওইখানেই শেষ হয়। বিশুদার খেয়াল থাকে না।

ঘরে রুগ্‌ণ ছেলে। কিন্তু কাজের কামাই নাই। নূতন মন্দির কোথাও হয়—অমনি বিশুদার ডাক পড়ে। চমৎকার হাত,—মাথাও। পাথর হইতে মূর্ত্তি কুঁদিয়া বাহির করে। নূতন গড়ন, নূতন ধরণ, নূতন ভঙ্গী। কোনটা পুরুষ, কোনটা নারী,—কোনটা বা জানোয়ারের।

কিন্তু নারী মূর্ত্তি!—ওইটি হয় আরও চমৎকার!

কারণ আছে। বৌ ছিল বিদ্যুৎলতা। নাম—করবী। কিন্তু তাহার চোখ দুটি?—নীলপদ্ম! পাষাণে ফুটিয়া এখনও কথা বলে।

বিশুদার এখন শুধু ম্লান হাসি,—বাঁচ্‌বে না কেউই। কি রাণী—কি কানি।

অম্বা রাগ করে,—কিন্তু তোমার এ তত্ত্ব-কথা সংসারে খাটে না, বিশুদা।

কেন দিদি? ভাঙা হাটে দাঁড়িয়ে কেঁদে লাভ কি?

ওদিকে রেবা তখন ছোঁক্‌ ছোঁক্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোথায় কি হুট্‌পাট্‌ শব্দ করে। গান গায়। হয়ত বা কবিতা আওড়ায়। কিম্বা অন্তত ভাঙা-তক্তায় হাত চাপ্‌ড়াইয়া তব্‌লাও বাজায়।

রেবার জ্বালায় কোথাও শান্তি নেই বিশুদা।

বেশ। ভূতের মুখে রাম নাম।—একটু নীরব থাকিয়া বিশুদা আবার কহিল, শান্তিটাকে আমি বড় ভয় করি, দিদি। চারিদিক নিশুতি হলে যেন বুক চেপে ধরে। সরগরমে থাকাই জীবন—নৈলে ত মরেই আছি।

একমনে মূর্ত্তির উপর আবার তাহার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য চলিতে থাকে।

চট্ করিয়া অম্বা উঠিয়া গেল। কিন্তু রেবার কাছে নয়—অন্য ঘরে। একটু পরে ওদিক হইতে রেবা বাহির হইল,—কোথা গেলি অম্বা? চলে' গেল বুঝি?

ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া দেখে, অম্বার কোলে রুগ্ণ ছেলে। জানালার দিকে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া।—যেন সমাহিত ভাব!

সমস্ত পাড়াটার মধ্যে অতবড় চঞ্চল মেয়ে নাই। মার ধোর, দুষ্টামি, ইস্কুল পালানো—কোন বিষয়েই পুরুষের চেয়ে খাটো নয়। মাছ ধরিতে, সাঁতার কাটিতে যে-কোনও যুবকের সমকক্ষ। হকি খেলায় ইস্কুলের সব মেয়েদের মধ্যে সে প্রথম। দুষ্ট গরুর শিঙ্ ধরিয়া সে নাচিবার চেষ্টা করে।

আজ সে শান্ত। যেন বালকটির সীমায় আসিয়া তাহার সমস্ত চাঞ্চল্যের স্পন্দন একেবারে স্থির!

রেবা হাসিয়া ফেলিল,—ছেলে তোর কানে মন্তর দিলে নাকি?

ঘুমন্ত ছেলেটাকে তাড়াতাড়ি অম্বা বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

যেন ধরা পড়িয়া গেছে—

বলিল, কাঁদছিল কিনা তাই একটুখানি,—কিন্তু ছেলেটি বিশুদার ভারি শান্ত, না রে?

হুঁ—খুব।

চল্ বাড়ী যাই।

রেবার ছোট্ট নিঃশ্বাস পড়িল,—তাই চল্। তা ছাড়া যে আছাড়টি আজ হয়েছে তোমার—রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে নিজের গা নিজে টিপো!

অম্বার খিল্ খিল্ করিয়া হাসি,—তা ছাড়া আবার কে টিপ্‌বে?

দূর মুখপুড়ি, আমি কি তাই বল্‌ছি?

রেবা চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে অম্বা। সে আর একবার মুখ ফিরাইল—ছেলেটি তখন কাৎ হইয়া বিছানায় শুইয়া আছে।

নির্জ্জীব, দুর্ব্বল!—অক্ষম শিল্পীর রচনা!

খানিক পরে রেবার পুনঃপ্রবেশ। আসিতে আসিতেই চিৎকার করিয়া অভিনয়।

আপনার খেয়ালেই—

হঠাৎ আসিয়া বিশুদার হাত হইতে বাটালি, উকো কাড়িয়া লইল,—আমি মর্‌ব চেঁচিয়ে আর তুমি কাজ করে' যাবে? কক্ষণো না।

মহা বিপদ! বিশুদা হাত গুটাইল—কি করব তবে?

গান কর্ত্তে পার না?

কি গান ভাই?

এমনি যা তা। পুতুল গড় আর গান জান না? ভাল একটি মূর্ত্তি ত গানেরই মতন।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

বা—। বলবে আবার কি? গান ত চারিদিকেই ছড়ানো। নদী পাখী ফুল মাটি আকাশ—সবাই ত গান করে! মানুষ ত গানেতেই পাগল!

আমার গান গাওয়া যে সত্যিই পাগলামি ভাই। গান গাইতে সকলেই পারে। পারে না পাথর—পারে না মরু—ছেলেটা কাঁদচে বুঝি—

বিশুদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরে গেল।

ছেলের তখন অকাতরে ঘুম। বিশুদা জানলা বন্ধ করিয়া দিল।—ঠাণ্ডা লাগিবে। বালিশটা গোছ করিয়া দিল। ছেলের গায়ে একটি কাপড় ঢাকা দিল। একবার একটুখানি আদর—। তারপর আবার বাহির হইয়া আসিল।

শিষ্ দিতে দিতে রেবার তখন যাইবার পালা।

যেন উচ্ছল ঝরণা—।

মরুপথে পথ-ভোলা জল-বালিকা যেন!

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল—আরে, সবিতা-দি বসে' এখানে চুপটি করে'?

আছি এম্‌নি।—মুখ তুলিল সবিতা।

তাহার কাছে বসিয়া রেবা কহিল, সবিতা-দি—মাপ করবে ভাই? তোমাকে যেন কি সব বলেছিলুম।

কি?

তা মনে নেই। কিন্তু মনের ভেতরেই দোষ করেছি।

মাপ চাও তবে নিজেরই কাছে।

দুজনেই হাসিল। আর মেঘ নাই—পরিষ্কার।

বাড়ী যাই, ক্ষিধে পেয়ে গেছে।—রেবা উঠিয়া আবার শিষ্ দিতে দিতে চলিয়া গেল।

ইঁদারার পাশটিতে সবিতা বসিয়া রহিল। পাশেই একটা বেলগাছ।

তারই মাঝে সবিতা যেন গোপন রজনীগন্ধা!

বিশুদা মুখ বাড়াইল—চুপটি করে' বসেছিলে কেন এতক্ষণ?

সবিতার প্রখর দৃষ্টি। কহিল, তাতে তোমার কি?

বিশুদা তাহাকে সমীহ করিয়া চলে। তবুও হাসিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ীটা যে আমার।

কঠিন মুখে সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল; নিঃশব্দে।

আর কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নয়—দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া সটান্ বাহির হইয়া গেল—একেবারে রাস্তায়।

বিশুদা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আমি তা বলি নি, শোন সবিতা,—এ শুধু হাসির কথা—।

সেও বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু সবিতা তখন নাগালেরও বাহিরে।

মুন্না বলে, এ আমি মান্তে পারি না।

রেবা বলে, না মানো বয়ে' গেল। বিশুদার কাছে আমরা যাবই। ওর কাছে জল না খেলে আমাদের তেষ্টা যায় না।

ইংরেজিতে মুন্না বলে, ভণ্ডামি—দুর্নীতি! যে মেয়েরা নিজেদের 'সংরক্ষিত' না রাখে আমি তাদের—

অম্বা তাহার দিকে নিঃশব্দে তাকায়। ইচ্ছা করে ওর গালে দুইটা চড় বসাইয়া দেয়।

মুন্না উকীলের মেয়ে। অঙ্ক জানে ভালো। বলে—

কি ছাই মূর্ত্তি গড়ে ও লোকটা? না ম্যাথা—না মুণ্ডু। ভাল 'ক্রিটিকে'র পাল্লায় পড়লে নাস্তানাবুদ হতে হত। যেমন ছাঁদ তেম্নি ছিরি।—আমার মুখ একটু আল্‌গা—কি-না-কি বলে ফেল্‌বো, তাই ত যাই না ওই মিস্তিরিটার ঘরে।

রেবা বলে, তোমার মতন শুক্‌নো রুক্ষু মেয়ে হলে ত ভাই সকলের চলে না, তাদের যেতেই হয়।

যে যায় যাক্ না—আমার কি! তবে যতক্ষণ ঠাট্টা তামাসা করব ততক্ষণ একটা আঁক্ কষ্‌লে বরং—বাবার এক মক্কেল বলেন—

গোল্লায় যাক্ তোমার মক্কেল!—অম্বা আর রেবা উঠিয়া চলিয়া গেল।

বাবার মক্কেলের প্রতি এমন কটূক্তি!

তীব্র দৃষ্টিতে মুন্না সেদিকে চাহিল। কহিল, পুরুষ মানুষকে আমি ঘৃণা করি।

ঝাল্‌টা বিশুদার উপরেই।—

পায়ে পায়ে সন্তর্পণে বিশুদার ঘরের কাছে সবিতা।—ছেলের জন্য বিশুদা দুধ গরম করিতেছিল।

মুখ ফিরাইয়া কহিল—সবিতা যে, এসো এসো। মনে হচ্ছিল সেদিন রাগ করে' চলে গেলে। সত্যি?

রাগই ত!—দাঁত দিয়া সবিতা অধর চাপিল।

বিশুদা হাসিল—তা হক্। সকলে যেন আমার ওপর রাগই করে।—একটুখানি তামাসাও করিল—রাগের বাঁ-দিকে 'অম্বু'টা যেন কারো না থাকে।

উঠিয়া গিয়া বিশুদা একখানি আসন আনিল।

বসো সবিতা, সত্যি কথা বলতে কি—তোমাকে একটু ভয় করি ভাই।

আসন পাতিয়া দিল।

একটা পা দিয়া সবিতা আসনটাকে অন্যদিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, দরকার নেই খাতিরে।

বিশুদা মুখ তুলিয়া চাহিল।—ভয়ে কাঠ!

সবিতার ভ্রূক্ষেপ নাই। কহিল, কাজ কর্ম্ম তোমার চলে কি করে'?

বিশুদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তা এম্‌নি—এমন আর কি কাজ। শুধু ছেলেটা—তা যা হক করে'—

ছেলের একটা ঝি দরকার হয় না?

ন্‌-নাঃ।

এদিক ওদিক তাকাইয়া সবিতা বলিল, আমার নামে রেবা যে এসে তোমার কাছে বলে, তা শুনেছি। গয়ে গায়ে বাড়ী, চোখ কান সবই থাকে এদিকে।

ও—। বিশুদা আড়ষ্ট। বলিল, কিন্তু রেবা ত এমন বিশেষ কিছুই—

তা জানি। হঠাৎ হাসিয়া সবিতা কহিল, কিন্তু আমার হয়ে তুমি ওদের কাছে ওকালতি কর কেন? আমার নিন্দে বুঝি তোমার গায়ে লাগে?

সবিতা হাসে কিন্তু জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে তার দুটি চোখ। সন্ধ্যার অন্ধকারেও বিশুদা দেখিতে পায়।

হঠাৎ ছেলেটা কাঁদিয়া বাঁচাইল।

যাই রে যাই।—বিশুদা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল।

পিছন হইতে সবিতার শুষ্ক কঠিন কণ্ঠ,— ছেলের এতটুকু কান্নাও বুঝি সহ্য হয় না?

উত্তর পাইল না।

একটু পরে বিশুদা বাহির হইয়া আসিল! ছেলে শান্ত হইয়াছে।

দেখে—মেঝের উপর দুধের বাটি উল্টানো, জলের ঘটিটা গড়াগড়ি, খাবার ছিল ঢাকা—এখানে ওখানে ছড়ানো; জলে-দুধে-খাবারে একাকার চারিদিক।

অভিভূতের মত সে কহিল, কে কল্লে?

এক-পা এক-পা করিয়া সবিতা বাহিরে যাইতেছিল, বলিল—আমি।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল।

সবিতা চলিয়া গেছে—

বিশুদা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল। সুমুখের অন্ধকার বেলগাছটা। কহিল, উপোস করবে আজ রুগ্‌ণ ছেলেটা? আর ত কিছু নেই।

সংসারে ওই তৃণটিই সম্বল তাহার।

অম্বা আর ইস্কুলে যায় না। দেখা মেলা ভার। হঠাৎ সে দলছাড়া।

দুপুর বেলা সেদিন সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিল। পশ্চিমের এদেশে মেয়েদের বাঁধাবাঁধি বিশেষ নাই।

রূপলোভী পুরুষেরই কি অভাব? ওরা স্বর্গে গিয়াও উর্ব্বশীকে দেখে।

দূর ছাই—। অম্বা আবার ফিরিয়া চলিল।

গলিঘুঁজি পার হইয়া বরাবর গঙ্গার ঘাটে।

শীতকাল—তবু রৌদ্রটা খুব তীক্ষ্ণ। ঘাটে আসিয়া অম্বা একবার দাঁড়াইল।

গঙ্গার এপার ওপার অনেকখানি চওড়া। কিন্তু সবটা জল নয়—ওপারের প্রায় অর্দ্ধেকটা বালির চড়া। সূর্য্যের আলোয় দূর হইতেও চক্ চক্ করিতেছে। দূরে ছোট ছোট 'দু' একখানি নৌকা।

ওপারে রাজার প্রাসাদ।—রামনগর।

ঘাটে লোকজন কেহ নাই। শুধু একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে সাবান দিয়া কাপড় কাচিতেছিল।

অম্বা ঘাটে নামিল। জামাকাপড় শুদ্ধ একেবারে গিয়া গলা জলে। অন্যদিন সিঁড়ি হইতে ঝাঁপাইয়া জলে পড়িত; আজ নিয়ম-ভঙ্গ!

সাঁতার কাটিতেও অরুচি। ধীরে সুস্থে স্নান সারিয়া সে উঠিয়া আসিল।

কাপড়ের একধারে মাথা মুছিল। জল ঝরাইল। তারপর রাস্তায় উঠিয়া আসিল।

মেয়ে যেন কত শান্ত!

বাঁ-হাতি কালী-মন্দির। ভিতরে ঢুকিল। আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া পুরোহিতের কাছে রাখিয়া বলিল, ফুল নৈবিদ্যির জন্যে দিলুম।—একটু পেসাদ দাও ত ঠাকুর!

প্রসাদ হাতে লইয়া অম্বা এদিক ওদিক চাহিল—কেহ কোথাও নাই—চট্ করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে একটি প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

এবারেও বাড়ীর পথে নয়—অন্যদিকে।

অপরাহ্ণ বেলায় সটান্ বিশুদার ঘরে। কাহারও সাড়া নাই। তাড়াতাড়ি সে ঘরের ভিতর ঢুকিল।

রুগ্‌ণ ছেলেটি যেন কেমন-কেমন! মুখ খানা রক্তহীন, চোখ দুটা ঝাপ্‌সা, গলার মধ্যে

ঘড় ঘড় শব্দ—যেন কি রকম! চিঁ চিঁ করিয়া অস্পষ্ট কথা বলে, হাত পা বিশেষ নাড়ে না,—ভিতরে কোথায় যেন তলাইয়া থাকে।

অম্বা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। কাপড় চোপড় তখনও ভিজা। আবার তাহাকে বিছানায় শোয়াইল। পরে প্রসাদী ফুলগুলি তাহার মাথায় ঠেকাইয়া বিছানার উপরেই ছড়াইয়া দিল।

বাঁ-হাতে ছিল ডাক্তারী ঔষধ। শিশির ছিপি খুলিয়া সে একদাগ খাওয়াইল। বিছানা ভাল করিয়াই প্রস্তুত; সে আর একবার ঝাড়িয়া মুছিয়া দিল।

এম্‌নি করিয়া যত্নের আর অন্ত নাই!

এ যত্ন যেন মায়েরও নয়—ভগ্নিরও নয়; এ যেন অন্যরূপ!

ছেলেটা চোখ চাহিয়াছিল, অম্বা তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কে আমি বল্‌তে পারো?

তুমি? কেউ না!

সময় কাটিতে থাকে।

ঘরে ঢুকিল বিশুদা। দেখে—ছেলের কাছে বসিয়া অম্বা। বিছানায় ফুল। ফুলের গন্ধ চারিদিকে।

অম্বা-দিদির খবর কি গো? ফুলশয্যে নাকি?

ধড়মড় করিয়া অম্বা উঠিয়া পড়িল। বিশুদার আসা টের পায় নাই।

বলিল, ছেলেকে এক্‌লা রেখে তোমার এমন রোজগার নাই-বা হল বিশুদা?

এক্‌লা? এমন দরদী আছে জান্‌লে বাড়ীই আসতুম না আজকে।

কি যে বল তুমি।—লজ্জায় অম্বার মাথা হেঁট।

বিশুদার মৃদু হাসি,—ছেলে আছে কেমন?

ভালই—সেরে যাবে।—অম্বা বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হয়।

ছাদের পাঁচিলের কাছে দাঁড়াইয়া সবিতা সবই দেখে।—বিশুদার সংসার চলে।

ছেলের জন্য বিশুদার চোখে জল আসে।—সবিতা তাহাও অনুভব করিতে পারে।

ঠুক্‌ ঠুক্‌ করিয়া সেদিন বিশুদা কাজ করিতেছিল আপন মনেই,—সবিতা ভিতরে আসিল। ইঁদারার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—। অনেক নীচুতে জলের ভিতর নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিল।—দেখিয়া হাসি। বিশুদার চোখচোখি হইলে রাগ হয়।

হয় ত অকারণে বাল্‌তিটার শব্দ করিতে থাকে। ঘটিবাটিগুলা পা দিয়া এধার ওধার

ছুঁড়িয়া দেয়। ইঁদারার বাঁধুনির উপর হাত চাপ্‌ড়াইয়া আওয়াজ করে। বিশুদার মনোযোগ নষ্ট হইলে সে খুসী হয়।

দেখিয়া দেখিয়া বিশুদা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু কথা বলিতে সাহস নাই।

কিন্তু তাহার কাজও আর হয় না—ছেলের তদ্বির করিতে উঠিয়া যায়।

সবিতা গিয়া ঘরে উঁকি মারিল। দেখে—ব্যাকুলভাবে বিশুদা ছেলেকে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া আছে।

সন্তানের বন্ধন আরও দৃঢ় হউক!

সবিতার কঠিন হাসি। সরিয়া আসিল। সুমুখে অসমাপ্ত মূর্ত্তিটা। হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া দুই হাতের নখে করিয়া সেটা আঁচড়াইতে লাগিল।

পাথরে আঁচড় চলে না!

কাছেই খোদাই করিবার যন্ত্রগুলি।—তাহাই আঁচলের মধ্যে কুড়াইয়া লইয়া ওধারে চলিয়া গেল।

এক জায়গায় আসিয়া বসিল।—দাঁত দিয়া অধর চাপা।

বিশুদা যখন বাহিরে আসিল, দেখে—যন্ত্রপাতি উধাও। বুঝিতে পারিল; হাসিয়া বলিল, বা রে বা! গেল কোথায় এগুলো? একেবারে ভৌতিক!

সবিতার দিকে চাহিল—উত্তর নাই। বিধবা মেয়েটা এবার শুধু মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

থাক্ তবে,—এখন আর কাজকর্ম্ম কিছু হবে না। মুখ হাত ধুয়ে এখুনি ছেলের ওষুধ আন্‌তে যাবো।—চঞ্চল হইয়া বিশুদা আর একদিকে পা বাড়াইল।

সবিতার তৎক্ষণাৎ রাগ। যন্ত্রপাতিগুলি আঁচল হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিল,—আমি ত আর নিই নি।

বিশুদার কানে গেল না কথাগুলি। যখন মুখ হাত ধুইয়া ফিরিয়া আসিল—সবিতা তখন দরজার কাছে দাঁড়াইয়া।

বেরিয়ে যাচ্ছো, ছেলে দেখবে কে?

ছেলে ঘুমিয়েছে।—বিশুদা বলিল।

যখন জাগ্‌বে?

ততক্ষণে আমি এসে পড়বো।

সবিতা নিরুপায়। হঠাৎ বিশুদার বাহির হইবার জামাটি টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

শোন' সবিতা শোন'—আমায় বেরোতে হবে এখুনি—শোন,'—বিশুদা আগাইয়া আসিল।

সবিতা শুনিল না। দূরে সরিয়া গেল;—আড়ালে। কোলের ভিতর জামাটি লুকানো। মুখে হাসি।

বিশুদা—অগত্যা—যন্ত্রপাতির দিকে চাহিয়া বলিল, থাক্ তবে, আবার কাজ কর্ত্তেই লেগে যাই।

কাজে-কাজেই কাজে বসিয়া গেল।

হাসি মিলাইল সুবিতার মুখে। জব্দ করিতে গিয়া নিজেই অপ্রস্তুত। দ্রুতপদে আসিয়া জামাটি ছুঁড়িয়া দিল। আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

বুকের মধ্যে রুদ্ধ কান্নার প্রচণ্ড আবেগ। পথে পড়িয়া মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল।—কান্নায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে।

* * * * *

ঘরে দাদা আর বৌদি। পুরুষ মানুষ হইলে বৌদির পাকা-দাড়ির বয়স। ওদের সংসারে সবিতা খাটে খুটে—আর থাকে। একবেলা রান্না। দীর্ঘ অবসর। সময় নাই, অসময় নাই,—বিশুদার ওখানে যাতায়াত।

পা টিপিয়া টিপিয়া আসে, লুকাইয়া চারিদিকে তাকায়, আবার চলিয়া যায়। কিন্তু বিশুদার নজরে পড়িলে অন্যরূপ। তখন আর বিড়ালের পা নয়;—হস্তিনীর। বিশুদা ফিরিয়া তাকায় কিন্তু পরস্পর নির্ব্বাক।

কথা কয় না বলিয়া সবিতার রাগ হয়। অন্যপথে দৃঢ়পদে ঘরে গিয়া ঢোকে। কিন্তু কিই-বা! তখন হাতের কাছে যা পায়! সেলাই করা কাপড়খানার সেলাই ছিঁড়িয়া রাখে, খাবার জল ফেলিয়া দিয়া খালি কলসী উপুড় করিয়া দেয়, লণ্ঠনটা মুচ্‌ড়াইয়া দুম্‌ড়াইয়া যা-তা করে, গায়ের জামাটা জলে ভিজাইয়া দেয়।—এমনি সব মারাত্মক দৌরাত্ম্য!

বিশুদা অন্যদিকে চাহিয়া বলে, উঃ—দুপুর বেলা একটু হাওয়া নেই……গুমোট্।

সবিতা তীরবেগে গিয়া হাতপাখাটি কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িতে থাকে।—তারপর একেবারে জানালার বাহিরে।—

কিন্তু বিশুদা না করে প্রশ্ন—না দেয় উত্তর!

সবিতা বদ্‌রাগী। ধুলা লইয়া বিশুদার খাবারে ছড়াইয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

ছেলের অবস্থা এখন একটু ভাল। ডাক্তারী ঔষধের গুণ!

বিশুদার আহ্লাদ আর ধরে না। আধমরা মনে রঙের ছোপ ধরিয়াছে। দিনরাত কাজ করে, আপন মনে গানও গায়।

ছেলের কাছে গিয়া বলিল, ভাল হয়ে কি খাবি গোপাল?

গোপাল বলিল, ঝোল খাবো—আর—

ঝোল? পাঁঠার বুঝি? আচ্ছা তাই তাই।

হাসিয়া আবার বলিল, তোমার মায়ের নামটি কি ছিল গোপাল ?

মায়ের নাম গোপাল শিখে নাই !

করবী, বুঝলি ?—করবী ! মরে গেছে তবু নাম এখনও কানের মধ্যে সর্ব্বদা—

দালানের কোণে করবীর একটি পাষাণ মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। তাহারই হাতের তৈরী। যেন অবিকল ! শুধু প্রাণটুকু চুরি গেছে। সেই মুখ। সেই হাসি। সেই চুল। সেই হরিণীর মত বড় বড় কালো দুটি চোখ ;—নীলপদ্ম !

বিশুদা বিহ্বল। পাষাণীর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, করবী !

অথচ আজ এতখানি উচ্ছ্বাসের কৈফিয়ৎই বা কি ?

চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ছেলে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিশুদা গান গাহিতে গাহিতে তাহাকে আদর করে। দূরে সরিয়া গিয়া বলে, এসো ত গোপালমণি হেঁটে হেঁটে ?

নড়্‌বড়্‌ করিয়া গোপালমণি তাহার কাছে হাঁটিয়া যায়। রোগের পর নূতন পা।

সেদিন সবিতা আসিতেই বিশুদা একেবারে উচ্ছ্বসিত।

দেখ্‌ছ সবিতা দেখ্‌ছ—ছেলে আমার কেমন হাঁটতে পারে ?

দেখছি—সবিতা বলিল। কিন্তু ফিরিয়াও তাকাইল না।

বিশুদা আপনার আনন্দেই বিভোল।—সবিতা বলিল, ছেলে বুঝি খুব আদুরে ?

আদর আর কই কর্ত্তে পারি। ওর মা মরবার পর—তখন আমি আসিনি এদেশে—সেই থেকেই ত ওর রোগ।

বৌ তোমার বুঝি খুব সুন্দরী ছিল ?

সত্যি—খুব। তোমার চাইতেও—না না তা নয়, তবে এই—তোমারই মতন—

কোথায় সে ?

এবারে বিশুদার হাসি,—জানো তুমি তবু জিজ্ঞেস কচ্ছ সবিতা।

সবিতা এদিক ওদিক তাকাইয়া কহিল, রান্না হবে না তোমার ?

দাঁড়াও, আগে যাবো কালী-মন্দিরে পূজো দিতে, তারপর ডাক্তারখানায়, সেখান থেকে এসে তবে বাজার হাট—

ছেলের ওপর দরদের যে আর সীমা নেই ?—ফরফর করিয়া সবিতার প্রস্থান।

ছেলেকে একদফা খাওয়াইয়া, বিছানায় শোয়াইয়া, জুতা জামা চড়াইয়া বিশুদাও বাহির হইল।

খানিক পরে সবিতা আবার আসিয়া হাজির। কেহ কোথাও নাই। একবার সে

চারিদিকে চাহিল। তারপর সমস্ত বাড়ীটাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুমুখে পাষাণ প্রতিমা। একবার দাঁড়াইয়া দেখিল,—ক্রূর দৃষ্টি! আবার চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—ছেলেটা ঘুমাইতেছে। দুর্ব্বল ছেলে!

বিছানার উপর ঝুঁকিয়া ছেলেকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। টের না পায়। না ছেলে—না বাইরের লোক। চুরি করিয়া দেখা।—নিজের কাছেই চুরি!

সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল—পারিল না। একটিবার ছেলের গায়ে হাত রাখিল। নরম গা। তুল্ তুল্ করে—এমনি মোলায়েম।

হাত আর সরানো যায় না। যেন বাঁধা পড়িয়াছে।

ধীরে ধীরে তাহাকে সবিতা কোলে তুলিয়া লইল।

মাতৃহীন! অন্ধকার দুর্গম এই চলাচলের পথে পরিত্যক্ত।—অভাগা!

চোখ জ্বালা করিয়া সবিতার চোখে জল। চোখের জল গড়াইয়া ছেলের গালে পড়িল। তাহাকে নামাইয়া আবার সে বাহিরে আসিল।

কাজের ফের্তা বিশুদা ফিরিল—দেখে—ছেলে ঘরে নাই! এদিক ওদিক দেখিয়া রান্নাঘরে আসিল—সে এক কাণ্ড। রান্না চড়িয়াছে, কুট্‌নো বাট্‌না,—সব প্রস্তুত। সবিতার কাছে বসিয়া গোপাল খাবার খাইতেছে।

বা—। এমন ত জানতুম না? আসবার আগেই যে তুমি—

সবিতা কহিল, আমিই সব আনিয়েছি—আমিই—

আগে যদি জানতুম তুমি এমন করে'—

অনেক কিছুই জানো না তুমি।

এ যে—ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিশুদা ঘরে উঠিয়া আসিল।

প্রকাণ্ড একটা অভাব চোখের সুমুখে!

নদী ছিল, তরঙ্গ ছিল,—আজ কিছু নাই; শুষ্ক। শীর্ণ রুক্ষ বালির চড়া—ধূ ধূ! তাহারই ভিতর হইতে আজ একটা ভয়ঙ্কর সরীসৃপ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ক্ষুধা পাইয়াছে তাহার, তৃষ্ণায় জিব বাহির হইয়া পড়িয়াছে!

বিশুদার গলা বুজিয়া আসিল।

খানিক পরে গোপালের নাম করিয়া সে আবার রান্নাঘরের কাছে আসিল,—আয় রে আয় আমার কাছে।

গোপাল উঠিতেছিল—ঝপ্ করিয়া সবিতা তাহাকে কোলে টানিয়া লইল।—যেতে দেব না।

থাক্ থাক্—তবে থাক্। মায়ের মতন পেয়েছে কিনা।—বিশুদা আবার পিছন ফিরিল।

কিন্তু সবিতা তৎক্ষণাৎ কোল হইতে ছেলেকে নামাইয়া দিল। হাতের সব কাজও পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ ছুটিয়া গেল সে কুট্‌নো কুটিবার বঁটিখানার কাছে। কি একটা কুটিতে গিয়া বাঁ-হাতের একটি আঙুল কাটিয়া ফেলিল। বিশুদার অলক্ষ্যেই।

ফিন্‌কি দিয়া রক্ত!

উঠিয়া আসিল। আঙুলটা দেখাইয়া বলিল, কেঁটে গেল বটিতে। যে ধার—

আহা হা, তাইত—ইস্, আমার জন্যেই ত এমন—বিশুদা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সবিতার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। বলিল, ওষুধ নেই? দাও না একটু। দাও না বেঁধে আঙুলটা ভাল ক'রে—

নিটোল সুন্দর বাঁ-হাত। বিশুদার হাতের কাছেই হাতখানি সরিয়া আসিল। চট্ করিয়া বিশুদা সরিয়া গেল। কহিল—কাটার ওষুধ? দেখি আছে বুঝি আমার কাছে। ছেনি হাতুড়ি নিয়ে কাজ কর্ত্তে হয় কি না—। অনেকটা কাট্‌লো বুঝি?

হুঁ—অনেক।—সবিতা কহিল—ছুঁতে ঘেন্না করে নাকি আমাকে?

বিশুদা চলিয়া গেল।

কিন্তু ঔষধ আসিল না।

সবিতা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। তবুও বিশুদার দেখা নাই। তারপর নিজেই সে উঠিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল—চোরের মত বিশুদা বসিয়া আছে।

কই, ওষুধ দিলে না?—সবিতার কঠিন মুখ আরও কঠিন!

বিশুদা মুখ তুলিল। কহিল—সবিতা, তুমি যাও।

যাবই ত। ওষুধটা দিই আগে।—ডান-হাতে ছিল খানিকটা নুন, তাহাই সবিতা ক্ষতস্থানে চাপিয়া ধরিল।

ব্যাকুল হইয়া বিশুদা একবার তাহার হাতটা ধরিতে গেল—কিন্তু ধরিল না, নিজেই আবার সরিয়া আসিল।

যন্ত্রণায় বিকৃত সবিতার মুখ! হাসিয়া কহিল—এতেই সার্‌বে।

রুদ্ধকণ্ঠে বিশুদা ছেলেকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। চোখের সুমুখে তাহার সব ধোঁয়া।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দ!

বিশুদা স্নান করিতে আসিল। দেখে,—মুখ গুঁজিয়া সবিতা রান্নাঘরের দ্বারে বসিয়া আছে,—কোথাও যায় নাই!

কাছে আসিয়া কহিল—কি হ'ল আবার?

উত্তর নাই।

রান্নাঘরে বিশুদা উঁকি মারিল—কিছু বুঝিল না। পাশ কাটাইয়া ভিতরে ঢুকিল।

একেবারে অবাক। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখিতে লাগিল,—ডাল, ভাত, তরকারি, দুধ, মিষ্টি চারিদিকে ছড়ানো। উনানে জল ঢালা,—ঘরময় ছাই উড়িয়া অন্ধকার। থালা, ঘটিবাটি এখানে ওখানে গড়াগড়ি। চারিদিক একাকার—মৈ-মাড়ন্।

কিন্তু বিশুদা বাহির হইবার অবসর পাইল না। অকস্মাৎ সবিতা উঠিল; দুই হাতে দরজার দুইটা কবাট ধরিয়া পথ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল।

তেমনি করিয়া অধর চাপিয়া মেয়েটার টিপি টিপি নির্ব্বাক হাসি!

বিশুদা কহিল—বল না কি চাও? বল না?

সবিতা কথা কয় না—শুধু হাসে।

থাকো তবে দাঁড়িয়ে; আমিও বসে থাকি এইখানে।

তাই থাকো।—কপাট দুইটা টানিয়া শিকল বন্ধ করিয়া সবিতা প্রস্থান করিল।

বন্ধ দরজায় বিশুদা হাত চাপ্ড়াইতে লাগিল—খোল' সবিতা খোল, দরজা খুলে দাও—

খানিকক্ষণ পরে—

ঝন্ ঝন্ করিয়া শিকল খুলিয়া গেল।

কিন্তু সবিতা নয়—অম্বা! একেবারে মুখোমুখি।

অম্বা হাসি চাপিল—শেকল দিয়ে গেল কে তোমায় বিশুদা?

কি জানি ভাই, বোধ হয় সবিতাই হবে। যেমন ছেলে-মানুষী কাণ্ড তোমাদের!

তা বলে' একেবারে শেকল? আমাকেও হার মানালে যে!—অম্বা কিন্তু রান্নাঘরের ভিতর তাকাইল না।

তোমার সবিতা বন্ধুটি কোথায় গেল, অম্বা-দিদি?

তা ত জানি নে।

বিশুদা নীরব। অম্বা কহিল, ছেলেটা কাঁদছিলো যে এতক্ষণ!

কাঁদুক গে ভাই। দিনরাত ওর কথা আর ভাল লাগে না।—বিশুদা ইঁদারার কাছে গিয়া বসিল।

অম্বারও যেন অন্য কাজ আছে। ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিল। ছেলে ততক্ষণে শান্ত!

তাহার কাছে আসিয়া বসিল। গায়ে হাত বুলাইয়া কহিল, ভাল আছ ?

গোপাল ঘাড় নাড়িল।

আসবে আমার কোলে ?—অম্বা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। পরে ছেলের মুখের উপর নিজের মুখ রাখিল। তারপর গাল দুটি ধরিয়া কহিল—বড় হয়ে আমায় কি বলে ডাকবে ?

ছেলে মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু কথা বলে না।

নাম ধরে' ডেকো, কেমন ?—ছেলেকে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল—এমনি করে' আমাকেও খুব আদর করো, বুঝলে ?

একবার ছেলেকে নামাইয়া দেয়—আবার কোলে তুলিয়া লয়। এম্‌নি বার বার!

সমস্ত হৃদয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরে। বুকের উপর যেন পিষিয়া মারে।

বার বার সে শুধু মাত্র অনুভব করিতে চায়—সে নারী!

আর যাহাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে—সে পুরুষ!

অম্বা একেবারে বিহ্বল! ঘুরায় ফিরায় দোলায়—আর ছেলেকে দেখে। আবার আদর করে। তারপর যত্ন করিয়া নামাইয়া দিল।

যাইবার সময় দেখে—ইঁদারার পাড়ে বসিয়া বিশুদা। মুখোমুখি হইল, কিন্তু কথা বলিবার মন কাহারও নয়।

আহ্লাদীর বিয়ে—। রেবার নাম আহ্লাদী। যে শুনিল সেই গেল। আহ্লাদী বড় আদরের!

ছেলে-কাঁধে বিশুদাও গেল। —রেবাদিদির সশরীরে নিমন্ত্রণ!

গেল না মুন্না। কোন্ পরিচ্ছদটি পরিয়া গেলে তাহাকে সুন্দর দেখাইবে—তাহা সে অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে বসিয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই তাহার পছন্দ হইল না। তখন বলিল, একটা আঁক্ নিয়ে ব্যস্ত আছি। তাছাড়া যারা হ্যাংলার মত নেমন্তন্ন খেতে যায়, আমি তাদের ঘৃণা করি। বাবার এক মক্কেল বলেন—

বাবার মক্কেলকে কেহ গ্রাহ্য করে না!

আর গেল না সবিতা। তাহার বাড়ীর সকলে গেল। সেও বাহির হইল কিন্তু মাঝপথ হইতেই ফিরিল।

নিমন্ত্রণ সারিয়া বিশুদা ফিরিল। কাঁধে গোপাল।—অনেক রাত।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল—রাঙা আলো! প্রদীপের নয়,—আগুনের আভা! চারিদিকে পোড়া গন্ধ!

সে কি !—বিশুদা ঘরের কাছে আসিল। অকস্মাৎ তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার। পট্ পট্ করিয়া শব্দ। ভিতরে আগুন। আর সেই আগুনের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আগুনেরই শিখা,—সবিতা !

গোপালকে এক জায়গায় নামাইয়া বিশুদা ছুটিয়া আসিল।—সরো সরো, পথ ছাড়ো—ছারখার হয়ে গেল যে !

সবিতা পথ ছাড়িল না। দুই হাতে ঘরের পথ আড়াল করিয়া দাঁড়াইল। কহিল—যাক্।

পুড়ে যাবে অম্‌নি করে' ঘর দোর জিনিস পত্তর ?

হ্যাঁ পুড়ুক্। বাইরের আগুনটাই কি এত বড় ?

বিশুদা ছট্‌ফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল কিন্তু সবিতা পথ দিল না। ততক্ষণে ঘরের যা কিছু সব পুড়িয়া গেছে।

হাওয়া পাইলে আগুন উড়িয়া বেড়ায়। একপাশে ছিল করবীর প্রতিমা। অতি যত্নে পাষাণ মুর্ত্তিতে কাপড় চোপড় পরানো। তাহাতেও আগুন ধরিল। বিশুদা ঘুরিয়া যাইতেই সবিতা তীরবেগে গিয়া পথ আগ্‌লাইল।

পথ ছাড়ো সবিতা—পথ ছাড়ো, পায়ে ধরি তোমার—

সুন্দর সুডোল ডান-পাখানি সবিতা বাড়াইল—ধরো পায়ে !

পায়ে আল্‌তার দাগ। তাহাও আগুনের রঙ্। বিশুদা পিছাইয়া গেল। সবিতা হাসিয়া কহিল, এখনও ছোঁবে না ? ছুঁলে দোষ হয় বুঝি ?

করবীর মূর্ত্তি ততক্ষণে পুড়িয়া পুড়িয়া কালো। বিশুদা কাঁপিতেছিল। বলিল, হ্যাঁ।

তবে ছেলে পাবে না—যাও। আমার ছেলে।—হঠাৎ ছুটিয়া গিয়া সবিতা গোপালকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

বিশুদা আর পারিল না। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গোপালের একটা হাত ধরিল। বলিয়া উঠিল—ছেলে তোমার নয়, আমার।—হাত ধরিয়া সে গোপালকে টানিয়া লইল।

তোমার ?—বেশ ! — সবিতা নিঃশব্দে চারিদিকে একবার তাকাইল, তারপর অন্ধকারে বাহিরে আসিয়া পথে নামিল। দুই চোখে তার দুই ফোঁটা আগুন !

ওদিকেও আগুনের ক্ষুধা মিটিতে চায় না। পাথরের ঘর—তবু জ্বলিতে থাকে।

গোপাল ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। বিশুদা তাহাকে বুকে লইয়া আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

মন দিয়া বিশুদা আবার কাজ করে। কিন্তু মন থাকে না।

কোথায় অসমাপ্ত মন্দির। তাগিদের পর তাগিদ আসে সেখান হইতে। কিন্তু কাজ কর্ম্মে বড় গোলমাল হইতে লাগিল। ভিতরের শিল্পী যেন পথ ভুলিয়া অন্যপথে গেছে।—

তবু চেষ্টার অন্ত নাই।

যন্ত্রপাতি লইয়া বিশুদা আবার বসিল। আবার করবীর মূর্ত্তি গড়িতে হইবে!

পাথর খোদাই চলিতে লাগিল।—

করবী!—স্বপ্ন শুধু করবীকে লইয়াই। মানস সরোবরের প্রস্ফুটিত পদ্ম!

দেহের সব গড়নগুলি ঠিক ঠিক হইল,—মুখখানি কেবল বাকি। যত গোলমাল এই খানেই।

ছেনি দিয়া কুঁদিয়া কুঁদিয়া দাগ কাটিতে থাকে আর মানস সরোবরের দিকে তাকায়।

চুলগুলি তেমনি হয়, কিন্তু কপালটি? ভুরু দুটি ত হইল না!—আবার কারিকুরি চলিতে থাকে।

চোখ দুটি হয়। নাকটিও এক রকম করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঠোঁট দুটি? হাসিটি?—বিশুদার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে।

কি যেন কোথায় হারাইয়া গেছে!—

ক্লান্ত মন! ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি—সুনিবিড়। উপরে দ্যুতি পাণ্ডুর আকাশে ফট্‌ফটে তারা। কোটি কোটি দীপ্ত চক্ষু শুধু তাহারই দিকে। বিবশ-বিহ্বল চাঁদের আলো ব্যথায় আতুর। দূরে অস্পষ্ট শাদা বাড়ীগুলি মায়াপুরীর মত!—বিশুদার অর্দ্ধ-জাগ্রত দৃষ্টি কাঁপিতে থাকে।······ভুখারী অন্তরাত্মা বন্দীশালার বন্ধ দুয়ার আঁচ্‌ড়ায়। পাথরে দাগ কাটে।

তা হক—। বিশুদা আবার ফিরিয়া আসিল। আলো জ্বালিল। তারপর একমনে বসিয়া গেল।

কাজ শেষ হইল; মোরগও ডাকিল।

নিখুঁৎ মূর্ত্তি এইবার। চমৎকার! ধ্যান আসিয়া আকারে ধরা দিল।

ম্লান প্রদীপ ম্লানতর হইয়া নিবিয়া গেল।

দিনের অস্পষ্ট আলো—

ক্লান্ত চক্ষুদুটি রগড়াইয়া বিশুদা উঠিয়া দাঁড়াইল। এক মুখ হাসি! সমস্ত ক্ষোভ মুছিয়া গেছে।

বাহিরে গেল। মুখে চোখে জল দিল। ছেলেটা তখনও অকাতরে ঘুমাইতেছে।

······সুন্দর প্রভাত ! দূরে উষসীর শুভ্র ললাটে ব্যাধের বাণ বিঁধিয়া রক্ত ঝরিতেছে। আরক্ত মুখখানিতে শুকতারার উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দুটি !—পাখী ডাকে না ? সলজ্জ মধুর গন্ধটুকু কার ? নিশিগন্ধার শেষ মিনতি বুঝি ?

বাঁকি কাজটুকু সারিতে সে আবার বসিল।

কিন্তু একি ! অকস্মাৎ বিশুদা শিহরিয়া উঠিল।

সদ্য-সমাপ্ত মূর্ত্তিটি,—এ ত' করবীর নয় ! কে এ ?

অথচ চেনা মুখ, চেনা দুটি চোখ, চেনা হাসি,—সবই চেনা !—কিন্তু করবী ত নয় !

সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন দিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিল—সে যে সবিতা ! সবিতাই ত বটে !

বিশুদা উন্মাদের মত উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। কপালের শিরাগুলি স্ফীত, ক্ষুরধার দৃষ্টি। নিজের কাছে নিজে অপরাধী।

নিজের ভিতরেই কি একটা ঘুমভাঙ্গা বস্তুর প্রতি সে তাকাইতে লাগিল।

এবার বিশুদার পথের জীবন। ঘর দোর আর ভাল লাগে না।—প্রলোভনের পঙ্কিল বাতাসে বিষজর্জ্জর !

ঘরে অক্ষম দুর্ব্বল সন্তান। তাও যেন একঘেয়ে।

সে চায় দূর-দুর্গম পথ। নিজের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা।

কিন্তু ক্ষুধা আছে—তৃষ্ণা আছে। ছেলেটার তদ্বিরও দরকার।

সারাদিন বাদে ঘরে ফিরিল। হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া শুনিল—ভিতরে চীৎকার !

অম্বার গলা। বিশুদা ছুটিয়া ঘরে আসিল। অম্বা ছুটাছুটি করিতেছে। বলিল, শিগ্‌গীর দেখ বিশুদা, ছেলে কেমন কচ্ছে। আমি এসে দেখি যে—

বিশুদার পা অবশ। দেখে—ছেলেটা ছট্‌ফট্ করিতেছে, হাত পা বাঁকিয়া গেছে, মুখ দিয়া শব্দ বাহির হয় না,—দুইটা চোখই কপালে তুলিয়াছে।

ডাক্তার !—কিন্তু কেই-বা ডাক্তার ডাকে। ছেলেকে চাপিয়া ধরিয়া বিশুদা চীৎকার করিল—গোপাল ?

আর গোপাল ! ঘরময় শুধু তার বিদ্রূপাত্মক প্রতিধ্বনি। ছেলের তখন শেষ অবস্থা। শক্ত শীর্ণ আঙুলগুলি দিয়া পিতাকে আঁকড়াইতে চাহিল, প্রাণপণে সাড়া দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু শক্তি কই ! বিছানার উপর আবার টলিয়া পড়িল। নিঃশব্দ—নিস্পন্দ !

বিশুদা, ও বিশুদা—ছেলে গেল যে ?

বিশুদা পাথর। মরা ছেলেকে অম্বা জাপ্‌টাইয়া ধরিল। বলিল—ও বিশুদা, শুন্‌চ ?

শুন্‌চি—তা আমি কি করব অম্বা ? গেল মরে ! গেল ত গেল······যাক্। আমি কি করব !

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বিশুদা চলিয়া গেল।

অন্ধা ত কাঁদে না,—কাঁপে!

তারপর—। সে কথা কেহ ভাবে নাই। বিশুদার বিদায়।

অলক্ষ্যে বিশুদা বাহির হইল। হাতে একটি পুঁট্‌লি।—সন্ধ্যাকাল।

বাঁ-হাতি রাস্তায় নামিয়া বরাবর গঙ্গার পথে। রাস্তায় তখনও আলো জ্বলে নাই।

অনেকদূর গিয়া ডান দিকে। রাস্তাটি একেবারে গঙ্গার কোলে গিয়া মিশিয়াছে।

ঘাটে নামিয়া চুপ করিয়া বিশুদা দাঁড়াইল। নদীর ওপারে পূর্ণিমার চাঁদ। সুমুখে জল স্থির,—ভিতরে শুধু অবিরাম কল্‌কল্ শব্দ। সোনার মত চাঁদের আলো তাহারই উপর।

ঘাট জনহীন। শুধু দূরে একটা জলন্ত চিতা। তাহারই কাছে বসিয়া একটা হিন্দুস্থানী কানে হাত চাপিয়া দেহতত্ত্বের গান করিতেছিল।

চিতা!—আর একটা উহারই পাশে। ওইটিতেই তাহার সংসারের একটি মাত্র বন্ধন জ্বলিয়া পুড়িয়া গেছে!

পিছনে কে দাঁড়াইয়া!—এ কি, সবিতা!

আসছিলে বুঝি পেছনে পেছনে?

হুঁ।

যেন উন্মাদিনী! উপর দিয়া ঝড় গেছে, ঝঞ্ঝা গেছে,—প্রলয় গেছে।

কি চাও সবিতা?

অব্যক্তকণ্ঠে সবিতা কহিল—আমিই মেরেছি, আমিই—বিষ খাইয়ে—

বিশুদা ফিরিয়া তাকাইল। অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসি—তাই নাকি? বিশ্বাস কর্ত্তে হবে এ কথা?

বিশুদা সব পারে—এ-কথাটি শুধু বিশ্বাস করিতে পারে না!

ধূলা-বালির উপর সবিতা বসিয়া পড়িল। বিশুদা কহিল, শেষ বেলায় সে ত অন্ধাকে ডাকে নি—আমি জানি—তোমাকেই সে চেয়েছিলো। সবিতা, তুমিই তার মা।

সবিতা পা ছুঁইবার চেষ্টা করিতেই বিশুদা সরিয়া দাঁড়াইল—ছোঁবার সময় এখনও আসে নি, সবিতা।

অস্ফুটকণ্ঠে সবিতা কহিল—শাস্তি দাও।

শাস্তি!—বিশুদা হাসিল,—তোমাকে ত জানি সবিতা, নিজেকেও চিনেছি। দেবতা ত নই!

নিঃশব্দে উঠিয়া সবিতা আপনার পথে চলিয়া গেল।—অভিমানিনী!

কিন্তু এ জীবনের বাসনাই বা কি তাহার !

এই যে নৌকা ! কোথায় ছিল এতক্ষণ !—ওগো মাঝি, পার করবে ? আর যে দাঁড়াতে পারি না।

দূর হইতে শব্দ আসিল, করব গো করব, ব্যস্ত কেন ? ওই ত কাজ আমার !

ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়িল। দুইজন নামিয়া আসিল। রেবা আর নির্ম্মল--রেবার বর।

এ কি—বিশুদা ? কোথায় ?

পারে যাবো ভাই,—ওই রামনগরে। কাজের চেষ্টায়—

নির্ম্মল দাঁড়াইয়া রহিল। রেবা আসিয়া তাহার হাত ধরিল—আর আসবে না বিশুদা ?

আসবো বৈকি দিদি,—যাওয়া আসাই ত সম্বল !—ও মাঝি, রাত হল যে।

চল না বাছা, বসেই আছি ত তোমার জন্যে। তুমিই মায়া কাটাতে পাচ্ছ না !

হেঁট হইয়া রেবা বিশুদার পায়ের ধূলা লইল। আনন্দ ছুঁইল বেদনার পা দুটি ! মৃত্যুর পায়ে জীবন মাথা ঠেকাইল !

কি কাজ সেখানে করবে বিশুদা ?

এই যা হক একটা—না না, পাথরের কাজ আর নয়, দিদি। ওটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়। ওসব আর নয়।

মাঝ নদী—। চাঁদের আলোয় আবছা দুই তীর। উপরে আকাশ।

কত দেবে গো ?

দিয়েছি ত ভাই তোমার পাওনা ?

ওতে হবে না।

হবে না ?—নাও তবে এই পুঁটলিটা ?

ওটা ত পুঁটুলি।—জঞ্জাল একটা।

বিশুদার দৃষ্টি উপর দিকে। মুখ তুলিয়া রহিল—সবই ত দিলাম—যা কিছু ছিল,—সব। আর ত কিছু নেই !

চল তবে,—কি আর করি। পার করতে হবে ত !

* * * * * * *

পরিত্যক্ত অন্ধকার ঘর। —

বাণ-বিদ্ধা একজন মাটিতে লুটাইয়া দুই হাতে বুক মুচ্‌ড়াইয়া ছট্‌ফট্‌ করে। বুক মরুভূমি—কিম্বা পাথর! আঁচড়ায় শুধু—জল নাই! চীৎকার করিতে যায়—কণ্ঠস্বর নাই!

সবিতার প্রেতাত্মা!

আর একজন ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; নিশি-পাওয়ার মত!—অন্ধার ছায়া!

ওদের কে পার করে?

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

ঢুম্‌কা-রাণী

পাহাড়-ঘেরা বাঁধের তীরে—
পথ ফুরাল শেষ রাতে,
সাম্‌নে দূরে উচ্চ চূড়া—
দাঁড়িয়ে আছে জ্যোৎস্নাতে।
কাল্‌কে রাতে প্রহর জাগি'—
এসেছি আজ যাহার লাগি'—
সেই মোহিনী ঘুমায় তখন
শিরীষ-কেশর-শয্যাতে।

সন্ধ্যে-তারার আলোক থেকে
জ্বালিয়ে আপন দীপ-খানি
ঘুমিয়ে আছে 'ঢুমকা'-রাণী
এলিয়ে তনুর ফুল্‌দানি।
অ-ফুরন্ত ধূপের বাসে
মৃগ-নাভির গরব নাশে,—
পালিয়ে গেছে তিলোত্তমা—
কটাক্ষে তার হার মানি'।

ঝর্ণা-ধারা গাইছে গো তার
নূপুর-পরা পা'র কাছে,
ভোরের পাখী উঠ্‌ছে ডাকি'—,
ফুট্‌ছে আলো শাল-গাছে।
মৌয়া-ফুলের মদালসে
ওড়্‌না-খানি গেছে খসে',
তখনও তার মুখের 'পরে
জরির চিকণ জাল আছে।

আস্‌মানি-নীল কাঁচলি তার
শিউরে ওঠে উচ্ছ্বাসে,—
অন্তরে বয় আবেগ-তুফান,
বাইরে তাহার ঢেউ আসে!
বসন্তিয়া পর্‌দা টানি'
স্বপন দেখে পরীর রাণী,—
রঙীন্‌ হিয়া নিঙাড়িয়া
দিলাম আজি তার পাশে।

চির-যুগের কান্তা আমার,
প্রাণ-প্রতিমা, বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সীঁথির মণি,
শিথিল বেণীর নীল-ফিতা।
নিমন্ত্রণের পত্র লিখে'
পাঠিয়েছিলে এই পথিকে,—
শুনব মধুর কণ্ঠ তুহার,
জাগো ফাগুন-পুষ্পিতা।

তোমার রূপের দরবারে আজ
ভেট দিনু এই বরণ-হার,
চারু চোখের চোরা দিঠি
চম্‌কে দেছে দিল্‌ আমার।
তোমার পাণির তড়িৎ-ভরা
দাও পরশন তরুণ-করা,
ঘুচাও মম অকাল জরা,
খোলো শৈলপুরীর দ্বার।

লো পাষাণি, এই প্রবাসে
একটু বস' মোর সাথে,
হোক্ দু'জনে চোখো-চোখি
নীল পাথরের পঁইঠাতে।
গরীব-খানায় খেয়াল-সুরে
আমিই না হয় ছিলাম দূরে,—
তুমিই বা কোন্ ডাক্‌লে মোরে
বকুল-ঝরা দোল-রাতে?

কুঞ্জে যখন ক্ষ্যাপা পবন,
লুট্‌ত মধু যূঁই-ফুলে,
স্বপন-ঘোরে তখন মোরে
গেছ্‌লে প্রিয়ে, স্রেফ্ ভুলে'।
সে দিন তোমার এই লাবণি
লুকিয়ে কেন রাখ্‌লে ধনি!
তাকাও নিত' হায় স্বজনি,
কওনি কিছু চোখ তুলে'!

দিনের রঙে এই দুনিয়া
ঝাপ্‌সা দেখে যার আঁখি,
আব্‌ছায়ারা আল্‌পনা দেয়,
ফির্‌তি বেলার নেই বাকি;
শুক্ল কেশে অতিথ সাজি'
পরদেশীয়া ডাক্‌ছে আজি—
ওই দেখ' তার প্রিয়তমার
লাজ ভেঙ্গে দেয় বন-পাখী।

আবার নব কিশোর হ'ব
দাও রসায়ন, সুন্দরী,
চল' কুটীর-আঙ্গিনাতে
সোহাগ-সিঁদুর টীপ পরি'।
ফির্‌ব না সই—ফির্‌ব না লো,
সঙ্গ তুহার লাগ্‌ছে ভালো,—
জীয়াও তারে দরদ-ভারে
গিয়াছে যার মন মরি'।

রাখ' আমার শেষ মিনতি,
ছল ক'রোনা নিঠুরা,
সুর মিলায়ে দাও গো বেঁধে
তার-ছেঁড়া মোর তান-পূরা;
গাইব গীতের শেষের কলি,
রস-লহরী দাও উথলি',
তৃষাতুরের পেয়ালাতে
দাও গো ঢালি' শেষ সুরা।

আধ-ঘুমানো মুখে তোমার
হাসি-টুকুন্ লুকিয়ো না,
উদাস হ'য়ে বাঁকিয়ে গ্রীবা
সাধের মালা শুকিয়ো না;
এই যদি শেষ ছিল মনে,—
বিদায় দেবে আপন জনে,
মিথ্যা কেন আমায় তবে
কর্‌লে হেন উন্মনা।

ওই অলকে, ওই কপোলে,
অপাঙ্গে কি ভঙ্গিমা!
অভিসারের ললিত-বেশে
বিলাস-লীলার নেই সীমা।
নুর্‌-জাহানের রূপ জিনিয়ে
নিলে যে মোর মন ছিনিয়ে!—
চুণির মত দাও রাঙ্গিয়ে
অনুরাগের রক্তিমা।

'দুধ-পাথরে' তোমার নিখুঁৎ
মূর্ত্তি গড়ি' নির্জ্জনে,
আঙ্গুর-মিঠে অধর-পুটে
পিয়াস মিটাই তন্মনে।
জনম জনম এম্‌নি ক'রে
লুকাও দূরে কাঁদিয়ে মোরে,
দাগ রেখে যায় তোমার ছায়া
আমার স্মৃতির দর্পণে।

আজও ফোটে তেম্‌নি শোভায়
বন-গোলাপের লাল কুঁড়ি!
নিথর হয়ে প্রজাপতি
বসে গো তার বুক জুড়ি'।
বাঁধের ঘাটে 'পূর্ণিমা' সে
চুপি চুপি নাইতে আসে,—
গুম্‌রে উঠি' শুনি যখন
বাজে তরল জল-চুড়ি।

জাগাও তৃষা, মিটাও তৃষা
লো ষোড়শি সঙ্গিনি,
ঘূর্ণি-হাওয়ায় অনেক ঘুরে'
এলাম চলে' পথ চিনি'।
তোমার পানে চেয়ে চেয়ে
আফ্‌শোসে চোখ আস্‌ছে ছেয়ে,—
কেন মদির যৌবনে মোর
দাওনি ধরা রঙ্গিণি!

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গ-সাহিত্যে দুইজন উৎকল-কবি

বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টিকল্পে, মুসলমান ও খ্রীষ্টান্ পাদ্‌রিগণ যে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইলেও, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহিমা-প্রভাবে তদ্দেশবাসিগণ, বঙ্গবাসীর সহিত ভাবের আদান-প্রদানে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন। মহাপ্রভুর প্রেম-বন্যায় অভিসিঞ্চিত হইয়া উড়িষ্যাবাসীর হৃদয়-ক্ষেত্র যেরূপ সরস হইয়াছিল, তাহাতে বহু সুফলের আশা করা অসঙ্গত নহে। উড়িষ্যা দেশে, যথাযথভাবে সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা হয়ত অচিরেই জানিতে পারিব যে, বহু উড়িষ্যাবাসী কবি, বঙ্গভাষায় বহু পদ বা গান ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া পরোক্ষভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের অচিরেই অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য—বিলম্বে হয়ত বহু রত্ন চিরতরে বিলুপ্ত বা নষ্ট হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দুইজন উড়িষ্যাবাসী কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি। ভরসা করি, মাতৃভাষানুরাগী মহানুভবগণ অপরাপর কবির সন্ধান ও পরিচয় সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে অনুরক্ত হইবেন।

১—সনাতন বিদ্যাবাগীশ, দ্বিজ

সনাতন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বঙ্গভাষায় পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইনি অনুমান দুইশত বৎসর পূর্ব্বে, কটক জেলার মধ্যে, বারুঞা পরগণার অন্তর্গত কবিরপুর পোষ্ট আফিসের অধীন পুরুষোত্তমপুর গ্রামে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন সনাতনের বংশ লুপ্ত হইয়াছে।

সনাতন-প্রণীত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ এ-যাবৎ অপ্রকাশিত। ১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারী, সন্ধ্যার সময়, পুরীধামে জগন্নাথ দেবের নাট-মন্দিরে, আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় দেখিতে পান যে,—কটক জেলার গণ্ড-গোবিন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরহরি চেল মহাশয় তাঁহার বৃদ্ধ পিতৃদেবকে ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া সনাতন-প্রণীত হস্তলিখিত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন। আমার পিতৃদেব মহাশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ কয়েকটি ঘৃত-প্রদীপ ক্রয় করিয়া সেই ভাগবত গ্রন্থের অপঠিত অংশ হইতে, সেই ক্ষীণালোকে তাড়াতাড়ি যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। তাহা হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল। আমিও সে সময় তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলাম। হরেকৃষ্ণ চেল মহাশয় আমাদের ব্যয়ে এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি করাইয়া দিতে জগন্নাথ দেব সমক্ষে বাক্যবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে কয়েকবার স্মারক-লিপি প্রেরিত হইয়াছিল—কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ ও প্রকাশযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুঁথিশালার অধ্যক্ষ, আমার পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম-এ, মহোদয় গত বৎসর আমার পিতৃদেবকে এই গ্রন্থ-প্রাপ্তির সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৯১৪ খ্রীঃ হইতে এ-যাবৎ সনাতন বিদ্যাবাগীশ রচিত সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের কোথাও কোনরূপ সংবাদ বা কাহারও দ্বারা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনার কথা অবগত নহি।

সনাতন স্বপ্রণীত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে এই ভাবে ভণিতা দিয়াছেন—

(ক) প্রথম স্কন্ধের কথা অষ্টম অধ্যায়।
কুন্তীস্তব সনাতন রচিল ভাষায়॥

(খ) কহে নৃপবর ওহে ধরামর
আগমন কি লাগিয়া।
সনাতন গীত পদ সুললিত
দ্বিজ বলে বিরচিয়া।

অষ্টম স্কন্ধের শেষ পত্র এইরূপ—

অষ্টম স্কন্ধেতে ভাগবত ভাষামতে।
মৎস্য মনুকথা চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়েতে॥
সাধুগণ হিতে বিরচিল সনাতন।
পূর্ণ হৈল অষ্টম স্কন্ধের বিবরণ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসসংহিতায়াং বৈয়াহিক্যাং অষ্টম স্কন্ধে মৎস্য অবতার কথন চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়॥ ইতি অষ্টম স্কন্ধ ভাষা সমাপ্ত॥ যথাদৃষ্টং ইত্যাদি॥ লিখিতং

শ্রীগুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়॥ পুস্তকের মালিক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ সেনস্য॥ সাং বন্ধুডি পং অনতি। তপ্পে সাহাজানপুর॥ মাহ চৈত্র ২৮ বৃহস্পতিবার সাঙ্গ হৈল॥ লিখন সন ১২৪৯ সাল, শকাব্দ ১৭৩৩ সাল। শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥ শ্রীগুরুবে নমঃ॥ (৩৭ পত্র)

গ্রন্থের আকার সাধারণ পুঁথির আকারে, প্রতি স্কন্ধ গড়ে ৪০-৫০ পত্র। প্রতি পত্রে দুই পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র করিয়া লেখা। দশম স্কন্ধে ৫০০ পত্র। শ্লোক সংখ্যা অনুমান পঞ্চাশ সহস্র।

২—সারল কবি

সারল বা সাবল কবি 'উৎকল ব্রাহ্মণ' ছিলেন। ইনি, "বৃহদ্ বিরাট" নাম দিয়া মহাভারতান্তর্গত "বিরাট পর্ব্ব" রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিও এ-যাবৎ অপ্রকাশিত। তবে, এই কবির কথা অনেকেই অবগত আছেন। মৃত-কর্ম্মে "বিরাট পর্ব্ব" পাঠের ব্যবস্থা, প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। এই নিমিত্ত অন্যান্য রচয়িতার 'বিরাট-পর্ব্বের' ন্যায়, সারল কবির বিরাটপর্ব্বও বহুস্থলে পুথির আকারে পাওয়া যায়। আমাদের 'রতন'-লাইব্রেরী'র পুথি-শালায়, এই গ্রন্থের দুইখানি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আছে (রতন-লাইব্রেরী বীরভূম—পুথি নং ১১০১ ও ১৭৫৯)। প্রথমোক্ত পুঁথিখানি বৃহৎ পুঁথির আকারে ১০০ পত্র বা দুইশত পৃষ্ঠা। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬ ছত্র করিয়া লেখা।

গ্রন্থকার, স্বীয় গ্রন্থমধ্যে কোথাও কোনরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। ভণিতাংশ এইরূপ—

(ক)—সারদার পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
রচিল সারল কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥
(খ) সারদা সেবিয়া মনে চিন্তিয়া উপায়।
বিরাটপর্ব্ব ভারত-কথা সারল কবি গায়॥
(গ)—ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল।
সারল কবিরে সারদার কৃপা হৈল॥

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ—

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন। দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বপিতামহগণ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিল লুকায়ে। একই বৎসর বঞ্চে অজ্ঞাত হইয়ে॥
কিরূপে পরের ঘরে করিল বঞ্চন। কোন নামে কোন বেশে রহে কোন জন॥
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার। দুর্য্যোধন দুষ্টমতি বড় দুরাচার॥
মুনি বলে জন্মেজয় শুন সাবধানে। কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই আছয়ে কাননে॥
অনেক ব্রাহ্মণ আছে করিয়া বেষ্টিত। আপনি হইয়া মুনি ধর্ম্ম পুরোহিত॥

সে সকল নঞা রাজা কানন ভিতরে। হইল বনের অন্ত দ্বাদশ বৎসরে॥
সভে জ্ঞাত আছে তাহা পূর্ব্বের উত্তর। রাজা নিয়ম করিয়াছে সভার ভিতর॥
দ্বাদশ বৎসর মোরা রহিব বিপিনে। এক বৎসর অজ্ঞাতে বঞ্চিব ছয় জনে॥

ইত্যাদি।

গ্রন্থশেষে কবি বলিতেছেন—

কন্যা বিভা দিয়া তবে মৎস্য অধিকারী। নয়ন ভরিয়া দেখ বল রাম হরি॥
আনন্দের নাহি সীমা ভাই পঞ্চজন। গোবিন্দ সহিত করে কথোপকথন॥
হইল বিরাট পর্ব্ব এত দূরে সায়। সারদাকে ডাকিয়া সারল কবি গায়॥
অজ্ঞান বালক শিশু অতি মূঢ়মতি। কেবল ভরসা মনে দেবী সরস্বতী॥
এই সে ভারতকথা অতি সুধাময়। যত শুনি তত মোর তৃপ্তি নাহি হয়॥
এ-কথা শ্রবণে পাপীর পাপ হয় নাশ। শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস॥
সেই অনুসারে আমি পাঁচালী রচিল। এ কথা শ্রবণে পাপীর পাপ হরে গেল॥
এক মনে নর যদি স্মরণ করয়। মনের সদগতি হয় নাই যমভয়॥
অনায়াসে তরে সেই শমনের দায়। লিখেন সারল কবি শ্রীহরি কৃপায়॥
আদিরস অনুসারে লিখিলাম এত। এতদূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

গ্রন্থকারের রচনার আদর্শ স্বরূপ. আমরা যথেচ্ছভাবে একস্থান হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

বৃহন্নলা বচনে উঠিল পুনর্ব্বার। শমী বৃক্ষ তলে গেলা বিরাট কুমার॥
বস্ত্র আচ্ছাদিত ছিল মুচাইল যত। সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
দেখিয়া আকুল বড় বিরাট তনয়। বড়ই কাতর চিত্ত কম্পিত হৃদয়॥
ডাক দিয়া বৃহন্নলা বৈরাটীরে বলে। সর্প নহে ধনুকের জ্যোতি সে নিকলে॥
নির্ভয় হইয়া শুনি বিরাট কুমার। পঞ্চ গোটা ধনু দেখি অতি মনোহর॥
দিব্য গদা পঞ্চ শঙ্খ অতি অনুপম। ধনু পৃষ্ঠে আছে কত বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
দেখিয়া বিস্ময় চিত্ত পুলকিত তনু। শুন বৃহন্নলা এই দেখি পঞ্চ ধনু॥
কোন জনা থুয়ে এথা গেলা ধনুর্ব্বাণ। এই পঞ্চ ধনু আছে কাহার কি নাম॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাটের সুত। যার যে ধনুর চিহ্ন দেখ অদভূত॥
যে ধনু হেমের বর্ণ চপলা শোভন। ছয় হংস ধনু পৃষ্ঠে আছয়ে শোভন॥
সেই ধনু যুধিষ্ঠির করেন ধারণ। যেই ধনু ধরে হাতে ভীম বলবান॥
সহস্রেক গদা যেই ধনুতে নির্ম্মাণ। শুন শুন রাজপুত্র করি নিবেদন॥
সুপার্শ্বক নামে ধনু ধরে বৃকোদর। যাই যেই চিহ্ন ধনুর শুনহ উত্তর॥

যে ধনুর পৃষ্ঠে ব্রহ্মা আছেন নির্ম্মাণ। সেই ধনু ধরেন নকুল মন্ত্রীমান ॥
সহদেবের যেই ধনু কহিব তোমারে। শিখিধ্বজ যেই ধনুর আছয়ে উপরে ॥
নিপিলি ভূষিত গদা অতি দীর্ঘতর। ভীমের হাতের গদা শুনহ উত্তর ॥
নীলোৎপল আভা যেই মাণিক রচিত। শত চন্দ্র আভামণি মাণিকে খচিত ॥
শিখিপাখের শর গোছা দুই গোটা তূণ। সেই ধনু শর ধরেন পাণ্ডব অর্জ্জুন ॥
লক্ষবল গাণ্ডীব বলিয়া যার নাম। সুরাসুর পূজিত ধনুক অনুপাম ॥
ব্রহ্মা ধরিলেন করে পঁচাশী বৎসরে। প্রজাপতি ধরিয়া দিলেন নিশাকরে ॥
বহুদিন রাখি চন্দ্র দিলা বসুগণে। বসুগণ সেই ধনু দিলেন বরুণে ॥
বরুণের স্থানে আজি দেব হুতাশন। মাগিয়া লইল ধনু করিয়া যতন ॥
অনল আনিয়া ধনু দিলা পার্থবীরে। যে ধনুতে পরাজয় দেব পুরন্দরে ॥

'পাণ্ডব-প্রবেশ' ও 'পাণ্ডব-প্রকাশ' প্রভৃতি স্থান মিল করিয়া দেখা হইল। গ্রন্থকার মূল সংস্কৃত গ্রন্থের যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়া পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। গ্রন্থ-শেষে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে বলিয়াছেন —'সেই অনুসারে আমি পাঁচালী রচিল'।

শ্রীগৌরীহর মিত্র

পরাজয়

যোগস্নান সারিয়া ধাক্কা ঠোক্কর খাইতে খাইতে ভিড় হইতে রতিকান্ত যখন বাহির হইয়া আসিল তখন দেখিল জনকয়েক লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝখানে বসিয়া একটি বছর দেড়েকের শিশু কাঁদিতেছে।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, ক'র ছেলে মশায় ?

পার্শ্ববর্ত্তী একজন লোক উত্তর করিল, কা'র ছেলে বুঝতে পাচ্চেন না! ভাল ঘরের ছেলে যে নয় তা'ত বোঝাই যাচ্চে, নইলে এতটুকু দুধের ছেলে কি কখনও এমনিভাবে পড়ে থাকে ?

রতিকান্ত সোজা মানুষ। কথাটা বুঝিতে পারিল কি না সন্দেহ! জিজ্ঞাসা করিল, তা' এর বাপমায়ের খোঁজ পেয়েছেন আপনারা ?

আঃ, মশায়! বাপ-মাই যদি ত্যাগ করে যায়, তা'লে আর ত'াদের খোঁজ করে কি লাভ বলুন দিকি!

তা'রা কেন ত্যাগ করতে যাবে ?

তা'কি আর বুঝতে পাচ্চেন না, নইলে তাদের মুখ দেখাবার জায়গা কোথায় ? ছেলে যে তাদের শত্রু !

কথাটা রতিকান্তের কানে প্রবেশ করিল কিনা বোঝা গেল না। ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিয়াছে, রতিকান্ত সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। আর ঘণ্টাখানেক যদি এমনিভাবে কাটে তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশের শিশুমৃত্যুর তালিকায় যে আর একটি শিশুর স্থান অচিরেই জুটিবে, তাহা সে অনায়াসেই বুঝিল। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে তুলিয়া আনিয়া বলিল, মশায়, এর অভিভাবকের যদি খোঁজ পান, তা'হলে আমায় খবর দেবেন, আমি নিয়ে চল্লুম একে। বলিয়া আপনার সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা দিয়া ছেলেটিকে নিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল। রাস্তার ধারে অযথা একটি শিশুহত্যা চোখে দেখিতে হইল না বলিয়া কেহ আর তাহাকে বাধা দিল না।

বাড়ী ফিরিতেই রন্ধনা-নিরতা পত্নী যে ভাষায় স্বামী-সম্বর্দ্ধনা করিল তাহা রতিকান্তের নিকট আদৌ শ্রুতিমধুর হইল না। নির্ম্মলা বলিল, ছেলে কা'র ?

রতিকান্ত বলিল, রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

কোন্ জাতের ?

জানিনে।

ভূমিকা শেষ হইল। আসল কথা আরম্ভ হইল একেবারে সপ্তম স্বরে। নির্ম্মলা বলিয়া উঠিল, তোমার কি আক্কেল গা ? গঙ্গা-স্নানে তো কত লোকেই যায়, কিন্তু তোমার মতো এমন মুখ্যু ত কোথাও দেখিনি! কোন্ অজাত কুজাতের ছেলে কে জানে! তুমি তাকে নিয়ে এলে বাড়ীতে! বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার ?

প্রত্যুত্তরে রতিকান্ত শুধু বলিল, কি করি! রাস্তার ধারে পড়ে মরছিল।

নির্ম্মলা বলিল, আহা, কি দরদ্ রে! এতই যদি দরদ তবে ওটাকে নিয়ে আলাদা বাড়ীতে গিয়ে থাকগে। এখানে জায়গা হবে না।

ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। রতিকান্ত এবার অনুনয়পূর্ণস্বরে বলিল, একটু দুধ ওকে খাইয়ে দাও না!

নির্ম্মলা চড়াগলায় বলিয়া উঠিল, আমি যাব ছুঁতে এই অজাতের ছেলেটাকে—না? যেখানে পেয়েছ সেখানে ওকে রেখে এস, যাও।

রতিকান্ত দেখিল, সন্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। মুখের উপর জোর করিয়া একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, তা' কি হয় ? সেটা বড় নিষ্ঠুরের কাজ হবে। বরং ওর অভিভাবকের খোঁজ আমি আজই ভাল করে কচ্ছি। একটু দুধ দাও। কাঁদতে কাঁদতে গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে, কাঁদতেও পারে না, দেখ্‌চ না ?

নির্ম্মলা একবার সেদিকে তাকাইল; তারপর কি মনে করিয়া বাটিতে খানিকটা দুধ ঢালিয়া বলিল, যাও, ওঘরে ষ্টোভ আছে, জ্বাল দিয়ে নাওগে; আমার অত সব হাঙ্গাম করবার সময় নেই। আঃ, কর কি! যাও, যাও, ওটাকে নিয়ে আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

রতিকান্ত দুধের বাটিটা লইবার জন্য রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল; বাধা পাইয়া চৌকাঠের নিকট থামিল।

নির্ম্মলা বাটীটা বাহির করিয়া দিল। রতিকান্ত ছেলেটাকে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টায় মন দিল।

বয়স হিসাবে নির্ম্মলা বেশ সৌখীন। তাহার যে বয়স সে বয়সে বাঙ্গালীঘরের বধূরা সৌখীন থাকিতে পারে না, তিন চারিটী সন্তানের জননী হইয়া আপনাদের সৌখীনতা সেই সব সন্তানের নিকট বলি দিতে বাধ্য হয়। নির্ম্মলার সে সব কোন বালাই ছিল না, তাই সে আপনার সৌখীনতা চিরকালই সমানভাবে বজায় রাখিয়াছে। বাড়ীঘরদোর সবই ফিটফাট, শয়ন গৃহের প্রত্যেকটী জিনিষই সুন্দররূপে সাজানো, পোষাক পরিচ্ছদের ত কথাই নাই! সৌখীনতা হইতেই বোধ করি তাহার একটা ব্যাধি জন্মিয়াছিল; সেটা শুচিবায়ু। এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভিতর থাকিয়াও তাহার কেবলই মনে হইত, রাজ্যের যত জঞ্জাল এবং আবর্জ্জনা বুঝি তাহার উঠানে এবং ঘরের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া আছে, কোথায় কোন্ ন্যাকড়ার টুকরা, ভাতের কণা, কলসের কাণা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া এবং পরিষ্কার করিয়াই তাহার দিবসের অর্দ্ধেক সময়টা কাটিয়া যাইত। তাহার ফলে তাহাকে দিবসে স্নান করিতে হইত তিনবার; কোন কোন দিন চার পাঁচ বার পর্য্যন্তও।

নির্ম্মলাকে ভালরূপে জানিয়াও কেন যে সে একটা অজানা অচেনা শিশুকে কুড়াইয়া নিয়া আসিয়াছে, চিন্তা করিয়া রতিকান্ত একটু অনুতপ্ত হইল। দয়াপরবশ হইয়া হঠাৎ সে যাহা করিয়া বসিয়াছে তাহাই তাহার নিকট এখন দুর্ব্বুদ্ধির কাজ বলিয়া বোধ হইল। স্বেচ্ছায় যাহাকে সে লইয়া আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করা যায় না; ইহার পিতা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরই বা অনুসন্ধান করা যায় কোন্ সূত্র ধরিয়া! রতিকান্ত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সেদিনকার মত ক্ষান্ত রহিল।

রাত্রে আবার স্বামিস্ত্রীতে আর এক পশলা বাক্য-বিনিময় হইয়া গেল। ঠিক বিনিময় হইল না। কারণ, শুধু এক তরফ হইতেই বাক্যবর্ষণ হইল; প্রতিবর্ষণ বিশেষ কিছুই হইল না। শয়ন গৃহে ঢুকিতেই নির্ম্মলা দেখিল স্বামীর সঙ্গে সেই শিশুটী শুইয়া আছে; নির্ম্মলা গর্জ্জিয়া উঠিল, কোন্ সাহসে তুমি অজ্ঞাতটাকে এনে শুইয়েছ এই বিছানায়?

রতিকান্ত কথা কহিল না।

নির্ম্মলা বলিতে লাগিল, জাত বিচার কি একেবারেই উঠে গেল নাকি? ছিঃ ছিঃ! একেবারে বুদ্ধির মাথা খেয়েছ!

শান্তকণ্ঠে রতিকান্ত বলিল, এনেছি যখন তখন 'ধাঁ' করে আর একে কোথায় ফেলে দি' বল দিকি।

ক্রোধবিকম্পিতস্বরে নির্ম্মলা উত্তর করিল, চুলোয়, বিছানা-পত্তর সব ছুঁয়ে নষ্ট করে দিল এই হতভাগাটা। সব ধুতে হবে আমার, তোমার কি?

বলিতে বলিতে রাগে গর্ গর্ করিয়া মেজের উপর মাদুর বিছাইয়া শুঁইয়া পড়িল।

ছেলেটা ঘুমাইয়াছিল। নির্ম্মলার তর্জ্জন গর্জ্জনে জাগিয়াই কাঁদিয়া উঠিল।

ঐ যা, ঘুমুতেও দেবে না ছাই! দূর হতভাগা! বলিয়াই নির্ম্মলা সরোষে উঠিয়া পাশের ঘরে শুইবার জন্য চলিল।

পরদিন আফিসে যাইবার পূর্ব্বে রতিকান্ত ভীত সন্ত্রস্তপদে পত্নীর নিকট অগ্রসর হইল; একটু ইতস্ততঃ করিয়া কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব কোমল করিয়া বলিল, দেখ নির্ম্মলা, ছেলেটাকে যখন নিয়েই এসেচি তখন হঠাৎ আর একে কোথায় ফেলে দিই? খবরের কাগজে এর সংবাদ ছাপিয়ে দিলুম আজকে; যার ছেলে সে হয়তো দুদিন বাদেই খবর পেয়ে একে নিয়ে যাবে। দুটো দিন একটু চোখে চোখে রেখো।

ছেলেটার জন্য নির্ম্মলাকে আজ অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছে, ঘুম হইতে উঠিয়াই তাহাকে বিছানাপত্র সব ধুইতে হইয়াছে; মেঝেয় মলমূত্র লেপিয়া ছেলেটা একাকার করিয়াছিল, সে সব বাধ্য হইয়াই নিজ হাতে পরিষ্কার করিতে হইয়াছে। সেই জন্য ইতিমধ্যেই তাহার তিনবার স্নান হইয়া গিয়াছে। মেজাজটা তাহার চড়িয়াই ছিল। স্বামীর কথায় একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, গলার স্বরটা একেবারে সপ্তমে উঠাইয়া বলিল, না.—কক্ষণো না কক্ষণো না সে আমাদ্বারা হবে না কক্ষণো।

রতিকান্ত প্রমাদ গণিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, আজকের মত একে একটু দেখো। অফিসে তো যেতে হ'বে, কাল্‌কে যা-হয় এর ব্যবস্থা করা যাবে। বলিয়া দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটার দিকে তাকাইয়া বলিল, সময় নেই আর, আমি চল্লুম অফিসে।

বলিয়াই উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল।

কাজকর্ম্ম সারিয়া দ্বিপ্রহরে নির্ম্মলা ভাত বাড়িয়া খাইতে বসিয়াছে, ছেলেটা গুটিগুটি পা ফেলিয়া তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পশ্চাৎ হইতে বোধ করি, সে তাহার মায়ের সঙ্গে

নির্ম্মলার কোনও সাদৃশ্য দেখিয়া থাকিবে, তাই একেবারে কাছে সরিয়া নির্ম্মলার গলা জড়াইয়া ধরিল। নির্ম্মলা ভাতের গ্রাস ফেলিয়া বাঁ হাতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিল। চৌকাঠের উপর পড়িয়া গিয়া মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়া ছেলেটা চীৎকার করিয়া উঠিল। নির্ম্মলা কয়েক মুহূর্ত্ত সে দিকে তাকাইয়াই হাত ধুইয়া তাহাকে তুলিয়া লইল। মাথায় একটা জায়গা সামান্য কাটিয়া একটু রক্ত বাহির হইতেছিল। নির্ম্মলা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া ইহা মুছিয়া তাহাকে কোলে করিয়া শান্ত করিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলেটা তাহার কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল। নির্ম্মলা এই প্রথমবার তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, শিশু নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইতেছে; বুঝিবা মাতৃবক্ষে এমনিভাবেই ঘুমায়! সকলকে হারাইয়া অজানা অচেনা লোকের মাঝখানে আসিয়া শিশু ছাড়া বোধ করি, আর কেহই এমনিভাবে ঘুমাইতে পারে না। নির্ম্মলা চোখ ফিরাইতে পারিল না;—দিব্যি চেহারা, ফুটফুটে রঙ, সুগঠিত অবয়ব! কোথাও উহার এতটুকু খুঁত আছে বলিয়া বোধ হয় না। অজাত কুজাতের ছেলে বলিয়া ত মনে হয় না। নির্ম্মলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে বিছানা পাতিয়া তাহাকে শোওয়াইয়া নির্ম্মলা আপনার কাজে চলিয়া গেল।

বৈকালে আফিস হইতে ঘরে ফিরিয়া রতিকান্ত দেখিল, মাটি হইতে ছেলেটার উঁচু খাটে প্রমোশন হইয়াছে। রতিকান্ত মনে মনে খুসি হইল; আসন্ন ঝড়ের যে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল, তাহা দূর করিবার জন্য নিজেই প্রথমে কথা কহিল।

রাগ করো না নির্ম্মলা, কাল্‌কেই আমি ছেলেটাকে যেখানে হয় পাঠিয়ে দেব।

ক্রোধের কোন চিহ্নই নির্ম্মলার মুখের উপর ছিল না। শান্তকণ্ঠে বলিল, যত শীগ্‌গির পার পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো, পরের ছেলের ভার আমি বইতে পারবো না।

ছেলেটার মাথার উপর হঠাৎ রতিকান্তের দৃষ্টি পড়িল, একটা কালো দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দাগটা কিসের?

নির্ম্মলা সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই উত্তর করিল, জানিনে।

রতিকান্ত দাগটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, আজকেই কেটে গেছে বলে মনে হচ্চে, কেমন ক'রে কাট্‌ল?

নির্ম্মলা তেমনই ভাবে উত্তর করিল, জানিনে ওসব আমি।

স্থিরভাবে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া রতিকান্ত বলিল, ছেলেটাকে তা'লে মোটেই চোখে চোখে রাখনি?

সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাইতে জ্বালাইতে নির্ম্মলা বলিল, না।

দুঃখ ও বিরক্তিতে রতিকান্ত কথা কহিল না।

স্বামীকে পরদিন আর পীড়াপীড়ি কিম্বা ভর্ৎসনা করিল না। রতিকান্তও কাজেই নিশ্চেষ্ট রহিল। শিশু য'ার সে ছাড়া আর কেই বা ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পড়িয়া হয় ত শীঘ্রই ইহার অভিভাবক আসিয়া ইহাকে লইয়া যাইবে; কোনও রকমে নাক মুখ গুঁজিয়া দুইটা দিন কাটাইতে পারিলেই হয়! কিন্তু দুই দিনের জায়গায় তিনদিন কাটিয়া গেল, কেহই দেখা দিল না, তৃতীয় দিনে দেখা দিল আসিয়া তাহার মধুরভাষিণী পত্নী নির্ম্মলা—একেবারে ঠিক অগ্নিদেবের মতই জ্বলন্ত মূর্ত্তি লইয়া।

কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব চড়াইয়া নির্ম্মলা চীৎকার করিয়া বলিল, বলি একদিনের জায়গায় তিনদিন যে কেটে গেল সে জ্ঞান আছে?

রতিকান্তের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

নির্ম্মলা তেমনিভাবেই উঁচু গলায় বলিতে লাগিল, আজ কি খাবে দেখা যাবে; হাঁড়ি কড়াই সব ছুঁয়ে দিয়েছে এই হতভাগা অজাতটা। আজ যদি তুমি এই ভূতটাকে না ছাড়াও তা' হলে আমি কুরুক্ষেত্তর বাধাব।

পাছে কুরুক্ষেত্র সত্যই বাধিয়া যায়, এই ভয়ে রতিকান্ত বলিয়া উঠিল, এই আমি চল্লুম; যেখানে হয় ওটাকে আজ রেখে আসব। বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নির্ম্মলা শিশুটীর অনেকগুলি অন্যায় কর্ম্মই আজ তিনদিন নীরবে সহিয়া গিয়াছে। একখানি ছবির বই সে একেবারে কালি লেপিয়া নষ্ট করিয়াছে; একটা দোয়াত ও একখানা আয়না ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছে এবং আরও অনেকগুলি ছোটখাটো অপকর্ম্ম করিয়াছে। নির্ম্মলা কোনই শাস্তি তাহাকে দেয় নাই, রতিকান্তকেও কোন কথা জানায় নাই। পরন্তু সে তাহাকে এমন কতকগুলি অধিকার মঞ্জুর করিয়াছে, যাহা কোনক্রমে তাহার মতে ন্যায়সঙ্গত বলা যাইতে পারে না। নির্ম্মলা তাহাকে রান্নাঘরে প্রবেশের অধিকার দিয়াছে; এমন কি তাহাকে একসঙ্গে শুইবার অধিকারটা পর্য্যন্ত অনুমোদন করিয়াছে। কিন্তু এতগুলি অধিকার দেওয়া সত্বেও আজিকার অপরাধ তাহার নিকট এতই গুরুতর বোধ হইল যে সে উহা কোনক্রমেই মার্জ্জনা করিতে পারিল না। রতিকান্ত চলিয়া যাইতেই সে হাঁড়ি সমেত সমস্ত ভাত বাহিরে ফেলিয়া দিল এবং হেঁসেলে অন্যান্য যা কিছু রান্না করা দ্রব্য ছিল সব ফেলিয়া দিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি মাজিতে বসিল।

দ্বিপ্রহরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাড়ী ফিরিয়াই নির্ম্মলাকে সুমুখে দেখিয়া রতিকান্ত বলিল, ছেলেটা কোথায় গা? ওটাকে পার করবার ব্যবস্থা ক'রে এলুম;—ওপাড়ার মাসীর বাড়ীতে। কোথায় ছেলেটা?

নির্ম্মলা একটা পোড়া কড়াইয়ের কালো দাগ ঘষিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল; স্বামীর দিকে না তাকাইয়াই বলিল, কোথায় আছে খোঁজ ক'রে নাওগে।

রতিকান্ত ঘরে আসিয়া ছেলেটাকে নিয়া বাহির হইল; সদর দরজার কাছে গিয়া বলিল, চল্লুম তবে।

নির্ম্মলা জবাব দিল না, রতিকান্ত ছেলে নিয়া অদৃশ্য হইল।

ওপাড়ায় এক বর্ষীয়সী বিধবা স্ত্রীলোকের উপর ছেলেটাকে কিছুদিনের জন্য রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া রতিকান্ত যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা প্রায় দুইটা বাজিয়া গিয়াছে; ক্ষুধার জ্বালায় পেটটা তাহার চোঁ চোঁ করিতেছে। রান্নাঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার মত নিরীহ মানুষেরও ধৈর্য্য সংবরণ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল; রন্ধনপাত্রগুলি সদ্য-মাজা হইয়া ঘরের মাঝখানে ঝক্‌ঝক্ করিয়া শোভা পাইতেছে; রান্না হয় নাই, উদ্যোগ আয়োজনও নাই। রতিকান্ত ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, নির্ম্মলা একখানা বহি খুলিয়া সুমুখের দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, রান্নাবান্না হবে না আজকে?

না, শরীরটা ভাল নেই। বলিয়া নির্ম্মলা পুস্তকের একটা পাতা উল্টাইয়া তাহাতে আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

পত্নীর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া রতিকান্তের ক্রোধ আর বাহিরে প্রকাশ পাইল না; ভিতরেই উবিয়া গেল। ক্ষীণকণ্ঠে শুধু বলিল, ক্ষিদেয় যে প্রাণ যায়! খাব কি?

বাজার থেকে খাবার এনে খাওগে; আমি রাঁধতে পারব না। শরীরটা ভয়ানক খারাপ বোধ হচ্চে।

অগত্যা তাহাই করিতে হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রান্নাবান্না শেষ করিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে এক মুঠো মুখে দিয়া নির্ম্মলা বিছানায় শুইয়া পড়িল। নির্ম্মলার কি অসুখ, শতবার জিজ্ঞাসা করিয়াও রতিকান্ত কোন উত্তর পাইল না।

পরদিন সকালে আফিসের ভাত রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া নির্ম্মলা আপনার ভাত ঢাকা দিয়া ঘরে গিয়া শুইল। পাশের বাড়ীর নয়ান-বৌ প্রতিদিনকার মত আজও দ্বিপ্রহরে ছেলে কোলে করিয়া দেখা দিলেন। নির্ম্মলা শুইয়া আছে দেখিয়া বলিল, ওগো, শুয়ে আছ যে! খেল্‌বে না আজ্‌কে?

নয়ান-বৌ নির্ম্মলার কড়িখেলার সঙ্গী। ডাক শুনিয়া চোখ মেলিয়া বলিল, আজ্‌কে খেল্‌ব না, শরীরটা ভাল বোধ হচ্চে না।

নয়ান-বৌ বলিল, দিনের বেলা পড়ে' পড়ে' ঘুমুলেই কি শরীর ভাল বোধ হবে। উঠে বস, খেলা যাক্ খানিকক্ষণ।

নির্ম্মলা রাজী হইল না। নয়ান-বৌ ছেলেকে নিয়া অগত্যা বাহির হইলেন। যতদূর তাহাদিগকে দেখা গেল, নির্ম্মলা সতৃষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের পানে তাকাইয়া রহিল। প্রতিদিনই

সে তাহাদিগকে দেখে ; কিন্তু এমনিভাবে অন্তর হইতে একটা বুভুক্ষু দৃষ্টি নিয়া কোনদিনই তাহাদের পানে তাকায় নাই। আজ যেন তাহার চোখ হইতে একটা হিংসা-মিশ্রিত তীব্র বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছিল ; কাহার প্রতি যেন একটা নিস্ফল অভিমান ফুলিয়া ফুলিয়া অন্তরের দ্বারদেশে আসিয়া প্রচণ্ড আঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল।

ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিতেই নির্ম্মলা দেখিল, কুড়ানো শিশুর তিনদিনের স্মৃতিতে গৃহটী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মেজের উপর কালির ছোপ, দেওয়ালের গায়ে ভাঙা আয়না, টেবিলের উপর খানকয়েক ছেঁড়া বই ও খাতা—প্রত্যেকটীর অন্তরালেই যেন একটী শিশুর ক্ষুদ্র হস্ত লুকাইয়া থাকিয়া একটা মধুর বিরাট ইতিহাস খুলিয়া রাখিয়াছে। অপবিত্রতা ও অশান্তির আঁধার বলিয়া যাহাকে সে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়াই যেন একটা শান্তি ও পবিত্রতার উৎস গৃহের ভিতর এবং বাহির পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে! নির্ম্মলার অন্তর ঠেলিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

নির্ম্মলা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইল ; একেবারে সোজা মাসীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। মাসী মেঝেয় মাদুরের উপর সগর্জ্জনে নিদ্রা যাইতেছেন ; ছেলেটা অদূরে বসিয়া চীৎকার করিতেছে। মাসীর হুঁস নাই। নির্ম্মলাকে দেখিবামাত্র ছেলেটার কান্না থামিয়া গেল। তাহাকে যেন কোথাও দেখিয়া থাকিবে, এমনিভাবে সে নির্ম্মলার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

নির্ম্মলা গম্ভীরস্বরে ডাকিল, মাসী!

মাসীর ঘুম ভাঙিল না। বার তিনেক ডাকা সত্ত্বেও তাহার ঘুমভাঙার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন নির্ম্মলা তাহাকে সজোরে ঠেলা দিতেই তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

নির্ম্মলা উত্তেজিত হইয়া বলিল, বুড়ো হয়েছ, কাণ্ডজ্ঞান কবে হ'বে বল দিকি! ছেলেটা যে কেঁদে সারা হল, সে খেয়াল আছে? অথচ ছেলে পাল্‌বার সখটা তো পূরোপূরিই আছে দেখ্‌চি। বলিয়াই মাসীর কোনও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ছেলে কোলে নিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

মাসী কোনও বাধা দিলেন না। ধীরে ধীরে চক্ষু আবার তাহার বুজিয়া আসিল, নাসিকা-গর্জ্জনও পরমুহূর্ত্তেই শোনা গেল।

নির্ম্মলা বাড়ী ফিরিয়া ছেলেটাকে দুধ জ্বাল দিয়া খাওয়াইল, চুল সযত্নে আঁচড়াইয়া দিল, কপালে টিপ্ পরাইল। শিশু হাত পা ছুঁড়িয়া অবোধ্য ভাষায় তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। নির্ম্মলা তাহাকে বুকে জড়াইয়া আপনার মুখখানা তাহার ক্ষুদ্র মুখের উপর সংলগ্ন করিয়া ধরিল। কি এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে তাহার হৃদয়টা কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিল!

একটা খেলনা হাতে দিয়া ছেলেটাকে ঘরের কোণে বসাইয়া নির্ম্মলা এতক্ষণ পর আহারে বসিল। ভাতের গ্রাস মুখে দিয়াছে অমনি সে নির্ম্মলার সুমুখে উপস্থিত! খাটের নীচ হইতে নিজেই একটী ছোট তক্তা সংগ্রহ করিয়া ভাতের থালার সুমুখে পাতিয়া বসিয়া পড়িল; আহার্য্য-বস্তু দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাততালি দিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। নির্ম্মলা পাত হইতে তাহার মুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া দিল এবং পরমুহূর্ত্তেই আর এক গ্রাস আপনি খাইল। ছেলেটার জাতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আজ তাহার মনে উদয় হইল না; নিঃশব্দে সে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিল।

বৈকালে রতিকান্ত আফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, কুড়ানো শিশুটী আবার তাহার গৃহে উপস্থিত! বিস্মিত হইয়া নির্ম্মলাকে বলিল, এ ভূতটা আবার এসে ঘাড়ে চাপ্‌লো কেমন ক'রে?

নির্ম্মলা ঝঙ্কার দিয়া বলিল, তুমি বেশ লোক যা হোক্! এমন লোকের ওপরও পরের ছেলের ভার দিয়ে আস্‌তে হয়? ভাগ্যিস্ আমি যাচ্ছিলুম ডাক্তার বাবুদের বাড়ী বেড়াতে। মাসীর বাড়ীর ওপর দিয়ে যেতেই ছেলেটার কান্না শুনে গিয়ে দেখি, একটা কুকুরে ওকে চড়াও করেছে; মাসী দিব্যি আরামে নাক ডেকে ঘুমুচ্চে। আর একটু হ'লেই দিয়েছিল কাম্‌ড়ে'। শেষকালে যা' তা' লোকের কাছে রেখে আমায় খুনের দায়ী করবে, কাজ নেই! তা'র চেয়ে তুমি বাপু ওর বাপমায়ের খোঁজ কর।

রতিকান্ত কয়েকমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু মাসীর কাছে বেশ যত্নে ছিল, ওর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্চে।

নির্ম্মলা বলিল, হাঁ, চেহারা দেখে বোঝা যায় বটে! কিন্তু যত্ন বুঝ্‌তে পারতে যদি কুকুরে কাম্‌ড়াতো।

রতিকান্ত বলিল, যখন নিয়ে এসেচ তখন তোমার কাছেই কেন কদিন থাক্ না?

হঠাৎ যেন কি একটা কাজে নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, উত্তর দিবার অবকাশ হইল না।

দিন দুই পর একদিন প্রাতঃকালে রতিকান্ত কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নির্ম্মলাকে বলিল, ছেলেটাকে পার করবার একটা পথ পেলুম। সোজা কথাগুলো, যা' সবাই জানে, তাও এতদিন জান্‌তুম না ছাই!

নির্ম্মলা বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইল।

রতিকান্ত বলিতে লাগিল, পথে দেখা হ'ল এক বন্ধুর সঙ্গে; সে সব শুনে আমায় গালাগাল দিয়ে বল্লে, "ছেলেটাকে নিয়ে থানায় খবর দাওনি কেন এতদিন? তারাই তো সব খোঁজ করে দিত'। আমি এখনি ওকে নিয়ে থানায় যাচ্চি।"

নির্ম্মলা তরকারি কুটিতেছিল। রতিকান্তের কথার কোনও উত্তর দিল না। নীরবে একটা আলুর খোষা ছাড়াইতে আরম্ভ করিল।

রতিকান্ত ছেলে নিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, এমন সময় নির্ম্মলা গম্ভীরস্বরে ডাকিল, শোন।

স্বর শুনিয়া রতিকান্ত থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মলা স্থিরকণ্ঠে বলিল, থানায় আমি ওকে কিছুতেই পাঠাতে পারিনে।

রতিকান্ত বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কেন?

নির্ম্মলা সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

নির্ম্মলার নীরবতাতে রতিকান্তের সাহস বাড়িল; বলিয়া উঠিল, থানায় পাঠাতে চাওনা, অথচ আমাকে ভুগিয়ে তো খুবই মার্‌তে পারবে।

নির্ম্মলা বলিয়া ফেলিল, আর আমি তোমায় ভুগিয়ে মারব না। অপরাধ আমার ঢের হয়েছে, আমায় মাফ্‌ কর।

রতিকান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, কি অপরাধ তোমার?

নির্ম্মলা বলিল, এতদিন তোমার সঙ্গে ফাঁকি বাজি করে এসেচি; আর পারিনে আমি, আমায় মাফ্‌ কর। থানায় একে পাঠিয়ো না। কোথাও পাঠাবার আর দরকার নেই, এখানেই থাক্‌। বলিয়াই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতেছিল, দারুণ আগ্রহাতিশয্যে রতিকান্ত 'খপ্‌' করিয়া তাহার বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিল; একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ যে পরের ছেলে!

হোক্‌ না পরের ছেলে! যার ছেলে সে তো তার অধিকার স্বেচ্ছায়ই ত্যাগ করেছে, সে তো একে চায় না। চাইবেই যদি, তবে আজও কেন এর খোঁজ নেয় না?

রতিকান্ত একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু জাততো এর জানা নেই আমার!

নির্ম্মলা স্বামীর মুষ্টি হইতে আপনার হাত খানা ছাড়াইয়া নিয়া বলিল, দরকার নেই জান্‌বার! জাত? জাততো মানুষ নিজেরা সৃষ্টি করেছে, সৃষ্টির আদিম যুগে জাত অজাত বলে তো কোন কিছু ভগবান্ নির্দ্দেশ করে দেন নি! আর শিশুর আবার জাত কি? জাতের কথা তুলোনা।

রতিকান্ত নীরব রহিল। ধীরে ধীরে ছেলেটাকে বাহু পাশ হইতে মুক্ত করিতেই নির্ম্মলার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল, নির্ম্মলা তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল।

শ্রীমণীন্দ্ররঞ্জন মজুমদার।

অভিসারিকা

বাজ্‌ল বাঁশি ওই রূপসী ঘুমহারা তার চোখ খুলি'—
জ্বালিয়ে বাতি মুকুর পাতি' বাঁধ্‌লো সে তার চুল গুলি।
পৌর্ণমাসীর পূরন্ত চাঁদ বাতায়নের সম্মুখে—
সোহাগে তার কক্ষতলে বুলায় আলিম্পন-তুলি।

শিউলি মালা দোলায় গলে—পদ্মমুকুট ছায় মাথে—
গোলাপ কলির তাবিজ বাজু চাঁপার বলয় ভায় হাতে;
জড়ায় তনু নীল শাড়িতে লিপ্ত করি' চন্দনে—
কোন্ সে আকুল পিয়াস ভরে যায় তরুণী এই রাতে?

যায় তরুণী পথটি বেয়ে পাপিয়া গায় 'পিউ কাঁহা,'
চোখ্ ছাপিয়ে ছুট্‌লো তুফান অশ্রুজলের ওই আহা!
চিত্ত-মধুপ গুঞ্জরে কোন্ পদ্ম-পাণির সন্ধানে— ?—
ফির্‌বে প্রতি দিনের মত? আজ্‌কে তাকে চাই পাওয়া!

মৌন মধুর নিশুত রাতে শঙ্কাবিহীন অন্তরে
চল্‌ছে বালা কার লাগি হায় বিজন গিরি প্রান্তরে?
বিঁধ্‌বে যখন সায়ক বুকে তীক্ষ্ণ-খর-সন্ধানে—
সঞ্জীবিয়া উঠ্‌বে সে কোন্ মোহন মধুর অন্তরে?

পিয়াল বনের ছায়ায় ছায়ায় নিবিড় বনের মাঝ দিয়া
সুন্দরী যায় বিজন পথে নীল যমুনার কাছ দিয়া,
জ্যোছ্‌না তখন হাস্‌চে মিঠা, হাস্‌ছে বিধু পশ্চিমে—
ভাব্‌চে বুঝি ফির্‌তে হবে ব্যর্থ ফুলের সাজ নিয়া?

ওই বুঝি তোর বাঞ্ছিত ধন—আস্‌লি ধেয়ে যার আশে?
নীরব নিঠুর নিলাজ বুঝি মৌন হাসি ওই হাসে?
ও অভাগি, কর্‌লি কিরে? বাঁধ্‌লি ভুজ-বেষ্টনে?
তমাল ওযে! শুধুই তরু—দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে!

হায় আলেয়া কে দেখালে—বুক বুঝি দ'য় মুর্ম্মুরে ?
ফেল্‌লি কেন এক লহমায় ব্যর্থ ফুলের সাজ দূরে ?
হায় মানিনি, রচ্‌লি এ কোন স্বপ্ন মরু উদ্যানে—
ভুল্‌তে পারা এতই কঠিন সেই অকরুণ নিষ্ঠুরে ?

বল্‌চি বটে মুখের কথা, ভোলা কিরে হয় সোজা ?
নিত্য ওঠে যে হাহাকার নিত্য চলে যেই খোঁজা—
সবার বুকে যেই ক্ষুধাটি জাগে করুণ ক্রন্দনে—
ভুখ্‌ পিয়াসী যারাই আছে বইবে বুকে এই বোঝা ॥

শ্রীবীণাপাণি রায়

কেমাল সংহিতা

তুর্কী সুলতানী-পাশমুক্ত হয়ে নবকলেবর ধারণ করেছে। যে পুরুষসিংহ এই নবকলেবরকে সংজীবনে সঞ্জীবিত করে' সভ্য জগতে নব যাত্রায় প্রবর্ত্তিত করেছেন, সেই মুস্তাফা কেমাল পাশার জীবনবেদকে সংহত করে' আবেল আদম একখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থখানির নাম The book of Mustafa Kemal. ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপল্‌ নগরে প্রকাশিত (১)। আমি তারই বাঙলা অনুবাদ করচি "কেমাল সংহিতা"।

গ্রন্থকার বলেন, পৃথিবীতে যে সকল জাতি আজ প্রকৃত প্রাণবান্‌, তারা সকলেই আমাদের পশ্চিমে বাস করে; আর পূর্ব্বে যারা বাস করে তারা প্রাণহীন; তাদের প্রাণ ধারণ করবার অধিকার এখনও সভ্য জগতে স্বীকৃত হয় নি। গ্রন্থকার বলেন পশ্চিম দেশবাসীরও দু' হাত দু' পা, পূর্ব্বদেশবাসীরও দু' হাত, দু' পা, তবে এ দুয়ের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? * * * ইউরোপের মনোভাবই আজ পৃথিবীর মনোভাব। যতদিন ইহলোকে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, ততদিন এই মনোভাব নিয়েই কাজ করতে হবে; এসিয়ার মনোভাব হচ্ছে পর-লোকের মনোভাব; আমরা যখন পরলোকে যাব, তখন আমরা এসিয়ার পারলৌকিক মনোভাব নিয়ে কাজ করব।

প্রাচ্য মনোভাব সকল কাজের বিধি বাহির করতে চায় ধর্ম্মপুস্তক থেকে। প্রতীচ্য মনোভাব জীবনটাকে দেখে মানব চক্ষু দিয়ে। ঐশ্বরিক বিধি থেকে কর্ম্মনীতি এবং বিচারবুদ্ধি আবিষ্কার করে' এসিয়াবাসী দুঃখদারিদ্র্য নিবারণ করতে পারে নি। এসিয়াবাসী সকল দুঃখকষ্টের মূলে দেখে ঐশ্বরিক বিধান; আর দেখে যে সুলতান বা কোন দেবতা বা কোন প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত সেই বিধানের প্রবর্ত্তক। এসিয়ার এই মনোভাবের বিরুদ্ধে নব্য তুর্কী বিদ্রোহী হয়ে উঠে তার স্থানে একটা বিপ্লবকর মনোভাবের সৃষ্টি করেছে, আর সর্ব্বস্ব পণ করে' সেই বিপ্লবকর মনোভাবকে সযত্নে রক্ষা করতে ইচ্ছা করেছে।

---

(১) Literary Digest dated October 1, 1927.

আবেল আদম বলেন আমরা যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলাম, সেটা ছিল এই যে রাজা ঈশ্বরের ছায়ারূপে (Shadow of God) এই পৃথিবীতে বিরাজ করেন, আর আমরা সেই রাজার অধীন; অর্থাৎ সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের খলিফারূপী সুলতানের বিরুদ্ধ চরণ করা কারো সাধ্য নয়; আর আমাদের সমাজের চেয়ে উচ্চতর সমাজ কোথাও নাই এবং আমরা যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছি তাই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু সে কথা অযথার্থ; যথার্থ কথা এই যে দারিদ্র্যের ক্লেশ, ক্ষুধার জ্বালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে; প্রতি বৎসর আমাদের দেশের কোন অংশ না কোন অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য দেশে যাচ্ছে; আমাদের রাষ্ট্রশক্তি ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রশক্তির চেয়েও দুর্ব্বল; উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্নীতি আমাদেরকে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে; আমরা ইউরোপের কাছে সকল বিষয়ের জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী হয়েছি। অথচ আমাদের দেশে সুলতানরূপী ঈশ্বরের ছায়া বিরাজমান; তাঁর চল্লিশটি সহধর্ম্মিণী এবং চল্লিশটি বালক-কলত্র আছে; তারা ধর্ম্মপুস্তক-বর্ণিত স্বর্গসুখের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, আর মাদ্রাশায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে এই সকল বিধিব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহারকে অব্যভিচারিণী ভক্তির সহিত বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমাদের ধ্বংস আরম্ভ হয়েছিল। ইউরোপীয় জ্ঞানের সংস্পর্শে এসে, ইউরোপীয় মনোভাবের উৎকর্ষ স্বীকার করে' ঈশ্বরের ছায়ায় দেশে দুঃখদারিদ্র্য নিরীক্ষণ করে' আমাদের সত্যের উপলব্ধি হয়েছে। আমরা এখন বুঝেছি যে এই ঈশ্বরের ছায়াটি ভারতবর্ষের বৌদ্ধ পুত্তলিকাগুলির মতই শক্তিহীন, আত্মাহীন। মোহম্মদ যেমন মক্কা ও মদিনার পুত্তলিকাগুলিকে ভেঙে চুরমার করেছিলেন, আমরাও তেমনি খলিফার পুত্তলিকা, মাদ্রাশা, টেকে (tekkes) এবং তুরবে (turbehs) গুলিকে ভেঙে চুরমার করেছি। এই হল তুর্কির আসল বিপ্লব; এতে আমাদের দেশের মহা উপকার হবে।

গ্রন্থকার বলেন ইউরোপের কোন ব্যক্তি, মুর্খই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ নিয়ে কাজ করে না; কিন্তু এসিয়াতে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, শাসনকর্ত্তা এবং সাধুসন্ন্যাসী ছাড়া আর কিছুই নাই। লোকের ব্যক্তিগত বিষয়েই হ'ক, আর তাদের সামাজিক, অর্থ নৈতিক, বাণিজ্য ব্যবসায়িক, বৈজ্ঞানিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেই হক, এসিয়াবাসীর কাছে ঐশ্বরিক বিধান সর্ব্বত্র ক্রিয়মান; কোন বিষয়েই তা' থেকে অব্যাহতি নাই। সে বিধানের পরিবর্ত্তন নাই, সংশোধন নাই। যখনই যে বিধান পুরাণো হয়, তখনই দেখবে আর একজন অবতার নতুন বিধান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। এইরূপ অবতারের আবির্ভাব এসিয়ার একটা 'ফ্যাশান'।

এর মধ্যে বিশেষ করে' দেখবার বিষয় এই যে সকল অবতারই লোককে উপদেশ দিচ্ছেন যে, এ জীবনটা কিছুই নয়, তোমরা এর অস্তিত্ব স্বীকার কোরো না, এর মায়া ত্যাগ কর, আর পারলৌকিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হও, প্রীতিমান্ হও। এরই মানে বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং ইসলামের স্বর্গ। এই মনোভাবই চিন্তার স্বাধীন বিচার-শক্তিকে লুপ্ত করে দিয়েছে, এবং বুদ্ধিকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। ইউরোপ প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের দ্বারা যা' করতে চেষ্টা করে, এসিয়া তা স্তবস্তুতি, প্রার্থনা, ইন্দ্রজাল এবং অশরীরী আত্মার দ্বারা করতে চেষ্টা করে।

গ্রন্থকার বলেন এসিয়ার ধর্ম্মের ইতিহাস আর কিছুই নয়, কেবল ভিন্ন ভিন্ন যুগাবতারের ঈর্ষাপ্রসূত পরস্পরবিরোধী শিক্ষার ঘাতপ্রতিঘাতের কাহিনী মাত্র। বস্তুতঃ সে শিক্ষা একই; বুদ্ধ, কনফুশিয়স, ব্রহ্মা, মুসা, যীশু, মোহম্মদ— সকলের উপদেশই মূলে এক, খুটিনাটিতে যা কিছু প্রভেদ।

তারপর বিপ্লবের কথা উপলক্ষ্যে গ্রন্থকার বলেন, রাজা বা পোপ কেউই ঈশ্বরনিযুক্ত বা ঈশ্বরপ্রেরিত ন্যাসরক্ষক নন। ধর্ম্ম আগে রাজা এবং পোপের আশ্রয়ে ছিল। বিপ্লব ধর্ম্মকে সেই শক্তির আশ্রয় থেকে সরিয়ে এনে সমাজের আশ্রয়ে স্থাপিত করেছে; এরই ফলে জন্মেছে রাষ্ট্রীয় জাতিত্ব। ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির

জন্ম। কিন্তু শেষ হল রাষ্ট্রীয় জাতিত্বে। এই হল ইউরোপের রাষ্ট্রীয় মনোভাব ; এসিয়াতে এর মত কিছু নাই। আমাদের একে অর্জ্জন করতে হবে। আমরাও মানুষ। আমাদের একে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে হবে।

"কিন্তু কেমন করে তা হবে ?" গ্রন্থকার প্রশ্ন করছেন এবং উত্তর দিচ্ছেন "বিপ্লবকর উপায় (revolutionary methods) অবলম্বন করতে হবে। এসিয়াটিক মনোভাব দূর করে দিয়ে তার স্থানে ইউরোপীয় মনোভাব স্থাপন করতে হবে। যে সমস্যার সমাধানের জন্য ফরাসী বিপ্লব হয়েছিল, সেই সকল সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। কাজেই তার সমাধানের জন্য আমাদেরকেও সেই বিপ্লবকর উপায় অবলম্বন করতে হবে। বিপ্লব তার শত্রুকে স্বাধীনতা দেয় না। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আসে বিপ্লবের পরে। কাজেই আমরা এখন এমন প্রতিক্রিয়াশীল কোন কাজ কাউকে করতে দিতে পারি না যাতে বিপ্লব বিফল হয়ে যায়।"

"ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তিনটি—(১) মানুষের অধিকার, (২) রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদীক্ষা (culture) (৩) রাষ্ট্রীয় আর্থিক অবস্থা। তুর্কীর বিপ্লবের ভিত্তিও এই তিনের উপর স্থাপিত করতে হবে।"

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

মাছ ধরি

(জেলের গান)

নানা জলে মাছ ধরি—
মোরা মাছ ধরি।
গাঙ্গে গাঙ্গে ঝিলে বিলে
অনেক মেলে তুলে নিলে ;
কতই খাবে বগে চিলে
আমরা যত মাছ ধরি !
ঢেউএর তালে নেচে নেচে
অতল সাগর ছেঁচে ছেঁচে
নিজের হাতের বোনা জালে
লোনা জলে মাছ ধরি।
নিন্দা কর মোদের জাতির ?
করব না সে কথার খাতির ;
তোমরা খাদক আমরা সাধক—
অগাধ জলে মাছ ধরি।
জলে ভিজি রোদে পুড়ি—
মাছ বেচিগো ঝুড়ি ঝুড়ি ;
কিনে দিব পুতের মাকে
পুঁতির মালা পাঁচনরি।
লোনা জলে পানা জলে
নানান্ জলে মাছ ধরি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বঙ্গবাণীর নৈবেদ্য

সুদূর প্রাচ্যে রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বহুদিন যাবৎ সুদূরবর্ত্তী পূর্ব্ব প্রদেশে ভারতবর্ষের শিক্ষা ও জ্ঞান গৌরবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ব্রিটিশ-মালয় হইতে তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ করিবার অভিলাষও তাঁহার অনেকদিন হইতেই ছিল। এতদিন পরে এই অভিনব যাভা যাত্রার ফলে তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হইয়াছে এবং সুখের বিষয় এই যে প্রত্যেক স্থানেই তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায় ও রাজন্যবর্গের নিকট হইতে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সহযাত্রীর দল গত ১২ই জুলাই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ পৌছান; তথা হইতে ১৬ই তারিখে যাত্রা করিয়া ২১শে তারিখে সিঙ্গাপুর পৌছান। ১৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত তাঁহারা মালয়ের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। পরে পেনাং হইতে সুমাত্রার অন্তঃস্থিত বালাওয়ান্ ও মেডানের দিকে যাত্রা করেন, তথা হইতে যাভা পৌছান। ব্যাটাভিয়ায় তিন দিন থাকিবার পর তাঁহারা যাভার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত বলিদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন। সেখানে ১২দিন বাস করিয়া তাঁহারা পুনরায় যাভায় চলিয়া আসেন এবং তথায় কয়েক সপ্তাহ ভ্রমণ করিয়া সিঙ্গাপুরে ফিরিবার মুখে পেনাংয়ে আসেন। পরে ব্যাঙ্‌ককে এক সপ্তাহ বাসের পর তাঁহারা পুনরায় পেনাংয়ে আসিয়া "আওয়ামারু" নামক জাহাজে চড়িয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

মালয় বাসকালে কবি তথাকার অধিবাসিবৃন্দের নিকট হইতে বিশেষ সৌজন্য এবং সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। চীনারা যাহাতে রবীন্দ্রনাথের নব-নির্ম্মিত বিদ্যা-মন্দিরের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে চীনা ভাষার প্রবর্ত্তন করিতে পারেন তাহার জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া উঠেন। ভারতীয় ইউরোপীয় ভদ্রমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও কবির নিকট সহানুভূতি আসিয়া পৌছে। মালয়ে তিনি তথাকার প্রায় সকল বড় সহরগুলি ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বক্তৃতাও দান করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই তাঁহার মতবাদকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরে তিনি ব্রিটিশ মালয়ের শাসনকর্ত্তার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে স্থানেই তিনি গমন করিয়াছিলেন তথায় সরকার পক্ষীয় এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাঁহার ভ্রমণকে সফল করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিল। তাঁহার বয়স এবং স্বাস্থ্যের বিষয় বিচার করিলে তাঁহার এই ভ্রমণ যে তাঁহার নবোৎসাহে প্রণোদিত ছিল, এ কথা বলিতেই হইবে।

যাভায় ও বলিতে কবিবর বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের মানসে না যাইলেও, সুরবায়ার ভারতীয় সম্প্রদায় তাঁহাকে একটি টাকার থলি উপহার প্রদান করে। ব্যাটাভিয়ার অধিবাসিবৃন্দও জাপানী শিক্ষা প্রচারের উন্নতি কল্পে ঐরূপ একটি উপহার কবিবরকে প্রদান করেন। যাভাতে নিম্ন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব পরিদর্শন সমিতির ওলন্দাজ পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ কবিকে কতকগুলি ভগ্নস্তূপ এবং যাদুঘর প্রদর্শন করান। কবি তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। কবি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েন, যাভায় শিক্ষিতদিগের মধ্যে বর্ত্তমান জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতি দেখিয়া। সেখানে কবি একটি নৃত্যোৎসবে যোগদান করেন। নৃত্যের অপূর্ব্ব ভঙ্গি ও মনোহারিত্ব দর্শনে তিনি বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েন। সেই নৃত্য সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন যে উহা বহুদিবস হইতে যাভায় প্রচলিত আছে এবং উহার ভিতর হিন্দু সভ্যতার অনেক নিদর্শন বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর পূর্ব্ব দেশের সহিত ভারতবর্ষের বহু অতীতে যে যোগ ছিল এবং ভবিষ্যতে যে যোগ-সূত্র বাঞ্ছনীয় তৎসম্পর্কে কবির যাভা ভ্রমণ যে বিশেষ সফল হইয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্যাটাভিয়ায় অবস্থানকালে তিনি সংবাদ পাইলেন যে ব্যাঙ্‌ককের শ্যামীয়েরা, চীনাবাসীরা, ভারতবাসীরা এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোকেরা তাঁহার গমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু মধ্যে শ্যামদেশে এক সপ্তাহ তাঁহাকে বাস করিয়া যাইতে হইল। ব্যাঙ্‌ককে তিনি ভারতীয় সম্প্রদায়ের অতিথি হইয়াছিলেন এবং "ফিয়াআই" প্রাসাদ তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রথমে তিনি মিউজিয়ম হলে আহূত একটি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন। পরে "অমরেন্দ্র হলে" শ্যামাধিপতি এবং তাঁহার পরিবারস্থ ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি

শ্যামদেশের জাতীয় ধর্ম্ম-জীবনের নেতা প্রিন্স ধানি, প্রিন্স দামরঙ্গ, প্রিন্স বিদ্যালঙ্কারেস্, প্রিন্স নারিস্‌রা এবং বৌদ্ধ-কুলপতি প্রিন্স চন্দ্রপুরী প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যাহা মত তাহা শ্যামীয়গণ খুব উৎসাহের সহিত শ্রবণ করিয়াছিল। এবং তথাকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুশীলনকল্পে একটি 'চেয়ার' খুলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। ব্যাঙ্‌ককে যে এক সপ্তাহকাল তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার কাজের ফর্দ্দটা কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কবির সহযাত্রীদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ই, এরিয়াম উইলিয়ম্ মালয়ে এবং শ্যামে কবির সেক্রেটারীর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কবির আদর্শ, কবির ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং বিশ্ব ভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের "কলা ভবনের" ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর ও, মিঃ ডি. কে, দেব বর্ম্মণ শান্তিনিকেতন ও ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

যাহা হউক কবি, দার্শনিক, শিক্ষা-নায়ক এবং স্বদেশ-ভক্ত রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বস্থানেই সার্ব্বজনীন শান্তি ও আন্তর্জ্জাতিক সৌহৃদ্যের অগ্রদূত বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। যাভা এবং অন্যান্য যে সকল জায়গায় তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন সে সমস্ত জায়গার লোকেরা অনেক দিন হইতে তাঁহার গমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এবার রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এতবড় একজন মনীষা এবং বিশ্বমৈত্রীস্থাপনের এতবড় একজন উদ্যোগী পুরুষের সংস্পর্শ লাভ করিয়া তাহারা যে ধন্য হইয়াছে একথা তাহারা নিজেরাই তাহাদের অভিনন্দন পত্রে স্বীকার করিয়াছে। তাহারা যে বিশেষ ভাবে সন্তোষ লাভ করিয়াছে তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ওলন্দাজ ও তৎসম্পর্কিত সম্প্রদায় কবির প্রতি বিশেষ সৌজন্য তো দেখাইয়াছেই, তাহা ছাড়া যাভায় "রয়েল প্যাকেট ষ্টিমার সারভিস্" তাহাদের সকল জাহাজেই কবির জন্য বিনামূল্যে দেলুনে ভ্রমণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল এবং কবির সহযাত্রীদের অর্দ্ধমূল্যে ভ্রমণের অধিকার দিয়াছিল। মান্দ্রাজ হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যে ফরাসী জাহাজে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহারাও তাঁহার ভ্রমণের সুবিধার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল।

—ফরওয়ার্ড

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া সম্বন্ধে কবির মত

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পর সে দেশ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে সে দেশে বহুদিন পূর্ব্বে যে শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান ও কর্ম্ম আরম্ভ হইয়াছিল তাহার সহিত ভারতবর্ষের অন্তরের যোগ ছিল, কারণ সেই শিক্ষা ও সভ্যতা এমন একটি অজানা জগতের সন্ধান প্রদান করে যাহার অন্তর লোকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতের যোগসূত্র অতি অন্তরঙ্গভাবে বাঁধা ছিল। এবম্প্রকার নব অভিজ্ঞতা লাভ একদিকে যাভাতে এবং অপরদিকে শ্যাম দেশেই হইয়াছিল।

যাভা এবং বলিদ্বীপ কবির কৌতূহলী মনকে অভিনব ভাবে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। উভয় স্থানেই দেখা যায় যে তথাকার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও গৃহ-নির্ম্মাণ-শিল্পের অতীত মহিমা জাগ্রত, এমন কি জাতির সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের ভিতরে ও বাহিরে ভারতের বৈচিত্র্যময় পূর্ণ সৌন্দর্য্য বর্ত্তমান। কিন্তু এ কথা সত্য যে আজও পর্য্যন্ত যাভার প্রকৃত সৌন্দর্য্য মাটির ভিতর চাপা পড়িয়া আছে এবং শত শত বৎসর অতীতের কোলে বিলীন হওয়ার ফলে বোরবুদর (Borobudur) ও প্রামবানানের (Prambanan) ভগ্নস্তূপের উপর বিস্তর আগাছার জন্ম হইয়াছে। ইহার অতীত সৌন্দর্য্য ও গৌরবের ইতিহাসকে উদ্ধার করিতে হইলে পর্টুগীজ পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের পূর্ণ মনোযোগ ও চেষ্টা থাকা দরকার।

কবি বলিয়াছেন, এই দুইটি দ্বীপে বিশেষতঃ বলি দ্বীপে ভারতের শিল্প-কলা-জীবনের ভাব-সাধনা, ধ্যান ও চিন্তার অভিব্যঞ্জনার যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেরূপ নিদর্শন আর কোন দেশে নাই। যাভা ও বলি ভ্রমণ করিয়া তিনি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে সে দেশের লোকেরা মহাভারত ও রামায়ণকে আদর্শ করিয়া তাহাদের সমস্ত জীবন-নাট্যখানি পরিচালিত করিয়া থাকে। এমন কি উভয় মহাকাব্য হইতে অনেক কথা প্রতিদিন-

কার চলিত কথার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। অধুনাতন ধর্ম্মের বহুমুখী গতি অপেক্ষা বোধ হয় ইঁহাদের শক্তি অধিকতর প্রবল। যাভা ও বলির লোক জীবনের উপর মহাভারত ও রামায়ণ যতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ভারতের জীবনে ততদূর পরিলক্ষিত হয় না। এই দুই মহাকাব্যের মহতী স্রোতধারা সাধারণ লোক-জীবনের উপর দিয়া সর্ব্বদা বহিয়া যাইতেছে। মহাভারত ও রামায়ণের চিত্র আদর্শরূপে লোক সমক্ষে প্রতিদিন ছায়াচিত্রে, সঙ্গীতে, নৃত্যে ও শিল্প কলায় অভিব্যক্ত হইতেছে; তাই ভারতের মহিমা সেখানে একটুও খর্ব্ব হয় নাই—সেটি কিন্তু তাহার দর্শনের জন্য নহে তাহার কাব্যের জন্য। এক সহস্র বৎসরের ঝঞ্ঝা ও পরিবর্ত্তনের আঘাতে জর্জ্জরিত হইলেও এই দুই মহাকাব্যের চির নবীনতা এখনো সম্পূর্ণ ব্যক্ত রহিয়াছে এবং ইহাই এদেশবাসীদের নিকট পিতৃপিতামহের সম্পত্তির মত মহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন ক্রমবর্দ্ধনশীল হিন্দুধর্ম্মের প্রকোপে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যবদ্বীপে অতি সত্বরই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যবদ্বীপ ও বলিতে বৌদ্ধধর্ম্ম আগ্নেয়গিরির উৎপাতের মত হঠাৎ মহা আড়ম্বরের সহিত আরম্ভ হইয়া শেষে ভাল করিয়া পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে নাই। বোধ হয় ইহা আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ছিল বলিয়া এই দ্বীপবাসীদের প্রাণে আনন্দ দিতে পারে নাই। ইহারা ছিল সত্যকারের রস-সেবায়েৎ, ইহাই মানবজাতির নিকট তাহাদের বিশেষ পরিচয়।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের মধ্যে এই দেশবাসীরা এমন একটি সৌন্দর্য্য অনুভূতির প্রেরণা পাইয়াছিল যাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে পায় নাই। বোরবুদরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে একটি রাজার কার্য্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ইহারই সন্নিকটে প্রাম্‌বানান্‌এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেশের লোকধর্ম্ম জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেইজন্যই ইহা সাধারণ জনবর্গের মন-দর্পণে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বোরবুদর একান্ত নির্জ্জন ও বিরাটকায়। ইহা যেন আপন গৌরবে আপনি অভিভূত। মায়াবাদে ইহাকে শক্তি চাতুর্য্যের খেলা (tour-de-force) বলা হইয়া থাকে। ভাস্কর্য্য-প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিলে ইহা বিশেষ ভাবে প্রতীয়মান হইবে। ইহা ছাড়া বাস্তত বোরবুদরের বিশেষ কোন আকর্ষণী শক্তি নাই। অতি বিচক্ষণতার সহিত নিরীক্ষণ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে একই বুদ্ধ-মূর্ত্তির রূপ-গঠনে কোন রকম বিচিত্রতা না আনিয়া অসংখ্য করা হইয়াছে। ইহাতে বহুমুখীনতার এই বিশেষ অভাব কেবল একটি ধারণার অতি প্রবল পরিপূর্ণ শক্তি এই দেশের বিভিন্নমুখী বিচিত্রতার মূলে শেলাঘাত করিয়াছে। অপরদিকে প্রাম্‌বানানের হিন্দু-সন্দির সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ কৌশলের অপূর্ব্বতায় একতার সমস্ত সৌন্দর্য্য বহুত্বে মিশিয়া গিয়াছে। ইহা বহুবিধ ভাব ও রূপের সম্মিলিত প্রভাবের মধ্য দিয়া শিল্প-কলার চরম সৃষ্টি।

শ্যামদেশে কবি প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের জীবন্ত শক্তি প্রকাশিত দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেখানে বিহার, বৌদ্ধ-ভিক্ষু ও নবধর্ম্মব্রতীর সাক্ষাৎ মিলিয়া ছিল। শ্যামে বৌদ্ধ-শিক্ষা বিচ্ছিন্নভাবে আংশিক ধর্ম্ম-সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং সাধারণ জীবনের অত্যন্ত অন্তর দেশে জন্মলাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলে শ্যামদেশের লোকেরা বিশেষ ভাগ্যবান্, কেননা তাহাদের মধ্যে জাতিধর্ম্ম ও ভাষার এমন একটা সঙ্গতি আছে যাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়না। সেই জন্যই তাহারা খুব সরল এবং সেই সরলতার মধ্যে তাহাদিগকে নমনীয়তা ও শক্তির মোহিনী গরিমায় গুণান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে উচ্চ নৈতিক আদর্শ শ্যামবাসীদের মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শ্যামের বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা চিত্তবৃত্তির চঞ্চল প্রেরণার উচ্ছৃঙ্খলতায় অভিব্যক্ত নহে—এইরূপ অভিব্যক্তি অনেক সময় পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের উপর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আশা হয় যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই প্রকার উন্নত রূপ যেরূপ জীবন্ত ভাবে ইহার ধর্ম্মগ্রন্থে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা কোন কালেই নষ্ট হইবে না। জাতীয় স্মৃতি সাধনায় ব্রতী শ্যামীয়গণ পালিভাষায় শ্যামী-অক্ষরে লিখিত প্রায় পঞ্চাশৎ গ্রন্থাকারে ত্রিপিটকগুলি প্রকাশিত করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। এই মহৎ কার্য্য দরিদ্রজন ও রাজন্যবর্গের দ্বারা পরিপুষ্ট ও উজ্জীবিত হইতেছে। রাজবংশীয়দের মধ্যে অনেকেই অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিলেও আপনাদের মনের অভিব্যক্তি ও চিন্তা ধারায় স্বাধীনগতি প্রতিহত হয় নাই এবং তাহারাই শ্যাম-জাতির প্রকৃত অধিনায়ক।

শ্যামে ও যাভায় মহাভারত এবং রামায়ণ (বিশেষ করিয়া রামায়ণ) তদ্দেশীয়দের শিল্পকলা ও সাহিত্যের জীবন্ত অংশরূপে গণ্য হইয়া থাকে। রামায়ণ জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ ইহাতে অপূর্ব্ব চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বৈচিত্র্যের সমাবেশ। উভয় কাব্যের কাহিনীতে কবি অত্যাবশ্যক পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন, এগুলির মধ্যে জটিলতা নাই—কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পাঠান্তর মাত্র। বিভিন্ন সময়ে ভারতের নানা দেশাগত সওদাগরগণ এই মহাকাব্যদ্বয়ের প্রকৃত পুঁথি আনিয়া নানাবিধ কল্পিত কাহিনী সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন।

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতের কোন প্রকৃত বন্ধু (যথা মিঃ বিরলা প্রভৃতি) যদি মাঝে মাঝে এই লুপ্তরত্ন উদ্ধারের উদ্দেশে পর্টুগীজ পণ্ডিতগণের সহিত কার্য্য করিবার জন্য ভারত হইতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করেন তাহা হইলে দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। অতীতের গরিমাময় এই লুপ্ত-রত্নের উদ্ধার কেবলমাত্র এই উপায়েই সম্ভব। —ফর্ওয়ার্ড

অনুবাদক—শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

ছটে-ফোঁটা

বুড়ার কাহিনী

নাকের ডগায় চস্‌মা টানিয়া সদানন্দ ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিল আর সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিল—চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ব যোগাৎ; সেই সময়ে শ্রীহরির নামে হাই তুলিয়া বয়স্য কাশীনাথ তাহার পাশে আসিয়া বসিল। কাশীনাথ বলিল "দাদা, এ বয়সে ছেলেখেলা ছাড়, ধর্ম্মে মন দাও।" সদানন্দ তামাকের নলটা কাশীনাথের হাতে দিয়া আর চস্‌মাটা নাকে আঁটিয়া বলিল "ধর্ম্মত এ বয়সে এই শীত কালের প্রাতঃ-স্নানের সময়কার গঙ্গা-স্তোত্রের মত নিজেই ফুটিয়া ওঠে,—সাধনার প্রয়োজন হয় না। গঙ্গাস্তোত্র যেমন শীতের কম্বল, ধর্ম্মও হয় এই বয়সে সেই রকম ভয়ের সম্বল।" কাশীনাথ তামাকের ধোঁয়ায় একটু কাশিয়া বলিল—মানে কি, দাদা? সদানন্দ তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া বলিল "মানে অতি স্পষ্ট। মরণের দূতটা জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে খাবি-খাওয়া পর্য্যন্ত সকলেরই সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘোরে; ওঁৎ পাতিয়াই থাকে, কাহারও বয়স গণে না। শিশুরা তাহাকে চেনে না আর যুবারা হয় প্রবৃত্তির ধোঁয়ায় তাহাকে চোখে দেখিতে পায় না, নয়ত কাজ-কর্ম্মের প্রাচীরের আড়াল দিয়া তাহাকে ঢাকে, আর পাওনাদারেরাও কথা কহিতে আসিলে বলে—তাহার মরণের অবসর নাই। আমাদের এখন অবসর যথেষ্ট; রাত্রে একাকী পথিক ভূতের ভাবনা এড়াইবার জন্য যেমন চেঁচাইয়া গান ধরে, আমরাও সেই রকম দূতের মূর্ত্তি ভুলিবার জন্য স্তোত্র পড়ি, আর না হয় নামাবলী দিয়া গা ঢাকিয়া তাহার চোখের আড়াল হইতে চাই; গায়ে দুর্গন্ধের প্রলেপ দিলেও যে সে ছাড়ে না, সেটা বুঝিয়াও বুঝি না।"

কড়া তামাকটা কাশীনাথের সহিল না; সে নল ফিরাইয়া দিয়া বলিল—তুমি কি ধর্ম্মটাকে ভাব ফাঁকি আর জুয়াচুরি? সদানন্দ বলিল—না হে ভায়া সেটা ফাঁকিও নয় জুয়াচুরিও নয়, বরং খুব সত্য। তবে সেটা যে নিজেই দেখা দেয় সেই কথাটাই বলিতেছিলাম।

সদানন্দের বক্তৃতায় অল্প একটুখানি বাধা পড়িল; নাত্‌নী কমলা ছবির বইখানি দখল করিয়া পাশে আসিয়া বসিয়া বলিল, "ঠাকুরদা আজ দাদাদের চড়িভাতি আর থিএটার"। সদানন্দ

তাকাইয়া দেখিল তাহাদের ছোট সহরের অনেক ছেলে দল বাঁধিয়া হৈ-হৈ করিয়া চলিতেছে, আর তাহার নিজের বাড়ীর ছেলেরা একখানা বড় সতরঞ্চি ঘাড়ে করিয়া রাস্তার ছেলেদের দলে জুটিল। সদানন্দ বলিল—"দেখিলে কাশীনাথ, ছেলেরা বুড়ার দলকে এড়াইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেছে। উহাদের উৎসবে অপবিত্রতা নাই, তবুও বুড়ারা বাদ পড়ে। উহারা নিত্য নূতন কাজ করে,—আর কোন কাজটি ভাল বা মন্দ, তাহা অভিজ্ঞ বুড়াদের উপদেশে না শিখিয়া নিজেদের জ্ঞানের পরীক্ষায় ঠেকিয়া ঠেকিয়া শেখে। আমরা যদি আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ দেখাইবার ব্যগ্রতায় উহাদের মাথার উপর টিক্ টিক্ করি, তবে যথার্থই উহাদের জ্ঞান লাভ হয় না। গোড়া হইতে উপদেশের বোঝা ঘাড়ে করিয়া যদি শিশুরা ও যুবারা চলিত, তবে তাহারা নিষ্কর্ম্মা হইত ও বোকা বনিত; তাজা জীবন ফুটিয়া উঠিত না। কাজেই এই সঙ্গীহীন আমরা বুড়া বয়সের দৌলতে এক-ঘরে হই। একা পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাঁহাকেই সঙ্গী করিতে ডাকি যিনি মরণের দূতের মালিক। এই জন্য ঈশ্বর সকলের কাছে সমান ভাবে থাকিলেও বুড়ারা তাঁহাকে বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে। ধর্ম্ম হয় বুড়া বয়সের পাকা চুল ও ভাঙ্গা দাঁতের মত স্বাভাবিক। অনেক বুড়াকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়—তাহার চুল পাকিল না কেন, তাহার দাঁত পড়িল না কেন; কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সে জপের মালা ধরিল না কেন,—ধর্ম্মে মন দিল না কেন। যে বয়সে যাহা ঘটে তাহা লোকে দেখিতে চায়; তাই তুমিও আমাকে ধর্ম্মে মন দিতে বলিতেছ"।

কাশীনাথ গা-ঝাড়া দিয়া বসিয়া বলিল—আমরা কি তবে দায়ে ঠেকিয়া ফাঁকিকে ভজনা করি, না ঈশ্বর যথার্থই আছেন? সদানন্দ তাহার নাত্‌নীর বেণী ধরিয়া বলিল "এই আমার নাত্‌নী আছে, ঐ আকাশ আছে, বন আছে, পাহাড় আছে, কত কিছু আছে; শুধু আছে বলিয়াই তুমি সেগুলিকে ভজনা করিতে যাও না। ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার যদি সম্পর্ক একটা না থাকে, অর্থাৎ জীবন্ত সম্পর্ক না থাকে,—তিনি যদি আকাশের মত আমার চোখে স্নিগ্ধ না হন্, আমার নাত্‌নীর মত প্রাণের মধু না হন্, তবে আমি চাকরটার জ্বালায় উদাসীন চোখে কতবার আকাশের দিকে তাকাইব—অথবা পাওনাদারের আক্রমণ এড়াইবার জন্য কতক্ষণ নাত্‌নীর সঙ্গে খেলা করিব? তুমি যদি মরণের ভয়ে ঈশ্বরকে খোঁজ, তবে হইবে বৃথা ধর্ম্ম; তুমি কেবল অনিশ্চিতকে কৌশলে মনে রাখিবার প্রয়াসে করিবে মালা জপ, আর আতঙ্ক এড়াইবার জন্য পেঁচার মত মুখ করিয়া হাই তুলিয়া হরি-হরি বলিবে।"

কাশীনাথ বলিল—"গীতায় আছে—"। কাশীনাথের কথায় বাধা দিয়া সদানন্দ বলিল—রাখ তোমার গীতা, রাখ তোমার শাস্ত্র ও শোনা কথা; যাহা তুমি অ-সাধনায় পাও নাই, তাহা কেহ তোমাকে দিতে পারিবে না।

এই শেষ কথাটা কাশীনাথের ভাল লাগিল না; সে অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিল—ভাল ঘুম হয় না, কি করি বল ত? সদানন্দ নাত্‌নীর বিনুনি ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল "প্রাণ ভরিয়া হাস,—হোহো করিয়া হাস।" কমলা বিনুনির টানের জ্বালায় হাসি ভরা চোখে বলিল—উঃ, বড় লাগে। কাশীনাথ বাড়ী গেল।

বাড়ীতে ঢুকিয়াই কাশীনাথ দেখিল, তাহার ছোট নাতি ঠাকুরদাদার জুতা পায়ে দিয়া ও লাঠি গাছটি হাতে করিয়া বুড়ার চলনের অভিনয় করিতেছে। কাশীনাথ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর সেই হাসিতে উৎসাহিত হইয়া নাতিটি আরও অভিনয় করিতে লাগিল। কাশীনাথ

আনন্দে শুইয়া পড়িল, আর তাহার ঘুম হইল চমৎকার। ঘুম হইতে উঠিয়াই দেখিল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দে কোলাহল করিয়া পুতুল খেলা করিতেছে। কাশীনাথ তাড়াতাড়ি তাহার নামাবলীখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া পুতুলদের জন্য নূতন নূতন কাপড় দিল, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া ছেলেদের সঙ্গে ছেলে-খেলা করিয়া সুখী হইল।

পৌষে

কমিশনের উদ্দেশ্য—শান্তিতে ও সুবিধায় ভারতবর্ষ শাসন হইবার জন্য বিলাতের পার্লামেণ্ট কমিশন বসাইয়াছেন; জেতাদের স্বার্থে বাধা না ঘটাইয়া এদেশের আকাঙ্ক্ষা কতখানি পূর্ণ করা যাইতে পারে, কমিশনারেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। কাজেই কর্ত্তাগিরির দলে ভারতবাসী কাহাকেও নেওয়া চলে না; ভারতবাসীদের পক্ষে কি-কি অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা কেবল দেশের লোকের মুখে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিলেই পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য সফল হয়, আর সেই নীতিতেই কমিশনারেরা দেশের প্রতিনিধিদিগকে নিজেদের কথা বলিতে দিবেন। ভারতসচিবের উক্তিতে এই কথাটাই প্রকাশিত হইয়াছে, তবে তিনি ভারতবাসীকে কর্ত্তাগিরির দলে না নেওয়ার অন্য যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কেবল আমাদের মনস্তুষ্টি জন্মাইবার প্রয়াসে। আমরা যদি স্বীকার করি যে এদেশের সকল সম্প্রদায়ের যথার্থ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া নির্ব্বিবাদে কমিশনের কাজ চালান যায় না, তবুও সুযুক্তিতে বলা চলে না যে কয়েকজন ভারতবাসীকে কমিশনার করা অসম্ভব ছিল। কারণ, যাহারা ইংরেজ কমিশনরদের মত ভারতের কোন দলের লোক ন'ন্ অথচ অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মদক্ষতা আছে এদেশে এমন লোকের অভাব নাই। আমরা অনায়াসে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এরূপ অ-মুসলমান ও মুসলমানদের নাম করিতে পারি যাঁহারা অপক্ষপাতে সকল সম্প্রদায়ের ও সারাদেশের কল্যাণ কামনায় কাজ করিতে পারেন। সেরূপ নাম লিখিয়া এখন লাভ নাই; ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে এরূপ লোকের কোন সন্ধান একেবারেই নেওয়া হয় নাই, আর অপক্ষপাত বিচারে কেবল ইংরেজেরাই দক্ষ এই কথাই ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। যেদেশে অপক্ষপাত বিচারের লোক নাই সেদেশ আত্মশাসনে রক্ষিত হইবার যথার্থই অনুপযোগী; কাজেই দেখা গেল কমিশন বসিবার আগেই পার্লামেণ্ট স্থির করিলেন যে আমরা স্বরাজ্য লাভের অনুপযোগী। এ অবস্থায় কমিশনের রিপোর্টে যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহা শাসনের গোটাকতক ডাল-পালার প্রসঙ্গেই হইবে।

ভারত সচিব বলিয়াছেন যে কমিশনরদের দলে ভারতীয় ইংরেজ সম্প্রদায়ের লোককেও অপক্ষপাত বিচারের উদ্দেশ্যে নেওয়া হয় নাই। কথাটি অর্থশূন্য। পার্লামেণ্ট্ ত জেতা জাতির স্বার্থ-রক্ষার জন্যই মুখ্যভাবে কমিশন বসাইয়াছেন; ইহাতে এদেশের ইংরেজ বণিক প্রভৃতিরা কিছুতেই কোন আশঙ্কা করিতে পারেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেও যে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হয় নাই তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ববারেই বলিয়াছি যে কমিশনের কাজ ভারতগবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞতার আলোক দূর করিয়া করা যাইতে পারে না ও রিপোর্ট দাখিল হইবার পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট্ পূরা মাত্রায় সকল বিষয় সমালোচনা করিয়া মন্তব্য না লিখিলে রিপোর্ট পেস্ হইতে পারিবে না।

কাজেই এখন কথার ফাঁকি ও কথার লড়াই এড়াইয়া স্পষ্ট কথা বুঝিয়া নেওয়া ভাল। একজন মার্কিন বিবি এদেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও যখন ছয়মাস কেবল এখানে সেখানে ঘুরিয়া আমাদের সকল সমাজের নিগূঢ় তথ্য আবিষ্কার করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তখন সাতজন ইংরেজ কৃতী পুরুষ অনায়াসেই আমাদের দশ-জনকে কতকগুলি প্রশ্ন না করিয়াই নানা উপায়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা ও কল্যাণের কথা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন ; বৃথা বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

* * * * *

কমিশনের উপরে কমিশন—এদেশের রাজাদের শাসিত রাজ্যগুলির সঙ্গে বৃটিশ ভারতের সম্পর্ক কি ভাবে কতদূর রাখা যাইতে পারে ও রাজাদের রাজ্যশাসন সম্বন্ধেও কিছু বলা চলে কি-না, এই সকল কথা বিচারের জন্য পার্লামেণ্টের অন্য কমিশন বসিবে ও একই সময়ে দুই কমিশনের কাজ চলিবে। রাজাদের সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক পাকা রকমে নির্দ্দিষ্ট হইয়া সন্ধি ও সনদ পত্র প্রভৃতিতে অঙ্কিত হইয়াছে ও তাহার সাধারণ বিবরণ এচিসন্ কৃত ট্রিটি-সংগ্রহ গ্রন্থে আছে। এই সন্ধির নিয়ম গবর্ণমেণ্ট অতিক্রম করিতে পারেন না ; তবে সেই বাঁধা নিয়ম-গুলির সঙ্গে বিরোধ না ঘটাইয়া দেশীয় রাজাগুলির হিতের জন্য কি করা যাইতে পারে পার্লামেণ্ট তাহার বিচার করিতে চান্। আমরা যখন আপনাদের হাতে শাসনের ভার পাইবার জন্য উৎসাহিত তখন এই দেশীয় রাজ্যগুলির আত্মশাসন রক্ষা করিবার দিকেই আমাদের দৃষ্টি থাকা উচিত। এদেশে এমন অনেকগুলি রাজ্য আছে যেগুলি আয়তনে বেল্‌জিয়ম, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলি অপেক্ষা ছোট নয়; অনেকে হয়ত সেসকল রাজ্যের সুব্যবস্থার কথা কিছু কিছু জানেন। আমরা জানি, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও অনেক রাজ্যের শাসন-প্রথা খুব ভাল। এখন সকল রাজ্যের মধ্যেই রাজা ও প্রজারা শিক্ষিত হইতেছেন ; কাজেই তাঁহাদের নিজের পন্থা ধরিয়া উন্নতি সাধন করিবার দিকে কোন প্রকার বাধা না পড়া উচিত।

* * * * *

বঙ্গবাণীর একজন লেখিকা—এই পত্রিকায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমতী সুনীতি দেবী পাষাণী নামে যে গল্পটি লিখিয়াছিলেন ইউরোপে সেটির আদর হইয়াছে। বঙ্গবাণীর জর্ম্মণ পাঠকেরা ঐ গল্পটি জর্ম্মণ ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য অনুমতি নিয়াছিলেন, আর এখন সেটী বিদেশীয় স্বরচিত সাহিত্য পরিচয়ের গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। গল্পটির কাব্যশিল্পের প্রশংসা করিয়া জর্ম্মণ প্রকাশক যাহা লিখিয়াছেন, তাহার একটি ছত্র এই :—Your touching story is of great psychological delicacy and you succeed in a masterly manner in gradually revealing the highly surprising truth that underlies the whole.

* * * * *

ইংরেজ শাসনের সমালোচনা :—এদেশে ইংরেজের শাসন নিশ্চয়ই আমাদের সমালোচ্য, কেননা সকল বিষয়েই আমাদের স্বার্থের সহিত ব্যবস্থাগুলি জড়িত। আমরা মনুষ্যত্বের দাবিতে স্বাধীনতা চাই আর চিরদিনই তাহা চাহিব ; যাহা পাওয়া উচিত বা যাহা হওয়া উচিত তাহা না পাইলে বা না হইলে আমরা ক্ষুণ্ণ হইব ও ন্যায়ের ও মনুষ্যত্বের বিচার ভুলিয়া অন্যায়ের

বিরুদ্ধবাদী হইব। কিন্তু এইরূপ সমালোচনায় অভ্যস্ত হইয়া যেন তাড়াতাড়ি সেইরূপ ব্যবস্থার বিরোধী না হই যাহা ভারতের পক্ষে হিতকর। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক ব্যয়ে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন কি-না তাহা হইল এক দিকের কথা, আর অন্যদিকের কথা এই যে ঐরূপ সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন আছে কি-না। সম্প্রতি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে আসামের দিকে ভারত-সীমান্ত দৃঢ় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন; এই প্রস্তাবের একটি বিরোধী সমালোচনায় লক্ষ্য করিলাম যে ঐ প্রকার ব্যবস্থায় ইংরেজের শাসন সুদৃঢ় হওয়ায় সম্পাদক তত প্রসন্ন নন। এখানে ভাবিতে হইবে যে ভারতবর্ষ যদি সম্পূর্ণ আমাদের হাতে থাকিত তবে আমরা এদেশকে বিদেশীদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ না করিয়া থাকিতে পারিতাম কি-না। ইংরেজ যদি চলিয়া যান আর সীমান্তগুলি তাঁহাদের যাইবার সময় শিথিলভাবে থাকে তবে আমাদের স্বরাজ পাইবার দিনে সে অবস্থা সুখের হইবে না। চীন দেশের লোকেরা এসিয়ার লোক বলিয়া এমন নিশ্চয় বন্ধু হইতে পারেন না যে সুবিধা পাইলে কোন উপদ্রব করিবেন না। প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী ধরিয়াই আমরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করিবার পক্ষপাতী।

ভারতের প্রাচীন আইন—হিন্দুজাতির উত্তরাধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের বিধান ঠিক কিরূপ ছিল তাহা প্রাচীন শাস্ত্রের নিপুণ আলোচনায় নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য বোম্বাই সহরে কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে: এই সমিতি ভারতের সকল প্রদেশের বড় বড় কেন্দ্রে শাখা সমিতি স্থাপন করিয়া পণ্ডিত-সমাজের সাহায্যে প্রাচীন বিধির যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতায় একটি সভা আহূত হইয়া যে শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার সম্পাদকরূপে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক ও ঋষীন্দ্রনাথ সরকার নিয়োজিত হইয়াছেন ও সভাপতি হইয়াছেন স্যর নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় আর সহকারী সভাপতি হইয়াছেন জষ্টিস্ চারুচন্দ্র ঘোষ, জষ্টিস্ বিপিনবিহারী ঘোষ, জষ্টিস্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যর্ প্রভাসচন্দ্র মিত্র। সদস্যবর্গের মধ্যে স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ প্রমুখ অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত আছেন আর তাহা ছাড়া অনেক আইনজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। এই সদস্যদলে এই পত্রের সম্পাদকও সদস্য নিয়োজিত হইয়াছেন। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারে ও এদেশের হাইকোর্ট গুলির বিচারে হিন্দু আইন নামে যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারুক বা নাই পারুক, এই সমিতিগুলির অনুসন্ধানে প্রাচীন সমাজের ব্যবস্থা ও অবস্থা যদি সুনির্দ্দিষ্ট হয় তবে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। বোম্বাই হইতে পণ্ডিত বামনশাস্ত্রী কিঞ্জওয়াদেকর মীমাংসক-শিরোমণি কলিকাতার এই সমিতি স্থাপনের উদ্যোগে আসিয়াছিলেন ও সংস্কৃত ভাষায় সমিতি স্থাপনের দিনে সমিতির উদ্দেশ্য প্রভৃতির কথা বলিয়াছিলেন।

Editor: Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya at the Model Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal.

"আবার তোরা মানুষ হ"

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩৩৩-'৩৪ — মাঘ — দ্বিতীয়ার্দ্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক

যে প্রবল ভারতবর্ষীয় নৃপতি গ্রীক বীর সেলিউকসের নিকট হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্থিত বিস্তীর্ণ জনপদ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, গ্রীক ইতিহাসে যিনি Sandr

এই বিপরীত সিদ্ধান্তের প্রধান উপকরণ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রের উক্তি। হেমচন্দ্রের মতে চন্দ্রগুপ্ত মহাবীরের মোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে (অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে) রাজ্যাভিষিক্ত হন। সে সময়ে অবশ্য মাকিদনবীর আলেকজান্দারের জন্মও হয় নাই। সুতরাং হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদের পরিচিত চন্দ্রগুপ্ত কখনই গ্রীক লেখকদিগের Sandrocottus হইতে পারেন না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু এই উপকরণে আস্থাশূন্য হইবার উপযুক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণাব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের সৃষ্টি এবং সিংহলের নৃপতিগণের রাজ্যাঙ্ক হইতে গণনা করিতে গিয়া গণকগণ সমষ্টিতে ভুল করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে মহাবীরের মৃত্যুর বৎসর সম্বন্ধে জৈনগণের মধ্যেই এত মতভেদ আছে যে তাহা হইতে সত্যোদ্ধার একপ্রকার অসম্ভব। তাঁহারা নানা প্রমাণের আলোচনা করিয়া খৃঃ পূঃ ৪৯০ হইতে ৪৮০ পর্য্যন্ত কোন বৎসর বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ-প্রাপ্তির সময়—এইরূপ স্থির করিয়াছেন। মহাবীরের নির্ব্বাণ ইহার অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে। চন্দ্রগুপ্তের সময় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

Sandrocottus-এর সহিত প্রথম মৌর্য্য নৃপতির অভিন্নত্ব যে যে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার যথাযথ খণ্ডন হয় নাই। "Sandrocottus" যে 'চন্দ্রগুপ্ত' শব্দেরই গ্রীক হস্তে বিকৃতি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অশোককে Sandrocottus-এ পরিণত করিতে গিয়া তাঁহার নাম অশোকচন্দ্রগুপ্ত করা হইয়াছে। পরবর্ত্তী গুপ্তবংশে ১ম ও ২য় চন্দ্রগুপ্ত পরস্পর পিতামহ ও পৌত্র ছিলেন বলিয়া মৌর্য্যবংশেও যে ঐরূপ একটা কিছু ঘটিয়াছিল এরূপ অনুমান আমরা তর্কশাস্ত্রের অনুমোদিত মনে করি না। নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন মেগাস্থিনিসের "বিবরণীতে প্রকাশ যে মৌর্য্যসম্রাটের বিরুদ বা উপনাম 'পাটলিপুত্রক' ও একটি নাম 'চন্দ্রগুপ্তক'।" Mc. Crindle সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে পাওয়া যায়—"The king in addition to his family name must adopt the surname of Palibothros as Sandrocottus, for instance, did, to whom Megasthenes was sent on an embassy." ইহা হইতে অশোকের "চন্দ্রগুপ্ত" উপনাম থাকার স্বপক্ষে প্রমাণ পাওয়া দূরে থাকুক, 'চন্দ্রগুপ্ত' যে নৃপতিবিশেষের পারিবারিক নাম ও নিজস্ব তাহা খুব স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়।

নগেন্দ্রবাবু চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে জষ্টিনসের গ্রন্থ হইতে এক স্থানের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—"জষ্টিনস লিখিয়াছেন, এই রাজা অতি নীচবংশোদ্ভব। দৈববলেই তিনি রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি আলেকসান্দরের সহিত দেখা করেন। কিন্তু তাঁহার রুক্ষ কথায় আলেকসান্দর রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়া রক্ষা পান।"...ইত্যাদি।

এই অংশে Alexandrum স্থলে এক্ষণে নন্দ্রাম্ পাঠ গ্রহণ করিতে দেখা যায়। নন্দ্রাম পাঠ ঠিক হইলে Sandrocottus কখন অশোক হইতে পারেন না; অশোক ও নন্দ যে বিভিন্ন সময়ের লোক তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, তাঁহাদের সংঘর্ষ অসম্ভব। আলেকজান্দ্রাম্ পাঠ ঠিক হইলেও যে কথাগুলি নবরাজ্যস্থাপয়িতা চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। জষ্টিনসের ভাষায় রাজাটী ছিলেন of humble (humili) birth। তাহার অনুবাদ "অতি নীচবংশোদ্ভব" করিলে ঠিক হয় না। চন্দ্রগুপ্তকে of humble birth বা born in humble life বলা সম্ভব, কিন্তু রাজার পৌত্র, রাজার পুত্র অশোক সম্বন্ধে এমন কথা মোটেই খাটে না।

দিওদোরাসের গ্রন্থ হইতে নগেন্দ্রবাবু যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে আলেকজান্দারের সমকালবর্ত্তী মগধরাজ নীচবংশোদ্ভব ও কোন নাপিতের অবৈধ পুত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই রাজার নাম দিওদোরাসের মতে Xandrames, কার্টিয়াসের মতে Agrammes। নন্দরাজগণ নীচবংশোদ্ভব বলিয়া পুরাণে পরিচিত। নবনন্দের কোন নন্দের নাম (এবং সম্ভবতঃ বংশপরিচয়) যে নিতান্ত বিকৃত অবস্থায় গ্রীক শিবিরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল ইহাই সহজে অনুমেয়। অশোকের পিতা বিন্দুসার ঐ সময়ে মগধরাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে যে তাঁহার নীচবংশ ঘোষিত হইবে বা নাপিতসম্বন্ধীয় কোন কিংবদন্তী গ্রীক লেখকগণের নিকট পৌঁছিবে বা প্রজারা তাঁহাকে "তুচ্ছতাচ্ছীল্য" করিবে ইহা কদাচ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অশোকাবদানের নানা আষাঢ়ে গল্পের মধ্যে অশোকের মাতার সম্বন্ধে যে কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহার মূলে কিছু সত্য থাকিলেও যে গ্রীকগণ বিন্দুসারকে নাপিতপুত্র স্থির করিয়া বসিবেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের মনে হয় এই কিংবদন্তী নবনন্দের আমলের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র।

নগেন্দ্রবাবু বলেন, "অগ্নিসম তেজস্বী চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত যবনকন্যা বিবাহ করিয়াছেন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ কোন আভাস নাই, তাঁহার সহিত যবন-সম্বন্ধ থাকিলে কোন না কোন ভারতীয় প্রাচীন লেখক অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিতেন"; কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর নিজের মতেই চাণক্য জৈন ও বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন। তিনি চাণক্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তাঁহাকে বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা কুণ্ঠিত।" যদি তাহাই হয়, তবে চন্দ্রগুপ্তের গ্রীককন্যা গ্রহণে চাণক্যের অমত হইবার কথা কি? চন্দ্রগুপ্ত যে যবনকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ঠিক এ কথাও কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। গ্রীক্‌বিবরণী হইতে আমরা এই মাত্র পাই যে তিনি সেলিউকসের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তেজীয়সাং ন দোষায়—কোন যুগেই রাজারাজড়ারা যৌন সম্বন্ধে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বিধান অকাট্য

বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গ্রীক ও হিন্দু উভয়েই দেবদেবীর উপাসক। পরবর্ত্তী কালেও বাপ্পারাও-এর মত 'অগ্নিসম তেজস্বী' হিন্দুরাজার মুসলমান কন্যা গ্রহণে কি চিতোরের রাণাবংশ গৌরবচ্যুত হইয়াছে? বিবাহ-প্রথায় চাতুর্ব্বণ্যধর্ম্মের আঁটাআঁটি ক্রমেই বাড়িয়া গিয়াছে। তবু আমরা দেখিতে পাই আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে বিখ্যাত মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণবীর বাজীরাও মুসলমান নৃপতির ঔরসজাত কন্যা গ্রহণ করিতেছেন। 'মহারাজ' উপাধিধারী হায়দরাবাদের ভূতপূর্ব্ব হিন্দুমন্ত্রীর বংশে একটি মুসলমান কন্যা গ্রহণ নাকি পারিবারিক প্রথা। গ্রীক কন্যা গ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর ঘটনা যুদ্ধান্তে গ্রীকবীর সেলিউকসের নিকট হইতে বিপুল রাজ্যগ্রহণ। চন্দ্রগুপ্ত কি অশোক যিনিই এই সম্মানের প্রকৃত অধিকারী হউন, কোন্ হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন লেখক তাঁহার এই অধিকারের ঘৃণাংশেও উল্লেখ করিয়াছেন? অশোক চন্দ্রগুপ্ত নামক কোন রাজা যে "পঞ্চনদ অধিকার করিয়া শক-যবন-কাম্বোজাদি সীমান্তপ্রদেশবাসী বীরগণকে সঙ্গে লইয়া" পাটলিপুত্রে আসিয়াছিলেন এই মত সমর্থনের উপযোগী প্রমাণ যতদিন না উপস্থিত হয়, ততদিন ইহা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কল্পনার রাজ্য কবির ও গল্প লেখকের, ঐতিহাসিকের নহে। সুসীমের কুলূত, কাশ্মীর ও পারসিক প্রভৃতি সীমান্ত-রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া কুসুমপুরে উপনীত হওয়ার কথাটাও এই শ্রেণীর।

এখন দেখা যাউক নগেন্দ্রবাবু অশোকের যে রাজ্যকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার সহিত অশোকলিপিতে উল্লিখিত পাঁচজন গ্রীক নরপতির সময়ের কতদূর সামঞ্জস্য আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ খৃঃ পূঃ ২৭৩ হইতে ২৬৮ পর্য্যন্ত কোন সময়ে অশোকের রাজ্যাধিকার স্থির করিয়া অনুশাসনোক্ত নৃপতিগণের সমকালবর্ত্তিতা প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর মতে অশোকের রাজ্যারম্ভকাল ৩২৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। নগেন্দ্রবাবু আরও বলেন, "৩০৯ কি ৩০৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তিনি চতুর্দ্দশটী অনুশাসন লিপিতে আপনার শাসনপ্রণালী ঘোষণা করিয়া অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে সেই প্রচারিত শাসন অনুসারে চলিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন"। সুতরাং দেখিতে হইবে এই ৩০৯ বা ৩০৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অনুশাসনের উল্লিখিত অস্তিওক, তুরময়, অস্তিকিনি, মগ ও অলিকসুন্দরের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি-না।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "যে সময়ের কথা লিখিতেছি তৎকালে সাধারণতঃ রাজন্যবর্গ স্বস্ব জনপদ বা রাজধানীর নামেই পরিচিত ছিলেন," "তাঁহার উক্ত ১৩শ অনুশাসনে যে পঞ্চ যোন বা যবনরাজের উল্লেখ আছে, তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানীর নামেই মৌর্য্যসম্রাটের নিকট পরিচিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করি। এখন দেখা যাউক, উক্ত পঞ্চ রাজধানী কোথায়?" কথাটা খুব সমীচীন বোধ হয় না। কোন কোন স্থলে স্থানের নামানুসারে রাজা পরিচিত হইয়া থাকিলেও ইহাকে একটা সাধারণ রীতি বলিয়া ধরা যায় না। অনুশাসনের ভাবাই এস্থলে

আমাদিগকে সত্যনির্ণয়ে সহায়তা করিতে পারে। অনুশাসনে চোল, পাণ্ড্য, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি রাজ্যের নাম আছে কিন্তু এগুলিকে রাজা বলা হয় নাই। পক্ষান্তরে অন্তিওক, তুরময়, অন্তিকিনি, মগ ও অলিকসুদর রাজা বলিয়া স্পষ্টই উক্ত হইয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবুর মতে এসিয়া মাইনরের Antigonia (এন্টিগোনিয়া), টলেমী স্থাপিত মধ্য-ইজিপ্তস্থ Ptolemais Hermii, (টলেমে হারমাইই), সেলিউকস্ প্রতিষ্ঠিত Antioch (এন্টিওক) প্রসিদ্ধ Makedon (মাকিদন) ও মিশরস্থ Alexandria (আলেকজান্দ্রিয়া) এই, পঞ্চস্থানের নামানুসারে অশোকানুশাসনের পঞ্চ নৃপতির নাম। কিন্তু গ্রীক ইতিহাসে পাই, এন্টিওক নগর সেলিউকস্ কর্ত্তৃক ৩০০খৃঃ পূর্ব্বাব্দে স্থাপিত। সুতরাং ৩০৯ বা ৩০৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাহার অস্তিত্ব সম্ভবে না। এন্টিগোনিয়াও খৃঃ পূর্ব্ব ৩০৬ অব্দে স্থাপিত সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর নির্দ্দিষ্ট অনুশাসনের সময়ে উহাও ভবিষ্যতের গর্ভে। মাকিদনপতিকে যবনরাজ মগ বলা হইয়াছে,—এ মত কতকটা কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে মধ্য ইজিপ্ত ও আলেকজান্দ্রিয়া একই টলেমীর রাজ্যভুক্ত ছিল। একই রাজাকে কি দুই রাজধানীর নামে দুইবার উল্লেখ করা হইয়াছে ?

নগেন্দ্রবাবু পাদটীকায় লিখিয়াছেন "অন্তিওক, অন্তিকিনি, তুরময় ও অলিকসুদর এই পাঁচটীকে যদি প্রকৃত ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়াই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আমাদের উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থানুসারে অশোকের যে কাল পাইতেছি, অর্থাৎ ৩২৪খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৮৭খৃঃ পূর্ব্বাব্দ মধ্যেই উক্ত নামে পঞ্চ যবনরাজের নাম পাইতেছি"। ইহার পর তিনি যে পাঁচ ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রথমটী সেলিউকসের পিতা Antiochus (অন্তিওক)। সেলিউকসের পিতা যে কোন কালে কোন দেশের রাজা ছিলেন ইহা ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও পাইতেছি না। তিনি আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপের অধীনে একজন কর্ম্মচারী ছিলেন—প্রতীচ্য ইতিহাস ইহাই বলে। এন্টিগোনাস্ ও টলেমীও খৃঃ পূর্ব্ব ৩০৬ অব্দের পূর্ব্বে রাজোপাধি ধারণ করেন নাই। মগস্ ও নগেন্দ্রবাবুর উল্লিখিত আলেকসান্দরের রাজ্যকাল তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অশোকানুশাসনের সময়ের যথাক্রমে পরবর্ত্তী ও পূর্ব্ববর্ত্তী।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও আমরা নগেন্দ্রবাবুর অভিনব মত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। সেকালে যাহা স্কুলে পড়িয়াছি একালেও তাহা ভুলিতে পারিলাম না।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

চন্দ্র-গ্রহণ

শুয়েছিনু রোগ-শয্যা পরে,
মুক্ত ছিল পূর্ব্ব বাতায়ন,
সুধাস্রোত ছড়ায় অম্বরে
পূর্ণিমার শশাঙ্কবদন।

সৌন্দর্য্যের রজত-প্লাবনে
মুগ্ধনেত্র আসিল মুদিয়া,
কি যেন রে সোনার স্বপনে
চিত্ত মম পড়িল ঘুমিয়া।

অকস্মাৎ ভাঙিল চমক
সুগম্ভীর শঙ্খঘণ্টারোলে,
টুটিল সে স্বপন-কুহক
শতকণ্ঠে উচ্চ হরিবোলে।

আঁখি তুলি' চাহিনু সহসা
সীমাহীন নীলিমার পানে,
চন্দ্রমার মুরতি বিবশা
বিপাণ্ডুর পড়িল নয়নে।

পঙ্কজের প্রতি দল পরে
সুষমার চারু ছটা প্রায়
যে মাধুরী লহরে লহরে
ছুটেছিল কলায় কলায়,

এ কি ! কার করাল নিঃশ্বাসে
একে একে গেল রে উড়িয়া,
অন্ধকারে একা সে আকাশে
কাঁপে শশী থাকিয়া থাকিয়া !

দল-ঝরা পদ্মের মতন
রহে পড়ি' মলিন কঙ্কাল ;
নাহি রূপ, নাহি সে কিরণ,
ছিন্ন মরি লাবণ্যের জাল !

পূর্ণ গ্রাস পূর্ণিমার বুকে
হৃদয়ে জাগা'ল হাহাকার,
কাঁদিলাম চন্দ্রমার দুখে
ভুলি' নিজ রোগের বিকার।

চিন্তা-ভারে ভারিল নয়ন,
আঁখি মুদি' রহিনু পড়িয়া ;—
শঙ্খ-রোলে চাহিনু যখন
বিস্ময়ে উঠিনু চমকিয়া।

হেরিলাম —ধীরে ধীরে ধীরে
অন্ধকার পড়িতেছে খসি'
স্নান করি' সৌন্দর্য্যের নীরে
নভ-তটে উঠিতেছে শশী।

একে একে ষোলকলা তার
পুনর্ব্বার আলোকে পূরিল ;
হাসিরাশি ছড়ায়ে আবার
দশদিশি পুলকে পূরিল।—

এমনি কি মরণের গ্রাসে
পড়ি' যবে হারাব জীবন,
আলো-হারা কাঁপিব তরাসে
সূক্ষ্ম দেহে আমি কি তখন ?

তারপর স্বপন-সিন্ধুর
অবগাহি' অ-চেতনা-নীরে
এমনি কি জাগিব মধুর
নবালোকে জীবনের তীরে ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

অদৃষ্ট

সহরের অপ্রশস্ত পথের এই জীর্ণ অট্টালিকা এবং তন্মধ্যস্থ ততোধিক জীর্ণ পরিবারটির ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন চিরদিন তাহাদের এমনি করিয়া কাটিয়া যায় নাই। কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়ে বিশাল মহীরুহ সমূলে উপ্‌ড়াইয়া ফেলে—তাহার একটা গৌরব আছে, কিন্তু সেই বনস্পতির শাখা, প্রশাখা, ফুল, পাতা অবশেষে কাণ্ডটি পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইয়া যখন কোন অন্ধকার কক্ষের এক কোণে স্তূপাকার করিয়া ফেলিয়া রাখা হয়, সে পরিণাম বড় সহজ পরিণাম নহে। এমনি করিয়া ইহাদেরও পুরুষ-পরম্পরায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অতুল ঐশ্বর্য্য ও প্রবল আভিজাত্য গর্ব্ব এই শতচ্ছিদ্র গৃহ ও তিনটি নরনারীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

হুজুগ জিনিষটা বাঙ্গালির-ধাতে যেমন করিয়া সহিয়া গিয়াছে বোধকরি তেমন আর কাহারও নহে। সেদিনও সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে এই পল্লী-প্রান্তের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে স্বদেশী-সভা হইয়া গিয়াছে, কয়েকটি ছেলে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহারই আলোচনা করিতেছিল।

একটি ছেলে বলিল 'চিরঞ্জীব বাবুর কথাগুলা কিন্তু একটু ভেবে দেখবার জিনিষ ভাই, সত্যিই আমরা দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছি বলত। কেবল চাক্‌রী, চাক্‌রী, ! লেখাপড়া শিখে কোনও রকমে একটা চাক্‌রী যোগাড় করে নিতে পাল্লেই যেন আমাদের জীবনের সব উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায়। এই চাক্‌রী করতে পারা ছাড়া লেখাপড়া শেখার যে আর কোন উদ্দেশ্য আছে বা থাকা সম্ভব সে কথা আমরা ভেবে দেখিনা ত!'

আর একটি ছেলে—তাহার অবস্থা বোধ হয় কিছু অসচ্ছল—বাধা দিয়া বলিল—'কিন্তু এই কথাটাই আমি কিছুতে মেনে নিতে পাচ্ছিনে। আমার অবস্থার কথাটাই ভেবে দেখ। সংসারের এমন জায়গায় এসে আমি দাঁড়িয়েছি, যে দুপয়সা উপায় না করতে পারলে কিছুতেই চলে না। তুমি হয়ত বল্‌বে ব্যবসা করগে যাও, সেই কথাই আমি বল্‌তে চাই, প্রথম ব্যবসার শিক্ষা আমাদের নেই, এ বাধাটা যদি ছেড়েও দাও, কারণ শিক্ষা করলে সেটা খুব চট্‌ করেই হতে পারে হয়ত, কিন্তু দ্বিতীয় বাধাটা—মানে টাকার কথা—যখন ওঠে তখন আমাদের চুপ্‌ করে থাকতে হয়। কারণ আমাদের অবস্থার লোক্‌কে দু' পাঁচ হাজার ধার কেউ দিতে চাইবে না; অবশ্য এ কথা আমি মানি যে ব্যবসা করতে গেলে যে-সব গুণ থাকা দরকার তা'র কিছুই আমাদের নেই, কিন্তু পথ পেলে চেষ্টাও ত করা চল্‌তে পারত।'

আর একটি ছেলে কহিল 'কিন্তু চন্দ্রবাবু যে চাষবাসের কথা বলছিলেন সেটাও নিতান্ত মন্দ বলেন নি।'

পূর্ব্বোক্ত ছেলেটি কহিল 'বেশ, এই চাষবাসের কথাটাই ধর, যা'দের দেশে দুচার বিঘে জমি আছে তাদের পক্ষে বরং এটা সহজসাধ্য, কিন্তু বিশ্বসংসারে আপনার বল্‌তে যা'র একছটাক জমিও নেই, সে কি করে বলত! আমার শক্তি আছে, ও-কাযকে আমি অগৌরবেরও মনে করিনে, চেষ্টা করলে দুপাঁচ বছরে দুচার বিঘে জমীও যে যোগাড় করতে না পারি এমন নয়, কিন্তু আমার মাকে, ছোট ভাই-বোনগুলিকে দুবেলা দুমুঠো খাওয়াবার জন্য আজই আমার কিছু না কিছু কর্ত্তে হবে। এখন বলত কোথায়ই বা আমি ব্যবসা শিখ্‌তে যাই আর দুমুঠো মাটির জন্য কার দোরে গিয়ে বসে থাকি।'

দিনান্তের শেষ দীপ্তিটুকু নিভিয়া আসিল, যুবকটি কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল "চিরঞ্জীব দা, একথা বল্‌লেন বটে, কিন্তু তাঁর অবস্থার কথাও জানি, কতটুকু সংসার— মা আর স্ত্রী—তা'ও শুনেছি বিমাতা! চিরঞ্জীব দা'র বাবা মারা যাবার পর ওঁদের অবস্থা যখন নিতান্তই খারাপ হয়ে পড়ল, তখন এই বাড়ীতে উঠে এলেন. দুএক হাজার টাকা কি ছিল, আর নিজের গয়না বেচে সৎমা ওঁকে মানুষ করে তুল্‌লেন। এখন উনি যখন সব বিষয়ে উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন, ওঁর মা যদি চান যে এবার তাঁর সন্তান তাঁদের ভার নিক্ একি নিতান্তই অন্যায়! সংসার যে ওঁদের কি করে চলে তা' যদি জানতিস্! ওঁর মা বাপের বাড়ী থেকে পঞ্চাশ টাকা করে মাসহারা পান, তা'র অর্দ্ধেক যায় বাড়ী ভাড়া দিতে।"

সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কাহারও মুখ দিয়া একটি কথাও আজ আর বাহির হইল না। গাছের পাতা সান্ধ্য হাওয়ার মৃদু কম্পনে মর মর করিয়া উঠিতেছিল। মনে হইতে লাগিল বাঙ্গালীর ঘরের রিক্তা লক্ষ্মী কোন বিশ্বমায়ের চরণতলে মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

২

প্রায় দুই প্রহর রজনীতে চিরঞ্জীব আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। রান্নাঘরে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল, তাহা ব্যতীত সারা বাড়ীতে আলোকের একটি রেখাও চোখে পড়ে না। রান্নাঘরে চারু তখন মায়ের দুধটুকু জ্বাল দিয়া লইতেছিল, কেহ কোথায় নাই দেখিয়া চিরঞ্জীব গিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল, কহিল 'এই চারু আজ আলো জ্বালিস নি কেন রে' ?

চারু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল 'সরো বাবু, আর জ্বালাতন কোরো না।' কখন কোন পথে আনন্দ আসিয়া, মানুষের মনকে ভরাইয়া রাখে, সকল সময় তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীবের অন্তরখানিও বোধ করি আজ পুরাতন আনন্দে টল্‌টল্ করিতেছিল, বলিল 'আরে শোন্ না, আজকে স্পিচ্‌টা যা দিয়েছি জানিস্—'

এই সভাসমিতির সংবাদ-দান ও তাহার বক্তৃতার প্রসঙ্গ নিত্য হয় এবং তাহার বাক্যস্রোত থামাইবার একটা অমোঘ অস্ত্রও চারুর জানা ছিল কিন্তু আজ সে সে-পথ দিয়াও গেল না। দুইখানি ঘন বিশাল নেত্রপল্লব স্বামীর মুখের পানে তুলিয়া ধরিয়া বলিল 'তোমার

ছেলেরা বোকা, তাই তোমার কথা শোনে।' চিরঞ্জীব একটু বিস্মিত হইল—আজ এই তিন বৎসরের মধ্যে এমন স্বরও ত সে তাহার চিরপ্রফুল্ল চারুর কণ্ঠে শুনে নাই।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া চারু একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, কোমল কণ্ঠে বলিল 'ওপরে মা'র কাছে গিয়ে বসগে লক্ষ্মীটি, আমার হ'লে তোমায় ডাক্‌ব।'

কয়দিন ধরিয়া জননী ভবানীদেবীর বুকের কাছে কি একটা ব্যথা ধরিত। চারু একা সংসারের সমস্ত কাজ করিয়া উঠিতে পারিত না বলিয়া, পাড়ার একটি কৈবর্ত্তদের মেয়ে আসিয়া মাঝে মাঝে চারুকে সাহায্য করিয়া যাইত, চিরঞ্জীব আসিয়া যখন জননীর কক্ষে ঢুকিল ভবানী তখন ঘর অন্ধকার করিয়া শুইয়াছিল, পার্শ্বে সেই মেয়েটি বসিয়া।

ছেলে ভাবিল মা ঘুমাইয়াছে, মাতার বুকে মাথা রাখিয়া শিশুর মত ডাকিতে লগিল 'মা, মা, ওমা!'

ভবানী বলিল 'কি!'

চিরঞ্জীব চুপ করিয়া রহিল, তাহাদের সুখের সংসারে আজ একি হইয়াছে! তাহার চারু, হাসি ছাড়া যাহাকে কল্পনা করা যায় না, এই তাহার স্নেহময়ী জননী, সাত হইতে আজ এই তেইশ বৎসর পর্য্যন্ত দিবারাত্রির অনেকখানিই যাহার বক্ষে মাথা রাখিয়া কাটিয়া গিয়াছে—আজ তাহাদের সেই স্নেহতরল কণ্ঠ কোথায় গেল! কি এ দুর্দ্দৈব!

কিন্তু সংসারে নাকি নিতান্তই আশ্চর্য্য বলিয়া কিছু নাই, তাই এমন আঘাতটাও চিরঞ্জীব সহিয়া লইল, তেমনি তরলকণ্ঠে বলিল 'নিজেরা সব খেয়েদেয়ে শুলেন, আমার বুঝি খিদে পায় না!'

চিরঞ্জীব সংসারের সংবাদ রাখিত না, তাহা না হইলে এমন কথাটা তাহার মুখ হইতে বাহির হইত না। আজ প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভবানী এক বেলা আহার বর্জ্জন করিয়া উপবাসে কাটাইতেছে, চারু অনুযোগ করিলে অসুখের দোহাই দিয়াছে। পার্শ্বোপবিষ্ট মেয়েটি তাহা জানিত, তাই অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া বলিল 'এখান হইতে যাও দাদাবাবু, মায়ের আজ মন ভাল নেই।'

ভবানী নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল, সন্তানের উপর গভীর অভিমান আজ তাহার মুখ হইতে একটি কথা, একটি সান্ত্বনার বাণীও বাহির হইতে দিলনা। চিরঞ্জীব তাহার বুক হইতে মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিল, তাহার পর ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইয়া গেল।

সেই গাঢ় অন্ধকার কক্ষতলে সবার অগোচরে ভবানীর অশ্রু আজ বাধা মানিল না, 'ওরে, খোকা, তোর রাগ অভিমান কাহার উপর! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল নিজেকেই তুই এমনি করিয়া চিনিলি, আর তোর আশেপাশে তোরই সুখের জন্য যাহারা প্রাণপাত করিতেছে তাহাদের পানে একবার ফিরিয়াও চাহিলি না।'

দুধের বাটী লইয়া চারু ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে কাহারও মুখ দেখা যায় না, কিন্তু চারু বুঝিতে পারিল ভবানী কাঁদিতেছে। দুঃখিনী কন্যাকে জননী যেরূপ বুকে করিয়া রাখেন সেরূপ আগ্রহে চারু ভবানীর মাথাটা কোলে লইয়া বসিল, আপনার বস্ত্রাঞ্চলে তাহার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দিয়া বলিল 'আর কেঁদনা মা!' এতটুকু সান্ত্বনায় ভবানীর অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বাষ্পবারিরুদ্ধকণ্ঠে বলিল 'চারু মা আমার!' ভবানীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে চারু বলিল 'মা আমার!' তাহার পর চারিদিক নিস্তব্ধ। ছোট গলি, গাড়ি ঘোড়ার কলরব নাই, পথিকের পায়ে-চলার শব্দ থামিয়া গিয়াছে, এই জীর্ণ অট্টালিকার অন্ধকার কক্ষে, গাঢ়তর অন্ধকার বুকে করিয়া দুইটি নারী বসিয়া রহিল। এই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম কথা কহিল চারু, বলিল 'দুধটুকু খেয়ে ফেল মা'।

সহসা যেন কি একটা কথা মনে পড়ায় ভবানী উঠিয়া বসিল, বলিল 'খোকার খাওয়া হয়েছে চারু?'

চারু ধীরে ধীরে কহিল 'কোথায় বেরিয়ে গেলেন যে।'

ভবানী ব্যস্ত হইয়া কহিল 'বেরিয়ে গেল, এত রাত্রে না খেয়ে আবার বেরুল কোথায়?' বলিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

চারু কহিল 'ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা, আস্‌বেন এখন তিনি, এতই বা কি রাত হয়েছে?' জানালার ধারে চাঁদের ক্ষীণ আলোকে চারু দেখিল ভবানীর দুইচক্ষে অশ্রুর ধারা বহিতেছে।

রাত হইতে লাগিল, চারু সত্যই স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া বাহির হইয়া গেল। আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের পানে চাহিয়া ভবানী তেমনি করিয়া বাতায়ন পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। দশমীর চন্দ্রমা মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে। শুভ্র জ্যোৎস্না বড় ক্ষীণ বড় করুণ। যেন মনে হয় বিশ্বের এইটুকু দীপ্তি বুঝি এখনি নিভিয়া যাইবে। ভবানী ভাবিতে লাগিল 'কি অদ্ভুত এই বালিকা, আজ তিন বৎসর সে ইহাকে কাছে পাইয়াছে। আপন কন্যার মত ইহাকে বুকে তুলিয়া লইতে এতটুকু সঙ্কোচ হয় না, এতটুকু দ্বিধা হয় না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে ইহাকে এতটুকুও বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এত যে অভাব অনাটন, এত যে রাগ অভিমানের দ্বন্দ্ব কোলাহল—ইহার এককণাও কি ঐ হাস্যময়ী বালিকার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পায় না! কিন্তু আজ সে হাসি তাহার গেল কোথায়? হাতের টাকা কয়টি যখন ফুরাইয়া আসে তখন ঐ বালিকা নিঃশব্দে দিনের পর দিন উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিতেছে, কাহাকেও মুখ ফুটিয়া একটা কথা বলে না, অথচ তাহার জন্য বাটী ভরিয়া দুধ আসিল এবং আর এক অভ্যাগতের পথ চাহিয়া অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া লইয়া সে নিশি জাগিয়া বসিয়া আছে।' তাহার অন্তর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, 'ওগো কল্যাণী, ওরে আমার লক্ষ্মী, তোর হাসির সহিত আমার শ্বশুরবংশের হাসিও কি শেষ হইয়া গেল রে!'

সন্তানের উপর ধিক্কারে তাহার মাতৃহৃদয় ভরিয়া উঠিল, মানুষ এত স্বার্থান্বেষীও হয়! তোমার চক্ষুর উপর এক দুগ্ধপোষ্য বালিকা না খাইয়া শুকাইয়া উঠিল আর তাহার রক্তবিন্দু লইয়া তোমার বিলাসের অট্টালিকা উঠিতেছে!

বাতায়নের সম্মুখ হইতে কখন চন্দ্রমা সরিয়া গিয়াছে তাহা তাহার খেয়াল ছিল না, চারুর ডাকে চেতনা হইল। চারু বলিতেছে 'রাত দুপুর বেজে গেল এখনও শুলে না, দুধটুকুও পড়ে রইল!' ভবানী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিল, বলিল 'তোমার খাওয়া হয়েছে?' ঈষৎ লজ্জিত হইয়া চারু বলিল 'আমি—না, আমার তেমন ক্ষিদে নেই ত'।

ভবানীকে দুধটুকু খাওয়াইয়া, শয্যাগ্রহণের আদেশ দিয়া চারু বাহির হইয়া যাইতেছিল, ভবানী ডাকিল 'বউমা, শোন।'

চারু ফিরিল! ভবানী বলিল 'কাল্‌কের জন্য কি ব্যবস্থা করলে?'

চারু নিকটে সরিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "ও বাড়ীর সেজদি পাঁচটাকা ধার দেবেন বলেছেন।" কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চারু ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, সহসা ভবানী তাহার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখখানি আপনার বুকের নিকট টানিয়া আনিল। তাহার পর ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল 'খোকা যে আমার কি-তা ত জান, দেখো যেন তার কোন কষ্ট না হয়।' বলিয়াই যেন বড় লজ্জা পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল 'যাও বউমা, শোওগে।'

চারু চলিয়া গেল—কিন্তু বড় বিস্মিত হইল -ভবানীকে এমন চঞ্চল হইতে কেহ কখনও দেখে নাই।

পাড়ার সেই কৈবর্ত্তমেয়েটির নিকট কতকগুলি কথা শুনিয়া আজিকার ঘটনা চিরঞ্জীবের নিকট কিছুই নূতন বলিয়া মনে হইল না। প্রায় দুইমাস হইতে তাহার মাতা চাকুরী, চাকুরী করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—আজিকার এ ক্রোধ তাহারই সূত্র। রাত্রে চারু শুইতে আসিলে চিরঞ্জীব বলিল 'চাকরী কি আমার জন্যে কেউ বসিয়ে রেখেছে চারু, যে ইচ্ছে করলেই পাওয়া যাবে?'

চারু কথা কহিল না।

চিরঞ্জীব তাহাকে আপনার নিকটে টানিয়া লইয়া বলিল 'চারু রাগ করলে?'

চারু বলিল, 'না।'

গভীর রাত্রে কিসের শব্দে সহসা চিরঞ্জীবের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চারু তাহারই শয্যাপার্শ্বে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে! পত্নীর মস্তকে হাত রাখিয়া চিরঞ্জীব কহিল 'চারু কাঁদ্‌ছ?'

ধরা গলায় চারু বলিল "না।"

সমস্তদিনের কাজে-কর্ম্মে যে চিন্তাকে চারু ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল, এই গভীর নিশীথে, সুপ্ত চরাচরের নিদ্রিত প্রহরীকে অতিক্রম করিয়া সে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

ব্যথার, বেদনার নিঃশব্দ অশ্রু জল তাহার শয্যা প্লাবিত করিতে লাগিল। চিরঞ্জীব নিশ্চিন্তচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩

লোকে শান্তির জন্য মেঘ যাচনা করে, বৃষ্টি প্রার্থনা করে, কিন্তু বজ্র ও অগ্নি তাহার যে উপসর্গ আছে তাহা তাহারা স্বতঃই ভুলিয়া যায়। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিলে তাহার শূন্য স্থান সহজে পূর্ণ হইতে চাহে না। ইহাদেরও হইল তাহাই।

পরদিন অনেক বেলা করিয়া যখন চিরঞ্জীবের ঘুম ভাঙ্গিল, শয্যাপার্শ্বে সহসা দৃষ্টি পড়িয়া কি এক তিক্ততায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। চারুর ক্রন্দন, কঠিন কণ্ঠস্বর, জননীর অভিমান, পরিচারিকার বার্ত্তা—কাল অন্ধকারে যাহাকে রহস্যময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল আজ দীপ্ত দিবালোকে তাহা বড় স্পষ্ট, বড় কঠোর বলিয়া মনে হইল। ইহারা সকলে মিলিয়া কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছে তাহাকে দাসত্ব না করিলে চলিবে না? যাহা সে কখনো করিবে না বলিয়া স্থির করিয়াছে, যাহা সে নিজে ঘৃণা করে ও অপরকে ঘৃণা করিতে শিখায়, কোন্ মুখে সে তাহারই জন্য ছুটিবে? কেমন করিয়া সবার সম্মুখে গিয়া সে বলিবে 'ওগো, আজ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সব ভুল, সব মিথ্যা? সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক চাকুরী তোমাদের করিতেই হইবে, তাহা না হইলে তোমার মা রাগ করিবেন, স্ত্রী কাঁদিবে, প্রতিবেশী গালি দিবে।' তাহার শিক্ষাভিমানী অন্তর ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনের আশা-উৎসাহ যখন একটু একটু করিয়া বিকসিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহাকে ছিড়িয়া খুঁড়িয়া ধূলায় লুটাইয়া ইহাদের কি লাভ হইবে?

কাল সন্ধ্যায় যাহা ধূম্র হইয়া দেখা দিয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তাহার অগ্নি প্রকাশ পাইল কিন্তু তাহা বড় দুঃখে ও বড় অসময়ে। অপমানে অভিমানে ভবানীর অন্তর প্রস্তর-কঠিন হইয়া উঠিল। যে কখন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহে নাই, সে আজ বড় গলা করিয়া বলিয়া গেল 'চাকুরী সে করিবে না; সংসার যেমন চলিতেছে চলুক!'

ভবানী ভাবিল একবার ইহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিলেই ইহারা বুঝিবে, সংসার চলে কেমন করিয়া। ভবানী স্থির করিল আজই পিতৃগৃহে চলিয়া যাইবে—তাহার পর ইহাদের কি হয় সে দেখিতেও আসিবে না।

চারু আসিয়া বলিল 'মা, আজ মাসের দুদিন হয়ে গেল, মাসকাবারী বাজারগুলো আনতে দেবে না?'

ভবানী নির্লিপ্তভাবে বলিল 'সে তোমরা যা পার করগে বাছা, আমি আর তোমাদের কোন কথায় নেই।'

সংসারে অনেক দুঃখ পাইয়াও ভবানীর উপর চারুর অনেক আস্থা ছিল, তাই নিঃশঙ্ক-চিত্তে বলিতে গেল "টাকাটা—"

সহসা তপ্ত হইয়া উঠিয়া ভবানী বলিল 'বউমা, টাকা কটা বাবা আমায় দেন, সে কি তোমাদের পেট ভরবার জন্যে ?' বলিয়াই আপনার বাক্স গুছাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

মানবজীবনে আশা বড় সহজ জিনিষ নহে। মানুষের চারিপার্শ্ব হইতে একে একে যখন সব খসিয়া পড়ে তখন এই আশাই থাকে একমাত্র ভাগ্য নক্ষত্রের মত। আজ আশাভঙ্গ হইয়া চারুর চক্ষে বিশ্বসংসার শূন্য মনে হইল। দৃঢ়পদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—তাহার পর সহসা কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকাঠের পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল।

যাইবার উদ্যোগ সারা হইলে ভবানী চারুর খোঁজ করিল। এতটুকু মেয়ে—না জানি কত দুঃখই উহার কপালে লেখা আছে ? সন্ধ্যা হইবার তখনও কিছু বিলম্ব ছিল, অনেক খুঁজিয়া ভবানী রন্ধনগৃহের এক কোণে চারুকে আবিষ্কার করিল। চিরঞ্জীব বাড়ী ছিল না।

চারু জানালার ধারে বসিয়াছিল। ভবানী আসিয়া বলিল, 'চারু আমি বরানগরে যাচ্ছি।' ভবানীর সাড়া পাইয়া চারু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই প্রায়ান্ধকারেও ভবানী চারুর মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইল। চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখখানাও অসম্ভব রকম লাল। সে ভাবিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ইহার জ্বর হইয়া পড়িল নাকি ! কিন্তু কথাটা জিহ্বাগ্রে আসিলেও সে দমন করিয়া লইল।

ভবানী বলিল, 'তোমার কিছু বলবার আছে ?' চারু বুদ্ধিমতী, সে কথা কহিল না।

ভবানী চঞ্চল হইয়া একটু কোমল কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল 'সেদিন যে পাঁচটা টাকা ধার করলে, তা শোধ দেবে কিসে শুনি।'

চারু মুখ নীচু করিয়া নোক খুঁটিতে লাগিল।

ভবানী কহিল 'কথা কচ্ছনা যে ?'

চারু একটু মুখ তুলিয়া বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল 'আমার এই চুড়ী ক'গাছি থাকতে আমার স্বামীকে—'

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কি জানি কেন থামিয়া গেল।

ভবানী কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল, কি ভাবিয়া বলিল 'বেশ।' দ্বারপ্রান্তে গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, ভবানী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, সহসা তাহার চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিল, মনে মনে বলিল 'চারু, মা, আমার খোকাকে আমি ছাড়তে পারলুম, তুই ছাড়িস্ নেরে ! তুই আমার লক্ষ্মী, আমার সর্ব্বস্ব।'

গভীর রাতে চিরঞ্জীব ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'খবর শুনেছিস চারু, কাল আমি একজন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাব। চাকরী একটা পেতে পারি। মা কোথায় রে ?' বলিয়া জননীর গৃহের দিকে যাইতেছিল, চারু বলিল 'মা বরানগরে গেছেন।'

[illegible] সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মাতৃশিক্ষা

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েদের জন্য

ইহাতে গর্ভাবস্থায় ও সূতিকাগৃহে মাতার এবং বাল্যাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ৩২৯ পৃষ্ঠা ব্যাপী উপদেশ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাণী অফিস

[illegible] রোড, ভবানীপুর

চিরঞ্জীব যেন চম্‌কাইয়া উঠিল—'বরানগরে, কেন, হঠাৎ---?'

চারু কথা কহিল না।

আরও কাছে আগাইয়া আসিয়া চঞ্চল, ব্যগ্রকণ্ঠে চিরঞ্জীব কহিল 'চারু, মা কি রাগ করে গেছেন?'

চারু নিম্নকণ্ঠে বলিল 'জানিনে।'

চিরঞ্জীব আর কথা না কহিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার অন্তর থাকিয়া থাকিয়া বিদ্রোহ করিয়া উঠিতেছিল 'এতটুকু দেরী সহিল না! তবে কাহার জন্য সে চাকরী করিতে যাইবে?'

সারারাত সে ঘুমাইল না।

পরদিন প্রভাতে চিরঞ্জীব বলিল 'চারু, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আর যাবনা, কি বল?'

বিস্মিত হইয়া চারু বলিল 'কেন?'

নির্লিপ্তকণ্ঠে চিরঞ্জীব উত্তর দিল 'চাকরী করে আর কি হবে?'

অস্ফুট শুষ্ক কণ্ঠে চারু বলিল 'সংসার চল্‌বে কি করে?'

চিরঞ্জীব ভাবিল 'তাইত, মা চলিয়া গিয়াছেন, এ ভার সে এখন তাহারই।'

দ্বিপ্রহরের—তীব্র রৌদ্র কলিকাতা সহরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু অফিস মহলের ভিড় বড় কমে নাই। শ্রান্ত পা দুইখানি টানিয়া লইয়া চিরঞ্জীব পথিপার্শ্বে এক উদ্যানে আশ্রয় লাভ করিল। একদিন আশাভঙ্গ হইয়া চারুর চক্ষে সংসার শূন্য ঠেকিয়াছিল, আজ আশাভঙ্গ হইয়া চিরঞ্জীবের মনে হইল সংসারটা এত পূর্ণ না হইলেও চলিত! সাহেবের কথাগুলা তাহার কানের কাছে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিতে লাগিল---সে বলিয়াছে 'বাবু, তোমাদের মরাই ভাল, লেখাপড়া শিখে এই কটা টাকার চাক্‌রির জন্য এত আগ্রহ!' আগ্রহ! তুমি কি জানিবে সাহেব, আমরা বাঙ্গালী, চাকরি করিতে না পারিলে জননী সন্তান ত্যাগ করে, স্ত্রী ঘৃণা করে। মনে মনে বলিল "মরা উচিত কি, মরিতে ত বসিয়াছি। ধার করিয়া চারু কয়দিন অকর্ম্মণ্য স্বামীকে খাওয়াইবে? তাহার পর উপবাস, তাহাই বা কতদিন!" চিরঞ্জীবের নিকট সহসা জীবনের বাকী দিনগুলি গণনার মধ্যে আসিয়া গেল।

আফিসগুলার ছুটী হইয়া গেল। পথে জনস্রোতের আর অন্ত নাই। চিরঞ্জীব ভাবিল সেও বাড়ী ফিরিয়া যায়, কিন্তু উঠিতে ইচ্ছা করিল না। শত সহস্র জীর্ণ বুভুক্ষু বাঙ্গালা হাসিমুখে বাড়ী ফিরিয়া চলিল, শুধু একজন সুস্থ সবলদেহ লইয়া তাহাদের সহিত চলিতে পারিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার যাহার প্রবেশ পথে স্বর্ণাস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে আজ এই কর্ম্মকেন্দ্রের কুঞ্জদ্বার তাহার গতিরোধ করিল।

সংবাদ শুনিয়া চারু দুঃখে হতাশায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। চিরঞ্জীব তাহা বুঝিল। তাহার পর সে চাকুরীর সন্ধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। সত্যই ত! স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যাহার

দুই বেলার দুই গ্রাস অন্ন যুটিতেছে, স্ত্রীর নিকট হইতে সমবেদনা সে আশা করে কি করিয়া? সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল।

এমনি করিয়া একমাস কাটিয়া গেল। চারুর হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু স্বামীর চাকুরীর কোন আশা আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। প্রত্যহ স্বামী বাহির হইয়া গেলে কল্পনার জাল বুনিয়া বুনিয়া সে সারা দ্বিপ্রহর কাটাইয়া দেয়, বৈকালে জানালার ধারে আসিয়া বসে—আজ বুঝি শুভসংবাদ আসিবে! কিন্তু গলির মোড়ে স্বামীর শুষ্ক মুখখানি দেখিয়াই সে উঠিয়া আসিত। বুঝিত আজও কিছু হয় নাই।

৪

সেদিন দ্বিপ্রহর। চারু হাতের শেষ পয়সা কয়টি খরচ করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিল। ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়া চারু সেখানেই লুটাইয়া পড়িল, মনে মনে বলিল 'ভগবান এইবার আমায় টানিয়া লও, আমার মা গিয়াছেন, আজ শেষ পয়সাকয়টি গেল, প্রাণ থাকিতে স্বামীর উপবাস দেখিতে পারিব না।' সে মাথা কুটিয়া বলিল 'এই বয়সেই আমার সংসারের সকল আশা ফুরাইয়াছে প্রভু, আর আমার দাবী করিবার কিছু নাই।'

শ্রান্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চিরঞ্জীব যখন বাড়ী ফিরিল তখন দেখিল চারু ঘরে শুইয়া আছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, 'চারু, আজ একটা চাকরী পেতে পারি, শুনেছ।' চারু নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। চিরঞ্জীবের আশা-উৎফুল্ল মুখখানি, পরিশ্রমের ক্লান্তি যাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই, মুহূর্ত্তে দীপ্তিহীন হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, 'আমাকে আবার এখনি বেরুতে হবে।' মিনিট দশেক পরে স্নান করিয়া ঘরে আসিয়াই তাহার গা জ্বলিয়া গেল! চারু উঠিল না, কথা কহিল না, কিসের অভিমান তাহা বলিল না, চাকুরীর সংবাদ দিল আনন্দ প্রকাশ করিল না, তবে কাহার মনস্তুষ্টির জন্য সে এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়! চিরসহিষ্ণু চিরঞ্জীবের আজ রাগ হইল, বলিল 'খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছ, লজ্জা করে না!' অথচ সেই কতদিন চারুকে তাহার জন্য বসিয়া না-থাকিতে অনুরোধ করিয়াছে। চারুর ঠোঁট দুইখানি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ধীরকণ্ঠে বলিল 'রান্না ঘরে ভাত ঢাকা আছে।' চিরঞ্জীব তেমনি কণ্ঠে তীব্রস্বরে বলিল 'কেন, মহারাণীর কি আজ গা—' কিন্তু বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। চারু উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার চোখ দুইটা দিয়া যেন আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।

চিরঞ্জীব দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিল না, ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যখন সে সেই দ্বিপ্রহরে পথের বাহির হইল তখন তাহার মনে হইল তাহার অন্তরের সব কিছু মাতাল হইয়া পড়িয়াছে। সকলে মিলিয়া একি উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহার

একবার মনে হইল যাইবে না ; কাহার জন্য সে কুড়ি টাকা বেতনের চাকুরী করিতে যাইবে ? আবার মনে হইল সংসার—

শ্রান্ত বুভুক্ষু যুবক নগ্নপদে সেই অগ্ন্যুত্তপ্ত পথে বাহির হইয়া পড়িল।

তখন বোধ করি সন্ধ্যা কয়েক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে চিরঞ্জীব ফিরিয়া আসিল। সম্মুখে গৃহের দ্বার মুক্ত, কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই অন্তরে গভীর অন্ধকার। চিরঞ্জীবের অন্তরেও আজ বড় জ্বালা ধরিয়াছিল। ঐ সামান্য বেতন, নগণ্য পদ তাহাও তাহার ভাগ্যে যুটিল না। সে আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—এই অকর্ম্মণ্য নিষ্ফল জীবন—নিজ হস্তে আজ সে ইহার সাঙ্গ করিবে। আজ তাহার একথা মনে হইল না আত্মহত্যা পাপ, অনন্ত নরকভোগের পন্থা।

চিরঞ্জীব ছাদে উঠিয়া আসিয়াছিল। জ্যোৎস্নার মৃদু আলোকপাতে বোধ করি তাহার উত্তপ্ত মস্তিস্ক কিছু শীতল হইল। তখন তাহার চারুর কথা মনে পড়িল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অনির্দ্দিষ্ট গভীর অভিমান জমা হইয়া রহিল। শিক্ষা, সংসার, জীবন, সকলের উপর কঠিন ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া রহিল।

কে এক ব্যক্তি অন্ধকারে সোপান বহিয়া আসিয়া তাহাকে একখানি পত্র দিয়া তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। চিরঞ্জীব একবার ভাবিল পরিচয় লয়, কিন্তু কিছু বলিল না। জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোকে পত্রখানি মেলিয়া ধরিল, অতি কষ্টে বুঝিল তাহা গৃহস্বামীর পত্র, দুই মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী। চিরঞ্জীবের হাসি পাইল, লিখিয়াছে আর একদিন অপেক্ষা করিতে পারে—একদিন নয় চিরজন্ম তোমায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। তাহার অন্তর হইতে কে যেন বলিল 'এ ফাঁকি, এ ভাল নয় ভাল নয়।' চিরঞ্জীব আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল ভাল নয়—ফাঁকি—এ কথা সেও জানে, কিন্তু বিশ্বসংসার যে তাহাকে ফাঁকি দিল তখন ত কেহ কিছু বলিতে আসিল না। ইহার কৈফিয়ৎ যদি কোন দিন দিতেই হয় তাহা হইলে তাহার ভাগ্য-নিয়ন্তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যাহা বলিবার বলিবে। আঘাত পাইয়া আজ সে মানুষকে ঘৃণা করিতে শিখিল।

আজ সারাদিন সে জলস্পর্শ করে নাই। সারা দেহ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। ছাদ হইতে নামিয়া আসিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আপনার কক্ষে গেল না, ভবানীর শূন্য ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিল। তাহার পর আপনার কক্ষ হইতে সব টানিয়া আনিয়া ভবানীর গৃহে শয্যা রচনা করিল। টেবিলের উপর চারুর হাতের লতাপাতা আঁকা আস্তরণ ছিল, তাহা আনিয়া শয্যায় বিছাইল। ঘরের সকল বাতায়ন খুলিয়া দিল। বাহিরের ম্লান জ্যোৎস্না ক্ষুদ্র শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। সে আলোক নিভাইয়া দিল।

শয্যাগ্রহণ করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, চারু গেল কোথায় ? আজ এই জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সংসারে কাহারও উপর রাগ বা অভিমান করিবে না স্থির করিয়াছিল, তাই ভাবিল

চারু গেল কোথায়। কিন্তু তাহার হাত পা কেমন অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল, এ কথা বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিল না। একবার সে মনে মনে হাসিল কাল যখন মা আসিয়া দেখিবে—সহসা তাহার মনে হইল তাহার কানের কাছে ঘড় ঘড় করিয়া কিসের শব্দ হইল। তাহার পর ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনিতে পাইল—তাহার মনে হইল যমদূত আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অকস্মাৎ তাহার পা দুইটা কে বাঁধিয়া দিল, তাহার পর তাহার মনে হইল যেন বিরাট অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে; সে প্রাণপণে ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, পারিল না।

ভবানী চিরঞ্জীবের শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন, দুইবাহু বক্ষের উপর আবদ্ধ, তাহার চোখ দুইটা কাচের মত চক্‌চক্ করিতেছে কিন্তু দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীব্র। পদতলে চারু মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া আছে। কাহারা দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিল আবার তেমনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

* * * *

চিরঞ্জীব বিষ পান করিয়াছে। রোগীর অবস্থা ঠিক বোঝা যায় না, জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। আসিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই তাহাতে কিছু আশা হয়।

ভবানী আসিয়া চারুর মাথায় হাত রাখিল, বলিল 'চারু, কাঁদিস্‌নে, ওঠ।'

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রেম ও দয়া

দেবতার নন্দন, স্পন্দিত বাতাসে;
মর্ম্মরে প্রেমতরু, কি করুণ গাথা সে!
কৈ, ভালবাসা কৈ, দয়া আর কৃপাতে
নিশ্বাস ভেসে আসে উল্লাস নিবাতে।
ঝরে মন্দার, আর ক্ষরে হরিচন্দন;
বন্দনা গানে জাগে ইন্দ্রের ক্রন্দন।
গাল-ভরা হাসি কৈ, তালভোলা নৃত্য?
প্রাণ-ধরা টান কৈ, দিশাহারা চিত্ত?
জন্মিল দয়া কবে দেবতার অঙ্গে,—
প্রকৃতির নন্দনে প্রেমলীলা ভঙ্গে?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

জৈন বৌদ্ধ ও ভারতের জাতিরহস্য

হিন্দু-আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ভাবসংস্কার এরূপ বিকৃত ও কলুষিত হইয়াছে যে, আমরা এখন বৌদ্ধ জৈন উভয়কেই বিধর্ম্মী ঘৃণিত জাতি বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। যদি বা জৈনধর্ম্মীর পার আছে, কিন্তু বৌদ্ধের প্রতি ভারতের অনেক হিন্দু বিজাতীয় দ্বেষ হিংসা পোষণ করেন। ইহার কারণ কি তাহার সত্য তথ্য নিরূপণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

জৈন বৌদ্ধ কি সমধর্ম্মী? প্রথমেই এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়। বৌদ্ধগণ ভগবান বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। তাঁদের বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি—এই তিনটী সত্যবাচন করিয়া সম্প্রদায় মধ্যে প্রবেশ করিতে হয় এবং সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি—এই আট আর্য্য সত্য পালন করিয়া নিজ চরিত্র নির্ম্মল করিতে হয়। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম্মে আর্য্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন। শুনা যায় বুদ্ধদেবের ব্রাহ্মণ শিষ্য কাশ্যপ ত্রিপিটকের অভিধর্ম্ম সঙ্কলিত করেন, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই আনন্দ সূত্র পিটক সঙ্কলিত করেন, আর তাঁর ভৃত্য উপালি বিনয়পিটক সংগ্রহ করেন। এ সকলই ভগবান বুদ্ধদেবের মুখনিঃসৃত বাণী। তাহাই ইঁহারা তাঁর জীবদ্দশায় লিখিয়া রাখিয়া তাঁর মৃত্যুর ৬ মাস পরে অজাতশত্রুর রাজ্যকালে রাজগৃহে যে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘের অধিবেশন হয় তাহাতে বৌদ্ধগণ সমীপে প্রচার করেন। তাহাই বৌদ্ধ-সমাজে ত্রিপিটক বলিয়া প্রচলিত।

জৈন ধর্ম্ম কি এইরূপ না উহার ধর্ম্মনিয়মাবলী এত প্রাচীন? বোধ হয় না। অথচ জৈনগণ বলেন জৈনতীর্থঙ্করগণের শেষ বর্দ্ধমান বা মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসময়ের মুনি—তিনি জৈন ধর্ম্ম প্রচার করেন। তারপর তাঁরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বুদ্ধদেব তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন!!! বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মপ্রধান ধর্ম্ম।—বুদ্ধদেব ঈশ্বর বা ঈশ্বরভক্তির কোন কথাই তাঁর উপদেশে বলেন নাই—মানুষকে কর্ম্মের সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতি লাভের পথ নির্দ্দেশিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে উপদেশ কালে কর্ম্মের অপরিহার্য্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতার কথা প্রখ্যাপিত করিয়া গিয়াছেন এবং জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধনে যত্নপর হইয়াছেন। দ্বাপর যুগের ভগবান ব্যাসদেব, ভীষ্মদেব, শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্ত ছিলেন। এঁদের পূর্ব্বে আদিবিদ্বান ভগবান কপিল সাংখ্যজ্ঞান প্রচার করেন ও হিরণ্যগর্ভ যোগকর্ম্মের প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। কপিলদেব জ্ঞানের উপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না—গোব্রাহ্মণকে যজ্ঞে বলি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নারায়ণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া বিপক্ষের প্রতিকূলতার নিমিত্ত কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া

পড়েন এবং ভারতময় গোব্রাহ্মণের হিতকারী রূপ নারায়ণের অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হন।

জৈনতীর্থঙ্করগণ প্রচারধর্ম্মে আপনাদের ব্রতী করেন নাই—তাঁরা নিজ নিজ মোক্ষ সাধনার চেষ্টাই করিয়াছিলেন—সাধারণের উপকারের কোন চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন নাই, অপিচ তাঁরা নিজে নগ্নবেশে নির্জ্জন স্থানে পর্ব্বত গুহায় সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন—লোকালয়ে আসিতেন না—গৃহস্থগণই সাধুদর্শন-মানসে তাঁদের দ্বারস্থ হইয়া তাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাই কালক্রমে "জিনপূজক বা ভক্ত" "জৈন"-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে—উহা হিন্দু বৌদ্ধ মতের মিশ্রণ মাত্র বলিয়া বোধ হয়। ভগবান বুদ্ধদেবের সময় তীর্থঙ্করগণ "নিগণ্ঠ" বা নির্গ্রন্থ বা বস্ত্রহীন বা সংসারবন্ধনহীন বলিয়া কথিত হইতেন। বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোশলের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথনে সেকথা ব্যক্ত হইয়াছে।—গোশল "নিগণ্ঠ এভাতিপুত্ত" বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

কণিষ্ক ও অশ্বঘোষের সময় বৌদ্ধগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়—মহাযান সম্প্রদায় ও হীন-যান সম্প্রদায়। যাহারা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া সংসারবিরাগী হইয়া প্রব্রজ্যার দ্বারা নিজ চিত্ত নির্ম্মল করিয়াছিলেন তাঁহারাই মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত হন। কণিষ্ক অশ্বঘোষ তাঁহাদের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন! আর যাঁরা গৃহস্থ, বিষয় ভোগে আসক্ত, তাঁহারা হীনযান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হন। পারিযাত্র অধিপতি নাগার্জ্জুন তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। এ নাগার্জ্জুনের সহিত মগধবাসী মাধ্যমিক নামক বৌদ্ধ যোগাঙ্গ প্রবর্ত্তক বোধিসত্ত্ব মগধবাসী নাগার্জ্জুনের কোন সম্বন্ধ নাই। ইনি বুদ্ধ নির্ব্বাণের ১৫০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন, আর এ নাগার্জ্জুন কণিষ্কের রাজ্যশেষে অথবা বুদ্ধ নির্ব্বাণের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভারতে এক নামে অনেক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সকলকে এক ও অভিন্ন ভাবা ঠিক নয়। একের সহিত অন্যের গোলযোগ বাধাইলে একদিকে যেমন সত্যের যথার্থ তথ্য নিরূপণের কোন আশা করা যাইতে পারে না, তেমনি অন্য দিকে পরস্পর বিরুদ্ধভাব একের মস্তকে চাপাইয়া দিয়া সত্যকে অন্য প্রকারে প্রতিহত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি নাম দিতেছি। প্রাচীন ভারতে শৌনক নামে অনেক মুনি লেখক প্রাদুর্ভূত হন। ভগবান পাণিনির মতে একজন শৌনক ঋগ্বেদের দুই এক সূক্তের প্রণেতা আর একজন প্রাচীন কল্প বা ধর্ম্মবিধির রচয়িতা, তৃতীয় ব্যক্তি প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বা ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার লেখক। মহাভারতে দেখা যায় ভৃগুবংশীয় মহাশাল শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক সত্রে একত্রিত ঋষিসংঘ দ্বারা মহাভারতের প্রতিসংস্কার হয়। আবার চরণব্যূহ ও প্রাতিশাখ্য প্রণেতাও একজন শৌনক আছেন। এই পাঁচ শৌনককে যদি এক ও অভিন্ন স্বীকার করা যায়, তা হ'লে সত্যের তো কোন কুলকিনারা হুইলই না, অগত্যা একজনকেই পরস্পর বিরুদ্ধমতের প্রচারক বলিয়া মানিয়া লইতে হয়—তাহা

যে সর্ব্বকালেই ও সর্ব্বস্থলেই অসম্ভব ও অসমীচীন তাহা এক অজ্ঞ বালকও বুঝিতে পারে। এই নিমিত্ত সকল সময়েই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া অগ্রপশ্চাৎ তুলনা করিয়া সত্যের নিশ্চয় করা সর্ব্বপ্রকারে বিধেয়। ইহাতে একদিকে যেমন ধর্ম্মসাধন হয় তেমনি অন্যদিকে চিত্তবৃত্তিরও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণ এই সত্য সাধনার নিমিত্তই ভারতীয়গণের নিকট পূজ্য দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

এইরূপে অন্য নামেরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন গোতম, ভরদ্বাজ, ভৃগু, বৃহস্পতি, ব্যাস ইত্যাদি।

ঋষিগণ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তাঁরা প্রবঞ্চনা করা মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁদের রচনায় প্রবঞ্চনার কোন কথা আদৌ নাই—ঋগ্বেদ যাহার প্রাচীনতাজ্ঞাপক গাছ-পাথরের অস্তিত্বমাত্র নাই তাহা ঋষিগণের দৃষ্ট সত্য ঘটনার লিপি—তাঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধর ঋষিগণ তাহারই জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিমূলক বিভিন্ন বিভিন্নরূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারত এই অনাবিল সুখ বহুকাল যাবৎ উপভোগ করিয়াছে—কেন সে সুখৈশ্বর্য্যের অবসান হইল তাহা ঈশ্বর জানেন, তবে পরাধীনতায় সাধারণের শিক্ষাদীক্ষার যে বিকার ঘটে, তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণামই যে উহার কারণ তাহা আভাসে বেশ বোধ হয়।

ভারতের সংকটকাল অনেক বার উপস্থিত হইয়াছে সে সময়ে ভারত নিজ সনাতন শিক্ষা-দীক্ষাকেই দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাখিয়া সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু কণিষ্কের পরে ভারতের যে সঙ্কটকাল উপস্থিত হয় তাহার পরিণামেই ভারতের সুখ ঐশ্বর্য্য-মহিমা গরিমা বলবীর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়া গেল। এই সময়েই ছদ্ম ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের পূজ্যশাস্ত্র, কাব্য, ইতিহাস, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে অনুদার ও প্রবঞ্চনামূলক মিথ্যাভাব অনুপ্রবেশিত করিয়া দেন। পারিযাত্র-অধিপতি নাগার্জুনই প্রথমে শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া কন্দুক ক্রীড়া আরম্ভ করেন।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ ছিল। তার প্রথমকার চিকিৎসা যাহার মূলগ্রন্থ চরক দ্বিতীয় শল্য চিকিৎসা যার মূলগ্রন্থ সুশ্রুত। এইরূপ কুমার ভৃত্য অগদ প্রভৃতি অন্য ছয়টী আছে। দ্বিতীয় শল্যচিকিৎসার প্রবর্ত্তক কাশীপতি দিবদাস ধন্বন্তরি। তিনি শবব্যবচ্ছেদ করিয়া মনুষ্য-শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিরা অস্থি প্রভৃতির সত্যস্বরূপ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন—তিনিই অস্ত্র প্রয়োগ ও ক্ষার দ্বারা মনুষ্যের রোগ উপশমের ব্যবস্থা করিয়া যান। ধন্বন্তরি নিজ প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর শিষ্যগণকে উপদেশ দেন। তাঁর শ্রেষ্ঠশিষ্য বিশ্বামিত্রপুত্র সুশ্রুত তাহাই সুন্দর ললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই ধন্বন্তরি বা তাঁর পুত্র প্রতর্দ্দণ বা প্রবহণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং যুদ্ধ সময়ে পাণ্ডবগণের সহায়তা করেন ও যুদ্ধপ্রাঙ্গণে প্রাণবিসর্জ্জন দেন। নাগার্জুন সুশ্রুতের সেই সুন্দর ছন্দের বিপর্য্যয় করিয়া দিয়া, তৎস্থলে নীরস গদ্য স্থাপন ও

মধ্যে মধ্যে নিজ সঙ্কীর্ণমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁর প্রথম প্রবঞ্চনার নিদর্শন আয়ুর্বেদকে অথর্ব্ববেদের উপবেদ বলা।—শৌনকের চরণব্যূহে উহা কিন্তু ঋগ্বেদের উপবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবঞ্চনা ব্রহ্ম লোকে আয়ুর্ব্বেদ এক সহস্র অধ্যায়ে রচিত হয়, অথর্ব্ব তাহা একশত অধ্যায়ে সংক্ষেপ করেন। এগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে গ্রন্থের লিখন ধরার ব্রহ্মকৃত প্রণালী প্রথম অনুসৃত হয়। তাহাই সুশ্রুতে নাগার্জ্জুন অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাভারতে দেখা যায় ব্রহ্মলোকে দেবগণ ষাট লক্ষ শ্লোকের গ্রন্থ ও গন্ধর্ব্বগণ দশ লক্ষ শ্লোকযুক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতেন! উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া মর্ত্তবাসীর জন্য এক লক্ষ শ্লোকাত্মকরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহা যে মিথ্যা কথা ও নগ্ন প্রবঞ্চনা তাহা যে কোন পাঠক মিলাইয়া লইতে পারেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর কৃষ্ণচরিত্রে উহা দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে সংস্কৃতের আঁচড় মাত্রকেই যাঁরা ঋষিরচনা বলিয়া সম্মান ও বিশ্বাস করিতে চান তাঁদের নিকট কোন সত্য প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা ও পণ্ডশ্রম। গীতায় নারায়ণের বচন স্মরণ করিয়া তাঁদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করা উচিত,—যে মূঢ়গণ অজ্ঞান কর্ম্মে বা প্রকৃতির গুণমোহে মুহ্যমান হইয়া নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমানে দৃপ্ত হয় কৃৎস্নবিৎ পণ্ডিত তাদের সে বুদ্ধিমূঢ়তা সুখস্বপ্ন বা মোহজাল ছিন্ন করিতে চেষ্টা যেন না করেন।*

এই নাগার্জুনের অনেক সমধর্মী পারিষদ ছিল—তাঁদের নাম বাদরায়ণ জৈমিনি ভৃগু গৌতম ভরদ্বাজ কুশীতক প্রভৃতি। ইঁহারা শাস্ত্র কলুষব্যাপারে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ, ভগবদ্গীতার শেষ তিন অধ্যায় রচনা করেন আর চরক সংহিতারও প্রতিসংস্কার করেন; মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের শেষ দুই তিন অধ্যায় অধিকসম্ভব তাঁরই রচনা। এ সকল স্থলেই পূর্ব্বতন ঋষিগণের কথার বিরোধোক্তি আছে। জৈমিনি† ধর্ম বা পূর্ব্ব মীমাংসা, সংহিতোপনি

---

* প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়া সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ॥ ভগ ৩.২৯
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাং।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ঐ ৩.২৬

† মহাভারতে লিখিত আছে জৈমিনি সামবেদ প্রচার করেন। বিষ্ণু পুরাণে বেদ প্রচারের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ও সকলগুলিই মিথ্যা। তন্ত্র বার্ত্তিক বা কুমারিল ভট্টের ধর্ম মীমাংসা বার্ত্তিকে লিখিত আছে যে সামবিধান বংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে ৮টী সামবেদের ব্রাহ্মণ আছে তাতে কোথাও নিয়তস্বর অর্থাৎ সুর সহায়তায় গেয় পদ নাই, অথচ সামবেদ যে গীত, তাহা ঋষিগণ ত জানতেনই ভাষ্যকার শবর স্বামীও তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সামবেদের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি যে নিতান্ত প্রবঞ্চনা মূলক গ্রন্থ তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই। গীতায় ভগবান বেদের মধ্যে সামকে নিজ বিভূতি বলিয়াছেন অর্থাৎ সামবেদই সর্ব্ববেদ অপেক্ষা প্রাচীন এই ভাবগ্রহণ করিয়া বিদেশীয় উপনিবেশকগণের এই বংশধরগণ আপনাদের সামবেদী বলিতে আরম্ভ করেন। অর্থাৎ তাঁহারা আর্য্যগণ অপেক্ষাও প্রাচীন।

ষৎ বা কেনোপনিষৎ ও মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন। ধর্ম মীমাংসায় কল্পসূত্রের বিরোধোক্তি আছে তাই ভাষ্যকার শবর স্বামী স্তম্ভিত হইয়া যান। কেনোপনিষদে ইহুদী জিহোবার যক্ষরূপে প্রশংসা আছে এবং আর্য্য উপনিষদের ব্রহ্মের অখ্যাতি আছে। অশ্বমেধ পর্ব্বে অনুগীতা-কথনে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই স্মৃতিশক্তিহীন মুর্খ বলা হইয়াছে !! ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাবলেই জৈমিনি ম্লেচ্ছ বলিয়া ধৃত হন; শাস্ত্রকলুষ করায় তাঁর হস্তিপদ দলনে প্রাণদণ্ড হয়। কুশীতক কৌশীতকী উপনিষৎ ও মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাত গীতা রচনা করেন। উপনিষদে ইন্দ্র প্রবহণ সংবাদে ইন্দ্রের যতিহত্যা; কালখঞ্জগণের নিধন, যুবতীর ভ্রূণনাশ, ও পিতামাতার হত্যার আত্মশ্লাঘা আছে, আর গীতায় শূদ্রের প্রতি দ্বেষ, অথর্ব্ববেদ হইতে সকল বেদের উৎপত্তি হীনোমনীষী বা হীনযান সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তির প্রশংসা আছে। গৌতম সূত্রধর্ম শাস্ত্র রচনা করেন। মনুস্মৃতির "উতথ্যতনয়স্য"চ ইঁহারই প্রতি ইঙ্গিত—উহা তাঁরই সহযোগী ভৃগু কর্ত্তৃক মনুস্মৃতিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। ভৃগু প্রাচীন মনুস্মৃতির মধ্যে মধ্যে অনুদার বিরুদ্ধভাবাপন্ন মতের রচয়িতা ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীর রচয়িতা। ইহাতে ভৃগু বরুণপুত্র বলিয়া কথিত হইয়াছেন। উপনিষদে ব্রহ্মবল্লী থাকিতে বিরোধোক্তি ছাড়া ইহার রচনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

ভরদ্বাজ পিপ্পলাদ বৃহস্পতি ঐতরেয় মহিদাস নামে পরিচিত হন। ইনি স্বয়ং সচ্চরিত্র বিনয়ী বিদ্বান ছিলেন। ইনি পারসীকবংশীয় সজ্জন। ঋগ্বেদ ও জেন্দাবস্তার ভাব সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া ইনিই অথর্ব্ববেদ সংকলিত করেন। ইনি ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভক্তগণ ইঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের রচয়িতা ঋষি বলিয়া প্রচার করেন—চরকের সূত্র স্থানের প্রারম্ভে সে কথার আভাস আছে। ইনি আপনাকে ঋষি অপেক্ষা ইতর বা হীন বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। অথর্ব্ব বেদীয় প্রশ্নোপনিষদে উহা লিখিত আছে। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বের শেষাশেষী অধ্যায়ে লিখিত আছে যে সারস্বতবংশীয় অপান্তরতমা সত্যযুগে একবেদ হইতে চারবেদের বিভাগ করেন, দ্বাপর যুগে ব্যাসদেব তাঁরই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া পুনঃ বেদবিভাগ করেন !!!* ইহাও খুব সম্ভব মহিদাসের তাঁর ভক্ত প্রদত্ত নাম—এরূপ কিম্ভুতকিমাকার নাম আর্য্য ঋষিগণ গ্রহণ করিতেন না—ইহার অর্থ যাঁর চিত্তের তমঃ বিদূরিত হইয়াছে।

মহাভারতের মহাশাল শৌনক ভৃগুবংশীয় ভৃগু বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অগ্নি হইতে উৎপন্ন হন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন। চ্যবনের পুত্র প্রমতি। তাঁর পুত্র রুরু। তাঁর পুত্র শুনক। তাঁর পুত্র শৌনক। রুরুর স্ত্রী প্রমদ্বরার সর্পাঘাতে মৃত্যু হওয়ায় তিনি সর্পজাতির প্রতি জাত-

* সারস্বতশ্চাপি জগদনষ্টং, বেদং পুনর্যং দদৃশু র্ন পূর্ব্বে। ব্যাসস্তৈনং বহুধা চকার, ন যং বশিষ্ঠঃকৃতবান্ ন শক্তি !!

ক্রোধ হন। একটী ডুণ্ডুভ বা হেলে সাপকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে সে বলে ব্রাহ্মণগণ ক্ষমাশীল পুরাকালে ব্রাহ্মণের কথাতেই সর্পগণ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নিধন হইতে রক্ষা পান। তারপরেই আস্তীক উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তাঁর পিতার নাম জরৎকারু। ইনি উর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী ও যাযাবর ছিলেন। এ শব্দটী পারশীকগণের ধর্ম্মগুরু জরুথুস্ত্র বা জোরো আষ্টরের সংস্কৃত পরিণতি। অথচ আদি পর্ব্বে ৪০ অধ্যায়ে শব্দের যে নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা অদ্ভুত—কারুরূপ শরীরকে ইনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জরাপ্রাপ্ত বা ক্ষয় করিতেছিলেন।—জরেতি ক্ষয় মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতং। শরীরংকারুতস্যাসীৎ তৎসধীমান্ শনৈঃ শনৈঃ। ক্ষপয়ামাস তপস্যেত ও উচ্যতে। জরৎকারু ॥ ৪০।৩-৫

ইনি তক্ষশিলার নাগরাজের ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে যে পুত্র হয় তিনি আস্তিক নাগ বা সর্পগণের ভাগিনেয়। এ নাগ জাতি সর্প নয়—উহারা চীনদেশীয় লোক—তাহারা ড্রাগন সর্পের পূজা করে ও আপনাদের তদ্বংশীয় বলিয়া স্বীকার করে।

পারস্য অধিপতি ডরায়ুস অস্তাস্প (Dorius Histaspas) খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ৫১২ বৎসরে পঞ্চনদ পারস্য রাজ্যভুক্ত করেন। জরুথুস্ত্র তাঁর মন্ত্রী। তিনিই পারসিক ধর্ম্মশাস্ত্র জেন্দাবস্তা প্রণয়ন করেন। এঁর মতে অহুর্ম্মজদা জগতের শুভকর্ম্ম শক্তি ও অহিমন মন্দকর্ম্ম শক্তি। এ ভাবটী অনেকটা ইহুদীদের জিহোবা ও শয়তানের অনুরূপ।—জিহোবা জগৎ সৃষ্টি করেন। শয়তান তাহা পণ্ড করিবার চেষ্টা করে।

পারস্যের পারসীকগণ গৃহী ও পরিব্রাজককে কি বলে জানিনা। ভারতের পারসীকগণ কিন্তু পরিব্রাজককে যাযাবর ও গৃহীকে শালীন বলে। এগুলি আর্য্যঋষিগণের আশ্রমের সংজ্ঞা নহে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে শালীন শব্দ বিনয়ী ও অধৃষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর আর্য্য লেখকগণ উহা ঐ অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পারসীক বংশীয় ছদ্মঋষিগণ ইহা গৃহস্থ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন—চরকে উহা গৃহী অর্থেই ব্যবহৃত।

কণিষ্কের সময় নাগার্জ্জুন দলভুক্ত হীনযান সম্প্রদায় দুরভিসন্ধি বশতঃই আপনাদের বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কারণ কণিষ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহারা যেমন শাস্ত্রগ্রন্থ কলুষকরণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তেমনি মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁরা অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের ভূমিকার নিজ ইচ্ছানুযায়িক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। *

---

* ভারতীয় বুদ্ধ চরিতের প্রারম্ভে এইরূপ মঙ্গলাচরণ আছে—শ্রিয়ং পরার্ধ্যাং বিদধদ্বিধাতৃজিৎ তমোনিরস্যন্নভিভূতভানুভৃৎ। নুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্দ্রমা, সবন্দ্যতেঽর্হন্নিহ যস্যনোপমা॥ এখানে বুদ্ধের প্রণাম নাই। অর্হতের বন্দনা আছে। ব্যাড়ির যে লুপ্ত অভিধানের দুই এক শ্লোক দৃষ্ট হয় তাহাতে জিন, বুদ্ধ, বুধ, এক পর্য্যায়ে কথিত "অথ বুদ্ধোজিনোযোগী সুগতো বুধ এবচ"। অমরসিংহ বুদ্ধের পর্য্যায়ে যেমন সুগত, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, ভগবান, মারজিৎ, জিন, মুনীন্দ্র, মুনি প্রভৃতি দিয়াছেন তেমনি শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থ সিদ্ধ, গৌতম, শৌদ্ধোদনি, মায়াদেবী সুতও সেই পর্য্যায়ে দিয়াছেন। অর্থাৎ কোথাও বুদ্ধদেবের পর্য্যায়ে নাই উহা

তাঁরা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, বিদ্বান বলিয়াও পরিচিত হইয়াছিলেন কিন্তু দুর্জ্জন বিদ্যার পারঙ্গত হলেও বিদ্যার শিক্ষাজনিত প্রভাবকে তার কুটিল স্বভাব অতিক্রম করে—এটা স্বয়ংসিদ্ধ সত্য, ইহার কোথাও ব্যভিচার নাই।

আমি অধ্যাপক জয়কারের সংস্করণ বুদ্ধচরিত দেখিয়াছি। তিনি অনেক কষ্টে ত্রিবাঙ্কুরের এক মৌনী জৈন সন্ন্যাসীর নিকট বুদ্ধচরিত লিখিয়া লইতে সমর্থ হন। তাঁর হিন্দু জাতির প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ও আক্রোশ ছিল যে সে ব্রাহ্মণ জয়কারকে নিজ সমীপস্থ হইতে বা পুস্তক স্পর্শ করিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই—তাঁর শিষ্য পড়িয়া যান ও জয়কার তাহা লিখিয়া লন। নেপাল তিব্বত চীনের মহাযান গ্রন্থের অন্তর্গত বুদ্ধচরিতে বিভিন্নরূপ পাঠ থাকিবার সম্ভাবনা। আমাদের রামায়ণ মহাভারতের গৌড়ীয় দাক্ষিণাত্য পাঠ যখন বিভিন্ন, তখন বহুলপঠিত বুদ্ধচরিতেরও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা যে অধিক তাহার সন্দেহ নাই।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ সম্বৎ সম্রাট অশোকের শিলালেখে দৃষ্ট হয়। তার বহুকাল পরে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণের ১৯১৮ বৎসরের একখানি কুটিল অক্ষরের লেখা দৃষ্ট হয়। কণিষ্কের সময় সম্বৎ নামে তাঁর রাজ্যাব্দ ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধগণ তাহাই প্রবহমান রাখিয়া কিছুকাল তাহাই ব্যবহার করিয়াছিলেন। তারপরে শকাব্দ তার স্থান অধিকার করে আর দেখা যায় হিন্দু বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই তাহাই ব্যবহার করিয়াছেন। জিনসেনাচার্য্য তাঁর হরিবংশে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ৭০৫ শকে উত্তর দিকে কৃষ্ণপুত্র ইন্দ্রায়ুধ, দক্ষিণে শ্রীবল্লভ, পূর্ব্বে অবন্তিরাজ ও বৎসরাজ, আর পশ্চিমে সূর্য্যবংশীয়গণের রাজ্যে বরাহ রাজাশাসন করিতেছিলেন। * জিনসেন যে জৈন তাহার সন্দেহ নাই। ইনিও শককালই ব্যবহৃত করিয়া

জৈনদের তীর্থঙ্কর বোধক সুতরাং এস্থলে বুদ্ধ চরিত্রের মঙ্গলাচরণে উহার প্রয়োগ প্রবঞ্চনামূলক। তাহ'লে সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে "স বন্দ্যতে বুদ্ধ ভুবিষস্তনোপমা" শেষ পদটী এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। Cowell ও Jogelekar ইহা দিয়াছেন. Cowell নেপালের সংস্করণ ব্যবহার করেন। যোগলেকর জয়কারের বন্ধু—তিনি ত্রিবাঙ্কুরের জৈন মুনির নিকট গ্রন্থ লিখিয়া লন। এ বুদ্ধ চরিতের সহিত তিব্বত বা চীনের বুদ্ধ চরিতের মিল নাই। ললিত বিস্তারের প্রারম্ভে গদ্যে "ওঁ নমঃ সর্ব্ববুদ্ধবোধিসত্ত্বেভ্যঃ" ইত্যাদি আছে, আর গাথায় শাক্যসিংহের পা জড়িয়ে প্রণাম আছে—জ্ঞানপ্রভংহতমসং প্রভাকরং, শুভ্রপ্রভং শুভ্রবিমলাগ্রতেজসং। প্রশান্তকায়ং শুভশান্তমানসং, মুনিংসমাশ্লিষ্যত শাক্যসিংহং॥ ইহা অধিক পঠিত হইত না আর তিব্বত চীনে বৌদ্ধনির্য্যাতনের সময় অপসারিত হয় তাই ইহার কলুষ সম্পাদিত হয় নাই।

* শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদিরাজেঽপরাং
সৌরানামধিমণ্ডলে জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি॥

গিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই বহুকাল যাবৎ শক বৎসরই প্রচলিত ছিল ও এখনও আছে। অবিনীত নামে দাক্ষিণাত্যের এক রাজা কিরাতার্জুনীয়ের ৩৯২ শকে একখানি প্রাকৃত টীকা রচনা করেন। জৈনদিগের মতে তিনি জৈন ছিলেন। তারপর আর্য্যাবর্ত্তের মহীপাল প্রভৃতি বৌদ্ধ-নৃপতিগণ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণের জৈনগণ সম্বৎ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। অধুনা দেখা যায় জৈনগণ বীরাব্দ বলিয়া একটী কাল-জ্ঞাপক বৎসর ব্যবহৃত করিতেছেন। তাঁদের মতে ইহা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্ব্বাণ সময় হইতে গণিত হইয়া থাকে—তিনি বুদ্ধদেবের ৪ বৎসর পূর্ব্বে নির্ব্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ৫২৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি মহাশূন্যে মিশাইয়া যান। এখন কথা দাঁড়াইতেছে যদি বীরাব্দ সে সময় প্রচলিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহা এত কাল যাবৎ লোকচক্ষের অন্তরালে কেন ছিল? প্রাচীন জৈন লেখকগণ তাহা কেন ব্যবহার করেন নাই? এ দুটির কোন সদুত্তর নাই। ইহা যে বৌদ্ধগণের প্রতি বিরোধিতা করিবার জন্য জৈনগণের উদ্ভাবিত মিথ্যা অব্দ তাহার এক তিল সন্দেহ নাই। ইহা অনহল বারাপত্তনের রাজা কুমারপালের গুরু ও মন্ত্রী হেমচন্দ্র সুরির উদ্ভাবিত মত। কুমার পাল ১১৯৯সম্বতে রাজা হন এবং প্রায় ৪৯ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। হেমচন্দ্র ১২৩২ সম্বতে ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দেহত্যাগ করেন। হেমচন্দ্র জৈনদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে অভিধান গ্রন্থ লিখিয়া যান। তিনি সংস্কৃতের অঙ্গসৌষ্ঠব বিধানে তাঁহার বিস্তৃত জীবনের অনেক অংশই ব্যয়িত করিয়া যান, এবং রাজাশ্রয় পাইয়া জৈন ধর্ম্ম গ্রন্থ বহুল প্রচারে সমর্থও হন। এঁর অভিধান চিন্তামণিতে লিখিত আছে কুমারপাল রাজর্ষি ও চালুক্য বংশের অলঙ্কার (মর্ত্ত্যকাণ্ড ৩৭৬)। আবার বাদরায়ণের নামের পর্য্যায়ে ব্যাস পারাশর্য্য মাঠর কানীন দ্বৈপায়ন দেওয়া হইয়াছে আর এঁদের মাতার নামের পর্য্যায়ে সত্যবতী, বাসবী, যোজনগন্ধা, শালঙ্কায়নজা প্রদত্ত হইয়াছে (মর্ত্ত্যকাণ্ড ৫১২) অর্থাৎ বাদ রায়ণ এবং পরাশর ও সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেব এক ও অভিন্ন ব্যক্তি!! ইহাই প্রবঞ্চনামূলক মত। বাদরায়ণের মাতার নাম শালঙ্কায়নজা হইতে পারে। ভগবান ব্যাসদেবের মাও কি তাই? কখন নয়। হেমচন্দ্র প্রবঞ্চনার সূত্রপাত করেন, জটাধর মেদিনীকর প্রভৃতি অভিধান-কার তাহা সমর্থন ও বৃদ্ধি করেন। জটাধর বাদরায়ণকে শালঙ্কায়ণ গোত্রজ বলিয়াছেন। হেমচন্দ্র পাণিনিকে শালাতুরীয় (৫১৫) বলিয়াছেন, জটাধর তাঁহা অপেক্ষা একধাপ উপরে উঠিয়া শালঙ্কায়ণকেও শালাতুরীয় বলিয়াছেন। এ সকলই প্রবঞ্চনা।

পারিযাত্র অধিপতি নাগার্জুন অনেক দুষ্কর্ম্ম করেন—সাংখ্য ব্যক্তিগণকে কুকুর লেলাইয়া দিয়া হত্যা করেন, কালখণ্ডকে অকারণ নিধন করেন, গর্ভবতী যুবতীগণের ভ্রূণ হত্যা করেন, অবশেষে সর্ব্ব পাপের চরম পিতামাতাকেও নিধন করেন। এ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁর মহিষীর বিষদিগ্ধ নূপুরের খোঁচায় মৃত্যু হয়। ধন্বন্তরি পুত্র প্রতর্দ্দন বা প্রবহণের সহিত

ইন্দ্রের কথনে কৌশীতকী উপনিষদে ইহা ইন্দ্রের আত্মশ্লাঘারূপে বিবৃত হইয়াছে। (ক উ ৩ অ)* এর পারিষদের মধ্যে জৈমিনি শাস্ত্রগ্রন্থ কলুষিত করায় হস্তিপদদলনে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তারপর নাগার্জ্জুনীয় দল দাক্ষিণাত্যে নির্ব্বাসিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহাদের কেহ আশ্রয় দেয় নাই। তারপর এইদল সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফলেই ক্রমে ক্রমে স্থানে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিতে লাগিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্য চোল প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া বসেন। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য পুলকেশী সত্যাশ্রয় এইরূপ সম্রাট। তিনি ৫৫৬ শকে জিনমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিদ্বন্দী ছিলেন— ঐতিহাসিক কথা হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিতে গিয়া এঁরই নিকট পরাজিত হন। আবার ইহাও ইতিহাসের কাহিনী যে হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার রাজ্যের ২৪ বৎসরে ভারত ও বিদেশের অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া তাঁদের সম্মান করেন এবং সকল সম্প্রদায়কে পৃথক্ পৃথক্ আবাসস্থান প্রদান করেন। অবশেষে একদিন এমন দৈবদুর্ব্বিপাক হয় যে নিশীথ রাত্রে অগ্নি উপাসক পারসীক সম্প্রদায়গণের আবাস বাটীটী ও তৎসঙ্গে মগ (Majii) পুরোহিত সঙ্ঘ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। বিপক্ষের সন্দেহ যে হর্ষ আক্রোশবশতঃই তাঁদের এরূপে বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। পুলকেশীও ইহার সুদে আসলে শোধ বোধ লইয়াছিলেন—তিনি দেশের নিরীহ বৌদ্ধগণকে অকারণ হত্যা করিয়াছিলেন—আবার যাহাতে সত্য তথ্যের সন্ধান কেহ না করিতে পারে সেই জন্য সেই হত্যার ঔচিত্যের আরোপ সুধন্বা নামে কোন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক নৃপতির উপর স্থাপিত হইয়া থাকে!!! বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মের শত্রু ছিল, তাই সুধন্বা শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের মত লইয়াই তাদের নিধন করেন!!! শঙ্কর বিজয়ে বৌদ্ধগণের নিন্দা ও সুধন্বার প্রশংসা নানরূপ অলঙ্কার ছটায় বর্ণিত আছে!! যে জাতি অপর জাতির প্রতি জাতক্রোধ হইয়া এরূপ উল্লাসের সহিত তার নিধন বার্ত্তা নিষ্করুণ হৃদয়ে বর্ণন করিতে পারে তাদের জাতি রহস্য সকলের অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক— কারণ অঙ্গারের স্বভাব ধর্ম্ম মলিনত্ব সে কস্মিন কালেও পরিত্যাগ করিতে পারে না।

অপ্রিয় হলেও সত্যের অনুরোধে ভারতীয় জাতিতত্ত্বের একটী জটিল দুর্জ্জ্রেয় অনিষ্পত্ত রহস্য এস্থলে উদ্ঘাটন ও বিবৃত করা নিতান্ত অপরিহার্য্য আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু জাতির মধ্যে জাতি বিদ্বেষের সদ্ভাব ও অস্তিত্ব আমার মনে বড় কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত করে। কিন্তু কোন উপদেশ বা কথা বলে ইহার প্রতিকার হবার কোন উপায় নাই—যদি চিরার্জ্জিত কুসংস্কার দূর না হয় তাহা হইলে ইহার মুলোৎপাটন হবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমাদের একটা

* ওঁ প্রতর্দ্দনোহবৈ দৈবদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ংধামোপাজগাম।……ত্রিশীর্ষাণংত্বষ্ট্রেমহনং মরুন্মুখ্যান্‌যতীন্ শালাবৃকেভ্য প্রায়চ্ছং, বহ্বীঃসংধা অতিক্রম্যদিবি প্রহলাদীয়ান তৃণ, মহমন্তরীক্ষে পৌলোমান্ পৃথিব্যাংকালখঞ্জান্।……ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণ হত্যয়া নাস্য পাপঃচ ন চকৃষো মুখান্নীলোচেতি। হীনযানীগণ এইরূপ দ্বেষ হিংসাপুর্ণ উপনিষদ লিখিয়া গিয়াছে আর আমাদের হিন্দুদের ও কর্মভোগ— তাই বহু মান করি!

বহুকাল-পরিপুষ্ট কুসংস্কার যে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধজাতিকে ভারত হইতে বহিষ্কার করেন। এটা ঠিক কি? শঙ্করের সুন্দর গ্রন্থ বেদান্ত দর্শন ভাষ্য ইহার উপর আনন্দগিরির টীকা আরো সুন্দর। শঙ্কর ভাষ্যে ভগবান বুদ্ধদেবের নিন্দা করিয়াছেন আবার বৌদ্ধগণের মায়াবাদ সমর্থন করিয়া, পাকে প্রকারে বুদ্ধদেবেরই মতের প্রতি আস্থা দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিলের সাংখ্য মতের প্রকৃতিবাদের খণ্ডন করিয়া আবার ব্রহ্ম ও মূল প্রকৃতিকে এক ও অভিন্ন বলিয়া তাহারই সমর্থন জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে অজ্ঞ ব্যক্তিই শঙ্করকে অব্যবস্থিতমতি বলিতে পারে। যে জ্ঞানী তিনি তাঁহাকে তা বলিবেন না—তিনি সত্যের দুর্দ্দমনীয় প্রেরণায় সূত্রকারের বিরুদ্ধমতও সমর্থন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—এই সত্যানুবর্ত্তিতার জন্যই তিনি ভারত-ময় পূজ্য -আর্য্যাবর্ত্তবাসী তাঁকে দেবতার পূজা প্রদান করিয়াছেন, দাক্ষিণাত্য তাঁর মতের খণ্ডন মণ্ডনে মুখরিত হইয়াছে—আধুনিক পুরাণগুলিতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আবার মজা এই যে অন্য পুরাণকারগণ এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট কথা বলেন নাই। পদ্মপুরাণকার তাহাই প্রকাশ করিয়া ত্রিমূর্ত্তির ভগবান শঙ্করের প্রতি বৌদ্ধমায়াবাদের এই মোহজাল প্রচারের আরোপ করিয়াছেন।

শঙ্কর বেদান্ত ভাষ্যে বৌদ্ধনৃপতি পূর্ণবর্ম্মার নামের উল্লেখ করিয়াছেন, আর ছান্দোগ্য ভাষ্যে হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনের প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসবান ছিলেন। শঙ্কর যদি বৌদ্ধদ্বেষী হইতেন তা'হলে এঁদের নামও উল্লেখ করিতেন না, আর তাঁর নিজ দেশ বৌদ্ধহন্তা পুলকেশী-শাসিত কেরলের কালদীও পরিত্যাগ করিয়া মগধে অবস্থিত থাকিয়া ভাষ্য রচনাও করিতেন না।

পারশীক উপনিবেশকগণ ভারতে বাসস্থাপন করিয়া ভারতের হিন্দু জাতির সহিত একাঙ্গ হইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা প্রথমে আপনাদের অগ্নিকুল ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করেন। তাহা চারিকুলে বিভক্ত—প্রমার, চৌহান, শোলঙ্কী, পারিহার। জটাধরের মতে বাদরায়ণ শালঙ্কায়ণ গোত্রজ। এশব্দটি যে শোলঙ্কীরই সংস্কৃতস্বরূপ তাহা শব্দ-সাদৃশ্যই প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। চালুক্য শব্দও উহারই অপভ্রংশ। সুতরাং স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বেশ বোধ হইবে যে বাদরায়ণ পুলকেশী ও কুমারপাল এক বংশেরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রাদুর্ভূত উত্তর পুরুষ। এই শোলঙ্কী শব্দই বর্ত্তমান সময়ে জাতি ও স্থান বিশেষে শুল্ক ও সরাউগী আকার ধারণ করিয়াছে। আজিমগঢ় বালিয়া প্রভৃতি স্থানের মদ্য ও লোহালক্কড় ব্যবসায়িগণ শুল্ক গোত্র বলিয়া পরিচয় দেন। আর জৈন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মণি মুক্তা ব্যবসায়িগণ সরাউগী বলিয়া পরিচয় দেন। সরাউগীর মধ্যে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণবধ প্রথা প্রচলিত আছে। ইংরাজের কঠোর শাসনে নরহত্যা রহিত হইলেও বৎসরের এক সময়ে কোন পর্কোপলক্ষ্যে পুতুলের মধ্যে আলতার রং পুরিয়া

তার মস্তক ছেদন রূপ প্রাচীন প্রথার বিকট স্মৃতি বর্ত্তমান—ইহা যে নাগার্জ্জুনের যতি-বধস্মৃতিরই অনুস্মৃতি তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং বংশপ্রথার সাদৃশ্য ধরিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে নাগার্জ্জুন ও শোলঙ্কীরা শালঙ্কায়ন গোত্রসম্ভূত।

ইঁহারা আপনাদের অগ্নিকুল হইতে সূর্য্যচন্দ্র বংশে উন্নীত করিয়াছেন। পুলকেশীর শিলা লেখে তিনি সূর্য্য বংশীয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জিনসেনও রাজপুতানার রাজগণকে সূর্য্য বংশীয় বলিয়াছেন। কবি রাজশেখর তাঁর যজমান কনোজের পরিহার মহেন্দ্রপালকে সূর্য্য বংশীয় বলিয়াছেন। আবার বর্ত্তমান সময়ে মহারাণা উদয়পুর যোধপুর জয়পুর আপনাদের সূর্য্য বংশীয়ই বলিয়া পরিচয় দেন। এতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে এইমাত্র প্রকাশ হইতেছে যে একুলের লোক যেখানে যেমন সেখানে তেমন পরিচয় দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না করেন নাই আর করিবেনও না।

এঁদের বংশধরগণ ভারতময় নানা আকারে নানা মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। প্রাচীন এক জাতিই দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যে বিভক্ত হইয়াছেন। প্রমার ব্রাহ্মণ, চৌহান ক্ষত্রিয়, শোলঙ্কী বৈশ্য হইয়াছেন পরিহারও ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। পূর্ব্বসময়ে এঁদের মধ্যে পরস্পরে বিবাহ হইত, এখন জাতি জন্মগত হওয়ায় তাহা রহিত হইয়া গিয়াছে। কবি রাজশেখর পুরোহিত গোষ্ঠীক প্রমার বংশ সম্ভূত। তিনি অবন্তীর চৌহানকুলসুন্দরী কর্পূর মঞ্জরীকে বিবাহ করেন। বঙ্গদেশেও ইঁহারা তিন জাতিতে বিভক্ত দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, সেন রাজগণ চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়, বৈদ্যগণ বৈশ্য। বিহারে ভুঁইহারগণ কোথাও ক্ষত্রিয় কোথাও ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। শাকল দ্বীপী ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। বিহারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উভয়েরই সিংহ উপাধি দেখা যায় যেমন চৈতসিংহ মানসিংহ রামেশ্বরসিংহ ইত্যাদি। শাকলদ্বীপীগণ অন্য ব্রাহ্মণের ন্যায় মিশ্র পাঁড়ে প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করেন। আবার বালিয়া প্রভৃতি স্থানের লোহালক্কড় ও মদ্য ব্যবসায়ী শুল্ক বংশায় কলবার বা শুঁড়িগণ শূদ্রবৎ আচরণীয় হইয়া থাকেন। ইঁহারা ধনী ও বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কোথাও কোথাও যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের পুরোহিত শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ। আর্য্যবর্ত্তে ইঁহারা জল আচরণীয় না হইলেও ঘৃণিত ও অভিশপ্ত নহেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে পারিয়া বিদ্বিষ্ট ও অত্যাচারিত জাতি হইয়া আছে। বৌদ্ধ গৃহস্থগণ সদাচার পরায়ণ ছিলেন। তাঁহারাই নাগার্জ্জুনের নির্ব্বাসিত দলের অভ্যুদয় কালে "ঘৃণিত পারিয়া" বলিয়া অঙ্কিত হইয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে জাতিবিভাগ হইলে সুধন্বা বা পুলকেশীর জাতভাইরা যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইলেন ও নিজেদের পারিয়া নাম ত্যাগ করিলেন, তেমনি বৌদ্ধ গৃহস্থগণের প্রতি আক্রোশবশতঃ "পারিয়া" নামে তাঁহাদের মণ্ডিত করিয়া দিলেন। পারিয়া শব্দ পারিযাত্রবাসী শব্দেরই প্রাকৃতরূপ। পারিযাত্রবাসীগণ নিজ কর্ম্মদোষে নির্ব্বাসিত হয়। তারা

পারিযাত্রে বাসকালে নিজের বৈরিতার নিমিত্তই কালখঞ্জ জাতির চিরশত্রু হয়। তারা সুবিধা পাইলেই পারিয়াদের ধরিয়া লইয়া গিয়া দেবী সমীপে বলি দিত—এখনও সেই প্রথা পুরুষ-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে—আফ্রিদীদের তারা হস্তগত করিলে গলায় ফাঁস দিয়া টানিয়া পাহাড়ের উপরে তোলে এবং সেইখানে দেবীর নিকট বলি দেয়। অধুনা কালখঞ্জ পিয়াপোষ কাফির বলিয়া পরিচিত হইয়াছে—তারা আফ্রিদী ইউসুফজয়ী খেল প্রভৃতি প্রান্তসীমাস্থ পাঠান জাতিকে পারিয়াই বলে। ইহারা নিজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু আমীর আব্দুল রহমান তাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

আর্য্যাবর্ত্ত বড় পুণ্যদেশ। এখানে দ্বেষ হিংসা পূর্ব্বে ছিল না। ভগবান বুদ্ধদেব এখানেই তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন ও হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধারণের সহানুভূতি লাভ করেন—হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে কোন কলহ-বিবাদ-হিংসা-আড়ি ছিল না। মহারাজ অশোক বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ শ্রমণ উভয়েরই সম্মান করিতেন, উভয়কেই অর্থ ভূমি দান দ্বারা তৃপ্ত করিতেন। ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস যে বুদ্ধদেব যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রতিকূলতা করেন—ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাবধিই যজ্ঞে পশুবধ নিষেধ করিয়াছিলেন—ইহা তাঁদের পূজ্যদেবতা নারায়ণের অবতার কপিলদেব সাংখ্যমত প্রচার দ্বারাই নিবারণ করিয়া দিয়াছিলেন—উহা বর্ত্তমান কলির এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা।* তারপর ভগবান্ ব্যাসদেব ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতার দ্বারা উহা রহিত করেন। কঠোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ দ্বারা পরবর্ত্তী মুনিগণ উহা কর্মকাণ্ডময় যজুর্ব্বেদে অনুপ্রবেশিত করিয়া দেন। তারই ছায়া মনুস্মৃতিতেও পতিত হইয়াছে। মনুভগবান্‌ও স্মৃতিতে পশুবধ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন—যে বিরুদ্ধ বচন উহার পাশে আছে, উহা বিধর্ম্মী বিদেশী উপনিবেশকগণের হস্ত কৌশল—উহাতে মোটেই বিশ্বাস আস্থা ও শ্রদ্ধা স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ উহা করিতে গেলেই পূর্ব্বতন পূজ্য ঋষিগণের বিরুদ্ধতা করিয়া পাপ অর্জন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান মনুস্মৃতি অধিক প্রাচীন নয়। তত্রাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা পতঞ্জলি মুনি ও কালিদাসের সময়ের মধ্যে কোন সময়ে সঙ্কলিত হয়। মনুর যে ভাব

* একথা বিশ্বাস করুন—ইহা অতিরঞ্জিত কথা নহে। মহাভারতে তার প্রমাণ আছে। কপিলদেব বর্ত্তমান সময়ের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বর্ত্তমান কলির ৬ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে হারাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। কলির প্রারম্ভে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। তার পাঁচ ছমাস পূর্ব্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগে শরীর ত্যাগ করেন। ভগবান আত্রেয়পুনর্বসু কলির ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন। গৌতম ও কণাদ মহর্ষিদ্বয় কলির প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা যাকে কলি বলি উহা বাস্তব পক্ষে ত্রেতার শেষ বা দ্বাপরের আরম্ভ—তার ২৪০০ বৎসর পরে কলি আরম্ভ হয়।

ভৃগুদেব সঙ্কলিত করেন, উহা খৃষ্টাব্দ পূর্ব্ব প্রায় ১৫৮০বৎসরে লিপিবদ্ধ হয়, কারণ তাঁর সময়ে মঘানক্ষত্রে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে দক্ষিণায়ন হইত, ইহার আভাস আছে। কিন্তু আর্য্যবর্ত্তের সংজ্ঞায় মুনিদের নানামত থাকায় যে ভাব বর্ত্তমান মনুতে দৃষ্ট হয় উহা বোধহয় বিন্ধ্যবাসী সাংখ্য যতি মহোদয়গণের সমসময়ে সঙ্কলিত হয়। ভগবান্ পাণিনির "শূদ্রানামনিরবসিতানাং" (২।৪।১০) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি মুনি আর্য্যাবর্ত্তের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাতে বোঝা যায় দশার্ণের পূর্ব্বে কালকবনের পশ্চিমে ও উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে পারিযাত্রের মধ্যস্থ ভূমিই আর্য্যাবর্ত্ত। (১) বর্ত্তমান মনুতে পূর্ব্ব-পশ্চিম-সমুদ্র-সীমাবর্ত্তিনী ভূমি ও হিমালয় বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তিনী ভূমিই আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া লিখিত আছে। (২) আবার বশিষ্ঠ স্মৃতিতে কতকগুলি বিকল্পদ্বারা আর্য্যাবর্ত্তের সংজ্ঞা বুঝান হইয়াছে। হিমালয়-বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেশই আর্য্যাবর্ত্ত; গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূমি কাহার মতে আর্য্যাবর্ত্ত। ভৃগুবংশীয় ভাল্লবীগণের গাথা মতে সিন্ধুর পশ্চিমে যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করে তাহাই ব্রাহ্মণ বাসের উপযুক্ত সুতরাং আর্য্যাবর্ত্ত। (৩) সাংখ্যযতিগণ জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ছিলেন তাঁরা পুরাতন গ্রন্থের যথাযথই প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। যেমন ষষ্টিতন্ত্রের সংক্ষিপ্তভাব সাংখ্য সপ্ততিতে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে মনুস্মৃতিরও তাঁরাই প্রতিসংস্কার করেন কিন্তু তাঁদের স্বর্গারোহণের পর যখন বিধর্ম্মী বিদেশী উপনিবেশকগণের রাজগণের অভ্যুদয় হইল সেই সময় ভৃগু-অত্রি-গৌতম নামের ব্যপদেশে মনুতে বিরুদ্ধমত অনুপ্রবেশিত হইল। যে কেহ, সন্দেহ হইলে, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আবার মহাভারতের মনুমত তুলনা করিয়া দেখিলে বিরুদ্ধ ও প্রক্ষিপ্ত মত শীঘ্র চোখে ধরা পড়িবে।

এই বিদেশীয় উপনিবেশকগণের বংশধরগণ মিথ্যার উপরই ভিত্তি করিয়া তাঁদের ধর্ম্ম আচারব্যবহার রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁদের বৃদ্ধ মুনিঋষির গ্রন্থ সাবধানে গ্রহণ করা উচিত, নতুবা প্রতারিত হইতে হইবে। বৃদ্ধ মনু বৃদ্ধ পরাশর প্রভৃতি নামগুলি প্রবঞ্চনায় ভরপুর, সুতরাং এঁদের মতগুলিও আগাগোড়া ছলনাময় ও মিথ্যা। এঁরাই

(১) আর্য্যাবর্ত্তাদনিরবসিতানাং। আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রাগাদশার্ণাৎ প্রত্যক্ কালকবনাৎ দক্ষিণেন হিমবন্তং উত্তরেণ পারিযাত্রং। যদি এবং কিষ্কিন্ধগন্ধিকং, শকচবনং, শৌর্য্যক্রৌঞ্চং নমিস্যতি।...

(২) আসমুদ্রাত্তু বৈপূর্ব্বাদাসমুদ্রাৎতু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধা॥ মনু২।২২

(৩) দক্ষিণেন হিমবতঃ উত্তরেণ বিন্ধস্য যে ধর্ম্মা যে চাচায়াস্তেসর্ব্বে প্রত্যেতব্যা নত্বন্যে প্রতিলোমকল্পধর্ম্মাঃ। এতদার্য্যাবর্ত্তমিথ্যাচক্ষ্যতে। গঙ্গাযমুনয়োরন্তরাপ্যেকে। যাবদ্বা কৃষ্ণমৃগো বিচরতি তাবদ্ব্রহ্মবর্চ্চসং ইতি। অথাপি ভাল্লবিনো নিদানেগাথামুদাহরন্তি।

পশ্চাৎ সিন্ধুর্বিহরিণী সূর্য্যোস্তোদয়নং পুরা
যাবৎ কৃষ্ণোহভিধাবতি তাবদ্বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসং। বশিষ্ঠ সংহিতা ১ অধ্যায়।

সকলে পুরাণগুলির রচয়িতা। কেবল ব্রহ্ম পুরাণ বিন্ধ্য পর্ব্বতের সাংখ্যযতিগণের কৃত ইহার গভীর তত্ত্বপূর্ণ কথা ও সুন্দর ভাষার সহিত যেমন অন্যপুরাণের ভাষার তুলনা হয় না, তেমনি ইহা উদার মতে পূর্ণ। কিন্তু অন্য পুরাণে সম্প্রদায়িক দ্বেষ হিংসা প্রবেশলাভ করিয়াছে।

ইহারা রামায়ণও কলুষিত করিয়াছে। রামজন্মের ঋতুনক্ষত্র মাস তিথির নির্দ্দেশ সর্ব্বৈব মিথ্যা—উহা বরাহের সময়ে প্রচলিত ঋতু হইতে গৃহীত। দশরথের চারি পুত্র প্রোষ্ঠপ্রদানক্ষত্রের সহিত তুলিত হইয়াছেন। অধিক সম্ভব তাঁরা ঐ নক্ষত্রের উদয় সময়ে বা চন্দ্রের ভোগকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সময় বাসন্তিক বিষুব রোহিণীতে সংঘটিত হইত কারণ রামায়ণের অনেক স্থলে রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সীতা অযোনিজা পৃথিবীর কন্যা নহেন—তিনি জনকের ঔরস কন্যা—ক্ষেত্র শব্দের স্ত্রী অর্থে ব্যবহার ঋষিগণ শ্লীলতার অনুরোধে করিয়াছিলেন। রামায়ণে বৌদ্ধগণকে চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে—ইহা কোন কলুষহৃদয় প্রক্ষেপকারীর গাত্রদাহ ছাড়া আর কিছু নহে। কারণ জাবালের কথায় লোকায়ত মতই ব্যক্ত হইয়াছে, উহা প্রাচীন স্বাধীন চিন্তাশীল ঋষি বংশীয়গণের উক্তি। তারপর গয়ায় পিতৃপিণ্ডদানের কথাও প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা কোন গয়ালী মহাপ্রভুর চাতুরী!! রাম চিত্রকুটে মন্দাকিনী তীরে ইঙ্গুদীপিষ্টক দ্বারাই দশরথকে পিণ্ড দিলেন—গয়ার মাহাত্ম্যে গদ্‌গদ্ হইয়া ফল্গুতীরে দৌড়াইয়া যান নাই।

এই তীর্থের পাণ্ডাগণ সকলেই পারসীকগণের অগ্নিকুল হইতে উৎপন্ন—ইঁহারা আর্য্যমুনিঋষিগণের বংশধর নহেন। ইঁহারা নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করিবার জন্যই তীর্থের মাহাত্ম্য খ্যাপন ও পাণ্ডাগিরির দ্বারা ব্যবসায় করিতেছেন ও যাত্রীগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ যখন নন্ তখন হিন্দু আর্য্য ব্রাহ্মণগণ কোন বাধ্যবাধকতায় ইঁহাদের পদস্পর্শ করিয়া সঙ্কল্প করেন? এবং ইহাদের অর্থদানে ইহাদের পাপ কার্য্যের পরিপোষণ করেন?

দাক্ষিণাত্যের ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণও এইরূপ। ইহুদীদের মধ্যে ফরাসী সম্প্রদায় যেমন আপনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব ও ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করিত, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণও আপনাদের তাই মনে করেন। ইঁহারা ভারতের অন্য সকল জাতিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।* ইঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, এক শঙ্করভক্ত দ্বিতীয়

* ভারতে একজন প্রবঞ্চক কালিদাস প্রাদুর্ভূত হন। ইনি জ্যোতির্বিদাভরণ নামক ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ লেখেন। এঁর ভাষা খটমটে ও নীরস। উহাতে হেমচন্দ্রসূরির অভিধান চিন্তামণির অব্যবহৃত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া বাছিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইনি আপনাকে দাক্ষিণাত্যের মাথুর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন ও অন্য প্রদেশের

বিষ্ণুভক্ত। শঙ্করভক্তের উপাধি আইয়ার চারিয়ার ইত্যাদি। বিষ্ণুভক্তের উপাধি আয়েঙ্গার চার্লু ইত্যাদি। ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি হয় কিনা জানি না, দ্বেষাদ্বেষি তো বেশ প্রবল—আয়েঙ্গারগণ শিব শক্তি কার্ত্তিক গণেশ দেবতার শোভা যাত্রা দর্শন করেন না এবং তাহাতে যোগ দেননা। শিব শক্তির পূজা পর্য্যন্ত করেন না, শঙ্কর সম্প্রদায়ের যে যে তীর্থে মঠ আছে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য রামানুজ সম্প্রদায়ও সেই সেই তীর্থে মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শঙ্কর সম্প্রদায়ের ভক্ত ও সন্ন্যাসীগণ ভস্মের তিনটী রেখা কপালে টানেন। রামানুজীগণ উর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র কাটেন—দুইধারে সাদা মধ্যে লাল। শঙ্কর সন্ন্যাসীগণ গৈরিক বসন ধারণ করেন, রামানুজীগণ শ্বেত বস্ত্র পরিধান করেন। রামানুজীগণ শঙ্কর সন্ন্যাসীদের অভ্যর্থনাও করেন না, ভিক্ষাও দেননা। ফরাসীগণ যেমন অন্য ইহুদী জাতির রক্তশোষণ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না, মুসলমানের সিয়াসুন্নীর মধ্যে যেমন মারকাট লাগিয়াই আছে ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতি ধর্ম্মের গোঁড়ামীতে যেমন একজন অপরকে দাহ হত্যা করিয়া পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, প্রান্তসীমার পাঠান জাতির যেমন এক কুল অন্য বংশকে উচ্ছেদ করিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করেনা, শ্বেতাম্বর জৈনগণ যেমন দিগম্বরদের হত্যা করিতে দ্বিধা বোধ করেনা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রামানুজগণও তেমন শঙ্কর সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করিতে ছাড়েনা। এই জাতীয় স্বভাবের লক্ষণ দ্বারা বোধ হয় ইহারা পাশ্চাত্যের কুটিল জাতিরই বংশধর।

ভারতের সকল ভাষাই দেবভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। কিন্তু তামিল তেলেগু কানাড়ী সেরূপ নয়। তামিলের হিব্রু আরবীর সহিত সংযোগ আছে। ভারতে বহুকাল হইতে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে ইহুদী খৃষ্টান বাস করিতেছে। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে মাড্রাস জার্নালে ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বের এক ইহুদীকে ভূমিদানের শাসনের বিবরণ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহুদী খৃষ্টানের ধর্ম্ম, স্বভাব চরিত্র, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহারের প্রভাব যে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণের মধ্যে প্রাদুর্ভাব লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ভাগবতের কংস চরিত্রে যে বাইবেলের হিরডের (herod) নৃশংসতার ছায়াপাত হয় নাই ইহা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তারপর খুড়তুত মামাত পিসতুত ভগিনীর পাণিগ্রহণও আর্য্যপ্রথা নয়, ইহা পাশ্চাত্য প্রথারই অনুসরণ—এবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতে কৌতুক জনক প্রবঞ্চনার অবতারণা করা হইয়াছে। মহাভারতে ধর্ম্মের দশ পত্নীর কথা বিবৃত

ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার সামাজিক প্রথার নিন্দা করিয়াছেন। ইনি লিখিয়াছেন কালিদাস বরাহমিহিরের মতানুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ ৩০৬৮ কলি অব্দে রচনা করেন !!! বিবেকবিমূঢ় হিন্দু আমরাই এইরূপ নগ্ন প্রবঞ্চনা, বিনা তর্কেবিতর্কে অম্লানবদনে বিশ্বাস করিয়া লই অথচ এটা দেখিনা যে মহাকবি কালিদাস সম্বতের পূর্ব্বে ও বরাহ ৪২৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ৺বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের মতে এই গণক কালিদাস ১১৬৪ শকে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন।

হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে মানুষ সুমতি সুকীর্ত্তি সুমেধা সুকৃতি আয়ু প্রভৃতি ফল স্বরূপ লাভ করে,—ইহাই ধর্ম্মপত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে মানুষকে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া শিক্ষা আছে সুতরাং এ রচনাও সার্থক। কিন্তু পুরাণে ধর্ম্মের দশ পত্নীর মধ্যে এক যামীর কথা আছে। যামী অর্থে ভগিনী অর্থাৎ ভগিনীই যথায় ধর্ম্মপত্নীরূপে স্বীকৃত হন—ইহার দ্বারা নিজ জাতির কৌলিক প্রথার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ভাগবত বিষ্ণুপুরাণের পাণ্ডিত্য সংস্করণ—ইহাতে বিষ্ণুপুরাণের স্পষ্ট সহজবোধ্য কথা পণ্ডিতের জটিল ও কুটিল ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে বোধহয় মিথিলা-অধিপতি নান্যদেবের মন্ত্রী বিষ্ণুর দ্বারা ৯৭০ শকে রচিত হয়। ভাগবতকার বোপদেব বোধহয় তাঁর পৌত্রস্থানীয়।

নান্যদেব কর্ণাটের রাজবংশীয়। তিনি প্রথমে রাজশূন্য বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন কিন্তু বিজয়সেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। তখন তিনি মিথিলায় গিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। বিজয়সেন ৯৫৪ শকে বঙ্গে আগমন করেন। এঁরই পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় বল্লালসেন ও পৌত্র লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের প্রশস্তিতে সেনরাজগণ ওষধিনাথ বা চন্দ্রবংশীয় ও বীরসেনের কুলগত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। বৈদ্যগণ ওষধিকে ঔষধিনাথ ধরিয়া তাঁহাদের ধন্বন্তরিবংশীয় বলিয়া স্বীকৃত করিয়াছেন। কিন্তু উমাপতিধরের পল্লবিত রচনা সে বংশের কীর্ত্তিগাথা পারাশর্য্য বা ব্যাসদেবের উপরে আরোপিত করায় (পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণ প্রীণায় প্রণীতঃ) তাহা নিরাকৃত হইলেও বৈদ্যগণের কথাও মিথ্যা নহে; কারণ সেন ভূপতিগণও দাক্ষিণাত্যের অগ্নিকুলেরই উত্তর পুরুষ সুতরাং তাঁদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন জাতিরই সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

বল্লালসেন ও তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেন বঙ্গে অনেক সুকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বল্লালসেনের সময়েই দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক ও কায়স্থগণ বঙ্গে আসিয়া বাস করেন এবং রাজার নিকট ভূমিদান প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত হন। চিকিৎসকগণ সেনগুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হন। কায়স্থগণ ঘোষবসুমিত্র উপাধিবিশিষ্ট ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া পরিচিত হন। লোকের একটা ভ্রান্তধারণা যে বল্লালসেন রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। যখন বল্লাল বঙ্গের রাজা হন তখন রাঢ়ী বারেন্দ্রগণের ৮।১০ পুরুষ হইয়াছে—তাঁরা পূর্ব্বতন রাজগণের নিকট ভূমিদান প্রাপ্ত হইয়াই বসবাস করিতেছিলেন, তাঁরা অধিক প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। তারপর কুলমর্য্যাদার কথা—ক্ষত্রিয় বল্লালের ব্রাহ্মণের কুলমর্য্যাদা প্রদানের কোন অধিকার থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণের কুলীনশ্রোত্রিয় শব্দ সদ্বংশজাত ও পণ্ডিত অর্থেই ব্যবহৃত হয় এবং শ্রোত্রিয় কুলীনে পুত্রকন্যার আদানপ্রদান বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া আসিয়াছিল। ১৩৬৭ শকের লেখক ধ্রুবানন্দমিশ্র তাঁর "মহাবংশে" ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দেবীবর ঘটক অমরকোষের সর্ব্বস্ব নামক টীকাকার সর্ব্বানন্দের পুত্র ও ধ্রুবানন্দের পৌত্রস্থানীয়, সে ব্রাহ্মণবংশের কুলাঙ্গার—সে-ই কুলের দোষ ধরিয়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলমর্য্যাদা স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। যে দুরাচার কুলকামিনীর চরিত্রকুৎসা অনায়াসে কারিকাগ্রন্থে ব্যক্ত করিয়া পৈশাচিক আনন্দ উপভোগ করে তার মত নরকের কীট আর দ্বিতীয় থাকিতে পারে কি ? ইহারই প্রদত্ত ৩৬টী কলঙ্ক ব্রাহ্মণের কুলে ৩৬ মেল বলিয়া বিদিত হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পরে সজ্জন ঘটক চট্টবংশের চৈতলকুলের মুলপঞ্চানন ইহার কৌলীন (জনবাদ) ঘটিত ব্যাপারকে কৌলিন্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া যান। তাঁর বাংলা কারিকায় দেবীবরের আরোপিত দোষ সদ্‌যুক্তির দ্বারা নিরাকৃত হয় এবং ফুলে খড়দহ বল্লভী সর্ব্বানন্দী শ্রেষ্ঠ কুল বলিয়া পশ্চিম বঙ্গে স্বীকৃত হয়! দেবীবর পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুরের লোক। যে বন্দ্যবংশে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিচারপতি গুরুদাস ও রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করিয়া তারই অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া গিয়াছেন দেবীবর কুলকন্যার কুৎসা করিয়া তাহার সেই বন্দ্যরূপ নিজকুল কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। মুসলমান যেমন এখন কুল-বালাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া তাঁদের ধর্ম্মনষ্ট করিতেছে, দেবীবর ও তাহার পূর্ব্বতন-দের সময়ও তাদের অপ্রতিহতপ্রতাপ ছিল—তখন প্রজার হাতে মাথাও কাটিতে পারিত। তারা যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছে তাহা ঘটকগণ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। যে কেহ আমার কথার সত্যতা মিলাইয়া লইতে পারেন।

এই সময় দেবীবরের স্বদেশীয় দুএকজন চাটুকারও জুটিয়াছিল। কুলরসাকার বাচস্পতি মিশ্র ও বল্লাল চরিতকার আনন্দ ভট্ট তাঁদের অন্যতম। এগুলিতেই বল্লাল সেন উপর কৌলিন্য প্রথার দোষ আরোপিত হইয়াছে। ইঁহারা উভয়ে অনেক মিথ্যা কথার প্রপঞ্চ করিয়া গিয়াছেন। ঢাকায় বিক্রমপুর সেনরাজগণের রাজধানী ছিলনা—সে বিক্রমপুর নবহট্ট গ্রামের নিকট গঙ্গা তটে অবস্থিত ছিল—তথায় বল্লালসেনের সৈন্যের স্কন্ধাবার বা ছাউনী ছিল। যবন আক্রমণের সময় শেষ লক্ষ্মণসেন সেই দুর্গ প্রকারেই অবস্থান করিতেন এবং মুসলমানদের সহিত বিক্রমের সহিতই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁরপরে সেনবংশীয় রাজা দনুজমর্দ্দনও সেস্থানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয়দের প্রাচীন ঘটক এড়ুমিশ্র এই দনুজমর্দ্দনেরই সভাপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গের সুবাদার তোগরল বিদ্রোহী হলে এই দনুজমর্দ্দনই দিল্লী অধিপতি বলবনকে সাহায্য করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকের নিকট ইনি মুজা নামে বিকৃত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিতও রামায়ণে নিজ বংশোল্লেখ কালে তাঁর পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়কে এই দনুজের মন্ত্রী বলিয়াছেন। আবার জীব গোস্বামী তাঁর ষট্‌সন্দর্ভনামক ভাগবতটীকার শেষে নিজ বংশাবলী উল্লেখ স্থলে লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁর পঞ্চম পূর্ব্ব পুরুষ পদ্মনাভ দনুজ (ততো দনুজমর্দ্দন ক্ষিতিপ পূজ্যপাদ ক্রমাৎ, উবাসনবহট্টকে

সকিল পদ্মনাভকৃতী) মর্দ্দনের নবহট্ট রাজ্যে গঙ্গা তীরে বাসের জন্য স্থান প্রাপ্ত হন। ষট্ সন্দর্ভ ১৫০০ শকে রচিত হয়—উহা জীবের জেষ্ঠ্যতাত সনাতন গোস্বামীর ১৪৭৬ শকের রচিত ভাগবতটীকা বৈষ্ণবতোষিণীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তাহলে বেশ দেখা যাইতেছে যে নবহট্ট বিক্রমপুর এক স্থলেই অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি বল্লালসেনের প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনের বিষয় বর্ণন দ্বারাও তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।

এখন যেমন ইংরাজগণ সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজগণের দুর্গ ও প্রাকার ধ্বংস করিয়া দিয়াছে সে প্রাচীন সময়েও তেমনি মুসলমান শাসকগণ হিন্দু দুর্গ ও নগররক্ষক প্রকার গুলি ধ্বংস করিয়া দেয়—তাই গঙ্গাতীরের বিক্রমপুর ধ্বংস হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে সেই নামের নগর স্থাপিত হয় আর তাহাকেই সেনরাজগণের প্রাচীন রাজধানী বলিয়া প্রচারিত করা হয়। যাহা মিথ্যার ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় তার সমর্থন কল্পে অনেক মিথ্যা গল্পের অবতারণা করিতে হয়। কুলরামা ও বল্লাল চরিতে তার অভাব নাই। বল্লাল চরিত ১৪৩৪শকে রচিত হয়। ইহাতে লিখিত আছে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ১৪।১৫গ্রামীন ব্রাহ্মণদের রাজা স্বুবর্ণ গোদান করেন। তার গর্ভে আলতার লালরং পোরা ছিল। ব্রাহ্মণগণ উহা স্বুবর্ণ বণিকগণের নিকট বিক্রয় করেন। বণিকগণ তাহা ছেদন করায় রক্ত সদৃশ পদার্থ বহির্গত হয়। তাহাতে তারা রাজকর্ত্তৃক গোহত্যাকারী বলিয়া সমাজে পতিত হন, আর ব্রাহ্মণগণ কুলীন পদবী হইতে অবনীত হইয়া কষ্টশ্রোত্রিয় মধ্যে গণ্য হন !!! এসব মিথ্যা কথা। প্রকৃতিরঞ্জক ও প্রজাপালক রাজা ওরূপ খামখেয়ালী করিতে পারেন না। তারপর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ যে রাজার স্বুবর্ণদান গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই সন্দেহজনক। কারণ আনন্দ ভট্ট লিখিয়াছেন রাজা উহা যোগীরাজকে দান করিবার ইচ্ছা করেন কিন্তু ব্রাহ্মণগণ লোভবশতঃ তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ ও রাজসমীপে যোগী রাজের কুৎসা করায় যোগীরাজ সমাজে নিগৃহীত হন ও যুগী বলিয়া অনাচরণীয় জাতিরূপে পরিচিত হন। এই কথার দ্বারাই আনন্দ ভট্ট আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন—তিনি যে যুগী বংশেরই কোন রত্ন, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। স্বুতরাং তিনি যে যুগী বংশের প্রশংসা ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণের কল্পিত কুৎসা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই। অপিচ ইহাতে কুলরামার দ্বারা তাঁহার কথার সমর্থনও হইতেছে। উহাতেও কষ্টশ্রোত্রিয়গণের নিন্দা আছে।

স্বুবর্ণ বণিকগণ পারসীক বংশীয় অগ্নিকুলেরই শাখা হইতে উৎপন্ন হন। ইঁহারা সরাউগীর ন্যায় বঙ্গে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সরাউগীগণ ব্রাহ্মণ বধ অপরাধে সমাজে হেয় ও অনাচরণীয় হন। স্বুবর্ণ বণিকগণও সেই একই কারণে সমাজে অনাচরণীয় হইয়া আছেন। তবে বঙ্গদেশে ইঁহারা নিজ উদার স্বভাবের প্রভাবে সাধারণের ও ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উত্তর পশ্চিমের সুবর্ণকারগণ আর্য্য বৈশ্য বংশীয় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন ও সমাজে জলআচরণীয়।

যুগীগণ নাথ উপাধি ধারণ করেন এবং আপনাদের গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের অথবা ভগবান শঙ্করের বংশধর বলিয়া প্রচার করেন। ইঁহারা দিগাম্বর জৈনগণের বংশে উৎপন্ন হন। জৈন নগ্ন তীর্থঙ্করগণ বিবাহ করিতেন না আর তাঁদের উলঙ্গ চেলাচাপাটীরাও বিবাহ করিতেন না। কিন্তু কালক্রমে রক্ত মাংসের শরীরের প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে তাঁদের অবনতি ঘটে এবং সেবাদাসীর প্রচলন হইতে সহজিয়া প্রেমের উৎপত্তি হয়---ইঁহারাই তথা-কথিত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের উদ্ভাবক।—এর সহিত বৌদ্ধ নামটী যে কেন কলঙ্কিত করা হয় তাহা বুঝা যায় না।—বৌদ্ধগণ নির্ম্মলচরিত্র ও সংসারবিরাগীই থাকিতেন, স্ত্রীজাতির সহিত আলাপ তাঁদের ধর্ম্ম ও সংঘ অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল। যুগীগণের ন্যায় আচার্য্য ও মড়িপোড়া ও ভাট ব্রাহ্মণগণও জৈন সম্প্রদায়েরই শাখা। তবে ইঁহারা বঙ্গদেশে অনেক স্থলে রাঢ়ীয় গ্রামীন বলিয়া পরিচয় দেন—উহা তাঁদের করাই অনুচিত। কারণ উহা প্রবঞ্চনামূলক---উহাতে লোকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয় যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণই পতিত হইয়া অনাচার দ্বারাই জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন ও করিয়া থাকেন।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ও কনৌজিয়া সরবরিয়া ব্রাহ্মণের ব্যবহৃত মিশ্র দুবে তেসরি পাঁড়ে উপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে বিদেশী-গণের মনে ভ্রান্তি উৎপাদিত হইতে পারে। কিন্তু তদ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাজ্ঞানহীন হলেও কুলের বিশুদ্ধতা রক্ষণে যত্নশীল—তাঁরা শাকলদ্বীপীগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ ত দূরের কথা কাঁচা পাকা কোন ভোজ্যবিষয়েরও আদানপ্রদান করেন না---অপিচ তাঁরা শাকলদ্বীপীগণকে মারণ উচাটন প্রভৃতি অভিচার কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য জীবনের নাশক বলিয়া ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন। শাকলদ্বীপীগণ পরিচয় সময় ভরদ্বাজগোত্র প্রমার সামবেদী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই প্রমার পরিচয়টাই নিঃসংশয়ে প্রকাশ করিয়া দিতেছে যে তাঁরা অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়েরই এক শাখা। এঁরা সকলেই আপনাদের সামবেদী বলিয়া পরিচয় দেন। অথচ ইঁহারা সকলেই ব্রাত্য ও অথর্ব্ববেদী।

লক্ষ্মণসেনের সময় অনেকগুলি গ্রন্থরত্ন সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারের অঙ্গ শোভাবর্দ্ধন করে। তিনি ১০৩০ শকে মাঘ মাসে রাজ্যাভিষিক্ত হন। এ সময় তাঁর তিন জন সভাসদ তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান—ধোয়ী কবিরাজ পবনদূত নামে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লেখেন। ইহাতে কলিঙ্গপতি কন্যা কুবলয়বতীর বিরহ বর্ণনা পবনদেবের মুখে রাজসমীপে নিবেদিত হইয়াছে। ইহার পুরস্কার স্বরূপ ধোয়ী কবি ভূমিদান ও অন্যান্য উপঢৌকনও প্রাপ্ত হন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতী রচনা করেন ও সেই

নৃপতিকেই এই শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যের নায়ক বলিয়াছেন। আর জয়দেব তাঁর অমর কাব্য গীতগোবিন্দ দ্বারা রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গীতি বর্ণন করিয়া নৃপতির আনন্দবিধান করেন। তাঁর বৃদ্ধ সভাসদ উমাপতিধর সেনরাজগণের তাম্রশাসনের প্রশস্তি লেখক। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীহর্ষ কনৌজের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সভায় থাকিয়া তাঁর নৈষধ চরিত কাব্য লেখেন। গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চন্দ্র বা ইতিহাসবিশ্রুত ভারত কুলাঙ্গার জয়চাঁদ তাঁর মাসতুত ভাই পৃথ্বীরাজের বিরোধিতা করিয়া মহম্মদ গোরীকে ভারতে আনয়ন করেন, আর ভারত মাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়া দেন। পৃথ্বীরাজের সভা কবি চাঁদবরদাই তাঁর পৃথ্বীরাজরাসোতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও শ্রীহর্ষের নৈষধের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ভারতে বিদেশ হইতে কতজাতি আসিয়া হিন্দু জাতির মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। হিন্দু তাদের সকলকেই আপনার বিশাল অঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছে। ইহার বিশেষ গূঢ় কারণ ব্রাহ্মণজাতির বশ্যতা স্বীকার করা। তখনকার ব্রাহ্মণও উদার প্রকৃতির ছিলেন, তাঁরা কোন জাতিকেই ঘৃণা করিতেন না—তাঁরা গুণের পূজা করিতেন তাই গর্গ মুনির এই প্রাচীন বচন শুনা যায়—"ম্লেচ্ছাহি মবনা স্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতং। ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্বেদবিদ্ দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ যবনগণ (বাবীল বাসী বা গ্রীকজাতি) অনাচারী অস্পষ্টভাষী ম্লেচ্ছ, কিন্তু তাদের মধ্যে ফলিত জ্যোতিষ বেশ প্রচলিত সুতরাং তারাও ঋষির ন্যায় পূজ্য হতে পারে, বেদজ্ঞানী ব্রাহ্মণ যে পূজ্য হবেন তার কথাই নাই।

কিন্তু পারসীক উপনিবেশকগণের নগার্জ্জুনীয়গণই ভারতের আর্য্যঋষিগণের এই সনাতন নির্ম্মল ধারায় আবিলতা আনিয়া উহা নষ্ট করিয়া দেন—তাঁরা আর্য্য ঋষি বংশীয় গণের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া স্বয়ং ঋষিমন্য হইবার চেষ্টার নিমিত্ত আর্য্যশাস্ত্র কলুষিত করিতে আরম্ভ করেন আর তাঁহাদের স্বদেশী রাজগণের শাসন সময়ে তাহা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। ভগবান বুদ্ধদেবের শাক্য বংশও ভারতের উপনিবেশক। তাঁরা চীন-দেশ হতে প্রথমে শাক দ্বীপ * বা প্রাচীন বর্মায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারপর নেপাল তরাইর কপিলাবস্তুতে উপনিবিষ্ট হন। তারপর ক্রমে ইঁহারা ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। অথচ বিবাহাদিতে মনুমত প্রতিপালিত না হইয়া তাঁদের পূর্ব্ব দেশেরই আচার অনুবর্ত্তিত হইত—স্বগোত্রে বা স্ববংশেও স্বভগিনীকে বিবাহই তাঁদের দেশাচার ছিল—শুনা যায় বর্মায় রাজগণ স্বভগিনীকে বিবাহ করিতেন—সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস পালিমহাবংশে দেখা যায় সীতাদেবী দশরথের কন্যা ভ্রাতা রামচন্দ্রকে বিবাহ করেন!!! ইহাতে বেশ বোধ হয় ভারতের পরম্পরাগত কিম্বদন্তী সমন্ধে ইঁহারা যেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন

* শাক শব্দের অর্থ সেগুণ গাছ। বর্মায় সেগুণ গাছ যদৃচ্ছায় স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয় এই কারণে ঋষিগণ উহাকে শাক দ্বীপ নামে অভিহিত করিতেন।

তেমনি সমাজিক প্রথা সমন্ধেও অজ্ঞ ছিলেন। ইঁহারা ঋষি হইতে চান্ নাই, তাই ভারতের অপকার করেন নাই। কায়স্থগণও ভারতের উপনিবেশক। চীনদেশের কাইথিয়া Scythia নামক প্রদেশের কোন নৃপতি ভারতে অভিযান করেন। তাঁর মৃত্যুর পর কায়স্থগণ রাজজাতি বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণের লেখক রূপে নিয়োজিত হন। শাস্ত্রে (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি) তাঁদের অত্যাচার হইতে রাজার প্রতি প্রজাকে রক্ষার উপদেশ আছে। ভারতে শক জাতির যে শেষ অভিযান হয়, তখন হইতে শক সেনা নামক কায়স্থগণের উৎপত্তি হয়। ভারতের আধুনিক সামাজিক প্রথা অনুসারে শক সেনাগণ কায়স্থ সমাজে হীন পদবীতে আসীন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তাহা নন—ভারতের সার্ব্বজনিক প্রশস্ততা তখন সঙ্কীর্ণভাবে পরিণত হইতেছিল, তাই তাঁহারা তদানীন্তন কায়স্থ সমাজে অপাংক্তেয় হন। এইরূপে পরবর্ত্তী পারসীক উপনিবেশক গণও প্রাচীন উপনিবেশকগণের সহিত একাঙ্গ হইতে পারেন নাই। শুনা যায় সঞ্জানের রাজা যাদবরাণা ৭১৬খ্রীষ্টাব্দে আরব অত্যাচারে বিতাড়িত পারসীকগণকে থানার উপকূলে বাসের স্থান দান করেন এবং তাঁহাদের গোবধ হইতে বিরত থাকিতে আদেশ করেন। ইঁহারা সংস্কৃত শ্লোকে রাজ সমীপে যে আবেদন করেন তার ধুয়াতে আপনাদের শৌর্য্যবীর্য্য ধীরতা ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন "গৌরাবীরা সুধীরা বহুবলনিলয়াস্তেবয়ং পারসীকা"।

মগধের শিশু নাগবংশীয় রাজগণও চীনদেশীয় উপনিবেশক। ইঁহারা এবং অন্য অন্য উপনিবেশকগণ কেহই ভারতের অপকার করেন নাই। কারণ ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাঁদের সদুপদেশে আপনাদের নিয়ন্ত্রিত (disiplined) করেন।

বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। যখন হিন্দুনৃপতিগণ শাসন করিতেন তখনকার বঙ্গীয় লেখকগণ যেমন উদার মত পোষণ করিতেন তেমনি তাহা রচনায়ও পরিস্ফুট করিতেন। কিন্তু মুসলমানের শাসনকালে যখন দ্রবিড়-প্রভাব বঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইল তখন দেবদেবীর প্রতি দ্বেষ হিংসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরস্পরের মধ্যেও উহা সংক্রামিত হইল। জীবগোস্বামী ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের রচয়িতা। ষট্সন্দর্ভে তিনি কালীর নিন্দা করিয়াছেন। তাই বৈষ্ণবগণ মধ্যে দ্বেষহিংসা সংক্রামিত হয়। তাঁরা কালী নাম উচ্চারণ করিতেন না, বিল্বপত্র বা জবাপুষ্প বলিতেন না। চৈতন্যদেবের মনে এরূপ পাপ ভাব ছিল না। কিন্তু বঙ্গদেশ আর্য্যবর্ত্তের অন্তর্গত পুণ্যভূমি। কবিকঙ্কণ রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র কমলাকান্ত দাশরথী প্রভৃতি লেখকগণ সেই দ্বেষহিংসা রহিত করিয়া দিয়া সকল দেবের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া দেন। বঙ্গদেশ আপনার গন্তব্যপথ স্বয়ং নির্দ্দেশ করুক। শাস্ত্রসম্বন্ধে ঋষিগণের উদার মত রাখিয়া অনুদার কলুষিত মতগুলি নিষ্কাশিত করিয়া দিয়া পূজ্য ঋষিগণের প্রতি আরোপিত কালিমা মুছিয়া দিয়া তাঁদের সম্মান ও বিমলজ্যোতি পুনঃ জগতের সম্মুখে স্থাপিত করুক—ইহা দেশহিতৈষী মাত্রেই দেখিতে ইচ্ছা করেন।

পূর্ব্বলিখিত অংশ দ্বারা বেশ প্রকাশিত হইল যে জৈনবৌদ্ধের ইতিবৃত্তের অন্তরালে মহাদুষ্কর্ম্মান্বিত একটী বিদেশীয় উপনিবেশক জাতির গূঢ় ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহারাই ভারতবর্ষে নানাপ্রকার অনাচার দুর্নীতি আনিয়া ও শাস্ত্রাদি কলুষিত করিয়া দিয়া ভারতের পরাধীনতা আনয়ন করিয়াছে। শাস্ত্রে যেইস্থানে অনুদার বিরুদ্ধ মত দৃষ্ট হইবে তাহা এঁদেরই কার্য্য বলিয়া নিশ্চিত করিবে। এবং পবিত্র শাস্ত্র অঙ্গ হইতে সেই সেই অংশ সম্মার্জ্জনীর নির্ম্মম কঠোর আঘাতে মার্জ্জিত করিয়া তাহার পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা সকলের কর্ত্তব্য।

ভারতের তামিল তেলেগু কানাড়ীভাষী দাক্ষিণাত্যগণ আপনাকে অন্ধ্র বা দ্রবিড় বলেন। স্কন্দপুরাণে ব্রাহ্মণের যে বিভাগ দেওয়া আছে তাতে আর্য্যাবর্ত্তবাসীগণ পঞ্চগৌড় ও দাক্ষিণাত্য-গণ পঞ্চদ্রবিড় বলিয়া কথিত হইয়াছেন। পঞ্চগৌড়ের মধ্যে সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় মৈথিল উৎকলের নির্দ্দেশ আছে, আর পঞ্চ দ্রাবিড়ের মধ্যে কলিঙ্গ অন্ধ্রদ্রবিড় গুর্জ্জর ও রাষ্ট্রবাসীর উল্লেখ দেখা যায়। এ নির্দ্দেশ যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। কারণ আর্য্যভাষা-ভাষী গুর্জ্জর ও মহারাষ্ট্রগণ দ্রবিড়বংশ সম্ভূত নহেন।—তাঁরা আর্য্যাবর্ত্তে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় প্রথমে সৌরাষ্ট্র পরে মহারাষ্ট্রে গিয়া বসবাস করেন, অথবা প্রাচীন রাজগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া তৎতৎ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অধিক সম্ভব রামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ের পর মহারাষ্ট্রদেশ আর্য্যনিবাসের উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয়। কারণ আর্য্যাবর্ত্তের নৃপতিগণ সৈন্যের যোদ্ধা ও নগররক্ষক প্রহরী নির্ভীক দুঃসাহসিক মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে হইতেই নির্ব্বাচিত করিতেন—মৃচ্ছকটীকের চন্দনক আর্য্যক শর্ব্বিলক মহারাষ্ট্রীয় বলিয়াই বোধ হন। পাণিনির বার্ত্তিকার কাত্যায়ন মুনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তবে দ্রবিড় ও অন্ধ্ররাজগণের অভ্যুদয়কালে রাজগণের সামাজিকপ্রথা বলবতী হওয়ায় ইঁহারাও মনুনিষিদ্ধ মাতুলীকন্যা বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন।

মৈথিল সব আর্য্যবংশীয় নহেন। তাঁরা অধিকাংশ দ্রবিড় বংশীয়—আর্য্যঋষিবংশীয় অল্পই আছেন। মনুর স্বতন্ত্র নামে টীকাকার উপাধ্যায় অথর্ব্ববেদকে ত্রয়ীবাহ্যগ্রন্থ বলিয়াছেন ও অথর্ব্ববেদীগণকে অভিচার-সেবী পাপিষ্ঠ বলিয়াছেন। মেধাতিথি এঁর সমকালবর্ত্তী লেখক, এঁর কথার কোথাও খণ্ডন কোথাও মণ্ডন করিয়াছেন। ইনি আর্য্যঋষি বংশীয় বলিয়াই বোধ হন। অচ্যুত উপাধ্যায় অমরকোষের সর্ব্বস্বনামা প্রাচীন টীকাকার। ইনি ও মনুটীকাকার এক ও অভিন্ন কি না জানিবার উপায় নাই। কারণ এঁদের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য বা লুপ্ত হইয়াছে। এঁর পরে মিথিলার উপাধ্যায় উপাধি-ধারী টীকাকার ও গ্রন্থ লেখকগণ সব দ্রবিড়বংশীয়। গঙ্গেশ উপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্র বিদ্যাপতি এঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ নান্যদেবের সহিত কর্ণাট হইতে মিথিলায় আগমন করেন। দ্রবিড় প্রভাবের সূত্রপাত হইলে মিথিলার ৫।৬ ঘর আর্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশের শ্রীহট্টে আসিয়া বাস করেন।

এঁদেরই একজনের বংশে বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও আর একজনের কুলে নদের দুলাল চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের ভরদ্বাজবংশ লুপ্ত হইয়াছে! রঘুনাথ বিবাহ করেন নাই তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরের কাত্যায়ন বংশ আছে। ন্যায়ের শেষ পরীক্ষা ও উপাধি অর্জ্জন করিতে হইলে মিথিলায় অধ্যয়ন করিতে হইত। তথায় উপাধ্যায়গণ মহা অনাচার প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন—পাঠ শেষে গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে ছাত্রদের কোন গ্রন্থের প্রতিলিপি আনিতে দিতেন না—ইহা আর্য্যঋষিগণের গুরু শিষ্য পরম্পরাগত প্রথা নহে—ইহা কুটিল কপটহৃদয় ব্যক্তিগণের কাজ। ছাত্রগণের প্রতি দুর্ব্যবহার ও অপমান নিবারণার্থে রঘুনাথ ন্যায়সূত্রের গঙ্গেশ উপাধ্যায়কৃত সমস্ত টীকা কণ্ঠস্থ করিয়া লন এবং পক্ষধর মিশ্রের নিকট বিদায় লইয়া নদে আসিয়া তাহাই গ্রন্থাকারে লিখিয়া ফেলেন। তারপর নবদ্বীপেই ন্যায়ের টোল খুলিয়া ন্যায়ের শিক্ষা ও উপাধি দিতে আরম্ভ করেন—এরূপে মৈথিলগণের কৃত অপমান তাঁদের সুদে আসলে প্রত্যর্পণ করিয়া দেন।

মিথিলায় শ্রোত্রিয় ও মৈথিল দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। শ্রোত্রিয় আর্য্য ঋষিবংশীয় ও মৈথিল বিদেশীয় উপনিবেশকগণের বংশে উৎপন্ন ব্যক্তি। উভয়ের মধ্যে বিবাহ বা আহার আদির প্রথা নাই। শ্রোত্রিয়গণ নিঃস্ব হইলেও মৈথিলগণের সম্মানভাজন। শ্রোত্রিয়গণ নান্যদেবের অভিলষিত ভূমিদান গ্রহণ স্বীকার করেন নাই। তাই তিনি উহা মৈথিলদের দান করেন—মিথিলার উপাধ্যায়গণ তাঁর শাসনভোগী ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। দ্বার বঙ্গের রাজা এই মৈথিলবংশীয় বিহার বেথিয়া মুজঃফারপুর প্রভৃতি স্থানের ভুঁইহারগণ এই মৈথিলবংশীয়। বিহারে চিকিৎসক ব্রাহ্মণ আছেন তাঁরা পারসীক উপনিবেশকগণের বংশে উৎপন্ন হইলেও সকলকেই শাকলদ্বীপী বলিয়া পরিচয় দেন। বিগ্রহপালের রাজ চিকিৎসক চক্রপাণি দত্ত গ্রন্থশেষে মাধবকর ও বৃন্দের সহিত আপনাকে "ত্রিভট্টে"র মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ইনিও এই শাকলদ্বীপী ব্রাহ্মণ। বোপদেবও আপনাকে কেশব ভিষকের পুত্র বলিয়াছেন। তিনিও এই শাকলদ্বীপী বা দ্রবিড় ব্রাহ্মণ। বঙ্গদেশে অধুনা বৈদ্য অনেকই ভট্টশর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে আর্য্যঋষিবংশীয় ব্রাহ্মণগণের ক্ষোভের কোন কারণ নাই। ভারতের সর্ব্বত্র চিকিৎসকগণ শাকলদ্বীপী আর শাকলদ্বীপীগণ সকলেই দ্রবিড় বংশীয়। তাঁরা যদি অন্যত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনার পরিচয় দেন, তাহ'লে বঙ্গদেশের সে চেষ্টায় ব্রাহ্মণ ও অন্য জাতির বিচলিত হইবার বিশেষ কারণ ত দেখা যাইতেছে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ সমাজে শাকলদ্বীপীর হীন পদ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই কারণে সেখানকার ভাল ব্রাহ্মণগণ কোথাও কোথাও চিকিৎসা ব্যবসায় করেন কিন্তু তাঁরা আমাদের বঙ্গদেশের বৈদ্যগণের ন্যায় সংস্কৃতজ্ঞ ও বৈদ্যকশাস্ত্রে পারদর্শী নহেন—ইহাই বঙ্গের

বৈদ্যগণের বৈশিষ্ট্য। পঞ্জাবে তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হন—গৌড়, সারস্বত ও গৌড় সারস্বত। গৌড় খাঁটী আর্য্যঋষিবংশধর, সারস্বত পারসীক উপনিবেশকগণের বংশে উৎপন্ন, আর গৌড়-সারস্বত উভয়ের সঙ্করে উদ্ভুত।

ভারতীয় জাতি রহস্যের ইহাই যথার্থ তত্ত্ব। ইহা অবগত হইয়া যাহার যেরূপ অভিলাষ হয় সমাজের সম্মান ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি সেইরূপ আদান প্রদান করিতে পারেন।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী

"আন'ল হক্"*

মান্‌ব না আর নিয়ম-বাঁধন যুগ-নিগড়ের মিথ্যা মায়ার কারা!
—চিত্ত দোলে মুক্ত, তন্দ্রাহারা!
ব্যর্থ আজি ব্যর্থ আজি অত্যাচারীর রক্ত বিভীষিকা—
সর্ব্বনাশের উল্লাসে প্রাণ অই জ্বেলেছে মুক্তি-হোমের শিখা!
ধর্ম্ম, সমাজ, পুণ্য, পাপ আজ সব থরথর লুপ্ত একাকার;
মিথ্যা-চাপের অন্তরালে, সত্য-বেদন ধুঁক্‌ছে দুনিয়ার!
ধ্বংস-নিশান কাঁপছে থরথর,—
আজ প্রলয়ের মাতন উতাল পায়ের তলে পৃথ্বী জড়সড়!

আর কতদিন? আর কতদিন? অত্যাচারীর তৃষ্ণা-কৃপাণ-তলে;—
রক্ত বুকের ঢাল্‌বে পলে পলে!
গুমরে গেছে চিন্তা সকল, মুষড়ে গেছে প্রাণের ইতিহাস,—
শাসন-চাপের অন্তরালে ধ্বংসমুখে মর্ম্ম-কলভাষ!

* ইস্‌লামের 'সুফীপন্থা'র সঙ্গে মনীষী মনসুর অল্‌-হলাজের কাহিনী অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। এই মহামতি মহাপুরুষকে পারস্যের আব্বাসিদ রাজত্বের সময়ে অল্‌-মুক্তাদির-এর রাজ্যকালে ৯২১ খৃষ্টাব্দে অতি নৃশংস ভাবে জীবন্ত ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। দোষ—তিনি বলিয়াছেন, "আন'ল হক্" (আমি সত্য—'সোঽহং।') এই উচ্চাঙ্গের সাধক মহাপুরুষের ভারতের বেদান্ত-তথ্যের সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় ছিল। এই অত্যাচারে সর্ব্বত্র বিশেষ সাড়া পড়িয়া যায়, সুফী কবি, ফরিদুদ্দিন আত্তার, হাফেজ প্রভৃতি এই গাথাকে ছন্দে অমর করিয়াছেন। এক স্থলে হাফেজ গাহিয়াছেন;

"কসদ্ নফ্‌স-ই 'আন'ল হক্' বর্ জমিন্ খুন্।
চু মনসুর্ অর্ কফি বর্ দার-অম্ ইম্‌সব্।"

[যদি আজ রাত্রেই মনসুরের মত আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ কর তবে আমার রক্ত মাটিতে পড়িয়াও 'আন'ল হক্' এই কথা লিখিবে।]—লেখক।

পাষাণ-চাপা—পাষাণ-চাপা, থম্‌কে গেছে শিরার রক্ত চলা!
সবার পায়ে নুইয়ে মাথা, শেষ হয়েছে সত্য কথা বলা!
অই পাষাণের রুদ্ধ করা প্রাণ,—
অগ্নি-গিরির উল্কাজ্বালা, টাল্‌বে ধরা আজ যে কম্পমান!

ফাঁসী? জেলে? দ্বীপান্তরে?—আর কতকাল অত্যাচারের ভয়?
—কণ্ঠ চেপে ধরলে কি আর হয়!
আজ মানি না ফাঁসির দড়ি, আজ মানি না জীবনভরা জেল!—
মিথ্যা দেখাও সম্মুখে মোর, অনাহারের বজ্র-দহন শেল!
'হক্' কথা ঠিক বল্‌ব জোরে, কার তোয়াক্কা আজকে আবার রাখি?
চাপের তাপে মেল্‌ছে হের—লক্ষযুগের সুপ্তিমৃত আঁখি!
—আজ জীবনের বিরাট অভিযান!
যুগ-নিগড়ের বক্ষ হ'তে রুদ্রদেবের প্রলয় মহীয়ান্!

মিথ্যা দিয়ে যায় কি ঢাকা বিশ্বদেবের সৃষ্টি মহাভাষ?
—শিশুদেবের বিরাট ইতিহাস!
ফাঁসির চাপে রক্ত আমার পড়বে যেথা উল্কা সম ঝরে'—
রাখ্‌বে লিখে স্বর্ণাখরে তপ্ত মাটীর বক্ষ উতাল করে';—
সত্য আমি, নিত্য আমি, মুক্ত আমি, শাশ্বত মোর প্রাণ!
মারবে যত, বাড়বে তত, জাগবে তত প্রলয় ব্যথার গান!
—বৃথাই তোমার কণ্ঠ-রোধের আশা!
মৃত্যু-পাগল প্রাণের কাছে জাগ্‌ছে কোন আর সুখ-বোধনের ভাষা!

সিন্ধু যখন তপ্ত উতাল, বিষুবীয়স মত্ত উতরোল!
—রুধ্‌বে কে তার উন্মাদনার দোল!
চাপ্‌বে ভাষা? পিষবে দেহ? শক্তি কোথায়, শক্তি কোথায় আছে?—
মিথ্যা সকল শক্তিপরখ তৃষ্ণা-ব্যাকুল মুক্তিকামীর কাছে!
রুধ্‌বে কে রে তৃষ্ণা মরুর? মানব মনের সুপ্ত দাবানল—
অত্যাচারী! থম্‌কে দাঁড়াও মিথ্যা তোমার রক্ত-আঁখির ছল!
—যে কালানল জ্বল্‌ছে পরাণময়!—
মুষড়ে দিবে—ধ্বংসি যাবে—জয় জগতের সত্যব্রতে জয়!

ফাঁসীর কাঠে রক্ত যাদের, কণ্ঠ ঘুরে মরছে হাহাশ্বাসে—
—আজ যে তাদের রক্ত প্রাণের পাশে!
নোয়নিকো শির যাদের কভু, সত্য কথা বল্‌তে নাহি ভয়!
জান্‌ দেছে, মান্‌ দেয়নি তবু, মৃত্যু নুয়ে মান্‌ছে পরাজয়!
রক্ত তাদের ছড়িয়ে হারা, ছিট্‌কে পড়ে আলোর ধারার মত—
রাঙ্গিয়ে দেছে, ফুটিয়ে দেছে, মানব মনের কমল অবিরত!
—মৃত্যু-ভয়ে থাম্‌বে না আর কথা!
দাও রেখে আজ নিষেধ-বাঁধন, শাস্ত্রবাঁধের যুক্তি কুটিলতা!

বুঝ্‌ছ নাকি? জান্‌ছ নাকি? বলির খুনে রক্ত-কমল দোলে!
—কাল বোশেখীর ঝঞ্ঝা উতরোলে!
রক্ত যত বাড়বে তত শক্তি প্রাণের বাড়বে চিরন্তন!
ছিন্নমস্তা রক্তধারে করছে নিতি শক্তি উদ্বোধন!
রুদ্ধকণ্ঠ, মৃত্যুমাঝে, নিঃশেষিয়া ছড়ায় হাহাশ্বাস—
জ্বালায় ধরা—মাতায় ধরা এম্নি প্রাণের রুদ্ধ অভিলাষ!
গুলিয়ে উঠে অযুত প্রভঞ্জন—
শিব ছেড়েছেন মদন-মোহে ধ্বক্‌ধ্বকিয়ে উঠ্‌ছে ত্রিনয়ন!

মান্‌ব না আর নিয়ম-বিধি, কিসের ভয় আজ? কারেই বা আর ভয়?
—কণ্ঠ চেপে ধরলে কি আর হয়?
রক্তকেতন অই উড়েছে, 'মৈ ভুখা হুঁ' তৃষ্ণা একী দেশে!
সত্য-তৃষা, চিত্ত-তৃষা, পরাজয়ের গ্লানি ধারায় মেশে!
দাও ফাঁসি দাও, কিম্বা জেলে, অনাহারে, কিম্বা দীপান্তর!
নাচ্‌বে শুধু রক্ত আমার, জাগ্‌বে প্রলয় চিত্তে ভয়ঙ্কর!
—জয় জগতের সত্যব্রতে জয়!
কে মানে আর নিয়ম-বিধি? কে করে আর ফাঁসি-কাঠের ভয়?

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রজাপতির দৌত্য

পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর

(১৫)

ব্রজকিশোরের শরীর ধীরে ধীরে কেমন অসুস্থ হইয়া পড়িতেছিল। ডাক্তার-বৈদ্যে কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না। হাত-পা শীর্ণ, মুখে স্বাস্থ্যের জৌলুষ নাই। বেশী কথা কহেন না, কারণে অকারণে রাগ হইয়া পড়ে। শরীরের দিকে নজর নাই, সকল বিষয়ে অসীম বৈরাগ্য। শরীর সম্পর্কে কেহ কিছু বলিলে, একটু হাসিয়া বলেন, আর কি, চিরদিন বেঁচে থাক্‌বো ? যাবার সময় হচ্চে ; তারি ডাক !

কমলিনী ভয় পায়। নিরলম্ব জীবনে পিতার অবর্ত্তমান যে তাহার কাছে অসহ্য ; সে-কথা কল্পনা করিতে তাহার ত্রাস হয়, হাত-পা শিথিল হইয়া আসে, বুকের মধ্যে দুর্-দুর্ করে।

ব্রজকিশোরকে কিছু না বলিয়া নন্দকে আসিতে লেখা তাহার পক্ষে একটা অতিমাত্র দুঃসাহসের কাজ ; তাই সে করিয়া ফেলিয়া, ভয়ে মরে। বাবা কত না রাগ করিবেন।

রাগ হয়তো ব্রজকিশোর করিতেনও কিন্তু নন্দ চমৎকার সামলাইয়া লইল। সে বলিল, তোমাদের দেখ্‌তে কেমন-যেন ইচ্ছা হ'লো, অনেকদিন বাড়ি আসিনি কিনা ?

ব্রজকিশোর নন্দর কথা শুনিয়া হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। নন্দর প্রতি কৃতজ্ঞতায় কমলিনীর চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল।

হাসিতে কুঁদ ফুলের মত ছোট ছোট দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িল তাহার, কমলিনী বলিল, কি বুদ্ধি তোর, মাইরি ! আমার চিঠির কথা বল্‌তিস্ তো, সর্ব্বনাশ !......সত্যি নন্দ, বাবার ভারি রাগ হয়েছে, আজকাল......তুই জানিস্ নি।

নন্দ ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া দিবার জন্য বলিল, শরীর খারাপ হ'লে অমনি সবারই হয়,—ও-কিছু নয়, একটু খিট্-খিটে হ'য়েছেন......

কমলিনী মনে অনেকখানি সাহস পাইল, বলিল, তা হবে,—তুই বি এ প'ড়ে...ক'লকেতায় গিয়ে অনেক শিখেচিস্......

নন্দ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, তুইও কম নোস্ ছোড়দি,—তুই আবার আমার বিদ্যে মাপিস্......

দুই ভাই বোন আনন্দে হাসিতে লাগিল।

পর্বের পরামর্শমত নন্দ ব্রজকিশোরের আহারের সময় উপস্থিত রহিল।

সত্যই আহারে সে রুচি নাই, স্পৃহা নাই। খাওয়ার শেষা-শেষি নন্দ বলিল, বাবা, একবার ক'লকেতা গেলে হয় না ?

দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ?

প্রশ্নের ভঙ্গীতেই নন্দ অনেকখানি দমিয়া গিয়া বলিল, সেখেনে বড় ডাক্তার কবিরাজ আছেন......শরীরটাতো ভাল যাচ্চে না......একবার দেখিয়ে এলে......

নন্দের সব কথা শেষ না হইতেই ব্রজকিশোর একটি সংক্ষিপ্ত হুঁ দিয়া যেন বলিলেন, হয়েছে, আর বল্‌তে হবে না।

খানিকটা পরে বলিলেন, শক্তি-সামর্থ্য থাক্‌তে থাক্‌তেই চ'লে যাওয়া ভাল রে, চিরদিন মানুষতো বেঁচে থাক্‌তে আসেনি এই পৃথিবীতে......

নন্দ এই কথার জন্য কতকটা প্রস্তুতই ছিল, সে বলিল, কিন্তু তাই ব'লে শরীরকে অবহেলা ক'রে আয়ু কমিয়ে আনার অধিকার মানুষের নেই।

ব্রজকিশোর হাসিলেন, কৈ ? আমিতো একটু শরীরের অবহেলা করিনে !

নন্দ কহিল, শরীর অপটু হ'লে তার বিধিমত ব্যবস্থা করা উচিত তো।

তাতো উচিতই, বলিয়া ব্রজকিশোর কমলিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি শরীরের অবহেলা করি ?

কমলিনী বলিল, তা' না ক'রলেও আগের মত আর খেতে পার না, তুমি বাবা, কত রোগা হয়ে গেছ দেখতো, বাবা ! বলিয়া সে তাঁহার ছবির দিকে হাত দিয়া দেখাইল।

ব্রজকিশোর হাসিলেন, ওটা যে আমার কম বয়সের ছবি, অমনিই কি চিরকাল থাক্‌বো ? এখন বয়স হচ্চে যে, মা !

কমলিনী এবার আনন্দের সুরে বলিল, তা হবে না, বাবা, তুমি একবার গিয়ে ভাল ডাক্তার-বদ্যি দেখিয়ে এসো গে !

আমাদের যাওয়া কি অত সোজা মা ? সতেরো লেঠা ; কে রেঁধে-বেড়ে দেয়, কে কি করে ? ব্রজকিশোর বলিলেন।

তবে আমাকেও নিয়ে চল সঙ্গে। দিদির সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে আমার। বলিয়া কমলিনী একটু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

সেকি হয় ?—ব্রজকিশোর বলিলেন, ওদের ছোট বাসা, ওরাই বা থাকে কোথায়, আমরাই বা থাকি কোথায়। নানান্ হাঙ্গাম, ওতেই আমার শরীর আরো খারাপ হবে।...... সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করার কোন দরকার দেখ্‌ছিনে ;......শরীর ব্যাপার জোয়ার-ভাঁটার মতো, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেরে উঠ্‌বো ; আর ডাক্তারেরাও তো বলে যে বুড়ো বয়সে মোটা হওয়াটা কিছুই নয়।

কমলিনী এবং নন্দ ভাল করিয়া জানিত যে একটা কথা বেশী ঘাঁটাইয়া তুলিলে ব্রজকিশোরের কাছে তাহার উল্টা ফল হয়। তাই তাহারা চুপ করিয়া গেল।

তিনি নিজেই হয়তো দুই পাঁচ দিন ধীর ভাবে সকল কথা আলোচনা করিয়া মতের পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন, এ আশাও একটা ছিল।

কিন্তু দুই পাঁচ দিনের মধ্যে সেইরূপ মত-পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন নন্দকে কমলিনী কহিল, নন্দ, মনে করেছিলুম, তুই বাবাকে মত করে ক'লকাতা নিয়ে যেতে পারবি; কিন্তু তাতো দেখচি হয় না; এখন কি করবি বলতো?

নন্দ বলিল, জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাবার মানুষ তো নন্, না হয় আর একদিন বলি।

কমলিনী মাথা নাড়িল; না, না, বল্লে উল্টো হবে, নন্দ; এ আমাদের কাজ নয়; ওঁর সঙ্গে, এক পারে শুধু দিদি। আয় দুজনে মিলে তাকে আস্‌তে একটা চিঠি লিখে দি ....

কমলিনীর কথা শেষ না হইতেই নন্দ উৎসাহে প্রায় নাচিয়া উঠিল, ঠিক্ ঠিক্, ঠিক বলেছিস্ কিন্তু তুই, ছোড়দি; বড়দি, উঃ সে বাবাকে রীতিমত ধমক দেয়! হাঁ, সেই ঠিক হবে।

কমলিনী শান্ত দুই চক্ষে নন্দর উল্লাস এবং উৎসাহ দেখিতেছিল। তাহার মৃদু হাস্য থামাইয়া সে বলিল, কিন্তু......

নন্দ ফিরিয়া বলিল, নাঃ এতে আর কিন্তু নেই কিছু, ছোড়দি, এইটেই বেষ্ট্ প্ল্যান্......

ইংরাজী না জানিলেও এই সকল ছোট-খাট কথা কমলিনী বুঝিত, তাই সে বলিল, তবুও আমার কথাটা শুনেই নেনা ভাই......

কি? বলিয়া নন্দ শুনিবার জন্য অবহিত হইল।

দিদিকে চিঠি দিলেই সে এসে পড়বে, এটা ঠিক; কিন্তু বাবা যে তাতে ভারি বিরক্ত হবেন......

নন্দ বলিল, যাঃ ওসব বাজে; আমি ওসব মানিনে .....রেখে দে তোর বিলেৎ ফেরৎ ......ও সব......

কমলিনী গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি মাননা, তা আমি জানি নন্দ, আর মনে মনে তার জন্যে মনে কত আরাম পাই; সত্যি, তুইও যদি দিদির বাড়ি ঐ ছলে না যেতিস্ তো কি বিশ্রী হ'তো বল্‌তো? কিন্তু ভাই, বাবার যেন একটা অন্তরের বিশ্বাস যে ওটা মহাপাপ...

নন্দ মাথা নেড়ে বল্লে, বুঝেছি, বুঝেছি, ওকেই ইংরিজিতে কি বলে জানিস্, ছোড়দি?

তা জেনে লাভ হবে কি ? বলিয়া কমলিনী হাসিল।

নন্দ এবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, না তাই বলছিলুম……

কমলিনী আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, একেই তো বাবার শরীর খারাপ, তার উপর তাঁকে উত্যক্ত ক'রে তোলা……তাই ভাবি!

নন্দ বলিল, কিন্তু উপায়ও আর দেখিনে……

কমলিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, একটা কাজ হ'লে, বাবা এক্ষুণি নিজের ঝোঁকেই চ'লে যেতেন কলকেতায়……বলিয়া সে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

নন্দ বুঝিল, বুঝিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলিল, তোদের আর ঘুম হ'চ্চে না……

হচ্চেই না তো, নন্দ!

নন্দ বলিল, যাক্ ও বাজে কথায় লাভ নেই,……কথায় বলে না ? গাছে কাঁটাল!……

তাই বই কি ? বলিয়া কমলিনী হাসিল, তুই পাশ করলে, দেখিস্, এ বছর আমি অম্‌নি যেতে দেব ?

পাশ কর্‌লে তো ? সে গুড়ে বালি।

ছিঃ, অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আন্‌তে নেই।

ভাই-বোনে বহু পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে বিনোদিনীকে পত্র দেওয়াই একমাত্র উপায়। অতএব নন্দ এবং কমলিনী দুইজনেই তাহাকে অবিলম্বে আসিবার পত্র দিয়া সেইদিন চিঠি ডাকে দিয়া প্রত্যহই বড়দিদির আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু না আসিল উত্তর, না আসিলেন বড়দিদি, দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ যে কাটিয়া যায়।

(১৬)

একদিন প্রভাতে ভবেশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বিনোদিনী আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে ব্রজকিশোর উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বিনোদিনীকে তিনি কতকাল দেখেন নাই। বিনোদিনী দেখিতে তাহার মার মতই, কথা-বার্ত্তায়, গৃহিণীপনায় তাহার ঢংটি হুবহু জননীর অনুরূপ! স্নেহ-বিগলিত সবাষ্প-চক্ষে ব্রজ-কিশোর অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিয়া আর সব কথা ক্ষণিকের জন্য বিস্মৃত হইলেন।

কিন্তু বিনোদিনী তাহা বেশীক্ষণ ভুলিয়া থাকিতে দিল না। সে তাহার চিরন্তনের অনুযোগটি যথা সময়ে হাজির করিল। পিতা অখণ্ড-প্রতাপ জমিদার, তাঁহার আবার সমাজ-প্রতিবেশীর কি ভয় ?

ব্রজকিশোরও জানিতেন যে, সেদিকের ভয়টা তেমন সমূহ না হইতে পারে; কিন্তু—; সে-কথা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিতে চাহিতেন না।

অহরহ নিকটে থাকিয়া কমলিনী তাহা অনুভূতির মত উপলব্ধি করিয়াছিল। মানুষের ইহকালের সব-কিছু হইলেই অনেক লেঠা চোকে বটে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারটাত নিবিড় অন্ধকারে ভবিষ্যতের গুহা-জঠরের মধ্যেই নিহিত!

কিন্তু সে কথা তো বলা চলে না, তাই সমাজ এবং প্রতিবেশীর আড়ালে তাহাকে গোপন করিয়া রাখিতে হয়।

অবশেষে ব্রজ-কিশোর উত্তর দিলেন, বুঝেচিস্ বিনু, কোন্ বাপ্ না সে চায়; কিন্তু তুই কি বুঝবি সব কথা?

বিনোদিনী তাহা বুঝিতেও চাহে না।

ভবেশচন্দ্র অত্যন্ত কাজের মানুষ, তাহাকে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে, তাই সে তাগাদা দিতে লাগিল, চল।

বিনোদিনী কিন্তু কিছুতেই বাগ্ মানে না, সে কি হয়, বাবার শরীর ভাল নয়, তাঁকে নিয়ে তবে আমি যেতে পারি।

ভবেশ ব্যস্ত হইয়া উঠে, তবে তাই চল, জানতো, আমার দেরীতে কত ক্ষতি?

বিনোদিনী কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া বলে, তা তোমার পায়েতো কেউ শেকল দিয়ে রাখেনি? যাওনা তুমি।······কে মানা করেছে?

ভবেশ মাথা চুলকাইয়া বলে, তাইতো, এমন জান্‌লে······

বিনোদিনী বলে, তাই কি তুমি জান্‌তে না, নাকি?

কমলিনী সেই ফাঁকে একখানা পিঠা তৈয়ারি করিয়া আনিয়া বলে, খান্ দিকি, মন ঠাণ্ডা হবে, আর উড়ু উড়ু ক'রবে না।

ভবেশ খাইতে খাইতে বলে, আর গেলা ছাড়া কি কাজ বল?

কাজতো অনেক করলেন, এখন দুদিন একটু জিরিয়ে নিন্ না।

কমলিনীর রসিকতা দেখিয়া বিনোদিনী মুখ টিপিয়া হাসে।

হাসো যে? ভবেশ জিজ্ঞাসা ক'রে।

না হেসে কি কাঁদবো নাকি, এযে শক্ত পাল্লা; উঃ আমি দিলে সাতশো বায়না হ'তো; ওগুলো খেলে গলা জ্বালা ক'রে, পেট ফুলে······

তাই নাকি? ভবেশ বলিল, কমল তোমার চেয়ে শক্ত? অনুরোধে মানুষ কি না-গেলে······,

আর আমার বুঝি জবরদস্তি ?

তা নয় ? তোমার এখন গিয়ে সবেই হুকুম চ'লছে ;—তুমি ? এই দেখনা, এক ব'লে আন্‌লে, এখন যাবার নামটি কর না।······ভালো বিপদে পড়্‌লাম দেখ্‌চি ...শুন্‌চো, কাল আমাকে যেতেই হবে......নইলে সে এক বিশ্রী কাণ্ড হবে, বুঝেছ ?

বিনোদিনী শান্ত হইয়া বলিল, বেশ কালই এসো গিয়ে, কিন্তু আজ সব ঠিক হয়ে যাক্‌ ?

কি আবার ঠিক হবে ?

ও-বাড়িটা পাওয়া যাবে না ?

ভবেশ বলিল, যাবে গো যাবে, মেরামত ক'রে চূণ ফিরোতে ক'দিন লাগে ?

বেশ, তুমি গিয়ে চিঠি দিলে, আমি বাবাকে নিয়ে যাবো······বাবাকে বল একবার ?

ভবেশ বলিল, আমি ?

ওমা ! কি আক্কেল তোমাদের, তুমি ব'লবে না ? আর তিনি গিয়ে তোমাদের বাড়িতে উঠ্‌বেন ? তেমনিই পেয়েছ কিনা, ওঁকে ?

ভবেশ এবার একটু অপ্রস্তুত হইল, বলিল, বেশতো আমি এখুনি গিয়ে বলছি তাঁকে, কৈ নন্দ কোথায় গেল ?

একা বুঝি বলা যায় না ? আবার সঙ্গে একজন পোঁ ধরতে হবে ?

নন্দকে পাওয়া গেল না, সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, অগত্যা ভবেশচন্দ্র একাই কর্ত্তার মত করিতে গেলেন, কিন্তু কাজটা তার একান্ত কঠিন বলিয়াই ঠেকিল।

অভ্যাসমত, ব্রজকিশোর ফুল-বাগানের মধ্যেই বসিয়া ছিলেন। চত্বরের চতুর্দ্দিকে বেলফুলের ঝাড়ের মধ্যে মধ্যে রজনীগন্ধার ডাঁটিতে থোকা থোকা স্ফুটনোন্মুখ কুঁড়ি হইতে সবে গন্ধ বাহির হইতে সুরু করিয়াছে, রাত্রেই সেগুলি ফুটিবে। প্রজাপতির দল বেলা যায় দেখিয়া যেন অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রজ-কিশোর ভবেশচন্দ্রকে সস্নেহ আহ্বান করিয়া বসিতে বলিলেন। একথা-ওকথার পরে ভবেশ বলিল, আমাকে কালই যেতে হবে।

ব্রজ-কিশোর বলিলেন, অনেকদিন পরে এসেছো, আশা কচ্ছিলুম, আরো কদিন থেকে যাবে তোমরা······

উত্তরে সে বলিল, আমি একাই যাব, মনে করেছি।

মধ্যে আর কোন ছুটি-ছাটা নেই ?

দিনকুড়িক পরে মহরমের ছুটি আছে······

তবে সে সময় নিশ্চয় এসো।

ভবেশ চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে বলিল, আপনার একবার ওদিকে গেলে ভাল হয় না ?

ব্রজ-কিশোর বুঝিলেন যে নন্দ-কমলিনীর পরামর্শের মধ্যে ভবেশও আছে। তিনি হাসিলেন, হুঁ, দেখছি সবাই তোমরা এক-জোট হয়েছ ; কিন্তু বাবা, বোঝত' আমাদের এ বয়সে, সুস্থ-শরীরকে আর ব্যস্ত ক'রতে মোটেই ভাল লাগে না······

কিন্তু, ভবেশ খুবই বিবেচনা করিয়া বলিল, কিন্তু আপনার শরীরটা তো তেমন ভাল নেই, একবার ভাল ডাক্তার দেখাতে পারলে······

ব্রজ-কিশোর সেই ঔদাসিন্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আর এ বয়সে শরীর ! এখন তো যাবারই সময় হ'লো !

ভবেশ বলিল, সে কথা আপনি ব'লতে পারেন, কিন্তু আমরা শুন্‌বো কেন ? আপনার নিজের প্রয়োজন হয় তো নেই ; কিন্তু আমাদের দরকারে আপনাকে আরো বাঁচ্‌তেই হবে, সে ভাব্‌না-চিন্তা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন্ !

ব্রজ-কিশোর একটু হাসিলেন, দেখো বাপু, তোমাকে মনের কথা বলি, ঐ ক'ল্‌কেতার ঘিঞ্জি আর বরদাস্ত হয় না, এই বয়সে।

সে কথা একশো বার সত্যি, ভবেশ বলিল, আমরা তো আপনাকে গিয়ে সেখেনে বাস করতে বলছি না ?······যাবেন, দু-দশ দিন থাক্‌বেন, ডাক্তার, কি কবিরাজ দেখিয়ে, ফিরে আস্‌বেন।

কিন্তু ঐ মেছোবাজারের বাসায় আমি একদিনও টিঁক্‌তে পারবো না, আর সেই নোংরা রাঁধুনি বামুনের হাতে······

ভবেশ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, কি আশ্চর্য্যি, কে আপনাকে ওখেনে থাকৃতে ব'লেছে —আর আপনি একলাই বা যাবেন কেন ?

তবে ? বলিয়া ব্রজকিশোর ভবেশের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-চোখে চাহিয়া রহিলেন।

ভবেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, না, তা হ'তেই পারে না······সে কি একটা কাজের কথা !

ব্রজকিশোর চাহিয়াই রহিলেন। ভবেশ আবার বলিল, আমাদের ল্যান্সডাউন রোডে বাড়িটা খালি হ'য়েছে, আমি গিয়ে দিন দশেকের মধ্যে—মেরামত করিয়ে, চুণ ফিরিয়ে খবর দেব নন্দকে, তখন যাবেন আপনি সব শুদ্ধ।

আর ভাড়াটে আস্‌বে না ?

দিনকতক ভাড়া বন্ধই থাক্ না। বলিয়া ভবেশ একটু হাসিল।

একান্ত চিন্তাভরে ব্রজ-কিশোর বলিলেন, তাই তো, সেও অনেকগুলো ক'রে টাকা, তোমাদের লোকসান হবে, ন দেবায় ন ধর্ম্মায়······

পিছন হইতে বিনোদিনী কথা কহিল, তা হোক্‌গে বাবা, অত কথা তোমার ভাব্‌তে হবে না। তুমি কোন্ দেবতার চেয়ে ছোট, তোমার থাকা তো আমাদের চিরদিনের সৌভাগ্য, ধর্ম্ম-কর্ম্মের চেয়ে তাই বা কিসে কম হ'লো, জানিনে।

ভবেশের সাম্‌নে বিনোদিনীর মুখরতায় ব্রজ-কিশোর যেন আহত হইলেন।

ভবেশ ধীরে ধীরে অপ্রস্তুতের হাসি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল।

বিনোদিনীর এ-সকল গ্রাহ্যের বস্তুই নয়, এমনি ভাবে সে অটল-গাম্ভীর্য্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

(১৭)

তরুণীর চিত্ত-সরোবরে কমল-কোরকটি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। মানুষের কঠিন-দৃষ্টি তাহা সহ্য করিবে না জানিয়াই বোধহয় শুভদা তাহাকে দুই হাত দিয়া আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল।

নন্দ আসিল অথচ একদিনও তাহাদের বাড়ি গেল না, দেখিল না, তাহার শুভি কেমন করিয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দিন যাপন করিতেছে। শুভদার মধ্যে এইটুকু কথা কাঁটার মতই ব্যথা দিতেছিল।

সে জানিত মানদা কতখানি কঠোর হইয়াছেন, কেমন করিয়া চোখে চোখে তাহাকে পাহারায় রাখিয়াছেন। একবার ভাবে, ভালই হইয়াছে নন্দ আসে নাই—কিন্তু শুভদার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে! পায়ের শব্দ শুনিয়া সে চমকিত হইয়া উঠে—ঐ বুঝি চির-পরিচিত স্বরে কে তাহাকে ডাকে। বহু ব্যথা লইয়া মর্ম্মতল ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়। তবে বুঝি সে আর আসিবে না।

অসীম ঔদাসিন্যের মধ্যেও উৎকর্ণ প্রতীক্ষা, অশেষ বৈরাগ্যের ভিতর একি পরম ক্ষুধা!

মানদা কয়েক দিনের মধ্যে বুঝিলেন যে রাম তাহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছে, তাই নন্দ আর এ-পথে আসিবে না। যে কঠোরতার জন্য তিনি নিজের চিত্ত-মনকে পাষাণের চেয়ে কঠিন করিয়া তুলিতেছিলেন, তাহার আর প্রয়োজন হইল না। তিনি মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

সেদিন দুপুরে মানদা কি একটা কাজে ও-পাড়ায় গিয়াছিলেন। শুভদার কি জানি কেন মনে হইল, চুলটা বাঁধিয়া রাখে। আর্শির সামনে দাঁড়াইয়া সে নিজের নিটোল মুখখানি দেখিয়া কেমন লজ্জাবোধ করিল। দেহের লাবণ্য যাহাতে অযথা বাড়িয়া না উঠে তাহার প্রাণপণ চেষ্টা সে করিত, তবুও পোড়া রূপ, কিছুতেই কি তাহাকে ছাড়িয়া যায় না?

চুল বাঁধিয়া শুভদার একখানি পরিষ্কার কাপড় পরিবার ইচ্ছা হইল; পুকুরে মাছ ধরিতে

যাইবার সময় পরিষ্কার কাপড় পরিবার আজ্ঞা মানদার ছিল বটে ; কিন্তু রোজ তাহা কিছু ঘটিয়া উঠিত না।

ময়দার টোপ তৈরী করিয়া ছিপ হাতে লইতেছে এমন সময় জ্ঞেনী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, নন্দ আসে।

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে শুভদার মনের উপর দিয়া রাগ, লজ্জা, অভিমান ঘূর্ণি-বাতাসের মত ওলট-পালট করিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া পড়িল।

জ্ঞানদা পথ-প্রদর্শক হইয়া নন্দকে আনিতেছিল, ঐ, ঐ দিদি পালিয়েছে, লুকিয়েছে, বলিয়া মুখে হাত দিয়া জ্ঞেনী হাসির উচ্ছ্বাসটা চাপা দিতেছিল।

নন্দ যখন ঘরে ঢুকিল তখন শুভদা পিছন ফিরিয়া বলিল, মা বাড়ী নেই......

জ্ঞেনী বলিল, সে কথা আমি আগেই ব'লেছিরে,.....তোকে আর ব'লতে হবে না।

মানদার অনুপস্থিতির কথা শুভী এক অর্থে বলিয়াছিল ; কিন্তু তাহার অন্য অর্থ-ই জ্ঞেনীর কথায় প্রকাশ পাইল ; বেশ হয়েছে, এই সময়ে মা নেই আর কে ব'কবে ?

শুভদা লজ্জায় একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

নন্দ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা আমি বুঝেছি, বুঝেছি শুভি ; কিন্তু তার যে অনেক দেরী, কোন দিন হবে কি না, কে বল্‌তে পারে।

জ্ঞেনী বলিল, কি নন্দদা ? কিসের কথা ব'লছো ?

তা তুই আবার জানিস্‌নে, পাকা বুড়ী ?

জ্ঞেনী বলিল, জানি, জানি, কি বল্‌বো ?......

নন্দ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আচ্ছা বলিস্ গিয়ে পুকুর ধারে, এখন ক'টা কেঁচো ধরে আন দিখি, আজ একটা মস্ত মাছ ধ'রবো কিনা ? তোদের আদ্ধেক দেব, আর আমি নিয়ে যাব —বাকিটা, আমাদের জামাইবাবু এসেছে কিনা ?

জ্ঞেনী চলিয়া গেল।

নন্দ পিছন হইতে শুভদার দুটি বাহু ধরিয়া, তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আদর করিতে করিতে বলিল, কিসের এত লজ্জা, ওরে আমার খুদে মানিক।

তাহার আরক্তিম মুখখানি টানিয়া তুলিয়া নন্দ বলিল, রাগ করেচিস, আমার ওপর ?

শুভদা লজ্জায় দুই চক্ষু বন্ধ করিয়াছিল, এবং ঘন ঘন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, না, না।

নন্দ সরিয়া আসিয়া বলিল, আমার সেই বড় ছিপ্‌টা ঠিক আছে ত ?

আছে।

কোথায় আছে ?

দাদার ঘরে।

নন্দ ছিপের সন্ধানে রামের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

নন্দ বসিয়াছিল কতকটা উপরে। লম্বা ছিপের সূতা গভীরতর জলের মধ্যে পড়িয়া রুই-কাৎলার অপেক্ষা করিতেছিল।

শুভদা ছোট ছিপে পুঁটির চেষ্টায় ছিল, তাই সে খানিকটা নীচে বসিয়াছিল। এবং জ্ঞেনী বোধহয় দুই জনের মধ্যে বার্ত্তাবহের কাজ করিতেছিল।

জ্ঞেনী গিয়া একেবারে ধরিয়া পড়িল, এইবারে বলো নন্দদা, সেই যে কি কথা দিদিকে ব'লেছিলে?

কি কথা রে?

সেই যে ব'লেছিলে—পুকুরে এসে বল্‌বে? সেই যে তুমি তখন বল্লে?

কি বল্লাম, একটু খেই ধরিয়ে না দিলে আমাদের কি মনে পড়ে? বুড়ো হয়েছি যে।

এঃ, তুমি বুড়ো হয়েছ? তাই নাকি? আমি জানিনে? এখনো বিয়েই হয়নি, বুড়ো হয়েছ?

শুভদা রাগ করিয়া জ্ঞেনীকে দেখার ছলে একবার নন্দকে দেখিয়া লইল। তাহার মনে তখন বসন্তের মলয় মৃদু মৃদু বহিতেছিল। বুকের মধ্যে যে কুঁড়িটি ফুটিবার অপেক্ষায় ছিল, আজ হঠাৎ কি জানি কেন, সেটি মন্দ-ব্যথায় হৃদয়কে সুখময় করিয়া যেন ফুটিয়া উঠিতেই চায়!

নন্দ বলিল, বুঝেছ, জ্ঞানদাসুন্দরি! বুড়ো হ'তে কি আর বড় বেশী দেরি হ'বে? তুমি বড় হ'লে তবে তো আমার বিয়ে? তা ততদিনে বুড়ো হব না?

নাক সিঁটকাইয়া জ্ঞেনী বলিল, ছিঃ, পাকচুলো বুড়োকে কি কেউ বিয়ে করে?

করবিনে জ্ঞেনী? তোর অপেক্ষায় থেকে তো আমার চুল পাক্‌বে—আর তুই শেষকালে বিয়ে করবিনে আমায়!

নন্দর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কিছুদূর পর্য্যন্ত বোধ হয় শোনা গেল।

ব্যঙ্গচ্ছলে জ্ঞেনাকে লক্ষ্য করিয়া নন্দ যে কথাগুলি বলিতেছিল তাহা শুভদার মর্ম্মে গিয়া পৌঁছাইতেছিল। শুভদা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল যে তাহার জন্য না জানি সে কি কঠোর পণই গ্রহণ করিয়াছে! তাহার প্রতীক্ষায় সে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত!

বালিকার সুকুমার মন কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। তাহারও মনে এই কথাই বার বার আসিল, জীবনে যাহাই কেন ঘটুক না, সে হৃদয়ের সিংহাসনে নন্দকে বসাইয়া আজন্ম পূজা করিবে।

নন্দ বলিল, জ্ঞেনী ভাই, আর কথা ক'স্‌নে, মাছ এসেছে; চুপ্‌ ক'রে দেখ, এখুনি একটা মস্ত মাছ তুল্‌বো।

স্তব্ধ হইয়া শুভদা নিজের ফাৎনার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, পুঁটিদের আজ হ'লো কি? একটা ঠোকরও যে মারে না!

ইতিমধ্যে শুভদার মন আবার উন্মনা হইয়া কোথা হইতে কোথায় ফিরিয়া মরিতে লাগিল।

নন্দ তাহার জন্য চিরজীবন অপেক্ষা করিয়া থাকিবে, সে পুরুষ-মানুষ, বিবাহ করিবে না বলিলে কে তাহার বিবাহ দিবে?

কিন্তু সেই ভাগ্য করিয়া নারীত' পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই! বৃদ্ধ হোক্, অন্ধ হোক্, খঞ্জ হোক্, কন্যাকে তাহার হাতে জলাঞ্জলি দিয়া......

শুভদা আর যেন ভাবিয়া উঠিতে পারে না!

তবে কি পিতার শেষ আশীর্ব্বাদ তাহার জীবনে ব্যর্থ হইবে? ব্রাহ্মণের কথা, তাহার পিতার মত একজন শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের কথা......

দূরে শুভদা যেন পিতার স্মিত মুখখানি দেখিতে পায়, তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া বলে, বাবা, বাবা, রোগশয্যায় তোমারই তো শেষ আদেশ প্রতিপালন করতে চাই...... বাবা, তুমি মনে বল দাও, নিরাশায় যে চারিদিক ভ'রে উঠ্‌ছে!......

নন্দর দৃষ্টি এবং মন ছিল জলের উপর চঞ্চল ফাৎনাটার দিকে, জ্ঞেনী তাহাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল, দেখ্‌ছনা নন্দদা দিদির কি হয়েছে!

শুভদার ঘাড় ঝুলিয়া গেছে—সে দেখিতে দেখিতে জলের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল।

নন্দ এক লাফে তাহাকে জল হইতে তুলিল। শুভদা অজ্ঞান-অচৈতন্য!

জ্ঞেনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ওগো মাগো, দিদি মরে গেল গো, তুমি শীগ্‌গির এসো গো......

চারিদিকে লোক জমা হইল। তিন চারজনে মিলিয়া শুভাকে বাড়ির মধ্যে রোওয়াকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া নন্দ ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে।

মানদা কোথা হইতে সিংহিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে কোলের মধ্যে তুলিয়া লইয়া কাঁদিলেন, তোর মনে কি এই ছিল, শুভি!

(১৮)

ডাক্তারের কথা মানদার মোটেই ভাল লাগিল না। শুভদাকে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, চিন্তার চাপে মানসিক অবসাদ, এই বয়সে হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। ডাক্তারের কথায় একটা কঠিন ইঙ্গিতও বোধহয় ছিল, শুভদার বিবাহে বিলম্ব করা আর উচিত নয়।

মানদা মনে মনে বলিলেন, একেই তো বলে গরীবমানুষের ঘোড়া রোগ। পেটে অন্ন জুটে না, আর এদিকে ছুঁড়ি ব্যামো বাধিয়ে ব'স্‌লো।

বিনোদিনী প্রায়ই শুভদাকে দেখিতে যাইত, তাহার সহিত কথা কহিয়া, কলিকাতার অপূর্ব্ব গল্প বলিয়া সে তাহাকে খুশী করিত।

তুই যাবি ক'লকেতায় শুভি ?

শুভদা কথা কহিত না; কিন্তু তাহার চোখের চাহনিতে মনের ভাব অপ্রকাশ থাকিত না।

চল্, দিন কতকের জন্যে আমাদের সঙ্গে; আমি জেঠিমার মত ক'রে নিচ্ছি।

শুভদা উত্তরে কেবল হাসে।

বাড়ি ফিরিয়া বিনোদিনী সেদিন কমলিনীর কাছে শুভদার রূপের সুখ্যাতি করিয়া বলিল, মেয়ে নয়তো যেন শাপে ভ্রষ্টা দেবকন্যে।

কমলিনী বিনোদিনীর কানে কানে কি একটা বলিল। সহসা বিনোদিনীর দুই চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া নাচিতে লাগিল, তাই নাকি কম্‌লি, তুই ঠিক জানিস্ ?

কমলিনী এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, চুপ্ কর দিদি, শুন্‌তে পেলে আর রক্ষে রাখ্‌বে না।

বিনোদিনী বলিল, এতদিন ব'লতে হয়।

উৎসাহভরে কমলিনী বলিল, বাবার একটুও অমত নেই, শুনেছি তিনি নিজে সনাতন-জেঠাকে ব'লেছিলেন······

তারপরে ? আগ্রহভরে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল।

তারপরেই ত তাঁর অসুখ হ'য়ে তিনি মারা পড়লেন; কমলিনী ধীরে ধীরে বলিল।

তবে বাধাটা কে দিচ্চে ? রাম না, জেঠিমা ?

বোধহয় জেঠিমাই।

বিনোদিনী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, আরে! সে তো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে; তাঁর মত করাতে কতক্ষণ ?

সেদিন মুখে পান গুঁজিতে গুঁজিতে বিনোদিনী ঘটকালি করিতে বাহির হইয়া গেল। মনে মনে বলিল, মিষ্টি কথায় কি না হয় ?······আগে তো এঁর মতটা করি, তারপর রামের, সেটা নম্বর খাতিরেও হয়ে যাবে নিশ্চয়।

বাড়িতে মানদা ছিলেন না। পাওনার তাগিদ করিতে এমন মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে হয়; কখন ফিরিবেন তাহারও কিছুই ঠিক নাই—এই কথা শুনিয়া বিনোদিনী রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি গরম! শুভি, একটা হাত পাখা দেনা, ভাই!

শুভদা একখানি পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে গেলে, বিনোদিনী তাহার হাত হইতে পাখা কাড়িয়া লইয়া বলিল, নিজের হাতের বাতাস সবচেয়ে মিষ্টি লাগে, আর তালপাতার বাতাসই ভাল ভাই, ইলেকট্রি-মিলেকট্রি কিছু নয়।

শুভদা কাছে বসিলে বিনোদিনী বলিল, আর মাথার কোন গোল নেই তো ?

শুভদা মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

কি হয়েছিল সেদিন ঠিক ক'রে বল্‌তো শুনি ?

শুভদা লজ্জায় লাল হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে বলিল, আমার ঠিক মনে নেই……

সে কি লো, সেই কালকের কথা! মনে নেই বল্লে চ'ল্‌বে কেন!……

কে-কে ছিলি তোরা ?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল। তাহার মুখের রক্তাভা দেখিয়া বিনোদিনীর মনে কেমন সন্দেহ হইল, তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, নন্দও বুঝি ছিল ?

শুভদা ধীরে মাথা নাড়াইয়া জানাইল, হাঁ।

তাই এত লজ্জা! মাগো, মরে যাই! ব্যাপারটাকে হাল্কা করিয়া শুভদার মনের কথা বাহির করার ইচ্ছাই বোধহয় বিনোদিনীর ছিল।

নন্দ ছিলতো কি হয়েছে ?—নন্দ বুঝি তোর মাছ ধরা দেখ্‌ছিল ?

নাঃ—তিনি নিজে মাছ ধরছিলেন।

তোদের পুকুরে সে বুঝি মাঝে মাঝে এসে মাছ ধরে ?

না, সেদিন জামাইবাবুর জন্যে মাছ ধরতে এসেছিলেন।

আঃ কপাল, আমার—তাই বল্‌তে হয়, বলিয়া বিনোদিনী খুব খানিকটা হাহা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী বুঝিল যে শুভদা সহজে নন্দর নাম করিতে চাহে না, তিনি, উনি বলিয়া তাহার উল্লেখ করে। বিনোদিনী মনে মনে আমোদ বোধ করিল। ইহাতে মানুষের মনের গোপন ভাব অনেকখানি প্রকাশ পায়।

ঘণ্টা দুই পরে মানদা ফিরিলেন। রোদে তাতিয়া পুড়িয়া তাঁহার মেজাজটা ভাল ছিল না। বিনোদিনীকে দেখিয়া মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন, দরিদ্রের সংসারে বড়লোকের ঘন ঘন গমনাগমন কেমন ভাল লাগে না।

বিনোদিনী খুবই তালে কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাতো হবেই জেঠিমা, এখন সংসারের সব ভার তোমার মাথায়, জেঠামশাই থাক্‌তে…… তা কি আমরা বুঝিনে

তা' রামটি শীগ্‌গির মানুষ হ'য়ে উঠে; তারপর হরির সুখ্যাৎ তো সবাই করে—যেন হীরের টুক্‌রো, ছেলে নয়তো সব..... বেঁচে থাকুক্, ওরা রাজা হবে।

মানদা বলিলেন, সে কপাল নিয়ে কি আমি এসেছি? কাজ নেই আমাদের রাজত্বে, এই ধুবড়ি মেয়েটাকে পার করতে পারলে যে এখন বুঝি......

বিনোদিনী বলিল, সে আর বুঝিনে? এমনি, চেষ্টা করতে করতেই পেরজাপতির ইচ্ছেয় ভাল বরঘরই জুটে যাবে, মানুষের ভাব্‌না মানুষ করে—আবার দেবতারাও ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে নেই? তাঁরাও তাঁদের কাজ করছেন, আমরা চোখে দেখিনে, তাই মরি হাঁক্-পাঁক্ ক'রে......

এইবার মানদার মুখে হাসির একটা ক্ষীণ রেখা দেখা দিল ; তাই বল্ মা, আর যে ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাইনে......আবার আমাদের মেলের ঘরবর মেলাও শক্ত; জোটে তো বুড়ো-ভাংড়ো!

তাতো বটেই,—তাতো বটেই, বলিয়া বিনোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, সে সত্যি জেঠিমা, নইলে ভাবনা কি? এই তো আমাদের নন্দ রয়েছে, চেনা-জানা ছেলে, কিন্তু তাতো আর হবে না।......

মানদা খুশী হইলেন; বলিলেন, তোর খাসা বুদ্ধি মা, এই সোজা কথাটা, পুরুষে কিন্তু বোঝে না; কি কাণ্ডটাই না ঘটে গেল......

বিনোদিনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, কি হয়েছিল, জেঠিমা? আমি তো কিছু শুনি নি?

মানদা চুপি চুপি যতটা সম্ভব ব্রজকিশোরের দোষ বাঁচাইয়া সনাতনের মৃত্যুর মূল-কারণের কথা বলিলেন; এমনি ভালবাসা ছিল মা, তাঁর কুলের ওপর; তাই কুল-ভাঙ্গার কথা কাউকে বল্‌তে শুন্‌লেও আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠ্‌তে থাকে। যা থাকে কপালে, এ কাজ আমি বেঁচে থাক্‌তে কিছুতেই হ'তে দেবো না; তা রাম আমার মতে একমত......

বিনোদিনী বুঝিল।

সে বলিল, আমি তো কিছু জানতুম না, তাই বলেছি জেঠিমা, তুমি আমার অপরাধ নিয়ো না।

মানদা বলিলেন, তোর অপরাধ কি নেব মা, তিনি বেঁচে থাক্‌তে এমন ঝগড়া আমিই কতো ক'রেছি তাঁর সঙ্গে, কত ব'লেছি যে কুল নিয়ে ধুয়ে খাবো আমরা? তারপর দেবতারা চোখ খুলে দিলেন, মা।

বিনোদিনী কথা না কহিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

মানদা আবার বলিলেন, সেই চণ্ডীতলার বুড়ো জমিদারের সঙ্গে তো সব ঠিক হ'য়ে

গিছ্‌লো ; কেবল আমার জন্যেই তো হ'লো না……বুড়ো শাপমন্যি দিয়ে চলে গেল …কি জানি মা ! কিসে কি হয় !…বলিয়া মানদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে বিনোদিনী বুঝিল যে, মানদা নন্দর সহিত শুভদার বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না।

তখন আর বৃথা অপেক্ষা করিয়া লাভ কি ?

সে কমলিনীকে বলিল, দেখ্, বাবা এবার যাচ্ছেন, আমরা দুই বোনে লেগে প'ড়ে নন্দর বিয়েটা দিয়েই ফেল্‌বো,—কলকাতায় কি না হয় ?—এই সামনের বোশেখে……

বিনোদিনীর উপর কমলিনীর অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সে কেন জানি না, মনে মনে জানিত যে শুভদা ছাড়া অন্য কাহাকেও নন্দ বিবাহ করিতে রাজি হইবে না !

তাই সে বলিল, কিন্তু দিদি শুভি হ'লেই বেশ হ'তো……

অধৈর্য্যে বিনোদিনীর একটু রাগ হইয়া গেল, সে বলিল, এই তোদের দোষ, যা দেখ্‌চিস, বুঝচিস্ যে হবার নয়—তার কথা না তোলাই ভাল।

একটুখানি চুপ করিয়া বিনোদিনী বলিল, এই ব'লে দিচ্চি তোকে, এই ব'শেখে যদি নন্দর বিয়ে না দিতে পারি তো……

কমলিনী তাহার মুখ চাপিয়া বলিল, আঃ দিদি, করিস্ কি ? মিছি মিছি দিব্যি গালা ভাল নয়……

বিনোদিনী রাগে গন্‌গন্ করিতে করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নীরবে

থেমে গেল কোলাহল চপলের জ্বলন্ত গৌরব ;
প্রকৃতির অতি ধীর বিকাশের চলন্ত সৌরভ
বহে মৃদু সমীরণে অবিরাম মোদিয়া চেতনা,—
বসন্ত নিদাঘ বর্ষা সরে' গেল বহিয়া বেদনা।
অবসান যৌবনের রসে পুষ্ট হৃষ্ট নর্ম্মলীলা ;
পড়ে' আছে বসুধার স্থির ভিত্তি দৃঢ় কর্ম্ম-শিলা।
কঙ্কালেতে অঙ্কুরিত বোধিমূলে আমি ধরি প্রাণ :
পাষাণের উৎস-রসে নীরবে উৎসব করি পান।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

গিরীশ-স্মৃতি ও গিরীশচন্দ্র

['বঙ্গবাণী'তে ধারাবাহিক প্রকাশিত 'গিরীশ-স্মৃতি'র সত্যতা সম্বন্ধে মানসী ও মর্ম্মবাণী পত্রিকা তাঁহাদের সমালোচনায় যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের দাবী করিয়াছেন। ইহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ সাহিত্যিক ও গিরীশচন্দ্রের আত্মীয়, বন্ধু ও সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মানসী ও মর্ম্মবাণীর সম্পাদক মহাশয়কে এই পত্রখানি প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় ইহা ফেরত দিয়াছেন। তৎপরে দেবেন্দ্রবাবু ইহা যথাযথ প্রকাশের জন্য আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই পত্রখানি গিরীশ-স্মৃতির সত্যতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ উঠিয়াছে, তাহার নিরসনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। বিশেষ গিরীশচন্দ্র সম্বন্ধীয় নানা তথ্যে ইহা পূর্ণ। সেইজন্য আমরা এই মূল্যবান্ পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।—বঃ সঃ]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু—

এই পত্রখানি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "মানসী"তে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের লিখিত "গিরীশ-স্মৃতি" সম্বন্ধে মত প্রকাশিত হইয়াছে—"গিরীশবাবুর জীবদ্দশায় এ প্রবন্ধ লিখিত হইলে কোন সন্দেহের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহার অবর্ত্তমানে লেখক তাঁহার মুখ দিয়া যে সব কথা বলাইতেছেন, তাহা বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ হইলেও তাহা যে গিরীশবাবুরই কথা, ইহার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আবশ্যক, আমরা কয়েকবারই তাহা দিতে অনুরোধ করিয়াছি।"

ভাদ্রের সংখ্যায় "মানসী" বলিতেছেন—"কথোপকথনের সারমর্ম্ম বা notes লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইগুলি এখন প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিতেছেন? না, স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন স্মৃতি হইতে লিখিতেছেন?" বৃদ্ধ বয়সে চক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, তবু গিরীশ স্মৃতি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই দেখিতেছি, "বঙ্গবাণী" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন—"এই প্রবন্ধের লেখক গিরীশচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে গিরীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে সমস্ত আলোচনা হইত, তাহার যতদূর তাঁহার স্মরণ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।" ইহার পরেও—"স্মৃতিতে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন স্মৃতি হইতে লিখিতেছেন?"—এ প্রশ্নের সার্থকতা কি বুঝিতে পারিলাম না। তারপর মানসীর "সন্দেহ" এবং তাহার নিরাকরণার্থ "যুক্তি সঙ্গত" প্রমাণের দাবি। কেবল তাহাই নহে। শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, কেহ কেহ সি, আই, ডি,র কার্য্যও করিয়াছেন। অবশ্য কোন্ পক্ষ হইতে জানি না, অবিনাশের কাছে অনুসন্ধান করা হইয়াছে যে, কুমুদবাবুর সহিত গিরিশচন্দ্রের পরিচয় ছিল কিনা এবং তিনি কবিবরের কাছে যাতায়াত করিতেন কি না? এ কালের রীতিনীতি, আচারব্যবহার কিরূপ জানি না, কেন না নানা কারণে বর্ত্তমানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার নাই। তবে একজন নিরীহ নিরপরাধ ভদ্র সন্তানের সম্বন্ধে এরূপ সি, আই, ডি, কার্য্যে ব্রতী হইতে সেকালে আমরা সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ করিতাম। সন্দেহের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ থাকিলে আমরা বোঝাপড়া করিতাম—স্বয়ং লেখকের সহিত। কিন্তু ভিন্নরুচিহি লোকঃ।

তারপর "যুক্তি সঙ্গত" প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে প্রমাণ কিরূপ হইলে "যুক্তি সঙ্গত" হইবে, মানসী তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। আদালতে ত দেখা যায় এবং আমা অপেক্ষা আপনি বেশি করিয়া দেখিয়াছেন যে, অনেক যুক্তি-সঙ্গত (তথা-আইন-সঙ্গত) 'হয়' 'নয়' হইতেছে। আদালতের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, একই আলোচনা দুই জনে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পৃথগাকার ধারণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। বলিবার সময় একরকম বলা হয়, লিখিবার সময় অন্য রকম দাঁড়ায়! সংশয় সকল ক্ষেত্রেই বিচরণ করে। যুক্তি অযুক্তির ধার সে ধারে না। হাজার যুক্তি দিলেও তার ঐ এক কথা—কিন্তু, তবু—

স্মৃতি অবিশ্বাসী, ধৃতি ভ্রান্তিসঙ্কুল, মন সঙ্কল্পে-বিকল্পে দোলায়মান, বুদ্ধি পদে পদে প্রমাদ ঘটায়। তথাপি ইহাদের লইয়াই আমাদের কার কারবার চালাইতে হইতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে মানসী যদি বলিয়া দিতেন কিরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ তাঁহার প্রয়োজন, তাহা হইলেও কতকটা পথ পাওয়া যাইত। তা তিনি বলেন নাই। তবে রবিবাবুর "আলাপ আলোচনা"র উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সেই জন্য (অর্থাৎ রবিবাবুর নিজের লেখা বলিয়া) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।" এই যদি মানসীর মর্ম্মবাণী ও মাপকাটি হয়, তাহা হইলে নাচার। কেননা গিরিশচন্দ্র ত জীবিত নাই। তবে "Psychical Research Society" অথবা Planchette দ্বারা কোন উপায় হইতে পারে কিনা, বলিতে পারি না। সুতরাং কে বলিবে, গিরিশ স্মৃতিতে তাঁহার মত বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহারই মত। কেবল কি তাই? গিরিশচন্দ্র কখনও তাঁহার রচনা নিজ হাতে লিখিতেন না। ইদানীং অবিনাশ লিখিত। অবিনাশের হাতের লেখা কবির অনেক অপ্রকাশিত রচনা এখনও বিদ্যমান। আজ যদি অবিনাশ সেই সকল পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া নিজের বলিয়া দাবি করে, গিরিশচন্দ্র বোধ করি পরলোকে বসিয়াও বলিবেন, তাই ত কি ঝক্‌মারি করেছি!

প্রমাণ কিরূপ হইলে মানসীর পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর একটি বিষয়ও বুঝিতে পারিলাম না, তাঁহার এ আকস্মিক সংশয়ের কারণ কি? যে দুই সংখ্যার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পূর্ব্ব কয়েক সংখ্যায় তিনি এ প্রবন্ধের প্রশংসাই করিয়াছেন। তবে হঠাৎ এ সন্দেহ কেন? এ যেন স্বপ্ন দেখিয়া রাজকন্যার জন্য রূপকথার রাজপুত্রের ক্ষেপিয়া উঠার মত! যাহাই হউক, গিরিশ-স্মৃতি প্রবন্ধ লিখিবার সঙ্কল্প যদি কুমুদবাবু আমার কাছে প্রকাশ করিতেন, আমি তাঁহাকে উপদেশ দিতাম, কবির অভিমতগুলি আপনি বেমালুম নিজস্ব বলিয়া চালাইয়া দিন। সাহিত্য সমাজ সমাদরে গ্রহণ করিবে। খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সবই পাইবেন। এমন ত হইতেছে! হুবহু অনুবাদ মৌলিক রচনা বলিয়া চলিয়া যাইতেছে!

স্মৃতিকে সন্দেহ করিতে গেলে Reminiscences লেখা একরূপ অসম্ভব হয়, তথাপি যে যে কারণে এই স্মৃতি-চিত্রের উপর সাধারণের সংশয় জন্মিতে পারে, পর পর তাহার নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ, কুমুদবন্ধুর সহিত গিরিশচন্দ্রের পরিচয় ছিল কি না? যাঁহারা এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিতেন, তাঁহারা অনেকেই এখন স্বর্গগত, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি এখনও বিদ্যমান। গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনে অন্যূন দ্বাদশ বর্ষ কাল ইহাঁরা তাঁহার নিত্য সঙ্গী ছিলেন। বিশেষতঃ যখন তিনি অসুস্থ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত রঙ্গালয়ে যাইতেন না, সে সময় অবিনাশ, মতিলাল, কুমুদ এবং স্বর্গীয় ডাক্তার কাঞ্জিলাল ছিলেন তাঁহার প্রধান অবলম্বন।

তন্মধ্যে

দিগেও অপর কয়জনের প্রধান আকর্ষণ ছিল গিরিশচন্দ্রের উদার অপরিসীম স্নেহ, তাঁহার উচ্চ আলোচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ। স্বভাবের দোষে, প্রকৃতি-বৈষম্যে অথবা অন্য যে কোন কারণে হউক গিরিশ যাহাকে স্নেহদানে সক্ষম হইতেন না, তাহার সঙ্গও তিনি অধিকক্ষণ করিতে পারিতেন না। মদ্যপ, গণিকাসক্ত, বাপে তাড়ান মায়ে খেদানো ছেলে, সমাজ-পরিত্যক্তা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে তিনি পুত্রকন্যাসম স্নেহ করিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কাব্যরসে বঞ্চিত, রামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ বিমুখ, তাহার সঙ্গ তিনি বিষবৎ বর্জ্জন করিতেন। গিরিশচন্দ্র গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। যথার্থ গুণসম্পন্ন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যতবার তাঁহার কাছে অপরাধ করিয়াছে, ততবারই তিনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া আদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নিষ্প্রাণ, জড়োপম মানুষ ছিল তাঁহার চক্ষুশূল। এরূপ কেহ আসিলে নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজের কথা কহিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিতেন। কিন্তু কুমুদ, কাঞ্জিলাল, মতিলাল সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। নিত্য সন্ধ্যার পর ইঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় গিরিশচন্দ্র উতলা হইয়া থাকিতেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা উপেক্ষা এবং মেঘ-বৃষ্টি বজ্রাঘাত মাথায় করিয়া ইঁহারাও নিত্য উপস্থিত হইতে ত্রুটি করিতেন না। জীবনের সায়ং সন্ধ্যায় এই কয়জনকে লইয়া প্রতিদিন তাঁহার বসিবার ঘরে বৈঠক বসিত এবং সে বৈঠকে আলোচনার বিষয় ছিল কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, কখন কখন রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্ম এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

গিরিশচন্দ্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যে যেমনভাবে বুঝিতে পারিত, যাহার যতদূর ধারণাশক্তি, তাহাকে তেমন ভাবে বুঝাইতেন ও তাহার সহিত তদনুরূপ আলোচনা করিতেন। এ বৈশিষ্ট্য তাঁহার স্বাভাবিক অথবা অভিনেতা অভিনেত্রীদিগকে শিক্ষা দিতে দিতে অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

সংশয়ের দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, 'গিরিশ-স্মৃতি' প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্রের মত বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে সেসকল অভিমত, তত্ত্ব বা তথ্য আলোচনা করিবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল কিনা। গিরিশ-চন্দ্রের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, গভীর চিন্তাশীলতা, তীব্র অনুসন্ধিৎসা, তীক্ষ্ণ মনীষা, তাহার অধ্যয়ন-স্পৃহা, জ্ঞান-পিপাসা, তাঁহার অন্তর্ভেদী অন্তর্দৃষ্টি, প্রখর তর্ক-বুদ্ধি, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, প্রভৃতির পরিচয় যিনি পাইয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে, গিরিশ বলিতেন যতটুকু, জানিতেন তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। একটা জিনিষ গিরিশচন্দ্র অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন—পল্লবগ্রাহিতা, তা কি ভোজনে কি জ্ঞানার্জ্জনে। তাঁহার পড়িবার ধারাও ছিল সাধারণ পাঠক হইতে স্বতন্ত্র। কোন গ্রন্থকারের কোন সিদ্ধান্তই তিনি নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতেন না। এইরূপে অধ্যয়ন করায় গিরিশচন্দ্রের নিজস্ব ভাব বা অভিমত কখন বিকৃত বা বিলুপ্ত হয় নাই বরং পুষ্টি লাভ করিয়াছে। গিরিশ অধ্যয়ন করিতেন পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়, আপনার ব্যক্তিত্ব বিকাশের নিমিত্ত। যে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা জাগিয়া উঠিত, তিনি সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। যখন Slave-trade লইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকার মধ্যে বাদানুবাদ চলিতে থাকে, সেসময়ে ঐ সম্বন্ধে যতকিছু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, ইংরাজি দৈনিক বা মাসিকে যতকিছু আলোচনা চলিয়াছিল, তাহার একছত্রও তিনি বাদ দেন নাই। এমনি জার্ম্মান-ফরাসী যুদ্ধের সময় দেখিয়াছি, তিনি মানচিত্র লইয়া একাগ্রচিত্তে সৈন্যের গতিবিধি, সমাবেশ প্রভৃতি লক্ষ্য করিতেছেন। গিরিশ আধাআধি কোন কাজ করিতে পারিতেন না, তা ভালই হ'ক আর মন্দই হ'ক। কিন্তু এসব ত গেল পুঁথিগত বিদ্যার কথা। কবির প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃতির পাঠশালায় মানব-চরিত্র-গ্রন্থ অধ্যয়নে এবং ভূয়োদর্শনে। অতি মত্ত অবস্থায়ও তিনি কখন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া এ শিক্ষা অবহেলা করেন নাই। যেমন

শিখিয়াছেন, তেমনি অসঙ্কোচে অকুণ্ঠিত ভাবে আত্মমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কখন কখন কাহাকে বলিতেন, তুমি ব'য়ে পড়েছ, আমি চোখে দেখেছি।

তৃতীয়তঃ, গিরিশচন্দ্রের বলিয়া কুমুদ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেসকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে গিরিশচন্দ্রের কিনা ? মানসী যদি গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা সামান্য অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতেন, তাহা হইলে এরূপ সংশয় তাঁহার মনে উঠিত না। গিরিশ বলিতেন, যিনি জানিতে চাহিবেন, তিনি আমাকে আমার রচনার ভিতরেই পাইবেন। এ উক্তি কবি-কল্পনা নহে, বাস্তব সত্য। প্রবন্ধে যেসকল অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের রচনার অনেক স্থলে তাহার ছায়া এবং সুস্পষ্ট আভাস আছে। গিরিশচন্দ্র পরলোকগত হইবার পর স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ তাঁহার বন্ধু-বান্ধব এবং ভক্তগণ কবিবরের জীবনী লিখিবার জন্য আমাকেই বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে পাছে আমার রচনা পক্ষপাত দোষে দূষিত হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এই সময় কবিবরের জীবনী লিখিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন আমার সাহায্য দাবি করেন এবং আমিও নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যথাসাধ্য সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হই। কিন্তু কুমুদবন্ধু পূর্ব্বে কখন এইরূপ প্রবন্ধ লিখিবার কল্পনাও করেন নাই এবং আমার কোনরূপ সাহায্যও চাহেন নাই। "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর তিনি ইহার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। সেই অবধি এ প্রবন্ধের উপর আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার স্বার্থ, গিরিশচন্দ্রকে represent করিতে গিয়া কেহ misrepresent না করেন। অর্থাৎ সেই পুরানো কথা—শিব গড়িতে বাঁদর না গড়েন। মতের চেয়ে মানুষ অনেক বড়। কিন্তু তথাপি তাহার কথা, কাজ এবং বিষয়-বিশেষে তাহার অভিমত প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে জানিবার বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়। এইজন্যই পদে পদে ভয় করে, তাহার অভিমত ঠিক ঠিক ব্যক্ত না করিতে পারিলে পাছে আসল মানুষটী খাটো হইয়া যায়। এপর্য্যন্ত যাহা দেখিয়াছি, সেরূপ হয় নাই। কেবল দুই তিনটি সাময়িক ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ (যেমন রবিবাবু সম্বন্ধে এবং আমার নিজ সম্বন্ধে আলোচনা) আমার অজ্ঞাত। কিন্তু শ্রীমান অবিনাশ বলেন, গিরিশচন্দ্র রবিবাবু সম্বন্ধে ঐরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা ব্যতীত এসকল সাময়িক ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ কখন কোন বিশেষ কারণে উঠিত। গিরিশ যেমন পরচর্চ্চার তেমনই আত্মচর্চ্চারও পক্ষপাতী ছিলেন না। এইজন্য তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই অজ্ঞাত। বলিতেন, আত্মপ্রশংসা এবং পরনিন্দায় যেমন বৈঠকের গল্প জমে, এমন আর কিছুতে নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গের কাছে তাহাও তুচ্ছ মনে হয়, তেমন আমোদপ্রদ হয় না। কি থিয়েটারে কি বাড়ীতে উচ্চ প্রসঙ্গ ব্যতীত গিরিশের মুখে অন্য প্রসঙ্গ বড় শুনিতে পাওয়া যাইত না। শ্রীমান অপরেশ বলেন, কুমুদবাবুর সহিত গিরিশচন্দ্রের ঐরূপ আলোচনা তিনি অনেক বার শুনিয়াছেন। আমি ঐসকল আসরে স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলেও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, সাহিত্য-শিল্প-পাশ্চাত্য নাটক প্রভৃতি সম্বন্ধে কুমুদবন্ধুর প্রবন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা গিরিশচন্দ্রের। একদিন নয় একবার নয়, বহুদিন বহুবার তাঁহাকে ঐ সকল অভিমত এবং যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অতীত অনেক কথা বলিতে শুনিয়াছি, যেমন গ্রীক্ ও ফরাসী নাটক সমূহের বিশ্লেষণ ইত্যাদি। তবে কুমুদবাবু গ্রামোফোনের কার্য্য করেন নাই। গিরিশ-চন্দ্রের সহিত ঐ সকল বিষয় আলোচনায় তাঁহার যাহা কিছু স্মরণ আছে, সেই স্মৃতি অবলম্বন করিয়া কুমুদবাবু নিজের ভাষায় এবং নিজের ধারায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। হইতে পারে, একদিনের আলোচনায় যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, হয়ত তাহাতে অন্যদিনের দুই একটা কথা মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাও মেকি নহে একই টাঁকশালের মুদ্রা।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই "বঙ্গবাণী" সম্পাদক মহাশয় সাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—"এই প্রবন্ধ লেখক গিরিশচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাঁহার যে সমস্ত আলোচনা হইত, তাহার যতদূর তাঁহার স্মরণ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।"

স্মৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের ধারায় প্রবন্ধ লিখিয়া কুমুদবাবু সুবিবেচনার পরিচয়ই দিয়াছেন। কেন না, গিরিশচন্দ্রের রচনা ছিল যেমন স্বচ্ছ, আলাপ আলোচনা ছিল তেমনই অস্পষ্ট। তাঁহার ভিতর কতক উক্তি উহ্য থাকিত, কতক বাহির হইত। কিন্তু যাহা বাহির হইত, তাহা প্রাণময় এবং আগুনের ফিন্‌কির মত সমুজ্জ্বল ও শক্তিশালী। কোথাও যে তাহারা নিবিয়া যাইত না এমন কথা বলি না। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্রে একটি স্ফুলিঙ্গ অনির্ব্বাণ শিখার তেজে জ্বলিয়া উঠিত। সে সকল আলোচনা ভুলিবার নয়। আমি ত ভুলি নাই। আর বোধ হয় যে কক্ষ এই সকল আলোচনা শুনিয়াছে, সে যদি কথা কহিতে পারিত, সেও এই সকল অভিমতের অনুকূলে সাক্ষ্য দিত।

একটি কথা ভুল বুঝিবেন না। আমার এই দীর্ঘ পত্র কুমুদবাবুর certificate নয়। 'মানসী'র ন্যায় প্রবীণা পত্রিকার এই অমূলক সন্দেহে এবং লেখকের প্রতি নিষ্ঠুর অবিচারে ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়াছি বলিয়াই আমার অভিমত লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশেষে ভাদ্রের সংখ্যায় "মানসী" বলিয়াছেন—'নাটকে পদ্যের প্রচলন হওয়া উচিত কিনা সে সম্বন্ধে তাঁহার (গিরিশচন্দ্রের) মত আমরা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতে পারি না, এবং তিনিও পরিণত বয়সের রচনায় সে পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই।' কে বলিল? এ সম্বন্ধে মানসীর "যুক্তিসঙ্গত" প্রমাণ যতই থাকুক, ঘটনার অকাট্য প্রমাণ এই যে, 'শঙ্করাচার্য্য' 'অশোক' এবং 'তপোবল' গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের রচনা। এমন কি 'তপোবল' কবির পরলোক গমনের এক বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আমরা 'মানসী'কে সবিনয় অনুরোধ করি, এই তিনখানি নাটকে একবার দৃষ্টিপাত করিবেন। বিনয়াবনত

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু

মর্ত্ত্য হইতে বিদায়

(প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ)

সাঙ্গ কোরেছি কুরুক্ষেত্র, সাঙ্গ প্রভাস আজ,
শ্মশান হ'য়েছে সোণার ভারত, ফুরাইল মোর কাজ।
আজি ধরিত্রী ভারবিমুক্তা,—বিধবা সন্ন্যাসিনী,
কোটী পুত্রের রক্তে রঙিন্ গেরুয়ায় গরবিণী!
পশ্চাতে কাঁদে অশ্রুসিন্ধু আর্ত্তের হাহারোলে,
সম্মুখে হাসে জ্যোৎস্না-জোয়ার সমুদ্র-কল্লোলে।
মাঝে বেলাভূমে যাদবকুমার লুটে সব চির-ঘুমে,
জ্যোছনাবিহীন লাখো মরা চাঁদে আকাশের চাঁদ চুমে!
প্রলয়ের মেঘে চাঁদের বৃষ্টি হ'ল কিরে বালুবনে?
হায় নরদেহ, হায় নরহৃদি,—কাঁদাইছে নারায়ণে!

আজ রাতে মনে পড়ে,—
বৃন্দাবনের কত না রজনী উজ্জল চন্দ্রকরে!
যমুনার তীরে দখিন সমীরে ভাসিছে বাঁশীর সুর,—
কিশোর হিয়ার কোমল কুসুমে প্রেমমধু ভরপুর।
কিশোরীরা আসে দুরু দুরু বুক তমাল-কুঞ্জবনে,
স্খলিত পাতার মৃদু মর্ম্মরে চমকিত ক্ষণে ক্ষণে;
কভু চেয়ে থাকা যমুনার পথে বসি' কদম্বতলে,—
ওকি দিগন্তে? অভিমন্যুর চিতা-বহ্নি কি জ্বলে?—
হায় রে মানব-মন।
বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির ব্যথায় বিচলিত নারায়ণ!

হাসি আসে ভেবে,—ব্রজপল্লীতে গোয়ালার সাজে নেমে,
ঢালি' দুধে জল, দেবতার লীলা ঢালি' মানুষের প্রেমে!
আমার খেলার ছেঁড়া দলা ফুল ছড়ানো বৃন্দাবনে,
হয়ত মানুষ খুঁজে খুঁজে তাই কুড়াইবে সযতনে;
হয়ত সে ফুলে আমারই অর্ঘ্য রচিবে অশ্রুজলে,
দেবহস্তের কাটা মাথা গেঁথে দেয় তারা দেবগলে!
অপূর্ব্ব নর-হিয়া
দেবতার হাতে দুঃখ পেলেও সুখ পায় পূজা দিয়া।

তারপর,— সেই মথুরা আসিতে মগধের সাথে রণ,—
ভারত ব্যাপিয়া প্রলয়-ঝঞ্ঝা জীবন-মরণ-পণ!
হৃদয় লইয়া খেলা ছেড়ে দিয়ে প্রাণ ল'য়ে খেলা করি,
কুরুক্ষেত্রে খেলিনু রঙ্গে আসল রংএর হোরি!
শরশয্যায় পড়িয়া ভীষ্ম গণে মরণের কাল,
সংসপ্তকে পাঠা'য়ে পার্থে সপ্তরথার জাল,
'হতগজে' হত হ'ল মূঢ় দ্রোণ, কর্ণে অনুজ মারে,—
কেবা কার ভ্রাতা? ধর্ম্মের মলা রক্ত-স্নানে ছাড়ে।
তাই ত প্রভাসে আপন-রক্তে খেলিলাম শেষ হোরি,
আজ খেলাশেষে দেখি সাথী নাই,—পোহাইছে বিভাবরী!
কাঁদে গান্ধারী, কাঁদে রুক্মিণী, কাঁদে ধরিত্রী আজি,
জীবনের ভার-মুক্ত মৃত্যু হাসে কঙ্কালে সাজি!
মানুষের ত্রুটি মানুষের পাপ ঢাকিলাম নিজপাপে;
হায় নরদেহ, নারায়ণ হ'য়ে নরের মতন কাঁপে!

আজ মনে হয়,—বৃথা আসিলাম সাধের গোলোক ছাড়ি',
যে কাজ করিনু,—হ'ত অনায়াসে পাঠাইলে মহামারী।

অতিশ্রম কোরে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলিবার কৌশল,
বল দিয়ে যেথা আঁটা নাহি যায় সেথা প্রতারণা ছল,
প্রাণপণ প্রেম ডুবে আঁখিজলে, স্নেহ পুড়ে হয় ছাই,
যারা মরিবার তারা মরে' আছে, যা হবার হবে তাই,
নরের হৃদয়ে হৃষীকেশ বসে' যা করান তাই হয়,
বহ্নির মুখে পতঙ্গসম মানুষ কিছুই নয়,—
এ সব তত্ত্ব মানুষ ত দেখি বহুকাল হ'তে জানে,
এত ঘটা করে' আমার আসার না জানি কি ছিল মানে!
পাঠাইলে মহামারী,—
আরও সংক্ষেপে সুলভে ভূভারহরণ যে'ত সে সারি।

মিছে করিলাম ক্লেশ,—
রোগ সারাইতে রোগীর অন্ত ঘটে গেল সেই শ্লেষ!
ত্রিযুগের ব্যথা তিনভাগ জলে পূর্ণ করিল ধরা,
বাকী একভাগ ধর্ম্মের নামে অশ্রুতে আজ ভরা!
শ্মশান হয়েছে ভারতবর্ষ, আজি ধর্ম্মের জয়!
শবসঙ্ঘের মাঝে অধর্ম্ম কোথা পাবে আশ্রয়?
মানব-দানব ক্ষয় করি সব এ মহাশ্মশান মাঝে
চিতার আলোয় একক দেবতা শ্মশানেশ্বর রাজে।
শোক-উদ্বেল নারীর অশ্রু-সাগরে করিয়া স্নান,
কন্দর্পের মাথার খুলিতে বারুণী করিব পান!
অনিরুদ্ধের হৃদয়-রক্তে ললাটে তিলোক আঁকি'
ভ্রমি' চিরদিন বিশ্রামহীন আপনারে দিব ফাঁকি!

শান্ত হওরে মন!
তুমি নর নহ, তুমি নর নহ, তুমি শুধু নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ, তুমি নারায়ণ, ধরেছ নরের কায়া,
দূর কর সব মানব-সুলভ স্নেহ প্রেম দয়া মায়া।
হের অপরূপ আপন স্বরূপ বিরাট বিশ্বময়,
বুদ্বুদ্-সম চন্দ্রসূর্য্য তোমাতে উদয়, লয়!
বাসর শ্মশান তোমার সমান, সুখদুখ সব মিছে,
নারায়ণ হ'য়ে নরের মতন ছুটোনা মায়ার পিছে।

তবু, তবু মন টানে,
সখা সহচর গাণ্ডীবধর নরোত্তমের পানে।
হায় নরদেহ, একি তোর মোহ, নারায়ণে স্নেহ পায়।
সুবল সুদাম কত ভুলিলাম,—আজও অর্জ্জুনে চায়!

নর-নারায়ণে যে লীলা চলিছে হোক্ তার অবসান,—
সুখে থাক্ নর, নারায়ণ আজ করে মহাপ্রস্থান!
ক্ষমিও মানব! মানব-লীলায় দেবতার যত চুক্;—
আজ নিশিভোরে নারায়ণ আর নরে দেখাবে না মুখ।
কেঁদো না রে আঁখি মানুষের মত, প্রশান্ত হও মন,—
হের নরতনুবিমুক্ত তুমি গুণাতীত নারায়ণ!
দিয়ে যাই বর,—নরের যেটুকু পাইলাম পরিচয়,
নর চিরদিন নর থাকে যেন, নারায়ণ নাহি হয়!

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন

মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গভীরতর জীবন

চিন্তা ও কর্ম্মের পশ্চাতে মানুষ তাহার সত্যজীবনের একটি স্বতন্ত্রধারা বাহিয়া চলিয়াছে। সকলের অলক্ষ্যে এই জীবন ফল্গুপ্রবাহের মত আপনার গূঢ় লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছে; এই জীবন দিয়াই মানুষের সত্য বিচার। নানা ভাষা ও নানা আচরণের আবরণ ভেদ করিয়া মানবের সত্য রূপটি প্রকাশ পায় না; উহাকে দেখিতে হইলে অনুভবের গভীরতা ও অন্তর্দৃষ্টি চাই। অবশ্য প্রত্যেক যুগেই এমন মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন যাঁহারা প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া মানুষকে তাহার সত্যরূপে দেখিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যুগলক্ষণ দেখিয়া মেটারলিঙ্ক বলিতে চান যে মানবজাতি যেন আজ সমগ্রভাবে সেই গভীরতর সত্যদৃষ্টির অধিকারী হইতে চলিয়াছে।

এই গভীরতর জীবন লাভ করিয়া 'মানুষ তাহার নিজকে আরও নিকট করিয়া পাইয়াছে এবং আপনার মানবভ্রাতার আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের চোকের চাওয়ায়, অন্তরের ভালবাসায়, গভীরতর আন্তরিকতা ও কোমলতর সাহচর্য্য পাওয়া যাইতেছে।'* এক ব্যক্তিজীবনের সহিত আর এক ব্যক্তিজীবনের যে নিবিড় নিগূঢ় যোগসূত্র অদৃশ্য থাকিয়া সমগ্র জীবনকে একটি পরিপূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্যের মধ্যে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে, মানবাত্মার অন্তর্দৃষ্টি যেন আজ তাহা আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছে—এক কথায়, মানবজাতির মধ্যে এক নবচেতনার হাওয়া বহিয়াছে। মেটারলিঙ্ক তাই বলিতেছেন 'এমন একটা যুগ বোধ হয় আসন্ন—(অনেক ব্যাপারই তার আগমন সূচনা করিতেছে)—যখন আমাদের

* Treasure of the Humble (Awakening of the Soul).

আত্মা পরস্পরকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতা নিরপেক্ষ হইয়া চিনিয়া লইতে পারিবে।' * শুধু ইহাই নহে; তিনি বলিতেছেন যে এই যে আমরা মনে করি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচয় সাধিত হয়, ইহা সত্য নহে; পরিচয় ব্যাপারটি মোটেই ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখে না। মানুষের সহিত মানুষের এই যে রহস্যময় ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ অন্তর্জ্জাগতিক পরিচয়, অন্ততঃ নাট্যসাহিত্যে বোধকরি মেটারলিঙ্কই সর্ব্বপ্রথম তাহার রহস্য-কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। মেটারলিঙ্কীয়-নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

নানা তুচ্ছতা ও ব্যস্ততার মধ্য দিয়া একটা বিশৃঙ্খল কোলাহল তুলিয়া আমরা চলিয়াছি আর বলিতেছি এই কোলাহল এই চাঞ্চল্যই সজীবতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ইহাই জীবন। কিন্তু ইহা যে আমাদের সত্যজীবন নয়, এই সব কোলাহলময় ব্যাপার হইতে আমাদের জীবন যে কত স্বতন্ত্র, আমাদের অন্তর নিভৃতে যে আমরা একটি স্বতন্ত্র গোপন জীবন লইয়াই চলিয়াছি, আমরা যাহা কিছু করিতেছি ও ভাবিতেছি তাহার কিছুই যে সে জীবনকে প্রকাশমুখে আনিতে পারিতেছে না, কখনও কখনও যে আমরা তাহা বুঝিতে না পারি তাহা নয়; যখন কোনও বেদনাগভীর মুহূর্ত্তে আমাদের মর্ম্মচেতনা (Inner Consciousness) সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে তখন আমরা যেন পলকের জন্য সেই হৃদয়বাসীর সত্যরূপটি দেখিতে পাই, মুহূর্ত্তের জন্য যেন সত্যজীবন আমাদের চেতনায় স্বপ্নের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। কবি ম্যাথু আর্ণল্ড্ (Mathew Arnold) তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মগ্নজীবন' (Buried life) কবিতায় এই সত্য-জীবনের কথাই বলিয়াছেন। এই সত্যজীবনকে পাইতে হইবে, কারণ উহারই পূর্ণতায় আমাদের সার্থকতা। এই মগ্নজীবন ধারার সহিত যোগ প্রতিষ্ঠিত হইলেই অপর মানবের সহিত পরিচয়ও সত্য হইয়া উঠিবে কারণ গভীরতার জীবনের মধ্যেই আমাদের পরস্পরের যোগ-সূত্রটি নিহিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগ ও চরিত্র বিচার

মেটারলিঙ্কের মতে বর্ত্তমান যুগের মানুষ এই জীবনের সন্ধান পাইয়াছে তাই মানবচরিত্র বিচারের মাপকাঠিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মানবের একটা নবীন সত্তা আজ মানব চেতনার দ্বারে পরিচয়প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই জন্য কার্পেণ্টার অরবিন্দের মুখেও আজ নব সাম্যবাণী শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। মেটারলিঙ্ক বলেন যে এমনটি দেখা যায় যে বাহিরের দিক দিয়া যাহাকে সর্ব্বপ্রকারেই পাপী না বলিয়া উপায় নাই, তাহাকেও অন্তত কখনও কখনও শুদ্ধ পবিত্র বলিয়া টানিয়া লইতে চায়; আবার যাহাকে বাহ্যতঃ সাধু বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই, অনেক সময় তাহার সংস্পর্শেও অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া

* Treasure of the Humble (Awakening of the Soul),

আসে। এই ভাবের বিচিত্র ও অসঙ্গত অনুভবের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া মেটারলিঙ্ক মানবজীবনের অন্তরাল প্রবাহিনী 'গভীরতর জীবন' ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এইজন্যই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "আমরা মানুষের বিচার তাহার কর্ম্মের দ্বারা ত করিই না, এমন কি, তাহার গোপনতম ভাবনার দ্বারাও না।" *

এই সত্যকার মানুষটিকে দেখিবার সহজ শক্তি সকলের নাই। কিন্তু নাই বলিতে যে এ কেবারেই নাই তাহা নহে। সাধারণ মানুষটিও সেই শক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই; তাহারও চেতনার মর্ম্মস্থলে সেই শক্তি সুপ্তবৎ রহিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নিতান্ত সাধারণ মানুষও বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত্তে এই সত্যজীবনের মধ্যে জাগিয়া উঠে এবং তাহারও আর চিরপ্রচলিত ও চিরব্যবহৃত বিচার প্রণালী দিয়া কাজ চালান অসম্ভব হইয়া উঠে। লোকে তাহার বিচার দেখিয়া পাগলও বলিয়া থাকে, কিন্তু সত্যকার উপলব্ধি তখন তাহাকে এমনই সাহস ও শক্তি দেয় যে অকস্মাৎ সে তাহার এতকালের পাকা আমির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে একটুও শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হয় না। মনে করা যাক, একটি ভয়ানক পাপী আজ মৃত্যুমুখে; আজ সে তাহার দুর্ব্বহ পাপের বোঝা লইয়া করুণ-কাতর-দৃষ্টিতে ধরণীর নিকট শেষ আশ্রয় চাহিতেছে; বুঝি যাইতে তাহার মনে বড়ই ভয় হইতেছে। বিগত জীবনের শত দুষ্কৃতির প্রতিশোধ স্মৃতি আসিয়া আজ তাহার যাওয়ার পথখানি কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে; আজ তাহার অন্তর চরম অসহায়তায় কাতর হইয়া শক্তিহীন বাহু দুখানি দিয়া না-জানি কাহাকে জড়াইয়া ধরিবার জন্য চারিদিকে চাহিতেছে! আজ এমনি মুহূর্ত্তে তাহার শয্যাপার্শ্বে, তাহার সমগ্র জীবনের পরম শত্রু উপস্থিত; তাহার প্রতিশোধ লইবার শেষ মুহূর্ত্ত আজ আসন্ন। কত ক্ষতি, কত লাঞ্ছনা, কত মর্ম্মভেদী অপমানের প্রতিশোধ লইবার আজ শেষ সুযোগ। কিন্তু তবু শেষ সুযোগ জানিয়াও কি আজ এই পরম শত্রু তাহার চিরজীবনের বিচারকে অচল রাখিতে পারিবে? আজও কি ঘৃণা ক্রোধ অবজ্ঞা আপনাদের চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হইতে পারিবে? মনে মনেও তাহাকে আজ দোষী করিতে কি সমস্ত অন্তর শিহরিয়া উঠিবে না? তাহার মৃত্যুবিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কি অন্তর বলিয়া উঠিবে না, আর যাহাই হোক এ সমস্তই মাত্র বালকের ভ্রান্তি! ইহাই কি মনে হইবে না যে আজ সে পাপের অতীত? মৃত্যুর নৈকট্য আসিয়া কি জানি আমাদের এ কোন্ দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করিয়া দেয় যাহাতে ভালমন্দকে আর পূর্ব্বের মত করিয়া দেখা সম্ভব হয় না!

জীবনে গভীর শোক-দুঃখ অথবা অন্য কোনও তীব্র গভীর অনুভব সেই গভীরতর জীবনের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইতে পারে কিন্তু সেই পরিচয় স্থায়ী হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট

* Treasure of th- Humble (Awakening of the Soul).

বন্ধুর মত পরে সে নিতান্ত অলীক বলিয়াই মনে হয় আর যদি কোন মুগ্ধস্মৃতি রহিয়া বা যায়, তাহা হইলেও স্বপ্নের বন্ধুকে পাওয়ার যেমন উপায় থাকে না তেমনি উপায়বিহীন হইয়া সেই জীবনের জন্য শুধুই নিস্ফল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হয়। মেটারলিঙ্ক বলেন, একমাত্র ভালবাসাই মানুষকে গভীরতর সত্যজীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অন্তর্দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করিতে পারে। যতদিন জীবনে এই ভালবাসার উন্মেষ না হইবে ততদিন মেটারলিঙ্কের এই অতীন্দ্রিয় নীতিবোধ একটা কথামাত্রই থাকিয়া যাইবে, ততদিন উহার স্পষ্ট কোন অর্থই পাওয়া যাইবে না। সেই জন্য এই উচ্চতর ন্যায়বোধ ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠা পর্য্যন্ত ধীরভাবে আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে।*

প্রেমের পথে

প্রেম, কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের সাধনাই মেটারলিঙ্কীয় জীবন-সাধনার মূল কথা। তিনি বলেন, 'মৃত্যুমুখে পতিত মানুষের মত, প্রেমাতুরা নারীর মত, জীবনপ্রাপ্ত দেবদূতের মত আমাদের জীবনযাপন করিতে হইবে, সৌন্দর্য্য ও আন্তরিকতা জীবনের অঙ্গীভূত হওয়া চাই। 'বাস্তবজগতে এত নীচ কোন প্রাণী নাই যে জানে না সুন্দর ও মহৎ কর্ত্তব্য কি বস্তু। কিন্তু কেবল এই মহৎ ও সুন্দর তাহাদের অন্তরে শক্তি সংগ্রহ করিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সর্ব্বপ্রথম আমাদের উচিত এই অদৃষ্ট শক্তিটিকে বাড়াইয়া তোলা।' এখানে এই কথাটি বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে সৌন্দর্য্য বস্তুটি মেটারলিঙ্কের নিকট মহত্ত্ব ও কল্যাণের নামান্তর মাত্র। এই সৌন্দর্য্য-পিপাসাই মানবাত্মার একমাত্র পিপাসা। ভাল করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে মানব কল্যাণ ও মহত্ত্বের উপাসক। কেবল শক্তির অভাবে মানব আপনার অভীপ্সিত কল্যাণ ও মহত্ত্বকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইচ্ছার সহিত শক্তির অসামঞ্জস্যই ইহার মূলে। মানুষ সত্য সত্য অমঙ্গলের সন্তান নয়; দুর্ব্বল এবং অক্ষম বলিয়াই মানুষ যাহা সত্যই চাহিতেছে তাহাকে আপনার করিতে পারিতেছে না।

এই জন্য শত দৌর্ব্বল্য এবং অক্ষমতা সত্ত্বেও মেটারলিঙ্ক মানুষকে মহৎ ও সুন্দর বলিয়াই জানিয়াছেন। বাহিরের নানা আবরণে যদিও মানবাত্মার এই গৌরবশ্রী আচ্ছন্ন থাকে, তথাপি প্রেমের ভাস্বর আলোকে তাহা কখন গোপন থাকিতে পারে না। মেটারলিঙ্ক এইজন্য সর্ব্বত্রই কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশোন্মুখ প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের পূর্ণাদর্শকেই মেটারলিঙ্ক ভগবান্ আখ্যা দিয়াছেন। ভগবান্ মানবহৃদয়ের, মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ ও গভীরতম সম্ভাব্যতা। এইজন্যই তিনি বলেন, 'আমাদের জীবনকে ভগবানের অন্বেষণে

* Treasure of the Humble (Mystic Morality).

ব্যয়িত করিতে হইবে কারণ ভগবান্ গোপনে থাকেন'।* একমাত্র প্রেমের দিব্যালোকেই বিশ্বব্যাপ্ত ভগবানের—শিবম্ ও সুন্দরম্ এর—অস্তিত্ব ধরা পড়িয়া যায়!

প্রেমের শক্তিকেই মেটারলিঙ্ক জীবনের সাফল্য ও সার্থকতা লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই আশাই তাঁহার প্রাণকে বল দিয়া আসিয়াছে যে একদিন আসিবে যেদিন বিশ্বজগতে সার্ব্বজনীন ভাবে এই মৈত্রী ও প্রেমের ধর্ম্মই স্বীকৃত হইবে।† তাঁহার নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় এইজন্যই দেখিতে পাই যে সমগ্র নাট্যসৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি এই গভীরতর প্রেম-জীবনের কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অদৃষ্ট ও প্রেমের রহস্যময় ঘাত-প্রতিঘাতে অন্তর্জ্জীবনের রহস্য-কথাটিকে ব্যক্ত করাই তাঁহার নাটকের মূল লক্ষ্য। এই প্রেম যে শুধু প্রেমিককেই সার্থকতার দিকে চালিত করে তাহা নয়, ইহার স্পর্শে অপর হৃদয় আপনার সত্যসম্বন্ধে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মেটারলিঙ্ক মানুষের সহিত মানুষের একটি নিগূঢ় জীবনগত যোগ স্বীকার করিয়াছেন; এই যোগসূত্র রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ মানুষের পরিচয় ও সঙ্গ পাইতে পারে। সেইজন্য মেটারলিঙ্ক বলেন যে যদি কোন প্রেমবিশুদ্ধ হৃদয় অপর একটি সামান্য জীবনকেও স্পর্শ করে তবে সেই তুচ্ছতামগ্ন জীবনও একনিমেষে তাহার গভীরতর সত্যের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে; বসন্তস্পর্শে যেমন করিয়া জীর্ণ নগ্নবৃক্ষগুলি তাহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া নবীন হইয়া উঠে, নিতান্ত জীর্ণনগ্নবৃক্ষগুলির মতই হৃদয়ও তেমনি প্রেমের উচ্ছ্বসিত পুলকে এক অভিনব রূপ ধারণ করে। সেইজন্য মেটারলিঙ্ক বলেন, 'অন্তরে ভাল হও, দেখিবে তোমার চতুষ্পার্শ্বের সবই তোমার মত ভাল হইয়া উঠিবে।' মানবের মঙ্গলময় সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে এই দৃঢ় শিশুসরল বিশ্বাস মেটারলিঙ্কের প্রাণেরই সৌন্দর্য্যটিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দেয়।‡

সম্পূর্ণ

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

* Treasure of the Humble (Deeper life).

† Double Garden (Modern Drama) p. 107.

"For when the sun has entered into the consciousness of him, who is wise, as we may hope that some day it will enter into that of all men, it will reveal one duty and one alone, which is that we should do the least possible harm and love others as we love ourselves; and from this duty no drama can spring."

‡ যখন ছয়বৎসর পূর্ব্বে (১৩২৫) মেটারলিঙ্কীয় মতবাদের আলোচনা প্রকাশ করি তখন এতটা বিস্তৃত আলোচনা করিবার কল্পনাও মনে আসে নাই। মেটারলিঙ্কের সমগ্র রচনার সহিত পরিচিত হইবারও তখন সুযোগ ছিল না। তাই তখনকার লিখিত 'মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ' অধ্যায়টিকে এখানে স্থান দিতে বসিয়া মনে হইতেছিল যে এই কথাগুলিকে অন্যভাবে বলিলে হয়ত ভাল হইত। মেটারলিঙ্কীয় মতবাদেরও

এক ফোঁটা অশ্রু

ফ্যাচাঙ্ অনেক।

বড় সংসার না,—আর সংসারই বা বলি কি করিয়া......না আছে পরিবার, না আছে একটা মেয়েলোক।

বাপ বেটায় মিলিয়া মোটে চারজন।

একটা বিকাশ এবং পরিণতি ঘটিয়াছে তাহার কথাটি তখন লক্ষ্যই করি নাই। সেইজন্য, জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মেটারলিঙ্ক যে অনেক ধারণাকেই নূতনভাবে সংস্কার করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা দেখাইবারও কোনও চেষ্টা ইহার মধ্যে করা হয় নাই।

তবে মেটারলিঙ্কীয় ভাবধারায় এই ক্রমিক বিকাশটিকে পূর্ব্বের কয়েক অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় যে এই অধ্যায়টির মধ্যে আর হস্তক্ষেপ না করিলেও হয়ত চলিতে পারে। কারণ ইহাতে যে মতবাদটি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা মেটারলিঙ্ক আজ বর্জ্জন করেন নাই। শুধু, তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের মানবচেতনাসম্বন্ধীয় গবেষণা ও হিন্দুমতবাদের সহিত পরিচয়ের ফলে, তাঁহার পূর্ব্বপ্রচারিত মতবাদটি আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। এইজন্য পূর্ব্বলিখিত এই অধ্যায়টির হাত পা ছাঁটিয়া নূতন করিবার ইচ্ছা না থাকায় এবং ইহাকে একেবারে নির্ম্মম নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়ার প্রবৃত্তি না থাকায়, মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধীয় আলোচনার এই প্রথম নিদর্শনটিকে স্থানে স্থানে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া তেমনই রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্ব অধ্যায়গুলির পাঠক ইহার মধ্যে নূতন কিছুই পাইবেন না; যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে মেটারলিঙ্কীয় মতবাদের ভাব সংগ্রহ করিতে চান, তাঁহাদের জন্য এখানে দুটি কথা বলিতে চাই।

এই প্রবন্ধে মেটারলিঙ্কীয় মতবাদ আলোচনা করিতে গিয়া 'অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃষ্ট' 'দীনের সম্পদ' এবং 'গোপন মন্দির' এই কয়খানি বইকেই বিশেষ ভাবে আশ্রয় করা হইয়াছিল। তাহাতে 'রহস্যোদ্যান' 'জীবন ও পুষ্প', 'আমাদের অমরতা' 'ঝড়ের মাতন', 'পার্ব্বত্য পথ', 'পরম রহস্য' ও 'অজানা অতিথি' এই বইগুলির সাহায্য লওয়া হয় নাই; কারণ ইহাদের প্রায় বইই তখন প্রকাশিত হয় নাই।

প্রথম জীবনে মেটারলিঙ্ক আপনার অনুভব জীবনের মধ্যেই যেন কতকগুলি সত্যের ইঙ্গিত পাইয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনার ফলে মেটারলিঙ্ক মানব-বুদ্ধিকেই (intellect) খুব বড় স্থান দিতে আরম্ভ করেন, এবং পূর্ব্ব জীবনের অনুভূতি ও বিশ্বাসকে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিচারের কষ্টি পাথরে কষিয়া লইতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে তিনি মানব চেতনার অন্তরালে অতি রহস্যময় মগ্নচেতনার (The Unconscious) বিশাল অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন এবং বুঝিতে পারেন যে এই মগ্ন চৈতন্যলোকে মানব অসীম বিশ্বের সহিত নিগূঢ় ও অচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্বদ্ধ হইয়া আছে। আর এই বিশ্বজগতের মাঝে ব্যক্তি যে জাতিসত্তারই একটি ক্ষণিক বিকাশ মাত্র এবং এই জাতিসত্তাই যে সত্যকার বস্তু এই কথাটি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। মগ্ন চেতনাসম্বন্ধীয় আলোচনায় এই কথাটিও মেটারলিঙ্ক বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন যে ভূত-ভবিষ্যত-বর্ত্তমান এই সমস্তই নিত্যকালের অন্তরে চিরবর্ত্তমান রহিয়াছে। মৃত্যুর সম্মুখে এক সময় মেটারলিঙ্কীয় আলোচনা আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি পরলোক সম্বন্ধে কতকটা আস্থাবান্ হইয়া উঠিয়াছেন দেখা যায়। যদিও একেবারে নিশ্চিত প্রমাণ তিনি পান নাই, তবু নানা দিক দিয়া আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে ইহা আর যাহাই হোক অসম্ভব নহে। অন্ততঃ পক্ষে মৃত ব্যক্তিরা যে আমাদের জীবনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়াইয়া থাকে তাহা তিনি নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মেটারলিঙ্ক মানব-জীবনকে অসীমেরই একটি অংশ বলিয়া মনে করেন, এই জন্যই মানব যে আনন্দলোকের যাত্রী এই কথাটি তিনি বিশেষ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তি-ভাগ্য যাহাই হোক, বিশ্বমানবচেতনা যে এই অসীম আনন্দলোকের দিকেই চলিয়াছে এই কথাটি 'আমাদের নিত্যতায়' মেটারলিঙ্ক দার্শনিক যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। —লেখক।

ছোট ছেলেটাই সব চাইতে বেয়াড়া।

ধনপতি সেটাকেই কিছুতে আর সামলাইতে পারে না।

খুব গোব্‌দা চেহারা—স্বাস্থ্য দেখিয়া বাপেরও ঈর্ষ্যা হয়।

বড় ছেলে বলে, ভায়েদের মধ্যে ঐ একটারই যা তবু গায়ে একটু মাংস আছে, তাও তোমার সয় না। নজর মেরে মেরে তুমি ওকে নটে শাকটি না ক'রে ছাড়বে না দেখছি।

ধনপতি গম্ভীরভাবে বলে, হ্যা তোর যেমন বুদ্ধি রেজো, বট গাছকে হাজার নজর দিলেও কি তা আর নটে শাক হয় কখনও রে?......শিবু আমার অক্ষয় বট, বুঝলি?

রাজশেখর কাল পুরু ঠোঁটটা কেমন এক প্রকার বেঁকাইয়া বলে, অক্ষয় বট তোমার যেন নটে শাকটি না হলো। তোমার এই আ-দেখলে নজরের বাজ হেনে হেনে ওকে ঢলা ক'রে তুলতে ক'দিন লাগবে শুনি?

শিবশেখর বাপের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়ায়।

মুখাখানা তার সত্যই রৌদ্রে-তাতা মাঠের মতই ঢলা।

রাজশেখর বলে, দেখ ত বাবা, কি মুখখানা কি হ'য়ে গেছে?

শিবশেখর ফিক্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

বাপের মুখের কাছে দাঁড়াইতেই বিশ্রী গন্ধ ছাড়ে।

বাপ চমকিয়া ওঠে।

শিবুও চমকিয়া ওঠে।

ধনপতি একলাফে উঠিয়া দাঁড়ায়—

—হারামজাদা, উল্লুক্কা......

নিজের মুখেই বাঁধিয়া যায়, বলে, পাঁজি, নচ্ছার, বিড়ি টানতে শিখেছ......

হাত পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে।

চণ্ডাল রাগ চোখ মুখ খামচে ধরে, লাল করিয়া ছাড়িয়া দেয়।

রাজশেখর বলে, সত্যি?—

যেন বিশ্বাসই হয় না।

বাপের উঠিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবশেখর সেই যে দৌড় মারে, আর—তাহার পাত্তাও মেলে না।

শশীশেখরের জুতার শব্দে তাহাকে চেনা যায়।

জুতা ত অনেকেই কেনে—পায়েও দেয়, কিন্তু শশাশেখরের জুতার মত মচ্ মচ্ ত কই করে না।

শশী বলে, জুতো চিনে কেনা চাই।

রাজু বলে, তুই আর জন্মে নিশ্চয় মুচি ছিলি, নইলে চিনতে পারিস কি ক'রে? কই, আমি ত একবারও মচ্‌মচে জুতো কিনতে পারলুম না।

শশী একটু ভাবিয়া লইয়া বলে, তুমি আর জন্মে নিশ্চয় ষাঁড় ছিলে। আমার বেশ মনে পড়ে সেই চামড়া দিয়ে আমি জুতো তৈরী করেছি।

কুরুক্ষেত্র বাঁধে—বাক্যবাণের আদ্যশ্রাদ্ধ।

মজা লুটিয়া লয় শিবু।

প্রাণ ভরিয়া হাসে।

সেই মেজদার জুতার শব্দে শিবু পাশের বাড়ীর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসে।

কাঁচুমাঁচু হইয়া বলে, মেজদা', বাবা আজ আমায় মেরেই ফেলত।

শশী ছোট ভাইয়ের গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলে, কেন, কি করেছিলি?

এঃ ম্যাগো, তোমার গায়ে কি গন্ধ মেজদা'—বলিয়া শিবু দুই হাত পিছাইয়া যায়।

ও কিছুনা, যাঃ—আবার শিবুর হাত ধরিয়া বলে, কি করেছিলি?

শিবু দুই আঙ্গুল মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলে, বিড়ি টেনেছি···হি হি··· মেজদা'।

শশী বলে, সাবাশ!

রাজু বলে, রাস্কেল, তোকে আজও বলি,—ওর মাথাটা আর খাস্‌নে। নিজেত একেবারে এঁচোড়ে পেকে ঝানু হ'য়ে গেছিস্। এই বয়সেই কত করলি...ঢের···এখন ওটাকে রেহাই দে।

ব-ব-বটে। ব-ব-সব সবার সাক্ষাতে? এ তল্লাটের কে না জানে সে ধনপতি হাজ্‌রার সূয্যির ষাঁড় রেজো।—শশী বলে।

রাজু বলে, কোন শালা, বাপের বেটা কি দেখেছে বলতে পারিস?

শশী ঝন্‌কাট ডিঙাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলে, বাবার কাছে জুতো খেয়েছিলে মনে নেই?

রাজু হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।

বলে, ছোাঃ, সে বুঝি ও জন্মে!···

শিবু বলে, মিথ্যে কথা বলোনা বড়দা', সেত আমিও দেখেছি।

রাজুর মুখের হাসি মিলাইয়া যায়।

মোটের মাথায় শিবুর বিড়ি খাওয়ার দরুণ কোন শাস্তিই হয় না।

ধনপতি একটা দৈনিক সংবাদপত্র অফিসের কম্পোজিটর্। রাত তাহার অফিসেই কাটিয়া যায়।

সকাল বেলা চায়ের দোকান হইতে এক কপ্ চা পান করিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়ে।—

শিবুর ঘুম ভাঙে।

রাজু যে কোথায় বাহির হইয়া যায়, কেহ জানে না।

বাড়ী ফিরিয়া বলে, মর্ণিং ওয়াক্ করে' এলুম।

শশীর ঘুম ভাঙে,—নেশা কাটে না।

শিবুর মাথায় ফন্দী আসে—

মনে মনে হাসে, মশারির দড়িটা একটানে ছিড়িয়া ফেলিয়া শশীর কাছার সঙ্গে বেশ করিয়া একদিক বাঁধে—আর একদিক জানালার গরাদের সঙ্গে।

এইবার উচ্চকণ্ঠে হাসে।

একখণ্ড কাগজ বেশ করিয়া পাকাইয়া শশীর রবযুক্ত বৃহৎ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দেয়।

শশীর মাথাটা শির্ শির্ করিয়া ওঠে।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া, দুই তিনবার 'উ-হুঁ-হুঁ' করিয়া উঠিয়া বসে।

তারপরেই—

হে-হে-হে—এচ্ছ।

বাপ্ রে! আকাশ পাতাল ফাটিয়া যাওয়ার জোগাড়।

শিবু দরজার আড়াল হইতে উঁকি মারে—আর হাসে।

কেমন জব্দ—

সত্যই শশী জব্দ হইয়া গেছে।

শিবুর কারসাজি......

সে ত আর অসহ্য না।

কিন্তু অলক্ষ্যপুরুষের কারসাজি সে যে একেবারেই অসহ্য।

দুই ভাইয়ে কচাল সুরু হয়।

যোগ্যং যোগ্যেন—

বাপ বলে, শশীটা যেমন একবগ্গা—রেজোটা আবার তেমনি একহারা যোগ্য পুত্রকা। একটা খুনোখুনি না বাধে।

বাধে না কিছুই।

সে রাত্রে শশী বাড়ীই ফেরে না।

ধনপতি সে খোঁজ আর রাখে কেমন করিয়া—

শিবুই বলিয়া দেয়।

রাজুও বলে, বাবা একশোই বলি, শশীটাকে সাম্‌লাও,—তাত আর শুনবে না। ওটা যে একেবারে বয়ে গেল। ঘরের ওচলা, ঝেটিয়ে দূর করা উচিত। বংশের কাঁটা……

আরও কত কি।

ধনপতি শিবুকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে।

একবিন্দু অশ্রুও হয়ত ঝরে।

দেবীদাস আসিয়া জানায়—

সেও দুঃসংবাদ।

বলে, এই বলে যাচ্ছি, ফের যদি রেজো হারামজাদা আমার বাড়ী মুখো হবে তা'হলে আমারই একদিন কি ওরই একদিন।

ধনপতির ইচ্ছা হয়, নিজেকে আজাড় করিয়া বলে, সে কত বড় অকষ্টবন্ধেই না পড়িয়াছে, কিন্তু পারে না।—

যাহা বলে, তাহা এই—

সে যেদিন গেছে সেদিন থেকেই জানি সবাই বয়ে যাবে। যাক্‌; তোমাদের যার যা খুশী করো দাদা, আমার আর কি বলার থাকতে পারে।

সত্যই তাহার আর বলার কিছুই নাই।

অফিসে যায়।

এখানে শান্তি ছিল না কোন দিনই—

তবু রাতের জন্য রেহাই।

শারীরিক কষ্টে মানসিক কষ্ট ভুলিয়া থাকা শুধু।

একটুখানি ফাকি—

অদ্ভুত লাস।

রবিবার সকাল ৭টায় কাস্তাজুরির বস্তির মাঝের নর্দামায় এক অদ্ভুত লাস পাওয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে নাম জানা গিয়াছে, শশীশেখর হাজরা। ধাম বা মৃত্যুর কারণ কিছুই জানা যায় নাই। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

...এতদিনের সুদক্ষ কম্পোজিটয়ের হাতও কাঁপিয়া উঠিল।

ছাপাখানার আলোগুলি একে একে চোখের সামনে নিবিয়া গেল। রাত্রের দানো'টা চীৎকার করিতে করিতে হাফাইয়া নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে। সমস্তই নিঃস্পন্দ, নিঃসাড়......শুধুই ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া তখনও জ্বলিতেছিল ধনপতির বক্ষে শতজন্মের অভিশাপ......মাঠের মাঝে চিতার মত...

নারিকেল যেমন করিয়া কুরুণী দিয়া কুরায়—কে যেন তেমন করিয়াই তাহার হাড় পাঁজরা মায় হৃৎপিণ্ড কুরাইয়া বাহির করিয়া আনিতেছিল।

এইত—

সন্ধ্যা হয় হয়।—

ধনপতি শিবশেখরকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া বলে, উঃ......রাত আমার খাব্‌লে খেয়েছে পোড়া অফিস। চ' সেখানেই তোর ঠাঁই করে' দেব, আমার চোখের সামনে শুয়ে থাকবি। আর......

শিবু বলে, বেশ বাবা, তাই চল।

শিবুর চোখে থাকে—

সে কিছুই না—

এক ফোঁটা অশ্রু।

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

পলাতকা

পাড়ার মাঝারে সব চেয়ে সেই কুঁদুলী মেয়েটি কই!
　　কত দিনপরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের,—
সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই
　　কই কই বালা আজিকে তোমার পাই না কেন গো টের!

তোমার নখের আঁচড় আজিও লুকায়ে যায় নি বুকে,
　　কাঁকন-কাঁদানো কণ্ঠ তোমার আজিও বাজিছে কানে!
যেই গান তুমি শিখায়ে দিছিলে মনের সারিকাশুকে
　　তাহারি ললিত লহরী আজিও বহিয়া যেতেছে প্রাণে!

কই বালা কই!—প্রণাম দিলে না!—মাথায় নিলে না ধূলি!
　　—বহুদিন পরে এসেছি আবার বন তুলসীর দেশে!
কুটিরের পথে ফুটিয়া র'য়েছে রাঙা রাঙা জবাগুলি,—
　　উজান নদীতে কোথায় আমার জবাটি গিয়েছে ভেসে'!

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

ছিটে ফোঁটা

(১)

বয়কট্

ধর্‌তে গিয়ে মে-ওর মেও, দেখ্‌তে পেলে মুষিকে—
স্বয়ং হুলা বাড়ায় মুলা! ভুলে তখন পুসিকে
বস্‌ল গর্ত্তে তর্ক কর্‌তে; ধার্য্য হ'ল প্রস্তাবে,
যদি সবাই না যাই সভায়, মার্জ্জারেরা পস্তাবে।
হাতের চেয়ে ভাতে মারায় সদাই ধরায় জয় ঘটে;
কমিশনের সেসন্ পেষন্ হবে ভীষণ বয়কটে।

(২)

বুড়ার উপদেশ

স্থান—সদানন্দের বৈঠকখানা, সময়—অপরাহ্ন।

সদানন্দ বৈঠকখানায় আসিয়া বসিতেই কয়েকজন যুবক ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের এখানে-সেখানে বসিল। সদানন্দ সকলকেই চিনিতেন; একবার সস্নেহে সকলের প্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া পাশের বাক্সটি খুলিয়া, হিসাবের খাতা বাহির করিলেন ও তাহার একটি পৃষ্ঠায় দু-এক ছত্র লিখিয়া খাতাখানি বন্ধ করিলেন। যুবকেরা দু-এক মিনিট্ এ উহার মুখের দিকে তাকাইল ও পরে একজন যুবক একটুখানি জড়সড় ভাষায় বলিল—আমরা আপনার কাছে কিছু উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছি। সদানন্দ হাসি চাপিতে পারিলেন না; তিনি ঠাওর করিয়াছিলেন, ছেলেরা তাহাদের একটা খেয়ালের অনুষ্ঠানে চাঁদা চাহিতে আসিয়াছে আর উপদেশ চাওয়াটা তাহার ভূমিকা। বিদ্যালয়ের লেখাপড়া যখন শেষ হইয়া আসে,—যে সময় পর্য্যন্ত উমেদারির দিক্‌দারিতে মুখ মলিন হয় না; সেই সময়েই যুবকেরা অনেক খেয়ালের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোমাদের ষাঁড়ের গোবরের প্রয়োজন হইল কেন, বুঝিলাম না। বক্তা যুবকটি থতমত খাইয়া বলিল—আজ্ঞা, সে কি কথা! সদানন্দ বলিলেন—ঠিক কথা বলিয়াছি, বাছা; জীবনের পথ বহিয়া আসিবার পর যখন নানা জ্ঞান আসিয়া বুড়ার শরীরে বাসা বাঁধে তখন সে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ষাঁড়ের গোবরে দাঁড়ায়। কেন-না একদিকে সে জ্ঞান খাটাইয়া বুড়ার পক্ষে কাজ করার সুযোগ থাকে না—কর্ম্মভার তখন

পড়ে যুবাদের হাতে। অন্যদিকে যুবারা মুখে যাহাই বলুক, তাহাদের সমগ্র জীবনের প্রবৃত্তি এই, যে ঠেকিয়া ঠেকিয়া ও ঠকিয়া ঠকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে চায়; অভিজ্ঞতার মানেও তাই।

যুবকেরা কি যেন বলিবার জন্য উৎসুক হইতেছিল, কিন্তু বুড়া তাহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—তোমরা নিশ্চয় একটা বিশ্বহিতকর অনুষ্ঠানে হাত দিয়াছ; সেটা হয় নারীজাতির মুক্তিদান, না হয় চাষাদের শিক্ষার ব্যবস্থা, না হয় পীড়িতদের সেবা, না হয় আর কিছু। সেই অনুষ্ঠানের জন্য তোমাদের কিছু চাঁদা চাই; নয় কি? বক্তা যুবককে ঠোঁট চাটিয়া সে কথা স্বীকার করিতে হইল, তবে সে তাহাদের অনুষ্ঠানটির কথাও শোনাইবার জন্য পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিল। সদানন্দ আবার হাসিয়া বলিলেন যে তিনি সে সকল কথা পরে শুনিবেন, কারণ তিনি জানেন যে যুবকেরা তাঁহার টাকা ইচ্ছা করিয়া অসৎকাজে লাগাইবে না। আগে হইতেই সদানন্দ হিসাবের খাতায় পাঁচটি টাকা খরচ লিখিয়াছিলেন আর বাক্স হইতে সেই টাকা বাহির করিয়া যুবকদের হাতে দিলেন। হাতে দিবার সময় বলিলেন যে তিনি চাঁদার খাতায় নিজে হাতে নাম লিখিবেন না। যুবকেরা আর কথা কহিবার সুবিধা না পাইয়া চলিয়া গেল। সদানন্দ একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন যে তাহার বড় নাতিটি পাঁচিলের পাশে দাঁড়াইয়া আছে। সদানন্দ ভাবিলেন যুবকদের দায়িত্বজ্ঞান বাড়াইবার জন্য এইরূপ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন আছে; তবে অনুষ্ঠানটি যে অল্পদিনেই মরিবে, তাহাও জানিতেন।

সদানন্দের মনে তাঁহার তরুণ জীবনের ইতিহাসের ছায়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে সেই ছায়ায় উপরে গেরুয়া পরিচ্ছদের আলোক ছড়াইয়া কোন একটা মহাত্মাকুলের প্রতিনিধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। সদানন্দ সে দৃশ্যে একটুখানি কাহিল হইয়া পড়িলেও বলিলেন—আসুন, আমার ফরাসে আপনার পায়ের ধুলা দিন্। আগত ব্যক্তি তাহাই করিলেন—তাঁহার সারা পায়ের ধূলায় ফরাসখানি ধূসরিত করিয়া বসিলেন। লোকটির গায়ে ছিল গেরুয়ারূপ ধর্ম্মপ্রাণতার বিজ্ঞাপন আঁটা, আর মুখের ছবিতেও ছিল সেইরূপ গুরুগিরির দম্ভ যাহা ধর্ম্মের সাধনায় প্রায়ই ফুটিয়া উঠিতে ছাড়ে না।

মাণ্ডুক্যসঙ্ঘের জ্ঞান-সরোবরের এই হংস বা পরমহংসকে কি উপায়ে বিদায় দেওয়া চলে, সদানন্দের মনে সেই ভাবনা কঠ-কাঠক-প্রশ্নের মত কঠিন হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহার বয়স্য কাশীনাথ আসিয়া জুটিলেন। সদানন্দ একটু বল পাইয়া স্বামীজিকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সদানন্দ জানিতেন যে স্বামীজির প্রার্থনা চাঁদা, তবে তিনি তাহা দিবেন না স্থির করিয়াছেন। কথার সোজা উত্তর না দেওয়া গুরুগিরির লক্ষণ; স্বামীজি সদানন্দকে পরলোক বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

সদানন্দ বলিলেন,—মহাশয়, আমি বুজরুগি করিনা বলিতে পারিব না, তবে আমি নচিকেতাও নই, থিওসফিষ্টও নই যে ওপারের কথার একটা প্রত্যক্ষ সংবাদ দিব। স্বামীজি নিজমূর্ত্তি ধরিয়া ভ্রূ কোঁচ্‌কাইয়া বলিলেন, আপনি কি নাস্তিক? এবারে সদানন্দের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা দেখা দিল; তিনি জবাবে বলিলেন—যাহা সত্য, যাহা আছে তাহা না মানা ও সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিক কথা মানা যদি নাস্তিকতা হয়, তবে আপনিও নাস্তিক, আমিও নাস্তিক, সকলেই নাস্তিক, তাহা ছাড়া মহাভারতে পড়িয়াছিলাম—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণে দান চাহিলে নাস্তি বলে, সে ব্যক্তিও নাস্তিক। ধরুন, আপনি যদি আপনার পরমহংস-সঙ্ঘের সেবার জন্য কিছু চাহিতেন আর আমি না দিতাম, তাহা হইলেও হইতাম নাস্তিক। এই শেষ কথাটিতেই স্বামীজি বা পরমহংস ক্ষীরে-নীরে প্রভেদ করিতে পারিলেন, কাজেই আর ধর্ম্মালোচনার প্রয়োজন দেখিলেন না; তিনি সাধনসুলভ ক্রোধে বাহিরের মুক্ত বাতাসে চলিয়া গেলেন।

কাশীনাথ বলিলেন—দাদা, হংসটি যে উড়িল, কিন্তু পরলোক কি নাই? যে অত্যধিক উত্তাপে পৃথিবীর সকল উপকরণ পুড়িয়া ও গলিয়া পড়িয়াছিল, সে উত্তাপ কমিতেই যদি জড়ের উপকরণে জীবনের সৃষ্টি হইতে পারিয়াছিল তবে শ্মশানের দাহে সব পুড়িয়া শেষ হইতে পারিবে কি? সদানন্দ স্মিতমুখে কাশীনাথের হাত ধরিয়া বলিলেন—কাশী প্রাপ্তির কথা আর একদিন হইবে। সেই সময়ে সদানন্দের প্রতিবেশী আর এক বুড়া অতীত জীবনের আনন্দের উৎসবের কল্পনায় বিভোর হইয়া তাহার দাওয়ায় বসিয়া ভাঙ্গা গলায় গাইতেছিল —মনে রইল সই, মনের বেদনা। সদানন্দ বলিলেন—শুনিতেছ, কাশীনাথ! আমাদের বিদায় হইবে, সংসারের সঙ্গে বিরহ ঘটিবে আর সেই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনের কথা মনেই থাকিয়া যাইবে; জীবনের প্রহেলিকা মনের মত করিয়া বোঝাও যাইবে না, খুলিয়াও বলা হইবে না।

"বাঙ্গালীর অতীত"

(উত্তর)

পৌষ মাসের বঙ্গবাণীতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত মহাশয় "বাঙ্গালীর অতীত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বাঙ্গালাদেশের কোন ইতিহাস নাই, থাকিলেও তাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। কিন্তু আমাদের অনেকেই গ্রীস, ইটালি এমন কি প্রাচীন ইজিপ্ট ও ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া ফরাসী-বিপ্লব ও অ্যামেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ প্রভৃতি ঐতিহাসিক তথ্য নখদর্পণে দর্শন করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় বাঙ্গালাদেশের সম্বন্ধে উপর উপর দুএকটি কথা নাড়া-চাড়া করিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মাঝে মাঝে এদেশের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াস পান—ইহা আমাদের চরম দুর্দ্দশা।

প্রথমতঃ লক্ষ্মণসেনের পলায়নের কথা। ইতিহাস একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে লক্ষ্মণসেন তৎসময়ে একজন দিগ্বিজয়ী মহাবীর ছিলেন। মিথিলা এমনকি বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কথা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এদিকে মুসলমানেরা অপ্রতিহত গতিতে উত্তর ভারত জয় করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছিল।—লক্ষ্মণসেন তাহাদের বিজয় অভিযানের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন। রাজপুতগণ হটিয়া গেলেন, মগধরাজের উন্নত মস্তক নত হইল। নালন্দার বিরাট গ্রন্থশালা পুড়িয়া ছাই হইল, ওদন্তপুরের উপর নিদারুণ আঘাতের শব্দ বাঙ্গলার কর্ণকুহরে পৌঁছিল। শত শত মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুক ও দেব-বিগ্রহের উপর নির্ম্মমভাবে অসি চালাইয়া মুসলমানেরা বাঙ্গলা দেশের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সেনবংশের নবাধিকৃত। তাহাদের প্রকৃত শাসনকেন্দ্র ছিল পূর্ব্ববঙ্গ, তাহাদের নৌবাহিনী ছিল দেশবিজয়ী। লক্ষ্মণসেন বুঝিয়াছিলেন, স্থলযুদ্ধে মুসলমানদিগকে প্রতিরোধ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইবে। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপে বসিয়া ক্রম-অগ্রসর মুসলমানগণের অভিযানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, এদিকে পূর্ব্ববঙ্গে সোণার গাঁয়ে শক্তিসঙ্ঘ নিবিড় করিয়া পুষ্ট করিতেছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার বিপুল নৌবাহিনীর সম্মুখীন হইয়া জয়ী হইতে পারিবে না, একথা তিনি জানিতেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার রাজ্যের বিশিষ্ট সামন্ত ও বণিক সম্প্রদায় পশ্চিম বঙ্গ হইতে তাঁহাদের ধনরত্নসহ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানীতে ইতিপূর্ব্বেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের বিপুল ঐশ্বর্য্য তিনি পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। যখন মুসলমানেরা আসিলেন, তখন তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৮০ বৎসর বয়সে বৃথা রক্তপাত ও যুদ্ধজনিত অযথা প্রজাধ্বংসের ইচ্ছা মহাবীরের পক্ষেও সম্ভাবিত নয়। ১৭ জনই আসুক বা ৭ জনই আসুক লক্ষ্মণসেন জানিতেন, তাহারা বিপুল মুসলমান বাহিনীর অগ্রদূত মাত্র, পঙ্গপালের কয়েকটি মাত্র উড়িয়া অগ্রে আসিয়াছে। তিনি পূর্ব্বেই তাহাদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এজন্য নিশ্চয়রূপে অবধারিত বৃথাধ্বংসকার্য্যের সহায় না হইয়া যেখানে তাঁহার শক্তি অলঙ্ঘ্য সে স্থান আরো সুদৃঢ় করিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় নবদ্বীপ বিজয়ের সওয়াশত বৎসর পর পর্য্যন্ত সেনবংশ অপ্রতিহতভাবে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সে অনেক কথা। এরূপ অবস্থায় সিংহাসন ত্যাগ করিলে হিন্দু স্মৃতিকারদের মতে রাজার সে সিংহাসনে আর দাবী থাকে না,—বিশেষ ৮০ বৎসর বয়সে রাজত্ব করিবার সাধ তাঁহার মিটিয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনে তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং খুলনা গমন করেন। সেনহাটির নিকট তাঁহার স্থাপিত সেনের হাট এখনও আছে,—প্রতাপাদিত্যের সভাসদ্ কবিরাম তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন সেনহাটি গ্রাম লক্ষ্মণসেন স্থাপন করিয়াছিলেন। * তথায় তাঁহার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত বিজয় চণ্ডী বিগ্রহ লইয়া আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন পলায়নের পর যে নগরীতে বাস করিয়াছিলেন মুসলমান ইতিহাস লেখক তাহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একটা নোক্তার ভুলের জন্য তাহার পাঠ বিকৃত করিয়া অনেকে উহা জগন্নাথ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন,—বস্তুত উহা শাক্নাট—খুলনা জেলার একটি গ্রাম, জগন্নাথ নহে। গৃহীরা তীর্থবাস করিবার জন্য কখনও জগন্নাথে যান না, শুধু তীর্থদর্শনের জন্য তথায় যাইয়া থাকেন। বাস করিবার জন্য হিন্দুরা কাশীতে যাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ লক্ষ্মণসেন যে পুরীতে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, এরূপ কোন ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী সেদেশে নাই। শাক্নাট নগরী এখন বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত,—তাহা লক্ষ্মণসেনের কীর্ত্তিকলাপ এখনও বুকে করিয়া আছে। সতীশবাবুর ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক তথ্যের একটু আভাস আছে।

বল্লালসেন যে কৌলীন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা ২৭ বৎসরের জন্য। নির্দ্ধারিত ছিল এই সময় অতিক্রান্ত হইলে পুনরায় গুণের বিচার হইয়া নূতন কুলীন-পর্য্যায়ের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু দুর্দ্দিনে যখন লক্ষ্মণসেন দেখিলেন, তাঁহার পিতৃসৃষ্ট এই কুলীন সম্প্রদায়ই তাঁহার প্রধান সহায় ও পৃষ্ঠপোষক, তখন তিনি কৌলিন্য গুণগত না করিয়া তাহা বংশানুগত করিয়া ফেলিলেন। কুলীনেরা এই অপ্রত্যাশিত সম্মান ও বংশ-পরম্পরায় গৌরব লাভ করিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ও প্রধান সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি খুলনায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করিতে যান নাই, তিনি স্বীয় অন্তরঙ্গ ও ভক্তদের আশ্রয় স্বরূপ তথায় জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জীবন ভরিয়া তিনি বহু সংগ্রাম বিজয় করিয়া দিগ্বিজয়ী সম্রাট হইয়াছিলেন। এবার তিনি প্রেম ভক্তি ও অনুরাগের এক নব সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার রাজা হইয়া দাঁড়াইলেন। খুলনাজেলা ও তদুপান্তে বরিশালে তিনি অনেক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা ও ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। সেনের কাটির প্রকাণ্ড বাসুদেবের মূর্ত্তি লক্ষ্মণসেনের ন্যায় বড় রাজা না হইলে কে নির্ম্মাণ করাইতে পারিত? মৌভোগ, খেয়াভোগ প্রভৃতি স্থানের নামেও আমরা তাঁহার প্রদত্ত বহু দেবোত্তর ভূমির প্রমাণ পাইয়াছি। দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হাইকোর্টের উকিল ব্রজবাবু আমাকে বলিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন প্রদত্ত দানপত্র এখনও খুলনায় অনেক ব্রাহ্মণের নিকট পাওয়া যায়। এই জন্যই যশোর ও খুলনা শত শত বৎসর পূর্ব্বে কৌলিন্যের একটা প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের বহু পূর্ব্বে—লক্ষ্মণসেনের সময় হইতে উচ্চশ্রেণীর কুলীনেরা যশোর খুলনায় বসবাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা বংশাবলী খুঁজিলেই দৃষ্ট হইবে। কুলীনদিগের স্রষ্টা এবং প্রধান আশ্রয়দাতা সেনবংশ, সুতরাং তাঁহারা এ বংশের অনুগামী হইবেন তৎসম্বন্ধে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে? তাহা না হইলে যশোর-খুলনা প্রাচীন কালে উচ্চ হিন্দু সমাজের কুলীনকেন্দ্রে পরিণত হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

লক্ষ্মণসেনের কলঙ্ক সম্বন্ধে যাহা আমার বক্তব্য তাহা আমি লিখিলাম।

* বিশ্বকোষ অভিধান দেখুন।

মহাবংশে উল্লিখিত বাঙ্গালীর সিংহল বিজয়ের কথা কাল্পনিক নহে। বহু বাঙ্গালী পরিবার যে খ্রীঃ পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে তথায় বাস করিয়া আসিতেছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। সিংহলবাসীদের আচারব্যবহার ও আকৃতিপ্রকৃতিতে আমাদের সঙ্গে তাহাদের সাদৃশ্য বিশেষরূপে বিদ্যমান। সিংহলী ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষার শব্দগত সাদৃশ্য এত বেশী যে বাঙ্গালীর সিংহল বিজয় শুধু ভাষার দিক দিয়াও প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার সঙ্গে সিংহলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিংবদন্তী প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের নানাস্থানে বিদ্যমান। ধনপতি, শ্রীপতি এবং অপরাপর বণিকরাজগণের সফরের কাহিনী সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন। যবদ্বীপের বরোবদর মন্দিরে, বালির প্রম্বনমের নানা কারুকার্য্যমণ্ডিত দেবালয়ে, ক্যাম্বোডিয়ার ভগ্ন স্তূপে বাঙ্গালী শিল্পির কৃতিত্ব এখনও বিদ্যমান। চীন ও জাপানে বাঙ্গালীরা যাইয়া যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইতেছি। জাপানের হুরিয়োজি মন্দিরে রক্ষিত কোন ধর্ম্মগ্রন্থে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যাহার প্রতিলিপি অক্সফোর্ড পাঠাগারে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ, একাদশ শতাব্দির বঙ্গাক্ষর। এখনও জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিতেরা ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরের সঙ্গে তাহার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। শান্ত রক্ষিত বিক্রমপুরের অধিবাসী, তিনি হিউএনসাংএর সময় নালন্দা বিহারের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। দীপঙ্কর বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্র-যোগিনীবাসী। তিনি তিব্বতে প্রায় বুদ্ধের মতই পূজিত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণবিহারীবাবু লিখিয়াছেন 'বৌদ্ধ যুগে অতীশ, দীপঙ্কর প্রভৃতি বাঙ্গালী ধর্ম্মবীরের কথা শুনিতে পাই বটে......আজ তাঁহাদের স্মৃতি এতই ক্ষীণ যে এখন তাঁহাদের লইয়া গর্ব্বপ্রকাশে আমাদের দীনতাই বেশী ফুটিয়া উঠে।' তিব্বতবাসীরা যে এখনও তাঁহাকে মন্দিরে মন্দিরে পূজা করিয়া থাকেন! কিন্তু তিনি একাদশ শতাব্দির লোক। বুদ্ধের পর এত বড় লোক যে বৌদ্ধ জগতে বিরল, এই সামান্য কথাটাও তিনি জানেন না! তাঁহার অজ্ঞতা আর একটি কথায় বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে। তিনি লিখিয়াছেন 'অতীশ, দীপঙ্কর প্রভৃতি' —কমাটি দিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝাইতেছেন অতীশ ও দীপঙ্কর দুই পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু অতীশের উপাধি দীপঙ্কর। ইঁহারা দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি নহেন, ইহা তিনি জানেন না। তিব্বতি ভাষায় দীপঙ্করের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীবনচরিত আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিব্বতি শিক্ষক অকালে মৃত মহাপণ্ডিত লামা পদ্মরাজ আমাকে তিব্বতি ভাষায় লিখিত দীপঙ্করের এক বিরাট জীবন চরিতের হস্তলিখিত পুঁথি (প্রায় একহাজার পত্র বিশিষ্ট) দেখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন 'দীপঙ্কর সম্বন্ধে তিব্বতি ভাষায় বিস্তর পুস্তক আছে। তিব্বতবাসীরা তাঁহাকে বুদ্ধের মতই সম্মান করিয়া থাকেন।'—এহেন মহাপুরুষকে লইয়া গৌরব করিলে নাকি 'আমাদের দীনতাই বেশী ফুটিয়া উঠে!' আমাদের প্রধান দীনতা 'এই যে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে তিব্বতে যে সকল গ্রন্থ ও কিম্বদন্তী আছে—তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ না হওয়া পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে আমরা অজ্ঞই থাকিয়া যাইব।

বাঙ্গালীরা যে স্বাধীনতাকে কত ভালবাসিতেন তাহা বারভুঞার কীর্ত্তিকলাপেই প্রতিপন্ন হইবে। এই বারভুঞা শুধু আকবরের সময়ের বারভুঞা নহেন। প্রত্যেক হিন্দু রাজার অধীনেই বারজন সামন্ত রাজা থাকিতেন। এই প্রথা গ্রীসের অনুরূপ। রাজপুতদের মধ্যেও রাজাদের অধীনে বারজন সামন্ত রাজা থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেদিন পর্য্যন্তও ত্রিপুরা রাজ্যে তদ্রূপ বারজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই ধারা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের ধর্ম্মমঙ্গলে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালাদেশের কত রাজা যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দিতে মুসলমান সম্রাটদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনতার

পতাকা উড়াইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। ত্রিপুরার রাজমালায় মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ইতিহাস পাঠ করুন। তিনি মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়া মোগল সেনাপতিকে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে বলি দিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য ২২বার মোগলবাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মানসিংহের দূত তাঁহার নিকট বেড়ি ও অসি লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিল—'মহারাজ হয় বেড়ি (পরাধীনতার শৃঙ্খলের চিহ্ন) নতুবা অসি গ্রহণ করুন।' প্রতাপাদিত্য সদর্পে বলিয়াছিলেন 'বেড়ি দিও আপনার মনিবের পায়' এবং অসি গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, মোগলসৈন্য পরাজিত করিয়া 'যমুনার জলে ধোব এই তরবারী'—বিপক্ষরক্তলাঞ্ছিত এই অসি তিনি যমুনার জলে ধুইবেন,—এই ছিল তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা। জয়-পরাজয় ঈশ্বরেচ্ছাধীন। কিন্তু এই বিক্রান্ত তেজস্বিতার তুলনা কোথায়? শুধু প্রতাপাদিত্য নহেন, তৎসময়ের বারভুঞার অপরাপর ভুঁঞাগণও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কায়স্থবীর চাঁদরায় ও কেদার রায় মানসিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ আকবরের সময় বাঙ্গালীরা যে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয়। বঙ্গের সম্রাট দায়ুদ খাঁ যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। রাজপুত বিশোয়ারা ক্ষত্রিয় বংশের প্রদীপ কালিদাস গজদানি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সোলেমান নামে পরিচিত হন। ইঁহারই পুত্র বারভুঁঞাদের অন্যতম নেতা ইশাখাঁ—যিনি ঘোড়াঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার বীরত্ব কাহিনী ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। শুধু আইন-ই-আকবারীতে নহে, বাঙ্গলার বহু পল্লীগাথায় ইহার অমর কীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মানসিংহের সঙ্গে ইনি হাতাহাতি যুদ্ধ করিয়া এরূপ সংগ্রামনৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন যে উদারচরিত্র আকবর ইহাকে 'মসনদআলি' উপাধি দিয়া সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার বন্ধুত্বাভিমানী হইয়াছিলেন। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় পরেও এই ক্ষত্রিয় পরিবার হিন্দুদের রীতিনীতি এতটা রক্ষা করিয়াছিলেন যে পল্লীগাথায় দৃষ্ট হয় গোঁড়া মুসলমানেরা তজ্জন্য ইঁহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। ইশা খাঁর বংশধর দেওয়ান ফিরোজ খাঁ মোগলের দাসত্ব দুঃসহ মনে করিয়া যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি নবীন যৌবনে ভোগবিলাস ছাড়িয়া দিয়া উদাসীনের মত কেবলই ভাবিতেন, কি করিয়া তিনি মোগলের দাসত্বশৃঙ্খল ভগ্ন করিবেন। একদিন তিনি তাঁহার মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—

"বড়বংশের বেটা আমি শুন সাহেবগণ।
বাদশার সহিত যারা করিয়াছিল রণ॥
বংশের প্রধান দেখ ইশা খাঁ দেওয়ান।
যাঁর কাছে বাদশার ফৌজ পাইল অপমান॥
এমন বংশেতে আমি লয়েছি জনম।
এখন উচিত আমার শুন দিয়া মন॥
আল্লাতল্লা পয়দা করাইলেন[১] দুনিয়া ভিতরে।
মরজি[২] করি পাঠাইলেন জঙ্গলবাড়ি স'রে[৩]॥

১। পয়দা করাইলেন—আবির্ভাব করাইলেন।

২। মরজি—ইচ্ছা।

৩। জঙ্গলবাড়ি স'রে—জঙ্গলবাড়ি সহরে। জঙ্গলবাড়ি ইহাদের রাজধানী ছিল।

যতেক খিরাজ[1] পাই তার আধাআধি।
দিল্লিতে পাঠাইয়া আমি রাখিয়াছি গদি ॥
এমন গদিতে আমার নাই প্রয়োজন।
আমার মনের কথা শুন সাহেবগণ ॥
আর না পাঠাইব খিরাজ দিল্লীর সহরে।
আর না যাইবাম আমি বাদশার দরবারে ॥
যা করে বাদশার ফৌজ করুক আমারে।
লড়িয়া মরিবাম আমি খুদার কুন্তরে[2] ॥
যা থাকে নছিবে[3] মোর শোন মিঞাগণ।
খিরাজ[4] বান্ধিয়া আমি ডাকাইবাম মরণ ॥"

—পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা
দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

বঙ্গদেশের হিন্দুরাজগণের গৌরবের কথা বিচ্ছিন্নভাবে নানারূপ উপগল্পে জড়িত হইয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে স্থান পাইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া ময়নাগড়ের কর্ণসেন ও তৎপুত্র লাউসেনের কীর্ত্তিকথা উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা পঞ্জিকা সমূহে মহীপাল, আকবর প্রভৃতি কলিযুগের শ্রেষ্ঠ রাজগণের নামের সঙ্গে লাউসেনের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়, এখনও তাঁহার প্রাসাদের বিস্তৃত ভগ্ন স্তূপ রহিয়াছে। ইছাই ঘোষের দুর্গ, তদধিষ্ঠিতা শ্যামরূপা দেবীর মন্দির, লাউসেন পূজিত ধর্ম্মঠাকুর, ভীমকৈবর্ত্তের জাঙ্গাল, বাখরগঞ্জের যমসদৃশ অর্জ্জুন রাজার স্মৃতি এবং বঙ্গীয় বহু পল্লীতে অপরাপর বড় বড় রাজার কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ—এসকল উপাখ্যান নহে। মালিকাবিচ্ছিন্ন কুসুম পংক্তির ন্যায় বঙ্গীয় ইতিহাসের বহু উপাদান সর্ব্বত্র পড়িয়া আছে। মালী নাই,—মালা গাঁথিবে কে? সাহেবেরা ইতিহাস লিখিয়া দিলে তবেত আমরা নকল করিব! সপ্তদশ শতাব্দিতে বনবিষ্ণুপুরের মহারাজ বীর হাম্বির, গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহার অব্যবহিত পরে গৌড়দ্বারের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা চাঁদ রায় ও তাহার ভ্রাতা সন্তোষ রায়কে কতলুখাঁ এত ভয় করিতেন যে, কর্ম্মচারী পাঠাইয়া রাজস্ব আদায় করিতে সাহস করিতেন না। তেমন কোন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের একখানি উজ্জ্বল চিত্রপট অঙ্কিত হইতে পারে, তাহার মহিমা কোন দেশের গৌরব অপেক্ষা ন্যূন হইবে না।

কিন্তু রাজসিক ধর্ম্মের পর এদেশে সাত্ত্বিক ধর্ম্মের মহিমা যেরূপ উজ্জ্বল হইয়াছে, জগতে অন্যত্র তাহার তুলনা আছে কিনা জানিনা। রমণীধর্ষণের অপরাধে মহারাজ রামপাল—যাঁহার নাম লাঞ্ছিত নগরী ও দীর্ঘিকা বিক্রমপুরের বুকে সাত্ত্বিক মহিমাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে—সেই পবিত্রকীর্ত্তি পুণ্য শ্লোক মহারাজ রামপালদেব তাঁহার একমাত্র বংশধরকে শূলে দিয়াছিলেন। রামচরিত নামক সংস্কৃত ঐতিহাসিক গ্রন্থে এই অপূর্ব্ব বিচারের

১। খিরাজ—খাজনা, রাজস্ব।
২। খুদার কুন্তরে—ঈশ্বরের কৃপায়।
৩। নছিব—কপাল।
৪। খিরাজ......মরণ—রাজস্ব বন্ধ করিয়া আমি মৃত্যুকে ডাকাইয়া আনিব।

কথা বিবৃত হইয়াছে। সেক শুভোদয়া গ্রন্থে লিখিত আছে যখন লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী বল্লভা দেবীর ভ্রাতা কোন বণিক সীমন্তিনীকে অপমান করায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন, তখন রাণী স্বয়ং রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্রোধস্ফুরিতাধরে বলিলেন 'আমার ভ্রাতাকে কোন্ বিচারক বিচার করিবে? এক কুলটার কথায় প্রত্যয় করিয়া কে আমার ভ্রাতার কেশস্পর্শ করিবে? এরূপ স্পর্দ্ধা কোন্ বিচারকের আছে আমি জানিতে চাই।' তখন ভয়ে হলায়ুধ প্রভৃতি মন্ত্রীগণের মুখ শুখাইয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে অজীনাসন, কৌপিনদণ্ডধারী, অশিতিপর বৃদ্ধ আচার্য্য গোবর্দ্ধন দণ্ড লইয়া রাণীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার চক্ষু সজল, ওষ্ঠাধর বিকম্পিত, তিনি মূর্ত্তিমান বিচারবেশে লক্ষ্মণসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'তুমি না সেই সিংহাসনে বসিয়াছ যে সিংহাসনে মহারাজ রামপাল একদিন উপবেশন করিয়া এইরূপ অপরাধে স্বীয় একমাত্র পুত্রকে শূলে দেওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন?' এই বলিয়া হাতের দণ্ড ফেলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। রাজা সিংহাসন হইতে নামিয়া আচার্য্যের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। বাঙ্গালার ইতিহাস এইরূপ নির্ভীক সাত্ত্বিক মহিমায় উজ্জ্বল। অত দূরের কথা নহে, ৫০০ বৎসর অতীত হইল রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস যেদিন গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বরচিত পঞ্চশ্লোক আবৃত্তি করিয়া চমৎকৃত করিয়া দিলেন, সভাসদ পণ্ডিতদের মধ্যে কেদার খাঁ কবির মস্তকে চন্দনের ছড়া ঢালিতে লাগিলেন এবং মহারাজা খুসী হইয়া তাঁহাকে পুষ্পমাল্য উপহার দিলেন,—তখন মন্ত্রীরা তাঁহাকে একবাক্যে উপদেশ দিলেন "মহারাজ প্রীত হইয়াছেন, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করুন। মহারাজ নিশ্চয়ই তাহাই আপনাকে দিবেন।" তখন কবি সদর্পে বলিলেন "আমি কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ করি না। আমার কবিতায় মহারাজ প্রীত হইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট—প্রতিগ্রহ করা আমার রীতি নয়।" আজকাল কয়টি ব্রাহ্মণ এরূপ নিঃস্বার্থভাবে বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারেন? এই ত্যাগ ও স্বার্থত্যাগের ভিত্তির উপর রাজাদেশে বাঙ্গলা রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। ইহার ভিত্তি সারবান গুণগরিমায় দৃঢ়। তাই পাঁচশত বৎসর পরেও বঙ্গের ঘরে ঘরে ইহা আদর পাইতেছে। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বহু অর্থলোভ দেখাইয়াও কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে তাঁহার সভায় আনিতে পারেন নাই। তিনি তিন্তিড়ির ঝোল দিয়া ভাত খাইয়া স্বীয় কুঁড়ে ঘরে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জ্ঞানানুশীলন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এক শতাব্দি পূর্ব্বে উইলসন সাহেব সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পাঁচশ টাকা মাসিক বেতন দিতে স্বীকৃত হইয়াও কোন ব্রাহ্মণকে এই পদ গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। একজন বৈদ্য পণ্ডিত রাখিয়া তিনি সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণবাবু রাজসিক বৃত্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং সেই হিসাবে বঙ্গীয় কাব্য নায়কগণের মধ্যে চাঁদসদাগরের প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গদেশে ভাব রাজ্যের গোলকুণ্ডা স্বরূপ যে পল্লী-গীতিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, দুঃখের বিষয় তৎসম্বন্ধে তিনি অবহিত নহেন। এই গীতিকাগুলি বঙ্গদেশের সাহিত্যিক আলোকচিত্র। কোন ইতিহাস, কোন ইতিবৃত্ত, বঙ্গদেশ, বঙ্গসমাজ তথা বঙ্গীয় রীতিনীতির এরূপ নিখুঁত চিত্র দিতে পারিত কি না সন্দেহ। যাঁহারা এই গীতিকাগুলি পাঠ করিবার সুবিধা পান নাই, বঙ্গদেশ তাঁহাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছে। এই গীতিকাগুলিতে যে সকল চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া। বাঙ্গালা দেশে মানুষ জন্মে নাই, কিম্বা বঙ্গদেশ অপরাপর জাতির সঙ্গে তুলনায় মনুষ্যত্ব হিসাবে খাট, যাঁহারা এই মত পোষণ করেন তাঁহারা একবার এই অভিনব ও সমৃদ্ধ চিত্রশালা দর্শন করুন। বাঙ্গলাদেশ হিন্দু ও মুসলমান লইয়া। এই

গীতিসাহিত্যে এই দুই সমাজেরই অপূর্ব্ব চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। বঙ্গভাষা শুধু হিন্দুর নহে, ইহাতে মুসলমানেরও তুল্য অধিকার, এই তথ্য গীতিকাগুলিতে পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান গায়কেরা সম্মিলিত কণ্ঠে এই সকল গান গাহিয়াছে। ব্রাহ্মণ গর্গ ও চণ্ডালগৃহে প্রতিপালিত ব্রাহ্মণকুমার কঙ্কের কাব্যময় গীতি পাঠ করুন—একজন শুভ্র সাত্ত্বিক মহিমান্বিত হইয়াও অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের ন্যায় রাজসিকভাবে ধূমাচ্ছন্ন। তাঁহার পবিত্রতা ও ঔদার্য্য যেরূপ অবাধ, তাঁহার ঘৃণা ও ক্রোধ দুই-ও তেমনি সুদূর প্রসারিত। কুসুমকোমল অথচ বজ্রকঠিন এরূপ চরিত্রের আজ সমকক্ষ পাওয়া দুষ্কর। কঙ্কের চরিত্র শর্করার ন্যায় মধুর,—তাহার প্রেম ও স্নেহ যেন হরিদ্বারের উৎস। তিনি ক্ষমায় অপরাজিত, কবিত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় অতুলনীয়। আশে পাশের সমস্ত দৃশ্য ছাপাইয়া উঠিয়াছে দস্যু কেনারামের চিত্র। তাহার ভয়ঙ্করত্ব অশিক্ষিত অথচ অপূর্ব্ব বাক্‌পটুতা,—তাহার কাল করাল ভৈরবমূর্ত্তি ষোড়শতাব্দীর কবি চন্দ্রাবতী ভিন্ন কে আঁকিতে পারিত? কবি স্বচক্ষে এই ভীষণ দস্যুকে দেখিয়াছিলেন, তাই তদীয় কাব্যে এই মহামূর্ত্তির স্বরূপ এরূপ যথাযথভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। যখন এই দস্যু ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ভীষণ অনুতাপ, সর্ব্বস্বপণ আত্মত্যাগের কাছে জগাই মাধাইএর ধর্ম্মভাব কোথায় লাগে? নৈশ নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া শত শত মশালে আলোকিত জালিয়ার হাওড়ে যখন নারদের মত বংশীদাস ভক্তির গান গাহিতে লাগিলেন তখন সেই দস্যুর নির্ম্মম পাষাণ হৃদয় কুসুমাদপি কোমল হইয়া পড়িল। এই জটিল ও ভীষণ মহিমান্বিত চিত্রটি একবার দর্শন করুন। মনসুর দস্যুর পরিবর্ত্তনও কেনারামেরই অনুরূপ। অগণিত অর্থ করায়ত্ত, এই সময়ে তাহার মুখোচ্চারিত 'লাহে লাহেল্লেলা' ধ্বনি বেদমন্ত্রের ন্যায় গৃহস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যে চিত্র প্রকটিত করিল তাহা পাঠকের মনে চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে। আমীর, মুনীর বৈদ্য, টোনা বারুই, চাঁদ ভাণ্ডারী প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাঙ্গালীর যে গুণগরিমা প্রকাশিত করিতেছে তাহা বঙ্গীয় গাথার বিজয়কেতন। আমাদের স্থান সঙ্কীর্ণ, এই পল্লীগীতিকার ক্ষেত্র মধ্যভারতের 'খেজুরাহের' অজন্তা, এলিফ্যাণ্টা, ও বরোবদরের ন্যায়ই বিস্তৃত। পাঠক একবার স্বয়ং এই গীতিকা-গুলির সহিত পরিচিত হউন। তাহা হইলে কৃষ্ণবাবুর ন্যায় বিলাপের সুরে বলিবেন না যে বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যে কোন প্রধান পুরুষের চিত্র নাই। "আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে, আঁধার ঘরে খুঁজতে গেলি"—আমাদের এই অবস্থা! নিজের দেশে এই অমূল্য রত্নরাজি থাকিতে আমরা নিজেদের রিক্ত মনে করিতেছি। ইহার অপেক্ষা দুর্দ্দশার কথা আর কি হইতে পারে? গীতিকাগুলির স্ত্রী-চরিত্র সমূহের উজ্জ্বলতার নিকট মনে হয় যেন বিশ্বসাহিত্যের সমস্ত মহিলাচিত্র পরিম্লান। হয়ত আমি স্বদেশপ্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া কতকটা অতি-রঞ্জন করিতেছি কিন্তু আমি ইহাদের এমনি গুণমুগ্ধ যে আমার সরল প্রাণের কথাই নিবেদন করিতেছি। আমাদের পল্লীসাহিত্যের পম্পা হ্রদে যে কত সদ্যবিকশিত শতদল ফুটিয়া আছে, তাহাদের সৌন্দর্য্য ও সুরভি মহিমায় শুধু বঙ্গদেশ নয়, সমস্ত ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে।

এই সকল চরিত্র সমাজের আজ্ঞাধীন ভৃত্য নহে। ইহাদের প্রেম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, নির্ভীকতা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে স্বকীয়। মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা, মদিনা কাঞ্চনমালা প্রভৃতি চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা নহে। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মহিমায় প্রভাময়। প্রত্যেকের কোন না কোন এমন বৈশিষ্ট্য আছে যাহাতে ইহারা আমাদের পূজার্হ। বৃথা সতীত্বের ঢাক বাজাইবার চেষ্টা নাই অথচ ইহারাই আমাদের সেই দেবী, যাঁহাদিগকে আমরা আশ্বিনে ভগবতীরূপে, কার্ত্তিকে লক্ষ্মীরূপে, মাঘে সরস্বতীরূপে, চৈত্রে অন্নপূর্ণা ও ভাদ্রে পদ্মারূপে পূজা করিয়া থাকি। কৃষ্ণবাবু আমাদের দেশে গৌরব করিবার কিছু পান নাই। তিনি ইতিহাস জানিতে

চেষ্টা করেন নাই, অথচ দেশের ইতিহাসের উপর কাদামাটি ছড়াইয়াছেন। শিক্ষিত সমাজের এই প্রবৃত্তি স্মরণ করিলে আমাদের কষ্ট হয়। বঙ্গ'লক্ষ্মী' ইহাদের নিকট মুখ লুকাইয়াছেন। আমরা ত নিলাম হইয়া গিয়াছি। এখনও আমাদের যাহা কিছু গৌরব তাহা চাষাদের কুটীরে,—বিদেশী আবহাওয়া হইতে দূরে বামুনপণ্ডিতের টোলে ও বণিকদের আঙ্গিনায় ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাইয়া কথঞ্চিৎ জীবিত আছে। আর আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে একান্ত নিষ্কর্ম্মা, শুধু পরকীয় অভিনয় করিয়া জীবন যাপন করিতেছি।

কৃষ্ণবাবু বঙ্গদেশের অজেয় নব্যন্যায়ের একটিবার নাম করিলেন না। মধ্যযুগে যে কত নৈয়ায়িক বঙ্গদেশে অতুল্য গৌরবের দীপশিখা জ্বালাইয়া ভারতবর্ষের সমস্ত বিদ্যাকেন্দ্র হইতে পূজা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম তিনি করিলেন না। নবদ্বীপের জগজ্জয়ী টোলের কথা একটিবার বলিলেন না। অথচ অশোক এবং মগধ রাজবৃন্দের কথা লইয়া আমরা কেন গৌরব করি তজ্জন্য ধিক্কার দিতে কসুর করিলেন না। তিনি কি জানেন না যে নালন্দা ও বিক্রমশীলা ধ্বংসের পর মুসলমানকৃত নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া মগধের উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিরা দলে দলে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যে গন্ধ বণিককুল উজ্জ্বল করিয়া চাঁদসদাগর লক্ষ্মীন্দর এবং বেহুলা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা এই পূজার প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তাঁহারা মগধ ত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া মনসাদেবীর পূজা এদেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত করেন। এখনও বিহারে বেহুলানদী ও চম্পাই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ দর্শন করিলে ইহা প্রতীত হইবে। সম্প্রতি পৌষমাসে গন্ধবণিক পত্রিকার ৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, "ভাগলপুরের উপকণ্ঠে গন্ধবণিকের উপাস্য মনসাদেবী ও গন্ধবণিক কুলরত্ন চাঁদসদাগর ব্যাপকভাবে সেখানকার লোক কর্ত্তৃক যেরূপ ভক্তির সহিত পূজিত হইয়া আসিতেছেন, তাহাতে নিশ্চয় অনুমান করা যায় এককালে এদিকে গন্ধবণিক জাতির প্রাধান্য যথেষ্টই ছিল।" এখন সেখানে গন্ধবণিকের সংখ্যা অতি অল্প—তাঁহারা বঙ্গে উপনিবিষ্ট। পূর্ব্ববঙ্গে মনসাদেবী এবং চাঁদসদাগর ও বেহুলা প্রভৃতির মূর্ত্তি ভাদ্রমাসে পূজা পাইয়া থাকে এইভাবে বিহারের অনেক প্রাচীন প্রথা এদেশে প্রচার লাভ করিয়াছে, এবং তথাকার প্রাচীন সমাজের লোক, এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তাহার একটা ইতিহাস আছে। ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মাপুরাণের লেখক নারায়ণদেব মগধ হইতে বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে মগধ হইতে বহু ভদ্রপরিবার একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। মগধের বিহারগুলির অগ্রগামী মহিমা নবদ্বীপের সুবর্ণবিহার কাড়িয়া লইয়াছিল। মগধের শিক্ষাব্যবস্থা ও সভ্যতা নবদ্বীপকে নবভাবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গভাষা অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতের রূপান্তর। বঙ্গীয় শিল্প মাগধী শিল্পের বিকাশ। সেদিন পর্য্যন্ত মগধ (বিহার) বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং আমরা যদি মাগধ গৌরবের দাবী করি তবে তাহা অন্যায় হইবে না। সমেৎশেখর পার্শ্বনাথ পাহাড় প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থঙ্করদের নিবাস ভূমি। ২৪জন তীর্থঙ্করদের মধ্যে ২৩জন এই সমেৎশেখরে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্শ্বনাথ অষ্টাদশবর্ষ রাঢ়দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে পার্শ্বনাথের প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীনকাল হইতে অঙ্গ বঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মগধের প্রাচীন সভ্যতার দীপশিখা উত্তরকালে বঙ্গদেশে উপগত হইয়া বঙ্গমহিমাকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশের মসলীন, ঢাকার অপূর্ব্ব স্বর্ণ ও রৌপ্যের তারের কাজ, বঙ্গদেশের স্থপতি-বিদ্যা প্রভৃতি চারুশিল্প সম্বন্ধে কৃষ্ণবাবু নির্ব্বাক। ফার্গুশন সাহেব লিখিয়াছেন বঙ্গদেশের ইষ্টক নির্ম্মিত 'বাঙ্গলাঘরের' অনুকরণে

পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঐরূপ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম শিল্প জগতে অতি গৌরবান্বিত আসনের দাবী করিতেছে। এদেশের প্রাচীন প্রস্তর-বিগ্রহের মধ্যে যে সূক্ষ্ম কাজ আছে তাহা বিশেষজ্ঞগণকর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত হইতেছে। আমি নিজে কিছু সংগ্রহ করিয়াছি। দ্বাদশ শতাব্দির একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত হরগৌরী মূর্ত্তি আমার নিকট আছে, তাহার অনেকটা ভাঙা। শিবের ক্রোড়ে আলিঙ্গনবদ্ধা গৌরী বসিয়া আছেন। গৌরীর মুখখানি দস্যুরা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। শিবের করাঙ্গুলি গৌরীর চিবুক স্পর্শ করিয়াছে। সেই অঙ্গুলীর ভঙ্গী কি সুন্দর! অন্য কিছু যদি না থাকিত, তথাপি সেই অঙ্গুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইত শিব কি অপরিসীম স্নেহে গৌরীকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছেন। সেই কোমল অঙ্গুলি হইতে তীর্থোদকের ন্যায় যেন স্নেহের উৎস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। সে স্পর্শ যে কত কোমল ও কত মধুর তাহা শিল্পি আশ্চর্য্য শক্তি সহকারে গড়িয়া দেখাইয়াছেন। শিবের স্নেহপূর্ণ আনত দুটি চক্ষু ও প্রেমের নির্ঝর ধারার ন্যায় অঙ্গুলি কয়েকটি মাত্র আছে। যদিও গৌরীর মুখখানি ভাঙ্গিয়াছে তথাপি সেই চক্ষু ও সেই অঙ্গুলীগুলি যে মুখের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, তাহা যে কত সুধামাখা ও সুষমাময় ছিল তাহা অনুমানে বোঝা যায়। খৃষ্টীয় ৭ম কি ৮ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একখানি ধাতব বৌদ্ধ-মূর্ত্তি আমি বঙ্গের কোন প্রান্তভাগ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এই মূর্ত্তিখানিতে ইন্দ্রিয়াতীত মুক্ত পুরুষের হাসি ও চিন্ময় দেহের যে প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহার সৌন্দর্য্য আমার লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। তাহার দুইটি চক্ষু সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে "লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার, মধু মাতল কীয়ে উড়ই না পার।" বাঙ্গালী ভাবরাজ্যের লোক। এই ভাবরাজ্যে তুফান বহাইয়াছিলেন চৈতন্য। জগতের ইতিহাসে প্রেমাশ্রুর এরূপ বন্যা ও চিন্ময় আনন্দের এরূপ সার্ব্বজনীন বিকাশ অন্যত্র হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। বাঙ্গালী যেখানে তুলি, সূচি, কি লেখনী ধারণ করিয়া কোন সুকুমার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন সেখানে অপর সমস্ত জাতি মাথা হেঁট করিয়াছে। যাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি আছে তিনি বৈজ্ঞানিক মাফ্‌জোকের কাঠি ছাড়িয়া দিয়া ভাব-প্রকাশের সূক্ষ্ম কারিগরীর দিকে নজর দিয়া দেখিবেন—বাঙ্গালীর বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়।

চারুশিল্পের আর একটী উদারণ দিব। ৩৫ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বলাই মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে একখানি সঙ্কীর্ত্তনের ছবি আছে। এই ছবিখানি চৈতন্য তিরোধানের অব্যবহিত পরে অঙ্কিত হইয়াছিল। বলাইবাবু ইহার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ জানেন। একশত লোক লইয়া এই সঙ্কীর্ত্তন। এই এক শত লোকেরই সুস্পষ্ট ছবি ক্যানভাসটিতে আছে। স্থান ভাগীরথী তীর। এক গৃহস্থ নৌকায় হুকাহস্তে যাইতেছেন। মাঝিরা দাঁড় টানিতেছে। কিন্তু সেই অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তন দেখিতে দেখিতে কল্‌কেটী উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। গৃহস্থের চক্ষু ভ্রমরের মত চৈতন্যের মুখকমলের উপর ন্যস্ত, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া চৈতন্যের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। কলসী গঙ্গাজলে ভাসিয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃকপাত নাই, কুলললনারা চৈতন্যের বদনসুধা পান করিতেছেন। সে যে কি আনন্দ-লোক, ভাবরাজ্যের কি অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে বুঝাইব কিরূপে! এই ছবি যখন বঙ্গদেশে ভাগীরথী তীরে অঙ্কিত হয়, তখন ইটালীতে বসিয়া র‍্যাফেল ম্যাডোনা আঁকিয়াছিলেন। সেই ম্যাডোনার প্রশংসার দুন্দুভি তদবধি বাজিতেছে কিন্তু এই সঙ্কীর্ত্তনের ছবি যে শিল্পি আঁকিয়াছিলেন তিনি আধ্যাত্ম রাজ্যের পূর্ণ মহিমামণ্ডিত করিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান গৌরব-কীর্ত্তনকে তুলির টানে জীবন্ত করিয়াছিলেন—তাহা বুঝিবার লোক নাই। আমার মনে হয় জগতের মধ্য-যুগের ছবিগুলির মধ্যে এই ছবিখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার এই মত প্রকাশের

সাহসিকতার জন্ম যে দণ্ড দিতে চান দিন, কিন্তু আমি নিজে যাহা বুঝিয়াছি তাহা বলিতে আমার কোন কুণ্ঠা বা ভয় নাই।

বাঙ্গালীরা শিল্পে, কাগজে, কাপড়ে ও কাঠের উপর রং দিয়া প্রস্তর ও কাষ্ঠফলকে কুঁদিয়া যে-সব দেববিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলিতে অসাধারণ শক্তির নিদর্শন আছে। প্রতাপাদিত্যের সময়ের একখানি কাষ্ঠগৃহ খুলনায় ছিল। এই গৃহ সমস্তটাই কারুকার্য্য-মণ্ডিত। তাহাতে ফুললতা ও দেবমূর্ত্তি কুঁদিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার কিছু নমুনা আমার কাছে আছে। পোড়ামাটীর মধ্যে বিচিত্র লতাপুষ্প, দেববিগ্রহ ও দেবসহচরগণের পুত্তলিকা খোদিত হইত। এখনও অনেক প্রাচীন মন্দিরের গায়ে তাহা আছে। আর কয়েক বৎসর পরে তাহা থাকিবে না। এখনও ফরিদপুর জেলার সাচৈর গ্রামে যে মাতুর ও পাটী নির্ম্মিত হয়, তাহার এক একখানির মূল্য ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এ পোড়া দেশের গৌরবের দিকে কাহার দৃষ্টি আছে? আমরা "আমার দেশ", "আমার দেশ" বলিয়া ঘোররবে আস্ফালনপূর্ব্বক প্রাচ্য সভ্যতা ও প্রাচ্য স্বদেশী প্রেমের অভিনয় করিতেছি, এদিকে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কালের গ্রাসে যাইয়া পড়িতেছে। তাহা রক্ষা করিবার কি কোন চেষ্টা আছে! একমাত্র দেশপ্রেমিক শরৎকুমার রায় কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা কি একের কাজ?

মুসলমানবিজয়ের দুর্দ্দিনে যখন হিন্দুর কোন আশা ভরসা থাকিত না, তখন তাহাদের ধনদৌলত, দেববিগ্রহ প্রভৃতি তাহারা অনেক সময়ে পুষ্করিণী ও দীঘির জলে ফেলিয়া দিতেন। অনেক গ্রামে এই সব জলাশয় আছে। এই জলাশয়গুলি আমাদের গৌরবের সমাধি। প্রায়ই বাঙ্গালার অধুনা অজ্ঞাত কোন কোন পল্লীর দীঘি পুষ্করিণী হইতে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত দেববিগ্রহ পাওয়া যাইতেছে। তথাকথিত দেশপ্রেমিকগণ ইহাদের উদ্ধারের জন্য কি রীতিমত কোন চেষ্টা করিতেছেন? ঋষিশাপে অভিশপ্তা কমলার ন্যায় বঙ্গের ইতিহাসলক্ষ্মী এই সমস্ত দীর্ঘিকায় আত্মগোপন করিয়া আছেন। কোন্ মাতৃভক্ত সন্তান সমস্ত গ্রাম মন্থনপূর্ব্বক শাপমুক্ত করিয়া বঙ্গীয় শ্রীকে পুনরায় লোকলোচনের সম্মুখীন করিবেন?

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষ কিছু লিখিতে পারিলাম না, কিন্তু যেটুকু লিখিয়াছি তাহাতে আশা করি এই কথাটী উপলব্ধ হইবে যে, বঙ্গদেশের ইতিহাসের বহু উপকরণ এখনও নানাস্থানে ছড়াইয়া আছে। মুসলমানেরাও বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উদাসীন। কত মসজিদ চামচিকার বাসা হইয়াছে, মাকড়সার জাল দ্বারা তাহাদের প্রস্তরলিপি গোপন করিয়া রাখিয়াছে। বঙ্গের নানা স্থানে কত বিরাট রাস্তাঘাট, কত দীর্ঘিকা, কত রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা স্বকীয় বিজয়কেতন উড়াইয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্ম কি কেহ চেষ্টিত?

আমরা অতি সহজে ইংরাজ লিখিত ইতিহাসের অনুবাদ পাঠ করিয়া সবজান্তা হইয়া বসি। কিন্তু হে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্যমান্য কৃষ্ণবিহারীবাবু! নিজের দেশের গৌরবের উপর এমনভাবে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিবেন না। আমাদের কিছু নাই, পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া যদি আমাদের নির্জ্জীব দেহে একটু বল পাই, সে পথটুকু রোধ করিবেন না। যে দেশ মহাপ্রভুর পদাঙ্ক ধারণ করিয়াছিল সে দেশের তপস্যা ও সাধনার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন না। আমার নিজের কথা বলি, এদেশ হাজার বৎসর পরাধীন থাকুক, তথাপি যেন জন্ম জন্মান্তরে এই দেশেই জন্ম গ্রহণ করি। এদেশের খোলের বাদ্য, এদেশের নারীমহিমা, এদেশের বাৎসল্য ও মাধুর্য্যের লীলা,—এদেশের ভগবানকে নিজের আঙ্গিনায় বুকের কাছে আনিয়া তাহার সহিত রাগ,

রঙ্গ, মান, অভিমান করিয়া অন্তরঙ্গ করিয়া লওয়া—এ সমস্তই আমার কাছে অতি দুর্লভ সামগ্রী। আম, জাম, কাঁঠালের ছায়াশীতল এই বঙ্গদেশের ইতিহাসলক্ষ্মী কোন সরসীর ফুল্লকমলের ন্যায় মাঝে মাঝে আমার প্রতি যে ইঙ্গিত করিতেছেন, শত শত বৎসর তপস্যা করিয়া যেন আমি সেই লক্ষ্মীর মুখখানি বাঙ্গালীর নিকট সুস্পষ্ট করিতে পারি এই আমার মনের সাধ, ভগবানের নিকট প্রার্থনা। বঙ্গীয় পল্লিগীতিকায় আমাদের জাহাজ নির্ম্মাণ ও বাণিজ্য সমৃদ্ধির যে আভাষ পাওয়া যায়, তাহা ইতিহাসের এক নব অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, কতদিক হইতে যে সে ইতিহাসের উপকরণের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে তাহা আর কি বলিব। কৃষ্ণবিহারীবাবু আমাদের প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হউন। অজ্ঞতার কুজ্ঝটিকায় বিলীয়মান মহামন্দিরের উত্তুঙ্গচূড়ের দিকে বিদ্রূপ ও নিগ্রহের শর ছুঁড়িবেন না। মুসলমানগণ যে সামান্য ইতিহাস দিয়াছেন তাহা রাষ্ট্রীয় কথাপূর্ণ এবং শুধু তাহাদেরই মহিমাব্যঞ্জক কিন্তু বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস কেহই এখনও পর্য্যন্ত লিখেন নাই। একার্য্য করিবার জন্য বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কৃষ্ণবাবু অতি অনুগ্রহ-দৃষ্টিপাত করিয়া মহাপ্রভুর গৌরব স্বীকারপূর্ব্বক আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন, কিন্তু দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র না জানিয়া যেভাবে বঙ্গলক্ষ্মীর বেণী ধরিয়া টান দিয়াছেন তাহার স্পর্দ্ধা আমাদিগকে ব্যথিত করিতেছে। মুসলমান রাজত্বকালেও ব্রাহ্মণসমাজ যেরূপ ঔদার্য্যের সঙ্গে ধর্ষিতা রমণীদিগকে স্থান দিয়াছিলেন তাহা এখনকার দিনে একটা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। বঙ্গদেশে শত শত কুলজী গ্রন্থ আছে। তাহাদের মধ্যে বিস্তর ঐতিহাসিক উপকরণ রহিয়াছে। কৃষ্ণবাবু তাহার একখানিরও পাতা উল্টাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু একথা তিনি নিশ্চয়ই জানিবেন, যে বাঙ্গলার অতীত গৌরবকে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বঙ্গদেশে বাস করিতেছি বলিয়াই যে আমরা স্বদেশ সম্বন্ধে পরম প্রাজ্ঞ এরূপ মনে করা উচিত নহে। জন্ম ভরিয়া যে পিপীলিকা হিমালয় পর্ব্বত পরিভ্রমণ করিল, সে কি গিরিরাজের মহিমার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিয়াছে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

'সাহিত্য-ধর্ম্ম'-এর জের

রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্র

(১)

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার কোনও অখ্যাত অনুচর সম্প্রতি আমাকে গালাগালি দিয়া খ্যাতিলাভের সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছে। সে ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কিঞ্চিৎ নিবিড় পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ পরম্পরায় শ্রুত হইলাম। তার লেখা আমার পড়িবার অবসর হয় নাই কিন্তু শুনিলাম সে নাকি লিখিয়াছে যে আপনি আমার লেখা সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা কেবল আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে নয়।

লেখককে যে আপনি একথা বলিয়াছেন এবং একথা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেন আপনি একথা বলিতে গিয়াছিলেন আর একথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই বা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলেন সেই হেতুটা বুঝিতে পারিলাম না।

কথাটা সত্য কিনা বিচার নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন আমাকে চিঠি লিখিয়াছিলেন তখন আমার কতকগুলি প্রবন্ধ গুটিকয়েক গল্প এবং খানকয়েক উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি কয়েকখানা উপন্যাস আপনাকে উপহার দিয়াছিলাম। তারপর আপনি লিখিয়াছিলেন যে আমার 'লেখা' আপনি কতক পড়িয়াছেন এবং পড়িয়া সাধুবাদ করিয়াছেন ইত্যাদি এবং আপনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে পত্রে আপনি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই যে আমার লেখা অর্থে আমার প্রবন্ধ বুঝিয়াছিলেন এবং গল্প সম্বন্ধে ওকথা প্রযুজ্য নয়।

তারপর 'কাঁটার ফুল' উপন্যাস প্রকাশিত হয়, তাতে আপনার পত্রাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার ঢাকার কোনও যুবকবন্ধু কলিকাতায় আসিয়া এ কার্য্যটি করাইয়াছিলেন, আমি ইহার কথা পূর্ব্বে জানিতাম না। বইখানা হস্তগত হইবার পরই আমি সেজন্য আপনাকে বইখানা পাঠাইয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, কেন না আমার মনে হইয়াছিল যে আপনার নিকট, প্রকাশের অনুমতি না লইয়া ঐ পত্র ছাপা অন্যায় হইয়াছে, এবং যে ভাবে উহা ছাপা হইয়াছে তাহাতে উহা কাঁটার ফুল বিষয়ই লেখা হইয়াছে লোকে এরূপ মনে করিতে পারে, উহা হয়তো আপনার অনুমোদিত না হইতে পারে।

আমার সে পত্রের উত্তর পাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সে উত্তরে আপনি কোনওরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই এবং প্রকাশ যে আপনার অননুমোদিত এমন কথাও জানান নাই। ও কথা যে আপনি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধেই লিখিয়াছিলেন এবং উহা আমার উপন্যাস সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয় ইহার আভাসও আপনি সে পত্রে দেন নাই।

তারপর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এতদিন পর আপনার সে প্রশংসা প্রত্যাহার বা তার অর্থ সঙ্কুচন করিবার ইচ্ছা হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য বা অন্যায় বলিয়া মনে করি না। কিন্তু দুঃখ এই যে আপনার সে অভিপ্রায় আমাকে না জানাইয়া আপনি আমার পরোক্ষে অন্য ব্যক্তিকে জানাইয়া তাহা প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহা এভাবে প্রচারিত হইলে যে আমি জগতের কাছে মিথ্যাবাদী ও বঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইব এ সহজ কথাটা আপনার মনে হয় নাই ইহা মনে হয় না।

আপনার নিকট প্রশংসা ও সমাদর লাভে আমার লোভ যতই থাকুক, তাতে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সুতরাং আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় আমাকে জানাইতেন তবে 'আমি স্বয়ং প্রকাশ্যে ভুল বুঝিবার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়া সে পত্র প্রত্যাহার করিতাম। কেননা যিনি আমাকে সমাদর করিয়া লজ্জিত তাঁর সমাদর লইয়া বড়াই করিয়া বেড়াইব এতটা দৈন্য আমার নাই।

তা ছাড়া সময়ে জানিলে আর একটা উপকার হইত। গত অগ্রহায়ণের বিচিত্রার আমার যে লেখা বাহির হইয়াছে, বোধ হয় "পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছেন" যে তাতে আমি প্রকাশ করিয়াছি যে 'শান্তি' প্রকাশিত হইবার পর আপনি আমাকে সাক্ষাতে সে বইয়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে প্রশংসাপত্র দিয়াই যেরকম কুণ্ঠিত দেখিতেছি, তাতে 'একথা প্রকাশ হওয়ায় নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিব্রত বোধ

করিতেছেন। আপনার মত পরিবর্ত্তনের বিষয় আগে জানা থাকিলে কথাটা প্রকাশ করিয়া আপনাকে বিড়ম্বিত করিতাম না।

যাহা হউক, আমার প্রকাশককে জানাইয়া আমার বইয়ের বিজ্ঞাপন হইতে আপনার পত্রখানি উঠাইয়া লইতে উপদেশ দিতেছি। যাহা ছাপা হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমার হাত নাই, সেজন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে যদিও কর্ত্তব্যানুরোধে সম্প্রতি আমাকে আপনার অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে আমার গ্রন্থাবলীর বহুস্থানে আপনার সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছি এখনও তার কোনও অংশ বিন্দুমাত্র সঙ্কোচন বা প্রত্যাহার করিয়া দত্তাপহারকের প্রত্যবায় অর্জ্জন করিবার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার হয় নাই। আপনার প্রতিভার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অচলা আছে এবং আশা করি চিরদিন থাকিবে।

আর একটা কথা বলি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির উপর যদি আপনার ক্রোধের কোনও কারণ হইয়া থাকে তবে স্বয়ং আঘাত করিতে কি আপনি কুণ্ঠিত? আপনি যদি আঘাত করিতে ইচ্ছা করেন তাতে নিন্দার কোনও কথা নাই, আর আমিও যদি সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করি তাতেও কেহ দোষ দিতে পারিবে না। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণে অক্ষম সেই শিখণ্ডীর দল দাঁড় করাইয়া গোপনে অস্ত্রাঘাত কি শিষ্ট যুদ্ধনীতি?

এমন একটা ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কাগজে ঘাঁটাঘাঁটি হয় ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে আপনার অনুচরটি খবরটা অত্যন্ত ছড়াইয়াছে এবং তার চালে হয়তো আমি লোকের কাছে মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছি। সেজন্য এই পত্রখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যদি সেবিষয়ে কোনও আপত্তি থাকে তবে জানাইলে বাধিত হইব।

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

(২)

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

সামাজিক প্রবন্ধে আপনার সাহসিকতা দেখিয়া আমি আপনাকে প্রশংসা করিয়াছি। সে সময়ে সমাজ-বিরুদ্ধ মত অসঙ্কোচে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। গল্প রচনায় যদি কিছুর প্রশংসা করিতে হয় তাহা ভাষা-নৈপুণ্য ও কল্পনাশক্তির,—সামাজিক দুঃসাহসিকতা গল্পসাহিত্যের মুখ্য ও প্রশংসাযোগ্য পরিচয় হইতে পারে না। যখন আপনার গল্পের বহির বিজ্ঞাপনে উক্ত পত্রাংশ দেখিতে পাই তখন বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং যে কেহ আমাকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই ভাবেই উত্তর দিয়াছি। বিনাপ্রশ্নে একথা লইয়া আলোচনা করিবার কথা সম্প্রতি বা পূর্ব্বে আমার মনেও উদয় হয় নাই।

আপনার সহিত মতের বা রুচির পার্থক্য লইয়া ক্ষোভ অনুভব করি নাই। "সাহিত্য-ধর্ম্ম" প্রবন্ধে আমি আপনাকে লক্ষ্য করি নাই; আপনার গল্প আপনি কি ভাষায় ও কি ভাবে লেখেন তাহা আমি জানিও না। সাময়িক পত্রে বা গ্রন্থ আকারে যে গল্প বা কবিতা পড়িয়া আমি লজ্জা ও দুঃখ বোধ করিয়াছি আপনার লেখা তাহার অন্তর্গত নহে। সুদীর্ঘকাল আপনার লেখা পড়িবার অবকাশ হয় নাই।

যখন আমি বিদেশে ছিলাম আপনি আমাকে মিথ্যাচারী প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সাক্ষ্যের অপেক্ষা মাত্র করেন নাই। হয় আপনি বিশ্বাস

করিয়াছেন এরূপ মিথ্যাচার আমার পক্ষে অসম্ভব নহে, নয় বিশ্বাস না করিয়া লিখিয়াছেন। ইহা মত বা রুচিগত আচরণ নহে, চরিত্রগত, এই কারণেই ইহা ক্ষোভের বিষয়। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩)

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আপনার পত্রাংশ আমার বইয়ের বিজ্ঞাপনস্বরূপ বাহির হইবার পর আপনি সে বিষয়ে আলোচনা ও মত প্রকাশ করিবার একাধিক অবসর পাইয়াছিলেন; আমার এক পত্রেই এ বিষয় আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলাম এবং তদুত্তরে আপনি জানাইয়াছিলেন যে ইহাতে আপনার অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণই নাই। সে কথা বোধহয় আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন। যাহা হউক এ বিষয় লইয়া আপনার সহিত বাগবিতণ্ডা করা আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা হইবে। আমি কেবল নিজের মান রক্ষার জন্য যাহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি তাহাতে আমি আনন্দ বোধ করি নাই।

এই প্রসঙ্গে আপনি যে আপনার মালয়ের কার্য্য সম্বন্ধে আমার পত্রের কথা উপস্থিত করিয়াছেন তার প্রসক্তি করিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমার সে পত্র বোধহয় আপনার দেখিবার অবসর হয় নাই; তার বিবরণ পরম্পরায় শ্রুত হইয়া থাকিবেন। সে পত্রে আপনার উপর কোনও মিথ্যাচার আরোপ করা হয় নাই; পক্ষান্তরে বলা হইয়াছিল যে "I do not doubt the truth or sincerity of his statement, but the question is whether that was the time or place for making it." স্থান কাল হিসাবে আমি আপনার উক্তি অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলাম যে ইহার পর যদি কেহ আপনাকে বলে যে গভর্ণরের নিমন্ত্রণের খাতিরে আপনি একথা বলিয়াছিলেন তবে তাহা আশ্চর্য্যের হইবে না—ইহা যে আমি মনে করিয়াছি এমন আভাস মাত্র দেই নাই।

আপনার কথার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখিয়াই কথাটা লিখিয়াছিলাম সত্য কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপারের এমন কোনও পূর্ণতর বিবরণ দেখি নাই যাহাতে আমার ঐ মত পরিবর্ত্তন করিতে হইতে পারে। যদি তেমন বিবরণ দেখিতাম তবে আমি সর্ব্বাগ্রে অপরাধ স্বীকার করিয়া আমার উক্তি প্রত্যাহার করিতাম।

আপনি এ ব্যাপারে আমার মত বা রুচিগত প্রভেদ না দেখিয়া আমার চরিত্রের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন। আপনার অন্তর্দৃষ্টি চিরদিনই অসাধারণ বলিয়া বিখ্যাত। ইহা বোধহয় সেই অসাধারণত্বের একটা নিদর্শন। কোনও কথা বিশ্বাস না করিয়া বলা বা কাহারও উপর অযথা দুরভিসন্ধি আরোপ করা যে আমার চরিত্র নয় একথা আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকিলে আপনি জানিতে পারিতেন। যার চরিত্র বা আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই তার একটা বিশিষ্ট অভিমতের—অপব্যাখ্যা করিয়া তার চরিত্রে দোষারোপও চরিত্রের একটা গুরুতর ত্রুটি প্রকাশ করে। মতভেদ সম্বন্ধে যে অসহিষ্ণুতা ও অতিরিক্ত আত্মাভিমান এই প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে তাহা আমাদের দেশে বিরল নয়। দুঃখ এই যে আপনার মত লোকের প্রতিভাও সে দোষ হইতে মুক্ত নয়। ইতি

প্রণত

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মায়াবাদীর প্রতি

মায়াময় এই সংসার ছাড়ি তুমি নাকি গেছ বনে
যিনি মায়াতীত পরম ব্রহ্ম তাঁহারি অন্বেষণে,
সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সকল বিভেদ ভুলি,
জরা মরণের অতীত রাজ্যে গৌরবে মাথা তুলি
তুমি নাকি, ভাই, হয়েছ এখন সোহংরূপে শিব—
মহিমা তোমার ভক্তের মুখে ছেয়েছে ধরণী দিব্!
আমরা সে কথা সংসারে বসি শুনিতেছি অনুক্ষণ,
সুখ দুঃখ জয়!—সে যে কত বড় ভাবিয়া না পায় মন!

হেথা মোরা মূঢ় বাসনা বিপাকে ভুগি শত পরমাদ;
তোমার সঙ্গে পারিনি'ক যেতে, ক্ষমা করো অপরাধ।
ভেবনা'ক মনে তর্ক তুলিব—এত জ্ঞান কোথা বটে;
জানি না জগৎ-প্রপঞ্চ বলে কি মহাতত্ত্ব রটে!
মেঘ ও রৌদ্র আলোছায়া মাখা এই স্বপনের জাল
জানিনা সে কোন মায়াবীর রচা—শুধু দেখি চিরকাল!
লিখে দিতে পারি জয়পত্রিকা, তাই যদি নিতে চাও;
দুর্ব্বল বলে ক্ষমা ক'রো ভাই, গৌরব তুমি নাও।

এই ধরণীর আমি আদরের ধূলিমাখা সন্তান
চাহিনা অমর দেবের স্বর্গ, চাহিনা দেবের মান।
এই ফলভরা কুঞ্জকানন, কুসুম বৃন্তে মধু,
প্রেমের প্রদীপে আলোকরা ঘর, বক্ষে মানবী বধূ,
আশার রঙীন রামধনু আঁকা সুনীল গগন পট,
নৃত্যচরণা লক্ষতটিনী, অক্ষয় ছায়াবট—
ধরণীর দান লই শির পাতি—এই মোর ভাল লাগে:
বিদ্রূপ যদি ক'রো, বলে যাও যা আসে মনের আগে।

জানি, জানি হেথা সুখ চলে যায়, স্মৃতি তাও হয় ভুল,
না ফুরাতে কথা দিন অবসান, ঝরে পড়ে ফোটা ফুল;
প্রতি পায় বাধা, মিথ্যা হেথায় সত্যের করে গ্লানি;
হেথা সাধুতার আবরণ তলে হিংসার হানাহানি;
জীবনের নদী ছুটিয়া চলেছে মরণ সিন্ধু পানে।
দুখের কণাটি রয়েছে মিশায়ে আনন্দভরা গানে;
ভাল ও মন্দ হেথা পাশাপাশি—সে বড় মধুর দান;
আমার যা আছে তাই মোর থাক—তারি গাহি জয় গান!

ধরণীর ফুল, লতা, পাতা, পাখী, পশু ও মানুষ ভাই!
আমি ধরণীর ধূলিমাখা ছেলে তোমাদের গান গাই।
তোমাদের এই ক্ষণিক জীবন, সুখ দুঃখের হাসি,
আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনা বিপুল, চির সংসার রাশি
আমার এ প্রাণে মিশাইয়া দাও; তোমাদের ব্যাকুলতা
আমার কণ্ঠে ধ্বনিয়া তুলুক নিখিল মর্ম্মকথা;
দ্বন্দ্ব, মৈত্রী—সকলের মাঝে নিতে পারি যেন ভাগ;
সকলের মাঝে আপনার হই—দাও হেন অনুরাগ!

তোমাদের ফেলি মোক্ষ' মাগিব ঘৃণ্য এ কৃপণতা
চিত্তে পরশ করে না'ক যেন; যুগে যুগে যথা তথা
তোমাদের মাঝে ঠাঁই নিয়ে যেন বাড়াই আপন মান,
আহত মেষের শিশুটি বাঁচাতে যেন দিতে পারি প্রাণ;
হিয়ার ধর্ম্ম বড় বলে মানি যেন সকলের চেয়ে,
জনমে জনমে ভেসে আসি যেন প্রেমের সাগরে নেয়ে!
বন্ধু! ক'হিনু অন্তর কথা, কহিনু প্রাণের সাধ;
তোমার সঙ্গে পারিনি'ক যেতে—ক্ষমা ক'রো অপরাধ।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

বাঙলার কৃষকের কথা ঃ—শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত, চন্দননগর প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীরামেশ্বর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৮ পৃষ্ঠা—মূল্য এক টাকা মাত্র। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

হৃষীকেশ বাবুর এই পুস্তকখানি আমাদিগকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছে। বাঙ্গালার কৃষকদিগের কথা বোধ হয় আর কেহই এমন করিয়া ভাবে নাই,—এমন করিয়া আলোচনা করে নাই—এমন দরদ দিয়া প্রচার করে নাই। বাঙালী কৃষকের এমন ব্যথার ব্যথী বুঝি আর দেখি নাই। পুস্তকখানি একাধারে গবেষণামূলক ইতিহাস, statistics, উৎপীড়নের কাহিনী ও পীড়িতের আর্ত্তনাদ। ভারতবর্ষে আর্য্যদের আগমনে কেমন করিয়া কৃষিকর্ম্মের উপযোগী ভূমি সংগ্রহ হইল,—কেমন করিয়া কৃষিকর্ম্মের আরম্ভ হইল—মুসলমানগণের আগমনে ভূমিসম্বন্ধীয় কি ব্যবস্থা হইল,—কোন ভূমিকর কেমন করিয়া স্থাপিত হইল, কত প্রকার "আবওয়াব" সৃষ্ট হইল—কেমন করিয়া তাহা কৃষকদিগের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল,—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া ভূমিস্বত্বের কি ব্যবস্থা করিলেন,—তাঁহাদের আমলে ভূমিসংক্রান্ত নানাবিধ ব্যবস্থার পরীক্ষা,—ছিয়াত্তরে মন্বন্তরে কৃষকগণের অবস্থা—ওয়ারেন হেষ্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্ত—লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্ত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ইহাতে জমীদারগণের সুবিধা, প্রজাগণের অবস্থা,—বৃটিশ রাজের ভারতরাজত্ব গ্রহণের পর প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন,—বাঙ্গালার জমীদারের সহিত ইংরেজ ল্যাণ্ডলর্ডের তুলনা—জমী কার? ভোগ করে কে?—প্রভৃতি কৃষক সম্বন্ধীয় এমন সুগভীর আলোচনা পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। হৃষীকেষ বাবু চিন্তাশীল লেখক—তিনি বাজে বিষয়ে বাজে কথা লেখেন না—তাঁহার সমস্ত লেখাই গবেষণামূলক সমস্ত উক্তিই প্রমাণপ্রয়োগে সারবান। কৃষকের কথা আলোচনা করিতেও তিনি স্বীয় পন্থা সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রকাশ প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মচর্য্য ও শক্তি-সাধনা—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ বি এ প্রণীত, ঢাকা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত,—৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য আট আনা।

জাতির জাগরণে ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা, ব্রহ্মচর্য্য সাধনের উপায়, এ বিষয়ে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য প্রভৃতি সুললিত ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্যায়ামে বাঙালী—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ বি-এ প্রণীত, ঢাকা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, ৯৮ পৃষ্ঠা,—মূল্য এক টাকা মাত্র।

জাতির উন্নতির পক্ষে শারীর-চর্চ্চার উপকারিতা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। এ বিষয়ে চারিদিকেই আন্দোলন-আলোচনা ও উপায় নির্দ্দেশ প্রভৃতি চলিতেছে। এ সময়ে অনিল বাবুর বইখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। মল্লক্রীড়া, সাধারণ ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌশল, ধনুর্ব্বিদ্যা, অসিখেলা, বিদেশী খেলা, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে যে সমস্ত বাঙালী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সচিত্র জীবনী এই পুস্তকে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের রচনা-রীতি চিত্তাকর্ষক। ইঁহার "সরল ব্যায়াম-প্রণালী" অধ্যায় পুস্তকখানির উপকারিতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে।

বীরত্বে বাঙালী—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি-এ প্রণীত। ঢাকা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত—১৩৫ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

পৌরাণিক যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাঙ্গালী অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, লেখক যত্নসহকারে তাঁহাদের কয়েকজনের ইতিহাস চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কীর্ত্তি কথার লুপ্ত ইতিহাস,—বীরেন্দ্র-সমাজে অপাংক্তেয় "ভেতো" বাঙ্গালীর গৌরব-কাহিনী। লেখকের বাঙ্গালীজাতির কলঙ্ক অপনোদনের এই প্রয়াস সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর পঠনোপযোগী করিয়া লিখিত। যদি বালক ও যুবক সম্প্রদায়ের হস্তে এই পুস্তক পড়িবার কোন ব্যবস্থা হয়, তবে—একদিন যে বাঙ্গালী নৌ-শক্তি পরিচালন করিত, উপনিবেশ সংস্থাপন করিত, একদিন যে তাহারা কামান ও গোলাগুলি প্রস্তুত ও ব্যবহার করিত,—একদিন যে তাহাদের লাঠিয়াল ও লাঠি বাঙ্গালার আব্রু, পরদা ও মান রাখিত—তাহা জানিয়া ও শিখিয়া যে আনন্দে ও গৌরবে তাহারা অধীর হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ঝরা ফুল—শ্রীরত্নমালা দেবী প্রণীত, ছোট কেল্লাবাড়ী, মুঙ্গের হইতে শ্রীবিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১১০ পৃষ্ঠা মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীরত্নমালা দেবী স্বনামধন্য ৺মদনমোহন তর্কলঙ্কারের দৌহিত্রী। তাঁহার রচিত এই ধর্ম্মভাবপূর্ণ ও সুলিখিত কবিতা পুস্তকখানি প্রশংসনীয় কবিতার সমষ্টি!

জীমূতবাহন—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত—চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—৪৩ পৃঃ মূল্য ।৵০ মাত্র।

নাগানন্দ নামক সংস্কৃত নাটক হইতে গৃহীত গল্পাংশ অবলম্বনে বালকদিগের অভিনয়োপযোগী করিয়া লিখিত নাটিকা। রবীন্দ্রনাথের "মুকুট" ব্যতীত ছেলেদের অভিনয়োপযোগী পুস্তক নাই বলিলেই হয়। লেখকের এই পুস্তকখানি কথঞ্চিৎ সেই অভাব পূরণ করিবে।

হা ডু ডু ডু—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ প্রণীত,—হা-ডু-ডু-ডু খেলার 'চারুচন্দ্র স্মৃতি ফলক" সভার সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৬৮ পৃষ্ঠা,—মূল্য এক টাকা মাত্র।

হা-ডু-ডু-ডু খেলার নাম শুনেন নাই বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কেহ আছেন শুনিলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। "হা-ডু-ডু-ডু"ও "গাদন" বাঙ্গালার প্রাচীন খেলাগুলির অন্যতম। তবে ফুট্‌বল প্লাবিত বঙ্গদেশে হা-ডু-ডু-ডুর অবস্থা শোচনীয়—এবং ফুট্‌বল যেরূপ অমিতবিক্রমে বঙ্গের পল্লীগুলি পর্য্যন্তও আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে প্রতিক্রিয়া ব্যতীত হা-ডু-ডু-ডুর জীবন সঙ্কট বলিতে হইবে। এরূপ সময়ে নারায়ণ বাবুর হা-ডু-ডু-ডুকে তাহার নিজস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। নারায়ণ বাবু যদি সত্যই হা-ডু-ডু-ডুর পুনঃ প্রচলনে সমর্থ হন, তবে দেশের একটি বিশেষ উপকার করিবেন,—আমাদের এই বিশ্বাস। হা-ডু-ডু-ডু বিজ্ঞান-সম্মত স্বাস্থ্য ও শক্তিপ্রদায়ক ও প্রতিযোগিতার শক্তিবর্দ্ধক,—ইহাতে পয়সা খরচ নাই ও হাত পা ভাঙ্গিবার ভয়ও থাকে না। নারায়ণ বাবু স্মৃতিফলক সাহায্যে যে এই খেলার প্রচলন-প্রয়াসী হইয়াছেন তাহা সবিশেষ কালোপযোগীই হইয়াছে। আমরাও বাল্যকালে জয়ী দলকে পুরস্কার লাভ করিতে দেখিয়াছি, তবে তাহা "ফলক" নহে, তাহা "পিতলের ঘড়া"। যাঁহারা হা-ডু-ডু-ডু খেলা, তাহার ইতিহাস, তাহার নিয়মাবলী, "চারুচন্দ্র-স্মৃতিফলক" ও বর্ত্তমানে হা-ডু-ডু-ডু খেলার প্রচলন সম্বন্ধে কিছু জানিতে চান, তাঁহারা নারায়ণ বাবুর এই পুস্তকখানি পড়িলে সকল সংবাদ পাইবেন।

অহল্যা উপাখ্যান—শ্রীযোগীরাজশিষ্য মৈত্রেয় প্রণীত "সর্ব্ববাদিসম্মত" ধর্ম্ম হইতে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত ১১৮ পৃঃ,—মূল্য একটাকা মাত্র।

গৌতম পত্নী অহল্যা সম্বন্ধে যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন, তাহার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও প্রমাণ প্রদান এবং সমাজে প্রচলিত অনেক প্রকার ভ্রমনিরসন ও প্রকৃত অর্থনির্দ্দেশই পুস্তক খানির উদ্দেশ্য। সুবিখ্যাত কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জ্জি মহাশয়ও কয়েকটি প্রবন্ধে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন।

নিশীথে—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত,—৩৫ পৃঃ—মূল্য আট আনা মাত্র।

এখানি একখানি ছোট কবিতার বই—উপভোগ্য,—ছাপা ও কাগজ ভাল।

তাম্বুল বণিক—শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত,—২৬০ পৃঃ,—মূল্য আট আনা মাত্র।

তাম্বুলীগণের বৈশ্যত্বের প্রমাণ প্রয়োগ, তৎসহায়ক ব্যবস্থা প্রদর্শন,-তাম্বুলী জাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির বিবরণ প্রদান জন্য পুস্তকখানি লিখিত।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার (২য় সংস্করণ)—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত,—এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস লিঃ হইতে প্রকাশিত,—৩১৫ পৃঃ,—মূল্য ২॥০ টাকা মাত্র।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রকাশ করিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে যশস্বী হইয়াছেন, তিনি গাছেরও অনুভবশক্তি আছে—এইরূপ কিছু প্রমাণ করিয়াছেন—বাঙ্গালীর সাধারণ শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিতগণের মধ্যে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে জ্ঞান এতদপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা ভাষায় আচার্য্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে পুস্তকের অভাবই ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়। রায় সাহেব জগদানন্দ বাবুর বাঙ্গালা ভাষায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের পরিচয় প্রদানের এই প্রচেষ্টা যে বাঙ্গালীর নিজের গৌরব কাহিনী জানিবার সহায়ক হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বশ্রেণীর উপযোগী সুপাঠ্য বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা করিয়া জগদানন্দ বাবু যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালার শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায় সমানভাবে উপকৃত। জগদানন্দ বাবুর এই পুস্তকখানি তাঁহার যশ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। এই পুস্তকে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার গুলির মোটামুটি সমস্ত বিবরণই সচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে—তাঁহার আধুনিক আবিষ্কারগুলিও বাদ পড়ে নাই। বর্ণনাগুলি এরূপ আড়ম্বরহীন ভাষায় সহজ ও সরলভাবে প্রদত্ত হইয়াছে যে, ভাবসংগ্রহে কাহারও কষ্ট হইবে না। এই পুস্তকখানির প্রতি আমরা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

আহৃতি—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত,—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—১৫৬ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকখানি নরেশচন্দ্রের কয়েকটি রচনার সমাহার। ইহার সমস্ত রচনাগুলিই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা। রচনাগুলি সুলিখিত, সুষ্ঠু আলোচিত ও সুপাঠ্য। ছাত্র, শিক্ষক বা জনসাধারণের যে কেহ সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে পুস্তকখানি অবশ্য-পাঠ্য। সাহিত্যে ইহার উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্য আমার ইহার বর্ণনীয় বিষয়গুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি;—(১) সাহিত্যে স্বাধীনতা, (২) বাঙ্গলার কথা, (৩) বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, (৪) বাঙ্গালার কথার আভিজাত্য, (৫) ময়মনসিংহের কাব্য কথা, (৬) সাহিত্য ও ধর্ম্ম, (৭) সমালোচনা।

বিশ্বজিৎ—শ্রীগোবিন্দলাল বর্ম্মা প্রণীত ও প্রকাশিত ;—প্রাপ্তিস্থান—গুড়চাকলী, পোঃ দেহাটী মেদিনীপুর,—২৮১পৃষ্ঠা,—মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

পুস্তকখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক,—আগাগোড়া অমিত্রাক্ষরে লেখা। স্থানে স্থানে রস সঞ্চারের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

প্রহ্লাদ—শ্রীরেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,—প্রাপ্তিস্থান,—পোঃ তাহিরপুর (রাজসাহী) গ্রন্থকারের নিকট,—১৬৬পৃঃ—মূল্য—১॥০ মাত্র।

প্রহ্লাদ একখানি সুচিন্তিত ও সুরচিত কাব্য। ভাষার প্রাঞ্জলতার ভিতর ভাবের মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে কবির উপরে নবীন সেন ও মাইকেলের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়,—কিন্তু তাহাতে মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। প্রহ্লাদের চরিত্র নূতন ভাব ধরিয়া বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার কয়েকটি অধ্যায় সবিশেষ উপভোগ্য।

লগ্নফল—জ্যোতিবাচস্পতি প্রণীত ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত,—১১০পৃঃ—মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকখানির দুই অংশ ;—১ম,—লগ্নফল, ২য়,—রাশিফল। বাচস্পতি মহাশয়ের মাসফলের ন্যায় লগ্নফল একখানি সুলিখিত জ্যোতিষের বই। ইহার ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল যে, যাহার সামান্য ভাষাজ্ঞান আছে সেই ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে। আমরা নিজেদের মধ্যে লগ্নফল মিলাইয়া দেখিলাম যে, অনেকাংশে বেশ মিলে।

সুখের সংসার—শ্রীবিপিনবিহারী বটব্যাল প্রণীত,—বটব্যাল এণ্ড কোং (১৭২ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত,—১৯১ পৃঃ,—মূল্য এক টাকা।

ইহলোকে পরলোকে সুখভোগ করিতে হইলে খাদ্য, পানীয়, রৌদ্র, বায়ু, পরিচ্ছদ, নিদ্রা, শ্রম প্রভৃতি বিষয়ে কর্ত্তব্য ও মৃত্যু, ঈশ্বর, ধর্ম্ম কর্ম্মফল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে পুস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে।

দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা—শ্রীত্রিরূপ মুখোপাধ্যায় প্রণীত,—১৪৭পৃঃ—মূল্য একটাকা মাত্র।

পুস্তকখানি দাক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ইতিহাস স্বরূপ। ইহাতে রাণী রাসমণি কর্ত্তৃক কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়, দক্ষিণেশ্বরের অতীত ইতিহাস, পরমহংসদেবের সাধন জীবন প্রভৃতি ধারাবাহিক বর্ণিত আছে। লেখা বেশ ভাল, পড়িতে আনন্দ পাওয়া যায়, এবং সমস্ত ইতিহাসের পৌর্ব্বাপৌর্য্যক্রমে একটা ধারণা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু পুস্তকখানির আচমন, আবাহন, আসনশুদ্ধি প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগের বিশেষ আব কতা বুঝিতে পারিলাম না।

ত্রিলোচন—By S. G. Mozumder, প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র, দি বুক কোম্পানী—৪।৪ এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১॥০।

পুস্তকখানি উপন্যাস, কিন্তু গতানুগতিক নহে। পুস্তকের মলাটে লেখা আছে—A Tale of Three Cities—অর্থাৎ কলিকাতা হইতে লণ্ডন এবং লণ্ডন হইতে কলিকাতা ও বেনারস—এই তিন "লোচন" লইয়াই পুস্তকখানির প্লট সংগৃহীত হইয়াছে। প্রভাতবাবুর 'দেশী ও বিলাতী' ও দিলীপবাবুর 'মনের পরশ'কে এই পর্য্যায়ে ফেলিতে পারা যায়। শিবপ্রসাদ ও বিহারীলাল লণ্ডন-প্রবাসী হইয়া গৃহস্বামীর কন্যা অ্যালিসের স্বভাব ও গুণ-মাধুর্য্যে বিশেষ মুগ্ধ হয়। বিহারী অ্যালিস্‌কে তাহার প্রণয় জানায়, কিন্তু মধ্যে কাপ্তেন রবার্ট নামে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া জুটিলে সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়। পরে শিবপ্রসাদ ও বিহারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল এবং শিবপ্রসাদ বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম্ম লইয়া বিবাহ করিয়া জীবন আরম্ভ করিল।

বিহারীও বিবাহ করিয়া বালিগঞ্জে থাকিয়া নিজের চিত্র-বিদ্যার প্রসারণের জন্য একটি চিত্র-শালা খুলিল এবং পরে বন্ধুর চিঠি পাইয়া বেনারসে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল। ওদিকে অ্যালিসের কাপ্তেন রবার্টের সঙ্গে বিবাহ হইল কিন্তু ঘটনাচক্রে বিহারীকেও সে ভুলিতে পারিল না। মোটের উপর এইটুকু হইতেছে পুস্তকের সংক্ষিপ্ত ঘটনা। লেখক ইহার মধ্যে বিলাতী সমাজের অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকিয়া পুস্তকখানিকে বেশ মনোরম করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন,—"প্রত্যেক ব্যাঙ্ক হলিডেতে লণ্ডন-সহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হ্যাম্প্‌ষ্টেড্‌হীথে প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। সেখানে নানাদিক হইতে নরনারী মিলিয়া অনেক প্রকার আমোদ-প্রমোদের নেশায় বিভোর হইয়া যায়। অশিক্ষিত 'সাধারণ' স্ত্রী ও পুরুষের দল আমোদে মাতিয়া সেই স্থানটিকে এমনি বিশৃঙ্খল করিয়া তুলে যে মেফেয়ারের সভ্য শিক্ষিত সমাজ অন্য সময়ে সেখানে বেড়াইতে আসা হাইড্‌ পার্ক কেন্‌সিংটন্‌ গার্ডেনে ভ্রমণের তুল্য ফ্যাসানেবল্‌ মনে না করিলেও গর্হিত মনে করেন না।" লেখক আবার লিখিতেছেন,—"আমাদের দেশেও ত মেলা দেখেছি, কই তাতে এমন ধৈর্য্য ও নীতির বিশৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় না, আর আমরাও ত বেশ আমোদ আহ্লাদ করি" ইত্যাদি। এ পুস্তকখানিকে মিস্‌ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়ার" একটা পাল্টা জবাব বলিলে বা মন্দ কি!

পুস্তকখানি সরোজনলিনী দত্ত নারী-মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠাত্রী ৺সরোজনলিনী দত্ত মহাশয়ার পবিত্র নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে এবং ইহার প্রথম সংস্করণের বিক্রয়ের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ ঐ নারী-মঙ্গল সমিতির যশোহর কেন্দ্রের জন্য দান করা হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সফল হউক এই আমাদের কামনা। পুস্তকের গোড়ায় শ্রেষ্ঠ-নারীধর্ম্মের ও পরিপূর্ণ মাতৃত্বের প্রতীক স্বরূপ একটি ছবি দেওয়া হইয়াছে। ছবিখানি সুন্দর, কিন্তু তলায় নামকরণের ভাষা সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে। কেন না যে ভাষা দিয়া একজনের নামে উৎসর্গ পত্র লেখা হইয়াছে উহাই আবার একখানি কাল্পনিক ছবির তলায় দিলে, উহাকে উক্ত স্ত্রী বা পুরুষেরই প্রতিচ্ছবি বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক। পুস্তকের মধ্যে অনেক ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে, সেগুলির সংশোধন আবশ্যক।

মাধবীর বিদ্রোহ—শ্রীরামহরি ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মহেশপুর (পোঃ আঃ) যশোহর, স্বস্ত্যয়ন সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্যপুরাণতীর্থ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচসিকা।

পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে বাস্তবিক ইহা একখানি উপন্যাস নহে। অতএব চরিত্রসৃষ্টি কিংবা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সমাবেশ উপন্যাসের রীতি অনুযায়ী হয় নাই বলিলে পুস্তকের সুবিচার করা হইবে না। গল্পচ্ছলে বিবিধ সমস্যার অবতারণা করাই গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমাজে নারীর স্থান ও কর্ত্তব্য,—এই প্রসঙ্গেই গ্রন্থের অর্দ্ধেক নিয়োজিত হইয়াছে, এবং কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থকার এই জটিল প্রশ্নের যথাসম্ভব নিষ্পত্তিরও চেষ্টা করিয়াছেন। অধিকাংশ যুক্তিতর্কের সহিত মতের অনৈক্য ঘটিলেও গ্রন্থকারের এই প্রয়াস অতীব প্রশংসনীয়। পুস্তকের শেষভাগে লাক্ষাচাষের বিবরণ সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হইয়াছে। বাস্তবিক বর্ত্তমানের এই নিদারুণ অর্থ সমস্যার দিনে লাক্ষার আবাদ কি পরিমাণে অন্নকষ্ট নিবারণে সহায়তা করিতে পারে, সে বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার কৌতূহল হয়।

পুস্তকের ভাষা সহজ, অনাড়ম্বর, যদিও স্থানে স্থানে নাটকীয় উচ্ছ্বাসের অভাব নাই। ছাপা ও বাঁধাই মন্দ নয়, কিন্তু ছবিগুলি না থাকিলেই ভাল হইত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে আধুনিক কালের আবর্জ্জনাবহুল গল্পপুস্তক লিখিয়া তথাকথিত সাহিত্য-সেবা অপেক্ষা এই শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন সহস্রগুণ হিতকর।

"মাদার-ইণ্ডিয়া"—শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম-এ লিখিত, মাতৃমন্দির কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত,—১১ পৃষ্ঠা,—মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

ইহা মিস্ মেয়োর "মাদার-ইণ্ডিয়া নামক পুস্তকের সমালোচনা। সমালোচনায় লেখক পুস্তকের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কথাই নূতন বলিয়া মনে হইল না। লেখক ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "মাদার-ইণ্ডিয়া পুস্তক লইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ হৈ চৈ হইল। এত প্রতিবাদ কিসের জন্ত? মাদার-ইণ্ডিয়া বইখানা এমনি যত না প্রসিদ্ধ হইত এই সব আলোচনার জন্ত আরও প্রসিদ্ধ হইয়া গেল। আমরাই প্রচুর নিন্দা করিতে গিয়া এই বইখানির এত নাম ও গৌরব বাড়াইয়া দিলাম ও মাঝখান হইতে মিস্ মেয়ো অনেক পয়সা করিয়া লইলেন।" আমরাও বুঝিতে পারিলাম না লেখকের উক্ত অভিমত সত্বেও এই আলোচনার উদ্দেশ্য কি?

বিপর্য্যয়

(গান)

দেশে যে লাগ্‌লো আগুন
লাগ্‌লো আগুন লাগ্‌লো আগুন,
পুড়ে যে রাঙা হোল—
সবুজ মাটি সবুজ ফাগুন।
প্রলয়ের ঝঞ্ঝা রাতে
কত প্রাণ গেল সাথে
পূরবের উষার নভে—
লালেতে জাগ্‌লো সে খুন।

কাঁদিছে বিজন পথে
যত সব সঙ্গীহারা,
তাদের এই দুখের দিনে
চিনাবে পথ্‌টি কারা?
ছুটে আয় তরুণ ছেলে
মমতার জাল্‌টি ঠেলে
সাহসের গান গেয়ে চল্
সকালে গুণ্ গুণা গুণ্।

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায়চৌধুরী

গিরীশ-স্মৃতি

(১০)

বাণীর প্রিয়পুত্র কবি রজনীকান্ত কল্‌কাতার মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে ঘর ভাড়া ক'রে যখন ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার জন্য তথায় অবস্থিতি কর্‌ছিলেন তখন আমি তাঁকে একদিন দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। সেটা হবে বাংলা ১৩১৭ সন। তিনি আমাদের আত্মীয়, স্বজাতি ও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত ছিলেন। কতদিন আমার মাতুল শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ফড়িয়া পুকুরের বাড়ীতে তাঁর উন্মাদনাময় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তাঁরি রচিত রাশি রাশি সঙ্গীত শুনেছি আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথা দিয়ে চ'লে গিয়েছে।—যদিও তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, যশঃ ও খ্যাতি লাভ ক'রেছিলেন—যদিও কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁর গান ধ্বনিত হ'ত কিন্তু তবুও তাঁর বিন্দুমাত্র অহমিকার ঝাঁজও ছিল না। তাঁর অমায়িক ব্যবহার প্রতিভোজ্জ্বল সহাস্য বদন ও সরস আলাপের যে একবার পরিচয় পেয়েছে সে জীবনে তা আর ভুল্‌তে পার্‌বে না। বিশ্রাম নেই,—বিরাম নেই,—কুণ্ঠা নেই—একটা গানের পর আর একটা গান ভাবে, উচ্ছ্বাসে—কবির জীবন্ত জ্বলন্ত অনুভূতির পুলকস্পর্শে শ্রোতাকে কোন্ স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যেত! রজনীকান্ত গানে ওস্তাদ ছিলেন না—কোকিলকণ্ঠের কাকলী তাঁর কণ্ঠে বোধ হয় ছিলনা,—রাগরাগিণীর সুরের কর্ত্তব্ ছিল না—গিট্‌কিরি—কাঁপানো টান ছিল না, কিন্তু তাঁর তানে একটা প্রাণের স্পন্দন ছিল—একটা সজীবতা ছিল—একটা মোহিনী শক্তি ছিল—যা কোনও ওস্তাদের গানের কস্‌রতে নেই—গিট্‌কিরির অঙ্গভঙ্গীতে নেই—সুরের মূর্চ্ছনা গমকে নেই। কবি রজনীকান্ত ছিলেন একটা ভাবের উৎস—তাঁর প্রাণে ছিল একটা আধ্যাত্মিক আকুলতার উচ্ছ্বাস, তাঁর বাণীতে—সুরেতে—কণ্ঠেতে ছিল বিশ্বাস আর প্রেমের মিষ্টতা, সরলতা, সরসতার একটা মাধুর্য্যপ্রবাহ—ছিল আত্মনিবেদন ও প্রার্থনার একটা অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় ভাবের ফোয়ারা। যে সে গান শুন্‌ত সেই মুগ্ধ হ'ত। যে শুনেছে সে আর তা জীবনে কখনও ভুলতে পার্‌বে না।

রজনীকান্তের রুগ্‌ণশয্যার পাশে গিয়ে যখন ব'সলাম—তখন তিনি আমাকে দেখে বড় আনন্দিত হ'লেন। কথা কইবার শক্তি ছিল না। আমি বল্‌তাম তিনি শুন্‌তেন—যখন কিছু প্রকাশ কর্‌বার ইচ্ছা হ'ত তখন তিনি—তাঁর শয্যার পাশে কতকগুলো কাগজ পেন্সিল ছিল—তাইতে লিখে জানাতেন। তিনি লিখ্‌লেন "একসঙ্গে ব'সে কতদিন আমোদ আহ্লাদ ক'রেছি সে দিনগুলি মনে পড়্‌ছে। জীবনে তা আর ঘট্‌বে না।" আমি বল্‌লাম "সব সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা। তাঁর ইচ্ছা হ'লে—আবার আপনার সুধামধুর কণ্ঠের গান শুন্‌বো।" তিনি মৃদু হেসে লিখ্‌লেন "আমি এখন ওপারের যাত্রী—পারের তরী ঘাটে বাঁধা এখন

শুধু তাঁর নাম ক'রে উঠ্‌তে বাকী।" তাঁর সেই সৌম্য, স্নিগ্ধ, করুণ, মাধুর্য্যপূর্ণ ভাব দেখে আমি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলাম। মৃত্যুর ভীতি নেই—কায়মনোবাক্য যেন বিভুর চরণে আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন। বিশ্বাস ও শান্তির একটা বিমলালোকে তাঁর চোখ ও মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে—মুমূর্ষ কবির ভগবদ্‌ভাবানুরঞ্জিত মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ তিনি কাগজে লিখলেন "আপনি কি দয়া ক'রে গিরিশবাবুর কাছে গিয়ে একবার আমার কথা বল্‌বেন? তাঁকে দেখ্‌তে—আমার খুব ইচ্ছে হচ্চে। তাঁকে অনেক কথা বল্‌বার আছে। কবে চ'লে যাব তার ঠিক নেই। আপনি দয়া ক'রে জানাবেন কি?" আমার মাতুলের নাম শ্রীযুত গিরীশচন্দ্র সেন—রজনীবাবুর খুব পরমাত্মীয় এবং কল্‌কাতায় এসে মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়ীতে উঠ্‌তেন। সেইখানেই—তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়-সৌভাগ্য ও মেলামেশা হয়। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস কর্‌লেম, "কেন গিরীশমামার সঙ্গে আপনার দেখা হয় নি? বেশ আজই গিরীশমামাকে আপনার কথা বল্‌বো।" কবি আবার লিখলেন "তিনি নন, আমি মহাকবি গিরীশচন্দ্রের কথা বল্‌ছি। তাঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আপনি সেখানে প্রায়ঃ যান—আপনার মুখেই শুনেছি। আপনার মুখে তাঁর কথা অনেকবার শুনেছি। আজই একবার তাঁকে আমার একান্ত অনুরোধ জানাবেন।—মহাকবিকে দর্শন করতে আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে।" আমি তাঁকে বল্‌লাম "আপনি স্থির হোন্, আজই তাঁকে আমি আপনার কথা জানাব। এখনও প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে যাই।" কিছুক্ষণ পরে তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিলেম। সেই দিন সন্ধ্যার পর গিরিশবাবুকে কবি রজনীকান্তের বিনীত অনুরোধ জানালেম। তিনিও পূর্ব্বে আমার মুখে কবির ক্যান্সার রোগ শুনে—মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন "রজনীবাবু কেমন আছেন?" গিরিশবাবু রজনীবাবু কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও বিস্ময়াপন্ন হলেন। "রজনীবাবু—আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চান। যদিও আমি তাঁর গুণমুগ্ধ তবুও আমার ধারণা ছিল আজকালকার সব সভ্য-সাহিত্যিকেরা কেহ আমাকে চান না।—আমিও রুগ্‌ণ"—ডাক্তার কাঞ্জিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "ডাক্তার—তুমি যদি কাল পরশু সময় ক'রে আমায় নিয়ে যাও।" ডাক্তার বল্‌লেন "যে আজ্ঞে। আমি আপনাকে নিয়ে যাব।—কোন্ সময়ে যেতে চান?" গিরিশবাবু বল্‌লেন "বেলা ৩টা ৪টার সময়—পার্‌বে কি?" কাঞ্জিলাল বল্‌লেন—"খুব পার্‌বো!" তারপর গিরিশবাবু বল্‌লেন—"দেখ—রজনীকান্তের আমি গুণমুগ্ধ।"

আমি। আমার ধারণা ছিল না যে আপনি রজনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত।

গিরিশবাবু বল্‌লেন "সাক্ষাৎভাবে বিশেষ পরিচয় হয় নি। পূর্ণিমা মিলনে একবার নগেনবাবুর (সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের) বাড়ীতে যাই—সেখানে রজনীবাবু "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই"—তাঁর রচিত এই

গান গাচ্ছিলেন। যেন মধু বর্ষণ কর্‌ছিলেন। তাঁর আবেগ তাঁর ভাবপূর্ণ গানের ভঙ্গী দেখে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলেম। তারপর তাঁর রচিত আরও গান শুন্‌লাম। সরল প্রাণের ভক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস। কবি রজনীকান্তের ভাবপূর্ণ গানগুলি—বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব্ব রত্ন।—আজকালকার দোআঁশলা সাহিত্যের বাজারে রজনীকান্ত একজন খাঁটী বাঙ্গালী কবি। এঁর গানগুলি হৃদয়স্পর্শ করে।—He writes what he sincerely feels. প্রকৃত উচ্চদরের কবি। প্রত্যেক গানগুলি কবির মর্ম্মস্থান থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—তাই সকলের মর্ম্ম স্পর্শ করে।"

আমি। আচ্ছা মশায় গান আর কবিতা কি এক জিনিষ?

গিরিশবাবু। গান—গান আর কবিতা—কবিতা। দুটি জিনিষের বেশ পার্থক্য আছে। গান কি জান? একটা সুরের তরঙ্গ প্রাণের ভিতর উথ্‌লে ওঠে। কোনও রসের আবেগ যখন এত গভীর হয় যে কথায় তা বলা যায় না—ছন্দে কবিতায় তা প্রকাশ কর্‌তে পারে না—তখন মানুষ সুরে সেই অব্যক্ত ভাবকে ব্যক্ত কর্‌বার চেষ্টা করে।—সেই সুর যখন জাগে—তখন ছন্দে তার রূপ ফুটে ওঠে—কণ্ঠে তখন গান হ'য়ে ব্যক্ত হয়। যারা গান বাঁধে প্রথমে একটা সুর তার অন্তরের ভিতর ঢেউ তুলে চলে—সেই ঢেউর তালে তালে ছন্দ নাচ্‌তে থাকে—তাইতে তার ভাবের—তার রসের একটা রূপ ঝলক মেরে যায়—সেই ছবি ধ'রে কবি গান বেঁধে যায়—গায়ক সেই সুরলহরীর হিল্লোলে গায়। তোমার ভিতরের অন্তস্তলে—অন্তর্জগতে সেই সুর প্রতিনিয়ত বাজ্‌চে—অব্যক্তকে ব্যক্ত কর্‌বার প্রয়াস পাচ্চে—সেই সুরই শ্যামের বাঁশী।—যে শুন্‌তে পায় সে বিহ্বল হয়ে মুগ্ধ হ'য়ে থাকে। যোগী একেই বলে অনাহত ধ্বনি।

গিরিশবাবু খানিকক্ষণ স্থির হ'য়ে চুপ ক'রে রইলেন। পরে আবার বল্‌লেন "শুধু কি ভিতরেই গান চলেছে। সামনে দেখ নদী উঠছে কলগীতি গেয়ে—মুক্ত আকাশের তলায় পাখী উধাও হয়ে গেয়ে চলেছে,—প্রভাতে সন্ধ্যায় বিহগ কাকলী কি মধুর! ফুলের সুবাস মেখে বাতাস গাইছে স্বন্‌ স্বন্‌, মানুষ কাদ্‌চে, হাস্‌ছে, কথা কইছে সুরে গানে।—যা তোমাকে এখন বল্‌ছি—তাই ছন্দে বদ্ধ হ'লে কবিতা হয় কিন্তু গান তা নয়! বিশেষ একটা ভাবের—রসের অব্যক্ত প্রকাশ।"

আমি। কিন্তু রাগরাগিণীও কি তাই?

গিরিশবাবু।—উদাত্ত—অনুদাত্ত—স্বরিত। তারা উদারা মুদারা—প্রথম সুরের এই তিনটী বিভাগ মানুষ সহজে ধর্‌তে পার্‌লে।

আমি। কেমন করে মানুষ তা ধর্‌তে শিখ্‌লে?

গিরিশবাবু। মানুষের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যখন শব্দে ব্যক্ত হয় তখন দেখা যায় উত্তেজিত কণ্ঠে কখনও উচু কখনও নীচু হয়ে স্বর ফুটে ওঠে—তা কি ক্রোধে কি

আনন্দে কি শোকে! যখন গভীরভাবে মন আন্দোলিত হয়ে ওঠে তখন তন্ময় হয়ে চেঁচিয়ে বলে না হ'লে ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুটভাবে বলে যেন—কণ্ঠের স্বর রোধ হ'য়ে আসে। সহজ ভাবে মানুষ না উঁচু না নীচু এমনি স্বরে কথা কয়। এই দেখ না তিন্‌টে কথা আঃ ইঃ উঃ—তিনটী আলাদা আলাদা ভাবে ব্যক্ত হ'তে পারে।—তিনটী শব্দ তিনটী আলাদা স্বরে উচ্চারিত হ'য়ে—তিনটী আলাদা ভাবকে প্রকাশ কর্‌চে।—গানের মূল এইখান থেকে সুরু হ'ল। তারপর সাম্‌নে পড়ে আছে—প্রকৃতির তান—যা মানুষের কানে অবিরত ধ্বনিত হচ্চে। তাও ভৈরব রবে মেঘগম্ভীরনাদে কখনও ললিত বিভাষে কল কল উচ্ছ্বাসে আবার কৌমুদী বসন্তে নির্ঝরিণী গেয়ে চলেছে। নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে প্রকৃতির সেই গান মানুষ অনায়াসেই শুন্‌তে পায়। জল, হাওয়া যেমন কেহ চিন্‌তে শেখায় না—মানুষ আপনি তা নিজের দরকারে লাগিয়েছে, তেম্‌নি এই বিশ্ব জুড়ে পাহাড়ের বুকে, নদীর কোলে, ঝর্‌ণার ঝর ঝরে, হাওয়ার স্বন্‌ স্বনে, পাখীর কণ্ঠে—জীব জগতে জড় প্রকৃতিতে যে নিয়ত গানের ঝঙ্কার চ'লেছে মানুষ প্রথমে তারই অনুকরণ ক'রে তার কণ্ঠে সুর তুল্‌তে প্রয়াস পায়।—প্রথম সঙ্গীতের ধ্বনি এই প্রকৃতিরই একটা প্রতিধ্বনি। মানুষের মনস্তত্ত্বে তারই ছাপ প'ড়ে প'ড়ে একদিন শুভ মুহূর্ত্তে তার কণ্ঠে স্বর বেজে উঠ্‌লো। তার অন্তরের তন্ত্রী থেকে কণ্ঠের তন্ত্রী বাজ্‌লো। মা বীণাবাদিনীর বীণায় নিখিল ভুবন ঝঙ্কারিত হল। তারপর এল সুরের বিভাগ—উঁচু নীচু কোমল। বেদের উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত সুরে ধ্বনি উচ্চারিত হল, মানব সমাজে তাই তারা উদারা মুদারা হয়ে কণ্ঠে কণ্ঠে মুখরিত হ'ল। এই তিন স্বরগ্রাম থেকে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর জন্ম হ'ল।

আমি। এই ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর মানে কি?

গিরিশবাবু।—তুমি গান গাইতে জান? সঙ্গীতে তোমার taste আছে?

আমি। গান টান আমি আদৌ জানিনা কি বুঝিনা—তবে শুন্‌তে বেশ লাগে।

গিরিশবাবু।—বটে! নিতান্ত যার গাধার মত স্বর—সেও কখনও কখনও আপনার মনে গায়। গানের technique বল্‌লে কিছু বোঝনা? এই জিনিষটায় একটু মন দিলেই অনেক জান্‌তে পার্‌বে আর শিখ্‌তে পার্‌বে। গলার ভিতর থেকে যখন স্বর বেজে উঠ্‌লো তখন মানুষ দেখ্‌লে সুরের যে বিভাগ করা গেল সে তিনটীকে আশ্রয় ক'রেও তার উঁচু নীচু পর্‌দা আরও আছে।—এই রকমে একটী একটী করে প্রত্যেক বিভাগে সাতটী করে পর্‌দা হল।—এই রকম করে সা রি গা মা পা ধা নি এই সাত পর্‌দা হ'ল। এই যে পর্‌দায় পর্‌দায় সুরের ধ্বনি সাজান হ'ল, মানুষ তাতে দেখ্‌তে পেলে, তার অব্যক্ত ভাব মনের পরিচয় এতে যেন ফুটে উঠ্‌ছে। হাসি কান্না প্রেম অভিমান নিরাশা আশা সব ফুটে ফুটে প্রকাশ পাচ্চে। মন বিশ্লেষণ ক'রে তার ছয়টী ভাব বা উচ্ছ্বাসের নাম-

করণ করলে "রাগ"। মানুষ—তাতে আনন্দ পেলে—বুঝলে গানে এক আনন্দ—এক অপূর্ব্ব রসের অনুভূতি—ভিতর বাইরে সব একাকার হয়ে যায়। হৃদয়ের যত ভাবের উচ্ছাস —emotions-এর যত রকম স্তর বা বিভাগ আছে—সবগুলিকে প্রকাশ ক'রে মানুষ তার রসাস্বাদন করতে ব্যস্ত হল। মূলতঃ ছয় রাগকে আশ্রয় ক'রে ছত্রিশ রাগিণী নানাভাবের মূল মিশ্রণ রূপে emotional expressions-এর different and separate types ধ'রে সুরের সৃষ্টি হল—এই রকমে ছয় রাগের সঙ্গে ছত্রিশ রাগিণীর উৎপত্তি হ'ল।—সঙ্গীত বিদ্যার মত আর বিদ্যা নাই—সুরের ভিতর espressions-এর analytical বিভাগ।—প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর মা বীণাবাদিনীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমি। পাশ্চাত্য জগতে কি ভারতবর্ষ থেকে সঙ্গীত বিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ ক'রে নি?

গিরিশ।—Emotional expressions-এর এই রকম analytical synthesis দেখায় নি। তবে—পাশ্চাত্যজগৎ সঙ্গীত বিদ্যার একটা প্রধান উন্নতি সাধন করেছেন—তা harmony—বিভিন্ন সুরের—notations-এর harmony. আমাদের যে তা ছিল না তা বলা যায়। ধর একতারা তানপুরা বীণা—একটা সুরের ঝঙ্কারে সব রকম রাগরাগিণী সাধা যায়।—ইউরোপা দেখিয়েছে সব রকম সুরের মিলনে একটা অপূর্ব্ব সুরের উদ্ভাবন হ'তে পারে।—গ্রীকের Lyre বাজিয়ে কবিতায় গেয়ে বেড়াত—তাইতে emotion-এর expression দিত। এই Lyre-এর সাহায্যে যে কবিতা গাওয়া হ'ত তাকেই Lyric poems বা যা তোমরা গীতি কবিতা বল—তাই বল্‌তো!

আমি। Lyre টী কি রকম বাদ্যযন্ত্র ছিল?

গিরিশ বাবু। এক রকম তারের বাদ্যযন্ত্র।—এস্রাজ সারেঙ্গের ঢংয়ের।—বড় বড় কবিতা কোনও পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক পালা একজন লোক বাজিয়ে বাজিয়ে গাইতো—তাই তাকে প্রথম বল্‌তো cantata. বর্ত্তমানে অবিশ্যি cantata বলতে আর সাবেক cantata বোঝায় না। এখন পাঁচজন মিলেও cantata গায়। একজনের লিরিক পরে পাঁচজনের কোরাসে দাঁড়াল। এই কোরাস গান থেকে নাটকের সৃষ্টি—তাই নাটকের ভিতরেও লিরিক মিশিয়ে আছে।—গ্রীকের কোরাস বিখ্যাত। এই কোরাস orchestraয় গীত ও অভিনীত হ'ত। Cantataর বর্দ্ধিত আকার oratorio.

আমি। Oratorio কি?

গিরিশ। কোনও পৌরাণিক দেব কাহিনী কিম্বা বাইবেলোক্ত কোনও পবিত্র আখ্যান-বস্তু সঙ্গীতে রচিত হ'ত।—তাই solo-তে, কোরাসে orchestra-য় অভিনীত হ'ত। এই অভিনয়ে দৃশ্যপট, সাজ সজ্জা কিম্বা কাথাবার্ত্তা বক্তৃতার অভিনয় নাই। শুধু গানে। রোমের নিকট Santa Maria Maggoire গির্জ্জার Oratoryতে এটা প্রথম কল্পিত ও অভিনীত হয়েছিল ব'লে একে oratorio বলে।

আমি। Solo কাকে বলে?

গিরিশবাবু। একজনে যা এক্‌লা বাজিয়ে বা গেয়ে গীতাভিনয় করে—তাকেই solo বলে। এই solo-র উপর কিছু চাল বাড়িয়েছে sonata-য়।

আমি। Sonata কি রকম?

গিরিশবাবু। Solo-র মতই—তিন বা চার রকমের অঙ্গভঙ্গে কিম্বা বিভাগে solo বাদ্য-যন্ত্রের জন্য গীতি রচনা। Beethhoven-এর sonato বিখ্যাত।—ইটালীতে গীতবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হ'য়েছিল। স্বরের উঁচু পরদায় রকমারি খেলা Soprano-তে আবার মেয়েদের গলায় contralto-ও মধুর।

আমি। Contralto-টা আবার কি ?

গিরিশবাবু। যুবতীর কণ্ঠে গভীরতম উচ্ছ্বাস খুব নীচু পরদায় সুরের লহরী লীলা। আবার চাপা গলায় বিহগকাকলীর প্রতিধ্বনির মত সুর। খুব উঁচু মরদানা আওয়াজের স্বর তরঙ্গে Alto-র পরিচয়। অস্বাভাবিক গলায় খুব উঁচু সুরকে falsetto বলে। চতুষ্পদী quartet-এর দ্বিতীয় চরণকেও Alto বলে। আমার মনে হয় কি জান প্রকৃতির অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরতম হাব ভাব সমূহ প্রকাশ পেতে লাগ্‌লো। তারপর উল্লাসে আনন্দে শরীরের অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্যের আমদানী হল। এই নৃত্যই তালের জন্ম দিলে—তখন নৃত্যে—তালে—গানে—ভাবের সমন্বয়ে মানুষ এর মাধুর্য্যধারা জান্‌তে পেরে আনন্দে রসের আস্বাদন কর্‌তে শিখ্‌লে। গানের সঙ্গে নাচের তালের সঙ্গে ছন্দের সুরের সঙ্গে রূপের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে !

আমি। কেমন ক'রে ?—ঠিক বুঝতে পার্‌লেম না।

গিরীশ বাবু। হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবের উচ্ছ্বাস সুরের ভিতর গান হ'য়ে প্রকাশ পায়। সুরের একটী rhythm আছে তা'তে একটা রূপ ফুটে ওঠে—সেই অস্পষ্ট রূপের প্রকাশের সঙ্গে ভিতরে rhythmic movements হয়—তাতেই ছন্দের উৎস ব'য়ে যায়—এই ছন্দে সুরে অন্তরের rhythmic movements-এর সঙ্গে যখন গান হ'য়ে বার হয় তখন তার সঙ্গে ছন্দের তালে তালে শরীরের অঙ্গ-ভঙ্গী আসে। মানুষ সমাজ-সভ্যতার খাতিরে নাচতে লজ্জা পায়—তা না হ'লে দেখ না কেন মানুষ যখন কোনও বিষয়ে উত্তেজিত হয়, আনন্দিত হয়, আতঙ্কিত হয় মানুষ হাত-পা ছোড়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, শরীর শিউরে ওঠে! এরই পরিমাপে নৃত্য—তালে তালে পা ফেল্‌তে শিখলে।

আমি। নাচের চর্চ্চা আমাদের দেশেও তো খুব এক সময়ে হ'য়েছিল।

গিরীশ। নিশ্চয়ই। অতীতের একটা খোলস তয়ফায়, বাই খেমটার নাচে, সংয়ের নাচে—নানাভাবে প্রাণহীন হ'য়ে পড়ে রয়েছে। আদিম কাল থেকে ভগবদ্ভাবে বিভোর হ'য়ে মানুষ নাচে। এই নৃত্যে যখন অব্যক্তকে ব্যক্ত কর্‌বার প্রয়াস পায়, তখন একটা অনুপম মাধুর্য্য ঝর্‌তে থাকে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের নৃত্য, প্রভু নিত্যানন্দের নৃত্য—বৈষ্ণব গ্রন্থে কত ভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু ঠাকুরের নৃত্য যে একবার দেখেছে সে বুঝেছে শরীরের অঙ্গভঙ্গে চাহনিতে সে অনন্ত আনন্দ ধারার মাধুরী কেমন ক'রে প্রকাশ পায়। আহা যে দেখেছে সে ধন্য হ'য়েছে।

আমি। কিন্তু আমাদের দেশে নাচকে তো ঘৃণা করে। শিক্ষিত ভাবুক যারা—তারা নাচকে অসভ্যতা মনে করে।

গিরীশ বাবু। সে যারা করে করুক, তাতে কি এসে যায়। তবে শিক্ষিতেরা ভাবুকেরা উৎসাহ দিলে—যোগদান কর্‌লে জিনিষটার উন্নতি সত্বরই হয়। তবে সব মঙ্গলময়ের ইচ্ছে। ইউরোপে orchesis, orchesography একটা প্রকাণ্ড বিদ্যে—একটা মস্ত কলাকুশলতা। গ্রাম্য গ্রামে যাত্রা গান, পালা গান আমাদের দেশে যেমন—ইউরোপের সর্ব্বত্রে তেম্‌নিই প্রচলিত ছিল।

আমাদের দেশে যেমন রাখালের গান আছে, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ গোষ্ঠ বাংলার—শুধু বাংলার কি—ভারতের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে আছে—গাঁয়ে গাঁয়ে তাই নিয়ে যাত্রা গান চলেছে, ইউরোপে তেমনি Pastoral song, Pastorale প্রচলিত ছিল—এই থেকে ইটালীতে Pastoral Dramaর সৃষ্টি হ'ল, পৌরাণিক আর রূপকে নাটক রচিত হ'তে লাগলো, এই Pastoral drama থেকে অপেরার সৃষ্টি।

আমি। অপেরার জন্ম কি ইটালীতে ?

গিরীশ বাবু। হাঁ—ফ্লোরেন্স সহর থেকে। অপেরার নৃত্যগীত হাবভাবের artistic expressions দিতে লাগ্‌লো। আজ কাল অপেরার রাজত্ব চল্‌চে। ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে যথার্থ নাটক খুব কম play হচ্চে—অপেরাই বেশী অভিনীত হয়।

আমি। আমাদের দেশে কি অপেরা ছিল না ?

গিরীশ বাবু। ইউরোপে যে ভাবে আছে ঠিক সে ভাবে আমাদের দেশে ছিল না। কিন্তু গীতিনাট্যের বেশ প্রচলন ছিল। কৃষ্ণযাত্রা—যাত্রা জিনিষটারই নাটকের চেয়ে অপেরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইউরোপের স্বাধীন দেশে নরনারীর অবাধ স্বাধীনতা উদ্দাম প্রকৃতির সহযোগে নৃত্য ও গীতের একটা অপূর্ব্ব উন্নতি সাধন ক'রেছে। ওদের অজস্র ধন রোজগার হচ্ছে প্রাণে ফূর্ত্তি সখ আছে, আর কলাকুশলতার পরিপুষ্টির চেষ্টা আছে—বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী জন্মগ্রহণ কর্‌চে—তাই fine arts'ও সুন্দর develop করছে।

আমি। কিন্তু আমাদের দেশে পরাধীনতা সত্বেও এই কলা বিদ্যার চর্চ্চা চলেছে ; হ্রাস পায় নি—বরং যুগে যুগে উন্নতি লাভ করেছে। এখন যে লোক খেতে পায় না তবুও যাত্রাগান থিয়েটার, বাইনাচ প্রভৃতিতে লোকের কম উৎসাহ দেখা যায় না।

গিরীশ বাবু। তার কারণ কি জান ? আমাদের জাতের প্রাণ মরেনি—রসধারা শুকোয় নি। এই প্রাণে রসের ধারা মহাপুরুষরা জাগিয়ে রেখেছেন। আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থিক সব gloomy—অন্ধকারময়। কেবল বর্ত্তমান তথাকথিত শিক্ষিতেরা যে, "ধর্ম্মে"র নামে নাক তোলেন—সেই ধর্ম্মই জাতটার প্রাণরক্ষা কর্‌চে—অনন্ত রসের ভাণ্ডার ঢেলে দিয়ে এই দুর্দ্দিনে দুরবস্থায় জাগিয়ে রেখেছে। আজ যদি ভারতে ধর্ম্মের প্রবাহ না থাক্‌তো—তবে জাত্‌টা ছারখার হয়ে যেত।

আমি। কেন সাহিত্যের অনুশীলনেও তো রসের ধারা বজায় থাকে। আজকাল কেউ কেউ বলেন যে সাহিত্যের উপর জাতীয় আন্দোলন প্রতিষ্ঠা কর্‌তে।

গিরীশ বাবু। বটে! সাহিত্যের রস আস্বাদন কর্‌বে কে যদি জাতটার প্রাণ না থাকে ? সাহিত্য—জাতটার expressions—অভিব্যক্তি মাত্র। মহাপুরুষদের জীবন, চরিত্র, চিন্তায় সাহিত্যের বিকাশ আর পরিপুষ্টি। পিছনে একটা বড় ভাবের প্রবাহ না থাক্‌লে সাহিত্যের পরিপুষ্টি হয় না। সেই ভাব-প্রবাহের উৎস—ভারতবর্ষে ধর্ম্ম। এই দেখনা কেন আমাদের এই দেশের সাহিত্য। ধর্ম্মের আন্দোলন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গড়ে উঠেছে। প্রাচীন সাহিত্য বল আর আধুনিক সাহিত্য বল, পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের বলে তোমার আমার ভিতর রসের ধারা রয়েছে, তাইতে তুমি অন্য দেশের সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে সক্ষম হচ্চ—এই শক্তির বলে adjust করে নিতে পারচো। মুসলমান আমলে বল আর ইংরেজের আমলেই বল, আমাদের দেশে বড় বড় ধর্ম্মবীর—অবতার পুরুষ—জন্মগ্রহণ ক'রেছেন ব'লেই আজ আমরা সমগ্র

জাতের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করছি। যখন আমরা এই ধর্ম্মকে উপেক্ষা করবো—তখন আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের মস্ত ভয় কি জান—আমরা আমাদের এই জাতীয় ব্যক্তিত্বটাকে না হারাই—যেখানে জাতের ব্যক্তিত্বটা মরে যায়, সেখানে জাতটাও মরে যায়। আর যতক্ষণ সে ব্যক্তিত্বটা বেঁচে থাকে, ততক্ষণ হাজার দুর্দ্দশা ঘট্‌লেও অত্যাচার উৎপীড়ন এলেও ব্যক্তিত্বটা সহ্য করে তার প্রতিবিধান করবার জন্য সময়ের প্রতীক্ষা করে। সে সময়ের প্রতীক্ষা মানে আপনার শক্তি সঞ্চয়।

ডাক্তার কাঞ্জিলাল।—কিন্তু এই সাদা কথাটা আজকাল কেউ বুঝ্‌তে চায় না। ইউরোপীয় আদর্শ লোকের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়া দিয়েছে।

আমি। তা দেবে না কেন? যে দিকে বিচার কর পাশ্চাত্যেরা আমাদের চেয়ে কত উন্নত। তাদের সাহিত্য—তাদের বিজ্ঞান—তাদের শিল্পকলা—তাদের রাজনৈতিক উন্নতি—তাদের প্রকাণ্ড missionary organisation—চিকিৎসা বিদ্যায় উৎকর্ষ—কলকব্জা বাণিজ্য কোন দিকেই তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। এই যে নাটক—নাচ গান—তাতেও ওদের প্রভাব আমাদের স্বীকার করতে হয়। প্রতি হাতে ওদের মুখের দিকে আমাদের তাকাতে হয়।

গিরিশবাবু। সত্যি—তা বটে। উন্নত উদ্যমশীল জাত্—তা কে অস্বীকার করবে? তবে কি জান যে বিষয়গুলো বল্‌লে—তাতে ওদের মুখের দিকে তাকাচ্চ। কিন্তু ধর্ম্মচিন্তায়—ধর্ম্মের আদর্শে কি ওদের দিকে তাকাতে হচ্চে? যেখানে ভারতে বেদ ষড়্‌দর্শন গীতা ভাগবত পুরাণ রামায়ণ মহাভারত আছে, যেখানে বুদ্ধ চৈতন্য রামকৃষ্ণ আছে, সেখানে কি তোমাকে ওদের দিকে তাকাতে হচ্চে? এই বিশেষত্বের পার্থক্য আগে ভাল করে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। যেখানে তোমাদের আছে সেখানে পাশ্চাত্যের নেই, আবার যেখানে পাশ্চাত্যের আছে সেখানে তোমাদের নেই। এই "আছে নেইর" সমন্বয় করতে হ'বে। প্রত্যেক কালে তাই হয়েছে। পূর্ব্বেও ভারতের সভ্যতা শিক্ষা নানা দেশে এমন কি ইউরোপে পর্য্যন্ত আপনার প্রভাব প্রচার করেছে। এখন উন্নত ইউরোপের প্রভাব অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ভারতের আদর্শ সাম্‌নে রেখে সেই প্রভাবকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তাই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। মহাপুরুষরা পথ নির্দ্দেশ করে যান। স্বামী বিবেকানন্দ সেই পথ দেখিয়ে গেছেন—তাই অনুসরণ করতে হবে।

আমি। নাটক অপেরার সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা শুনছিলাম। তাই ভাল করে জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

গিরিশবাবু। (হাসিয়া) বটে—এতে তুমি interested বোধ করছ? কি জান্‌তে চাও বল?

আমি। অপেরা কি শুধু ইটালীতে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল?

গিরিশবাবু। অনেকটা বটে। কিন্তু জার্ম্মাণ ফরাসীরাও একে অনেক বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করেছে। ইউরোপে নৃত্যগীতের একটা প্রবল বিপ্লব ঘটেছিল। অপেরার সঙ্গে সঙ্গে লিরিক কবিতারও খুব আদর হ'তে লাগ্‌লো। আপাততঃ অপেরা আর Lyric-এর যুগ। নাচ গান নাটকের অন্তর্গত হয়ে একটা নূতন গতি নিলে।

আমি। কি রকম নূতন গতি?

গিরিশবাবু। Pathos প্রকাশ করতে শিখ্‌লে। নাটকীয় চরিত্রানুযায়ী গানে

expressions দিতে শিখ্‌লে। Comedy বা tragedy-র expressions নৃত্যগীতে পরিস্ফুট হতে লাগ্‌লো — এটাই নৃত্যগীতের নূতন গতি।

আমি। ইউরোপে আমাদের দেশের মত রাগরাগিণী নাই—আপনার থিয়েটারী সুরকে সুগায়কেরা অবজ্ঞা করে বলে মিশ্র সুর, ভংকা সুর।

গিরিশবাবু। নূতন কোনও জিনিষ আমদানী হ'লেই ওরকম চেঁচায় ভেংচায়—তাতে কিছু আসে যায় না। থিয়েটারী সুর মানে কি? নিছক রাগ-রাগিণী এক এক সময়ের গান। ভোরে ভৈরবী, সন্ধ্যায় পূরবী, রাত্রে বেহাগ, এই রকম এক এক সময়ে এক এক রাগ-রাগিণী গাইবার বিধি আছে। থিয়েটারে নাটকে সকল শিল্পকলার সমন্বয়। দেখ কনসার্ট সমস্ত বাদ্যের ঐক্যতান। দৃশ্যপট, সাজ সজ্জা সব অভিনয়ের উপযোগী করতে হয়। রঙ্গালয়ে গান ও নাচ অভিনয়ের একটী অঙ্গ। রঙ্গালয়ের গান সখের গান নয়—যাত্রার গান নয়। রঙ্গালয়ের নাচ গান যেখানে বিশেষ আবশ্যক—নাটকীয় চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে নাটকের গতিকে সাহায্য করতে নাটকের অভিনয়কে সজীব করতে নাচগানের সেখানে প্রয়োজন।—সুতরাং গানে যাতে মনের ভাব বিশেষ ক'রে ব্যক্ত হতে পারে তার চেষ্টা থাকে এবং সেই অনুযায়ী সুরও সংযুক্ত থাকে। কথাবার্ত্তায় হাবভাবে যেমন impressions পড়ে—গানেও সেইরূপ impressions দিতে হবে। আমাকে ভৈরবী থেকে বেহাগ—সব আলাপ এক সময় গাইতে হবে। সেইটে যাতে না হয় তা আমার বিশেষ লক্ষ্য থাকে। মনে কর কোথাও বিষাদের সুর কি কোথাও আনন্দের সুর—সব তো অভিনয়ে দেখাতে হবে। আবার অস্বাভাবিক করলে চল্‌বে না। অভিনেতা বা অভিনেত্রী গান গাইতে যদি রাগ-রাগিণী দস্তুর মত আলাপ করে তবে রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয়ে যে আব্‌ হাওয়ার সৃষ্টি করে—তা ভেঙ্গে যাবে। আমি যখন গান বাঁধি—তখন নাটকীয় চরিত্র মনে রেখে গান বাঁধি—সুরের ইঙ্গিত দেখিয়ে দি—তবে অপরে সেই সুর অবলম্বন ক'রে গানে সুর দেয়। নৃত্যও তাই—তালে-তালে পা ফেল্‌তে হয়—ঘুমুরের - নূপুরের ধ্বনি তালে তালে বাজ্‌বে—তার সঙ্গে যে রসবিকাশ করতে হবে তা নৃত্যে দেহভঙ্গীর সঞ্চালনে প্রকাশ পাবে—শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চাউনি পর্য্যন্ত সেইভাবের হিল্লোলে আন্দোলিত করতে হ'বে। ইউরোপীয়েরা Pause বা Posture দিয়ে সেই হাবভাব প্রকাশ করে। ইউরোপে জীবজন্তু পাখীর অনুকরণে সুর সাধনা করে—তাই দেখানো মস্ত আর্ট। নৃত্যেও প্রজাপতি ভুজঙ্গিনী—Butterfly, Serpentine ভাবে Pause দেখাবার চেষ্টায় নৃত্যের শিক্ষা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যচাতুর্য্যে জীবজন্তু বিহঙ্গম সরীসৃপের অনুকরণ নেই—তাতে আছে ভাবের অভিব্যক্তি। Pause এবং expressions of emotions দুইটী বিশেষ দরকার।—রঙ্গালয়ে নৃত্যগীতের এই পরিপুষ্টির বিশেষ ইচ্ছা ছিল—কিন্তু তা হ'ল না। দেশে প্রকৃত নাট্যানুরাগের অভাব।

আমি। Waltz নাচটা কি?

গিরিশবাবু। এই নাচ জার্ম্মানীর জাতীয় নাচ। দুজনে মিলে খুব whirling motion দেখায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে Waltz নাচের চলন হয়। এ ছাড়া Quadrille নাচ আছে।

কান্তিলাল। Quadrille dance কি রকম?

গিরিশবাবু। চারটী-জোড়া মেয়ে-মদ্দ square হ'য়ে নৃত্য করবে। এই নাচে পাঁচ-রকম অঙ্গের আন্দোলন—নাচের রকমফের দেখাবে।—অপেরায় আবার Ballet dance আছে।

আমি। তা কি রকম ?

গিরিশবাবু। এতে নাচ আছে, Posturing আছে--আবার Pantomimic action আছে।

আমি। Pantomimic action কাকে বলে ?

গিরিশবাবু। Action without words. এই সব যারা নাচে তাদের Ballerina বলে। Balladine—Ballerina যুবতী নর্ত্তকীর নাম। অপেরা ট্র্যাজেডীতে জমেছিল, পরে কমেডিতে জম্‌লো।—খুব comic opera নাম হ'ল অপেরা বুফ্—opera·bouffe। এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে আবার নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হ'ল। এমন কি কনসার্টের পূর্ব্বে কর্ণাটিনা বলে একরকম বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হ'ল।

আমি। বাস্তবিক প্রত্যেক বিষয়ে জগতে কত নূতন সৃষ্টি আবিষ্কারের উন্নতি পরিপুষ্টি হচ্চে—তা ভাব্‌তে গেলে অবাক্ হ'তে হয়।

গিরিশবাবু।—তা আর বল্‌তে। আর দেখ ইটালিতে melodramaর সৃষ্টি।—অপেরা আর melodrama-র ঢেউ ইটালী ও ফরাশীদেশে খুব হয়েছিল।

আমি। Drama থেকে melodramaর পার্থক্য কি ?

গিরিশবাবু। অনেক পার্থক্য। গল্পের চরিত্র সৃষ্টির অপেক্ষা ঘটনা সৃষ্টি—situation-এর সৃষ্টি—বিশেষ হয়ে থাকে। খাঁটী সজীব নরনারী নায়ক-নায়িকা দেখ্‌তে পাবে না—different types-এর রকমারি আছে। Emotion-এর বাহুল্য, হৃদকম্পনকারী ঘটনা, দৈববলে উদ্ধার, নয়নরঞ্জনদৃশ্য প্রভৃতি melodrama-র বিশেষ বিশেষত্ব।

আমি। বাস্তবিকই বর্ত্তমান যুগে নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গালয় নানাদিকে অদ্ভুত উন্নতি লাভ কর্‌ছে।

গিরিশবাবু। কিন্তু মনে রেখ সাম্‌নে যে বিস্তৃত প্রকাণ্ড নাট্যশালা রয়েছে—তার কোটী অংশের এক কণামাত্র এই সব নাটক বা রঙ্গালয়। এখানে অভিনেতাও তুমি দর্শকও তুমি। রকম রকম ভূমিকাও তুমি গ্রহণ কর্‌ছ—দেখ্‌ছোও সাক্ষীরূপে তুমি।

কান্তিলাল। সে কি রকম মশায় ?

গিরিশবাবু। অন্তরে মননশীল মন আছেন, আর সাক্ষী—দ্রষ্টারূপে আত্মা—তাকেও মনই বল্‌তে পার। এক মন কাজ করে আর এক মন দেখে। ধ্যান কর্‌তে বস্‌লে দেখ্‌বে একমন একাগ্র কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চে, ইষ্টমূর্ত্তি ধারণ কর্‌বার যত্ন কর্‌চে,—আর এক মন তুমি ক্ষমতা অক্ষমতা দেখ্‌চো। যখন বক্তৃতা কর তখন একটু অনুধাবন করলেই দেখ্‌তে পাবে। অভিনেতা যখন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে তখন একজন অভিনয় করে অপর মন সাক্ষীরূপে দ্রষ্টারূপে শ্রোতারূপে থাকে।—এও এক রহস্যপূর্ণ রসপূর্ণ আনন্দপূর্ণ নাটকের অভিনয়। এই রঙ্গালয়ে যে ট্র্যাজেডী অভিনীত হয় তা আর কোথাও হয় না—যে কমেডি অভিনীত হয় তা আর কোথাও হয় না, যে অপেরা melodrama-র নৃত্যগীত হয়—তা আর কোথাও হয় না।—এমন রসের স্ফূর্ত্তিও আর কোথাও উথ্‌লে ওঠে না।

গিরীশবাবু নীরব হইলেন—বোধ হইল যেন তিনি কোন্ চিন্তারাজ্যে—কল্পনার ভাব-রাজ্যে চ'লে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যময় আনন্দপূর্ণ—আবার গম্ভীর অন্যমনা। আমরা ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ কর্‌লাম।

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

স্রোতের মায়া

বিশেষ কাজের তাড়া না থাকিলে এ সময়ে কেহ পদ্মায় নৌকা ভাসায় না। ক্ষুধিতা নদী গ্রামের পর গ্রাম, মাঠ, চর, একে একে মুখে পুরিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, তাহার ক্ষুধা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিতেছে। পাড় ছাড়িয়া লোকে দূরের গ্রামে পলায়ন করিতেছে। যতদূর দেখা যায় নদীবক্ষ শূন্য, চঞ্চল স্রোত কল কল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। শুধু আমার পালতোলা নৌকাটী সেই বিপুল স্রোত কাটিয়া অগ্রসর হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল।

নৌকায় ছিলাম আমি এবং আমার দু চারজন কর্ম্মচারী। প্রতিমুহূর্ত্তে নৌকা উল্‌টাইয়া যাইবার ভয়ে সকলেই শিহরিয়া উঠিতেছিলাম। নৌকা এক লগি যায় ত দশ লগি পিছাইয়া আসে। আমি ভরা পদ্মার নব যৌবনের রূপ অতৃপ্ত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। ভয়ের পরিবর্ত্তে আমার মনে কেমন একটা আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছিল।

দূরের একটা চরের দিকে চোখ পড়িল। সমস্তটাই তাহার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। একখানি মাত্র খড়ের চালা একপাশে হেলিয়া আছে। তাহার দাওয়া পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে। তাহারি উপর একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া হাতছানি দিয়া অনবরত আমাদের ডাকিতেছিল।

অনেকক্ষণ অনিমেষে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। সহসা সমস্ত মনটা কেমন একটা স্নেহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। একটা ক্ষুদ্র শিশুর অন্তরের আহ্বান আমার অন্তরে স্পর্শ করিতেছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বুঝি বা পদ্মাপারের কোনো জেলে বা মাঝির অনাড়ম্বর কুটীর ওইখানি। সাথীশূন্য এই উচ্ছ্বসিতা নদীর মধ্যে একান্ত অসহায় অবস্থায় সে হয়ত সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। আমি মাঝিদের ডাকিয়া বলিলাম "ঘোরাও ওই দিকে নৌকা—"

নৌকা কুটীরের দাওয়ার ঠিক নিম্নে আসিয়া লাগিল। দেখিলাম পাঁচ বছরের একটী ছেলে হাত দুইটী জলের দিকে বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। চোখ দুইটী তাহার জলে ভরা। এক একবার সে ভাঙা গলায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে "বাবাগো বাবা!—মাগো মা!—"

তাহাকে টানিয়া নৌকায় তুলিয়া লইলাম। কুটীরের দরজা দিয়া ভিতরে উঁকি দিয়া দেখিলাম কুটীর শূন্য। ছেঁড়াঘোঁড়া ময়লা কাপড় আর দুই একটা ভাঙা মাটীর হাঁড়ি ঘরের চারদিকে ছড়ান রহিয়াছে। কখন যে কুঁড়েখানা ধ্বসিয়া নদীতে পড়িবে তাহার ঠিক নাই।

ছেলেটীর নগ্নতনু জলে ভিজিয়া গিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপিতেছিল। একখানা ফরসা কাপড় বাহির করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া তাহাকে কোলের উপর বসাইলাম। সে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একবার বলিল "ওগো আমার বাবাকে দেখেছ, মাকে দেখেছ—সেই যে মা গেল নৌকো চড়ে"—ফ্লাস্কে গরম দুধ ছিল তাহার খানিকটা বাহির করিয়া ছেলেটীকে খাইতে দিলাম। একটু পরে আমার কোলের উপর শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখ হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। এক শ্রাবণের জলঝড়ের রাত্রে আমার স্ত্রী একটী শিশুসন্তান প্রসব করেন, জন্মের পর একবারমাত্র চোখ মেলিয়াই সেটী ফুলের কোরকের মত চিরতরে মুদিয়া যায়। এই ছেলেটীর মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে আমার রহিয়া রহিয়া তাহারই ব্যথা মনে হইতে লাগিল। তাহারও ছিল যেন এমনিই কোমল সুকুমার মুখখানি। একজন কর্ম্মচারীকে বলিলাম 'কি করা যায় বলত বিষ্টু। ছেলেটী ঘরে একলা পড়ে' আছে—"

বিষ্টু, বলিল "আমিও ভাবছিলুম ওর বাপ মায়ের কথা। তারা কি আর আছে!—যে জলের তোড়—"। ছেলেটী জাগিয়া উঠিল। শান্তভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কোল ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল "বাবা আসেনি আমার, দেখে আসি ঘরে—" আমি তাহাকে কোলে বসাইয়া বলিলাম "আস্‌বে বৈকি, কোথায় গেছে তোমার বাবা জানো—আমরা ডেকে আন্‌ব?" ছেলেটী দূর পদ্মায় আঙুল দেখাইয়া বলিল "ওই যে হোথায়, নিত্যি যে মাছ ধরতে যায়। ভোরের বেলা শাল্‌তিখানি বেয়ে মা বাবাকে খুঁজতে গেছে। হাঁ গা দেখেছ আমার মাকে তোমরা?" বুঝিলাম পদ্মার বুকেও মাতৃস্নেহ পূর্ণ রহিয়াছে। কচি শিশুটীকে গ্রাস না করিয়া সে তাহাকে তাহাদের দাওয়ার উপরেই ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পিতা মাতা! তাহারা বুঝি আর জল হইতে উঠিয়া আসিবে না। করুণায় ও সমবেদনায় আমাদের সকলের হৃদয় কোমল হইয়া উঠিল। মাঝিদের বলিলাম "আর কাজে গিয়ে দরকার নেই, পাড়ের দিকে নৌকো ভিড়োও।" স্রোতের মুখে নৌকা মেঘের মত ছুটিয়া চলিল।

ছেলেটীকে ঘরে আনিতে সকলেই কৌহতূল ভরে দেখিতে আসিল। আমার ছোট ছেলেটী তাহার একটী খেলার সাথী মিলিয়াছে স্থির করিয়া তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিল। একটু বিস্মিত হইলেন কেবল আমার স্ত্রী।

সমস্ত ঘটনাটীই তাঁকে কহিলাম। কেন যে ছেলেটীকে বহিয়া ঘরে লইয়া আসিয়াছি—সেটুকুও জানাইলাম। বাস্তবিক ছেলেটীর উপর এই অল্পক্ষণের ভিতরেই আমার একটা গভীর মায়া বসিয়া গিয়াছিল। বলিলাম "এটীকেও তোমায় মানুষ করতে হবে বিনুর মত। মাবাপহারা ছেলে—মা ওকে আমাদের হাতে তুলে দিয়াছেন, ফেল্‌তে পারি কি—" স্ত্রী কিছুই বলিলেন না। খানিকক্ষণ কেলোর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। বিনু কেলোকে পাইয়া বসিল। সে তাহাকে লইয়া বাগান, উঠান, খেলাঘর, মাঠ, পদ্মার পাড়—দিনরাত খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি আড়াল হইতে প্রায়ই তাহাদের দেখিতাম। কেলো সব সময়েই উন্মনা হইয়া থাকিত। বুঝিতে পারিতাম বিনুর সহিত চপল আনন্দে খেলায় সে যোগ দিতে পারিতেছে না। সুযোগ পাইলেই সে ছুটিয়া আসিয়া পদ্মার পাড়ে দাঁড়ায়। চোখের উপর হাত দিয়া রোদের আড়াল করিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকে।

আমি তাহাকে সব সময়েই আদর করিতাম। কিন্তু তবু সে যেন আমার কাছে আসিতে চাহিত না। সব সময়েই ভয়ে ভয়ে সরিয়া সরিয়া যাইত। আমার স্ত্রীর মন সে দখল করিতে পারে নাই। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম একটা অমূলক আশঙ্কায় স্ত্রী এই ছেলেটীকে একটু বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে সুরু করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বিনা কারণে তাহাকে একটু আধটু শাসন ও ভর্ৎসনা করিতেন।

একদিন বাগানের ধারে গিয়া দেখিলাম কেলো ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সাপটিয়া ধরিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইলাম, বলিলাম "কি হয়েছে রে কেলো?" আমার কোলের ভেতর মুখ লুকাইয়া কেলো বহুক্ষণ নীরবে কাঁদিল। আমি তাহাকে লইয়া আমার ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে বলিল "মাসিমা মারছিল দাদাকে"—সহসা দরজা খুলিয়া গেল, আমার স্ত্রী বিনুর হাত ধরিয়া ঝড়ের মত ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেলো তখনও আমার কোলে ছিল, সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিলক্ষণ ঝাঁঝ মিশাইয়া বলিলেন "খুব হচ্ছে সংসার করা বটে, নিজের ছেলেটা নদীর ধার, মাঠ জঙ্গল করে' করে' জানোয়ার

হয়ে উঠ্‌ল—সে দিকে কি চোখ দেবার একটু সময় হয় না ?" ম্লান হাসিয়া বলিলাম "কোন দিন কি সে কাজ আমি করেছি ?—তোমার—" "বেশ বেশ সে কাজ আমারই বটে, ডুবিস্‌না কেন রে বিনে তুই—পদ্মার জলে—" বলিতে বলিতে বিনুর হাতটায় হ্যাচকা টান দিয়া তিনি সশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কেন জানিনা সেইদিন হইতে কেলোর প্রতি স্নেহ আরো গাঢ় হইয়া উঠিল।

বিনু আর আমার কাছে আসে না। ঘরের খোলা জানালার সামনে বসিয়া দেখি বিনু আর কেলো বই শ্লেট বগলে লইয়া স্কুলে যায়। বিনু বার বার পিছনের একটা জানালার দিকে চাহিয়া দেখে। সেখান হইতে বোধহয় যে তার মায়ের তীব্র চোখের পাহারা দেখিতে পায়। পথের দুই পাশ দিয়া ছেলে দুইটী বরাবর সোজা চলিয়া যায়। এক একবার আমার ঘরের জানালার দিকে তাহার চোখ পড়ে। তখনি মাথাটী নিচু করিয়া সে চলিয়া যায়। ছোট ছেলের অন্তরের রুদ্ধ অভিমান যেন গুমরিয়া গুমরিয়া আমার কাণের কাছে বাজিতে থাকে।

সেদিন কি ঝড় আর কি বৃষ্টি!—অপরাহ্নের ম্লান ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্য্যোগ যেন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। শঙ্কিত নয়নে দুরু দুরু বক্ষে আমি বাতায়নের ধারে বসিয়া ছিলাম ছেলেরা তখনো পাঠশালা হইতে আসে নাই। চাকর ত অনেকক্ষণ তাহাদের আনিতে গিয়াছে। বারকয়েক সমস্ত ঘরময় পায়চারি করিয়া আমি বাহিরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। অল্পক্ষণ পরেই চাকর বিনুকে কোলে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমি পথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম কেলো ত আসে নাই! বিনু চাকরের কোল হইতে নামিয়াই ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল, উৎকণ্ঠা ভরে বলিয়া উঠিল "বাবা গো—কেলো ঘরে এলো না। বল্লে আমি আর বাড়ী যাব না।"—আমি চমকিয়া উঠিলাম, বিনুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলাম, "ঘরে এলো না কোথায় গেল তবে ?"—আমার কোলের ভিতর ছট্‌পট্‌ করিতে করিতে বিনু বলিল "পথের দিকে গেল বাবা—আমি বল্লুম ফিরে আয় কেলো বিষ্টিতে ভিজে যাবি! সে শুন্‌লে না, দৌড়ে মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেল। খুঁজবে চল না বাবা তাকে!" কোল হইতে নামিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। অত্যন্ত উন্মনা হইয়া উঠিলাম। কি যে ভাবিতেছি তাহা নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। মৃদুকণ্ঠে কহিলাম "তুমি মার কাছে যাও বাবা, সে ফিরে আস্‌বে এখুনি"—ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

তাহার পর জানি না কখন ঘর হইতে বাহির হইয়া বাগানে বাগানে, মাঠে মাঠে, নদীর পারে পারে সেই বৃষ্টিঝরা রাত্রে জলে ভিজিয়া ভিজিয়া কতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। ভীষণ শব্দে মাঠের মধ্যে বাজ পড়াতে যেন চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল, সম্মুখ দিয়া যেন একটি ছোট ছায়া চঞ্চল গতিতে চলিয়া গেল। সেদিকে হাত বাড়াইতে গিয়া হুমড়ি খাইয়া আমি জলকাদার উপর পড়িয়া গেলাম।

খুব ভোরে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলাম প্রান্তরের পারে দূরে পদ্মাতীরে অনেক লোক জড় হইয়াছে। জানালার নীচে দাঁড়াইয়া বিনোদ বাগ্দি এই সময় ডাকিল "কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু একবার আসুন ত!"—বলিয়াই সে চঞ্চল গতিতে অগ্রসর হইল। কম্পিত পদে আমি তাহার অনুসরণ করিলাম।

পদ্মাতীরে আসিয়া দেখিলাম একটী বালকের দেহ মাটীর উপর শোয়ানো রহিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গাঁয়ের লোকেরা নানা কথা বলাবলি করিতেছে। আমাকে

দেখিয়া সকলে সরিয়া গেল। দেহটীর কাছে গিয়া আমি হাঁটু গাড়িয়া নিচু হইয়া দেখিলাম সে কেলোই বটে। মুখখানি অনেকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কম্পিত হস্তে আমি তাহার বুকে হাত দিলাম। তুহিন্‌শীতল স্তব্ধ দেহ। এই সময় বিনু ছুটিয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই কেলোর দিকে চাহিয়া রহিলাম। বিনোদ বলিল "ভোরের বেলা ওপার থেকে আস্‌ছিনু কর্ত্তা, জল থেকে পেনু একে—" আমার চোখে নিমেষ পড়িল না। বিকৃত মুখখানা হইতে চোখ ফিরাইতে পারিলাম না। মুখে কোন কথা আসিল না। অনেকক্ষণ পরে বিনুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে স্থিরভাবে আমার পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার দুই চোখে বড় বড় মুক্তার মত দুফোঁটা জল টল্ টল্ করিতেছে।

শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঘে

আমাদের কর্ত্তব্য ও কমিশন—উচ্চপদস্থ ভারতবাসীদের মধ্যে যাঁহাদের যথার্থ বহুদর্শিতা আছে, বিজ্ঞতা আছে ও বিদ্যা আছে তাঁহাদের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত লর্ড্ সিংহ সকলকে কমিশনের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতের জন্য তিনি উপহাসের পাত্র ন'ন্, তবে কেন যে আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি তাহা বলিতেছি। রাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গে কমিশনকে বয়কট্ না করার কথা ছাড়া তিনি মার্কিণবিবির অতি ঘৃণিত ভারত সমালোচনার বইএর কথা বলিয়াছেন, আর সে বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ। অযথাভাবে উত্তেজিত মাথায় বিদ্বেষপরায়ণা মার্কিণবিবির গ্রন্থখানি এদেশের পদস্থ ব্যক্তিরা অতিমাত্রায় সমালোচনা করার ফলে এই ভারতেই উহার কাট্‌তি হইয়াছে অত্যন্ত অধিক,—অর্থাৎ অর্থের হিসাবে বিবিটিকে অনেক লাভ করিতে দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া বিবিটির মনে এই কৃতার্থতার আনন্দ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহার লেখায় তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুরূপে ভারতের লোকেরা উত্যক্ত হইয়া মানসিক জ্বালা ভোগ করিতেছে। ইহার উপর আবার যদি আমাদের কোন প্রতিনিধি ঘরের খাইয়া মার্কিণ দেশের বনের মহিষ তাড়াইতে যান তবে নির্ব্বুদ্ধিতার একশেষ হইবে।

কমিশন বয়কট্ করার প্রস্তাবটি যে ভাবে কয়েকজন স্বদেশীয় নেতা আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের উত্তেজনা ও ক্রোধ বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়; যদি তাহা না হইত আর কমিশন সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য স্থিরভাবে আলোচিত হইত, তবে কেহই আমাদের পন্থাকে তিলমাত্র দুষিতে পারিতেন না। কমিশনে ভারতের লোককে নেওয়া হয় নাই বলিয়া যদি ক্রোধ ও অভিমান হইয়া থাকে তবে আমরা যথার্থই ভারতসংস্কারের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় চালিত হইতেছি। আমাদের উদ্দেশ্যে ও পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্যে কিরূপ প্রভেদ না থাকিয়াই যায় না, তাহাই আগে বুঝিতে হইবে। ইংরেজ এদেশ দখল করিয়াছেন আর মনে করেন যে ভারতকে ষোল আনা দখলে না রাখিলে পৃথিবীতে তাঁহাদের স্থিতিতে বাধা পড়ে, আর ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়া এদেশে চাষ আবাদ ও খনি প্রভৃতিতে যত স্বার্থের সূতা জড়াইয়া আছে, তাহার কোন গাছিই

ছিঁড়িতে গেলেই ইংরেজ জাতির প্রভূত ক্ষতি। কাজেই ইংরাজরাজ বলিতে যে পার্লামেণ্ট বুঝায় সেই পার্লামেণ্ট কিছুতেই ইংরেজের স্বার্থ তিলমাত্র নষ্ট করার দিকে কাজ করিবেন না; সভ্যেরা লেবার দলের হউন বা অন্য যে কোন দলের হউন, একই কথা। যদি কমিশনে জনকতক ভারতবাসীকে নেওয়া হইত তাহা হইলেও সারা দেশের লোকের ভোটে সদস্য নিযুক্ত হইত না,—হয়ত বা সদস্য হইতেন কয়েক জন ঘরের ঢেঁকি। যদি বা রাউণ্ড্ টেবিল্ কন্‌ফারেন্স্ হইত, অর্থাৎ সকল সদস্যেরা সমান পদ-মর্য্যাদায় ভারতের ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতি নাকচ করিবার উপায় ছিল অনেক। আমাদের বক্তব্য এই যে কমিশন বসুক বা নাই বসুক, আমরা আহূত হইয়া কথা বলি আর নাই-ই বলি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য এই যে আমরা সুবিচারে সারা দেশের বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা নির্ণয় করিব, অশিক্ষিত দল যত অধিক হইলেও বা সাম্প্রদায়িক বিবাদ যত অধিক হইলেও কেন যে সকলে মানুষমাত্রের প্রাপ্য অবাধ স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য তাহা বুঝাইব, ব্যবসা-বাণিজ্যাদির হিসাবে কি-কি বাধায় ভারতের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে তাহা বুঝাইব ও শেষে বিশেষ করিয়া বুঝাইব যে বিদেশ হইতে আগত পুরুষেরা যদি কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না হইয়া শাসনভার পাইবার উপযোগী হ'ন্ তবে দেশের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত শিক্ষিত ও দক্ষ ভারতবাসীরা কিছুতেই রাষ্ট্রশাসনের কাজে অনুপযোগী বিচারিত হইতে পারেন না। এই সকল কথা যে গ্রন্থে লিখিত হইবে তাহা ইংরেজিতে ইংরেজেরা পড়িতে পাইবেন ও প্রাদেশিক প্রধান প্রধান ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া সারা দেশের লোকে পড়িয়া শিক্ষালাভ করিবেন ও চেতনা জাগাইবেন; উহাতে ফল হইবে এত চমৎকার যে পার্লামেণ্ট কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এই কর্ত্তব্য-বোধে কাজ করিলে কমিশনকে বয়কট করার কথা আদপেই ওঠে না, অথচ সম্পূর্ণরূপে কমিশনকে উপেক্ষা করিয়া বিনা অভিমানে ও ক্রোধে আপনাদের কাজ করা হয়। এরূপ পদ্ধতিকে আমাদের লর্ড্ সিংহই হউন্ অথবা যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই হউন্ কিছুতেই নিন্দার কাজ বলিতে পারিবেন না। ক্রোধে ও অভিমানে আমাদের কর্ত্তব্যপালনের পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইতেছে।

* * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনের জন্য পূর্ব্বে যে আইন ছিল ও এখনও রহিয়াছে উহা যে পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত তাহা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন ও দেশের সকল শ্রেণীর লোকেই বলিয়াছেন। আইনের সংস্কার না হওয়ার ফলে ও যাঁহারা যথার্থ শিক্ষিত ও সুবুদ্ধি তাঁহারা সেনেট্ সভায় উপযুক্ত সংখ্যায় নির্ব্বাচিত না হওয়ার ফলে কত যে অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা গত ডিসেম্বর মাসের সেনেট সভার বিবাদ, তর্ক ও সিদ্ধান্ত দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। কোন একজন ব্যক্তি কেবল যদি বিদ্বেষবুদ্ধিতে বা খামখেয়ালিতে উপযুক্ত অধ্যাপক প্রভৃতিকে তাড়াইতে চান্ তবে তিনি অনেক দায়িত্ব-বুদ্ধিহীন সভ্যের পোষকতায় তাহা করিতে পারেন। দু-একবার সেনেট সভায় যাহা অভিনীত হইয়াছে তাহা বহুপরিমাণে আরও নানা বিষয়ের প্রসঙ্গে অভিনীত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রনীতির দলাদলির স্থান নয়, অথবা ব্যক্তিগত হিংসা-বিদ্বেষ অবলম্বনে কাজ করিবার স্থান নয়। এসকল দোষ সম্পূর্ণ চলিয়া যায় যদি যাঁহারা যথার্থ সুশিক্ষিত তাঁহারা অধিক সংখ্যায় স্বাধীনভাবেই নির্ব্বাচিত হইয়া সেনেটের সভ্য হ'ন্। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থাপক

সভায় দুইখানি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে ; একখানি রচনা করিয়াছেন অধ্যাপক ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আর একখানি রচনা করিয়াছেন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়। এই দুই কৃতী ব্যক্তির বিলের মধ্যে যে সকল স্থলে প্রভেদ আছে তাহা অনায়াসেই দূর করা চলে ও একমতে বিল পাস্ করা চলে। উভয়ের বিলেই একটি কথা মূলসূত্ররূপে আছে যাহার সারবত্তা কয়েক বৎসর আগেকার শিক্ষা-মিনিষ্টর স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কথাটি এই যে গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সভ্যের সংখ্যা একশত সদস্যের মধ্যে কুড়িজনের অধিক হওয়া উচিত নয়। সরকারি কর্ম্মচারীদের মধ্যে যাঁহারা যথার্থই উচ্চশিক্ষার সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত, উভয় বিলেই তাঁহাদিগকে সদস্য রাখিবার ব্যবস্থা আছে ; কাজেই এ বিল পাস্ হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কলিকাতা কর্পোরেশন, মহাজন সভা, হাইকোর্ট, দুইটি মেডিকেল কলেজ, এঞ্জিনিয়ারিঙ্ কলেজ, জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপেলিটি প্রভৃতি যাহাতে সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি সকল কলেজ হইতে এমন কি হাইস্কুল প্রভৃতি হইতে যাহাতে সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যে সংখ্যায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার জন্য ডাঃ প্রমথনাথের প্রস্তাব আছে তাহা অত্যন্ত উপযুক্ত মনে হইল। উভয় বিলের খুঁটিনাটি প্রভেদ ধরিয়া যে সকল তর্ক উঠিতে পারে তাহা তেমন গুরুতর মনে হয় না। যাহা অত্যন্ত প্রয়োজনের সে কথাটি এই যে গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যের সংখ্যা শতকরা বিশজনের অধিক হইতে পারিবে না। উভয় বিলে স্বীকৃত এই প্রস্তাবটি পাস্ হইয়া গেলেই বিশ্ববিদ্যালয় সুচিন্তিত ও স্বাধীন কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

* * * *

শান্তি-স্থাপনের উদ্যোগ—আমাদের গবর্ণর বাহাদুর পাবনা জেলার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষণের মামলাগুলিতে দণ্ডিত সকল ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়া সে জেলার সকলকে বিদ্বেষ ভুলিয়া শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সুবিচারিত কাজের জন্য আমরা লাট বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের দেশ যথার্থ হিতৈষণার বুদ্ধিতে জাগিয়া উঠিলে কিছুতেই যে সাম্প্রদায়িক বিবাদ উত্থাপিত হয় না, ইহা কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ আন্‌সারি বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন। বহুব্যাপী সাম্প্রদায়িক বিবাদে বুদ্ধিমানেরা বুঝিয়াছেন—সে বিবাদের মূল কোথায় ; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই সুবুদ্ধি জাগাইতে হইলে বিবাদ-বিদ্বেষের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া সকলকে অল্প-বিস্তর দেশের হিতকর কাজের দিকে লাগাইতে হইবে। পল্লীতে পল্লীতে সকল শ্রেণীর লোকের স্বার্থরক্ষার কাজ প্রভূত পরিমাণে আছে আর সে সকল কাজে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা কিছুতেই উঠিতে পারে না। দেশসেবকদের মধ্যে যাঁহারা পল্লীর কাজ করিবার উপযোগী ও যাঁহারা বক্তৃতা করিতে অনভ্যস্ত, তাঁহারা যদি সহরের সভাসমিতির মোহ কাটাইয়া পল্লীর কাজে পল্লীর লোকদিগকে উৎসাহিত করাইয়া কাজ করান, তবে অল্প সময়ের মধ্যেই লোকেরা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভুলিয়া অতর্কিতভাবেই মৈত্রীর পথে অগ্রসর হইতে পারেন। বিদ্বেষ দূর কর—বলিয়া যত বক্তৃতা বাড়ান যাইবে ততই বিদ্বেষের আগুন জ্বলিবার সম্ভাবনা থাকিবে।

* * * *

শোক-সংবাদ—প্রায় ৬৩ বৎসর বয়সে পৃথ্বীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি শিক্ষালাভের পর সংসারে প্রবেশ করিবার দিন হইতে এপর্য্যন্ত সাহিত্য-সেবায় ও দেশের অনেক হিতকর অনুষ্ঠানের উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রাচীন কংগ্রেসের জীবনকাল পর্য্যন্ত পৃথ্বীশচন্দ্র কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন ও গত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রায় প্রথম ভাগে ভারতের দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া একখানি ইংরেজি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বুড়া কটন সাহেব, দাদাভাই নৌরোজি প্রভৃতি ব্যক্তিরা ঐ গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। একবার ইনি একখানি সুপাঠ্য ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন ও সেখানি কয়েক বৎসর ভালই চলিয়াছিল। তিনি যে কয়েক বৎসর দৈনিক বেঙ্গলী পত্রখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন তখন অনেক বিষয়ে তাঁহার সারগর্ভ রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। নিত্যস্মরণীয় স্যর আশুতোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যখন কয়েকজন ব্যক্তি বিদ্বেষবুদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তখন পৃথ্বীশচন্দ্র অনেকগুলি প্রবন্ধে স্যর আশুতোষের হিতকর নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ের প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে Capital পত্রের প্রসিদ্ধ লেখক Pat Lovett-এর কথা; এই সুবুদ্ধি ও তেজস্বী লেখক স্যর আশুতোষের বিরুদ্ধবাদীদের নীচতা অতি পরিস্ফুটভাবে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই Pat Lovett-ও সম্প্রতি পরলোকে গিয়াছেন। আমরা উভয়কেই সশোকে স্মরণ করিতেছি।

আমরা আর একজনের শোক-স্মৃতি বহন করিতেছি,—ইনি বিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী হকিম আজমল্ খাঁ। যেভাবে ইনি নিজের স্বার্থ বলি দিয়া সমতার দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানকে দেখিয়া পূর্ণ অনুরাগে দেশের হিতসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন ও কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে একজন প্রধান নেতা বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন তাহা এদেশের কাহারও কাছে অবিদিত নাই। ইঁহার সাধুতার স্মৃতিতে এদেশে সাম্প্রদায়িক বিবাদ দূর হউক ও দেশ-হিতৈষণা বর্দ্ধিত হউক—ইহাই আমাদের কামনা।

ভ্রম সংশোধন

গত পৌষ সংখ্যার বঙ্গবাণীর "গিরীশ-স্মৃতি" প্রবন্ধে কতকগুলি মুদ্রাকর ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। ঐ প্রবন্ধের ৫২৫ পৃষ্ঠায় পনর ছত্রে "এই জাতিভেদের ভিতর" স্থলে "এই জাতিভেদ ছাড়া" হইবে। উক্ত প্রবন্ধের ৫৩৪ পৃষ্ঠার ছাব্বিশ ছত্রে "নীচ পাপিষ্ঠ স্বামী থাক্‌লে স্ত্রীর উন্নতির উপায় কি ক'রে হ'তে পারে তা "হরমণি"র চরিত্রে দেখিয়েছি।" এখানে "হরমণি" স্থলে "জোবি" হইবে। পরে উক্ত ছত্রের "জোবিকেও" স্থলে "সমাজধর্ষিতা হরমণিকেও" হইবে। পাঠকপাঠিকারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

Editor: Bejoychandra Majumdar.
Published by Kishori Mohan Bhattacharyya from the Bangabani Office, 77, Asutosh Mookerjee Road, Calcutta.
Printed by Shasi Bhusan Bhattacharyya, at the Model-Litho & Printing Works, 66-1A, Baitakkhana Road, Cal.